« পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি »

পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি

বিনয় ঘোষ

পুস্তক প্রকাশক

কলিকাতা ১২

প্রথম প্রকাশ
সাধারণতন্ত্র দিবস, জানুয়ারী ১৯৫০

প্রকাশক
নির্মলকুমার সরকার
পুস্তক প্রকাশক
৮/১বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা ১২

প্রচ্ছদপট
সত্যজিৎ রায়
বর্ণলিপি ও রেখাচিত্র
পূর্ণেন্দু পত্রী

মুদ্রক
শ্রীগোপালচন্দ্র রায়
নাভানা প্রিন্টিং ওআর্কস প্রাইভেট লিমিটেড
৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ
কলিকাতা ১৩

ছবি ও প্রচ্ছদপট মুদ্রক
লয়াল আর্ট প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড

বাঁধাই
ইস্টএণ্ড ট্রেডার্স

মূল্য : আঠার টাকা

আমার মায়ের স্মৃতি উদ্দেশে

সূচীপত্র

॥ চতুর্থ বিভাগ। আলোচনা ॥

॥ পরিশিষ্ট ও নির্ঘণ্ট ॥

চিত্রসূচী

[উপর থেকে নীচে, বাম থেকে দক্ষিণের চিত্রক্রম]

মানচিত্র

পূর্বাভাষ

বঙ্গসংস্কৃতির রূপায়ণ

পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি সাধারণভাবে বঙ্গসংস্কৃতির অঙ্গীভূত এবং ভারত-সংস্কৃতির সঙ্গে তার সংযোগও অনস্বীকার্য। পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ ভারতের বহু সাংস্কৃতিক উপকরণ ও গড়নের সঙ্গে বঙ্গসংস্কৃতির যে রূপসাদৃশ্য দেখা যায়, তা সুদৃঢ় ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সে-ভিত্তির মূল প্রাগিতিহাসের কুয়াশাচ্ছন্ন দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। সেইজন্য ভারত-সংস্কৃতির প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে বঙ্গসংস্কৃতির রূপমণ্ডন বিচার করা সম্ভব নয়। কিন্তু ভারত-সংস্কৃতির সাগর অভিমুখে যাত্রাপথে বহু জানপদ-সংস্কৃতির বিচিত্র স্রোতস্বিনী-ধারা পরস্পরের সঙ্গে মিলিত ও বিচ্ছিন্ন হয়েছে। বহু জাতি-উপজাতির ও জনগোষ্ঠীর দান আছে তাতে। বঙ্গসংস্কৃতি, বাঙালী জাতি এবং তার অন্তর্ভুক্ত বহু বর্ণ-গোষ্ঠী তাদের মধ্যে অন্যতম।

ভারত-সংস্কৃতির সঙ্গে বিভিন্ন জানপদ-সংস্কৃতির যে সম্পর্ক, এক-একটি জানপদ-সংস্কৃতির সঙ্গে সেই জনপদান্তর্গত বিভিন্ন অঞ্চলের সম্পর্কও কতকটা অনুরূপ বলা চলে। আধুনিক জাতি-বিজ্ঞানের অর্থে 'বাঙালী' একজাতি বলে গণ্য হলেও, বহু উপজাতি সম্প্রদায় ও বর্ণের সংমিশ্রণে তার উদ্ভব হয়েছে। তারও আগে, মৌলিক ও সঙ্কর মানবজাতির শাখা-প্রশাখার মিলন-মিশ্রণ ঘটেছে বাংলাদেশে। নৃতত্ত্ববিদ্ ও জাতিতত্ত্ববিদ্‌রা তার বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। জাতিশুদ্ধতা বিজ্ঞানীদের কাছে 'মিথ্' বা কল্পনা ছাড়া কিছু নয়। বর্ণকৌলীন্যের বিবেচ্য কোন বাস্তব ভিত্তি থাকলে, তা কৃষ্টিগত ও কুলাচারগত, জৈবিক শুদ্ধতা-অশুদ্ধতার সঙ্গে তার তেমন কোন সম্পর্ক নেই। বরং দেখা যায় যে, উচ্চবর্ণের মধ্যে যতটুকু অসবর্ণ-মিলনের উদার সুযোগ থাকে, তথাকথিত অনুচ্চবর্ণের মধ্যে তাও থাকে না। আদিবাসীদের স্তরে পৌঁছলে দেখা যায়, ক্ল্যান্ (clan) বা 'সিব্'-এর (sib) বন্ধন রীতিমত কঠোর। অনেকক্ষেত্রে এই কঠোরতা এত বেশি যে উচ্চবর্ণের কুলীনদের গোত্র-গোঁড়ামিও তার তুলনায় উদার মনে হয়। সুতরাং জৈবিক শুদ্ধতার দাবিতে বর্ণাভিমান বা উচ্চানুচ্চভেদ সঙ্গত নয়। বৃত্তি আচার ও সংস্কারের পার্থক্যের জন্যই কালক্রমে এই ব্যবধান ঘটেছে। সামাজিক গড়ন ও কর্মব্যবস্থাই তার জন্য দায়ী,

কোন জাতিকর্মা বিধাতাপুরুষ দায়ী নন। বৃত্তি আচার সংস্কার ধ্যানধারণা অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান নিয়েই যখন 'সংস্কৃতি', তখন তাতে সকল জাতির ও বর্ণের দান যোগ্য মর্যাদার সঙ্গে বিচার্য। শ্রেণীভেদে বা কুলভেদে সাংস্কৃতিক দানের তারতম্য নেই বিজ্ঞানীর কাছে। এক-একটি জনপদের বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চল জুড়ে, বিশেষ ঐতিহাসিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক ঘটনাবিন্যাসের জন্য এক-একটি আঞ্চলিক সংস্কৃতির রূপায়ণ হয় এবং ক্রমে সেটি তার স্বকীয় সুষমায় ভাস্বর হয়ে ওঠে। অর্থাৎ প্রত্যেক অঞ্চলের একটি সাংস্কৃতিক 'ব্যক্তিত্ব' গড়ে ওঠে। পশ্চিমবঙ্গ পূর্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গ হল বাংলা-দেশের এইরকম এক-একটি অঞ্চল। এই সব আঞ্চলিক সংস্কৃতির সংমিশ্রণে বঙ্গসংস্কৃতির সমগ্রতা ও বিশিষ্টতা, দুয়েরই বিকাশ হয়েছে। তাদের বিস্তারিত অনুশীলন বঙ্গসংস্কৃতির সামগ্রিক রূপোপলব্ধির জন্য একান্তভাবে আবশ্যক। 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' এই ধরনের অনুশীলনের একটি 'নমুনা' মাত্র। কিন্তু অনুশীলনের পথে অন্তরায় অনেক। প্রথম ও প্রধান অন্তরায় হল, চিরাচরিত 'অ্যাকাডেমিক' পদ্ধতিতে এ-অনুশীলন কোনপ্রকারেই সম্ভব নয়। তার জন্য সরজমিনে প্রত্যক্ষ অনুসন্ধানের প্রয়োজন। দ্বিতীয় অন্তরায় হল, কেবল একটি বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান নিয়ে অনুসন্ধান করলে, তা ব্যর্থ হবার সম্ভাবনাই বেশি, কারণ বিভিন্ন জ্ঞাতি-বিদ্যার (allied disciplines) আলোক নানাকোণ থেকে প্রসৃত করতে না পারলে, জনমানসের জটিলতা ভেদ করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। ইতিহাস নৃতত্ত্ব সমাজতত্ত্ব অর্থতত্ত্ব, এই ধরনের পরস্পর-নির্ভর জ্ঞাতি-বিদ্যা বলে সুধীজনমহলে ক্রমেই স্বীকৃত হচ্ছে। প্রত্যেক বিদ্যার ক্ষেত্রসীমাও প্রসারিত হচ্ছে প্রতিদিন। একজন ব্যক্তির পক্ষে সর্ববিদ্যায় সুরক্ষিত হয়ে প্রত্যবেক্ষণকার্যে অগ্রসর হওয়া এবং তাতে সাফল্যলাভ করা সাধনাতীত ব্যাপার। সকল শ্রেণীর জ্ঞানীগুণীদের সহযোগিতা ভিন্ন একাজ সুষ্ঠুভাবে করা সম্ভব নয়। এসব জেনেশুনেও, এই অনুশীলনের দুরূহ সংকল্প গ্রহণ করার একমাত্র যুক্তি হল, ভবিষ্যতে একাজ করবার ইচ্ছা থাকলেও কারও পক্ষে করা বোধ হয় আর সম্ভব হবে না। কারণ পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলের দ্রুত রূপান্তর ঘটছে। ভবিষ্যতে আরও দ্রুতগতিতে ঘটবে। বৃটিশযুগে যেসব কারণে গ্রাম্যসমাজ ও গ্রামীণ সংস্কৃতি স্থিতিশীল ছিল, বর্তমানে স্বাধীন পরিবেশে সেই কারণগুলি

অনুসন্ধানের রীতি ও অন্তরায়

ক্রমেই অপসারিত হচ্ছে। গ্রাম্যসমাজের গড়নের (social structure) এবং সেই সঙ্গে মানুষের আচার-অনুষ্ঠানের ও ধ্যানধারণার পরিবর্তন ঘটছে। ভবিষ্যতে আমাদের সংস্কৃতির অনেক নিদর্শন ইতিহাস-রচনার জন্য আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। যেটুকু যাবে তার মধ্যে কৃত্রিম ও বিকৃত নিদর্শনই থাকবে বেশি। এই অনুসন্ধান ও অনুশীলনের আশু আবশ্যকতা তাই এত বেশি। কারণ আজকের পরিবর্তনশীল সমাজ ও সংস্কৃতির অন্যতম শুভলক্ষণ হল, আমাদের সাংস্কৃতিক মূল্য-মান, সদ্‌গুণ ও ঐতিহ্য জানবার অদম্য আগ্রহ। এই আগ্রহ ও ঔৎসুক্য আজ কেবল শহর-নগরের শিক্ষিতশ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, গ্রামাঞ্চলের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যেও সক্রিয়ভাবে সঞ্চারিত। গ্রামে গ্রামে এই ঔৎসুক্যের প্রকাশ আমি দেখেছি এবং অনুভব করেছি। উনিশ শতকে যে সাংস্কৃতিক নবজাগরণের (cultural renaissance) সূচনা হয়েছিল বাংলা-দেশে, তা ছিল মহানগরজীবী উচ্চশ্রেণীর মধ্যে আবদ্ধ। আজ তার নাগরিক উচ্চশ্রেণীগত সীমানা-প্রাচীর ভেঙে পড়ছে। সত্যকার নবজাগরণের লক্ষণগুলি আজ স্পষ্টতর হয়ে উঠছে। এই নবজাগ্রত ঐতিহ্যচেতনাই এই দুঃসাহসিক অনুশীলনকার্যের স্বপক্ষে প্রধান যুক্তি।

অনুসন্ধানের আবশ্যকতা

আঞ্চলিক সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ অনুশীলন ভিন্ন দেশের সাংস্কৃতিক রূপের ঐক্য ও বৈচিত্র্য কেন বোঝা যায় না, সে সম্বন্ধে একদা রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন :[১]

> ...যেখানেই হউক না কেন, মানব-সাধারণের মধ্যে যা কিছু ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলিতেছে, তাহা ভাল করিয়া জানারই একটা সার্থকতা আছে,—পুঁথি ছাড়িয়া সজীব মানুষকে প্রত্যক্ষ পড়িবার চেষ্টা করাতেই একটা শিক্ষা আছে ; তাহাতে শুধু জানা নয়, কিন্তু জানিবার শক্তির এমন একটা বিকাশ হয় যে, কোনো ক্লাসের পড়ায় তাহা হইতেই পারে না।...
>
> আমরা নৃতত্ত্ব অর্থাৎ Ethnologyর বই যে পড়ি না, তাহা নহে, কিন্তু যখন দেখিতে পাই, সেই বই পড়ার দরুণ আমাদের ঘরের পাশে যে হাড়ি-ডোম...রহিয়াছে, তাহাদের সম্পূর্ণ পরিচয় পাইবার জন্য আমাদের লেশমাত্র ঔৎসুক্য জন্মে না, তখনি বুঝিতে পারি, পুঁথি সম্বন্ধে আমাদের কত বড়ো

১ ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ, ১৩১২ সন। রবীন্দ্রনাথের 'শিক্ষা' গ্রন্থে সংকলিত।

একটা কুসংস্কার জন্মিয়া গেছে—পুঁথিকে আমরা কত-বড়ো মনে করি এবং পুঁথি যাহার প্রতিবিম্ব, তাহাকে কতই তুচ্ছ বলিয়া জানি। কিন্তু জ্ঞানের সেই আদিনিকেতনে একবার যদি জড়ত্ব ত্যাগ করিয়া প্রবেশ করি, তাহা হইলে আমাদের ঔৎসুক্যের সীমা থাকিবে না। আমাদের ছাত্রগণ যদি তাঁহাদের সেই প্রতিবেশীদের সমস্ত খোঁজে একবার ভালো করিয়া নিযুক্ত হন, তবে কাজের মধ্যেই কাজের পুরস্কার পাইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

সন্ধান ও সংগ্রহ করিবার বিষয় এমন কত আছে, তাহার সীমা নাই। আমাদের ব্রতপার্বণগুলি বাংলার এক অংশে যেরূপ, অন্য অংশে সেরূপ নহে। স্থানভেদে সামাজিক প্রথার বিভিন্নতা আছে। এ ছাড়া, গ্রাম্য ছড়া, ছেলে ভুলাইবার ছড়া, প্রচলিত গান প্রভৃতির মধ্যে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় নিহিত আছে। বস্তুত দেশবাসীর পক্ষে দেশের কোন বৃত্তান্তই তুচ্ছ নহে…

রবীন্দ্রনাথের ইতিহাসবোধ যে কত গভীর ছিল তা তাঁর পঞ্চাশ বছর আগেকার এই উক্তি থেকে বোঝা যায়। পুথিসর্বস্ব ইতিহাসচর্চার ত্রুটি কোথায় তাও তিনি আভাসে উল্লেখ করতে ভোলেননি। কেবল পুথি না পড়ে, পুথি ছেড়ে সজীব মানুষকে প্রত্যক্ষভাবে 'পড়বার' চেষ্টা করা দরকার, কারণ "তাহাতে শুধু জানা নয়, কিন্তু জানিবার শক্তির এমন একটা বিকাশ হয় যে, কোনো ক্লাসের পড়ায় তাহা হইতেই পারে না"। সন্ধানীদের শব্দভাণ্ডারে 'প্রাইমারী সোর্স' বা প্রাথমিক আকর বলে যে কথা আছে তা সাধারণত অমুদ্রিত পাণ্ডুলিপির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তা ছাড়িয়েও সজীব মানুষকে সরজমিনে প্রত্যক্ষ করাকে রবীন্দ্রনাথ "জ্ঞানের আদিনিকেতনে" প্রবেশ করা বলেছেন। দেশের বিভিন্ন অংশের ও অঞ্চলের সাংস্কৃতিক তথ্য সন্ধান ও সংগ্রহ করার আবশ্যকতা আছে, কারণ "স্থানভেদে সামাজিক প্রথার বিভিন্নতা আছে"। এই বিভিন্নতা সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান না থাকলে সাংস্কৃতিক অভিন্নতার ভিত্ কোথায় তার খোঁজ পাওয়া যায় না। সাম্প্রতিক-কালে ইতিহাসচর্চা ও এষণা তাই নির্জীব পুথিপত্রের গণ্ডি ছেড়ে সজীব মানুষের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শলাভের জন্য উৎসুক হয়েছে। ঐতিহাসিকদের মধ্যে অনেকেই উপলব্ধি করেছেন, রাজবংশানুক্রমের ইতিহাস আলোচনার পক্ষে একদা যে অনুশীলনরীতি নির্ভরযোগ্য ছিল, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের ক্রমায়াত

আঞ্চলিক ইতিহাস

ধারা বিশ্লেষণের পক্ষে তা আদৌ পর্যাপ্ত নয়। তার জন্য প্রত্যেক দেশের ছোট-ছোট অঞ্চলের জনকৃতির বিস্তারিত বিবরণ সংগ্রহ করা প্রয়োজন। ইতিহাস-রচনার এই রীতিকে বলা হয়েছে—"the process of writing history 'from the bottom up', through the use of local materials and a local focus."[১] ইতিহাস যদি প্রকৃত সংস্কৃতির ইতিহাস হয়, তাহলে সে-ইতিহাস বিচারের দৃষ্টি 'from the bottom up' প্রসারিত না হলে, তার সত্যকার রূপোপলব্ধি বা বিশেষত্ব ব্যাখ্যান সম্ভব নয়। সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এই অনুশীলনরীতির প্রাথমিক পরীক্ষালব্ধ ফল হল 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি'।

সমাজতাত্ত্বিক ও মার্ক্সবাদী ইতিহাস-বিচার

সমাজবিজ্ঞানীরা ইতিহাসচর্চার এই বিশেষ পদ্ধতিকেই সমাজতাত্ত্বিক ইতিহাস-বিচার বলেন। আমেরিকান ইতিহাস-সভা 'from the bottom-up' অনুশীলনের যে পদ্ধতির কথা বলেছেন, সমাজবিজ্ঞানীরা তাকেই ইতিহাসচর্চার 'sociological technique' বলেন। অ্যাকাডেমিক পদ্ধতি এবং এই সমাজতাত্ত্বিক পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য হল এই যে কেবল অধীত বিদ্যার আলোকে যে-সব সামাজিক ঘটনা ও সাংস্কৃতিক নিদর্শন বিচ্ছিন্ন বলে মনে হয়, ঘটনাক্রমের অন্তর্লীন সূত্রটির সন্ধান পাওয়া যায় না, দ্বিতীয় পদ্ধতির প্রত্যক্ষ জ্ঞানের আলোকে তা ক্রমেই উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। এ যুগের অন্যতম বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী কার্ল ম্যানহাইম (Karl Mannheim) এই সমাজতাত্ত্বিক ইতিহাস-বিচার পদ্ধতি সম্বন্ধে তাই বলেছেন :[২]

১ The Cultural Approach to History: Edited for the American History Association, by Caroline F. Ware (Columbia University 1940). এই সংকলন-গ্রন্থে এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য রচনা হল : Sources and Materials for the Study of Cultural History, এবং The Value of Local History. গভীর সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যানে যাঁরা কৌতূহলী তাঁরা Karl Mannheim-এর Essays on the Sociology of Culture (London 1956) গ্রন্থের The False and the Proper Concepts of History and Society অধ্যায়টি (২৫-৫৮ পৃষ্ঠা) পড়তে পারেন। মার্ক্সীয় ইতিহাস-বিচারপদ্ধতির গুণাগুণ সম্বন্ধে ম্যানহাইমের উক্তি তর্কাতীত নয়। তা না হলেও, 'History conceived without its social medium is like motion perceived without that which is moving' (P. 37)—ম্যানহাইমের এই স্বীকৃতি স্মরণীয়।

২ Karl Mannheim: Ideology and Utopia, An Introduction to the Sociology of knowledge (London 1936), P, 83.

The study of intellectual history can and must be pursued in a manner which will see in the sequence and co-existence of phenomena more than mere accidental relationships, and will seek to discover in the totality of the historical complex the role, significance and meaning of each component element. It is with this type of sociological approach to history that we identify ourselves. If this insight is progressively worked out in concrete detail, instead of being allowed to remain on a purely speculative basis, and if each advance is made on the basis of available concrete material, we shall finally arrive at a discipline which will put at our disposal a sociological technique diagnosing the culture of an epoch.

তথ্যসংগ্রহের এবং সেই তথ্য বিশ্লেষণের প্রয়োজনের সমান গুরুতার কথা ম্যানহাইম উল্লেখ করতে ভোলেননি। ম্যানহাইম-বর্ণিত ইতিহাসচর্চার এই সমাজতাত্ত্বিক পদ্ধতির আবশ্যকতাবোধ আধুনিক-যুগের মার্কসবাদী ইতিহাস-ব্যাখ্যানের পরোক্ষ স্বীকৃতি ছাড়া কিছু নয়। মার্কসবাদী ইতিহাস-ব্যাখ্যায় মধ্যে মধ্যে সমাজ-সংস্কৃতির অর্থনৈতিক বাস্তবভিত্তির উপর অত্যধিক অসম গুরুত্ব আরোপ করা হয় বলে, তা যান্ত্রিক হয়ে ওঠে, জীবন্ত সত্য হয় না। যান্ত্রিক বাস্তবতায় সত্যের সমগ্রতা প্রতিফলিত হয় না। কিন্তু প্রকৃত মার্কসবাদ (তা নিয়ে অবশ্যই মতভেদ হতে পারে) কোন ঘটনার ও সমস্যার যান্ত্রিক বিশ্লেষণ সমর্থন করে না। নানাবিধ পরস্পর-বিরোধী সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে ইতিহাসের রথচক্র ঘর্ঘরিয়ে চলে। তাতে অর্থনৈতিক উপাদানের প্রভাব স্বীকার করলেও, নীতি-আদর্শের ও অন্যান্য উপাদানের প্রভাব অস্বীকার্য নয়। সমস্ত উপাদান সংগ্রহ করে, তার বিচার-বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যানের ভিতর দিয়েই ইতিহাসের, বিশেষ করে সাংস্কৃতিক ইতিহাসের, স্বরূপটি ফুটে ওঠে। কেবল মুদ্রিত গ্রন্থের ভিতর থেকে এই উপাদান আহরণ করা সম্ভব নয়, মানুষের ও জীবনের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শ থেকেই সম্ভব। 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি'তে সেই বিরাট সম্ভাবনার আভাস দেবার চেষ্টা করেছি।

ইতিহাসচর্চায় তথ্য ও তত্ত্বের আপেক্ষিক গুরুত্ব সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের ও মতানৈক্যের অবসান আজও হয়নি। সংস্কৃতি সমাজ বা রাষ্ট্র, যারই ইতিহাস হোক না কেন, নির্ভুল তথ্য অবশ্যই তার প্রাথমিক ভিত্তি। একথা অনস্বীকার্য, কিন্তু তথ্যতারিখের নির্ভুলতার স্বাভাবিক আবশ্যকতাবোধ যদি অস্বাভাবিক বাতিকে পরিণত হয়, তাহলে ইতিহাসচর্চার আসল লক্ষ্য অন্তর্ধান করে। ইতিহাসের আনুপূর্বিক ধারা আবিষ্কার করা এবং সেই ধারার তরঙ্গায়িত গতির ছন্দটি খুঁজে বার করাই ঐতিহাসিকের প্রধান লক্ষ্য। এই লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হলে, তথ্যের মহারণ্যে প্রবেশ করে তালকাণা হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। তথ্যতারিখের হাজার নোঙরের বন্ধন ছিন্ন করে ইতিহাস-তরণি অকূল সমুদ্রে ভেসে যায়। তথ্যান্তর্নিহিত তত্ত্বের ও তাৎপর্যের সন্ধান না পেলে ঐতিহাসিক অন্বেষণও অনেকখানি ব্যর্থ হয়।[১] তথ্যসংকলনের সঙ্গে তত্ত্বীয় ব্যাখ্যানের অত্যাবশ্যকতার কথা উল্লেখ করে কার্ল ম্যানহাইম বলেছেন :

তথ্য ও তত্ত্বের আপেক্ষিক গুরুত্ব

The transition to an evaluative point of view is necessitated from the very beginning by the fact that history as history is unintelligible unless certain of its aspects are emphasized in contrast to others. This

১ A. F. Pollard, Honorary Director, London Institute of Historical Research : Factors in Modern History (London, 3rd edition, 1932) : "The facts and dates are the merest framework of historical study. They have no value in themselves ; mere lists of facts convey the impression that history is a fortuitous collocation of inconsequential events, instead of a coherent sequence of causes and effects ; and dates by themselves obscure the nature of historical evolution. They are useful and necessary solely as means of determining sequences, and without the careful observance of sequences we cannot arrive at causes. But it is the causes which the historical student has ultimately in view ; he seeks in the study of history an explanation of how mankind reaches its present state of development as individuals, as societies, as nations...It is only when we penetrate the outer husks of facts that we can reach the kernal of historical truth. A fact of itself is of little value unless it conveys a meaning. There is a meaning behind all facts if one can only discover it..." (P.P. 3, 4, 14).

selection and accentuation of certain aspects of historical totality may be regarded as the first step in the direction which ultimately leads to an evaluative procedure and to ontological judgments. (op. cit, Ibid)

পুথিপত্র বা সজীব মানুষ, যেকোন ক্ষেত্র থেকে আহৃত তথ্য সম্বন্ধে একথা সত্য। সামান্যীকরণের (generalisation) দায়িত্ব নেওয়া তাই একান্ত প্রয়োজন। তার জন্য চাই ঐতিহাসিক অন্তর্দৃষ্টি ও কল্পনাশক্তি। কার্লাইল ঐতিহাসিক গবেষকদের 'dryasdust' বলেছিলেন। কিন্তু এই ঐতিহাসিক কল্পনার সঙ্গে কবিকল্পনার ও সৃজনপ্রতিভার আনুরূপ্যের কথা মনে করে, কার্লাইলের উক্তির প্রতিবাদে, বিখ্যাত সামাজিক ইতিহাসবিদ্ ট্রেভেলিয়ান বলেছেন: 'Dryasdust at bottom is a poet.' সুপ্রসিদ্ধ নৃতত্ত্ববিদ্ অ্যালফ্রেড হ্যাডন তাঁর সারাজীবনের অনুসন্ধান-অভিজ্ঞতা থেকে সামান্যীকরণের আবশ্যকতা অস্বীকার করতে পারেননি। হ্যাডন বলেছেন, বিস্তারিত তথ্যান্বেষণ তখনই সার্থক হয় যখন তা সামান্যীকরণে পরিণতিলাভ করে। তাঁর মতে, 'অবজারভার' ও 'জেনারালাইজার' একই ব্যক্তি হলে একাজ সুন্দররূপে সম্পাদিত হওয়া সম্ভব।[১] কিন্তু একজন ব্যক্তির পক্ষে তা হওয়া খুব কঠিন। অন্যান্য আরও অনেক নৃতত্ত্ববিদ্ একথা স্বীকার করেও তথ্যান্তর্গত সূত্রসন্ধানে পশ্চাৎপদ হননি। এ-সম্বন্ধে সচেতন হয়েও তাই সামান্যীকরণের দুঃসাহস আমাকে সঞ্চয় করতে হয়েছে এবং পদে-পদে ভুলভ্রান্তির সম্ভাবনা মেনে নিয়েও কেবল যান্ত্রিক তথ্যাবৃত্তিতে সন্তুষ্ট হতে পারিনি।

তথ্যাহরণের সঙ্গে তথ্যনির্বাচনের সমস্যাও জড়িত। যতগুলি গ্রাম দেখেছি এবং যে-পরিমাণ তথ্য সংগ্রহ করেছি, তার সম্পূর্ণ বিবরণ দেবার প্রয়োজন হয়নি। কারণ তাতে পুনরাবৃত্তি-দোষ ঘটত এবং একই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ

১ A. C. Haddon: History of Anthropology (London, Reprint 1945): "Detailed investigations, however valuable and interesting, are after all but material to be merged into generalisations...The most valuable generalisations are made, however, when the observer is at the same time a generaliser; but 'doubtless,' as Maharbal said to Hannibal after the battle of Cannae, 'the gods have not bestowed everything on the same man. You, Hannibal, know how to conquer; but you do not know how to use your victory.' (Preface)

গ্রামের বিবরণ একঘেয়ে হয়ে উঠত। ভ্রমণকাহিনীর জন্য তার আবশ্যকতা থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু সংস্কৃতি-বিজ্ঞানের আলোচনায় তা একেবারে অনাবশ্যক। প্রায় ২০০ গ্রামে প্রত্যক্ষ অনুসন্ধান করেছি, তার মধ্যে প্রায় ৯০টি গ্রামের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছি এবং প্রসঙ্গত প্রায় ৩০০ গ্রামের কথা উল্লেখ করেছি। অনেক গ্রামের অনেক কথা বলা হয়নি, প্রতিপাদ্যের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই বলে। সামান্যীকরণের জন্য সমাজবিজ্ঞানীর প্রয়োজন হয় অল্পসংখ্যক বিশিষ্ট দৃষ্টান্তের, যা 'টিপিক্যাল', কিন্তু যা সত্যের সবটুকু জটিলতা প্রকাশ করতে অক্ষম।[১] এই ধরনের 'টিপিক্যাল' দৃষ্টান্ত হিসেবেই 'গ্রাম-প্রদক্ষিণ' বিভাগের স্থানগুলি নির্বাচন করা হয়েছে।

এই গ্রামকেন্দ্রিক প্রত্যক্ষ অনুসন্ধানের প্রধান উদ্দেশ্য হল, বাংলাদেশে সাংস্কৃতিক রূপায়ণের রীতিবিচার করা। তার জন্য পশ্চিমবঙ্গের ভৌগোলিক সীমানার অন্তর্গত বিভিন্ন স্থান থেকে ছোট-বড় সাংস্কৃতিক উপকরণগুলি সংগ্রহ করে শ্রেণীবদ্ধ করেছি এবং তার ভিতর থেকে রূপায়ণের ঐতিহাসিক গতি ও রীতি বিচার করার চেষ্টা করেছি। সাংস্কৃতিক উপকরণের (Culture-traits) সংস্থান ও বিস্তারণ-ক্ষেত্রটি (distribution) জরিপ করতে পারলে তার আকরের আভাস পাওয়া যায় যেমন, তেমনি তার ধারাবাহিক ইতিহাস, মিলন-মিশ্রণ, পরিবর্তন-বিবর্তন, বিকাশ ও ক্ষয় ইত্যাদি সম্বন্ধেও ধারণা স্পষ্ট হয়। বিভিন্ন উপকরণ কি কারণে ক্রমে স্তবকিত হয়েছে (cluster of culture-traits) এক-একটি অঞ্চলে এবং তার ফলে অভিনব মিশ্র-সংস্কৃতির (Culture-complex) উদ্ভব হয়েছে, তারও আভাস পাওয়া যায়। এই সব মিশ্র-সংস্কৃতির আদান-প্রদানে ও উপকরণ-বয়নে এক-একটি সংস্কৃতি-মণ্ডল (Culture-area) গড়ে ওঠে। সারা বাংলাদেশে ও পশ্চিমবঙ্গে এই ধরনের একাধিক সংস্কৃতি-মণ্ডল গড়ে উঠেছে। জনসংস্কৃতির এই অনুশীলনরীতি অপেক্ষাকৃত আধুনিক। খুব বেশি হলে, সমাজবিজ্ঞানী ও নৃবিজ্ঞানীরা এই রীতি গত মাত্র পঁচিশ-ত্রিশ বছর

সাংস্কৃতিক রূপায়ণের রীতিবিচার

১ G. M. Trevelyan : English Social History (London,1948) : "The generalisations...must necessarily be based on a small number of particular instances, which are assumed to be typical, but which cannot be the whole of the complicated truth." (Introduction)

ধরে অনুসরণ করছেন।[১] অন্ধকারে ঢিল না ছুঁড়ে এবং বাঁশবনে ডোমকাণা না হয়ে, খোলা চোখ ও মন নিয়ে বিজ্ঞানসম্মত এই রীতি সন্ধানক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে, আর কিছু না হোক, জনসংস্কৃতির বাস্তব রূপ ও গতিধারা অনেক বেশি স্পষ্ট ও জীবন্ত হয়ে ওঠে। পশ্চিমবঙ্গের অনুসন্ধানক্ষেত্র থেকে এরকম কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করছি।

সংস্কৃতির 'ট্রেট-কমপ্লেক্স-প্যাটার্ন' সম্পর্কিত প্রত্যয়গুলির (concepts) ব্যাখ্যান প্রসঙ্গে দৃষ্টান্তগুলি উল্লেখ করব। 'কালচার ট্রেট্' হল সংস্কৃতির প্রত্যেকটি মৌল পদার্থ ও উপাদান, যার নানারকমের সমাবেশে সংস্কৃতির বিশিষ্ট রূপমণ্ডন হয়। যেমন, শীকার, চাষবাস, ঘরবাড়ি, দেবদেবী, দেবালয়, আচার-ব্যবহার, প্রথা-সংস্কার ইত্যাদি স্বতন্ত্রভাবে এক-একটি মৌল সাংস্কৃতিক উপাদান। ক্রোবের এইজন্য 'কালচার-ট্রেট'কে 'minimal definable element of culture' বলেছেন। স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেকটি মৌল উপাদানের উদ্ভব ও বিস্তারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা যায়, কিন্তু এই অনুসন্ধানের সার্থকতা ও দায়িত্ব সম্বন্ধে হার্স্কোভিট্‌স বলেন—'methodologically its use as an end in

উপাদানের বিন্যাসক্রম ও মিশ্র-সংস্কৃতির রূপ

১ সমাজবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞানের অনেক গ্রন্থে জনসংস্কৃতির এই আধুনিক অনুশীলনরীতির আলোচনা করা হয়েছে। অনুসন্ধিৎসুদের জন্য এখানে কয়েকটিমাত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের নাম করছি: (১) Clark Wissler : Man and Culture (N. Y. 1923) ; (২) A. L. Kroeber : Anthropology (London, Revised ed, 1948) ; (৩) Kroeber and Clyde Kluckhohn : Culture, a Critical Review of Concepts and Definitions (1952) ; (৪) Melville J. Herskovits : Man and his Works (N. Y. 1948) ; (৫) Ruth Benedict ; Patterns of Culture (Pelican Books, 1946) ; (৬) B. Malinowski : The Dynamics of Culture-Change (1945) ; A. Scientific Theory of Culture and other Essays (1944) ; (৭) R. H. Lowie : Culrure and Ethnology (N. Y. 1929) ; The History of Ethnological Theory (N. Y. 1943) ; (৮) W. H. R. Rivers . Psychology and Ethnology (London 1926) ; (৯) David Bidney : Theoretical Anthropology (N, Y. 1953) ; (১০) Felix M. Keesing : Culture Change : An Analysis and Bibliography of Anthropological Sources, upto 1952 (Stanford University Press).

আমাদের দেশে এবিষয়ে অধ্যাপক শ্রীনির্মলকুমার বসু উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন। এদেশের সংস্কৃতিক্ষেত্রে এই অনুশীলনরীতি প্রয়োগ করে তিনি যে ফললাভ করেছেন তা তাঁর দুখানি বাংলা বই—'হিন্দু সমাজের গড়ন' (বিশ্বভারতী), 'নবীন ও প্রাচীন'—এবং ইংরেজী 'Cultural Anthropology and other Essays' (Revised edition 1953) বইতে সংকলিত হয়েছে।

itself is applicable only to the investigation of specialised problems Frequently, not the single trait, but a grouping of traits found to exist in close relationship within a given culture must be the object of study,' অর্থাৎ সংস্কৃতির মৌল উপাদান নিয়ে অনুসন্ধানের প্রয়োজন হয় বিশেষ কোন বিষয় নিয়ে অনুশীলন করার সময়। যেমন বিবাহ, সৎকার ও সমাধি-প্রথা, দেবালয়-স্থাপত্য, বিশেষ দেবদেবীর পূজার্চনা, বিশেষ শিল্পকলার রীতি। কিন্তু সংস্কৃতির রূপবিচারে এই ধরনের এক-একটি উপাদানের স্বাতন্ত্র্যের চেয়ে, বহু উপাদানের বিশিষ্ট সমাবেশ-পদ্ধতির ও বিন্যাসরীতির অনুশীলনেরই সার্থকতা বেশি। মৌল উপাদানের এই বিশিষ্ট সমাবেশ ও বিন্যাসকেই সংস্কৃতিবিজ্ঞানীরা 'কালচার-কমপ্লেক্স' বলেছেন। বাংলায় 'মিশ্র-সংস্কৃতি' বা 'যৌগ-সংস্কৃতি' বলা যেতে পারে। বিভিন্ন উপাদানের বিন্যাসের ধরন সর্বত্র একরকম নয়। বিভিন্ন অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর কাছে সেগুলি যে প্রাধান্য-ধারায় গৃহীত হয়, এক-একটি 'কম্‌প্লেক্সে' মৌল উপাদানের বিন্যাসও হয় সেই ধারায়। যেমন ক খ গ ঘ উপাদান ক-খ-গ-ঘ, ক-গ-খ-ঘ, ক-ঘ-খ-গ, ঘ-খ-গ-ক, ঘ-ক-গ-খ ইত্যাদি নানা-ক্রমে (sequence) বিন্যস্ত হতে পারে এবং সেই ক্রম অনুযায়ী সাংস্কৃতিক মনোভাবের তারতম্য হয়, বিভিন্ন যৌগ-সংস্কৃতির পার্থক্য ঘটে। বিন্যাসের এই ক্রমটি আবিষ্কার করতে পারলে, সংস্কৃতির ঐতিহাসিক ধারা ও আঞ্চলিক স্বকীয়তা সম্বন্ধে ধারণা অনেক স্পষ্ট হয়। পশ্চিমবঙ্গের সাংস্কৃতিক উপাদান-বিন্যাসের এই ক্রমটি আবিষ্কার করাই আমার অনুসন্ধানের অন্যতম লক্ষ্য ছিল। এখানে কয়েকটি প্রাসঙ্গিক দৃষ্টান্ত উল্লেখ করছি।

দক্ষিণবঙ্গে (চব্বিশপরগণায়) গ্রাম্য দেবদেবীর সমাবেশ হয়েছে এইভাবে— দক্ষিণরায়, পঞ্চানন্দ, পীর সাতবিবি বনবিবি, শাক্তদেবী, শিব-রাধাকৃষ্ণ ইত্যাদি। ভাগীরথীর পশ্চিমে হাওড়া-হুগলী থেকে সমাবেশের প্রাধান্য-ধারা বদলাতে আরম্ভ করেছে। হাওড়া-হুগলী পর্যন্ত পঞ্চানন্দ আছেন, কিন্তু দক্ষিণরায় ও বনবিবি-সাতবিবিরা অন্তর্হিত। আরও উত্তরে ও পূবে-পশ্চিমে পঞ্চানন্দ প্রায়-অন্তর্হিত এবং শিব সুপ্রতিষ্ঠিত। গ্রামে গ্রামে শিবের নতুন প্রতিযোগী ধর্মরাজের আবির্ভাব এই অঞ্চল থেকে। শিব-ধর্মরাজ-অন্যান্য দেবদেবী, এই

প্রাধান্য-ক্রম ধীরে ধীরে ধর্মরাজ-শিব ইত্যাদি ক্রমে পরিণতিলাভ করেছে বীরভূম-বিষ্ণুপুর-ঘাটাল-আরামবাগ অঞ্চলে। ধর্মরাজের সহচরদেরও আঞ্চলিক ভেদ আছে, যেমন পঞ্চানন্দের আছে। দক্ষিণবঙ্গে পঞ্চানন্দ বনদেবতা ও বনদেবীদের সঙ্গে অধিষ্ঠিত ও পূজিত হন, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে তিনি শিব, কালী প্রভৃতি দেবদেবীর সঙ্গে পূজ্য। বীরভূম-বিষ্ণুপুরে ধর্মরাজ প্রধানত চণ্ডী-মনসার সঙ্গে বিরাজ করেন, অন্যত্র (ঘাটাল-আরামবাগ) তাঁর কামিন্যাদের বিচিত্র সব নাম আছে।[১] বিভিন্ন অঞ্চলের গ্রাম্য দেবদেবীর পূজা-উৎসবের এই বিন্যাসক্রম থেকে আনুষঙ্গিক উপাদানগুলিকে বর্জন করলে এক-একটি লোকোৎসবের ও ধর্মাচারের উৎপত্তিকেন্দ্র (origin) ও বিস্তারণক্ষেত্র (distribution) সম্বন্ধে আমরা মোটামুটি একটা ধারণা করতে পারি। শুধু তাই নয়, বিন্যাসের বিশেষ ক্রমও ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করা যায়, কারণ মৌল উপাদান-বিন্যাসে এক-একটি যৌগ-সংস্কৃতির উদ্ভব হয় ঐতিহাসিক ঘটনার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায়।

আর্য-অনার্য সংস্কৃতির সংমিশ্রণ

আনুষঙ্গিক উপাদান বর্জন করলে দেখা যায়, বনদেবতার পূজা পশ্চিমবঙ্গের বনময় অঞ্চলে প্রচলিত ছিল, উত্তর-পশ্চিমের 'জঙ্গল মহল' থেকে আরম্ভ করে দক্ষিণবঙ্গের সুন্দরবন পর্যন্ত। আদিকাল থেকে এইসব বনদেবতার পূজা-উৎসবের সঙ্গে স্থানীয় বনবাসীদের বাস্তব জীবনযাত্রার গভীর ও প্রত্যক্ষ সংযোগ ছিল। এই সব উৎসব-পার্বণ বা ধ্যানধারণা আর্য-বৈদিক আচারভুক্ত নয়। উত্তর ও মধ্যভারত (আর্যাবর্ত) থেকে ধীরে ধীরে পূর্বভারতে আর্যসংস্কৃতির বিস্তার হয়েছে অনেক পরে এবং পূর্বভারতের অন্তর্গত বাংলাদেশের সমস্ত অঞ্চলে এককালে একভাবে হয়নি।[২] নানাবিধ তথ্যপ্রমাণ থেকে এবিষয়ে যতটুকু আভাস

১ 'গ্রাম প্রদক্ষিণ' বিভাগের বিষ্ণুপুর, ময়নাপুর, বীরভূমের ধর্মপূজা, ঘাটালকেন্দ্রের ধর্মরাজ উৎসব প্রভৃতি প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

২ পূর্বভারতে ও বাংলাদেশে আর্যসংস্কৃতির ক্রমবিস্তার সম্বন্ধে ঐতিহাসিকরা দীর্ঘকাল ধরে আলোচনা করেছেন। এ-সম্বন্ধে প্রামাণ্য ইতিহাস-গ্রন্থও অনেক আছে। আমার প্রতিপাদ্যের আলোচনায় তার পুনরাবৃত্তি অপ্রয়োজনীয় ও অপ্রাসঙ্গিক। সাধারণত যে অভিমত এখন ঐতিহাসিক মহলে গৃহীত, তারই ভিত্তিতে আমি আলোচনা করেছি। বাংলাদেশে আর্যসংস্কৃতির ক্রমবিস্তার সম্বন্ধে সম্প্রতি শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার 'Spread of Aryanism in Bengal' (J.A.S., Vol. 18, No. 2, 1952) নামে একটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ লিখেছেন।

পাওয়া যায় তাতে মনে হয়, বিদেহ বা মিথিলা (আধুনিক উত্তর-বিহার) অঞ্চলে প্রথম পূর্বভারতের আর্যবসতি গড়ে ওঠে এবং সেখান থেকে ধীরে ধীরে আর্য-সংস্কৃতির বিকীরণ হয় বাসুদেবের পুণ্ড্রবর্ধনে (উত্তরবঙ্গ) এবং জরাসন্ধ রাজার মগধদেশে (দক্ষিণবিহার)। পুণ্ড্রদেশের ভিতর দিয়ে ভগদত্ত রাজার প্রাগ্‌জ্যোতিষ রাজ্যে (আধুনিক আসাম) আর্যসংস্কৃতির ক্রমবিস্তার ঘটে। পাটলিপুত্র থেকে (আধুনিক পাটনা) নন্দবংশ ও মৌর্যবংশের রাজারা যে বাংলাদেশেও রাজত্ব করতেন (খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ থেকে খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী), তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। সম্প্রতি মেদিনীপুর, চব্বিশ-পরগণা (বেড়াচাঁপা) প্রভৃতি অঞ্চল থেকে যেসব প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গেছে তাতে এ-অনুমান সত্য বলে মনে হয়। 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ' গ্রন্থে (আঃ খৃষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দী) উত্তরবঙ্গের পুণ্ড্রজনদের 'দস্যু' বলা হয়েছে এবং 'ঐতরেয় আরণ্যক' গ্রন্থে বঙ্গ ও বগধ (মগধ) দেশের মানুষকে 'অসুর' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বাঁকুড়া জেলায় এখনও 'অসুর'-সূচক একাধিক গ্রামের নাম আছে, যেমন অসুরগড়, বন-অসুরিয়া ইত্যাদি। বৈদিক-সাহিত্যের এই উল্লেখ থেকে বোঝা যায়, খৃষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে পুণ্ড্র বঙ্গ ও মগধ আর্যসান্নিধ্য লাভ করলেও, আর্যসংস্কৃতির প্রচার ও প্রসার তখনও এসব অঞ্চলে তেমন হয়নি। 'বৌধায়ন ধর্মসূত্রে' (আঃ খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দী) অঙ্গ ও মগধদেশকে 'সঙ্কীর্ণযোনি' বা আংশিক আর্যীকৃত বলে অভিহিত করা হয়েছে, কিন্তু পুণ্ড্রবঙ্গ ও কলিঙ্গদেশ আর্যবহির্ভূত অঞ্চল বলে উপেক্ষিত হয়েছে। এই সব উক্তি থেকে মনে হয়, দক্ষিণ ও পূর্ব-বিহার প্রদেশ অনেকটা আর্যীকৃত হলেও, বাংলাদেশে ও উড়িষ্যায় কেবল আর্যসংস্পর্শ ঘটেছে, প্রকৃত আর্যীকরণ দীর্ঘকাল সম্ভব হয়নি। তার মধ্যে আবার উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব বঙ্গে প্রথমে আর্যীকরণ আরম্ভ হয়েছে, অন্যান্য অংশে অনেক পরে আর্যসংস্কৃতির বিস্তার হয়েছে। কেবল 'সাহিত্যের' নয়, শিলালিপি ও মুদ্রাদির প্রমাণ থেকেও বঙ্গসংস্কৃতির ক্রমিক আর্যীকরণের এই আভাস পাওয়া যায়।

পশ্চিমবঙ্গে, অর্থাৎ সুহ্ম বা রাঢ়দেশে আর্যসংস্কৃতির বিস্তার খৃষ্টপূর্ব যুগে এইভাবে হয়েছিল কিনা, তার কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণাদি এখনও পাওয়া যায়নি। সুপ্রাচীন আর্যসাহিত্যে পুণ্ড্র ও বঙ্গের মতন সুহ্ম বা রাঢ়দেশের নাম খুঁজে পাওয়া যায় না। শিলালিপি যা পাওয়া গেছে তার মধ্যে সবচেয়ে

প্রাচীন হল, বাঁকুড়ার শুশুনিয়া পাহাড়ের চতুর্থ খৃষ্টাব্দের লিপি। তাতে মনে হয়, উত্তরবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের অনেক পরে পশ্চিমবঙ্গে প্রকৃত আর্যীকরণ আরম্ভ হয়েছে। চতুর্থ খৃষ্টপূর্বাব্দের জৈন 'আচারাঙ্গ সূত্রে' সর্বপ্রথম সুহ্ম ও রাঢ়ার নাম পাওয়া যায় যখন, তখন তার বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে সেখানে বন্যবর্বর সংস্কৃতির প্রাধান্য ছিল। সিংহলী 'মহাবংশ' গ্রন্থেও দেখা যায়, রাঢ়দেশ দুর্গম বনাকীর্ণ প্রদেশ ছিল এবং বনময় রাঢ়ের সিংহরাজা বঙ্গদেশের রাজকন্যাকে জোর করে বিবাহ করে যে সন্তানের জন্ম দেন, সেই রাজপুত্র রাঢ়দেশের 'শতযোজন বিস্তৃত' জঙ্গল হাসিল করে গ্রাম বসতি গড়ে তোলেন।[১] এই আখ্যানের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে আর্যসংস্কৃতির বিস্তারের ইতিহাসটি 'রূপকে'র ছদ্মবেশে আত্মগোপন করে আছে কি না, ভাববার বিষয়। কেবল আর্যধর্ম-সংস্কৃতির নয়, বৌদ্ধধর্ম-সংস্কৃতিরও প্রসার বাংলাদেশে এই ধারায় হয়েছে বলে ঐতিহাসিকরা অনুমান করেন, প্রথমে উত্তর ও পূর্ববঙ্গে, পরে পশ্চিমবঙ্গে। প্রায় ষষ্ঠ খৃষ্টাব্দ থেকে পশ্চিমবঙ্গে আর্যসংস্কৃতির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়।

আর্যসংস্কৃতির প্রসার ও প্রতিষ্ঠার আগে পশ্চিমবঙ্গের অনার্যসংস্কৃতির একটা সুদীর্ঘ ঐতিহ্য ছিল। তার দিগন্তরেখা আদিপ্রস্তরযুগ পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রস্তর-যুগের বিভিন্ন পর্বের নানারকমের আয়ুধ পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান ভৌগোলিক সীমানার মধ্যেও পাওয়া গেছে। মনে হয়, ছোটনাগপুর ও সাঁওতাল পরগণা থেকে পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাংশের উচ্চভূমিসীমা পর্যন্ত প্রধানত আদি-অস্ট্রাল (Proto-Australiod) বা নিষাদজাতির বিভিন্ন শাখার সাংস্কৃতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। শীকার, পশুপালন, কৃষি প্রভৃতি নানাস্তরভুক্ত ছিল এই সংস্কৃতি। প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে বিভিন্ন স্তরের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল। শীকার ও পশুপালনের ঐতিহ্য আজও পশ্চিমবঙ্গের বহু উপজাতির মধ্যে জীবন্ত রয়েছে। এমন কি বন্য ফলমূল-সংগ্রহের (food-gathering) ঐতিহ্য পর্যন্ত ('মেদিনীপুরের আদিবাসী' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)।[২] ঝাড়গ্রাম অঞ্চলের লোধারা প্রধানত বন্য ফলমূল সংগ্রহ করেই জীবনধারণ করত। সাঁওতালরা এখন কৃষিজীবী হলেও, শীকার তারা বর্জন করেনি। শীকার-উৎসব তাদের অন্যতম উৎসব। বর্ধমানে 'গোপভূম' নামে পরগণা ছিল, প্রধানত আসানসোল

১ Mahavamsa, Chapter 6 ; Geiger's translation, PP.51-54

২ 'গ্রাম-প্রদক্ষিণ' বিভাগ : ৪৫১-৪৬০ পৃষ্ঠা।

মহকুমার বনময় অঞ্চল নিয়ে।[১] মহেন্দ্ররাজা, ইছাই ঘোষ প্রভৃতি গোপভূমের সব বিখ্যাত রাজা। এখন গো-পালন করেন যাঁরা, তাঁরাই গোপ বলে পরিচিত। একদা এঁরা অন্যান্য বন্য পশুও পালন করতেন। গরুর বিশেষ মর্যাদা পরে আর্যরা দিয়েছেন বলে, এঁরা কেবল গো-পালক বলে পরিচিত হয়েছেন। শুধু তাই নয়। পশুপালন ও কৃষিকর্ম যে প্রায় একই খাদ্যোৎপাদন (food production) স্তরভুক্ত, তাও অনেকের মতন, এঁরাও জানেন না। তাই কৃষিকর্মী যাঁরা তাঁরা 'সদ্‌গোপ' এবং পশুপালকরা 'গোপ' বলে পরিচিত। বন্য পশুর স্বভাব দীর্ঘকাল ধরে লক্ষ করে, তাকে পোষ মানিয়ে, তার বংশবৃদ্ধি (breeding) করার কৌশল উদ্ভাবন করা (দুধ, মাংস প্রভৃতি খাদ্য উৎপাদনের জন্য) সভ্যতার ইতিহাসে কৃষিকর্মের তুলনায় কম যুগান্তকারী ঘটনা নয়। মর্যাদা দুয়েরই সমান। কিন্তু কৃষিকর্মের উন্নত মর্যাদা আর্য-সংস্কৃতির দান। ক্ষত্রিয়ত্বের মর্যাদা-চেতনাও আর্যবর্ণবৈষম্যের প্রভাব। সমাজের উপরতলার এই বর্ণবৈষম্যের প্রভাব সমাজের অন্যান্য স্তরেও বিস্তৃত হয়েছে। বোঝা যায় সদ্‌গোপ, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, মাহিষ্য প্রভৃতি বাংলার সুপ্রাচীন জনগোষ্ঠী এই বর্ণকৌলীন্যকে স্বভাবতই স্বীকার করতে চাননি। তাঁদের সুদীর্ঘ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যবোধও প্রবল ছিল, তাই আর্যসংস্কৃতির পরবর্তী প্রাধান্যের বিরুদ্ধে তাঁরা বিদ্রোহ করেছেন এবং অবশেষে তার নিষ্পত্তি করেছেন সেই পেশাগত বর্ণবৈষম্যের বিষ নিজেদের মধ্যে সঞ্চারিত করে। কৃষিকর্মের ও ক্ষত্রিয়ত্বের উন্নত মর্যাদা মেনে নিয়ে তাঁরা নিজেদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছেন।

কিন্তু দীর্ঘকালের ঐতিহ্য বা সংস্কার যে বহিরারোপিত নব্যসংস্কারের চাপে সহজে লুপ্ত হয় না, তার প্রমাণ সকল জাতির আচার-অনুষ্ঠান থেকে আজও পাওয়া যায়। গোপভূমের অন্তর্গত অমরাগড়ের মহেন্দ্ররাজার বংশবিবরণ স্থানীয় কবির 'শিবাখ্যা-কিঙ্কর' কাব্যে এইভাবে বর্ণনা করা হয়েছে :

শোন মহারাজ শোন দিয়া মন
কহি মহেন্দ্রের বংশ বিবরণ,
পিতামহ তার ক্ষত্রিয় কুমার
ভল্লুপদ নাম জানে সর্বজন,
ভল্লুকে তাহারে করিল পালন।···

১ 'গ্রাম-প্রদক্ষিণ' বিভাগে 'অমরাগড়' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য (২০৪-২০৯ পৃষ্ঠা)।

জাতীয় প্রকৃতি লুকাবার নয়,
শৈশবে সে শিশু নির্ভয় হৃদয়,
মৃগয়া করিত শ্বাপদ বধিত
বনের বরাহ করিয়া বিজয় ··।

স্থানীয় কবি অমরাগড়ের সদ্‌গোপ-রাজবংশের বংশধরদের মুখে তাঁদের ঐতিহ্যের কথা শুনেই এই কাব্য রচনা করেছিলেন। সমস্ত বিবরণের মধ্যে 'পিতামহ তার ক্ষত্রিয় কুমার' ঠিকই যোগ করা হয়েছে। নিজেদের ঐতিহ্য ত্যাগ করে আর্যদের ক্ষত্রিয়ত্বের মর্যাদালাভের এই প্রচেষ্টা 'ইনফিরিয়রিটি-কম্‌প্লেক্সের' প্রকাশ ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু 'জাতীয় প্রকৃতি লুকাবার নয়' বলে যে বর্ণনা আছে, তা থেকে গোপভূম অঞ্চলে পশুপালকদের প্রাধান্যেরই ইঙ্গিত পাওয়া যায়। রাজবংশের একজন প্রবীণ বংশধর আমাকে কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন যে ভল্লুক মরলে তাঁদের অশৌচ পালন করতে হত। এক-একটি মৌল সাংস্কৃতিক উপাদান বা 'কালচার-ট্রেট' কিভাবে পরিবর্তিত যৌগ-সংস্কৃতির বা 'কালচার-কম্‌প্লেক্সের' মধ্যে উদ্‌বৃত্ত অবস্থায় লুকিয়ে থাকে, এটি তার একটি উল্লেখনীয় দৃষ্টান্ত। বোঝা যায়, ভল্লুক ছিল পালিত পশুদের মধ্যে অন্যতম, এবং পশ্চিমবঙ্গের পশুপালকদের একটি শাখার বা ক্ল্যানের 'টোটেমও' ছিল ভল্লুক। সুতরাং খাদ্যসংগ্রহ ও খাদ্য-উৎপাদন-পর্বের নানাস্তরভুক্ত জনগোষ্ঠীর যে বাস ছিল পশ্চিমবঙ্গে এবং তাদের দীর্ঘকালের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ছিল, একথা অস্বীকার যায় না। জৈন ও সিংহলী গ্রন্থের রাঢ়দেশ-বিবরণ এই দৃষ্টিতে বিচার্য।

আর্যসংস্কৃতির প্রসার পশ্চিমবঙ্গে আরম্ভ হবার পরেও সর্বত্র সমান ব্যাপকভাবে হয়নি। বড় বড় বনময় অঞ্চলগুলি (যেমন বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুর, বীরভূম, উত্তর মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, দক্ষিণ চব্বিশ-পরগণা ইত্যাদি) কতকটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতন ছিল। স্থানীয় জনগোষ্ঠীপতিরা এইসব অঞ্চলে রাজত্ব করতেন। উপরের সিংহাসন-বদল হলে তাঁরা নামমাত্র আনুগত্য-বদল করতেন। হিন্দুযুগ ছাড়িয়ে মুসলমানযুগে, এমনকি বৃটিশযুগের প্রথম পর্ব পর্যন্ত এই বিচ্ছিন্নতা প্রায় অক্ষুণ্ণ ছিল। সেইজন্য পশ্চিমবঙ্গে অনার্য-সংস্কৃতির প্রচুর উদ্‌বৃত্ত নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায় এবং কয়েকটি অঞ্চলে তার প্রাধান্যও অনুভব করা যায়। চণ্ডী ভৈরব রুদ্রা বড়ম প্রভৃতি নানারকমের বনদেবতার

উৎসবের প্রচলন তাই আজও এই সব অঞ্চলে বেশি।[১] 'বাগদীরাজা' 'গোপরাজা' প্রভৃতির কিংবদন্তীর প্রাচুর্যও পশ্চিমবঙ্গে লক্ষণীয়।

এই ধরনের দুটি নিদর্শনের কথা বলব, দুটিই অনার্যযুগের উদ্বৃত্ত নিদর্শন—বীরস্তম্ভ ও সয়লা উৎসব। 'সাংস্কৃতিক প্রসঙ্গে' এ সম্বন্ধে পৃথকভাবে আলোচনা করেছি। এখানে আরও কয়েকটি কথা বলব। 'বীরস্তম্ভ' যে 'মেগালিথিক' বা প্রস্তর-স্মৃতিস্তম্ভযুগের নিদর্শন, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। একদা নিষাদ-জাতির কোন-কোন শাখার মধ্যে এই স্তম্ভাচারের প্রচলন ছিল। রমাপ্রসাদ চন্দ সম্রাট অশোকের শাসনস্তম্ভ সম্বন্ধে বলেছেন যে অশোকপূর্ব যুগেও এই প্রস্তরস্তম্ভ স্থাপনের প্রথা ছিল এবং স্তম্ভশীর্ষে জীবজন্তুর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হত। পরবর্তীকালের বিষ্ণুর গরুড়ধ্বজ, মকরধ্বজ এবং শিবের বৃষধ্বজ, এই প্রথারই প্রকাশ ছাড়া কিছু নয়। পারস্যদেশে অশোক-প্রতিষ্ঠিত শিলাস্তম্ভের প্রেরণা খুঁজতে যাওয়া অর্থহীন। এ-দেশের বৃক্ষপূজা ও জন্তুপূজাই ক্রমে, রমাপ্রসাদের মতে, জন্তুশীর্ষ স্তম্ভাচারে পরিণত হয়েছে :[২]

বীরস্তম্ভ-মেনহির ও শিবলিঙ্গ

> The existence of pillars crowned by animal figures before Asoka turned them into Dharma pillars by engraving edicts on them indicates that such pillars were originally intended for some other purpose, evidently for worship...
>
> The cult of the pillars crowned by such figures was evidently an element of the primitive religion of Eastern India. It was probably an offshoot of the tree-cult, of the cult of the tree like the palm-tree...

রমাপ্রসাদ চন্দ বৃক্ষপূজা ও জন্তুপূজার কথা বলেছেন এবং এই আদিম ধর্মাচারের সঙ্গে স্তম্ভপূজার সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর ইঙ্গিত খুবই

১ 'গ্রাম-প্রদক্ষিণ' বিভাগ, ৭৪-৯৪, ৯৯-১০৪, ১২৩-১২৮, ১৮৯-২০৯, ৩২৭-৩৩২, ৩৩৩-৩৫৩, ৩৫৯-৩৬৩, ৪৫১-৪৬০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। 'সাংস্কৃতিক প্রসঙ্গ' বিভাগে 'বনদেবতা' ও 'রঙ্কিণী' দ্রষ্টব্য।

২ R.P.Chanda ; The Beginnings of Art in Eastern India, A.S.I. Memoir No.30, P.31, P.33. এই প্রসঙ্গে রমাপ্রসাদ চন্দের 'Survival of the Prehistoric Civilisation of the Indus Valley' নিবন্ধ (A. S. I. Memoir No 41) দ্রষ্টব্য, ৩৪-৩৬ পৃষ্ঠা।

গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বৃক্ষপূজার সঙ্গে তিনি যদি মেগালিথিক গোরস্থানের স্তম্ভাচারের কথা উল্লেখ করতেন, তাহলে শিলাস্তম্ভপূজা-প্রথার কৌলিক সম্পর্ক আরও প্রত্যক্ষভাবে জানা যেত। প্রাগৈতিহাসিক অনার্য স্তম্ভপূজা ও স্তূপপূজা, বৃক্ষপূজা ও জন্তুপূজা বৌদ্ধযুগেও গৃহীত ও প্রচলিত হয়েছিল। মেগালিথিক সংস্কৃতির শিলাস্তম্ভপূজা ক্রমে অনার্য শিব-রুদ্রদেবতার প্রতীক-পূজায় পরিণত হয়েছে এবং তা থেকেই মনে হয় অনাদিলিঙ্গ শিবপূজার প্রবর্তন হয়েছে। এই প্রসঙ্গে শিবের সঙ্গে শ্মশান-মশানের সাহচর্যের পৌরাণিক কাহিনীর গভীর তাৎপর্য আছে কি না চিন্তা করা উচিত। পশ্চিমবঙ্গে অনাদিলিঙ্গ শিবের আবির্ভাবের সঙ্গে গোপদের প্রায়-অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক থেকে অনুমান করা যায়, কিভাবে আর্যীকৃত শিব পরবর্তীকালে পশুপালক ও অন্যান্য অনার্যসমাজে প্রবেশলাভ করেছিলেন।

সয়লা উৎসব ও সমাজিক 'বন্ধুত্ব'

সয়লা উৎসব হল বন্ধুত্বের উৎসব। বন্ধুত্ব হল দুজন বা তারও বেশি অজানা ও অনাত্মীয় ব্যক্তির মনোবন্ধন। এ-বন্ধন সামাজিক বন্ধনও, কারণ বন্ধুর সামাজিক কর্তব্য আছে, কর্তব্যপালনের নৈতিক বাধ্যতাও আছে। সমাজ-বিজ্ঞানীরা এই বন্ধুত্বকে সামাজিক জীবনের অন্যতম আদি-সংগঠন বা 'ইনস্টিটিউশন' বলে মনে করেন। সম্প্রতি হার্স্কোভিট্স পশ্চিম-আফ্রিকার ডাহোমি (Dahomey) প্রদেশে এই বন্ধুত্বের সামাজিক ভূমিকা সম্বন্ধে যেসব তথ্য উদ্ঘাটন করেছেন, তাতে মানবসমাজের ক্রমবিকাশে বন্ধুত্বের দান সম্পর্কে পূর্বধারণা অনেক বদলে গেছে। সাধারণত সমাজবিজ্ঞানীরা এতদিন বন্ধুত্বের তাৎপর্যকে উপেক্ষা করে এসেছেন বলা চলে—"The most fundamental of these non-relationship groupings, and the most immediate, is one which is most neglected by anthropologists—friendship."[১] এই উপেক্ষার কারণ হচ্ছে, হার্স্কোভিট্সের মতে, বিজ্ঞানীরা বন্ধুত্বকে সামাজিক 'ইনস্টিটিউশন' বলে মনে করেননি। কিন্তু প্রাচীনতম সমাজ-সংগঠনের মধ্যে 'বন্ধুত্ব' অন্যতম এবং সামাজিক বন্ধনের মধ্যে (বৈবাহিক, কৌলিক প্রভৃতি) বন্ধুত্বের বন্ধন আদিমতম। আমাদের দেশের রাখীবন্ধন

১ M. J. Herskovits : Dahomey, an Ancient West African Kingdom (2 vols), N. Y. 1938 : Vol. I, Chapter 13.

উৎসবের মধ্যে এবং সই-পাতানো, মিতা-পাতানো প্রভৃতি প্রথার মধ্যে এই সুপ্রাচীন বন্ধুত্ব-উৎসবের স্মৃতি সেদিন পর্যন্ত জাগরূক ছিল। পশ্চিমবঙ্গের একটি সঙ্কীর্ণ অঞ্চলে (ঘাটাল-আরামবাগ কেন্দ্র করে) এই উৎসবের আনুষ্ঠানিক ও লৌকিক রূপ এখনও অনেকটা বজায় আছে। স্থানীয় লোকের কাছে আজ তার কোন তাৎপর্য না থাকলেও, সমাজবিজ্ঞানীর কাছে এই লোকোৎসবের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্য গভীর। প্রধানত ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা ও আঞ্চলিক জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক স্থিতিশীলতার জন্যই এই ধরনের একটি প্রাচীন মৌলিক উৎসবের উদ্‌বর্তন সম্ভব হয়েছে বলে মনে হয়।

প্রত্যেক মৌলিক উপাদানের স্বাতন্ত্র্য এক-একটি যৌগ-সংস্কৃতির বিন্যাসের মধ্যে পরিবর্তিত হয়। এক-একটি 'কালচার-কম্‌প্লেক্সের' বিশিষ্ট বিন্যাসের মধ্যে প্রত্যেক ট্রেট্‌-এর বা উপাদানের একটা বিশেষ তাৎপর্য থাকে। একটি 'কমপ্লেক্স' থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্য 'কম্‌প্লেক্সে' যখন কোন 'ট্রেট্‌' গ্রন্থিত ও বিন্যস্ত হয়, তখন সেই ট্রেট্‌-এর তাৎপর্যও বদলে যায়, অনেকটা অজ্ঞাতসারে। রাসায়নিক 'কম্‌পাউণ্ডের' সঙ্গে কতকটা এই যৌগ-সংস্কৃতির তুলনা করা চলে। ক-খ-গ কম্‌প্লেক্সে খ-এর যে তাৎপর্য থাকে, চ-খ-ট কম্‌প্লেক্সে সেই একই খ-এর আর সেই তাৎপর্য থাকে না। বিভিন্ন মিশ্র-সংস্কৃতির বিন্যাসে এক-একটি মৌলিক সাংস্কৃতিক উপাদানের এই তাৎপর্য-বদলের অনেক উদাহরণ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতিক্ষেত্র থেকে দেওয়া যায়।

সাংস্কৃতিক উপাদানের তাৎপর্য-বদল

নরবলি বা উৎসর্গ-প্রথা (human sacrifice) একটি সুপ্রাচীন আদিম প্রথা। নিষাদ ও কিরাত (Indo-Mongoloid) জাতির সংস্কৃতিতে এই প্রথার গভীর তাৎপর্য ছিল। বিজয়োৎসব ও নানারকমের কামনা-উৎসবের অঙ্গ ছিল নরবলি ও নরমুণ্ডনৃত্য (শবর, নাগা প্রভৃতি জাতির মধ্যে কিছুদিন আগেও প্রচলিত ছিল)। আর্যদের মধ্যে পুরোহিত ব্রাহ্মণশ্রেণী এই প্রথা 'অধর্ম' বলে নিন্দা করলেও, ক্ষত্রিয় রাজারা দীর্ঘকাল এই প্রথা পালন করেছেন। বৈদিক সাহিত্যে ও মহাভারতে তার অনেক উপাখ্যান-উদাহরণ আছে।[১] ক্রমে এই

১ R. P. Chanda: Survival of the Prehistoric Civilisation of the Indus Valley, A. S. I. Memoir No 41, 'Human Sacrifice' অধ্যায় দ্রষ্টব্য (১৪-১৮ পৃষ্ঠা)।

প্রথা আর্যীকৃত হয়েছে এবং বিভিন্ন মিশ্র-সংস্কৃতিতে বিন্যস্ত হয়ে তার তাৎপর্যও বদলে গেছে। যে কোন হিন্দু শাক্ত দেবীর উৎসবে (যেমন দুর্গোৎসব, কালীপূজা ইত্যাদি) বলিদান অন্যতম অনুষ্ঠান। দীর্ঘকাল ধরে, একশতাব্দী আগে পর্যন্ত (যেমন রঙ্কিণী দেবীর পূজায়) বিচ্ছিন্ন নরবলিপ্রথা প্রচলিত ছিল। ক্রমে নরবলির বদলে পশুপক্ষীর বলি প্রবর্তিত হয়েছে। বৈষ্ণবধর্মের প্রভাবে তার বদলে শাকসব্‌জী ফলমূল বলিদানের প্রথা প্রচলিত হয়েছে আরও পরে। বলিদানপ্রথা, এমন কি নরবলিপ্রথা পর্যন্ত প্রতীকাকারে (মাটির পুতুল) আজও উদ্‌বৃত্ত রয়েছে। কিন্তু মৌলিক প্রথার আসল তাৎপর্য প্রায়-অন্তর্হিত। ভিন্ন কালচার-কম্‌প্লেক্সে একই উপাদানের এইভাবে তাৎপর্য-বদল হতে থাকে।

তন্ত্রাচার ও তান্ত্রিক সংস্কৃতি আর একটি দৃষ্টান্ত। তন্ত্রের অধিকাংশ আচার-অনুষ্ঠানই আদিম ধর্মানুষ্ঠানের অন্তর্গত। জাদুবিদ্যা বা শবরীবিদ্যা, মারণ-উচাটন-বশীকরণ ইত্যাদির আদিম মানবসমাজে যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্য ছিল, পরবর্তী বৌদ্ধতন্ত্রে বা হিন্দুতন্ত্রে ঠিক তা ছিল না। বৌদ্ধ ও হিন্দু-তন্ত্রের সম্পূর্ণ ভিন্ন 'কালচার কম্‌প্লেক্সে' আদিম সমাজের এই সব ধর্মকর্ম ও ধ্যানধারণা গ্রথিত হয়ে পরিবর্তিত হয়েছে। জীবন ও সমাজের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগসূত্র থেকে ছিন্ন হয়ে এই সব উপাদান ক্রমে যান্ত্রিক আচার-অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। তার ফলে ব্যভিচার ও অবনতি ঘটেছে। এই দৃষ্টান্ত থেকে সংস্কৃতির ইতিহাসের একটি 'সূত্র' আবিষ্কার করা যায়। জীবন ও সমাজের প্রত্যক্ষ সংযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন হলে মৌলিক সাংস্কৃতিক আচার ক্রমে অনাচার ও ব্যভিচারে পরিণত হয়, অন্তত হবার সম্ভাবনা থাকে। আমাদের দেশের তন্ত্রাচার তার অন্যতম দৃষ্টান্ত।

নরমুণ্ডনৃত্যও অন্যতম আদিম ধর্মানুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠান পরে ধর্মঠাকুরের ও শিবের গাজনোৎসবের অঙ্গ হয়েছে। ধর্মঠাকুর রাঢ়ের অন্যতম গ্রামদেবতা এবং 'গাজন' (গা=গ্রাম, জন=জনসাধারণ) গ্রামের জনসাধারণের উৎসব।[১] ধর্মের গাজন গ্রামদেবতার লোকোৎসব। ধর্মঠাকুরের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের বিচিত্র লোকধর্মের সংমিশ্রণ ঘটেছে। তার সঙ্গে বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্মেরও অনেক উপাদান

১ ১৮২৯ সালে রামকমল সেন এসিয়াটিক সোসাইটিতে 'চড়কের গাজন' সম্বন্ধে একটি নিবন্ধ পাঠ করেন। তাতে 'গাজন' শব্দের তিনি এই ব্যাখ্যা করেছেন (J. A. S., Vol. 2, 1833)।

মিশেছে। ধর্মঠাকুরের ধ্যানধারণায় বৌদ্ধধর্মের প্রভাব অনস্বীকার্য। ধর্মঠাকুরের সঙ্গে বৌদ্ধমূর্তিপূজা ও স্তূপ-প্রতীকপূজা রাঢ়ের একাধিক স্থানে দেখেছি। কূর্ম-প্রতীকও কোন নিষাদ-জাতির কূর্ম-টোটেমের চিহ্ন বলে মনে হয়। বিষ্ণুর পৌরাণিক অবতার বলে 'কূর্মের' ব্যাখ্যা করার আগে ভাবা উচিত, এই অবতার-কল্পনারই (মৎস, কূর্ম, বরাহ ইত্যাদি) বা উৎস কোথায়? পুরাণকারদের এই কল্পনার প্রয়োজন হয়েছিল কেন? টোটেম-সংস্কৃতির ধারক ও বাহক বিপুল জনগোষ্ঠীর মধ্যে ধর্মপ্রচারের জন্য নয় কি? রাঢ়দেশে টোটেম-সংস্কৃতির ধারক ও বাহক বহু জনগোষ্ঠীর বাস ছিল। পশ্চিমবঙ্গের 'বাঘ', 'হাতি', 'ঘোড়া' ইত্যাদি কৌলিক উপাধি আজও তার সাক্ষী। এই সব জাতি আর্যসংস্কৃতির প্রত্যক্ষ সংযোগ ও প্রভাব-বহির্ভূত ছিল। জৈন ও বৌদ্ধধর্মের প্রভাব তাদের উপর পড়া স্বাভাবিক। হিন্দুধর্মের প্রভাব থেকেও পরে তারা একেবারে মুক্ত হয়নি। এই সব ধর্মাচার ও সংস্কৃতির সমন্বয়ে ধর্মঠাকুর রাঢ়দেশে গ্রাম-দেবতারূপে রূপায়িত হয়েছেন। তাঁর গ্রাম্য জনোৎসবের নাম হয়েছে গাজন। ক্রমে ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা এই 'গাজনকে' শৈব উৎসবে পরিণত করেছেন। শিব ক্রমে প্রধান গ্রামদেবতা হয়েছেন বলে ধর্মের গাজন সহজে শিবের গাজনে পরিণত হয়েছে।

গ্রামদেবতার সঙ্গে গ্রামদেবী থাকতেন, পুরুষ-দেবতার সঙ্গে একজন স্ত্রী-দেবতা। রাঢ়ের গ্রামদেবতা ধর্মের সঙ্গে থাকতেন তাঁর কামিন্যা। কামিন্যাদের নানারকমের নাম আছে। এই কামিন্যারাই ক্রমে শাক্ত ও তান্ত্রিক ধর্মের প্রভাবে গ্রামদেবতা কালী হয়েছেন মনে হয়। তার সুন্দর আভাস পাওয়া যায় মুর্শিদাবাদ ও বীরভূমের সংযোগ-স্থল থেকে। বীরভূমের কীর্ণাহার-লাভপুর অঞ্চলে একাধিক গ্রামে হাড়ি-ডোম পূজিত বিখ্যাত সব 'কালী' আছেন। এ-অঞ্চলে ধর্মপন্থী ও তান্ত্রিকদের প্রাধান্য ও মিশ্রণ খুব বেশি। কীর্ণাহার থেকে মাইল দুই দূরে বেণেপাড়ায় এক বিখ্যাত কালী আছেন, সেবায়েৎ ডোম। মুর্শিদাবাদের কান্দী মহকুমা ও বীরভূমের প্রায় শতাধিক গ্রাম জুড়ে এই 'বেণেপাড়ার কালী' গ্রামদেবতারূপে বিরাজ করেন। পাণ-পাড়ায় এক কালী আছেন, সেবায়েৎ হাড়ি। কালকেপুরের কালীর দেয়াশী ডোম। কীর্ণাহারের গ্রামদেবতা ভদ্রকালী। লাভপুর তো ফুল্লরাদেবীর তান্ত্রিক পীঠস্থান বলে খ্যাত। বোঝা যায়, রাঢ়ের এই অঞ্চলে ধর্মনিরঞ্জন-

পন্থীদের সঙ্গে বৌদ্ধ ও হিন্দু তান্ত্রিকদের বিচিত্র সাংস্কৃতিক মিশ্রণ ঘটেছিল। গ্রামদেবতারা তার সাক্ষী হয়ে রয়েছেন এবং শিলালিপি বা তাম্রশাসনের সাক্ষীর চেয়ে তাঁদের সাক্ষী কম নির্ভরযোগ্য নয়।

নরমুণ্ডনৃত্য বা মড়াখেলা ধর্মের গাজনের অঙ্গ ছিল রাঢ়দেশে। এই নিষাদাচার সহজেই রাঢ়ের জনসাধারণ কর্তৃক ধর্মদেবতার উৎসবে গৃহীত হয়েছিল। মুর্শিদাবাদের কান্দী মহকুমার অনেক স্থানে, বর্ধমানের একাধিক স্থানে, ধর্মঠাকুরের উৎসবে মৃতের পচা-গলা নরমুণ্ড নিয়ে নৃত্যগীত হত, 'কালিকার পাতারা' নৃত্য করত, কাল্‌কে-পাতারি নাচ বলা হত। এই উৎসব সম্বন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রায় পঞ্চাশ বছর পূর্বের বিবরণের মধ্যে লিখেছেন: "কালিকার পাতারা আস্ত মড়া—মনুষ্যের শবদেহ—অনেক সময় গলিত শব—আনিয়া মন্দিরের উঠানে উপস্থিত হয় ও ঢাকের বাদ্য ও ধূপের ধোঁয়া সহ বিকট পৈশাচিক নৃত্যের অভিনয় করে। পূর্বে শব সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হয়, গলিত দুর্গন্ধ শব হইলেই বিশেষ বাহাদুরি, অভাবে গোটাকতক শুকনা মাথা। শ্মশানবাসী মহাদেবের কালাগ্নিরুদ্রমূর্তির সম্মুখে এই পৈশাচিক অনুষ্ঠান সঙ্গত হইতে পারে, কিন্তু ইহার অনার্যত্বে সংশয় নাই।"[১] কান্দীর রুদ্রদেবের গাজনে এই নৃত্যানুষ্ঠান হয়। কান্দীতে বুদ্ধমূর্তি রুদ্রদেব বলে পূজিত হন এবং কান্দী অঞ্চলের ধর্মের গাজনের নরমুণ্ডনৃত্য রুদ্রের গাজনেও অনুষ্ঠিত হয়। বর্ধমানের কুড়মুন গ্রামের ঈশানেশ্বর শিবের গাজনে এই নরমুণ্ডনৃত্য হয়। এই অনার্য অনুষ্ঠানের আসল তাৎপর্য বহুকাল লোপ পেয়েছে এবং ধর্মের গাজন থেকে শিবের গাজনে গৃহীত হয়ে ক্রমেই তার বাহ্য বীভৎসতা বেড়েছে মাত্র।

সাংস্কৃতিক বিশ্লেষণের এই পদ্ধতি অবলম্বন করে আমরা স্থানীয় শিল্পকলার রীতি ও ভঙ্গি-স্বাতন্ত্র্যের বিচার করতে পারি। বিশেষ সামাজিক-অর্থনৈতিক ও মানসিক পরিবেশে, বিশেষ ধ্যান ধারণা ও আদর্শের প্রেরণায় শিল্পকলার বৈচিত্র্যের বিকাশ হয়। সেই পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হলে এবং তার সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ না থাকলে, কিভাবে শিল্পকলার ক্রমাবনতি ঘটে, সে সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গের

শিল্পকলার রীতিবিচার

১ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী "গ্রামদেবতা" প্রবন্ধে মুর্শিদাবাদের (কান্দীর) এই উৎসবের চমৎকার বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন (সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩১৪ সন, ১ম সংখ্যা)।

চিত্রকরদের পটশিল্প ও বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরের মৃৎশিল্পপ্রসঙ্গে আলোচনা করেছি।[১] এখানে কলারীতি বা 'আর্ট-স্টাইল' সম্বন্ধে কিছু বলব। ঝাড়গ্রামের সাঁওতাল-প্রধান এলাকা থেকে বিষ্ণুপুর-আরামবাগ পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে অধিকাংশ গ্রাম-দেবতার স্থানে যেসব পোড়ামাটির হাতিঘোড়ার মূর্তি দেখা যায়, স্থানীয় মৃৎশিল্পী কুম্ভকাররা সেগুলি তৈরি করেন। এই সব হাতি-ঘোড়ার গড়ন লক্ষ করলে (৫১নং প্লেট দ্রষ্টব্য) দেখা যায়, বাস্তব বা 'রিয়ালিষ্টিক' গড়ন থেকে ক্রমেই যেন একটা ভঙ্গিপ্রধান অবাস্তব গড়নের দিকে এই মৃৎশিল্পের অগ্রগতি হয়েছে। ঝাড়গ্রামের অনুন্নত অঞ্চলের হাতি-ঘোড়া 'সলিড' ও অনেকটা বাস্তব (প্লেট ৫১, প্রথম চিত্র)। ঝাড়গ্রামেরই উন্নত গ্রামাঞ্চলের হাতি-ঘোড়া ভঙ্গিপ্রধান বিশেষ রূপ ধারণ করেছে এবং তারই পরিণতি হয়েছে বিষ্ণুপুর-পাঁচমুড়োর ফাঁপা বৃত্তাকার গড়নে। তাহলে কি শিল্পকলার রীতিবিকাশের স্বাভাবিক ঝোঁক, বাস্তব-চিত্রণ (Realism) থেকে প্রতীকী-চিত্রণের (Symbolism) দিকে? প্রকৃতি আগে, প্রতীক পরে? বাস্তবতা আগে, ভঙ্গিপ্রধান স্বাতন্ত্র্য পরে? না দুয়েরই যুগপৎ বিকাশ হয়েছে?

কলারসিকদের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে এবিষয়ে তর্ক-বিতর্ক হয়েছে। তর্কের শেষ হয়নি আজও। সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে এবিষয়ে প্রত্যক্ষ গবেষণা করেছেন যাঁরা, তাঁদের মধ্যে হ্যাডন, বাফুর, বোয়াস প্রভৃতির নাম উল্লেখনীয়। হ্যাডন স্তূপীকৃত শিল্পকলার নিদর্শন সংগ্রহ করে, তাদের ক্রমবিকাশ ও ক্রমাবনতির ধারা অনুসন্ধান করে, এবিষয়ে মন্তব্য করেছেন যে কলারীতির বিকাশের ধারা হল বাস্তবতা থেকে প্রতীকের দিকে, 'representational' রূপায়ণ থেকে 'conventionalised' ভঙ্গি ও রীতিপ্রাধান্যের দিকে। তিনি বলেছেন:[২]

> The vast bulk of artistic expression owes its birth to realism; the representations were meant to be life-like, or to suggest real objects; that they may not have been

১ 'গ্রাম-প্রদক্ষিণ' বিভাগের বিবরণ ছাড়াও, 'সাংস্কৃতিক প্রসঙ্গ' বিভাগে এবিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। 'লোকধর্ম ও শিল্পকলা', 'দশাবতার তাস', 'পশ্চিমবঙ্গের চিত্রকর' প্রভৃতি প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

২ A. C. Haddon: Evolution in Art (London, 1914), p. 7; এই প্রসঙ্গে H. Balfour-এর The Evolution of Decorative Art (London, 1895) দ্রষ্টব্য।

so was owing to the apathy or incapacity of the artist or to the unsuitability of his materials. Once born, the design was acted upon by constraining and restraining forces which gave it, so to speak, an individuality of its own. In the great majority of representations the life-history ran its course through various stages until it settled down to uneventful senility; in some cases, the representation ceased to be—in fact, it died.

হ্যাডনের এই মত বোয়াস্‌, হার্স্কোভিট্‌স প্রভৃতি সমাজবিজ্ঞানীরা আংশিক সত্য বলেছেন। আংশিক সত্য হলেও, হ্যাডনের এই সূত্রটি এত বেশি তথ্যনির্ভর যে সহজে তা খণ্ডনীয় নয়। কিন্তু অন্যান্য আরও অনেক আদিম জাতির (যা হ্যাডন দেখেননি) শিল্পকলার মধ্যে প্রথম থেকে প্রতীকী রূপায়ণের এমন প্রাধান্য দেখা যায় যে—কলারীতির বিকাশের ধারা সম্বন্ধে সঠিকভাবে কিছু নির্দেশ করা যায় না। আদিম-শিল্পীর দৃষ্টিতেও এক-একটি প্রত্যক্ষ বস্তুর বিশেষ কোন অংশ এমনভাবে কল্পনামণ্ডিত হয়ে ওঠে যে সেই বিশেষ অংশের রূপায়ণই তার কাছে সত্য বলে প্রতিভাত হয় এবং তাই থেকে প্রতীকী শিল্পের বিকাশ হয়। পশ্চিমবঙ্গের মাটির হাতি-ঘোড়া প্রসঙ্গেও এ-উক্তি প্রযোজ্য। বড় বড় হাতি-ঘোড়া ছাড়া ক্ষুদ্রাকার মাটির হাতি-ঘোড়াগুলি সবই প্রায় প্রতীকী রূপায়ণের নমুনা। কাঠের রঙিন পুতুল ও পোড়ামাটির পুতুলের ক্ষেত্রেও একথা সত্য, কিন্তু কৃষ্ণনগরের (নদীয়া) মৃৎশিল্প প্রধানত 'representational', বাস্তবধর্মী। সুতরাং অঞ্চলভেদে রীতিভেদ আছে। একটা নির্দিষ্ট বাঁধাধরা ছক্‌ ধরে কলারীতির যান্ত্রিক বিকাশ হয়নি। আঞ্চলিক সামাজিক-মানসিক পরিবেশের পার্থক্যের জন্য তার মধ্যে বৈচিত্র্যের বিকাশ সম্ভব হয়েছে।

•

অর্থনৈতিক-সামাজিক, প্রাকৃতিক বা নৈতিক-মানসিক পরিবেশের পরিবর্তনের জন্য শিল্পকলার ক্রমাবনতি ও বিলুপ্তি ঘটতে পারে।[১] পশ্চিমবঙ্গের শিল্পকলার

১ W. H. R. Rivers: 'The Disappearance of Useful Arts', reprinted in 'Psychology and Ethnology' (London 1926).

ক্ষেত্রে তার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন দেবালয়-স্থাপত্যের বিকাশ হয়েছিল বিশেষ একটি সাংস্কৃতিক পরিবেশে। রাঢ়ের সূত্রধর ও গৃহশিল্পীরাই মনে হয়, দো-চালা চার-চালা আট-চালা গড়নের ইটের বাংলা মন্দিরের রূপ দিয়েছিলেন। বাঁকা-চাল খড়ের মাটির ঘরের প্রায় হুবহু অনুকরণে বাংলা মন্দির গড়ে উঠেছে। যতরকমের বাঁকা-চালের খড়ো ঘর পশ্চিমবঙ্গে দেখা যায় (একতালা, দোতালা), ততরকমের বাঁকাচালের ইটের মন্দিরও পাওয়া যায় (প্লেট ৫৪ দ্রষ্টব্য)। মনুষ্যালয়ের সঙ্গে দেবালয়ের আন্তরিক সম্পর্ক স্থাপন করেছেন পশ্চিমবঙ্গের সূত্রধর-শিল্পীরা। দেবতার সঙ্গে মানুষের পারিবারিক আত্মীয়তার নিদর্শন হল বাংলা মন্দির। দেবতাকে 'সম্রাট' মনে করে, প্রাসাদতুল্য মন্দিরে তাঁর অধিষ্ঠানের কথা বাংলার শিল্পীরা কল্পনা করেন নি। পশ্চিমবঙ্গের বাঁকা-চালের গৃহের গড়ন ও বিস্তারণ থেকে মনে হয়, রাঢ়দেশের কেন্দ্রস্থল থেকেই বাংলার এই বিশিষ্ট দেবালয়-স্থাপত্যের বিকাশ ও বিস্তার হয়েছিল। প্রথমে হয়ত কাঠের ও খড়ের ঘরই দেবালয় ছিল, যেমন গ্রামে গ্রামে এখনও অনেক আছে। পরে ইটের গড়নে তাকে রূপান্তরিত করা হয়েছে, এবং কাঠের কারুকার্য (দরজা, খুঁটি ইত্যাদির) মন্দিরের গায়ে পোড়ামাটির কারুকার্যে পরিণত হয়েছে। তার জন্য স্থানীয় জমিদার ও সামন্তরাজার আর্থিক পোষকতা প্রয়োজন হয়েছে। ইটের দেবালয়ের যেসব নিদর্শন এখনও আছে, তা থেকে মনে হয়, ষোড়শ সপ্তদশ শতাব্দী থেকে এই দেবালয়ের প্রবর্তন হয়েছিল। মন্দিরের সংলগ্ন লিপি থেকে তার পূর্বের কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। কোন নিদর্শনও নেই। সামন্তপোষকতা ক্রমে যত কমেছে, স্থাপত্যেরও তত অবনতি হয়েছে দেখা যায়। ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই দেবালয়-স্থাপত্যের চরম বিকাশ হয়েছে মনে হয় এবং উনবিংশ শতাব্দী থেকে দ্রুত অবনতি ঘটেছে, মন্দিরের গড়ন পর্যন্ত বিকৃত হয়েছে। দেবালয় গড়তে পারেন, এরকম সুদক্ষ সূত্রধরশিল্পী এখন পশ্চিমবঙ্গে প্রায় দুর্লভ বলা চলে। চিত্রকর-পটুয়াদের মতন, তাঁরা জীবিকার জন্য ভিন্ন বৃত্তি অবলম্বন করেছেন।

শিল্পকলার বিকাশ ও অবনতি

বিভিন্ন সংস্কৃতির সংঘাত ও সংস্পর্শের (Culture-contact) ফলে আঞ্চলিক সংস্কৃতির কিভাবে পরিবর্তন ঘটে, ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে নতুন

সমন্বয় (integration) হয়, সে-সম্বন্ধে 'গ্রাম-প্রদক্ষিণ' ও 'সাংস্কৃতিক প্রসঙ্গ' বিভাগের একাধিক প্রবন্ধে আলোচনা করেছি। সংঘাত ও সংস্পর্শ দুদিক থেকে বিচার করা যায়। আভ্যন্তরিক সংঘাত—যেমন আর্য-অনার্য, হিন্দু-বৌদ্ধ, শাক্ত-বৈষ্ণব ইত্যাদি সংস্কৃতি-ধারার সংঘাত। বহিরাগত সংস্কৃতির সংঘাত—যেমন ভারতীয়-হিন্দু-মুসলমান-ইয়োরোপীয় ইত্যাদি। সংঘাতের তীব্রতা দুই দিকেই সমান হতে পারে। আর্য-অনার্যের সংঘাত, হিন্দু-বৌদ্ধের সংঘাত, শাক্ত-বৈষ্ণবের সংঘাত এবং হিন্দু-মুসলমান বা ইয়োরোপীয় সংস্কৃতির সংঘাতের তীব্রতা ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য বিশেষ নেই। সমন্বয়ের বিভিন্ন স্তর আছে, সামাজিক জন-স্তর। সর্বস্তরে সমন্বয়ের গভীরতা বা একাত্মীকরণ (assimilation) সমান নয়। জনমানসের বিভিন্ন স্তরের গ্রহণ-প্রবণতার উপর সমন্বয়ের গভীরতা প্রধানত নির্ভরশীল।

সংস্কৃতি-সংঘাত ও সমন্বয়

সমাজবিজ্ঞানসম্মত অনুশীলনরীতি প্রয়োগ করে বঙ্গসংস্কৃতির রূপায়ণের ধারা এইভাবে নানাদিক থেকে বিশ্লেষণ করা যায়। সংস্কৃতির বৈচিত্র্যের পরিচয় না পেলে, তার অন্তর্নিহিত ঐক্যের আভাস পাওয়াও সম্ভব নয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৈচিত্র্যের ও স্বাতন্ত্র্যের মিলনেই বৃহত্তর ঐক্য গড়ে ওঠে। ভারত-সংস্কৃতির ঐক্য বহু জাতি-উপজাতির সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই বৈচিত্র্যের বিচারের জন্য পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতির আঞ্চলিক অনুসন্ধান ও অনুশীলন প্রয়োজন। অনুশীলনের ফলাফল সম্বন্ধে যেটুকু আভাস দিয়েছি, পরবর্তী আলোচনায় তারই তথ্যভিত্ রচনা করেছি।

নলহাটী
আজিমগঞ্জ
মুর্শিদাবাদ
রামপুরহাট
বহরমপুর
কান্দী
সাঁইথিয়া
রাজনগর
সিউড়ি
দুবরাজপুর
বরাকর
পলাশী
দেবগ্রাম
কেন্দুলী
বোলপুর
কাটোয়া
আসানসোল
শ্রীখণ্ড
মঙ্গলকোট
কৃষ্ণনগর
নবদ্বীপ
ছাতনা
বাঁকুড়া
বর্ধমান
শান্তিপুর
কালনা
গুপ্তিপাড়া
রানাঘাট
পাত্রসায়ের
বিষ্ণুপুর
রায়না
জামালপুর
পাণ্ডুয়া
ত্রিবেণী
ময়নাপুর
আরামবাগ
তারকেশ্বর
হুগলী
নৈহাটি
গড়বেতা
গড়মান্দারন
চন্দ্রকোনা
ক্ষীরপাই
খানাকুল
শ্রীরামপুর
বারাসাত
ঘাটাল
দমদম
আমতা
হাওড়া
কলিকাতা
উলুবেড়িয়া
মেদিনীপুর
পাঁশকুড়া
ঝাড়গ্রাম
বারুইপুর
তমলুক
নারায়নগড়
ডায়মণ্ডহারবার
কেশিয়াড়ী
পটাশপুর
খেজুরী
কাকদ্বীপ
কাঁথি

ভাতার
মন্তেশ্বর
খড়ি
খড়ি
কর্জনা
বাঁকা
বাঁকা
বর্ধমান
সাতগাছিয়া
দামোদর নদ
মেমারী
গুপ্তিপাড়া
বেহুলা
রায়না
জামালপুর
পাণ্ডুয়া
ভাগীরথী নদী
ভাগীরথী নদী
0 ১০ ২০
স্কেল

পশ্চিমবঙ্গের
নদ নদী
ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দী
(আনুমানিক)

ধনিয়াখালী
তারকেশ্বর
চাঁপাডাঙ্গা
ঘিয়া
কানা নদী
শ্রীরামপুর
আমতা
হাওড়া
উলুবেড়িয়া
হুগলী নদী
স্কেল

ভূগোল ও ইতিহাস

কোন এক অখ্যাত কবি 'ভূগোল' ও 'ইতিহাস' সম্বন্ধে লিখেছেন: 'Geography is about maps, History is about chaps'—এবং একজন বিখ্যাত ভূবিজ্ঞানী অখ্যাত কবির এই উক্তি প্রসঙ্গে বলেছেন, 'in fact there can be maps about chaps'. ম্যাপ সম্বন্ধে তিনি মন্তব্য করেছেন, 'The map is a social symbol'—মানচিত্র সমাজের প্রতীক।[১] মানচিত্র কেবল ভূ-চিত্র নয়, সমাজ-জীবনেরও চিত্র। মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের মানচিত্র বদলায়, রাষ্ট্রিক ও সামাজিক জীবনেরও মানচিত্র বদলায়। তার সঙ্গে সাংস্কৃতিক জীবনেরও মানচিত্র বদলাতে থাকে। বাংলাদেশের মানচিত্র হিন্দুযুগে বদলেছে, মুসলমানযুগে বদলেছে, বৃটিশযুগেও একাধিকবার বদলেছে। অকারণে বদলায়নি, বিশেষ রাষ্ট্রিক ও সামাজিক কারণে বদলেছে। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের মানচিত্রের আবার যে পরিবর্তন হয়েছে, তারও সামাজিক কারণ আছে। পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস যে ভৌগোলিক ইতিহাসের সঙ্গে কত প্রত্যক্ষভাবে জড়িত তা সহজেই বোঝা যায়।

কিন্তু মানচিত্রই ভূগোলের সবটুকু নয়। প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিবর্তনের কারণ ও ধারা অনুসন্ধান করা ভৌগোলিকের অন্যতম লক্ষ্য। উনবিংশ শতাব্দী থেকেই প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে মানবসভ্যতার সম্পর্ক আবিষ্কারের জন্য ভূবিজ্ঞানীরা কৌতূহলী হয়েছেন। পরবর্তীকালে অনুসন্ধানের পদ্ধতি ক্রমেই বিজ্ঞানসম্মত হয়েছে এবং বহু বিজ্ঞানীর অনুশীলনের ফলে পরিবেশবিদ্যা বা 'Human Geography' নামে ভূগোলের একটি স্বতন্ত্র শাখার বিকাশ হয়েছে।[২] পাহাড়-পর্বত, সমুদ্র-নদ-নদী, বন-উপবন-উপত্যকা, মরুভূমি-

১ J. M. Mogey : The Study of Geography (London, 1950) ; Introduction.

২ এবিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কয়েকখানি বই : E. C. Semple : Influence of the Geographical Environment (1911)—বইখানি বিখ্যাত বিজ্ঞানী F. Ratzel-এর Anthropogeographie (1882-91) গ্রন্থের ইংরেজী ভাবানুবাদ। T. Griffith Taylor : Environment and Nation (1936) ; E. Huntingdon ; The Pulse of Asia (1909); P. V. Blache : Principles of Human Geography (1926) ; J. Brunhes : Human Geography (1920) ; C. D. Forde : Habitat, Economy and Society (1934).

জনপদ ইত্যাদির পরিবর্তন ও রূপান্তরের ধারাই সভ্যতার ইতিহাসের ধারা। কিন্তু কেবল প্রাকৃতিক কারণে এগুলি বদলায়নি বা বদলায় না। বন-উপবন কেটে জনবসতি স্থাপিত হয়েছে মানুষের চেষ্টায়। প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিবর্তন করেছে মানুষ নিজের স্বচ্ছন্দ ও নিরাপদ জীবনযাত্রার জন্য। কার্ল মার্ক্স (Karl Marx) বলেছেন, প্রাকৃতিক পরিবর্তনের ইতিহাস যেমন সত্য, তেমনি সেই পরিবর্তনকালীন মানুষের সংগ্রামের ইতিহাস এবং সংগ্রামের ফলে মানুষের নিজের পরিবর্তনের ইতিহাসও সত্য। প্রকৃতি ও মানুষ, দুয়েরই পরিবর্তনের ধারা মিলিত হয়েছে সভ্যতার ইতিহাসের ধারায়। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর আগে, নদ-নদীর ধারা নিয়ন্ত্রণ, বন্যা-প্রতিরোধ ইত্যাদি প্রাকৃতিক ঘটনা মানুষের আয়ত্তের অতীত ছিল বলা চলে। তার জন্য মানুষের সংগ্রামের বিরতি হয়নি বটে, কিন্তু প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক পরিবর্তনের কাছে মানুষ অনেক সময় আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছে। রাষ্ট্রিক ও সামাজিক কারণে, উপেক্ষা ও অদূরদর্শিতার জন্যও অনেক সময় ভৌগোলিক পরিবর্তন (যেমন নদ-নদীর খাত মজা বা খাত-বদল) অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে সেই পরিবর্তনের প্রভাব পড়েছে। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতির ইতিহাসও এই ভৌগোলিক প্রভাবমুক্ত নয়।

ভূগোলের সঙ্গে ইতিহাসের ও সংস্কৃতির যে মৌলিক সম্পর্ক আছে, সেদিক থেকে প্রথমে পশ্চিমবঙ্গের ভৌগোলিক বিশিষ্টতার কথা উল্লেখ করা উচিত। বাংলাদেশ বলতে আমরা সাধারণত মনে করি যে নদ-নদীর পলিমাটি দিয়ে তৈরি একটি দেশ। কিন্তু সমগ্র বাংলার ভূভাগ নদনদী-বাহিত পলিমাটি দিয়ে তৈরি নয়। পশ্চিমবঙ্গে মেদিনীপুর জেলার প্রধান অংশ, বাঁকুড়া বীরভূম ও বর্ধমান জেলার অনেকটা ভূভাগ বৃষ্টিবায়ু ও হিমবাহ-বাহিত মাটি দিয়ে তৈরি। পলিমাটির দান যা আছে, তাও হিমালয়-দুহিতা নদীর প্রাথমিক দান নয়। হিমালয়-নির্গত নদীধারার আগে দক্ষিণের বিন্ধ্যপর্বত ও ছোটনাগপুরের পার্বত্য উপত্যকায় উৎপন্ন প্রাচীন নদনদীর পলি দিয়ে তৈরি হয়েছিল প্রাচীন আর্যাবর্তের (উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের) ও পশ্চিমবঙ্গের কিয়দংশ। পশ্চিমবঙ্গ বয়সে অনেক প্রবীণ, ভূতাত্ত্বিক দিগন্ত পর্যন্ত তার জীবনের লীলাক্ষেত্রের সীমানা। দক্ষিণভারতের সঙ্গে তার সাংস্কৃতিক সংযোগ আদিপ্রস্তরযুগ পর্যন্ত বিস্তৃত।[১]

১ 'আলোচনা' বিভাগে শ্রীধরণী সেনের "পশ্চিমবঙ্গের প্রাগিতিহাস" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

সরস্বতী নদী ছাড়া, ভাগীরথী-হুগলীর পশ্চিমতীরবর্তী পশ্চিমবঙ্গের সব নদনদীরই উৎস হল ছোটনাগপুরের মালভূমি। তার মধ্যে প্রধান হল মোর বা ময়ূরাক্ষী, অজয়, দামোদর, দ্বারকেশ্বর, রূপনারায়ণ, কাঁসাই, হল্‌দি ও সুবর্ণরেখা। ময়ূরাক্ষী রাজমহল পাহাড়ের পশ্চিমাংশের উৎস থেকে, প্রথমে পশ্চিমবাহী, পরে দক্ষিণবাহী হয়ে সাঁওতাল-পরগণার দুমকায় পৌঁছেচে। সেখান থেকে দক্ষিণ-পূর্ব পথে প্রবাহিত হয়ে, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের সীমানা অতিক্রম করে, মুর্শিদাবাদে কান্দীশহরের কাছে ভাগীরথীতে মিশেছে। অজয়ও রাজমহল পাহাড়ের উৎস থেকে প্রবাহিত হয়ে এসে বর্ধমানে কাটোয়ার কাছে ভাগীরথীর সঙ্গে মিশেছে। মানভূমের উচ্চভূমিতে উৎপন্ন হয়ে দ্বারকেশ্বর সুশুনিয়া পাহাড়ের কাছ দিয়ে বাঁকুড়ায় নেমেছে এবং পূর্বগতিতে বাঁকুড়া শহরে পৌঁছে দক্ষিণপূর্ব গতি নিয়েছে। তারপর হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার ভিতর দিয়ে দ্বারকেশ্বর ক্রমে দক্ষিণমুখী হয়ে মেদিনীপুর জেলায় প্রবেশ করে, ঘাটালের কাছ থেকে নাম নিয়েছে রূপনারায়ণ। এই ঘাটালের কাছেই শিলাই (শিলাবতী) এসে মিশেছে। শিলাইয়েরও উৎপত্তি মানভূমেতে। কাঁসাই (কংসাবতী) মানভূমের উপত্যকায় উদ্ভূত। নিম্নাংশে কাঁসাইয়ের নাম হল্‌দি, হুগলী মোহানায় সর্বশেষ উপনদী। সুবর্ণরেখার প্রবাহ প্রধানত বিহার ও উড়িষ্যার ভিতর দিয়ে, কিছুটা মেদিনীপুর জেলার মধ্য দিয়ে। উড়িষ্যার সমুদ্রেই এর মোহানা। দামোদরের দৈর্ঘ্য প্রায় ৩৭০ মাইল। এই দীর্ঘপথ ছোটনাগপুরের হাজারিবাগ মানভূমের ভিতর দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে বাঁকুড়া বর্ধমানের সীমানা নির্দেশ করে, বর্ধমান-হুগলীর মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে দামোদর হুগলী-ভাগীরথীতে এসে মিশেছে।

পশ্চিমবঙ্গের নদনদীর এই উৎস ও প্রবাহ থেকে পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতিধারার চিত্রটি স্পষ্ট হয়ে ভেসে ওঠে চোখের সামনে। বলে দেবার প্রয়োজন হয় না, এ-সংস্কৃতির সংযোগ ছোটনাগপুরের নিষাদ-সংস্কৃতির সঙ্গে কত প্রত্যক্ষ ও গভীর। মানবসভ্যতার ইতিহাসে দেখা যায়, প্রধানত নদীপ্রবাহের পথেই সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রসার হয়েছে। তাই যদি হয়, তাহলে পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতির উপর অনার্য নিষাদ-সংস্কৃতির গভীর প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। কেউ কেউ বলেন 'দামোদর' নদীর নাম মুণ্ডাদের নাম। 'দা-মুণ্ডা' (Dah-Moondah) থেকে 'দা-মুদা'-'দামোদর' নাম হয়েছে। 'দা-মুণ্ডা' কথার

অর্থ হল, মুণ্ডাদের জল।[১] এই দামোদরের তীরে পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতির আঞ্চলিক উত্থান-পতন হয়েছে সবচেয়ে বেশি। দামোদরের প্রবাহের পরিবর্তনে গ্রাম্যসমাজের বিকাশ ও বিলোপ হয়েছে। খাড়ি বা খড়ি, বাঁকা, বেহুলা নদী একদা দামোদরের প্রাচীন খাত ছিল। প্রাচীনকালে ভাগীরথী-হুগলী নদীর অস্তিত্বের আগে, এই পথে দামোদর চব্বিশ-পরগণার পূর্বদিক দিয়ে সমুদ্রে মিশত। ঘেয়া, কাণা নদী, কাণা দামোদর, রাণাবাঁধ খাল, কাণাখাল প্রভৃতিও দামোদরের পরিত্যক্ত খাত বা কাটাখাল। দামোদরের পরিত্যক্ত প্রাচীন প্রবাহপথে অনেক একদা-সমৃদ্ধ জনপদের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়, যেমন দেখা যায় সরস্বতীর প্রাচীন তীরবর্তী অঞ্চলে।

ছোটনাগপুরে উৎপন্ন নদনদীর প্রবাহ দেখে পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতিতে যেমন নিষাদ-সংস্কৃতির প্রভাবের ও দানের কথা মনে হয়, তেমনি তাদের গঙ্গার প্রবাহে মিলনের কথা ভেবে আর্যসংস্কৃতির মিলনের ও সমন্বয়ের কথা মনে পড়ে। কেবল সুবর্ণরেখা পশ্চিমবঙ্গে এবং কর্ণফুলি পূর্ববঙ্গে স্বাধীনভাবে সমুদ্রে মিশেছে। তা ছাড়া বাংলার অন্য সব নদ-নদীর মিলন হয়েছে গঙ্গা-ভাগীরথী-পদ্মার প্রবাহে। ছোটনাগপুর-জাত পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত নদনদীও গঙ্গার শাখা ভাগীরথী-হুগলীতে এসে মিশেছে। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতির সম্পূর্ণ সমন্বয়ের চিত্রটি প্রতিফলিত হয়েছে তার নদ-নদীর এই উৎস থেকে সঙ্গমের ধারার মধ্যে।

বাংলাদেশের প্রাচীন জনবিভাগ ও জনপদ সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা না থাকলে বঙ্গসংস্কৃতির রূপায়ণের ধারা বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়।[২] প্রাচীন সুহ্ম বা

১ Dalton : The Kols of Chotanagpore, J. A. S (L), XXXV, 1866, Part II, PP, 153-200.

২ 'গ্রাম-প্রদক্ষিণ' বিভাগের বিভিন্ন অঞ্চলের বর্ণনার মধ্যে বাংলার প্রাচীন জনপদ-বিভাগ সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। 'আলোচনা' বিভাগে ডক্টর রাধাগোবিন্দ বসাক এ-সম্বন্ধে পৃথকভাবে আলোচনা করেছেন। ডক্টর বিনয়চন্দ্র সেনের "Some Historical Aspects of the Inscriptions of Bengal" গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের History of Bengal (Vol I) গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে বাংলার প্রাচীন জনপদ ও ভূগোল সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা আছে। বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির জার্ণালে ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় এ-বিষয়ে মনমোহন চক্রবর্তী, নন্দদুলাল দে, যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, নলিনীকান্ত ভট্টশালী প্রভৃতির আলোচনাও অবশ্যপাঠ্য।

রাঢ় দেশই পশ্চিমবঙ্গ। জৈন 'আচারাঙ্গ সূত্রে' (খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক) লাড়-রাঢ় দেশের নাম পাওয়া যায়। মহাভারতে (সভাপর্বে) যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের জন্য অর্জুন ভীম সহদেব নকুল উত্তর পূর্ব দক্ষিণ ও পশ্চিম দিক জয় করেছিলেন। ভীম পূর্বদিকে বহু রাজ্য জয় করে 'বৈদেহক ও জগতীপতি জনককে' পরাজিত করেন।

বাংলার প্রাচীন জনপদ-বিভাগ

বিদেহ রাজ্যের কাছে শক ও বর্বর এবং দূরে কিরাতরা বাস করত। তাদের বশ করে, স্বপক্ষীয় সুহ্ম ও প্রসুহ্মদের নিয়ে, মগধ-গিরিব্রজে জরাসন্ধপুত্রকে সান্ত্বনা দিয়ে, তিনি কর্ণকে ও পর্বতবাসীদের পরাজিত করেন। সেখান থেকে মোদাগিরি, তারপর মহাবল পুণ্ড্রাধিপতি বাসুদেব, কৌশকীকচ্ছবাসী রাজা মনৌজা, বঙ্গরাজ, সমুদ্রসেন, চন্দ্রসেন, তাম্রলিপ্ত, কর্বট ও মহাসাগরতীরবাসী ম্লেচ্ছদের জয় করেন।

মহাভারতের এই বিবরণের মধ্যে প্রাচীন ভৌগোলিক চিত্রটি পরিষ্কার ফুটে উঠেছে। বিদেহ রাজ্যের উত্তরসীমা হিমালয়, পূর্বসীমা কৌশিকী, দক্ষিণসীমা গঙ্গা ও পশ্চিমসীমা গণ্ডকী। এখনকার দ্বারভাঙ্গা (দ্বার-বঙ্গ) জেলা। বিদেহ রাজ্যের উত্তরাঞ্চলে শকেরা বাস করত। এই শক, আর বিদেশী শকজাতি অভিন্ন নয়। যে-শকজাতি বিদেহ রাজ্যের উত্তরে বাস করত, গৌতমবুদ্ধ সেই শকজাতীয়। দূরে কিরাতরা বাস করত। কিরাতরাই 'ইন্দো-মঙ্গোলীয়' (Indo-Mongloid), শকরা তাদেরই শাখা। সুহ্মদেশের আগে যে দেশ, তার নাম প্রসুহ্ম। ভাগীরথীর পশ্চিমের মুর্শিদাবাদ ও প্রাচীন রাঢ়ের উত্তর-পূর্বাংশ সুহ্মদেশ। তার আগে বা দক্ষিণে প্রসুহ্ম। মগধ গঙ্গার দক্ষিণে, তার উত্তরে ও পূবে ভাগলপুর, কর্ণের অঙ্গরাজ্য। মোদাগিরি মুঙ্গেরের গিরি, তার উত্তরে ও পূবে পূর্ণিয়া জেলা, পুণ্ড্রদেশের আরম্ভ এখান থেকে। পুণ্ড্রদেশের রাজা বাসুদেব, কৃষ্ণের প্রতিদ্বন্দ্বী ও জরাসন্ধের অনুগত ছিলেন। পুণ্ড্রের দক্ষিণে বঙ্গ। সমুদ্রসেন সমুদ্রপতি, পরে সমুদ্রের নাম সমতট বা সমুদ্রের তট-অঞ্চল হয়েছে। তাম্রলিপ্ত তমলুক। কর্বট দেশ-কোথায়? বঙ্গের দক্ষিণে বোধ হয়। 'ব্যাঘ্রতটীমণ্ডল' (অর্থাৎ যে সমুদ্রতটে বাঘ বাস করে) সুন্দরবন অঞ্চল হওয়াই সম্ভব।

বায়ুপুরাণে (১৪৭অ) ও মৎস্যপুরাণে (২০অ) বলা হয়েছে, গঙ্গানদী অন্যান্য দেশ ছাড়াও 'মগধ অঙ্গ ব্রহ্মোত্তর বঙ্গ তাম্রলিপ্ত' এই সব আর্যজনপদ পবিত্র করে, বিন্ধ্যাচলে প্রতিহত হয়ে, দক্ষিণ-সাগরে মিলিত হয়েছে। এখানে

ব্রহ্মোত্তর দেশ কৌশিকী দেশ, তাম্রলিপ্ত সুহ্ম। রাজমহল পাহাড়কে বিন্ধ্যাচলের পূর্বসীমা ধরা হয়েছে। যখন যবন ও হূণেরা ভারতের পশ্চিমোত্তর পার্বত্য দেশে বাস করত, তখন পূবদিকে ছিল মগধ, বিদেহ, ব্রহ্মোত্তর, পৌণ্ড্র (উত্তরবঙ্গ), প্রাগ্‌জ্যোতিষ (আসাম), প্রবঙ্গ বঙ্গেয় (দক্ষিণবঙ্গ), মালদ (মালদহ)। মার্কণ্ডেয় পুরাণে (৫৭অ) বৈতরণী নদী বিন্ধ্যপাদ থেকে প্রসূত। উৎকল এই নদীর দেশ, কলিঙ্গ দক্ষিণ দেশে। অর্থাৎ প্রাচীনকালে ছোটনাগপুরের দক্ষিণ দেশকে বলত কলিঙ্গ, পরে কলিঙ্গের উত্তর-পূর্বভাগের নাম হয় উৎকল। উত্তর-কলিঙ্গ থেকে উৎকল। কালিদাসের 'রঘুবংশে' রঘু দিগ্‌বিজয়ে বেরিয়ে সুহ্ম দিয়ে কপিশা পার হয়ে উৎকলে গিয়েছিলেন। কপিশা নদীকে কংসাবতী বা কাঁসাই বলা হয়েছে, কিন্তু সুবর্ণরেখাও হতে পারে। কালিদাসের বর্ণনা থেকে মনে হয়, রঘু বঙ্গ থেকে সুহ্মে ফিরে এসে পশ্চিমে সুবর্ণরেখা পার হয়ে উৎকলে গিয়েছিলেন।

গঙ্গাসাগর-সঙ্গম ও প্রাচীন গঙ্গা-নগর

গ্রীক লেখকরা পূর্বভারতের দুটি দেশের নাম করেছেন—গঙ্গারিডি (Gangaridae) ও প্রাসী (Prasi)। 'প্রাসী' হল 'প্রাচী' বা প্রাচ্যদেশ। 'গঙ্গারিডি' নাম মনে হয় সংস্কৃত 'গঙ্গারাষ্ট্র', 'গঙ্গারাঢ়া' বা 'গঙ্গাহৃদয়' নামের গ্রীক বিকৃতি। গঙ্গারিডি ও প্রাচী স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করার কারণ, তাদের রাষ্ট্রিক ও জানপদ-স্বাতন্ত্র্য তখন অস্বীকার্য ছিল না। মগধের মৌর্য রাজারা গঙ্গারিডি ও প্রাচী, উভয় রাজ্যের রাজা ছিলেন। গ্রীক ভৌগোলিক টলেমি (Ptolemy) বলেছেন যে গঙ্গার মুখের সমস্ত অঞ্চল জুড়ে গঙ্গারিডিদের বাস ছিল এবং তাদের রাজধানীর নাম ছিল গাঙ্গী (Gange)। গঙ্গানগর বলে কোন নগর ছিল বোঝা যায়। দক্ষিণবঙ্গের ব-দ্বীপাঞ্চল জুড়ে গঙ্গারিডিদের বাস ছিল। দ্বিতীয় খৃষ্টাব্দেই তাদের নিজেদের রাজধানী ছিল গঙ্গা নামে। টলেমি এই গঙ্গানগরের অক্ষাংশ (Latitude) ও দ্রাঘিমার (Longitude) যে নির্দেশ দিয়ে গেছেন, তাতে তার ভৌগোলিক অবস্থান সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা করা যায়। মনে হয়, বর্তমান গঙ্গাসাগর বা গঙ্গাসাগরসঙ্গমের কাছে এই গঙ্গানগর ছিল।[১] চতুর্থ খৃষ্টাব্দে গুপ্তযুগের আগেই

১ Dr. Dinesh Chandra Sircar: 'The City of Ganga', The Proceedings of the Indian History Congress, 1947.

গঙ্গাসাগর-তীর্থের প্রসিদ্ধি ছিল। মহাভারতের (বনপর্বে) তীর্থযাত্রা বিবরণে গঙ্গাসাগরকে বিখ্যাত তীর্থ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। রাষ্ট্রিক ও ভৌগোলিক অবনতির ফলে গঙ্গাসাগর যাত্রা ক্রমে বিঘ্নবহুল হয়ে ওঠে এবং সমুদ্রের ভাঙা-গড়ায় গঙ্গা-নগরও ধ্বংস হয়ে যায়। ১৮৪১-৪২ সাল পর্যন্ত গঙ্গাসাগরে যে প্রাচীন দু একটি দেবালয় ও অন্যান্য নিদর্শন ছিল, তাও পরে সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে যায়।[১]

রাঢ়দেশ ও সুহ্মদেশ পরে উত্তররাঢ় ও দক্ষিণরাঢ়ে বিভক্ত হয় এবং তার অন্তর্গত বিভিন্ন ভুক্তি ও মণ্ডলেরও সীমানা-বদল হয়। সব ভুক্তি ও মণ্ডলের বিস্তারিত বিবরণ এখানে অনাবশ্যক। এখানে কয়েকটি ভুক্তি সম্বন্ধে কিছু বলব। বর্ধমানভুক্তির উত্তর সীমা অজয়, পূর্ব ও দক্ষিণ সীমা ভাগীরথী। কিন্তু বর্ধমানভুক্তির পশ্চিম সীমা কি ছিল? অটবী বা অরণ্য। এই অরণ্যের খানিকটা ছিল রাঢ়ে, খানিকটা কলিঙ্গে। রাঢ়দেশ থেকে কলিঙ্গে যাবার পথও অবশ্য ছিল। সেই পথকে বলা হত 'দণ্ড'। বৃক্ষের দণ্ড বা কাণ্ড থেকে যেমন শাখা হয়, তেমনি বড় পথের (দণ্ডের) পাশ দিয়ে শাখা-পথ বেরোয়। ওড়িয়া ভাষায় এই অর্থে 'দাণ্ড' বা দণ্ড শব্দ বহুপ্রচলিত। দাঁতন-মেদিনীপুর-গড়বেতার পথ মেদিনীপুর জেলাকে 'দণ্ড'-রূপে পূর্ব-পশ্চিম দুইভাগে ভাগ করেছে। মেদিনীপুর শহরের ছয় মাইল উত্তরে কর্ণগড়ে দণ্ডেশ্বর শিব প্রতিষ্ঠিত। এই শিব দণ্ড-পথের দেবতা বা ঈশ্বর। গড়বেতার উত্তরে বিষ্ণুপুর বাঁকুড়া হয়ে পথটি উত্তর-পশ্চিম দিকে চলে গেছে। কিন্তু এই পথ বা এর পশ্চিমের চাইবাসা-পুরুলিয়ার পথ দিয়ে রাঢ়ে যাওয়া যেত না। উত্তররাঢ় থেকে দণ্ডভুক্তি যাবার চারটি পথ ছিল—রাণীগঞ্জ-গঙ্গাজলঘাটি-বাঁকুড়া, কাঁকসা-সোনামুখী-বিষ্ণুপুর, বর্ধমান-উচালন-শ্যামবাজার-গড়বেতা, বর্ধমান-উচালন-শ্যামবাজার-ক্ষীরপাই-মেদিনীপুর। এই চারটি পথের একটি ছিল আসল 'দণ্ডে'র অংশ এবং প্রাচীন দণ্ডভুক্তির মধ্য দিয়ে 'দণ্ড' বিসর্পিত ছিল। তার পশ্চিমে ছিল কলিঙ্গদেশ। দণ্ডভুক্তির পূর্বসীমা বোধ হয় দ্বারকেশ্বর এবং দক্ষিণ সীমা সুবর্ণরেখা ও সাগর ছিল।[২]

পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি প্রাচীন 'ভুক্তি'

---

১ ১৮৪১ সালে "Friend of India" পত্রিকায় (Vol. VII) গঙ্গাসাগর মেলার একটি মনোজ্ঞ বিবরণ প্রকাশিত হয়। তাতে এই ধ্বংসের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

২ যোগেশচন্দ্র রায়: 'বঙ্গের প্রাচীন বিভাগ', সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৪০, দ্বিতীয় সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

মুদ্গাগিরি
চম্পা
গৌড়
রামাবতী
কর্ণসুবর্ণ
কেন্দুবিল্ব
পিঙ্গল
নবদ্বীপ
বর্ধমান
ত্রিবেণী
বেতড়
তাম্রলিপ্তি
প্রাচীন
রাঢ় দেশ
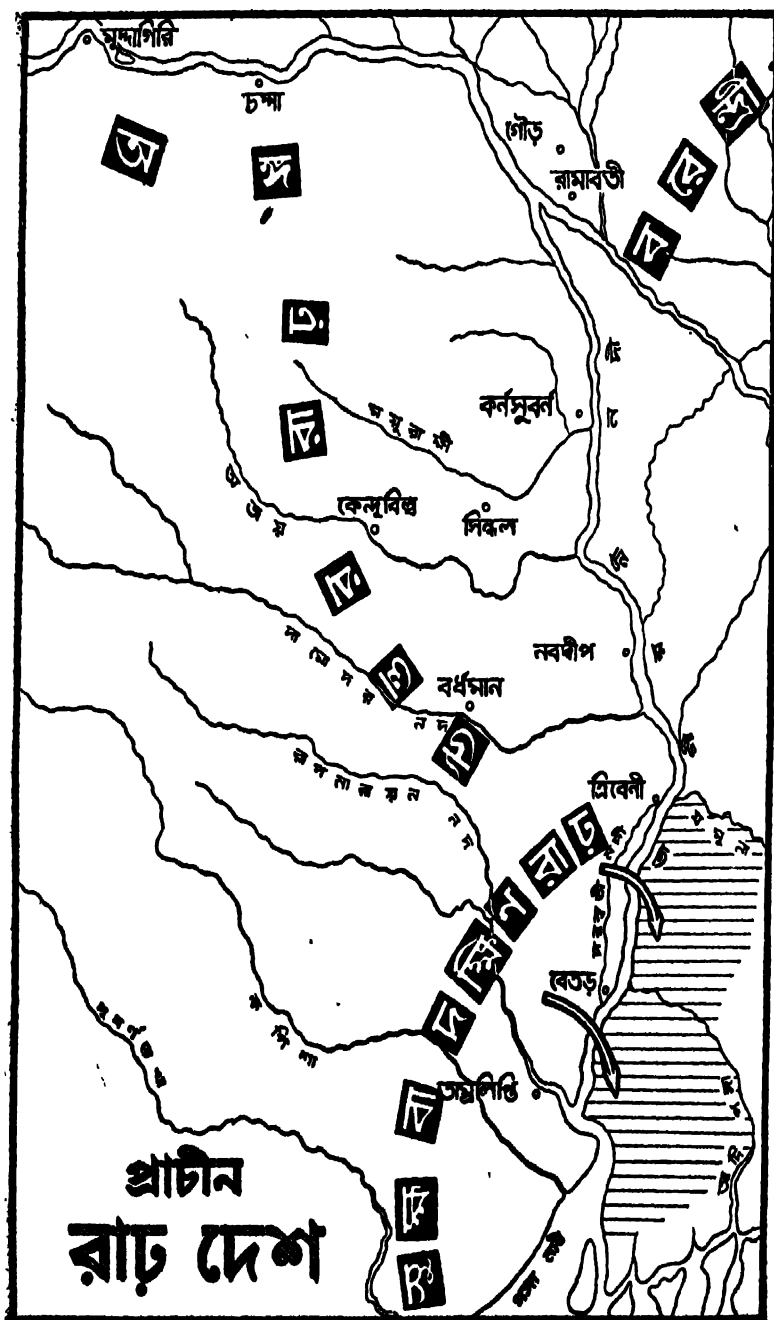
পৌণ্ড্রবর্ধন বা পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির সীমানা বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। প্রাচীন গৌড়রাজ্যের অন্তর্গত এতবড় ভুক্তি আর দ্বিতীয় ছিল না। উত্তরে হিমালয়-শিখর থেকে দক্ষিণে সুন্দরবনের (চব্বিশ-পরগণার) খাড়ি অঞ্চল পর্যন্ত ছিল পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির সীমানা। বহু 'মণ্ডল' ও 'বিষয়' এই ভুক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল। ভাগীরথী-গঙ্গার পূর্বতীরের পশ্চিমবঙ্গের বিশাল অঞ্চল ছিল পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির মধ্যে। তার মধ্যে খাড়ি-মণ্ডল অন্যতম। গঙ্গা দুইভাগে খাড়িমণ্ডলকে বিভক্ত করত। পূর্বতীরের নাম ছিল পূর্বখাড়ি। দক্ষিণ চব্বিশ-পরগণায় 'খাড়ি'নামে গ্রাম আছে (৬২৯-৬৩২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। পশ্চিমতীরে ছিল পশ্চিম-খাড়ি (সম্ভবত হাওড়া জেলায়)। 'খাড়ি' শব্দই সংস্কৃতে 'খাটিকা' হয়েছে।

লক্ষ্মণসেনের শক্তিপুর-শাসনে 'কঙ্কগ্রামভুক্তি' নামে নতুন ভুক্তির নাম পাওয়া যায়—"কঙ্কগ্রামভুক্ত্যন্তঃপাতিদক্ষিণবীথ্যাং উত্তররাঢ়ায়াং।" দ্বাদশ শতাব্দীর শেষদিকের কথা। উত্তররাঢ়ের সঙ্গে কঙ্কগ্রামভুক্তির সম্বন্ধ ছিল বলে মনে হয়। কেউ বলেন, কঙ্কগ্রাম হল রাজমহলের কাছে কঙ্কজোল-কাঁকজোল। কেউ বলেন, মুর্শিদাবাদ জেলার দক্ষিণে, কান্দী মহকুমায়, ভরতপুর থানার অধীন 'কাগ্রাম'-ই প্রাচীন কঙ্কগ্রাম।

জনপদ-বিভাগের এই প্রাচীন ইতিহাস থেকে বোঝা যায়, শাসনব্যবস্থার সুবিধার জন্য হিন্দুযুগেও ভৌগোলিক সীমানার পরিবর্তন হয়েছে। দশম শতাব্দীর ইরদা তাম্রশাসনে দেখা যায়, দণ্ডভুক্তি ছিল বর্ধমানভুক্তির অন্তর্ভুক্ত। মেদিনীপুরের দাঁতন অঞ্চলই প্রাচীন দণ্ডভুক্তি। পরে দণ্ডভুক্তি উৎকলভুক্ত হয়। দশম শতাব্দী পর্যন্ত মেদিনীপুরের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ, সুবর্ণরেখার বহু দূর তীরবর্তী অঞ্চল (হয়ত বালাসোর জেলা-সহ) বর্ধমানভুক্তির মধ্যে ছিল। একাদশ শতাব্দীতে ওড়িয়া রাজা রাজেন্দ্র চোড়গঙ্গ দক্ষিণ-রাঢ় ও উত্তর-রাঢ় জয় করে, বর্ধমান থেকে ত্রিবেণী পর্যন্ত অঞ্চলে কর (ট্যাক্স) সংগ্রহ করেন। কবি ঘনরাম লিখে গেছেন, বর্ধমান নগরের দক্ষিণে দামোদর পার হয়ে এক 'উড়ের গড়' ছিল। এরকম ওড়িয়া গড় ও গ্রাম পশ্চিমবঙ্গে একাধিক দেখেছি। উৎকলরাজাদের পশ্চিমবঙ্গে এই সাময়িক আধিপত্য-বিস্তারের সময় থেকেই মনে হয়, দণ্ডভুক্তি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় বর্ধমান-ভুক্তি থেকে। সুতরাং কেবল আভ্যন্তরিক শাসনব্যবস্থার জন্য নয়, অনেক

সময় প্রতিবেশী রাজাদের কর্তৃত্ব বিস্তারের জন্যও প্রাচীন জনপদের নাম-বদল ও সীমানা-বদল হয়েছে।

হিন্দুযুগের 'ভুক্তি' 'মণ্ডল' 'বিষয়' মুসলমানযুগের 'সরকার' 'মহল' 'পরগণা' 'চাক্‌লা' ইত্যাদি বিভাগে পরিবর্তিত হয়। আমাদের আলোচ্য 'পশ্চিমবঙ্গ' প্রধানত জলেশ্বর, মদারণ, সাতগাঁও, সালিমাবাদ, শরিফাবাদ ও ঔদুম্বর সরকারের অন্তর্গত ছিল। মুসলমানযুগে বর্তমান 'জিলা' নাম বা বিভাগ হয়নি। ইংরেজযুগে বিভাগের সীমানা বদলে যায় এবং জিলার নামকরণ হয়। আজও আমরা ইংরেজযুগের ভৌগোলিক উত্তরাধিকার বহন করছি এবং আধুনিক যুগে আমাদের জাতীয় স্বাতন্ত্র্যবোধ প্রখর হয়েছে বলে আমরা এই জিলা-সীমানার সঙ্গে অনেক সময় একটা জিলাগত সংস্কৃতিরও স্বাতন্ত্র্য-সীমানা টানতে চাই। কিন্তু সংস্কৃতিক্ষেত্রে এরকম কোন সঙ্কীর্ণ সীমানা টানা যে ইতিহাসসম্মত নয়, পশ্চিমবঙ্গের ভৌগোলিক ইতিহাসের ধারাই তার সাক্ষী।

মুসলমানযুগ ও বৃটিশযুগ

গ্রামপ্রদক্ষিণ

বাঁকুড়া জেলা
০ ৪ ৮ ১২ ১৬ মাইল
রেলপথ
শালতোড়
মেজিয়া
বড়জোড়া
সোনামুখী
ছাতনা
বাঁকুড়া
বাহুলাড়া
পাত্রসায়র
বর্ধমান
ইন্দপুর
বিষ্ণুপুর
ময়নাপুর
রানীবাঁধ
সিমলাপাল
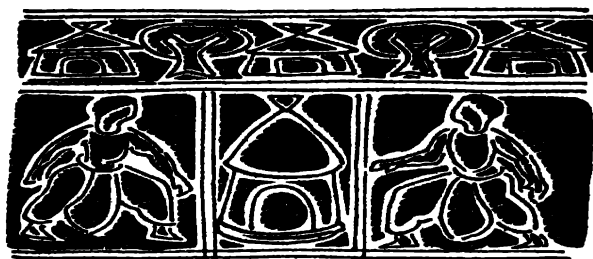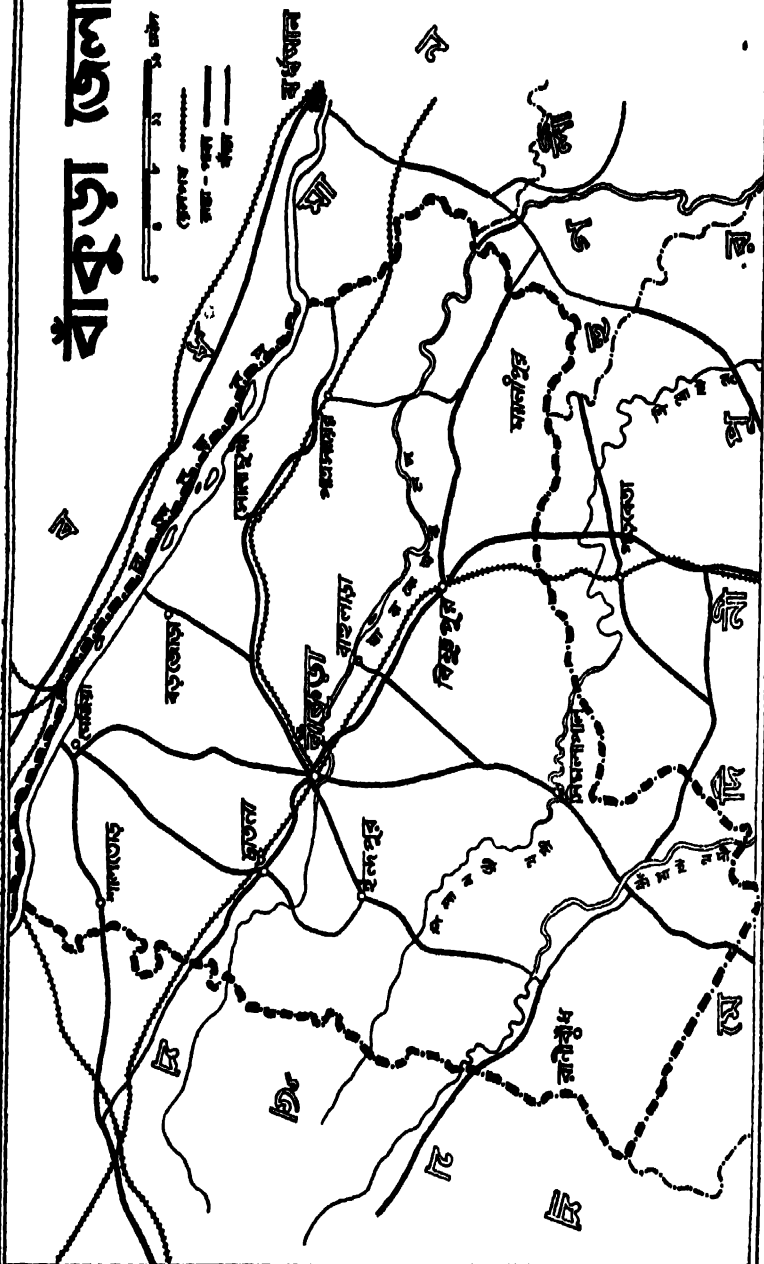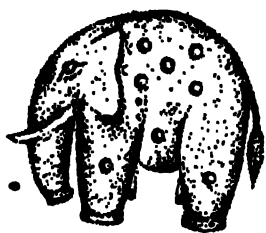
বাঁকুড়া

প্রাচীন রাঢ়দেশ

মহাভারতের সভাপর্বে ভীমসেনের দিগ্বিজয়প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, বীর্যবান পাণ্ডুনন্দন বিদেহ দেশে অবস্থান করে, ইন্দ্রপর্বত-সন্নিহিত কিরাত রাজাদের পরাজিত করলেন। পরে সুহ্ম ও প্রসুহ্মদের যুদ্ধে জয় করে মগধের দিকে অভিযান করলেন। মোদাগিরির রাজা, পুণ্ড্রাধিপ বাসুদেব ও কৌশিকী-কচ্ছের রাজা মহৌজাকে নির্জিত করে ভীম বঙ্গরাজ্যের দিকে ধাবমান হলেন। অতঃপর তাম্রলিপ্তপতি, কর্বটেশ্বর, সুহ্মরাজ ও সাগরবাসী ম্লেচ্ছদেরও তিনি জয় করলেন। নীলকণ্ঠ বলেছেন, মহাভারতের এই সুহ্মই রাঢ়া বা রাঢ়দেশ।

প্রাচীন জৈনসূত্রেও রাঢ়দেশের বিবরণ আছে। 'আচারাঙ্গসূত্রে' 'লাঢ়' বা রাঢ়দেশকে বলা হয়েছে জনপথহীন বনভূমি। রাঢ়ের প্রাচীন অধিবাসীদের রূঢ় ও বর্বর বলেও বর্ণনা করা হয়েছে। রাঢ়ের দু'টি বিভাগের নাম—বজ্জভূমি, সুহ্মভূমি। জৈন মহাবীর রাঢ়দেশে ভ্রমণকালে পদে পদে বর্বর অধিবাসীদের সম্মুখীন হতেন এবং তারা চু-চু করে তাঁর পিছনে কুকুর লেলিয়ে দিত। অবশ্য খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে মহাবীর স্বয়ং রাঢ়দেশে ভ্রমণ করেছিলেন কিনা বলা যায় না, তবে জৈনশ্রমণরা যে করেছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। হয়ত তাঁদেরই ধর্মপ্রচার-পর্যটন স্মরণ করে সূত্রকাররা এই ধরনের কাহিনী রচনা করেছেন। 'মহাবংশেও' রাঢ়দেশ সম্বন্ধে এই ধরনের কাহিনী লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। রাঢ়দেশে বন্যজন্তু ও আদিম অধিবাসীরা বাস করত

এবং প্রাচীন বঙ্গদেশের লোকেরাই এই রাঢ়দেশ উদ্ধার করেছিলেন। কাহিনীটি এই: রাঢ়ের অরণ্যভূমির সিংহরাজা বঙ্গের রাজকন্যাকে জোর করে হরণ করে নিয়ে গিয়ে বিবাহ করেন এবং তাঁদের মিলনের পর যে সন্তান জন্মগ্রহণ করে সেই রাজকুমারই রাঢ়ের জঙ্গলে গ্রাম ও লোকালয় স্থাপন করেন। বঙ্গ থেকে মগধ পর্যন্ত বিস্তৃত ক্যারাভান-পথের উপর রাঢ়দেশ অবস্থিত।ক

শুধু জৈনগ্রন্থে নয়, বৌদ্ধগ্রন্থেও সুহ্মদেশের কথা বলা হয়েছে। 'সংযুক্ত নিকায়' ও 'তেলপত্ত জাতকে' সুহ্মের অন্তর্গত দেশক বা শেতক অঞ্চলে স্বয়ং গৌতম বুদ্ধের ভ্রমণের বিবরণ আছে। মহাবীরের মতন গৌতম বুদ্ধেরও রাঢ়দেশে ভ্রমণ সম্বন্ধে সত্য-মিথ্যা কিছু বলা যায় না। হয়ত বৌদ্ধ শ্রমণদের স্মরণ করেই কাহিনী রচিত হয়েছে। কিন্তু যাই হোক, জৈন ও বৌদ্ধগ্রন্থের এই সব বর্ণনা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, রাঢ়দেশে রূঢ় বর্বর লোকের বাস ছিল বেশি এবং দেশটি জনপথহীন গভীর অরণ্যে ঢাকা ছিল। রূঢ় কর্কশ চোয়াড়দের দেশ বলেই বোধ হয় লাঢ়-রাঢ় নাম হয়েছে। এদেশের আদি-বাসীদেরই রূঢ় ও চোয়াড় বলে অভিহিত করা হয়েছে মনে হয়।

রাঢ়দেশ যে বাংলার আদিবাসীপ্রধান দেশ, এইটাই আসল কথা। দ্বিতীয় কথা হল, এই রাঢ়দেশে আর্যসভ্যতার প্রসার হয়েছে অনেক পরে, বাংলার অন্যান্য অঞ্চল আর্যীকরণের (উত্তরবঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গ ইত্যাদি) পরে। এ কথা বর্ধমান-বীরভূম-বাঁকুড়ার ঐতিহাসিক পটভূমিরূপে বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার, কারণ বর্ধমান-বীরভূম-বাঁকুড়া প্রাচীন সুহ্ম ও রাঢ়দেশেরই অন্তর্গত।

প্রাচীন রাঢ়ের ভৌগোলিক সীমানারও নানারকম ইঙ্গিত পাওয়া যায়। মহাভারতে তমলুক ও সুহ্ম বা রাঢ়দেশকে পৃথক করা হয়েছে (?) কিন্তু 'দশকুমারচরিতে' পরিষ্কার বলা হয়েছে—'সুহ্মেষু দামলিপ্তাহ্বয়স্য নগরস্য'। দামলিপ্তই তাম্রলিপ্ত। ধোয়ীর 'পবনদূত' কাব্যে রাঢ়দেশের এই বর্ণনা পাওয়া যায়—

গঙ্গাবীচিপ্লুত পরিসরঃ সৌধমালাবতংসো
বাস্তত্যুচ্চৈ স্তয়ি রসময়ো বিস্ময়ং সুহ্ম দেশঃ।

ধোয়ী বলছেন, 'যে-দেশের বিস্তীর্ণ অংশ গঙ্গাপ্রবাহের দ্বারা প্লাবিত হয়, যে-দেশ সৌধশ্রেণীর দ্বারা অলঙ্কৃত, সেই রহস্যময় সুহ্মদেশ তোমার মনে বিশেষ

(ক) পূর্বে 'ভূগোল ও ইতিহাস' অধ্যায়ে এবিষয়ে সবিস্তারে আলোচনা করেছি।

বিস্ময় এনে দেবে'। রাজকবি রাজকীয় কল্পনায় রাঢ়দেশকে সৌধশ্রেণী-অলঙ্কৃত মনে করেছেন, কিন্তু উল্লেখযোগ্য হল যে, রাঢ়ের বিস্তীর্ণ অংশ তিনি গঙ্গাপ্লাবিত বলেছেন। পরবর্তীকালের 'দিগ্বিজয়-প্রকাশে' বলা হয়েছে—

গৌড়স্য পশ্চিমে ভাগে বীরদেশস্য পূর্বতঃ।
দামোদরোত্তরে ভাগে সুহ্মদেশঃ প্রকীর্তিতঃ॥

—গৌড়দেশের পশ্চিম, বীরদেশের পূর্ব ও দামোদরের উত্তরপ্রদেশ সুহ্ম নামে কীর্তিত। সমস্ত বর্ণনার ধারা লক্ষ্য করলে দেখা যায়, বর্তমান হুগলী জেলাকেই প্রাচীন সুহ্ম বা রাঢ়দেশের কেন্দ্রস্থল বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং তার সীমানা মেদিনীপুর থেকে বীরভূম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল মনে হয়। বীরভূমির 'বীর' কথা মুণ্ডারী কথা, অর্থ হল 'জঙ্গল'। বীরভূম মানে জঙ্গলভূম। ঝাড়খণ্ড, জঙ্গলমহল ইত্যাদি নামের মধ্যেও জঙ্গলের ইঙ্গিত খুব স্পষ্ট। শ্রীচৈতন্য ছত্রভোগের প্রসিদ্ধ পথ ছেড়ে রায় রামানন্দ ও স্বরূপ দামোদরের সঙ্গে পরামর্শ করে যে বনাকীর্ণ পথ ভেদ করে কাশীধাম অভিমুখে যাত্রা করেছিলেন, 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে' তার এইভাবে বর্ণনা করা হয়েছে :

প্রসিদ্ধ পথ ছাড়ি প্রভু উপপথে চলিলা।
কটক ডাহিনে করি বনে প্রবেশিলা॥
নির্জন বনে চলেন প্রভু কৃষ্ণ নাম লৈয়া।
হস্তী ব্যাঘ্র পথ ছাড়ে প্রভুকে দেখিয়া॥
পালে পালে ব্যাঘ্র হস্তী গণ্ডার শূকরগণ।
তার মধ্যে আবেশে প্রভু করেন গমন॥
ময়ূরাদি পক্ষিগণ প্রভুকে দেখিয়া।
সঙ্গে চলে 'কৃষ্ণ' বলে, নাচে মত্ত হৈয়া॥
'হরিবোল' বলি প্রভু করে উচ্চধ্বনি।
বৃক্ষলতা প্রফুল্লিত সেই ধ্বনি শুনি॥
ঝারিখণ্ডে স্থাবর জঙ্গম আছে যত।
কৃষ্ণনাম দিয়া কৈল প্রেমেতে উন্মত্ত॥

ঝাড়খণ্ড, সিংহভূম, মানভূম, মল্লভূম, সামন্তভূম, বরাহভূম, বীরভূম—পশ্চিম-বাংলার সীমান্ত অঞ্চল। একদিকে ছোটনাগপুর, সাঁওতাল পরগণার

পার্বত্যভূমি ও গভীর অরণ্য, অন্যদিকে শস্যশ্যামলা বাংলার সমতলভূমি—এই দুয়ের মধ্যে রাঢ়দেশ। রাঢ়দেশে তাই আর্যপূর্ব নিষাদ (আদি-অস্ত্রালয়েড) ও দাসদস্যুদের (দ্রাবিড়ভাষী) আধিপত্য। রাঢ়ের বা পশ্চিমবাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে তাই নিষাদ-দস্যু-সংস্কৃতিরও একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে দেখা যায়। উত্তরবঙ্গে যেমন কিরাত-সংস্কৃতির (ইন্দো-মোঙ্গলয়েড) সংমিশ্রণ ঘটেছে হিন্দু সংস্কৃতির সঙ্গে, পশ্চিমবঙ্গে (রাঢ়ে) তেমনি তার সংমিশ্রণ ঘটেছে নিষাদ ও দস্যু-সংস্কৃতির সঙ্গে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণ ও সমন্বয়ের (acculturation) অনুসন্ধানের বিশাল ক্ষেত্র হল রাঢ়দেশ।

বাংলাদেশের বিভিন্ন শ্রেণীর মৎস্যজীবী, ধীবর, বাউরী, হাড়ি, ডোম প্রভৃতি জাতির আধিপত্য এখনও বেশি পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষ করে রাঢ়দেশে। এ আধিপত্য আগে আরও বেশি ছিল মনে হয়। সাম্প্রতিক লোকগণনাতেও দেখা গেছে যে, এই সব জাতির আধিপত্য এখনও বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া হাওড়া, হুগলী, মেদিনীপুর অঞ্চলে (অর্থাৎ রাঢ়দেশে) প্রায় অক্ষুণ্ণ রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে মোট ব্যগ্রক্ষত্রিয়ের সংখ্যা নয় লক্ষের কিছু বেশি, তার মধ্যে শুধু বর্ধমান, বীরভূম ও বাঁকুড়া জেলায় সাড়ে তিন লক্ষের বেশি, অর্থাৎ তিন ভাগের এক ভাগ এবং মেদিনীপুর, হাওড়া ও হুগলীতে সাড়ে চার লক্ষের বেশি। কেবল রাঢ় অঞ্চলেই মোট নয় লক্ষের মধ্যে আট লক্ষের বেশি ধীবরশ্রেণীর লোকের বাস। ধীবররা সকলেই যে এখন মৎস্যজীবী বা মৎস্যব্যবসায়ী, তা নয়। অনেকে কৃষিজীবীও। সকলেই সাধারণভাবে আজ 'ব্যগ্রক্ষত্রিয়' নামে পরিচিত। পশ্চিমবঙ্গে মোট বাউরীদের সংখ্যা হল তিন লক্ষের কিছু বেশি, তার মধ্যে শুধু বর্ধমান-বীরভূম-বাঁকুড়া এই তিনটি জেলাতেই আড়াই লক্ষের বেশি বাউরী বাস করে। পশ্চিমবঙ্গের মোট বাউরীর সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের বেশির বাস বাঁকুড়া জেলায়। ডোমজাতির মোট সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গে এক লক্ষের কিছু বেশি, তার মধ্যে তিন ভাগের দুভাগের বাস বর্ধমান-বীরভূম-বাঁকুড়া জেলায়। তাহলে দেখা যাচ্ছে, ধীবর, বাউরী ও ডোম এই তিনটি জাতির মোট জনসংখ্যার (পশ্চিমবঙ্গে) মধ্যে ধীবর তিন ভাগের একভাগ, বাউরী প্রায় ছয়-ভাগের পাঁচ ভাগ এবং ডোম তিন ভাগের

দুইভাগ কেবল রাঢ়দেশের তিনটি জেলাতেই (বর্ধমান-বীরভূম-বাঁকুড়াতে) বাস করে।[১]

আদিমজাতির মধ্যে বাংলাদেশে সাঁওতালরাই প্রধান। পশ্চিমবঙ্গে সাঁওতাল জাতির মোট জনসংখ্যা প্রায় সাড়ে আট লক্ষ, তার মধ্যে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ সাঁওতালের বাস বর্ধমান-বীরভূম-বাঁকুড়া জেলায় এবং মেদিনীপুর জেলায় দু'লক্ষ। এই চারটি জেলাতেই পশ্চিমবঙ্গের মোট সাঁওতালদের চার-ভাগের তিন-ভাগ বাস করে, তার মধ্যে মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জেলাতেই সর্বাধিক। এই সব জাতিপ্রাধান্যের দিক থেকে দেখা যায় :

বাঁকুড়া জেলা—সাঁওতাল, ডোম ও বাউরীপ্রধান
বর্ধমান জেলা—সাঁওতাল, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, বাউরী ও ডোমপ্রধান
বীরভূম জেলা—সাঁওতাল ও ডোমপ্রধান
মেদিনীপুর জেলা—মাহিষ্য, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, সাঁওতালপ্রধান
হুগলী—মাহিষ্য, ব্যগ্রক্ষত্রিয়প্রধান

'জাতিপ্রাধান্য' অর্থে সব জাতির মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ নয়, তথাকথিত উচ্চবর্ণ-বহির্ভূত প্রধান জাতি। যে কয়েকটি জাতির উল্লেখ করেছি, তার মধ্যে কোন্ জেলায় কোন্ জাতির প্রাধান্য, এই তালিকাটি থেকে তা বোঝা যায়।

নৃবিজ্ঞানীরা বিশেষভাবে অনুসন্ধান করে দেখেছেন যে, বাংলাদেশের ব্যগ্রক্ষত্রিয়, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, সাঁওতাল, মাল-পাহাড়িয়া প্রভৃতির মধ্যে দৈহিক সাদৃশ্য আছে। সামান্য যে পার্থক্য দেখা যায়, তা বিভিন্ন জাতিগত সংমিশ্রণ, দারিদ্র্য ও খাদ্যাভাব ইত্যাদির জন্য হওয়া সম্ভবপর। শুধু পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবের জন্যই কয়েক শতাব্দীর মধ্যে যে একটি জাতির জাতিগত দৈহিক বিশিষ্টতার রীতিমত পরিবর্তন হতে পারে, মাথা ও মুখের চেহারা পর্যন্ত বদলে যেতে পারে, একথা আজ প্রায় প্রত্যেক নৃবিজ্ঞানী স্বীকার করেন। সুতরাং দৈহিক মাপজোখের মধ্যে চুলচেরা সাদৃশ্য বিচার করা অর্থহীন। তার চেয়ে অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য তুলিত সাংস্কৃতিক বিশ্লেষণ। যুগে যুগে আর্থিক শক্তির প্রভাবে বলিষ্ঠ জাতি যত দ্রুত ক্ষীণ দুর্বল জাতিতে পরিণত হয়, তত দ্রুত কোন ঐতিহাসিক শক্তির প্রভাবে কোন জাতির মৌলিক সাংস্কৃতিক উপাদানগুলির

পরিবর্তন হয় না। মৌলিক ও লৌকিক সংস্কৃতির 'কঙ্কাল' দীর্ঘকালস্থায়ী, দৈহিক কঙ্কালের তুলনায়। পশ্চিমবঙ্গের ধীবর জাতির স্ত্রী-পুরুষ-শিশুর চেহারা দেখলেই একথার তাৎপর্য বোঝা যায়। ধীবর, বাউরী, ডোম প্রভৃতি জাতির দারিদ্র্য বর্ণনাতীত। একসময় যারা বাংলার বীর যোদ্ধৃজাতি ছিল, আজ তারা দারিদ্র্যের চাপে প্রায় লুপ্ত হতে চলেছে। কিন্তু তবু তাদের পূজাপার্বণ, আচার-অনুষ্ঠান নিয়ে যে সংস্কৃতি, তার যুগোত্তীর্ণ ধারা আজও প্রায় অবিকৃত অবস্থায় রয়েছে বলা চলে।

বাংলাদেশের ধীবর, ডোম প্রভৃতি জাতির ইতিহাস আজও লেখা হয়নি। অথচ বাংলার লৌকিক সংস্কৃতিতে এদের দান এত বেশি যে, তার বিচার-বিশ্লেষণের অভাবে বাংলার সংস্কৃতির ইতিহাস রচনা অসম্পূর্ণ রয়ে গিয়েছে। বাংলাদেশে ধীবর ও ডোমদের কেন্দ্র করে অসংখ্য কিংবদন্তী, কাহিনী ও লোকপুরাণের সৃষ্টি হয়েছে। কত রাজবংশের উৎপত্তির কাহিনীর সঙ্গে যে বাংলার ধীবররা জড়িত রয়েছে আজও তার ঠিক নেই। মল্লভূমের রাজাদের কাহিনীও ধীবর-সংশ্লিষ্ট। যুদ্ধবিগ্রহে শৌর্যবীরত্বের লোককথাও এই সব জাতির ঐতিহ্যমূল থেকে উৎসারিত। বাঙালীর সংস্কৃতির অনেকটা ক্ষেত্র এরাই অধিকার করে আছে। ধীবরদের তবু প্রতিষ্ঠা আছে, কিন্তু ডোমরা সমাজে দীর্ঘকাল অনাদৃত ও অবজ্ঞাত। বাংলার অনেক লোকশিল্প, বাঙালীর বল বীর্য বীরত্ব, বাংলার লোকোৎসব, নানাদিক থেকে এই সব জাতির কাছে ঋণী। কেন ও কি জন্য বাঙালীর সংস্কৃতিতে এত লৌকিক উপকরণের প্রাচুর্য, তার উত্তর অনেকাংশে রাঢ়দেশের ইতিহাস থেকেই (উত্তরবঙ্গ ছাড়া) পাওয়া যায়। রাঢ়দেশে বিভিন্ন জাতির আনুপাতিক প্রাধান্য, সাঁওতাল প্রভৃতি আদিম জাতির সঙ্গে তাদের শারীরিক ও সাংস্কৃতিক সাদৃশ্য থেকে বাঙালীর সংস্কৃতির লৌকিক উৎসের আভাষ পাওয়া যায়। রাঢ়দেশের এই ইতিহাস শিক্ষিত 'অ্যাকাডেমিক' ঐতিহাসিকরা কেউ অনুসন্ধান ও লিপিবদ্ধ করা তেমন প্রয়োজন বোধ করেননি। ইতিহাসে সাধারণত লোকসাধারণের কোন ভূমিকাও নেই, স্থানও নেই। সেখানে সব রাজা-রাজড়ার বিরাট কাণ্ডকারখানার তথ্য-সমারোহ। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের অখ্যাত লোকশিল্পীরা এই ইতিহাসটুকু পুরাণকথা, কবিগান, ছড়াকাহিনীও বিচিত্র সব লোকোৎসবের মধ্যে বাঁচিয়ে রেখেছেন। এই ইতিহাসের জীবন্ত চিত্র পোড়া-

মাটির ইটের উপর খোদাই করে রেখে গেছেন রাঢ়ের মৃৎশিল্পীরা। পশ্চিম-বঙ্গের মন্দিরের গায়ে সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত অশ্বারোহী, ধনুর্বাণধারী ও মল্লবীরদের চিত্র পোড়ামাটির ইটের গায়ে শিল্পীরা খোদাই করে রেখেছেন। বোঝা যায়, তখনও বাংলার স্থানীয় সামন্ত রাজাদের সিংহাসন ইংরেজের কামান-বিস্ফোরণে টলমল করে ওঠেনি। তখনও ধীবর, ডোম প্রভৃতি জাতি-উপজাতির লোকেরা বীর যোদ্ধা ছিল, বাঙালীর গৌরব ছিল। ইতিহাসের কয়েকটি জীর্ণ ছিন্নপত্রের মতন বিষ্ণুপুরের মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ চিত্রগুলি দেখতে দেখতে বাঙালীর অতীত দিনের এই সব স্মৃতি ভেসে উঠছিল চোখের সামনে। সেই 'অতীত' দিন সোনার দিন ছিল, এমন কথা বলছি না। তবু তখন বাঙালীর জাতীয় চরিত্রের এমন কতকগুলি গুণ ছিল, যা আজ স্মরণ করা প্রয়োজন। অতীত-বিস্মৃত ও ঐতিহ্য-বিস্মৃত জাতি সুন্দর 'ভবিষ্যৎ' গড়ে তুলতে পারে না। এই কথা মনে করেই পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম-প্রদক্ষিণের এই বিবরণ লিপিবদ্ধ করছি।

দলমর্দন বা দলমাদল কামান এখন নিস্তব্ধ। ভাস্কর পণ্ডিতের দুর্ধর্ষ মারাঠা-বাহিনীর বিরুদ্ধে দলমর্দন গর্জন করে উঠেছিল মল্লভূমির রাজধানী বিষ্ণুপুরের দুর্গ থেকে। মল্লভূমবাসীর বিশ্বাস, রাজদেবতা মদনমোহন স্বহস্তে দলমাদল ধারণ করে বন-বিষ্ণুপুরের অরণ্যভূমি কাঁপিয়ে তুলেছিলেন। বাংলার দলমাদলের গর্জনে মারাঠা দস্যুরা বিপর্যস্ত হয়ে অরণ্যে আত্মগোপন করেছিল। তারপর আরও অনেক কামান গর্জে উঠেছে মল্লভূমি থেকে, বিদেশী বৃটিশ দস্যু-দের বিরুদ্ধে। প্রায় এক শতাব্দী ধরে উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত সমগ্র মল্লভূম, বীরভূম, ঝাড়খণ্ড, সিংহভূম, মানভূম অঞ্চলে শত শত কামান গর্জন করেছে বৃটিশ সিংহের সামনে। আজ সব নিস্তব্ধ। দলমাদল ঐতিহাসিক কৌতূহলের বস্তুরূপে সংরক্ষিত, বাকি অধিকাংশই মল্লভূমের ভূগর্ভে সমাধিস্থ। স্বাধীন বাংলার এক অতীত যুগের স্বপ্নপুরী বিষ্ণুপুর।

মধ্যরাত্রে বিষ্ণুপুর স্টেশন থেকে গড়দরজার কাছে দেওয়ান-বাড়ি যাবার পথে বারবার আমার এই কথা মনে হচ্ছিল। বাংলার অন্যান্য মফঃস্বল শহরের সঙ্গে বিষ্ণুপুরের একটা পার্থক্য আছে, প্রতি মুহূর্তে সেটা অনুভব করছিলাম। শহরের একাংশের নাম 'মারাঠা ছাউনি' এবং তারই দক্ষিণে 'বীর দরজা', প্রাচীন দুর্গের প্রবেশদ্বার। মাঝরাতে সমস্ত শহর নিঝুম, নিস্তব্ধ। মনে হচ্ছিল যেন ঐতিহাসিক স্মৃতির স্বপ্ন দেখছে ঘুমন্ত বিষ্ণুপুর এবং সর্বাঙ্গ তার স্বপ্নস্পর্শে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে। ইতিহাস অনেক সময় কাব্যের চেয়েও বেশি রোমান্টিক মনে হয়, অন্তত বিষ্ণুপুরে আমার তাই মনে হয়েছে। দেওয়ান-বাড়ির অতিথি, সুতরাং গড়দরজার কাছে বিষ্ণুপুরের ঐতিহাসিক স্মৃতির ভগ্ন-স্তূপের কোলে আমি আশ্রয় নিয়েছি, রোমাঞ্চ হওয়া স্বাভাবিক। মা-দিদিমাদের কাছে বসে গল্প শুনেছি, অতীত দিনের নানারকমের টুকরো কথা—রাজার কথা, রাজকর্মচারীদের কথা, বিষ্ণুপুরের বিচিত্র সব উৎসব-পার্বণের কথা, ছড়া প্রবাদ, আচার অনুষ্ঠানের কথা। যত শুনেছি ও দেখেছি তত মনে হয়েছে, বিষ্ণুপুরকে যাঁরা 'ইন্দ্রপুরী' বলে গেছেন তাঁরা শুধু বড় বড় বাঁধ, গড়, দুর্গ ও মন্দির দেখে বলেননি, বিষ্ণুপুরবাসীর উৎসব-পার্বণ শিল্পকলায় অপূর্ব মানসৈশ্বর্যের

বিকাশ দেখেও বলেছিলেন। বড় বড় ইমারত, অট্টালিকা, স্তূপীকৃত ইটের রুচিহীন প্রাসাদ বা গৃহ বিষ্ণুপুর শহরে খুব বেশি নেই, বোধ হয় অন্যান্য মফঃস্বল শহরের তুলনায় সবচেয়ে কম। মারওয়াড়ী বণিকরা অভিযান করলেও কদর্য ইটের স্তূপে বিষ্ণুপুর আজও ছেয়ে যায়নি। এখনও বিষ্ণুপুরে ছবির মতন খড়ের বাঁকানো চালের ইটের ও মাটির ঘর (বাংলা ঘর) দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়, মনে হয় বিষ্ণুপুরে বাঙালী আজও বেঁচে আছে, অর্থের আভিজাত্যে তার রুচি বিকৃত হয়নি। বাংলার ঐতিহ্যের প্রতি বিষ্ণুপুরের যেন একটা নাড়ীর টান আছে বলে মনে হয়। শুধু বিষ্ণুপুরের লোকালয় নয়, দেবালয়গুলি দেখেও তাই মনে হয়।

বিষ্ণুপুরের রাজাদের সম্বন্ধে একাধিক কিংবদন্তী আছে। "নহ্যমূলাঃ জনশ্রুতিঃ"। জনশ্রুতি বা কিংবদন্তীর মূল একটা থাকে, কিন্তু কালক্রমে সেই মূল থেকে এত শাখাপ্রশাখা গজিয়ে ওঠে যে, শেষ পর্যন্ত মূলটি আর খুঁজে পাওয়া যায় না। বৃদ্ধ পণ্ডিতের কাছ থেকে হাণ্টার সাহেব রাজবংশের উৎপত্তির যে কাহিনী সংগ্রহ করেছিলেন ('স্ট্যাটিস্টিকাল অ্যাকাউণ্ট অফ্ বেঙ্গল' এবং 'অ্যানাল্স অফ্ রুরাল বেঙ্গল' গ্রন্থে) তার সঙ্গে 'গেজেটিয়ারের' জন্য ও'মালী সংগৃহীত (রাজবংশের নথিপত্র থেকে) বিবরণের মৌলিক পার্থক্য আছে। বেশ বোঝা যায়, প্রাচীন কিংবদন্তী ক্রমে রূপান্তরিত হয়েছে। পরবর্তীকালে মল্লরাজারা যখন সভাপণ্ডিতকে দিয়ে বংশবৃত্তান্ত রচনা করিয়েছেন, তখন তার ভিতর থেকে ধীবর ও আদিবাসীদের সঙ্গে আদিমল্লের সম্পর্কের সমস্ত কাহিনী ছেঁটে ফেলে ব্রাহ্মণ-কায়স্থদের কথা যোগ করেছেন এবং তাঁরা যে উত্তরভারতের রাজপুত বংশজাত তাও ভালভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। বাংলা-দেশের এই সব 'রাজবংশচরিত' ও 'কুলপঞ্জিকার' একটা উপসর্গ মনোবিজ্ঞানীদের সহজেই নজরে পড়বে—সেটার নামকরণ করা যায় 'ক্ষত্রিয়-কমপ্লেক্স' ও 'রাজপুত-কমপ্লেক্স'। হিন্দুসমাজের বর্ণবৈষম্যের এটা স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। অধিকাংশ ঐতিহাসিক, সমাজতত্ত্ববিদ্ ও জাতিতত্ত্ববিদ্‌রা এই সব বংশচরিত ও কুলপঞ্জীর ঐতিহাসিকতা অস্বীকার করেন। এগুলির যে একেবারেই কোন ঐতিহাসিক মূল্য নেই তা নয়, যথেষ্ট মূল্য আছে, কারণ বংশোৎপত্তির পরস্পর-বিরোধী কাহিনীগুলি বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করলে তার মধ্যে অনেক গোপন তথ্যের, অজানা ইতিহাসের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। আপাতত

বিষ্ণুপুর রাজবংশ প্রসঙ্গে তা করবার প্রয়োজন নেই। একদল ঐতিহাসিক বিষ্ণুপুরের রাজাদের স্থানীয় অধিবাসীদের বংশধর বলে মনে করেন। আমারও ব্যক্তিগত ধারণা তাই এবং তা নিয়ে বিতর্কের প্রয়োজন নেই। সবচেয়ে বড় কথা, বিষ্ণুপুরের রাজারা বাঙালী এবং পশ্চিমবঙ্গের স্বাধীন বাঙালী সামন্ত রাজাদের মধ্যে নিঃসন্দেহে অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজা। অবশ্য 'একদা' ছিলেন, এখন 'রাজা' নামে আছেন, 'রাজত্ব' নামেও নেই।

বিষ্ণুপুরের রাজাদের শৌর্যবীর্যের কাহিনী, স্বাধীনতা-প্রীতির কাহিনী, সাংস্কৃতিক বদান্যতা, ধর্মানুরাগ ও উদারতার কাহিনী আজ রূপকথার মতন অবিশ্বাস্য মনে হলেও, এককালে ঐতিহাসিক সত্য ছিল। সুবিস্তৃত মল্লভূমের স্বাধীন রাজা ছিলেন তাঁরা, 'মল্লাবনীনাথ' বলে পরিচিত। মল্লভূমের সীমানা তখন উত্তরে সাঁওতাল-পরগণার দামিন-ই-কো, দক্ষিণে মেদিনীপুরের একাংশ, পূর্বে বর্ধমানের একাংশ এবং পশ্চিমে পঞ্চকোট, মানভূম ও ছোটনাগপুরের অনেকটা অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাঁরা যে মল্লবীর ছিলেন তা তাঁদের আদিমল্ল, জয়মল্ল, কালুমল্ল, বীর হাম্বীর প্রভৃতি নাম থেকেই বোঝা যায়। হিন্দুযুগে মল্লরাজাদের সঠিক কোন ইতিহাস জানা যায় না। মনে হয়, বাংলার পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের অন্যান্য স্বাধীন স্থানীয় রাজাদের মতন তাঁরাও রাজত্ব করতেন এবং প্রতিবেশী দুর্বল রাজা, গোষ্ঠী ও কৌম (ট্রাইব্যাল) সর্দারদের পরাজিত করে ক্রমে রাজ্যের সীমানা বিস্তৃত করেছেন। সীমান্তের আদিবাসী ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট জাতির মধ্যে মল্লরাজাদের অসাধারণ প্রতিপত্তি ছিল এবং সেইজন্য তাদেরই রাজা বলে তাঁরা পরিচিত ছিলেন। বাংলার আদিবাসী, ধীবর, ডোম প্রভৃতি জাতি বীর যোদ্ধার জাতি এবং বাঙ্গালীর বীরত্বের কাহিনীর প্রধান নায়ক তারাই। আজও মধ্যে মধ্যে বীরভূম বিষ্ণুপুর অঞ্চলে ডোমদের কাড়া-নাকাড়া বাজিয়ে পথে বেরুতে দেখা যায়। পশ্চিমবঙ্গের ধর্ম-মঙ্গল কাব্যে যুদ্ধযাত্রার চমৎকার বর্ণনা আছে। এই সব বর্ণনা থেকে পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দী ও তারও আগেকার যোদ্ধা বীর বাঙালীর ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। মল্লভূমবাসী জনৈক ধর্মমঙ্গল রচয়িতার বর্ণনা থেকে এই বর্ণনা কিছুটা উদ্ধৃত করছি:

গজপৃষ্ঠে ধাঙ ধাঙ বাজে জোড়া দামা
সাজিল ভূপতি রায় মাহুন্তার মামা।

আগে চলে বার ঘণ্টা পতাকা নিশান
ছাব্বিশ হাজার ঘোড়া চলে কানে কান।
সাজিল প্রধান ঢালি বুড়া কুম্ভকার
মত্ত…… ধানুকি কালসার।…
রায়বাঁশ … … ধাইল লাখে লাখ
টমক ধামসা বাজে রণশিঙ্গা ঢাক।
তিন হাজার সেনা সঙ্গে হাথে ধনুঃশর
হাঁড়িয়া চামর বান্ধা বাঁশের উপর।…
রাম রায় চাষা সাজে সমরে প্রচণ্ড
যমকে নাশিতে পারে যুঝ্যা এক দণ্ড।…
ছ' বুড়ি মাদল বাজে তের পণ ঢোল
আগে ধায় বন্দুকি ধানুকি কত কোল।

এর মধ্যে প্রধান ঢালি বৃদ্ধ কুম্ভকার আছে, সাধারণ চাষী আছে, যে যমকে পর্যন্ত দু'দণ্ড যুঝতে পারে, বন্দুকি ও ধানুকি ও আদিবাসী কোল আছে, মাহুত্যার মামা ভূপতি রায় আছে, ছাব্বিশ হাজার অশ্বারোহী, তিন হাজার ধনুর্বাণধারী প্রভৃতি আছে। একেবারে আদর্শ জনসেনাবাহিনী। কোন বিদেশী রাজা বা অপ্রিয় রাজার সাহস হত না এইরকম জনসেনা গঠন করতে। শুধু এই বর্ণনার মধ্যে নয়,

আগে ডোম বাগে ডোম ঘোড়া ডোম সাজে
দাল মেঘর ঘাঘর বাজে

—বাংলাদেশের এই ধরনের জনপ্রিয় ছড়ার মধ্যেও বাংলার জনসেনার স্মৃতি সম্পূর্ণ অক্ষুন্ন রয়েছে। এই সব ছড়ার উৎপত্তি অধিকাংশই পশ্চিমবঙ্গে এবং মনে হয় মল্লভূম অঞ্চলে।

মল্লভূমের রাজাদের স্বাধীন রাজশক্তির আভাস পাওয়া যায় এই সব কাব্যিক বর্ণনা, লোকপ্রবাদ কাহিনী ও ছড়ার মধ্যে। প্রবাদ আছে, রঘুনাথ সিংহ একবার মুর্শিদাবাদের নবাব দরবারে গিয়ে দেখেন যে, নবাবের একটি দুর্ধর্ষ প্রকৃতির ঘোড়াকে স্নান করাবার জন্য ষোলজন অশ্বারোহী ধরে নিয়ে যাচ্ছে। দেখে তিনি বিদ্রূপ করে বলেন: 'একটি ঘোড়ার জন্য ষোলজন লোকের দরকার হল?' নবাব তাঁকে চ্যালেঞ্জ করেন। রঘুনাথ সিংহ

অম্লানবদনে ঘোড়ার পিঠে চড়ে আট দিনের পথ নয় ঘণ্টায় ঝড়ের বেগে ঘুরে এসে বলেন: 'এই নিন আপনার ঘোড়া, বেশ দৌড়য় ভাল!' বিষ্ণুপুরের রাজার রাজস্ব মকুব করে নবাব সসম্মানে তাঁকে বিষ্ণুপুরে পাঠিয়ে দেন। কাহিনী হলেও এ-কাহিনীর বৈশিষ্ট্য আছে, বীরত্বের বৈশিষ্ট্য। মল্লভূম রাজবংশাশ্রিত অধিকাংশ কিংবদন্তী ও কাহিনীর এই বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। বোঝা যায়, স্বাধীন রাজার সুদীর্ঘ বীরত্বের ঐতিহ্য এর মধ্যে আত্মগোপন করে আছে।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষে বীর হাম্বীরের রাজত্বকাল থেকে আমরা বিষ্ণুপুরের রাজাদের মোটামুটি ধারাবাহিক ইতিহাস জানতে পারি। মোগল-পাঠানে যুদ্ধ চলছে তখন বাংলাদেশে। পাঠান আমলে এবং মোগল আমলেও দেখা যায়, মুসলমান শাসকেরা সীমান্তের হিন্দুরাজা বিষ্ণুপুর রাজাদের আভ্যন্তরিক রাজ্যশাসন ব্যাপারে বিশেষ হস্তক্ষেপ করতে সাহস পাননি। মুর্শিদকুলি খাঁ পর্যন্ত না। কিন্তু বৃটিশ শাসকরা করেছিলেন। বৃটিশ আমলে বর্ধিত রাজস্বের দায়ে, দুর্ভিক্ষের চাপে ও ঘরোয়া গোলযোগের মধ্যে বিষ্ণুপুর রাজবংশের দ্রুত অবনতি হতে থাকে। দুর্দিনের সময় অন্তর্দ্বন্দ্বও বিষ্ণুপুর রাজবংশের অধঃ-পতনের অন্যতম কারণ হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ও উনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে বিষ্ণুপুরের রাজাদের চরম দুর্দিন দেখা দেয়। ১৮০৬ সালে বর্ধমানের মহারাজা নিলামে বিষ্ণুপুরের রাজাদের অধিকাংশ সম্পত্তি কিনে নেন। গবর্ণমেন্টের সামান্য বৃত্তি ও দেবোত্তর সম্পত্তিটুকু শুধু সম্বল থাকে রাজাদের। তাই নিয়ে তাঁরা বিষ্ণুপুরে, ইন্দাসে, জামকুণ্ডী ও কুঁচিয়াকোলে ছিন্নভিন্ন অবস্থায় জীবনযাপন করতে থাকেন। ইংরেজ আমলে বাংলার পশ্চিম সীমান্তের অন্যতম স্বাধীন রাজবংশের রাজত্বের ইতিহাস এইভাবে শেষ হয়ে যায়। ইংরেজের কৃপাদৃষ্টিতে অবশেষে পত্তনি ব্যবস্থার মাধ্যমে বর্ধমানের মহারাজার শ্রীবৃদ্ধি হতে থাকে। বিষ্ণুপুর রাজবংশের অধঃপতন এবং বর্ধমান রাজবংশের শ্রীবৃদ্ধি ও উন্নতি হয় ইংরেজ শাসনকালে।

মল্লরাজ বীর হাম্বীরের রাজত্বকালে আর একটি বৈপ্লবিক ঘটনা ঘটে মল্লভূমের ইতিহাসে। শক্তির পূজারী মল্লভূমবাসীর রাজা বীর হাম্বীর শ্রীনিবাস আচার্যের কাছে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হন। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম থেকে বিষ্ণুপুরের রাজারা পরম বৈষ্ণব হয়ে পড়েন এবং শুধু বৈষ্ণবধর্মের নয়, বৈষ্ণব-

যুগের বাংলা সাহিত্যেরও তাঁরা বিশেষ পোষকতা করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত দক্ষিণ-পশ্চিম রাঢ়ে এমন কবি অল্পই ছিলেন, মল্লরাজবংশের প্রশস্তি যাঁরা গাননি। মল্লরাজারা ও রাজান্তঃপুরের মহিলারাও বৈষ্ণবশাস্ত্রে সুশিক্ষিত ছিলেন। তাঁরা নিজেরা অনেক বৈষ্ণব পদও রচনা করেছেন।

কিন্তু বাংলার অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ভাবাতিশয্য। বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা নিয়ে মল্লরাজারা তাঁদের রাজ্যের মধ্যে ক্রমে বৈষ্ণব আচার-অনুষ্ঠান কঠোরভাবে আবশ্যিক করলেন। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই অত্যুগ্র বৈষ্ণবতা কিরকম হাস্যকর হয়েছিল তার একটু দৃষ্টান্ত রূপরাম চক্রবর্তীর 'ধর্মমঙ্গল' থেকে দিচ্ছি—

রাজ্যের সহিত রাজা করে একাদশী,
পঞ্চবর্ণ দ্বিজ আদি থাকে উপবাসী।
চারা মানা হাথিকে ঘোড়াকে মানা ঘাস,
দশমীর বাদ্য বাজে রাজার নিবাস।

কবি ইঙ্গিত করেছেন, একাদশীর দিনে বিষ্ণুপুরের পোষা জন্তুদেরও খাদ্য দেওয়া হত না। "গোপাল সিংহের বেগার" প্রবাদের মধ্যে এই উৎকট বৈষ্ণবতার ইঙ্গিত আছে। বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা নিয়ে বিষ্ণুপুরের রাজারা যেমন বাংলার ধর্ম ও সংস্কৃতিকে নানাদিক থেকে সমৃদ্ধ করেছেন, তেমনি ক্রমে তার উৎকট আতিশয্যের জন্য নিজেদের অধঃপতনের পথও সুগম করেছেন। শক্তি ও বলবীর্যের পূজারীরা অবশেষে রাজ্যশুদ্ধ একাদশী করে ও গোপাল সিংহের বেগার খেটে নির্বীর্য শক্তিহীন হয়ে পড়েছেন। তারপর ঐতিহাসিক ঘটনাবর্তের ক্রমাগত ধাক্কায় ভিত পর্যন্ত ভেঙে পড়তে দেরি হয়নি। বাংলার ঐতিহাসিক পশ্চিম প্রান্তের বীর প্রহরী বিষ্ণুপুর রাজবংশের পতনের পর বাঙালীর স্বাধীন জীবনের সূর্য অস্ত গেছে। বিষ্ণুপুরের দুর্গের দিকে চেয়ে, দলমাদল কামানের দিকে চেয়ে, কেবল এই কথাই আমার মনে হচ্ছিল।

বিষ্ণুপুরের দেবালয়

(এক)

আকবর বাদশাহের সমসাময়িক মল্লভূমের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন বীর হাম্বীর। বনজঙ্গল ও পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসী, ধীবর বাউরী হাড়ি ডোম প্রভৃতি জাতিপ্রধান মল্লভূমের রাজা হঠাৎ বন-বিষ্ণুপুরকে ইন্দ্রপুরীতে পরিণত করার স্বপ্ন দেখলেন কেন ? শ্বেতপাথরের প্রাসাদ ও অট্টালিকাবহুল বিষ্ণুপুরের যে-সব বর্ণনা পাওয়া যায়, আজ তার কোন চিহ্ন দেখা যায় না বিষ্ণুপুরের কোথাও। বিষ্ণুপুরের দুর্গের মধ্যে রাজবাড়ীর যে ভগ্নস্তূপ আছে, তার ভিতর থেকে কোন বিশাল রাজপ্রাসাদের শ্বেতপাথরের কঙ্কাল অত্যুগ্র কল্পনার জীয়ন-কাঠির স্পর্শেও চোখের সামনে ভেসে ওঠে না। সাধারণ মনুষ্যালয়ের মতন বিষ্ণুপুরের রাজাদের বসতবাড়ি, দোতালাও নয়, একতলা—মনে হয় যেন মাটির অত্যন্ত কাছাকাছি থাকে যারা তাদের যাঁরা রাজা, তাঁরা রাজকীয় বিলাসের জন্য কোনদিন মাটির কোল ছেড়ে ঊর্ধ্বে শূন্যে বিরাজ করতে চাননি। বাস্তবিক, স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম বিষ্ণুপুরের রাজবাড়ি দেখে। বাংলার যে-কোন নগণ্য জমিদারের বাড়ির সঙ্গে তুলনা করলেও বিষ্ণুপুরের রাজবাড়ি মনে হয় সাধারণ গৃহস্থের বাড়ি। এ-সম্বন্ধে একাধিক কিংবদন্তী আছে বিষ্ণুপুরে। কেউ বলেন, আসল রাজবাড়ি ভূগর্ভে প্রোথিত। কিন্তু তা কল্পনা করার কোন কারণ নেই। কানিংহামের আমল থেকে একাধিক প্রত্নতাত্ত্বিক বিষ্ণুপুর গেছেন, দুর্গের অভ্যন্তরস্থ যাবতীয় গৃহ-দেবালয়াদি পরিদর্শন করেছেন, কিন্তু অতীতের কোন বিশাল রাজপ্রাসাদের কোন জীর্ণ বা লুপ্ত কঙ্কালের ইঙ্গিতও কেউ পাননি কোথাও। তাঁদের বিবরণীর মধ্যে তার কোন আভাষও নেই। বিষ্ণুপুরের লোকসাধারণের বিশ্বাস, বিষ্ণুপুরের লোকপ্রিয় রাজারা সাধারণ বাসগৃহ ছেড়ে রাজপ্রাসাদে বাস করতে চাননি এবং দুর্গের ভিতরে বা বিষ্ণুপুরে, দেবালয় ছাড়িয়ে যে-কোন আলয়, রাজার বা প্রজার, সদম্ভে মাথা তুলে দাঁড়াক, এ তাঁদের কাম্য ছিল না কোনদিন। বিষ্ণুপুরের একাধিক লোককে প্রশ্ন করে এই উত্তর পেয়েছি। মনে হয়, সাধারণের এই বিশ্বাসের মূলে কিছুটা ঐতিহাসিক সত্য লুকিয়ে আছে। কিন্তু সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হচ্ছে,

বাংলার দেবদেবালয়প্রধান স্থান বিষ্ণুপুর হল কি করে? মল্ল ক্রিশ্রের প্রেরণায় তাঁদের রাজধানীতে এত বিচিত্র দেবালয় নির্মাণ করলেন? মনে হয় যেন, বাংলার ভাস্কর, স্থপতি, সূত্রধর ও শিল্পীদের বিস্ময়কর কলাকুশলতার কীর্তিনগরী বিষ্ণুপুর, যুগযুগান্তের যাবতীয় ভাগ্যবিপর্যয় ও ঘটনাবর্তের মধ্যে অমর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আরও মনে হয়, অতীত শিল্পগৌরবের এই সমাধিক্ষেত্রে কেবল উদাসীন বৈরাগীর মতন বিচরণ করেই কি আমরা বাঙালীরা ভবিষ্যতে গৌরবান্বিত বোধ করব?

ষোড়শ শতাব্দীর শেষদিকে শ্রীনিবাস আচার্যের কাছে মল্লরাজা বীর হাম্বীরের বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষাগ্রহণ মল্লভূমের ইতিহাসে যুগান্তকারী ঘটনা। এ-সম্বন্ধে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। বৃন্দাবনের গোস্বামীরা গৌড়দেশে একগাড়ি বৈষ্ণবগ্রন্থ পাঠাচ্ছিলেন, শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দের তত্ত্বাবধানে। বনজঙ্গল পাহাড়ী পথ অতিক্রম করে তাঁরা বন-বিষ্ণুপুরে এসে পৌঁছলেন—

এথা তো আচার্য ঠাকুর বনেতে ভ্রমিয়া
একদিন বিষ্ণুপুরে প্রবেশিল গিএগ।

পথে মল্লভূমের গোপালপুর গ্রামে দস্যুরা বৈষ্ণবগ্রন্থাদি লুঠ করে। শোনা যায়, কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থেরও সদ্যোসমাপ্ত পাণ্ডুলিপি-খানি তার মধ্যে ছিল। লুটের সংবাদ পেয়ে বৃদ্ধ কৃষ্ণদাস সংজ্ঞা হারান এবং কেউ বলেন তৎক্ষণাৎ, কেউ বলেন অল্পদিনের মধ্যে, তাঁর মৃত্যু হয়। যাই হোক, দস্যুদের হাতে নিগৃহীত হয়ে তাঁরা বনপথে ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে বিষ্ণুপুরে উপস্থিত হন। বিষ্ণুপুরের মধ্যে প্রায় দশদিন ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে শ্রীনিবাসাদি আচার্যরা একদিন পথের ধারে বৃক্ষতলে বসে বিশ্রাম করছেন, এমন সময় একজন সুদর্শন ব্রাহ্মণকুমারকে দেখে শ্রীনিবাস জিজ্ঞাসা করেন:

কহ দেখি কেবা রাজা কি নাম হয়।
ধার্মিক কি অন্য মন তাহার আশয়॥
তিঁহো কহে রাজা হয় বড় দুরাচার।
দস্যুবৃত্তি করে সদা অত্যন্ত দুর্বার॥
ধরে কাটে ধন লুটে নাচলে ঘাট বাট।
বীর হাম্বীর নাম হয় রাজার মল্লপাট॥

মল্লরাজা বীর হাম্বীর ও তাঁর পূর্বপুরুষদের আচার-ব্যবহারের ইঙ্গিত করা হয়েছে এর মধ্যে এবং ইঙ্গিত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আরও উল্লেখযোগ্য, সুদর্শন ব্রাহ্মণকুমারের মুখ দিয়ে কথাগুলি বলানো হয়েছে। যেন কোন আর্যনন্দন যেন স্থানীয় কোন অনার্য রাজার বর্বরাচার বর্ণনা করছেন। এই বীর হাম্বীরকে শ্রীনিবাসাচার্য বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা দিয়েছিলেন। লুণ্ঠিত পাণ্ডুলিপির সন্ধানে রাজসভায় উপস্থিত হয়ে তিনি বীর হাম্বীরকে এমনভাবে আকৃষ্ট করেছিলেন যে, মল্লরাজার তাতে ভাবান্তর হয়েছিল। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে বীর হাম্বীরের এই দীক্ষাগ্রহণ, মল্লভূমের নয় শুধু, বাংলার সংস্কৃতির ইতিহাসে সেদিন যুগান্তর এনেছিল।

অথচ মল্লভূমে বিষ্ণুপূজার প্রচলন যে বীর হাম্বীর বা মল্লরাজাদের সময় থেকে হয়েছিল, তা নয়। রাঢ়ের স্বাধীন বাঙালী রাজাদের মধ্যে শুধু যে মল্লরাজারাই ছিলেন, তাও নয়। তাঁদের পূর্বে অনেক শক্তিশালী স্বাধীন রাজার আবির্ভাব হয়েছিল রাঢ়দেশে। বাঁকুড়া শহরের প্রায় বারো মাইল উত্তর-পশ্চিমে শুশুনিয়া পাহাড়ের গুহাপ্রাচীরের একটি লিপিতে দেখা গেছে যে, পুষ্করণার অধিপতি ছিলেন রাজা চন্দ্রবর্মা। শুশুনিয়ার পঁচিশ মাইল উত্তর-পূর্বের পোখর্না গ্রামটিকেই প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌রা 'পুষ্করণা' বলে মনে করেন। রাজা চন্দ্রবর্মা ছিলেন চক্রস্বামী বিষ্ণুর উপাসক। সুতরাং বিষ্ণুর উপাসনা রাঢ়দেশে চতুর্থ-পঞ্চম খৃষ্টাব্দ থেকে যে প্রবর্তিত হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাছাড়া বিষ্ণুমূর্তি এত প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গেছে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যে, চৈতন্যপূর্ব যুগেও যে বিষ্ণুভক্ত বৈষ্ণবদের বেশ আধিপত্য ছিল তা পরিষ্কার বোঝা যায়। বিষ্ণুর শিলামূর্তি ও দশাবতারের পূজা আগে থেকেই বাংলাদেশে চলে আসছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষদিকে মাধবেন্দ্র পুরী ও তাঁর শিষ্যরা গোপাল মূর্তির পূজার প্রচলন করেন। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে বৃন্দাবনের গোস্বামীরা রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি পূজার প্রবর্তন করেন। গৌর-নিতাই মূর্তি পূজার প্রচলন করেন প্রায় এই সময় শ্রীখণ্ডের (কাটোয়া) নরহরি সরকার ও অম্বিকা-কালনার গৌরীদাস পণ্ডিত। এই পূজার প্রথম ব্যবস্থাপক হলেন অদ্বৈত আচার্য।

বিষ্ণুপুরের দেবালয়গুলির মধ্যে অধিকাংশই বৈষ্ণব দেবতা প্রতিষ্ঠিত, রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি, মদনমোহন, মদনগোপাল প্রভৃতি। বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষাগ্রহণের

পরই যে বিষ্ণুপুরের রাজারা এই সব মন্দির নির্মাণ করেছিলেন, তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। সুতরাং দেবালয়গুলির প্রাচীনত্বের সীমারেখা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্যন্ত টানা যায়, তার আগে টানা যায় না। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌রাও দেবালয়ের লিপিগুলির পাঠোদ্ধার করে এবং অন্যান্য দিক থেকে বিচার করে তাই সিদ্ধান্ত করেছেন। কিন্তু তার আগেও নিশ্চয় মল্লরাজারা দেবদেবীর পূজা করতেন এবং কোন-না-কোন ধর্মাচরণে বিশ্বাসীও ছিলেন। কি সেই ধর্ম? এক কথায় বলা যায়, আজও সারা রাঢ়দেশ ও মল্লভূমের যা প্রধান লৌকিক ধর্ম—শাক্ত ও শৈবধর্ম এবং আদিম কৌমধর্ম, মল্লরাজারা প্রধানত তারই পোষকতা করতেন। রাজ্যের মধ্যে বিষ্ণুভক্ত বৈষ্ণবরা যে ছিলেন না (চৈতন্য-পূর্ব যুগের) তা নয়। ছিলেন, তবে তাঁরা প্রধানত সমাজের উচ্চবর্ণভুক্ত ছিলেন বলে মনে হয়। মল্লভূমের সাধারণ লোকসমাজে শক্তিপূজার নানারকম লৌকিক রূপের প্রচলন ছিল সবচেয়ে বেশি। এত বেশি যে বিষ্ণুপুরের রাজাদের পরবর্তীকালের উৎকট আতিশয্য ও আবশ্যিক বিধিনিষেধের দৌরাত্ম্যেও তার প্রভাব লোকসমাজে বিশেষ কমেনি। আজও ধীবর, বাউরী প্রভৃতি পরিবেষ্টিত বিষ্ণুপুরে কালীপূজা, মনসাপূজা, ভৈরবপূজা, বড়মপূজা ধর্মপূজা ইত্যাদির অত্যধিক প্রাধান্য রয়েছে দেখা যায় এবং এইসব উৎসবে তান্ত্রিকোচিত আচার অনুষ্ঠানের বৈশিষ্ট্যই (মদ্যপান, বলিদান ইত্যাদি) উল্লেখযোগ্য। 'নরোত্তমবিলাসের' বর্ণনার কথা মনে হয়—

করয়ে কুক্রিয়া যত কে কহিতে পারে।
ছাগ মেষ মহিষ শোণিত ঘর দ্বারে॥
কেহ কেহ মানুষের কাটা মুণ্ড লৈয়া।
খড়্গ করে করয় নর্তন মত্ত হৈয়া॥

যাঁরা বিশ্বাস করবেন না, তাঁরা পৌষসংক্রান্তির দিন বিষ্ণুপুরের বাউরীদের বড়মপূজার উৎসবটি দেখবেন। বরাহ-শিকার, বলিদান ও মদ্যপানোৎসবের ভয়াবহ রূপ দেখলে 'নরোত্তমবিলাসের' কথা মনে হবে। এরকম আরও অনেক উৎসব আছে এবং তারই সঙ্গে আছে রাসলীলা, দোল ইত্যাদি। দুটি উৎসবের স্বতন্ত্র প্রতিপত্তির ধারা বুঝতে কষ্ট হয় না। তাদের বিচিত্র মিলন-মিশ্রণও উল্লেখযোগ্য। কিংবদন্তী শোনা যায়, বিষ্ণুপুরের মৃন্ময়ী দেবীর সামনে আগে নরবলি হত। খড়বাংলোর প্রাচীন মন্দিরে আজও চণ্ডী, দুর্গা ইত্যাদি

পূজিত হন। বিষ্ণুপুর শহরের মধ্যে আজও কর্মকার 'পণ্ডিত' পূজিত বুড়োধর্ম আছেন। শুধু বড়মপূজা নয়, বিষ্ণুপুরের ভৈরবপূজাও উল্লেখযোগ্য। যে-সে ভৈরব নয়, ঝোপেঝাড়ের ভৈরব। এগুলি সব বৈষ্ণবপূর্ব যুগের বিষ্ণুপুরের প্রাচীন ধর্মোৎসবের ধারা বহন করছে মনে হয়। বিষ্ণুপুরের উৎসব-পার্বণ প্রসঙ্গে পরে এবিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এখানে শুধু এইটুকু বলা দরকার যে, বিষ্ণুপুরের বৈষ্ণবপ্রধান দেবদেবী ও দেবালয়ের মধ্যেও এইসব দেবদেবীরা সম্পূর্ণ কর্তৃত্বসহ বিরাজ করছেন। তাঁরা অবশ্য অনেকেই আলয়হীন, কেবল বুড়োধর্ম, চণ্ডী-দুর্গা ও মল্লেশ্বর শিবের একটি করে দেবালয় আছে।

অধিকাংশ দেবালয় আজ দেবতাশূন্য, বিষ্ণুপুর দুর্গের ভিতরে। তার মধ্যে পাশাপাশি একজোড়া করে চারটি রেখদেউল এবং দুর্গের বাইরে 'রাসমঞ্চ' ব'লে পরিচিত পিরামিডতুল্য গৃহটি উল্লেখযোগ্য। কানিংহামের আমলে ১৮৭২-৭৩ সালে বেগলার সাহেব যখন বিষ্ণুপুর গিয়েছিলেন (প্রায় আশী বছর আগে) তখন তিনিও এই রাসমঞ্চটি দেখে মন্তব্য করেছিলেন—"the very curious pyramidal structure known as the Rasmancha" (A.S.I. Report, vol. 8, 1878). পিরামিডের পাদদেশে সারবন্দী বাংলা দোচালা ও চারচালা ঘর রূপায়িত করা অলঙ্কাররূপে। দুর্গের ভিতরের চারটি দেউলের কথা কেউ উল্লেখ করেননি এবং কেন করেননি জানি না। বরাকরের দেউল বা চব্বিশ পরগণার জটার দেউলের মতন প্রাচীন নয়, মনে হয় দেউলগুলি সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে তৈরি, বিশেষ করে ছোট জীর্ণ দেউল দুটি। পঞ্চকোট-মানভূম থেকে বাঁকুড়া জেলার ছাতনা অঞ্চল পর্যন্ত এই দেউলাকার দেবালয়ের প্রাধান্য বেশি দেখা যায় বাংলাদেশে। বর্ধমান, বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলায় দেউলাকার দেবালয় যে এককালে গঠিত হয়েছিল তাও কয়েকটির অস্তিত্ব থেকে বোঝা যায়। বরাকর, বাহুলাড়া, ইছাইঘোষের ও জটার দেউলের মতন মনে হয় বিষ্ণুপুরের দুর্গাভ্যন্তরস্থ দেউলগুলিও বাংলাদেশে দেবালয়-স্থাপত্যের ইতিহাসের একটি অধুনালুপ্ত ধারার সাক্ষী দিচ্ছে।

(দুই)

বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা নেবার আগে মল্লরাজারা প্রধানত শিব ও শক্তির পূজারী ছিলেন। একথা আগে বলেছি। ষোড়শ শতাব্দীর আগেই রাঢ়ের সর্বত্র তন্ত্রাচারের পূর্ণ বিকাশ ও প্রতিষ্ঠা হয়। আদিম কৌমধর্ম ও লৌকিক ধর্ম তন্ত্রের প্রসারে ও লোকপ্রিয়তায় সাহায্য করে। কামরূপের সঙ্গে রাঢ়ের প্রত্যক্ষ সাংস্কৃতিক লেনদেনের সম্পর্কও প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কারণে মনে হয়, বিষ্ণুপুরের মল্লরাজারা বৈষ্ণব দেবালয় নির্মাণের আগে মল্লভূমে শিবমন্দির, ধর্মমন্দির ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বিষ্ণুপুরের মধ্যে তার নিদর্শন বিশেষ নেই, দু'একটি ছাড়া। বাইরে আছে। কিন্তু যেজন্যই হোক না কেন, বিষ্ণুপুরের দেবালয়গুলি বাংলার স্থাপত্যের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় জুড়ে রয়েছে।

খড়বাংলোয় চণ্ডী ও দুর্গার ভাঙা মন্দিরটি ছাড়া মল্লেশ্বরের মন্দিরটি প্রাচীন শিবমন্দির। বিষ্ণুপুরের বর্তমান দেবালয়গুলির মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন বলে প্রত্নতাত্ত্বিকরা মনে করেন। মন্দিরগাত্রের লিপি থেকেও তাই মনে হয়। লিপিটি এই :

বসুকর নবগণিতে মল্লশকে শ্রীবীরসিংহেন।
অতি ললিতং দেব কুলং নিহিতং শিবপাদপদ্মেষু॥

মল্লাব্দের সঙ্গে খৃষ্টাব্দের পার্থক্য প্রায় ৬৯৪ বছরের। এই হিসাবে দেখা যায়, মল্লেশ্বর মন্দিরের নির্মাণকাল আনুমানিক ১৬১১ খৃষ্টাব্দ। 'শ্রীবীর সিংহেন' বলতে রঘুনাথ সিংহের পুত্র বীরসিংহকে নয়, রঘুনাথের পিতা বীর হাম্বীরকেই বোঝায়। শ্রীঅভয়পদ মল্লিক তাঁর 'History of Vishnupur Raj' গ্রন্থের মধ্যে এই বিষয়টি ঠিকই উল্লেখ করেছেন। ব্লক (Bloch) সাহেব তাঁর প্রত্নতাত্ত্বিক রিপোর্টে (পূর্ববিভাগ, ১৯০৪-৫) নামের জন্য এ বিষয়ে গোজামিল দিতে বাধ্য হয়েছেন। হাম্বীরনন্দন রঘুনাথই প্রথম 'সিংহ' উপাধি পান মুর্শিদাবাদের নবাবের কাছ থেকে এবং তিনিই বিষ্ণুপুরের অধিকাংশ দেবালয়, বাঁধ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করেন। মল্লেশ্বর শিবের মন্দিরটি সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়াতে বীর হাম্বীরই নির্মাণ করতে আরম্ভ করেন। পরে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা নেবার পর তিনি মন্দিরটি হয়ত অসম্পূর্ণ রেখে দেন। পুত্র রঘুনাথ সিংহ তাকে

সম্পূর্ণ করেন এবং মন্দিরগাত্রের লিপিতে পিতার নামটি উৎকীর্ণ করার সময় 'বীরের' সঙ্গে নতুন 'সিংহ' উপাধিও যোগ করেন। রঘুনাথনন্দন বীরসিংহ ৯৬২ মল্লাব্দে রাজত্ব করেন, সুতরাং তিনি মল্লেশ্বরের প্রতিষ্ঠাতা হতে পারেন না। গড়নরীতির দিক দিয়ে মল্লেশ্বর মন্দির 'একক চতুষ্কোণ চূড়াবিশিষ্ট' (Single Square Tower)। বিষ্ণুপুরের অন্যান্য দেবালয়ের মতন বাংলার বিশিষ্টতা ও স্বকীয়তা তার মধ্যে বিশেষ পরিস্ফুট নয়। কিন্তু চমৎকার হল মল্লেশ্বরের সামনের নন্দী বা বৃষভের মূর্তিটি। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখেছি। মনে হয় যেন মন্থরগতিতে টহল দিয়ে এসে সবেমাত্র নিশ্চিন্তে শয়ন করেছে। কুঁজ ও গলকম্বলে হাত বুলোতে বুলোতে 'মহানির্বাণতন্ত্রের' একটি শ্লোকের কথা মনে হল :

দেব্যাগারে মহাসিংহং বৃষভং শঙ্করালয়ে।
গরুড়ং কৈশবে গেহে প্রদদ্যাৎ সাধকোত্তমঃ ॥

(মহানির্বাণতন্ত্র, ১৩।৩২)

অর্থাৎ সাধকোত্তম যিনি তিনি দেবীর আগারে মহাসিংহ, শঙ্করালয়ে বৃষভ এবং কেশবগৃহে গরুড় প্রদান করেন। মল্লেশ্বর-মন্দির শঙ্করালয়, তাই শঙ্করের বাহন বৃষভ তার সামনে বিরাজ করছে। মল্লেশ্বর-মন্দির দুর্গের বাইরে দূরে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু দুর্গের বাইরে তার স্থান কেন? বৈষ্ণব রাজারা পরে শিবকে দুর্গবহির্ভূত করলেও, বর্জন করতে পারেন নি। শুধু তাই নয়, শিবের নামটিও 'মল্লেশ্বর'। দুর্গের বাইরে থাকলেও তিনিই মল্লভূমির মানসলোকের অধীশ্বর বলে পরিচিত।

এবারে দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করা যাক। দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করলে প্রথমেই মনে হয় যেন বাংলার দেবালয়ের ঐতিহাসিক 'জাদুঘরে' এলাম। দুর্গটি যেন দেবালয়-সংরক্ষণের জন্যই তৈরি হয়েছিল। বাংলার দেবালয়ের নিজস্ব গড়ন-বৈচিত্র্য সম্পূর্ণ বজায় রেখে বিষ্ণুপুর দুর্গের দেবালয়গুলি বাঙালী স্থপতি ও সূত্রধরদের অপূর্ব শিল্পনৈপুণ্য ও স্বকীয়তার নিদর্শনস্বরূপ আজও দাঁড়িয়ে আছে মনে হয়। বাংলার দেবালয়স্থাপত্যের ক্রম-বিকাশের ইতিহাস বিষ্ণুপুর দুর্গের ভিতরেই রচিত হয়ে আছে—নির্মাণকালের দিক থেকে নয়, গড়নের দিক থেকে। যিনি বিষ্ণুপুরের দেবালয় দেখেননি, তিনি বাঙালী হয়েও বাংলার শিল্পকলার অমরাবতী-দর্শন থেকে বঞ্চিত হয়েছেন বলে আমার বিশ্বাস।

হাম্বীরনন্দন রঘুনাথ সিংহই বিষ্ণুপুর দুর্গের সবচেয়ে সুন্দর দেবালয়গুলি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কালানুক্রমে দেবালয়গুলির উল্লেখ করছি। অধিকাংশই রাধাকৃষ্ণের মন্দির। তার মধ্যে শ্যামরায়ের 'পঞ্চরত্ন' মন্দিরটি উল্লেখযোগ্য। লিপি এই:

শ্রীরাধাকৃষ্ণ মুদে শশাঙ্ক বেদাঙ্ক যুক্তে নব-রত্নবত্নম্।
শ্রীবীরহম্বীর নরেশ সূর্ণূর্দদৌ নৃপঃ শ্রীরঘুনাথ সিংহঃ॥

লিপি অনুসারে পঞ্চরত্ন মন্দিরটি ৯৪৯ মল্লাব্দে (১৬৪৩ খৃষ্টাব্দে) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দেখা যায়। বোধ হয় বাংলাদেশের পঞ্চরত্ন মন্দিরের সবচেয়ে প্রাচীন 'মডেল' এই মন্দিরটি, বাকি অধিকাংশই যা দেখেছি অন্যান্য অঞ্চলে সব অষ্টাদশ শতাব্দীর। বাঁকানো চালাবিশিষ্ট চারচালা বাংলা ঘরের চার কোণে চারটি খর্বাকৃতি 'দেউল', মধ্যে একটি। লক্ষণীয় হল, 'দেউল' এখানে অলঙ্কার হয়ে উঠেছে। 'পঞ্চরত্নের' পর উল্লেখযোগ্য হল বিষ্ণুপুরের 'জোড়বাংলা' মন্দিরটি।' লিপি এই:

শ্রীরাধাকৃষ্ণমুদে শুধাংশুরসাঙ্কেমে সৌধগৃহং শকেঽব্দে।
শ্রীবীরহম্বীর নরেশ সূনূর্দদৌ নৃপঃ শ্রীরঘুনাথ সিংহঃ॥

লিপি অনুসারে 'জোড়বাংলা' মন্দিরটি ৯৬১ মল্লাব্দে (১৬৫৫ খৃষ্টাব্দে) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দেখা যায়। দু'খানি দো-চালা বাংলা ঘর পাশাপাশি জুড়ে দিলে যা হয়, 'জোড়বাংলা' মন্দিরটি তাই এবং নামও সেইজন্য 'জোড়বাংলা'। বাংলার মন্দির-স্থাপত্যের অপূর্ব নিদর্শন এই জোড়বাংলা মন্দির, বাঙালী সূত্রধরের অভিনব পরিকল্পনা ও স্বকীয়তার প্রমাণ। দেবদেবীকে বাঙালীর মতন পরমাত্মীয় করে এমন আপনজন আর কেউ করতে পারেনি, তাই বাঙালী শিল্পীরাও বাংলার সাধারণ লোকগৃহের সঙ্গে দেবগৃহের সমস্ত ব্যবধান ঘুচিয়ে দিয়েছেন। দেবতার সঙ্গে মানুষের, দেবালয়ের সঙ্গে মনুষ্যালয়ের এমন বিচিত্র আত্মীয়করণ বাংলাদেশের মতন ভারতের আর কোন অঞ্চলে হয়েছে কিনা জানি না। দক্ষিণভারতে দ্রাবিড় দেশে 'বেসর' ও 'দ্রাবিড়' মন্দিরের গড়নের ক্রমবিকাশের ধারা লক্ষ্য করলে দেখা যায়, ক্রমেই রাজৈশ্বর্যের সঙ্গে দেবৈশ্বর্য বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পল্লব-চোল-পাণ্ড্য-বিজয়নগর-মাদুরা পর্যন্ত মন্দিরের সোপানান্তরিত পিরামিড-গঠন এবং অনুরূপ 'গোপুরমের' উচ্চতা ও বিশালতার ক্রমিক বৃদ্ধি হয়েছে। শেষের দিকে গোপুরম দেবগৃহের ঊর্ধ্বে সদম্ভে মাথা তুলে

দাঁড়িয়েছে। কল্পনার ঐশ্বর্যের সঙ্গে শক্তির আড়ম্বর এর মধ্যে প্রকট। বাংলার দেবালয়ে বাঙালী রাজারা ও ভূস্বামীরা রাজশক্তির মহিমা প্রচার করতে চাননি। বাঙালী শিল্পীরা তাই লৌকিক আদর্শের ধারা সেখানে সার্থকভাবে অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। বাংলার স্থাপত্যের ও বাঙালী শিল্পীর এ এক আশ্চর্য বিশিষ্টতা।

বিষ্ণুপুর দুর্গের মধ্যে আর একটি জোড়বাংলা মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আছে, সংরক্ষিত নয় বলে বর্তমানে কাঁটাবনের মধ্যে সমাধিস্থ। কাঁটাবনের মধ্যে কোনরকমে ঢুকে কাছে গেলে দেখা যায়, মন্দিরের গায়ে পোড়ামাটির কাজের দু'চারটি নিদর্শন এখনও রয়েছে। মন্দিরটি কেন পরিত্যক্ত হয়েছে এবং কেন সংরক্ষিত হয়নি, কেউ বলতে পারলেন না। জোড়বাংলা ছাড়া রাধাশ্যামের মন্দির, কাঁলাচাঁদের মন্দির ও মদনমোহনের মন্দির উল্লেখযোগ্য। একরত্ন-বিশিষ্ট বাংলা চারচালা ঘরের মতন দেবালয়গুলির গড়ন, চালাগুলির বঙ্কিম-রেখা অত্যন্ত স্পষ্ট। এছাড়া রঘুনাথনন্দন বীরসিংহ (৯৬৪ মল্লাব্দ, ১৬৫৮ খৃঃ) লালজীর মন্দির, তাঁর রাণী শিরোমণি দেবী মুরলীমোহনের মন্দির (৯৭১ মল্লাব্দ, ১৬৬৫ খৃঃ) ও মদনগোপালের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। রাজা দুর্জনসিংহ প্রতিষ্ঠা করেন মদনমোহনের বিখ্যাত মন্দিরটি। লিপি এই :

শ্রীরাধাব্রজরাজনন্দন পদাম্ভোজেযুতৎপ্রীতয়ে।
মল্লাব্দে ফণীরাজ শীর্ষগণিতে মাসেশুচৌ নির্মলে।
সৌধং সুন্দররত্নমন্দিরমিদং সার্ধংস্বচেতোহলিনা।
শ্রীমদ্দুর্জনসিংহ ভূমিপতিনা দত্তং বিশুদ্ধাত্মনা।

বিষ্ণুপুরের দেবালয়গুলির মধ্যে সৌন্দর্যের প্রতিমূর্তি মদনমোহনের মন্দিরটি। সত্যিই 'সুন্দররত্নমন্দির'ই বটে। একরত্নবিশিষ্ট বড় একটি বাংলা চারচালা ঘরের মতন মন্দিরটি। মন্দিরগাত্রের পোড়ামাটির চিত্র অতুলনীয়। জোড়বাংলা মন্দিরটি ও পঞ্চরত্নটি ছাড়া এরকম অপূর্ব পোড়ামাটির চিত্রাবলী বিষ্ণুপুরের অন্য দেবালয়গুলিতে দেখা যায় না। দেখে মনে হয়, একশ দেড়শ বছরের মধ্যে এই সব বাঙালী শিল্পী কোথায় লুপ্ত হয়ে গেলেন?

বৃটিশ আমলে দেশীয় ভূস্বামীশ্রেণীর একটা বৈপ্লবিক গোত্রান্তর হল। নতুন যাঁরা রাজা-মহারাজা জমিদার হলেন, তাঁরা কেবল অর্থের মালিক হলেন,

সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী হলেন না। দেশীয় সংস্কৃতির সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখার প্রয়োজন বোধ করলেন না তাঁরা।

বিসদৃশ এক বিকৃত ইঙ্গ-বঙ্গ কালচারের প্রবর্তক হয়ে তাঁরা কবিগান ও খেউড়-আখড়াই গানের আসর জমিয়ে তুললেন। বাইজীনাচ, সাহেব-বিবির নাচ, বুলবুলির লড়াই, মেড়ার লড়াই আর বারোইয়ারী পুজোয় সংস্কৃতিক্ষেত্র সরগরম হয়ে উঠলো। সমাজ-ব্যবস্থার এই চরম বিপর্যয়ের মধ্যে, সংস্কৃতির এই মহাসঙ্কটের মধ্যে, জীবন-সংগ্রামে পরাজিত হয়ে বাংলার সূত্রধর, ভাস্কর ও অন্যান্য লোকশিল্পীরা বিলুপ্ত হয়ে গেলেন। তাই দেখা যায় যে বৃটিশ আমলে অনেক দেবালয় তৈরি হলেও, সেখানে বাঙালী শিল্পীদের সেই কলাকুশল হাতের কোন স্পর্শ নেই। বর্ধমানের মহারাজারা যেসব মন্দির তৈরি করিয়েছেন, সাল তারিখ অনুসারে দেখা যায়, অষ্টাদশ শতাব্দীর কোন কোন মন্দিরে কারুকার্যের নিদর্শন কিছু কিছু আছে এবং ক্রমে উনবিংশ শতাব্দীতে এসে সেগুলি একেবারে লুপ্ত হয়ে গেছে। তখন কেবল মন্দিরের সংখ্যা (যেমন ১০৮ মন্দির) ও চূড়ো বেড়েছে, শিল্পৈশ্বর্য একেবারে লুপ্ত হয়ে গেছে। ভূস্বামীদের মধ্যে সাবর্ণ চৌধুরীদের মতন দেবালয় প্রতিষ্ঠা বোধ হয় আর কেউ করেননি। তাঁদের প্রতিষ্ঠিত অষ্টাদশ শতাব্দীর অনেক দেবালয়ে পোড়ামাটির কাজের নিদর্শন রয়েছে দেখা যায়, যেমন হালিশহরের মন্দিরগুলিতে। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে এসে দেখা যায়, মন্দিরের গায়ে বালির ও চূণের পলেস্তারা ছাড়া আর কিছু নেই, এমন কি কালীঘাটের বিখ্যাত মন্দিরেও না। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি রানী রাসমণি যখন দক্ষিণেশ্বরের বিখ্যাত মন্দিরটি নির্মাণের জন্য ছয় লক্ষ টাকা ব্যয় করেছিলেন তখন তিনি নিশ্চয় পোড়ামাটির কারুকাজের জন্য কোন শিল্পীর খোজ পাননি। যদি পেতেন তাহলে তার সামান্য নিদর্শনও কোথাও থাকত। তখন বাংলার সূত্রধর-শিল্পীরা প্রায় নিখোঁজ ও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছেন, অন্তত শিল্পনৈপুণ্যের দিক থেকে।

বিষ্ণুপুর-রাজের দুর্গোৎসব

দেশাচার ও কুলাচার-ভেদে বাংলাদেশের দুর্গোৎসবের তারতম্য আছে। প্রসিদ্ধ পুরোহিতবংশের এক-এক দুর্গাপূজা-পদ্ধতির পুঁথি আছে। সেই পদ্ধতিতে পুরোহিত যজমানেরা পূজা করে থাকেন। বিভিন্ন রাজবংশেরও ভিন্ন ভিন্ন পূজাপদ্ধতি ও উৎসব-বৈচিত্র্য আছে। এখানে বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরের মল্ল-রাজাদের দুর্গোৎসবের বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যের কথা বলব। বাংলাদেশের বনেদী রাজবংশের প্রধান বিষ্ণুপুরের মল্লরাজবংশের দুর্গোৎসবের বিশেষত্বের মধ্যে চিন্তার খোরাক আছে যথেষ্ট।

মহাভারতের ভীষ্মপর্বে (২৩ অধ্যায়ে) অর্জুন বাসুদেবের বাক্যানুসারে দুর্গার স্তব করছেন এই বলে : "হে গোপেন্দ্রানুজে নন্দগোপকুলসম্ভবে কোক-মুখে! তুমি জম্বু, কতক ও চৈত্য-বৃক্ষের কাছে নিরন্তর বিরাজ কর। হে কান্তারবাসিনি, তোমার প্রসাদে রণক্ষেত্রে আমরা যেন জয়লাভ করতে পারি।" দুর্গা কোক-মুখা। 'কোক' অর্থে বন্যকুকুর বোঝায়। দুর্গার নাম 'শিবা', শিবা শব্দের অর্থ শৃগালী। দুর্গা থাকেন কোথায়? দুর্গার এক নাম 'বিন্ধ্য-বাসিনী'। দুর্গা কান্তারবাসিনী। কান্তারে জম্বু, কতক ও চৈত্য-বৃক্ষের সন্নিধানে দুর্গা বিরাজ করেন। জম্বু গাছ জামগাছ, 'কতক' হ'ল অরিষ্ট—একরকম ফলের গাছ। চৈত্যবৃক্ষও গাছ, হয়ত অশ্বত্থ গাছ। বিন্ধ্যবাসিনী, কান্তারবাসিনী দুর্গা পার্বত্য অঞ্চলে অরণ্যে বাস করেন এবং গাছে গাছে বিরাজ করেন। দুর্গা কোকমুখা ও শিবা। বৃক্ষ ও বন্যজন্তু, পর্বত ও অরণ্য—দুর্গার ধ্যান-ধারণার সঙ্গে জড়িত। কেন জড়িত? দুর্গার উৎপত্তি সেখান থেকে। আদিম অরণ্যবাসী ও পর্বতবাসীর ধ্যানের দেবতা দুর্গা। তাই তিনি বৃক্ষে বৃক্ষে বিরাজ করেন। তাই তিনি কোকমুখা ও শিবা। তাই তিনি বিন্ধ্য-বাসিনী ও কান্তারবাসিনী। পরে, অনেক পরে, দুর্গা সমগ্র বাঙালী জাতির উপাস্য দেবী হয়েছেন। কান্তারবাসিনীর কথায় আমাদের 'বনদুর্গা'র কথা মনে হয়। বনদুর্গা বাঙালীর গৃহদুর্গায় পরিণত হয়েছেন। বনদুর্গা ও চণ্ডী হয়েছেন শিবের ঘরণী। গৃহী ও গৃহিণীরা মনে করেন, পার্বতী উমা তিনদিনের জন্য পিতৃগৃহে এসেছেন। তিনদিন পরে আবার তিনি শ্বশুরালয়ে ফিরে

যাবেন। গৃহিণী কন্যাকে 'নির্মঞ্চন' করেন, আমরা বলি 'বরণ'। অশ্রু ছল-ছল চক্ষে, রুদ্ধকণ্ঠে বলেন: 'আসছে বছর আবার এসো মা!' যিনি চণ্ডী, যিনি বনদুর্গা, তাঁকে বাঙ্গালীরা শুধু ঘরের দেবতা নয়, একেবারে 'ঘরের মেয়েতে' রূপান্তরিত করেছেন। এই পরমাত্মীয়করণই বাঙ্গালীর প্রধান মানসিক বৈশিষ্ট্য।

দুর্গা কিন্তু আসলে কান্তারবাসিনী, বিন্ধ্যবাসিনী, বনদুর্গা, চণ্ডী, কোকমুখা, শিবা। বাঁকুড়া রাইপুরে দুর্গার কোকমুখা পাষাণমূর্তি আজও পূজিত হয়, পূর্বে গাছতলায় হত, এখন মন্দিরে হয়। বাঁকুড়া-মানভূম অঞ্চলে একাধিক কোকমুখা দুর্গার পূজার খবর পেয়েছি। মূর্তিপূজার বদলে ঘটপূজা ও পট-পূজার প্রথা আজও বাঁকুড়া বীরভূম অঞ্চলে প্রচলিত আছে। বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরের পূজায় 'নবপত্রিকা'র পূজার বিশেষ গুরুত্ব আছে, আজও দেখা যায়। বস্ত্রাচ্ছাদিত নবপত্রিকার উপর একটি মাটির নারীমুণ্ড স্থাপিত হয় এবং নবপত্রিকা দুর্গারূপে পূজিত হয়। বিষ্ণুপুরের ভট্টাচার্যবাড়িতে ধাতুনির্মিত দশভুজা প্রতিমার উপর একটি মাটির নারীমুণ্ড স্থাপিত হয়, প্রতিমা ঢাকা থাকে। একে মুণ্ডপূজা বলে। জনশ্রুতি আছে, বিষ্ণুপুরের মৃন্ময়ী দেবীর সামনে মল্লরাজারা এককালে 'নরবলি' দিতেন। জনশ্রুতি মূল্যহীন বলে মনে হয় না। মল্লরাজাদের পোষ্য ডাকাতের দল যে বীর হাম্বীরের সময় পর্যন্ত ছিল তাতে সন্দেহ নেই। ডাকাতি ও শক্তিপূজার অঙ্গ হিসাবে নরবলি একশতাব্দী আগেও হত আমাদের দেশে। যেখানে নরবলি পর্যন্ত হত, সেই বিষ্ণুপুরে আজ দুর্গোৎসবে পশুবলি একেবারে নিষিদ্ধ। বিস্ময়কর পরিবর্তন, বৈষ্ণবধর্মের প্রভাবে। বৈষ্ণবধর্ম রাজধর্ম বলে বাঙালীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তি-মহোৎসব আজ বিষ্ণুপুরে বৈষ্ণব-মহোৎসবে পরিণত হয়েছে। কিন্তু বিষ্ণুপুরের রাজার দুর্গোৎসবের আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে কোন বিশেষ 'সম্প্রদায়ের' তেমন প্রভাব নেই। ইতিহাসের প্রত্যেক স্তরের ধর্মাচরণ তার মধ্যে আজও প্রকট হয়ে ওঠে।

বিষ্ণুপুরের মল্লরাজাদের দুর্গোৎসব অনেক আগে থেকে আরম্ভ হয়। জিতাষ্টমীর পরের নবমীতে প্রথমে আসেন 'বড়ঠাকরুণ'। রূপোর পাতে মহিষ-মর্দিনী মূর্তি, নাম বড়ঠাকরুণ। রাজগৃহেই থাকেন এবং নবমীর দিন রাজার ঘর থেকে তাঁকে এনে কৃষ্ণবাঁধে স্নান করিয়ে, নবপত্রিকাসহ পুজো করে 'দুর্গা-

মেলায়' প্রতিষ্ঠা করা হয়। নবপত্রিকা হল—ধান্য, মান, রম্ভা, কচু, হরিদ্রা, জয়ন্তী, বিল্ব, দাড়িম ও অশোক। নবপত্রিকা দুর্গার স্বরূপ বা নবদুর্গা। বড়-ঠাকরুণকে এনে মৃন্ময়ীতলার সামনে শিরীষ গাছের তলায় স্থাপন করে 'পাটে' পূজা করা হয়। পরে মেলার উপর পূজা হয়। তারপর থেকে প্রতিদিন নিত্যপূজা হতে থাকে। চতুর্থীর দিন আসেন 'মেজঠাকরুণ', একটি 'ঘট' মাত্র। গোপালসায়র থেকে রাজ-পুরোহিত ঘটে জল ভরে নিয়ে আসেন। পরে পুজো হয় মেজঠাকরুণের। ষষ্ঠীর দিন সন্ধ্যার পর রাজ-পুরোহিত ক্ষীরকুলতলায় যান। ক্ষীরকুল এক রকমের ফলের গাছ, রাজবাড়ির পিছনেই ক্ষীরকুলতলা। এই ক্ষীরকুলতলায় আগে বিষ্ণুপুরের রাজাদের অভিষেক হত। আজও অভিষেকের স্থানটি বাঁধানো আছে গাছতলায়। জঙ্গলাকীর্ণ ক্ষীরকুলতলার দিকে চেয়ে বিষ্ণু-পুর রাজবংশের অভিষেক-উৎসবের চিত্রটি আজও চোখের সামনে ভেসে ওঠে। সাঁওতাল, ধীবর, বাউরী, হাড়ি, ডোম ও আদিবাসীদের বাদ্যভাণ্ডসহ নৃত্য-গীতোৎসবের কথা মনে হয়। এই ক্ষীরকুলতলায় রাজ-পুরোহিত ষষ্ঠীর দিন সন্ধ্যার পর যান রাজা-রানীকে দুর্গার পট দেখাতে। একে 'পটদর্শন' বলে। রাজবাড়ির পিছনেই ক্ষীরকুলতলা। ঘরের ভিতর থেকে খোপের ফাঁক দিয়ে রাজা ও রাণী পটদর্শন করেন। তারপর দুর্গাপট নিয়ে রাজ-পুরোহিত বাদ্য-ভাণ্ডসহ ক্ষীরকুলতলা থেকে শ্যামকুণ্ড পার হয়ে বিল্ববৃক্ষতলায় আসেন। বিল্বতলায় বোধন হয়। পরে দুর্গাপটসহ দুর্গামেলায় এসে পট স্থাপন করা হয়। এই দুর্গাপটই হলেন 'ছোটঠাকরুণ'। বড়ঠাকরুণ, মেজঠাকরুণ ও ছোটঠাকরুণ এইভাবে দুর্গামেলায় প্রতিষ্ঠিত হন। বড়ঠাকরুণ মহিষমর্দিনী, মেজঠাকরুণ জলভরা ঘট এবং ছোটঠাকরুণ দুর্গাপট। বিষ্ণুপুরের ফৌজদার-বংশের শিল্পীরা এই দুর্গাপট আঁকেন।

সপ্তমীর দিন রাজবাড়ীর অন্দর থেকে দশভুজা মূর্তির 'স্বর্ণপট' বাইরে আনা হয়। স্বর্ণপটের এই দশভুজা মূর্তিকে বলা হয় 'পটেশ্বরী'। নবপত্রিকা ও দুর্গাপটসহ পটেশ্বরীকে কৃষ্ণবাঁধের ঘাটে নিয়ে গিয়ে পূজা করা হয়। পরে দুর্গামেলায় নিয়ে এসে প্রথম নিচে মাটিতে রেখে 'পাটে' পুজো হয়। তারপর উপরে তুলে যথারীতি বড়পূজা করা হয়।

মহাষ্টমীর দিন সকালে অষ্টাদশভুজা উগ্রচণ্ডী বিশালাক্ষী দেবী রাজবাড়ির অন্দর থেকে বেরিয়ে ঘরের মধ্যেই স্নান করেন, বাইরের কোন সায়রে যান না।

তারপর তিনি সিংহাসনে উপবেশন করেন। মহা-স্নানের পর পুজোর আয়োজন করা হয়। পুজোর কিছুক্ষণ আগে রাজপোষাক পরে, তলোয়ার হাতে নিয়ে রাজা আসেন,—এসে মহাপাত্রের (পুরোহিত) কাছা ধরে দাঁড়ান। মহাপাত্র পুষ্পাঞ্জলি দেন। দু'বার পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া হলে রাজা তোপধ্বনি করার হুকুম দেন। বংশানুক্রমে মাদোড়রা তোপ দাগে এবং তার জন্য রাজবৃত্তি পায়। কামানের কাছে তারা তোপ দাগার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকে। রাজার আদেশ পেলেই তোপদাগা হয়। সমগ্র মল্লভূমের একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত তোপধ্বনির প্রতিধ্বনি শোনা যায় এবং শোনা মাত্রই সর্বত্র মহিষমর্দিনীর মহাষ্টমীর পুজো আরম্ভ হয়। বিষ্ণুপুরের মল্লরাজাদের দুর্গোৎসবের এটা বংশানুক্রমিক রীতি। রাজৈশ্বর্য ও রাজত্ব আজ কিছুই নেই, তবু রীতিটি রয়েছে। সারা মল্লভূমব্যাপী লক্ষ লক্ষ লোক আজও মহাষ্টমীর দিন মল্লরাজাদের এই তোপধ্বনির সঙ্কেত শোনবার জন্য কান পেতে উৎসুক হয়ে থাকেন। তোপধ্বনির পর মহাষ্টমী পুজো আরম্ভ হয়, শুধু রাজবাড়িতে নয়, সারা মল্লভূমে। পূর্বে 'তামির' সঙ্কেতে মহাষ্টমী পুজোর তোপধ্বনি করা হত। বড় একটি জলভরা গামলায় তামার কুড়ি ভাসিয়ে দেওয়া হত এবং তাম্রকুড়িটি নাকি আপনা থেকেই ডুবে যেত জলে। ডোবার মুহূর্তে মহাষ্টমীপূজার শুভক্ষণ সূচিত হত এবং তোপধ্বনি করা হত সঙ্গে সঙ্গে। এখন ঘড়ি দেখে রাজার আদেশে করা হয়।

নবমীর দিন এক বিচিত্র পূজানুষ্ঠানের রীতি আছে বিষ্ণুপুরে। নিশাভোর (রাত বারোটার পর) এক দেবীর পূজা হয়, দেবীর নাম 'খচ্চরবাহিনী' (সিংহবাহিনী নন)। ঘটে ও পটে খচ্চরবাহিনীর পূজা হয়, কিন্তু দুর্গার ধ্যানেই পূজা হয়। পূজার পদ্ধতিটি বিচিত্র। ঘটের দিকে পিছন ফিরে বসে পুরোহিত পুজো করেন এবং পুজোর সময় কেবল দু'জন পুরোহিত ছাড়া আর কেউ থাকেন না। কিংবদন্তী আছে, যিনি পুজো করেন তাঁর বংশে বাতি দিতে আর কেউ থাকে না।

দশমীর দিন সকালে রাজা দুর্গামেলায় আসেন, এসে নিজে হাতে ধরে 'নবপত্রিকা' বিসর্জন দিয়ে আসেন। সন্ধ্যার পর রাজা রাজপোষাক পরে পাল্কী চড়ে ইঁদতলায় যান। ইন্দ্রপূজা বা ইঁদপরব যেখানে অনুষ্ঠিত হয়, তাকেই ইঁদতলা বলে। রাজ্যাভিষেকের সঙ্গে ইঁদপরবের খানিকটা সম্পর্ক আছে,

অভিষেক-উৎসবই বলা চলে। ক্ষীরকুলতলায় রাজা ও রানীর ষষ্ঠীর দিন 'পট-দর্শন' এবং দশমীর দিন রাজার ইন্দতলায় অনুষ্ঠান, বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রধানত নবপত্রিকা দিয়ে ইন্দতলায় একটি তোরণ তৈরি করা হয়—নাম 'সরক-দরজা'। দরজার কাছে অনন্তদেবের পাষাণমূর্তি স্থাপন করা হয়। দরজার একদিকে রাজা দাঁড়ান, অন্যদিকে দাঁড়ান পুরোহিতরা। তারপর রাজা একে-একে এইগুলি দরজা পার করিয়ে দেন :

॥ এঁড়ে গরু। উখান থালা। তলোয়ার। ডোমদের ঢোল। ঢাল ॥

এপার থেকে রাজা হাতে ধরে দরজা পার করে দেন, ওপার থেকে পুরোহিতরা টেনে নেন। তারপর পাল্কি চড়ে রাজা বিষ্ণুপুর শহরের মধ্যে শাঁখারিবাজারে 'বুড়া-ধর্মতলায়' যান। বুড়াধর্ম বা 'বৃহদ্ধাক্ষ' বিষ্ণুপুরের প্রাচীন ধর্মরাজ ঠাকুর। বুড়াধর্মের স্থান থেকে ঘুরে রাজার বাড়ি ফিরে যাওয়া অর্থহীন নয়। বাড়ি ফিরে গিয়ে ঢাল-তলোয়ার লাঠি নিয়ে রাজা নিজে ফৌজদার ও সেনাপতিদের সঙ্গে খেলা করেন, নৃত্যবাদ্যোৎসব হয়। অতঃপর রাজা তাঁর চৌকিতে এসে বসেন এবং ব্রাহ্মণরা তাঁকে আশীর্বাদ করেন।

রাজবাড়ির বাইরে দশমীর দিন কুম্ভকর্ণ-বধের উৎসব হয়। দশমীর পরদিন হয় ইন্দ্রজিৎ-বধের উৎসব। দ্বাদশীর দিন রাবণ-কাটার উৎসব। বিসদৃশ বাঁদরের সং সেজে বাঁদরনৃত্য নেচে দলে-দলে লোকে ভিক্ষা করে বাড়ি বাড়ি।

বিচিত্র উৎসব নয় কি? বিষ্ণুপুর-রাজাদের এই দুর্গোৎসব? কত বিচিত্র পূজা-পার্বণের আচার-অনুষ্ঠান যে দুর্গোৎসবের মধ্যে মিলিত হয়েছে, তার ঠিক নেই। বড়ঠাকরুণ, মেজঠাকরুণ, ছোটঠাকরুণ, ঘট, দুর্গাপট, নবপত্রিকা, মহিষমর্দিনী, দশভুজা পটেশ্বরী, অষ্টাদশভুজা উগ্রচণ্ডী বিশালাক্ষী, সিংহবাহিনী, খচ্চরবাহিনী, অনন্তদেব, ধর্মঠাকুর—সকলে এসে মল্লরাজাদের দুর্গোৎসবে মিলিত হয়েছেন। এমন বিচিত্র উৎসব-সমন্বয় সচরাচর দেখা যায় না।

স্বরতীর্থ বিষ্ণুপুর

বাঙালীর সংস্কৃতির ইতিহাসে মল্লরাজাদের রাজধানী বিষ্ণুপুর স্বরসাধনার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পীঠস্থানরূপে পরিচিত। কেবল রাজদরবারে নয়, বাংলার রসিকসমাজেও বিষ্ণুপুরের সঙ্গীত-সাধকরা প্রায় তিন শতাব্দীকাল অখণ্ড আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। নবযুগের রাজধানী কলকাতা শহরকেও যাঁরা স্বরসাধনার মহাকেন্দ্রে পরিণত করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে বিষ্ণুপুরের সঙ্গীতাচার্যদের দানই বেশি। তখন কণ্ঠসঙ্গীত ও যন্ত্রসঙ্গীত উভয় ক্ষেত্রেই বিষ্ণুপুরের সাধনা বিস্ময়কর সার্থকতা লাভ করেছিল।

বিষ্ণুপুরের স্বরসাধনার ইতিহাস দশ-বিশ-পঞ্চাশ বছরের ইতিহাস নয়, কয়েক শতাব্দীর ইতিহাস, দীর্ঘকালের ইতিহাস। সেই সুদীর্ঘ ইতিহাসের অনেক পর্ব আছে, অনেক অধ্যায় আছে। তার উৎস কোথায়, রাজদরবারে না সাধারণ লোকসভায়, তা বলা যায় না। তবু মনে হয়, লৌকিক উৎসব-পার্বণের বিস্তৃত ক্ষেত্র মল্লভূমে সঙ্গীতের জন্ম হয়েছে নিশ্চয় রাজসভার বাইরে বৃহত্তর জনসভায়। লোকসঙ্গীতের সেই ধারাতেই বিষ্ণুপুরের সঙ্গীতানুরাগ পরিপুষ্ট হয়েছে এবং রাজদরবারের অনুশীলনে সমৃদ্ধ হয়েছে। কবিগান, যাত্রা, পাঁচালি, কথকতা, ঝুমুর ইত্যাদির চর্চা মল্লভূমের লোকসমাজে অনেক আগে থেকেই রীতিমত চলে আসছিল মনে হয়। পরবর্তীকালে নন্দলালের রামায়ণের দল, রামশরণ শর্মার যাত্রার দল, ব্রজনাথ রজকের যাত্রার দল, রজনী মাঝি ও কেশবলাল মাঝির তর্জার দল, বিষ্ণুপুরী সরোজিনী ঝুমুর গান ও নাচের দল ইত্যাদি প্রসিদ্ধি লাভ করে। একাধিক কীর্তনীয়ার দলেরও বিকাশ হয় বিষ্ণুপুরে। বিষ্ণুপুরের কথকতার সুখ্যাতিও সর্বজনবিদিত। অনেক দূর দেশ থেকে শিক্ষার্থীরা কথকতা শিক্ষার জন্য বিষ্ণুপুরে আসতেন একসময়। কথকরা প্রায় প্রত্যেকেই সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞ ও শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন এবং সুকণ্ঠ গায়কও ছিলেন। রীতিমত গুরুর কাছে থেকে সঙ্গীতের চর্চা করতে হত কথকদের। কথকদের মধ্যে অনেকে সঙ্গীত শিক্ষাকালে সঙ্গীতের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে শেষ পর্যন্ত উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত চর্চাতেই আত্মনিয়োগ করেছেন। তাঁদের মধ্যে সঙ্গীতাচার্য ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর নাম বিশেষ

উল্লেখযোগ্য। বিষ্ণুপুরের কথকরা কেউ ভুঁইফোঁড় ছিলেন না, কথকতাবৃত্তির জন্য তাঁদের বিশেষভাবে শাস্ত্রে ও সঙ্গীতে শিক্ষালাভ করতে হত। সেইজন্য বিষ্ণুপুরের কথকদের দেশজোড়া খ্যাতি ছিল এককালে। সঙ্গীতকেশরী অনন্ত-লাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের (শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা) কনিষ্ঠ খুল্লতাত ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত কথক ছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম বিষ্ণুপুরে কথকতার টোল খোলেন। বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের রামকুমার বন্দ্যো-পাধ্যায় (ঈশ্বরচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র) ছিলেন কথকচূড়ামণি। কথকতার সময় তিনি এমন ওস্তাদের মতন গান করতেন যে, শ্রোতারা তাঁর গান প্রসিদ্ধ খেয়াল গায়কের গানের মতন শুনতেন। বিষ্ণুপুরের কথকতার এই সমৃদ্ধ ঐতিহ্য উত্তরসাধকদের সঙ্গীত-সাধনায় অনুপ্রাণিত করেছে।

কবিগান পাঁচালি যাত্রা ঝুমুর কথকতা ইত্যাদি লৌকিক সঙ্গীত-সাধনার অব্যাহত ধারার সঙ্গে সংযোগ রেখেই বিষ্ণুপুরে উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত-চর্চার সূত্রপাত হয় মোগলযুগে, বিষ্ণুপুরের মল্লরাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায়। লোকসঙ্গীতের ধারার পাশাপাশি বিষ্ণুপুরে দরবারী সঙ্গীতের নতুন ধারার প্রবর্তন হয়। বিষ্ণুপুরের স্বাধীন মল্লরাজারা মোগল বাদশাহের রাজধানী দিল্লী থেকে বিখ্যাত মুসলমান ওস্তাদদের উচ্চ বেতন দিয়ে বিষ্ণুপুরে নিয়ে আসতেন সঙ্গীত শিক্ষার জন্য। দিল্লীর মুসলমান ওস্তাদদের মধ্যে যাঁরা বিষ্ণুপুরে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ওস্তাদ বাহাদুর খাঁ ও মৃদঙ্গ-বিশারদ পীর বক্সের নাম উল্লেখযোগ্য। শোনা যায় বিষ্ণু-পুরের রাজা দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহ নাকি অষ্টাদশ শতাব্দীতে ওস্তাদ বাহাদুর খাঁকে মাসিক পাঁচশত টাকা বেতন দিয়ে বিষ্ণুপুরে নিয়ে আসেন। বাহাদুর খাঁর প্রধান সাকরেদ ছিলেন গদাধর চক্রবর্তী এবং এই চক্রবর্তী বংশের নীল-মাধব চক্রবর্তী ছিলেন মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গীত-শিক্ষক। ওস্তাদ পীরবক্স এসেছিলেন মৃদঙ্গবাদ্য শিক্ষা দিতে। সেই সময় উত্তরভারতে নাকি পীরবক্সের সমকক্ষ মৃদঙ্গবাদ্য-বিশারদ আর কেউ ছিলেন না। বিষ্ণুপুরে মৃদঙ্গ-বাদ্যের যে বিশেষ চর্চা ও দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায় তা প্রধানত তাঁরই শিষ্যদের শিক্ষার গুণে। শুধু সঙ্গীতাচার্যদের নয়, বিষ্ণুপুরের মৃদঙ্গাচার্যদেরও খ্যাতি দেশজোড়া। মৃদঙ্গের বোল যেন বিষ্ণুপুরী হাত ভিন্ন মুখর হয়ে উঠতে চায় না।

বিষ্ণুপুরের সার্থক স্বরসাধকদের মধ্যে সঙ্গীতগুরু রামশঙ্কর ভট্টাচার্য,

রামকেশব ভট্টাচার্য, কেশবলাল চক্রবর্তী, ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, যদুনাথ ভট্টাচার্য বা যদু ভট্ট, দীনবন্ধু গোস্বামী, অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, উদয়চন্দ্র গোস্বামী, রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র চক্রবর্তী, হারাধন চক্রবর্তী, অনন্তলাল চক্রবর্তী, দ্বারিকানাথ চক্রবর্তী, কৃষ্ণনাথ ও নীলমাধব চক্রবর্তী, জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী বা জ্ঞানগোঁসাই, হলধর গোস্বামী বা হলুগোঁসাই, নকুড়চন্দ্র গোস্বামী প্রভৃতি সঙ্গীতজ্ঞদের নাম উল্লেখযোগ্য। মৃদঙ্গবাদকদের মধ্যে মৃদঙ্গবিশারদ রামমোহন চক্রবর্তী, জগৎচাঁদ গোস্বামী, কীর্তিচাঁদ গোস্বামী, জগন্নাথ মুখোপাধ্যায়, মৃদঙ্গাচার্য শ্রীপতি অধিকারী, অনন্তলাল মুখোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র সরকার, গিরীশ চট্টোপাধ্যায়, ভৈরব চক্রবর্তী প্রভৃতি দেশজোড়া খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

বিষ্ণুপুরের সঙ্গীত-সাধনা শুধু মল্লভূমের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। বাংলার সঙ্গীত-সমাজে বিষ্ণুপুরের সঙ্গীতাচার্যরা দীর্ঘকাল ধরে আধিপত্য বিস্তার করে এসেছেন। বাংলাদেশের ধনী রাজবংশ ও জমিদারবংশে প্রধানত তাঁরাই সঙ্গীতের সভাচার্যের পদ অলঙ্কৃত করেছেন এবং সঙ্গীতানুরাগীদের সঙ্গীত শিক্ষা দিয়েছেন। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। সঙ্গীতাচার্য যদুনাথ ভট্টাচার্য (যদু ভট্ট) বিভিন্ন রাজসভায় আচার্যের পদে নিযুক্ত ছিলেন। মানভূম-পঞ্চকোটের রাজা তাঁকে 'রঙ্গনাথ' উপাধি দিয়েছিলেন এবং ত্রিপুরার মহারাজারা তাঁকে বলতেন 'তানরাজ।' ত্রিপুরার রাজসভায় তিনি দীর্ঘকাল সভাগায়ক ছিলেন। সঙ্গীতাচার্য দীনবন্ধু গোস্বামীর পুত্র গঙ্গানারায়ণ গোস্বামী ময়মনসিংহের মহারাজার সঙ্গীত-পরিষদে আচার্যপদে নিযুক্ত ছিলেন। ধামার গানে তাঁর বিশেষ খ্যাতি ছিল। মৃদঙ্গ-বিশারদ জগৎচাঁদ গোস্বামীর পুত্র সুপ্রসিদ্ধ রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীকে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীতে সঙ্গীত-চর্চার জন্য এনেছিলেন এবং ভারত সঙ্গীত-সমাজের আচার্যপদে নিযুক্ত করেছিলেন। তারপর কাশীমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী তাঁকে কাশীমবাজারে নিয়ে যান এবং তাঁর সঙ্গীতসভার আচার্যপদে নিযুক্ত করেন। তখন বাংলাদেশের লোক রাধিকা গোঁসাইয়ের কণ্ঠস্বর শোনার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকত। রাধিকা গোঁসাইয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র হলেন জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী (জ্ঞান গোঁসাই)।

সঙ্গীতবিশারদ রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় কুচিয়াকোলের রাজার সভাচার্যের পদে কিছুকাল নিযুক্ত থাকার পর, নাড়াজোলের রাজা নরেন্দ্রলাল খাঁর রাজসভায় যোগ দেন। নাড়াজোলরাজের আগ্রহে ও উৎসাহে তিনি বিখ্যাত 'সঙ্গীত-মঞ্জরী' গ্রন্থ রচনা করেন। সঙ্গীতাচার্য ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর কাছে পাথুরিয়াঘাটার মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর সঙ্গীতশিক্ষা করেন এবং তাঁদের সভায় তিনি দীর্ঘকাল আচার্যের পদ অলঙ্কৃত করেন। রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের উদ্‌যোগে ও অর্থব্যয়ে কলকাতা শহরে প্রথমে যে 'বঙ্গসঙ্গীত বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠিত হয়, আচার্য ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী তার তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন। এই বিদ্যালয়ের জন্য তিনি কণ্ঠসঙ্গীত ও যন্ত্রসঙ্গীত সম্বন্ধে কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেন। সঙ্গীতাচার্য রামকেশব ভট্টাচার্য কুচবিহার জনসভায় আমন্ত্রিত হয়ে যান এবং পরে কলকাতা শহরের বিখ্যাত ধনিক ছাতুবাবু ও লাটুবাবুদের গৃহে (রামদুলাল দে-র দুই পুত্র) অবস্থান করেন। সঙ্গীতাচার্য কেশবলাল চক্রবর্তী কলকাতার বিখ্যাত ধনিক তারকনাথ প্রামাণিকের গৃহে সঙ্গীতগুরু ছিলেন। ছাতুবাবু-লাটুবাবুর বৈঠকখানার মতন কলকাতায় তখন যে সব ধনিক বাবুদের বৈঠকখানায় নিয়মিত সঙ্গীতের আসর বসত, তার মধ্যে তারক প্রামাণিকের বৈঠকখানাও উল্লেখযোগ্য। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কেও মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর গায়কপদে নিযুক্ত করেন। মহারাজার মৃত্যুর পর সুরেন্দ্রবাবু ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গীতাচার্যের পদ গ্রহণ করেন।

এই কয়েকটি দৃষ্টান্ত থেকে এইটুকু পরিষ্কার বোঝা যায় যে, বাংলার সঙ্গীতসমাজে বিষ্ণুপুরের গায়করা একসময় রীতিমত প্রভুত্ব করেছেন। কলকাতার ঠাকুর-পরিবার, অন্যান্য রাজবংশ ও ধনিক পরিবারে সঙ্গীত-শিক্ষক ও আচার্যের পদ তাঁরাই অলঙ্কৃত করেছেন। উনবিংশ শতাব্দীতে কলকাতা শহরের ধনিক পরিবারের পৃষ্ঠপোষকতায় সঙ্গীত-সাধনায় যে নতুন উদ্যম দেখা দেয়, প্রধানত বিষ্ণুপুরের সঙ্গীতাচার্যরাই তাকে সার্থক করে তোলেন। বাংলা সঙ্গীতের ক্ষেত্রে যে নবজাগরণের সূত্রপাত হয়, বিষ্ণুপুরের সাধকরাই তার প্রেরণা যোগান। এই কারণে বাংলার সুরসাধনার ইতিহাসে বিষ্ণুপুরকে সুরতীর্থ বললে ভুল হয় না এবং সঙ্গীতের এই ইতিহাস বাদ দিলে বিষ্ণুপুরের ইতিহাসও সম্পূর্ণ হয় না।

ময়নাপুর

ইতিহাসের শূন্যস্থানগুলি মানুষের মন অতি সহজে কিংবদন্তীর সৌধ রচনা করে ভরাট করে নেয়। এরকম শূন্যতা ভরাটের নিদর্শন বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে ঘুরলে অসংখ্য দেখা যায়। শুধু তাই নয়। একই কিংবদন্তী স্বচ্ছন্দে বিভিন্ন স্থানে বিচরণ করে। বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর মহকুমার ময়নাপুর গ্রাম এইরকম বিচিত্র সব কিংবদন্তীর ঐশ্বর্যমণ্ডিত। ধর্মমঙ্গল-কাহিনীর রাজা লাউসনের রাজধানী, 'শূন্যপুরাণ'-রচয়িতা রামাই পণ্ডিতের গ্রাম ইত্যাদি জনশ্রুতিকে আশ্রয় করে ময়নাপুর নিজের অলিখিত ইতিহাস নিজেই রচনা করেছে। সাধারণ মানুষ আর যারই কাঙাল হোক, কল্পনার কাঙাল যে নয়, তার প্রমাণ বাংলার অন্যান্য গ্রামের মতন ময়নাপুরে এলেও বোঝা যায়।

কিন্তু জনশ্রুতি যে কেবল শূন্যতায় বিচরণ করে, তার কোন জটশিকড় নেই, তা সবসময় সত্য নয়। অলিখিত ইতিহাসের অনেক প্রয়োজনীয় উপাদান কিংবদন্তীর মধ্যে আত্মগোপন করে থাকতে পারে, একথা আগেও বলেছি। তবে কিংবদন্তীর চোরাবালিতে ইতিহাস-সন্ধানীদের খুব সাবধানে চলতে হয়। এই কথা মনে করে বিষ্ণুপুর থেকে ময়নাপুর গিয়েছিলাম। অনেকটা পথ, বিষ্ণুপুর থেকে দক্ষিণ-পূর্ব কোণে প্রায় বারো-চোদ্দ মাইল পথ হবে। সুবিস্তৃত শালবনের কোলঘেঁষা বাঁকুড়ার নীরস রুক্ষ মেটে পথ, যেমন উগ্র তেমনি কঠিন। বাহন দ্বিচক্রযান।

ময়নাপুর পৌঁছে সবই দেখলাম,—লাউসেনের রাজধানী ও 'শূন্যপুরাণ' রচয়িতার বাসস্থান হতে হলে যেসব ঐতিহাসিক স্মৃতির নিদর্শন থাকা দরকার তার প্রায় সবই ময়নাপুরে আছে। যেমন আছে মেদিনীপুর জেলার তমলুক থেকে কিছু দূরে ময়নাগড়ে। রাজা লাউসেন ও রামাই পণ্ডিতকে নিয়ে ময়নাপুর (বাঁকুড়া) ও ময়নাগড়ে (মেদনীপুর) যে দ্বন্দ্ব, সেই একই দ্বন্দ্ব কবি চণ্ডীদাসকে নিয়ে ছাতনা (বাঁকুড়া) ও নান্নুরের (বীরভূম) মধ্যে রয়েছে। দীর্ঘকাল ধরে এই বাদপ্রতিবাদ চলে আসছে। এখানে সেরকম কোন বিতর্কের অবতারণা করবার কোন ইচ্ছা নেই আমার এবং দ্বন্দ্বের অবসান ঘটানোরও সাধ্য নেই। মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্ধমান ইত্যাদি জেলার মধ্যে

এরকম আরও অনেক ঐতিহাসিক বিষয় নিয়ে কল্পিত বাদানুবাদের সৃষ্টি করা হয়েছে, যার কোন সার্থকতা আছে বলে আমি মনে করি না।

ময়নাপুরের কথা বলি। ময়নাপুর পৌঁছবার পর গ্রামবাসীরা সব কিছু দেখালেন, আমিও দেখলাম। গ্রামে 'যাত্রাসিদ্ধি' ধর্মরাজ ঠাকুর আছেন এবং তাঁর 'পণ্ডিত' উপাধিধারী পূজারীরা রামাই পণ্ডিতের বংশধর বলে দাবি করেন। 'পণ্ডিত'দের বাড়ি দেখলাম, যাত্রাসিদ্ধি ধর্মশিলা দেখলাম, তাঁর মন্দিরের ভগ্নস্তূপ ও বর্তমান চালাঘরের মন্দিরও দেখলাম। রামাই পণ্ডিতের বংশধরদের সকলকে দেখলাম। একটি নাতিদীর্ঘ পুকুর দেখলাম, নাম 'হাকন্দ-দীঘি'। স্থানীয় লোক হাকন্দ-দীঘির জল গঙ্গাজলের মতন পবিত্র মনে করেন। দীঘির পাড়ে পাথরখণ্ডের একটি মন্দির দেখলাম, নাম হাকন্দ-মন্দির। হাকন্দ-পুকুরের মধ্যে দৃষ্টির অন্তরালে নাকি একটি মন্দির দীর্ঘকাল ধরে রয়েছে এবং সেখানে এক দেবী বিরাজ করেন। হাকন্দ-মন্দিরের মধ্যে একটি পাথর-চাপা গর্ত আছে, সেটি নাকি সুড়ঙ্গ এবং সেই সুড়ঙ্গপথে নাকি পুকুরের তলায় মন্দিরে যাওয়া যায়। এইরকমের সব 'নিদর্শন' দেখে বাঁকুড়ানিবাসী শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রায় ৩০।৩৫ বছর আগে বলেছিলেন:

"এই সকল কারণে আমি মনে করি মল্লভূমই লাউসেন ও রামাই পণ্ডিতের দেশ ছিল এবং তাহার মধ্যস্থলে ময়নাপুরই ময়নানগরের প্রাচীন স্মৃতি বহন করিয়া আসিতেছে। অবশ্য এটা আমার অনুমান মাত্র।" (শূন্যপুরাণ—চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত—বসুমতী সংস্করণ, পৃঃ ৭৪)।

কেবল 'অনুমানের' উপর নির্ভর করে এই ধরনের বিষয়ে কোন ঐতিহাসিক ইঙ্গিত করাও যুক্তিসঙ্গত নয়। এককালে আমাদের দেশে ঐতিহাসিক গবেষণা যখন বিশেষ প্রসারলাভ করেনি, তখন একদল 'পণ্ডিত' কুলজীগ্রন্থ ও কিংবদন্তীর দুই পক্ষবিস্তার করে বাংলাদেশের ইতিহাসের শূন্য ভিটের উপর যদৃচ্ছা উড়ে বেড়িয়েছেন। সরলবুদ্ধি গ্রাম্যলোকের সহজ কল্পনায় তাঁরা প্রচুর ইন্ধন যুগিয়েছেন এবং সেইজন্য একই স্মৃতিবিজড়িত একাধিক ঐতিহাসিক স্থানের আজ বাংলাদেশে অভাব নেই। কিন্তু অনুমান ইতিহাস নয়, রাজা-রাজড়াদের হুকুমে লিখিত কুলজীগ্রন্থও ইতিহাস নয়। কিংবদন্তীও সম্পূর্ণ ইতিহাস নয়। এসবের যে কোন ঐতিহাসিক মূল্য নেই তা নয়, বিচার-

বিশ্লেষণে তার মূল্য যাচাই করা রীতিমত শ্রমসাধ্য ব্যাপার। ময়নাপুর-প্রসঙ্গেও এই কথা মনে রাখা উচিত।

কিংবদন্তীর নিশ্চিন্ত আশ্রয় ছেড়ে ময়নাপুরের বাস্তব পরিবেশ থেকে তার ঐতিহাসিক ধারার কি ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাই দেখা যাক। প্রথমত ময়নাপুরের ভৌগোলিক অবস্থান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পূর্বদিকে মাইল পঁচিশ দূরে হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমা এবং দক্ষিণে মাত্র তিন চার মাইল দূরে মেদিনীপুর জেলার সীমানা। ময়নাপুর কেন্দ্র করে পঁচিশ-ত্রিশ মাইল ব্যাসার্ধ নিয়ে বৃত্ত টানলে যে অঞ্চলটি পাওয়া যায়, সেখানে ধর্মপূজার প্রচণ্ড প্রতিপত্তি অন্যতম লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। এর মধ্যে মেদিনীপুরের গড়বেতা, ঘাটাল অঞ্চল, হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার অনেক স্থান পড়ে। 'কালচার-জোন' হিসাবে এই অঞ্চলটিকে ধর্মপূজার একটি অন্যতম 'জোন' (Zone) বলা যায়। উত্তরে বীরভূম থেকে বর্ধমান পর্যন্ত এরকম ধর্মপূজার নির্দিষ্ট 'অঞ্চল' আছে। লক্ষণীয় হল, ময়নাপুর-আরামবাগ-ঘাটাল কেন্দ্রের পর পূর্বে ও দক্ষিণে ধর্মপূজার অবিমিশ্র রূপ ক্রমে মিশ্রিত রূপ ধারণ করে ধীরে ধীরে যেন ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে এসে মিলিয়ে গেছে। একটা বিশিষ্ট সংস্কৃতিধারার প্রবল তরঙ্গোচ্ছ্বাস ক্রমে যেন বিলীন হয়ে গেছে গঙ্গার বুকে। কোন বিশেষ একটি কেন্দ্রকে বা স্থানকে এই ধারার উৎসরূপে নির্দেশ করা অর্থহীন ও যুক্তিহীন। পরিষ্কার বোঝা যায়, রাঢ়দেশের সুদীর্ঘ পশ্চিম সীমান্ত—উত্তরের সাঁওতাল পরগণা থেকে দক্ষিণের ছোটনাগপুর পর্যন্ত বিস্তৃত অনার্য নিষাদ-সংস্কৃতির অন্যতম মহাকেন্দ্র থেকে, অজস্র শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে এই সংস্কৃতিধারার প্রবাহ পশ্চিম থেকে পূর্বে এসে ভাগীরথী-সঙ্গমে মিশে গেছে। এই সংস্কৃতিধারার একটা নিটোল নিজস্ব রূপ আছে, যা বাংলাদেশের আর অন্য কোন অঞ্চলে নেই। ব্রাহ্মণ্যধারার বা তথাকথিত আর্যধারার প্রাধান্য এখানে যে কত নগণ্য তা শহর ছেড়ে গ্রামাঞ্চলে ঘুরলে বুঝতে পারা যায়। উপরতলার সংস্কৃতি যে প্রধানত ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতি তা বুঝতে এতটুকু কষ্ট হয় না। শুধু তাই নয়। ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতিকে যে পদে-পদে কিভাবে তথাকথিত অনার্য-সংস্কৃতির সঙ্গে আপোষ করতে হয়েছে, রাঢ়দেশ বোধ হয় তার অন্যতম প্রধান ঐতিহাসিক সাক্ষী।

শুধু ময়নাপুরেই ধর্মঠাকুর অজস্র দেখা যায়। যাত্রাসিদ্ধি ধর্মশিলার সঙ্গে

অনেক ধর্মশিলা একত্রে পূজিত হন। নানা নামে তাঁরা পরিচিত। বাঁকুড়া রায়, ক্ষুদি রায়, শীতলনারায়ণ, চাঁদ রায় ইত্যাদি। একসময় বিভিন্ন স্থানে তাঁদের পূজা হত। পূজারী অভাবে এখন সকলে ময়নাপুরের প্রধান ধর্মরাজ যাত্রাসিদ্ধির আশ্রয় নিয়েছেন। বাঁকুড়া রায়ের একটি স্বতন্ত্র সুন্দর ইটের কারুকাজ-করা মন্দিরও আছে, অন্তত শতাধিক বছরের প্রাচীন মন্দির। হয়ত ধর্মপূজার এই আঞ্চলিক আধিপত্যের জন্যই এবং ময়নাপুরের ঐতিহাসিক নাম-সাদৃশ্যের জন্য ময়নাপুর গ্রামটিকে কেন্দ্র করে ধর্মমঙ্গল-কাহিনীর রাজা লাউসেন ও শূন্যপুরাণ রচয়িতা রামাই পণ্ডিতের উপকথা রচিত হয়েছে। হওয়া আশ্চর্য নয়।

✓ ধর্মের মূর্তিগুলি সবই কূর্মমূর্তি ও শিলামূর্তি। ছোট বড় মাঝারি নানা-রকমের মূর্তি যাত্রাসিদ্ধির কাছে আছে। তার মধ্যে একটি মূর্তি পূজারী পণ্ডিতরা পূজা করেন। মূর্তিটি গ্রাম থেকে কুড়িয়ে-পাওয়া একটি সুন্দর বুদ্ধমূর্তি। শুনলাম, এরকম নাকি আরও বুদ্ধমূর্তি এখানে পাওয়া গিয়েছিল, সেগুলি স্থানান্তরিত হয়েছে। ধর্মঠাকুরের অসংখ্য মূর্তির সঙ্গে ময়নাপুরের এই বুদ্ধমূর্তিগুলিই সবচেয়ে মূল্যবান ঐতিহাসিক সম্পদ বলে আমি মনে করি, অন্তত রাজা লাউসেন ও রামাই পণ্ডিতের কাহিনী-সম্পদের চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান। এই বুদ্ধমূর্তির সঙ্গে আরও যেসব আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসব-পার্বণের নিদর্শন আছে ময়নাপুরে সেগুলি মিলিয়ে দেখলে এই অঞ্চলের যে ঐতিহাসিক ধারার আভাস পাওয়া যায় তারও গুরুত্ব আছে।✓

ময়নাপুর গ্রাম অব্রাহ্মণ-প্রধান গ্রাম। গ্রামে ব্যগ্রক্ষত্রিয় (তেঁতুলে, কাঁসাইকুলে ও ম্যেটে), হাড়ি, ডোম প্রভৃতিদের বাস যথেষ্ট আছে। গ্রাম-দেবতাদের মধ্যে মনসা, চণ্ডী, শীতলা, কুদ্রা, বড়ম্ ও ভৈরবই প্রধান। গ্রামের মধ্যে গাছতলায় সবচেয়ে জাগ্রত দেবী চণ্ডী বিরাজ করেন। পাঁচমুড়োর (বাঁকুড়া) কুম্ভকারদের তৈরি মাটির হাতিঘোড়াই সর্বত্র দেখা যায় চণ্ডী মনসা ভৈরবরূপে বিরাজমান। গ্রামের পশ্চিমদিকে যজ্ঞেশ্বর শিব ও রক্ষাকালী আছেন, জাতি-বর্ণনির্বিশেষে সকলেরই উপাস্য দেবতা। শিবের কাছে চড়কের গাজন হয় ধূমধাম করে। দুর্গাপূজা কালীপূজাও সমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখযোগ্য হল, কালীপূজার পর ধীবররা 'ডাকাতে কালী'র পূজা করে

এবং কালীর প্রতিমূর্তি হল 'নরমুণ্ডের উপর প্রোথিত ত্রিশূল'। গ্রামের অন্যতম জমিদারবংশ মুখোপাধ্যায়দের গৃহের সংলগ্ন কালীঠাকুর ও তান্ত্রিক-সাধকের পঞ্চমুণ্ডির আসন আছে। এই বংশেরই পূর্বপুরুষ দেওয়ান চণ্ডীচরণ বহুদিন নিঃসন্তান থাকায় শ্মশানে কালীসাধনা করে 'কালীপ্রসাদ' নামে পুত্র-লাভ করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকের কথা। এই কালীপ্রসাদ বিখ্যাত তান্ত্রিক সাধক ছিলেন। ময়নাপুরে কালীমন্দির এবং তারই পাশে দু'টি শিবলিঙ্গ 'কালীপতি' ও 'কালীগতি' নামে তিনিই প্রতিষ্ঠা করেন। লোকে তাঁকে 'কালীরাজা' বলে ডাকত। কমলাকান্ত ও রামপ্রসাদের মতন তিনিও অনেক শ্যামাসঙ্গীত রচনা করে গেছেন। শোনা যায়, 'কালীসুধাসিন্ধু' নামে একখানি তন্ত্রগ্রন্থও তিনি রচনা করেন এবং 'কুলবধূ ইব' (কুলবধূর মতন) অতি গোপনে সেটি রক্ষা করতে বলে যান।

ময়নাপুর গ্রামে বুদ্ধ, ধর্ম ও তন্ত্রের এই বিকাশ থেকে যে সংস্কৃতিধারার ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তার বিশেষ গুরুত্ব আছে। ময়নাপুর বাঁকুড়া জেলার তথা মল্লভূমের একটি প্রাচীন সংস্কৃতিকেন্দ্র। রুদ্রা, বড়ম, ভৈরব ইত্যাদি অনার্য সংস্কৃতির সুস্পষ্ট নিদর্শন। বজ্রাসনে উপবিষ্ট একাধিক বুদ্ধমূর্তি এককালে এইস্থানে বজ্রযানের প্রাধান্যের সূচনা করে। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত তান্ত্রিক ধর্মের প্রাধান্য এই ধারার স্বাভাবিক পরিণতি বলেই মনে করা যেতে পারে। চণ্ডী, কালী, আখড়া কালী, ডাকাতে কালী, পঞ্চমুণ্ডির আসনে সাধনা ইত্যাদি তার প্রমাণ এবং ধীবর থেকে মুখোপাধ্যায় পর্যন্ত ময়নাপুরের সকলে উগ্র তান্ত্রিক উপাসক। নরমুণ্ডের উপর ত্রিশূল আজও কালীর প্রতীকস্বরূপ পূজিত হয়। শিব যেমন সর্বত্র থাকেন তেমনি আছেন, কিন্তু তাঁর পাশে রক্ষাকালী আছেন। এরই মধ্যে ধর্মপূজার প্রাধান্যও দুর্বোধ্য নয়। ইতিহাসের একটা ধারাবাহিক উত্থান-পতনের চিহ্ন ময়নাপুরের এই সব নিদর্শনের মধ্যে রয়েছে। তার সাংস্কৃতিক গুরুত্ব আছে। আধুনিক অনুসন্ধানীরা অনেকেই যখন রাজা লাউসেন ও রামাই পণ্ডিতের ঐতিহাসিক অস্তিত্বেই সন্দেহ করেন এবং যাঁরা করেন না তাঁদের মধ্যেও যখন তাঁদের প্রকৃত সত্তা ও কালনির্ণয় নিয়ে মতভেদ আছে তখন ময়নাপুর প্রসঙ্গে তার গুরুত্ব দেওয়া উচিত নয়। তার চেয়ে ময়নাপুরের সাংস্কৃতিক গুরুত্ব অন্যদিক দিয়ে যেভাবে নির্দেশ করার চেষ্টা করেছি, মনে হয় তার যৎকিঞ্চিৎ মূল্য থাকলেও থাকতে পারে। ময়নাপুরের

ইতিহাস থেকে মনে হয়, বজ্রযানী বৌদ্ধধর্ম, ধর্মঠাকুর পূজা ও তান্ত্রিক ধর্ম, এই ত্রিধারার মধ্যে কোন গভীর যোগসূত্র আছে।

ময়নাপুরের 'হাকন্দ মেলা', ধর্মোৎসব ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। কথিত 'হাকন্দ মন্দিরের' কাছে 'কৈলাসের' মৃন্ময়মূর্তিগুলি (পৌরাণিক) মৃৎশিল্পের চমৎকার নিদর্শন। মধ্যে মধ্যে মূর্তিগুলি নতুন করে তৈরি করা হয়। মৃৎশিল্পীর অভাবে ভবিষ্যতে আর হবে কি না বলা যায় না। মল্লভূমের সমৃদ্ধি-কালে, বোঝা যায়, ময়নাপুর সেই সমৃদ্ধির অন্যতম কেন্দ্র ছিল। মল্লভূম আজ অতীত ইতিহাসের অধ্যায় মাত্র, ময়নাপুরও তার একটি জীর্ণ পৃষ্ঠা ছাড়া কিছু নয়, যার পাঠোদ্ধার করা সত্যই কঠিন।

বাহুলাড়া

'বাহুলাড়া' সাধারণ গ্রামের লোকের কাছে 'বোলাঢ়া' বলে পরিচিত। 'লাঢ়া' বা 'রাঢ়া' হল রাঢ়দেশ। জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর লাঢ়দেশেই ভ্রমণ করেছিলেন। খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের কথা। মহাবীর স্বয়ং না হলেও, জৈন শ্রমণরা যে রাঢ়দেশে ধর্ম প্রচারোদ্দেশ্যে ভ্রমণ করেছিলেন, তা অবিশ্বাস্য নয়। রাজেন্দ্রচোলের তিরুমলয় লিপির 'উত্তীরলাঢ়ম্' এবং 'তক্কণলাঢ়ম্' উত্তররাঢ় ও দক্ষিণরাঢ় দেশকেই বোঝায়। এই লাড়-লাড়ম্-লাড়া নামই 'বোলাড়া' ও 'বাহুলাড়া' নামের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠেছে। বোলাড়ার আশপাশের আরও একাধিক গ্রামের নামান্তে 'লাড়া' আছে—যেমন 'বেলাড়া', 'কুলাড়া'। মনে হয় যেন লাড়দেশের অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছি।

বিষ্ণুপুর থেকে বাঁকুড়ার পথে 'ওন্দা গ্রাম' বা 'ওঁদা'। ওঁদা থেকে প্রায় তিন মাইল ভিতরে বাহুলাড়া গ্রাম। দ্বারকেশ্বর নদের তীরে বাহুলাড়া এবং বহু দূর থেকে বাহুলাড়ার সিদ্ধেশ্বর মন্দিরের চূড়া দেখা যায়। উত্তরে দ্বারকেশ্বর নদ ও কাঁটাবনি গ্রাম, দক্ষিণে মাকরকোল, পূর্বে হড়ড়া ও পশ্চিমে ছাপড়া, আরও দূরে বেলাড়া, কুলাড়া, ভেটাড়া প্রভৃতি গ্রাম, মধ্যে বাহুলাড়া-বোলাড়া। চারিদিকের গ্রামের নামের মধ্যে 'লাড়া' আর 'আড়া' শব্দের বিচিত্র ধ্বনি-প্রতিধ্বনি। সিদ্ধেশ্বর মন্দিরের সুউচ্চ শিখর পরিপার্শ্বকে দমন করছে। কতকাল ধরে করছে কেউ জানেন না, আজও কেউ সঠিকভাবে বলতে পারেননি। অনেক প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক বাহুলাড়ার এই বিখ্যাত সিদ্ধেশ্বর মন্দির নিয়ে আলোচনা করেছেন, অনেকে দেখেছেন, কিন্তু সকলের কাছেই বাহুলাড়ার ঐতিহাসিক বয়স এখনও রহস্যাবৃত হয়ে রয়েছে। সিদ্ধেশ্বর মন্দিরের বয়স নয়, বাহুলাড়ার বা বোলাড়ার বয়স। সিদ্ধেশ্বর মন্দির খাঁটি বাংলার মন্দির নয়, চমৎকার 'রেখ-দেউল'। বাংলাদেশে রেখ-দেউলের যে কয়েকটি নিদর্শন আছে তার মধ্যে বাহুলাড়ার দেউলটি সবচেয়ে সুন্দর, সবচেয়ে জমকালো। দুঃখের বিষয়, শিখর-শীর্ষের 'আমলক' ও 'কলসটি' নেই, ভেঙে পড়ে গেছে। থাকলে ভুবনেশ্বরের রেখ-দেউলের অপূর্ব সৌন্দর্য সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রেখে বাহুলাড়ার সিদ্ধেশ্বর-মন্দির আজও মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকত,

বাংলাদেশের বাঁকুড়া জেলায়। প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগের পূর্বাঞ্চলের বাৎসরিক রিপোর্টে (১৯২১-২২ ও ১৯২২-২৩ সাল) বাহুলাড়ার মন্দিরের বিবরণ আছে। প্রত্নতাত্ত্বিকরা মনে করেন, মন্দিরটি পালযুগের তৈরি। নলিনীকান্ত ভট্টশালী বলেছেন :

The Siddhesvara temple at Bahulara in the Bankura district is probably the finest specimen of a brick-built *REKHA* temple of the mediaeval period now standing in Bengal. (Iconography of Buddhist and Brahmanical Sculptures : p. xvi).

আনন্দকুমারস্বামীও তাই বলেছেন এবং সিদ্ধেশ্বরের দেউলটি দশম খৃষ্টাব্দে তৈরি বলে তিনি অনুমান করেন। শ্রীদীক্ষিত মনে করেন যে আরও দু'এক শতাব্দী পরে তৈরি, অর্থাৎ একাদশ বা দ্বাদশ শতাব্দীতে। শ্রীসরসীকুমার সরস্বতী দেউলের গড়ন ও অলঙ্করণ-বৈচিত্র্যের দিক থেকে মনে করেন, একাদশ শতাব্দীর। এই সময়কার কয়েকটি দেউলের নিদর্শন আজও বাংলাদেশে আছে, তার মধ্যে সুন্দরবনের 'জটার দেউল' উল্লেখযোগ্য। সিদ্ধেশ্বর মন্দিরের অনুরূপ রেখ-দেউল বাঁকুড়া জেলায় আরও আছে—তার মধ্যে বাঁড়েশ্বর ও শল্যেশ্বরের মন্দির অন্যতম। কিন্তু তার মধ্যেও মনে হয়, বাহুলাড়ার সিদ্ধেশ্বর মন্দিরের গড়নের একটু বিশেষত্ব আছে। মন্দিরের মধ্যস্থ তিনটি বৃত্তাকার 'বন্ধনের' বেষ্টন খাঁটি উড়িষ্যার মন্দিরের মতন। তা ছাড়া দেউলের শিখরের 'শুকনাসতুল্য' গড়নভঙ্গিও বাংলাদেশের অন্যান্য রেখ-দেউলের তুলনায় অনেক বেশি স্পষ্ট ও পরিস্ফুট। প্রত্নতত্ত্ববিভাগ থেকে সংস্কার করা হলেও, মন্দিরের ইঁটের গায়ে বিচিত্র অলঙ্করণের ও মণ্ডনের ঐশ্বর্য আজও বাংলার সূত্রধরদের আশ্চর্য কারিগরির সাক্ষী দিচ্ছে।

বাহুলাড়ার এই মন্দির দেখে মনে হয়—উত্তরভারতীয় শিখরযুক্ত 'নাগর' দেবালয়ের একটি প্রধান বিশিষ্ট ধারার বিকাশ ভারতের পূর্বাঞ্চলে উড়িষ্যা ও বাংলাদেশের এই সীমানার মধ্যে হয়েছিল। 'দ্রাবিড়' ও 'বেসর' দেবালয়ের গড়ন-রীতির সঙ্গে উত্তরভারতীয় নাগররীতির মিলন-মিশ্রণ ও লেনদেনও এই অঞ্চলে হয়েছে। রেখ-দেউল তারই এক বিশেষ প্রকাশভঙ্গি। উড়িষ্যায় ও পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষ করে বাংলার মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, মানভূম, বর্ধমান, বীরভূম অঞ্চলে

একই সময়ে বা কিছু আগে-পরে রেখ-দেউলের বিকাশ হয়। মনে হয়, অষ্টম খৃষ্টাব্দ থেকে একাদশ-দ্বাদশ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। তারপর ক্রমে এই বিশেষ রীতি উড়িষ্যায় সীমাবদ্ধ হয়ে বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করে এবং বাংলার শিল্পীরা আর এক ধাপ অগ্রসর হয়ে দেবালয়ের সঙ্গে লোকালয়ের ব্যবধান ঘুচিয়ে দেন। বাংলা দোচালা ও চারচালা ঘরের মতন তাঁরা মন্দির তৈরি করেন এবং পূর্বের রেখ-দেউলটির প্রতীক তখন 'রত্ন' বা অলঙ্কাররূপে ব্যবহৃত হয়। 'পঞ্চরত্ন' ও 'নবরত্ন' মন্দিরের রত্নগুলি রেখ-দেউলেরই প্রতীক ছাড়া কিছু নয়।

বাহুলাড়ার মন্দির সিদ্ধেশ্বর শিবের মন্দির। মন্দিরের মধ্যে শিবলিঙ্গ ছাড়াও তিনটি বড় বড় পাষাণ-মূর্তি আছে। একটি গণেশের মূর্তি, মধ্যে জৈন পার্শ্বনাথের মূর্তি, পাশে সুন্দর একটি মহিষমর্দিনী মূর্তি। শিব আশেপাশে আরও অনেক আছেন। পাঁচাল গ্রামে আছেন রত্নেশ্বর শিব, চুয়ামুসিনা গ্রামে আছেন ভুগ্নেশ্বর শিব। চৈত্রসংক্রান্তির সময় মহাসমারোহে শিবের গাজন হয় বাহুলাড়ায় এবং উৎসব উপলক্ষে তিনদিনব্যাপী মেলা হয়। আগেকার তুলনায় সমারোহ এখন কমে গেলেও, আজও মেলায় চার-পাঁচ হাজার লোকের সমাগম হয়। গাজনে আগে কয়েকশত 'ভক্ত' বা সন্ন্যাসী হত এবং পিঠফোঁড়া বাণ হত। চড়কগাছে পিঠে বাণ ফুঁড়ে ভক্তরা দে-পাক, দে-পাক করে পাক খেতেন। এখন ভক্তের সংখ্যা একশ-দেড়শ জন হয় এবং পিঠবাণ হয় না। তা না হলেও অন্যান্য বাণফোঁড়া এখনও হয় সিদ্ধেশ্বরের গাজনে। যেমন জিব-বাণ কপাল-বাণ ইত্যাদি। এখনও চৈত্রসংক্রান্তির আগের দিন পাটভক্তা বা প্রধান ভক্তা স্নান করে, লোহার কাঁটা-বেঁধা পাটাতনের উপর চিৎ হয়ে শুয়ে, বুকের উপর ব্রাহ্মণ পূজারীকে বসিয়ে, ঘাট থেকে গাজনতলায় আসেন। অন্যান্য ভক্তরা বেতের ছড়ি ঠুকতে ঠুকতে—"ব্যোম্ ব্যোম্ শিব শঙ্কর"—ধ্বনি দিতে দিতে তাঁর অনুগমন করেন। বাহুলাড়ায় চাষী, তিলি, সদগোপ, কায়স্থ, ব্রাহ্মণ, নায়েক খয়রা, বাউরী, ধীবর প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির লোকের বাস থাকলেও, প্রধানত ভক্ত্যা হন নায়েক, খয়রা, বাউরী, ধীবর প্রভৃতি জাতির লোকেরাই বেশি। উৎসবটাও প্রধানত তাঁদেরই। কাছাকাছি ধর্মঠাকুরও আছেন এবং তাঁরও গাজন-উৎসব হয়।

শিবপূজা ও শৈব-উৎসব ছাড়াও বাহুলাড়ার অন্য ইতিহাস আছে। সেই ইতিহাস অনেকদূর অতীত পর্যন্ত বিস্তৃত মনে হয়। আজও তার কিছু কিছু

নিদর্শন ছড়িয়ে আছে বোলাড়ায়। সিদ্ধেশ্বর মন্দিরের কাছে গেলেই দেখা যায়, মন্দিরটি একটি উচ্চভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত। চারপাশের জমি থেকে বেশ উঁচুতে, অনেকটা জায়গা জুড়ে, মন্দিরের চৌহদ্দি। এই উঁচু চৌহদ্দির চারিদিকে অনেকগুলি ইটের স্তূপ আজও পরিষ্কার দেখা যায়। প্রত্নতত্ত্ববিভাগ থেকে প্রায় বছর ত্রিশ আগে মাটি খুঁড়ে এই স্তূপগুলি পাওয়া গিয়েছিল। প্রায় উনিশটি স্তূপ তখন পাওয়া গিয়েছিল, তার মধ্যে ষোলটি বৃত্তাকার স্তূপ। এই স্তূপই হল বৌদ্ধদের 'শারীরিক চেতিয়'। বৌদ্ধ শ্রমণদের মৃত্যুর পর তাঁদের দেহভস্মাবশেষ 'অস্থিকুম্ভের' মধ্যে রেখে মৃত্তিকাগর্ভে প্রোথিত করা হত এবং তার উপরে একটি বৃত্তাকার (সাধারণত) মাটির বা ইটের 'স্তূপ' (পালিতে 'থূপ', সিংহলী 'দাগোবা') নির্মাণ করা হত। সিদ্ধেশ্বর মন্দিরের পার্শ্বস্থ স্তূপ-গুলি দেখে প্রত্নতাত্ত্বিকরা অনুমান করেন যে, এইখানে আগে বৌদ্ধদের একটি কেন্দ্রও ছিল। এতগুলি স্তূপের এ রকম একত্র সন্নিবেশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে হয়। কিন্তু আজ পর্যন্ত এ অঞ্চলটি যত্ন করে খুঁড়ে দেখা হয়নি, কি পাওয়া যায় না যায়। খুঁড়ে দেখলে প্রত্নতত্ত্ববিভাগের কর্তারা লাভবান হবেন বলেই মনে হয়। বাহুলাড়া ও সিদ্ধেশ্বর মন্দিরের পরিবেশের মধ্যেই এ রকম ইঙ্গিত রয়েছে। উচ্চভূমি, যেখানে মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত, তার চারিদিকে বড় বড় দীঘি ছিল এবং পাশেই ছিল দ্বারকেশ্বর নদ। শৈবধর্মীদের প্রাধান্যের পূর্বে বৌদ্ধ ও জৈনধর্মীরাও এখানে প্রভুত্ব করে গেছেন বলে মনে হয়। সিদ্ধেশ্বরের মন্দিরের মধ্যে আজও যে মূর্তি পূজিত হচ্ছে তা জৈন তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের মূর্তি। জৈনধর্মের প্রতিপত্তি খৃষ্টপূর্ব যুগ থেকে প্রায় খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত বজায় ছিল বলা চলে। পালযুগে বৌদ্ধদের প্রাধান্য বাংলাদেশে রীতিমত ছিল, অন্যত্র ম্লান হয়ে গেলেও।

তাই মনে হয়, বাহুলাড়া-বোলাড়ার 'লাড়া' এবং আশপাশের কুলাড়া, বেলাড়া প্রভৃতির 'লাড়া' আর জৈনগ্রন্থের 'লাড়া ও লাড়' দেশের শব্দসাদৃশ্য কাল্পনিক নয়। বাহুলাড়া গ্রাম বাংলার ইতিহাসের একাধিক যুগ উত্তীর্ণ হয়েছে বলে মনে হয়। ইতিহাসের অনেক পর্বান্তরের চিহ্ন এখনও ঐ উচ্চ ভূমির গর্ভে লুকিয়ে আছে, সিদ্ধেশ্বরের মন্দির যার উপর প্রতিষ্ঠিত। চারিদিকের স্তূপগুলি বৌদ্ধদের স্তূপ বলেই মনে হয়, জৈনদেরও হতে পারে। জৈনরা যদিও স্তূপ-পূজা বিশেষ করতেন না, তবু কুষাণ যুগে মথুরায় জৈনধর্মীদের মধ্যে

স্তূপ-পূজার প্রচলন ছিল দেখা যায়। বাহুলাড়ার সিদ্ধেশ্বর-মন্দিরের এই প্রাঙ্গণটিতে আজ শিবের গাজনের অনুষ্ঠান হলেও একসময় জৈন ও বৌদ্ধদের স্তূপার্চনাতেও সরগরম ছিল মনে হয়। তখনও সিদ্ধেশ্বরের মন্দির তৈরি হয়নি, কেবল স্তূপবেষ্টিত উচ্চটিলার মতন ছিল স্থানটি। তার অনেক পরে ঐ 'স্তূপ' শিখরাকারে দেউল ও দেবালয়ের উপর গড়ে উঠেছে—অষ্টম-নবম থেকে একা-দশ-দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে। বাহুলাড়ার সিদ্ধেশ্বরের দেউলটিও তখন তৈরি হয়েছে—জৈন ও বৌদ্ধরা বাংলাদেশ থেকে যখন প্রায় বিদায় নিয়েছেন। শৈব ও তান্ত্রিকরা তখন আধিপত্য বিস্তার করেছেন। আজ পর্যন্ত তাঁদেরই আধিপত্য বোলাড়ায় অক্ষুণ্ণ রয়েছে।

এক্তেশ্বর

বাঁকুড়া শহর থেকে প্রায় দু'মাইল দূরে এক্তেশ্বর গ্রাম। গ্রামদেবতা এক্তেশ্বর শিবের নামে গ্রামের নাম। দ্বারকেশ্বর নদের উত্তর তীরস্থ গ্রাম। অধিষ্ঠিত দেবতা শিবের নাম থেকে গ্রামের নামকরণ হয়েছে, না গ্রামের নামে শিবের নামকরণ হয়েছে, আজ আর তা সঠিকভাবে বলা যায় না। বর্ধমান, বাঁকুড়া জেলায় এইরকম গ্রামদেবতা শিবের নামে একাধিক গ্রামের নাম আছে। তা থেকে আর কিছু না হোক, এই সব অঞ্চলে শৈব ও শাক্ত ধর্মের প্রাধান্য সূচিত হয়।

রাঢ়েশ্বর (রাঢ়ের ঈশ্বর), মল্লেশ্বর (মল্লভূমের ঈশ্বর), দেমুড়েশ্বর, মন্তেশ্বর, বিল্বেশ্বর ইত্যাদি শিবের শত শত নাম আছে বাংলাদেশে। শিব নেই ও শিবমন্দির নেই, এমন গ্রাম বাংলাদেশে খুব অল্পই আছে। গ্রামদেবতা বা গ্রামের অধিষ্ঠিত ঈশ্বর বলে গ্রামের নামে তাঁর নাম এবং নামেরও সেইজন্য অন্ত নেই। বাংলার শিব আজ আর কেবল শৈব ও শাক্তদের দেবতা ন'ন। শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব—সর্বধর্মাচারী ও সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবতা তিনি, বাংলার গ্রামদেবতা, বাঙালীর গৃহদেবতা। কিন্তু তাহলেও শিবের অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিপত্তি দেখে মনে হয় যেন একসময় বাংলার ঘরে ঘরে তন্ত্রোক্ত বাণী প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠেছিল এবং বাংলার জনমন তাতে সাড়া দিয়েছিল—

আদৌ শিবং পূজয়িত্বা শক্তিপূজা ততঃ পরং।
অতএব মহেশানি আদৌ লিঙ্গং প্রপূজয়েৎ ॥
—(প্রাণতোষণী-উদ্ধৃত তোড়লতন্ত্রবচন)

"আগে শিবপূজা করবে, পরে শক্তিপূজা করবে। অতএব মহেশানি! আগে শিবপূজা করবে।" এই তন্ত্রবচনের মাহাত্ম্য এমনভাবে প্রচারিত হয়েছিল বাংলার লোকসমাজে যে বিষ্ণুপূজা বা শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মের প্রবল জোয়ারের মুখেও বাংলার শিব ও শক্তি ভেসে যান নি, তার সঙ্গে একাকার হয়ে মিশে গেছেন। শিবের এই প্রচণ্ড শক্তির উৎস কোথায়, বিশেষ করে বাংলার শিবের, তা গভীরভাবে অনুধাবন করা উচিত।

শিবমূর্তি বাংলাদেশে আছে, তার চমৎকার বর্ণনাও আছে প্রাচীন বাংলা

সাহিত্যে। বাংলার জনসাধারণের মানবিক মূর্তির সঙ্গে বাংলার গণদেবতার দেবমূর্তির কোনও পার্থক্য নেই—এমনকি, জীবনযাত্রা, পেশা ও নেশা পর্যন্ত ভক্ত ও ভগবানের একই। কিন্তু বাংলার গ্রামে গ্রামে যে শিব দেবালয়ে প্রতিষ্ঠিত, তাঁর কোন মূর্তি নেই, তিনি অনাদি লিঙ্গমূর্তি। বাংলার ঘরে ঘরে যে শিবমূর্তি গড়া হয়, তাও কোন ভাস্করে গড়েন না, ঘরের মেয়েরা গড়েন, মাটির শিবলিঙ্গ। এই লিঙ্গরূপী শিবপূজা প্রবর্তনের কাহিনী লিঙ্গপুরাণ, শিব-পুরাণ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, স্কন্দপুরাণ প্রভৃতি একাধিক পুরাণ ও উপপুরাণে বর্ণিত হয়েছে। এখানে তার পুনরাবৃত্তির অবকাশ নেই। কেবল লিঙ্গপুরাণের একটি উপাখ্যানের কথা বলছি:

প্রলয়ার্ণবমধ্যে তু রজসা বদ্ধবৈরয়োঃ।
এতস্মিন্নন্তরে লিঙ্গমভবচ্চাবয়োঃ সুরাঃ।
বিবাদশমনার্থঞ্চ প্রবোধার্থঞ্চ ভাস্বরম্।
জ্বালামালাসহস্রাভং কালানলশতোপমম্॥
—লিঙ্গপুরাণ, ১৭ অঃ

"প্রলয়সমুদ্রের মধ্যে রজোগুণ-প্রভাবে আমাতে (ব্রহ্মাতে) ও বিষ্ণুতে বিরোধ হচ্ছিল। এমন সময় বিরোধভঞ্জন ও প্রবোধপ্রদানের জন্য শত শত কালাগ্নি-স্বরূপ ও সহস্র অগ্নিশিখাতুল্য দীপ্তিমান লিঙ্গ উৎপন্ন হল।" অর্থাৎ উপাখ্যানের মর্ম হল, একবার ব্রহ্মা ও বিষ্ণুতে ঘোরতর বিরোধ হয়। ব্রহ্মা বলেন,—'আমি বিশ্বের কর্তা', বিষ্ণু বলেন,—'আমি বিশ্বের কর্তা'। বিরোধভঞ্জন করেন শিব অগ্নিশিখাতুল্য লিঙ্গরূপে আবির্ভূত হন।

এরকম অজস্র উপাখ্যান ও কাহিনী আছে। কাহিনীর মধ্যে বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের বিরোধের ইঙ্গিত আছে এবং শিবলিঙ্গের প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিতও সুস্পষ্ট। কিন্তু লিঙ্গরূপী শিবের উৎপত্তির কাহিনী লেলিহান অগ্নি-শিখার মধ্যেও তেমন স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। শিবের অনাদি রূপ মানবেতিহাসের কোন্ আদিম স্তর পর্যন্ত প্রসারিত, তা নিয়ে পণ্ডিত সমাজে অনেক গবেষণা ও আলোচনা হয়েছে। শিব নিয়ে এক সুবৃহৎ শিবায়নও রচনা করা যায়। বাংলাদেশে একাধিক 'শিবায়ন' কাব্যও রচিত হয়েছে।

লিঙ্গরূপী শিব প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে হয় প্রাগৈতিহাসিক যুগের আদিম মানুষের লিঙ্গোপাসনার কথা (Phallic worship)। তারপর মনে হয়,

আদিম মানুষের শ্মশানে ও গোরস্থানে উন্নতশির শিলাস্তম্ভের কথা এবং সেই শিলাস্তম্ভ পূজার কথা। প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নতত্ত্ববিদরা সমাধিক্ষেত্রের এই শিলাস্তম্ভকে 'মেনহির' (Menhir) বলেন। পূর্বভারতে ও দক্ষিণ-ভারতে আদিম মানুষের অসংখ্য সমাধিক্ষেত্রে অজস্র 'মেনহির' দেখা যায় এবং সেই 'মেনহির' তারা নিয়মিত পূজা করে। সমাধিক্ষেত্রে ঘুরে ঘুরে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌রা বিশেষভাবে অনুসন্ধান করে দেখেছেন—অছেদিত (undressed) রুক্ষ স্বাভাবিক সরল-রেখার শিলাস্তম্ভ বা 'মেনহির' ক্রমে ক্রমে ছেদিত, খোদিত ও মার্জিত মেনহিরে পরিবর্তিত হয়ে শিবলিঙ্গের রূপ ধারণ করেছে এবং শৈব-সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে আদিমসমাজেও 'শিব' বলে পূজিত হচ্ছে (১৯১৫-'১৬ সালের ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিভাগের বাৎসরিক রিপোর্টে—দক্ষিণ ভারতের—এ-সম্বন্ধে লঙহার্স্টের আলোচনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য)। বাংলার শিবের উৎপত্তির আভাষ এর থেকেই পাওয়া যায়। প্রাচীন বাংলার এবং বর্তমান বাংলার প্রতিবেশী (উত্তরে ও পশ্চিমে) আদিবাসিদের শ্মশানে শ্মশানে মেনহির পূজার নিদর্শন আজও যথেষ্ট আছে। শিবের সঙ্গে শ্মশানও যে কেন অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, তাও বুঝতে কষ্ট হয় না।

বাঁকুড়ার এক্তেশ্বর-প্রসঙ্গে শিবের এই ভূমিকাটুকুর প্রয়োজন আছে। অনেকে হয়ত ভাবছেন, ধান ভানতে শিবের গীত কেন? যেদেশের মেয়েরা ধানভানার সময়েও শিবের গীত গান, সেদেশের অন্যতম শৈবতীর্থ এক্তেশ্বরের আলোচনাপ্রসঙ্গে শিবের কথা বলা নিতান্ত 'ধান ভানতে শিবের গীত গাওয়া' নয়। এক্তেশ্বর যাওয়ার আগে বাঁকুড়া শহরে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করে, অন্যান্য নানাবিষয়ের আলোচনার সময় 'এক্তেশ্বর' সম্পর্কেও আলোচনা করেছিলাম। বিদ্যানিধি মহাশয়ের মতে 'এক্তেশ্বর' হলেন 'একপাদেশ্বর'। বেদে 'একপাদেশ্বরের' উল্লেখ আছে। এক্তেশ্বর গেলাম। মন্দিরের সামনে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। এরকম নির্জন শান্ত পরিবেশের মধ্যে এমন বিচিত্র বিশাল মন্দির হঠাৎ দেখলে যে কেউ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবেন। মন্দিরের কথা পরে বলছি। বাইরে প্রচণ্ড রোদ, আলো ঝলমল করছে, একটুকরো মেঘেরও চিহ্ন নেই কোথাও। মন্দিরের ভিতরে দূর থেকে তাকিয়ে দেখলাম—গভীর অন্ধকার। কাছে গেলাম, আরও অন্ধকার মনে হল। প্রবেশদ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে উঁকি দিলাম—মনে হল

8
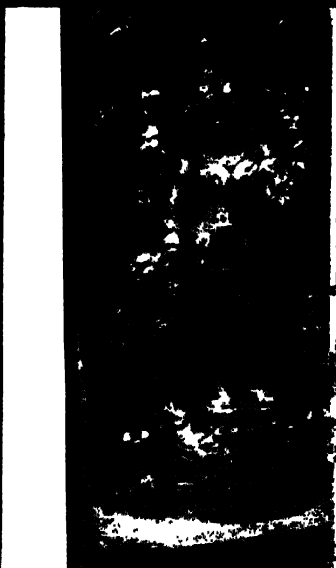
যেন অন্ধকারের একটা অতলস্পর্শ সুড়ঙ্গ পাতাল পর্যন্ত নেমে গেছে। পূজারীরা একজন বললেন—'চলুন, দর্শন করবেন'। কি দর্শন করব এবং কোথায়, কিছুই বুঝলাম না। প্রদীপ-হাতে পূজারীর পিছু পিছু ধাপে ধাপে নামছি এবং প্রতিমুহূর্তে মনে হচ্ছে উপরে ওঠার আর কোন আশা নেই। কিছু বলতেও সাহস হয় না, কেবল নেমে গেলাম। এইরকম নেমে গিয়েছিলাম কামরূপের কামাখ্যা মন্দিরে, কিন্তু সেখানে পাণ্ডা ও যাত্রীদের ভিড়ে তলিয়ে যাবার কথা একবারও মনে হয় নি। এক্তেশ্বরে মনে হল যেন তলিয়ে যাচ্ছি এমন এক জায়গায়, যার তলা বলে কোন পদার্থ নেই। হঠাৎ পূজারী বললেন—'বসুন এখানে'। কোথায় বসব? একবার মনে হল, এক্তেশ্বর, না 'একাকীশ্বর', না 'এককেশ্বর'? এরকম একাকীত্বের সঙ্গে যাঁর এমন নিবিড় একাত্মতা, তিনি এককেশ্বর, না একেশ্বর? প্রদীপের নিষ্প্রভ আলোয় পায়ের মতন কি একটা ভেসে উঠলো চোখের সামনে, পাষাণের পা। লিঙ্গমূর্তির বদলে পা, না উপরে পা, স্পষ্ট বোঝা গেল না।

শিবের বা রুদ্রের মূর্তিবৈচিত্র্যের অন্ত নেই। বিভিন্ন শাস্ত্রে নানারকম রুদ্রমূর্তির বর্ণনা দেওয়া আছে। 'বিশ্বকর্মশিল্প' ও 'রূপমণ্ডনে' বিভিন্ন রুদ্রমূর্তির পরিচয় আছে, তার মধ্যে বিরূপাক্ষ, রেবত, হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, সুরেশ্বর, জয়ন্ত, অপরাজিত প্রভৃতি রূপের সঙ্গে রুদ্রের 'একপাদ' রূপেরও বর্ণনা আছে। একপাদের বামহাতে খট্বাঙ্গ, বাণ, চক্র, ডমরু, মুদ্গর, বরদ, অক্ষমালা ও শূল; ডানহাতে ধনু, ঘণ্ট, কপাল, কৌমুদী, তর্জনী, ঘট, পরশু, ও চক্র (শক্তি)? শিল্পশাস্ত্র-বর্ণিত এই হল একপাদরূপী রুদ্রের মূর্তি (Elements of Hindu Iconography: T. A. Gopinath Rao: Vol 2, Part 2, p. 38৪)।

বিদ্যানিধি মহাশয়ের মতানুযায়ী এক্তেশ্বর যদি একপাদেশ্বর হন, তাহলে মূর্তির মধ্যে তার পরিচয় থাকা প্রয়োজন। কিন্তু এক্তেশ্বরের মূর্তিতে একপাদরূপী রুদ্রমূর্তির কোন লক্ষণই নেই। পূর্বে ছিল কিনা অবশ্য বলা যায় না, সুতরাং চূড়ান্ত কোন মতামত দেওয়া সম্ভব নয়। হয়ত বিদ্যানিধি মহাশয়ের কথাই ঠিক, কারণ দেবালয় যখন একাধিকবার সংস্কার করা হয়েছে তখন আসল মূর্তি যে নষ্ট হয়নি, বা স্থানান্তরিত হয়নি, তার কোন প্রমাণ নেই। কিংবদন্তী হল, সামন্তভূমের রাজার সঙ্গে মল্লভূম-বিষ্ণুপুরের রাজার

একবার প্রচণ্ড বিরোধ হয়, রাজ্যের সীমানা নিয়ে। বিরোধের মীমাংসা করেন স্বয়ং শিব এবং তখন উভয়ের নির্দিষ্ট সীমানার উপর এক্তেশ্বর শিব প্রতিষ্ঠিত হন। 'এক্তেশ্বর' কি তাহলে মল্লভূম ও সামন্তভূমের রাজাদের পরস্পরের রাজ্যের এক্তিয়ারের অভিভাবক ও ঈশ্বর বলে এক্তেশ্বর? কিংবদন্তীর অন্তরালে ইতিহাস প্রচ্ছন্ন থাকলেও থাকতে পারে।

এক্তেশ্বর বেশ প্রাচীন শৈবতীর্থ বলে মনে হয়। এক্তেশ্বর শিবের গাজন ও মেলাও বহুকালের প্রাচীন। ও'মালি সাহেব যখন বাঁকুড়া জেলার গেজেটিয়ার সঙ্কলন করেন, বছর পঞ্চাশ আগে, তখন তদানীন্তন বাঁকুড়ার কলেক্টর কুমার রমেন্দ্রকৃষ্ণ দেব তাঁকে এক্তেশ্বরের গাজনের একটি বিবরণ লিখে পাঠান। বিবরণটি প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ। পঞ্চাশ বছর আগেও এক্তেশ্বরে মহাসমারোহে শিবের গাজন ও মেলা হত। চড়ক উৎসবে বিভিন্ন রকমের বাণফোঁড়া হত, তার মধ্যে পিঠবাণও ছিল। ভক্তারা পিঠে লোহার বড়শী বিঁধে শালের চড়কগাছে পাক খেতেন, আর নিচে থেকে শিবশঙ্কর ধ্বনি দিতেন অন্যান্য ভক্তারা। আজকাল বে-আইনি বলে পিঠে বাণ ফুঁড়ে উৎসব করা বন্ধ হয়ে গেছে। আর একটি বিচিত্র উৎসবের কথা রমেন্দ্রকৃষ্ণ উল্লেখ করেছেন। গাজনের দিন রাতে জ্বলন্ত চিতার মতন আগুন জ্বালিয়ে ভক্তারা উৎসব করত এক্তেশ্বরে। উৎসবের নাম 'সতীদাহ' উৎসব। সতীদাহের প্রচলন যে এক সময় কি ব্যাপকভাবে হয়েছিল এ-অঞ্চলে, তা গাজনের উৎসবের সঙ্গে 'সতীদাহ' উৎসবের এই অনুকরণ ও অভিনয় দেখেই বোঝা যায়। বিচিত্র সংস্কৃতি-সংমিশ্রণের নিদর্শন!

এক্তেশ্বরের মন্দিরটি সবচেয়ে বিস্ময়কর। বাংলাদেশে ঠিক এই ধরনের মন্দির আর দ্বিতীয়টি আছে কি না, আমার জানা নেই। মনে হয় নেই। ১৮৭২-'৭৩ সালের প্রত্নতত্ত্ববিভাগের রিপোর্টে বেগলার সাহেব এক্তেশ্বর মন্দির সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন:

The temple is remarkable in its way; the mouldings of the basement are the boldest and finest of any I have seen, though quite plain. The temple was built of laterite ... (Report of a tour through the Bengal Provinces: Beglar: A. S. I. Report, 1872-73).

প্রায় সত্তর-পঁচাত্তর বছর আগে বেগলার যখন বাংলাদেশে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সন্ধানের জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, তখন এক্তেশ্বর মন্দির দেখেছিলেন। মন্দিরটি দেখে তাঁর মনে হয়েছিল যে, অন্তত পূর্বে তিনবার মন্দিরটি সংস্কার করা হয়েছে। মন্দিরের শিখরের উর্ধ্বাংশ ভেঙে পড়ে গেছে বলে তাঁর মনে হয়েছিল। আজও তাই মনে হয়। এরকম বিশাল স্তম্ভের মতন মন্দির বাংলায় দেখা যায় না। মন্দিরগাত্রের উদ্গত অংশগুলি দেখে মনে হয়, যখন সম্পূর্ণ শিখরটি ছিল, তখন মন্দিরটির উচ্চতাও ছিল যথেষ্ট। এক্তেশ্বর মন্দির 'বাংলা মন্দির' নয়। রেখদেউলের প্রতিটি অংশের বর্ধিত রূপ তার মধ্যে স্পষ্ট, কেবল শিখরশূন্য বলে রূপটি অর্ধসমাপ্ত হয়েছে। মন্দিরের গায়ে কোন কারুকাজ নেই, কিন্তু ছোট ছোট দেউলের মণ্ডিত রূপের নক্শা আছে। সংস্কারের সময় মন্দিরের আসল রূপটির দিকে যে বিশেষ নজর দেওয়া হয়নি, তারও প্রমাণ আছে যথেষ্ট। কিন্তু তাহলেও এক্তেশ্বরের মন্দিরটি বিস্ময়কর, কারণ মন্দিরের এরকম ভারি ও নিরেট গড়ন আর কোথাও দেখা যায় না। হঠাৎ দেখলে মনে হয় যেন পাহাড়ের গা থেকে খোদাই করা শিলামন্দিরের মতন এক্তেশ্বরের মন্দিরটি বাঁকুড়ার দ্বারকেশ্বর নদের তীরে ঠেলে উঠেছে।

ছাতনার 'চণ্ডীদাস'

বাংলার অমর কবি চণ্ডীদাসকে নিয়ে অনেক জটিল সমস্যা দেখা দিয়েছে। চণ্ডীদাস একজন, না দু'জন, না বহুজন, তাই নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বাগ্‌যুদ্ধ হয়েছে অনেক। অস্পষ্ট ইতিহাসের কুয়াশা ভেদ করে তিনজন 'চণ্ডীদাস' এখন আমাদের সামনে দাঁড়িয়েছেন—বড়ু চণ্ডীদাস, দ্বিজ চণ্ডীদাস ও দীন চণ্ডীদাস। চণ্ডীদাস বীরভূম জেলার নান্নুরের অধিবাসী ছিলেন, না বাঁকুড়া জেলার ছাতনার অধিবাসী ছিলেন, তা নিয়েও বিতর্কের শেষ নেই। নতুন করে এখানে বাগ্‌যুদ্ধের অবতারণা করবার কোন সার্থকতা নেই। অন্যান্য অনেক আলোচনার মতন, ছাতনা ও নান্নুর সম্বন্ধে বর্তমান আলোচনায় যে মতামত ব্যক্ত হবে তা অভ্রান্ত মনে করবার, অথবা তা নিয়ে তর্ক করবারও কোন প্রয়োজন নেই।

সর্বাগ্রে এই কথাটি মনে রাখা দরকার। আমি নিজেও এই কথাটি মনে রেখে বাঁকুড়া জেলার ছাতনায় এবং বীরভূম জেলার চণ্ডীদাস-নান্নুরে গিয়েছিলাম। ছাতনা ও নান্নুরের স্থানীয় অধিবাসীরা আমাকে নানাভাবে প্রশ্ন করে জানতে চেয়েছেন—চণ্ডীদাস-রহস্য সম্বন্ধে আমার নিজের কি মতামত। অর্থাৎ চণ্ডীদাস কি ছাতনার-বাঁকুড়ার, না চণ্ডীদাস নান্নুরের-বীরভূমের। কারও কথার কোন উত্তর না দিয়ে আমি এড়িয়ে গেছি। কারণ গ্রাম্য ঐতিহ্য সম্বন্ধে গ্রামবাসীর ও স্থানীয় লোকের এত বেশি মমত্ববোধ যে, তাকে আঘাত করতে আমি সত্যিই কুণ্ঠিত। তবু অনুসন্ধানীদের অনেক সময়, অপ্রীতিকর হলেও, স্থানীয় কিংবদন্তী-কেন্দ্রিক 'ঐতিহ্যকে' বর্জন করতেই হয়। ইতিহাসের বিবিধ অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হলে কোন জনশ্রুতিকেই অন্ধের মতন আঁকড়ে থাকা যায় না। চণ্ডীদাস প্রসঙ্গে ছাতনা ও নান্নুর উভয়েরই দাবির যৌক্তিকতা আছে। বাঁকুড়ার শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় হলেন ছাতনার চণ্ডীদাসের সমর্থক এবং বীরভূমের শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয় হলেন নান্নুরের চণ্ডীদাসের অন্যতম প্রধান অধিবক্তা। দু'জনের সঙ্গেই সাক্ষাতে আলোচনা করেছি। দুই প্রবীণ পণ্ডিত-প্রধানের মধ্যে পড়ে আমার অবস্থা যে কি রকম করুণ হতে পারে, তা যে কেউ সহজেই অনুমান করতে পারবেন। বিদ্যানিধি

মহাশয় ছাতনায় 'নান্নু' বা নান্নুরের মাঠের সন্ধান পেয়েছেন। আলোচনা-প্রসঙ্গে তিনি ছাতনা অঞ্চলের বাঁশুলি দেবীর প্রাধান্যের কথাও উল্লেখ করলেন, যা নান্নুরে নেই। তিনি বললেন, নান্নুরের বাঁশুলি বাগীশ্বরী দেবী, বাঁশুলি নয়। তা অবশ্য ঠিক। কিন্তু শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ সাহিত্যরত্ন মহাশয়কে যখন বললাম তখন তিনি এমন যুক্তির অবতারণা করলেন যে, সব গোলমাল হয়ে গেল। নান্নুরে গিয়ে আরও অনেক কথা মনে হয়েছে যা নান্নুর প্রসঙ্গেই বলব। এখন ছাতনার কথা বলি।

ছাতনা প্রাচীন সামন্তভূমের রাজধানী ছিল। 'সামন্তভূম' নাম থেকেই বোঝা যায়, সেকালের কোন সামন্তরাজার শাসনাধীন ছিল সামন্তভূম এবং ছাতনা ছিল তার রাজধানী। অনেকে বলেন শঙ্খ রায় হলেন এই রাজবংশের আদিপুরুষ। তাঁর পৌত্রের নাম হামীর উত্তর রায়। ছাতনায় এখনও রাজ-বাড়ী আছে, রাজবংশধর আছেন। তাঁদের সম্বন্ধে জনশ্রুতিও আছে অনেক। ছাতনার পুরাতন বাঁশুলি দেবীর মন্দিরের ইঁটে হামীর উত্তর রায় ও উত্তর রায় এই দুই নামই নাকি পাওয়া যায়। শোনা যায়, চণ্ডীদাস ও দেবীদাস নামে দুই ভাই অন্য কোন স্থান থেকে এসে রাজা হামীর উত্তর রায়ের আশ্রয়ে বাস করেছিলেন। দেবীদাস বাঁশুলি দেবীর পূজারী নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং ছাতনাতেই তাঁর বিবাহ হয়েছিল। চণ্ডীদাস ছিলেন কবি। তাঁদের পিতার নাম ছিল নিত্যনিরঞ্জন। ছাতনা থেকে যে বাঁশুলি মাহাত্ম্য পুঁথি পাওয়া গেছে তাই থেকে এবং দেবীদাসের বংশধরদের পুরুষানুক্রমিক স্মৃতি ও শ্রুতি থেকে এই কাহিনীর সমর্থন পাওয়া যায়। সুতরাং প্রশ্ন ওঠে, ছাতনায় কোন চণ্ডীদাস ছিলেন কি না ; যদি থাকেন তাহলে তিনি কোন্ চণ্ডীদাস?

এই প্রশ্নের উত্তর-প্রত্যুত্তরে চণ্ডীদাস সমস্যা ক্রমেই জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠেছে। চল্লিশ বছর আগেও চণ্ডীদাস নিয়ে কোন সমস্যা ছিল না। ১৯১৬ সালে বাঁকুড়ার বসন্তরঞ্জন বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় চণ্ডীদাসের অজ্ঞাতপূর্ব কৃষ্ণ-লীলাকাব্য 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' সম্পাদনা করেন। এক গৃহস্থের গোয়ালঘর থেকে তিনি এই প্রাচীন পুঁথিখানি আবিষ্কার করেছিলেন। পুঁথির সঙ্গে পাওয়া একটি আলগা কাগজের লেখা থেকে মনে হয়, পুঁথিখানি বিষ্ণুপুরের রাজাদের গ্রন্থাগারে ছিল এবং তার নাম ছিল 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ'। পুঁথি সম্পাদনকালে বসন্তবাবু তার নামকরণ করেছিলেন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'। পুঁথি আদ্যন্তখণ্ডিত,

নাম বা লিপিকাল কিছুই জানবার উপায় নেই। তাহলেও তার ভাব ও ভাষা দুইই যে খুব প্রাচীন তাতে সন্দেহ নেই। শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন বলেছেন: "এত পুরানো হাতের লেখা বাংলা বই এবং এত পুরানো ধরনের বাংলা ভাষা—চর্যাগীতি ছাড়া—ইতিপূর্বে পাওয়া যায় নাই। ভাবে ও ভাষায় প্রচলিত চণ্ডীদাস-পদাবলীর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের তফাৎ আকাশ-পাতাল। সুতরাং সংশয় জাগিল চণ্ডীদাসের একত্বে।" তার পরে শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু ১৩৪১ সালে দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী প্রকাশ করে 'একত্বের' সংশয় আরও গভীর করে তুললেন। এক-চণ্ডীদাস তিন-চণ্ডীদাসে বিভক্ত হয়ে গেলেন—বড়ু, দ্বিজ ও দীন।

ছাতনায় কোন্ চণ্ডীদাস ছিলেন? কোন্ সময় ছিলেন? 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের' ভণিতাকে সুকুমারবাবু পাঁচভাগে ভাগ করেছেন, যেমন—

(১) বাসলীর বন্দনা+বড়ু চণ্ডীদাস
(২) বাসলীর বন্দনা+চণ্ডীদাস
(৩) বড়ু চণ্ডীদাস
(৪) চণ্ডীদাস
(৫) অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস

এর মধ্যে প্রথম শ্রেণীর ভণিতা—বাসলীর বন্দনা ও বড়ু চণ্ডীদাসই সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর ভণিতা প্রায় সমান সমান। চতুর্থ শ্রেণীর ভণিতা 'চণ্ডীদাস' শুধু চারবার পাওয়া গেছে। পঞ্চম শ্রেণীর ভণিতা পাওয়া গেছে সাতবার, যেমন (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, ৪র্থ সং)—

আনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস গাএ (পৃঃ ২২।২)
অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস গাইল (২৪।২)
গাইল আনন্ত বড়ু চণ্ডীদাসে (২৫।১)
অনন্ত নামে বড়ু চণ্ডীদাস গায়িল, (৮৪।১)
আনন্ত বড়ু গাইল চণ্ডীদাসে (১২৭।২)
গাইল আনন্ত বড়ু চণ্ডীদাসে (১৩৩।১)
অনন্ত বড়ু গাইল চণ্ডীদাসে (১৩৪।২)

(বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম, পৃ ১৭২)

বিদ্যানিধি মহাশয় বলেন যে, অনন্ত নামে এক গায়েনের সাতটি পদ পুঁথির

মধ্যে ঢুকে গেছে। 'বড়ু চণ্ডীদাস' যে উপাধি হয়ে গিয়েছিল তাও পরিষ্কার বোঝা যায়। নানা কবি সেই উপাধি গ্রহণ করে পদ রচনা করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজনের নাম অনন্ত ছিল। এ অনুমান খুবই যুক্তিসঙ্গত মনে হয়। ভণিতা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, কবির আসল নাম অনন্ত, তাঁর কৌলিক উপাধি 'বড়ু' এবং চণ্ডীদাস তাঁর দীক্ষাগুরুর প্রদত্ত নাম। কিন্তু কবি কোন্ সময়ের কবি ? তাঁর সঙ্গে সামন্তভূমের ছাতনারই বা সম্পর্ক কি ?

লিপিতত্ত্ববিদ্‌রা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের লিপিকাল ১৩৮৫ খৃঃ অঃ থেকে ১৬০০ খৃঃ অঃ পর্যন্ত অনুমান করেছেন। মাঝামাঝি ১৫০০ খৃঃ অঃ যদি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের লিপিকাল ধরা যায়, তাহলে তার অন্তত একশ বছর আগে যে কবি জীবিত ছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই হিসাব অনুসারে আনুমানিক ১৪০০ খৃঃ অঃ-তে কবি জীবিত ছিলেন দেখা যায়। এই অনুমানের সঙ্গে যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের প্রদত্ত ছাতনা রাজবংশপরিচয়ের কালের প্রায় মিল হয়ে যায়। ছাতনার রাজবংশ পরিচয়ে পাওয়া যায়—

মাসাব্ধি বিশিখ শকে হামির উত্তর লোকে
সামন্তের কন্যা দিয়া রাজ্য দিল দান।
তাহারি সৌভাগ্যক্রমে বাসলী সামন্তভূমে
শিলামূর্তি ধরিয়া হলেন অধিষ্ঠান।
পাষণ্ড দলন হেতু ভবাব্ধি তরণে সেতু
রচে যবে চণ্ডীদাস রাধাকৃষ্ণলীলা।
বিদ্যাপতি তদুত্তরে গাইল মিথিলাপুরে
হরিপ্রেম রসগীতি নাহি যার তুলা।
ব্রহ্মা কাল কর্ণ (কর্ম) অরি শকে সিংহাসনোপরি
বসে বীর হাম্বির সে হামিরনন্দন।
সংগ্রামে যবনে তাড়ি বঙ্গরাজ্য নিল কাড়ি
অভিষেক দিল তার জনৈক ব্রাহ্মণ।

"মাসাব্ধি বিশিখ" বা ১২৭৫ শকে বা ১৩৫৩ খৃষ্টাব্দে হামির উত্তর ছাতনার রাজা হন। তিনি "ব্রহ্ম কাল কর্ণ অরি" অর্থাৎ ১৩২৬ শকাব্দে বা ১৪০৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। এই হামির উত্তরের রাজত্বকালে ছাতনায় বড়ু চণ্ডীদাস জীবিত ছিলেন।

এই চণ্ডীদাস যে চৈতন্যপূর্ব যুগের কবি ছিলেন, বৈষ্ণব সাহিত্য থেকে তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্য জয়দেব ও চণ্ডীদাসের গীতরস আস্বাদন করতেন। জয়ানন্দ তাঁর শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে লিখেছেন—

জয়দেব বিদ্যাপতি আর চণ্ডীদাস।
শ্রীকৃষ্ণচরিত্র তারা করিল প্রকাশ॥

সনাতন গোস্বামী কাব্যপর্যায়ে গীতগোবিন্দের সঙ্গে চণ্ডীদাসের দানখণ্ড নৌকাখণ্ডের উল্লেখ করেছেন। দ্বিজ চণ্ডীদাস বা দীন চণ্ডীদাসের ভণিতায় নৌকাখণ্ড বা দানখণ্ডের কোন পদ নেই। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলা হয়েছে—

বিদ্যাপতি জয়দেব চণ্ডীদাসের গীত।
আস্বাদয়ে রামানন্দ স্বরূপ সহিত।
(আদি, ১৩)

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটক গীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রিদিনে
গায় শুনে পরম আনন্দ॥
(মধ্য, ২)

এই সব সাহিত্যিক প্রমাণ থেকে বোঝা যায় যে, শ্রীচৈতন্যের পূর্বে 'চণ্ডীদাস' নামে একজন কবি জীবিত ছিলেন। তিনিই বড়ু চণ্ডীদাস।

এইবার 'বাসলী দেবী'র কথা বলা যাক। 'বড়ু চণ্ডীদাস' ভণিতায় বাসলীর বন্দনা অনেক পাওয়া গেছে। সুতরাং তিনি যে বাসলীর পূজক ছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ছাতনায় যে বাসলী দেবী আছেন, তাঁর মূর্তি ভাল করে দেখবার সুযোগ পেয়েছিলাম। মূর্তির সঙ্গে তন্ত্রোক্ত বিশালাক্ষীর ধ্যান প্রায় মিলে যায়—

ধ্যায়েদ্দেবীং বিশালাক্ষীং তপ্তজাম্বুনদ প্রভাম্।
দ্বিভুজাং অম্বিকাং চণ্ডীং খড়্গ খেটক ধারিণীং॥
নানালঙ্কার সুভগাং রক্তাম্বর ধরাং শুভাং।
সদা ষোড়শ বর্ষীয়াং প্রসন্নাস্যাং ত্রিলোচনাং॥

মুণ্ডমালাবলীরম্যাং পীনোন্নত পয়োধরাং।
শবোপরি মহাদেবীং জটা মুকুট মণ্ডিতাং॥
শত্রুক্ষয়করীং দেবীং সাধকাভীষ্ট দায়িকাম।
সর্ব সৌভাগ্য জননীং মহাসশৎ প্রদাং স্মরেৎ॥

বিশালাক্ষীর এই ধ্যানমূর্তির সঙ্গে ছাতনার বাসলীর অনেকটা মিল আছে। তাছাড়া 'বাসলী' তন্ত্রসম্মত মহাবিদ্যা—

কামাখ্যা বাসলী বালা মাতঙ্গী শৈলবাসিনী।
ইত্যাদ্যাঃ সকলা বিদ্যাঃ কলৌ পূর্ণফলপ্রদাঃ॥

নান্নুরের মূর্তি বাগীশ্বরী মূর্তি। বাগীশ্বরীও তন্ত্রসম্মতা মহাবিদ্যা—

কালী নীলা মহাদুর্গা ত্বরিতা ছিন্নমস্তকা।
বাগ্‌বাদিনী চান্নপূর্ণা তথা প্রত্যঙ্গিরা পুনঃ॥

কিন্তু বাগীশ্বরীই কি 'বাসলী' নামে পরিচিত হয়েছেন? কোন কোন ভাষাতত্ত্ববিদ্ বলেন—বাগীশ্বরী-বাইসরী-বাসরী-বাসলী—এইভাবে 'বাসলী' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। কিন্তু ভাষাতত্ত্বের জটিল নিয়মে যাই হোক না কেন, 'বিশালাক্ষী' থেকে 'বাঁশুলী'-'বাসলী' হওয়া তার চেয়ে অনেক বেশি সহজ ও স্বাভাবিক। ছাতনা অঞ্চলে অনুসন্ধান করে দেখেছি, 'বাসলী' প্রায় গ্রাম-দেবতার মতন পূজিত হন। আরও উল্লেখযোগ্য হল, বিশালাক্ষী-বাসলী দেবীর পূজা ক্রমে এই অঞ্চল থেকে মেদিনীপুর হয়ে দক্ষিণ-চব্বিশ পরগণা পর্যন্ত আধিপত্য বিস্তার করেছে। বর্ধমান ও হুগলী জেলাতেও বিশালাক্ষী আছেন, কিন্তু তেমন বিস্তৃত আধিপত্য আর নেই। এই কারণে মনে হয়—এই তন্ত্রোক্ত মহাবিদ্যার পূজা একসময় রাঢ়দেশের এই অঞ্চলেই ব্যাপক প্রসারলাভ করেছিল। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, বিশালাক্ষী 'বাঁসলি' কি না?

কিছুদিন আগে চকদীঘির 'রাঢ় প্রত্নাগার' থেকে একটি বৃহৎ মঙ্গলকাব্যের পুঁথি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পেয়েছেন। পুঁথখানির নাম হল—'বিশাললোচনী বা বিশালাক্ষীর গীত'। পরিচয়সহ পুঁথিখানি সম্প্রতি 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'য় ধারাবাহিকারে প্রকাশিত হয়েছে (৬০ ভাগ, ২য় সংখ্যা থেকে)। পুঁথিতে গ্রন্থকার ও রচনাকালের পরিচয় এইভাবে দেওয়া হয়েছে :

সাকে রষ রথ বেদ সসাঙ্ক গণিতে।
বাসুলীমঙ্গল গীত হৈল সেই হইতে॥

মুকুন্দরামের 'চণ্ডীকাব্যেও' আছে—

বাশুলীর প্রতিদ্বন্দ্বী দ্বাদশ বৎসর বন্দী
বিশালাক্ষী কৈল অপমান।

সুতরাং বিশালাক্ষী থেকেই যে বাশুলী-বাসলী হয়েছে, তাতে বিশেষ সন্দেহের কারণ নেই। তাই যদি হয় তাহলে ছাতনার বাসলীর পূজক যে একজন চণ্ডীদাস ছিলেন এবং তিনি বড়ু চণ্ডীদাস, তাতেও কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না। তাহলে বীরভূমের নান্নুরে কোন্ চণ্ডীদাস ছিলেন? ভাবে ও ভাষায় প্রচলিত চণ্ডীদাসের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের চণ্ডীদাসের তফাৎ আকাশ-পাতাল। সেই লোকপ্রিয় দ্বিজ চণ্ডীদাসই কি নান্নুরে ছিলেন?
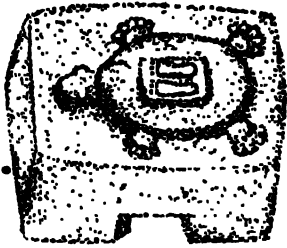
বীরভূম

সিউড়ী-বীরভূম

বীরভূম জেলার প্রধান শহর সিউড়ী, কাঁকর আর লাল মাটি দিয়ে গড়া। অদূরে ময়ূরাক্ষী নদী এবং দূরে সাঁওতাল পরগণার পর্বতমালার তরঙ্গায়িত রেখা। শাসনকেন্দ্র শহরে পরিণত হয়েছে, কিন্তু একদা যে সিউড়ী বীরভূমের অখ্যাত গ্রাম ছিল আজও তা পরিষ্কার বোঝা যায়। আমার কাছে সিউড়ী ও তার পরিপার্শ্ব সমগ্র রাঢ় অঞ্চলের সাংস্কৃতিক রূপের একটি নিখুঁত 'ফ্যাক-সিমিলি' বলে মনে হয়েছে। এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই সিউড়ী অনুসন্ধানীর কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্নতাত্ত্বিক 'সাইট' নয়, শাস্ত্রোক্ত পীঠস্থান নয়, তবু বৈজ্ঞানিক ইতিহাসের অফুরন্ত উপাদানকেন্দ্র সিউড়ী। সমগ্র বীরভূম জেলার সাংস্কৃতিক প্রতিচ্ছবি যেন। প্রত্নতত্ত্ববিদ ফার্গুসনের ভাষায়—'with an eye in the head' অনুসন্ধান করলে মফঃস্বল শহর সিউড়ীর আশেপাশে ও অলিগলিতে বহুশতাব্দীর বিস্তীর্ণ সাংস্কৃতিক উপকরণ কুড়িয়ে পাওয়া যায়।

একসময় শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, শিবরতন ও গৌরীহর মিত্র বীরভূম জেলার গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়িয়ে অনেক মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। নিজের জেলার ইতিহাস রচনার জন্য যে অক্লান্ত পরিশ্রম তাঁরা করেছিলেন, তার কোন যোগ্য পুরস্কার দেশবাসীর কাছ থেকে তাঁরা পাননি। 'বীরভূম বিবরণ' (তিনখণ্ড) ও 'বীরভূমের ইতিহাস' দুই খণ্ডের মধ্যে তার যৎসামান্য মাত্র প্রকাশিত হয়েছে, অধিকাংশ সঙ্কলিত উপকরণ আজও পাণ্ডুলিপি আকারে অপ্রকাশিত রয়েছে। এই পাণ্ডুলিপি থেকে আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে যে কত

উপকৃত হয়েছি, তা বলা যায় না। সমগ্র বীরভূম জেলা তার অপূর্ব সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য নিয়ে আমার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। প্রায় চল্লিশ বছর আগে ১৩২১ সালে হেতমপুরের রাজাদের পোষকতায় 'বীরভূম অনুসন্ধান সমিতি' প্রতিষ্ঠিত হয়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এই সমিতির অন্যতম উপদেষ্টা ছিলেন। সমিতির উদ্‌যোগে ও হেতমপুরের রাজাদের পোষকতায় শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বীরভূমের গ্রামে গ্রামে ঘুরে অনেক মূল্যবান উপকরণ সংগ্রহ করেন। 'বীরভূম বিবরণ' তিন খণ্ডে তাঁর সংগৃহীত তথ্যাদি প্রকাশিত হয়েছে। উপকরণ সংগ্রহের জন্য যে কঠোর পরিশ্রম সাহিত্যরত্ন মহাশয় তখন করেছিলেন, তার উপযুক্ত স্বীকৃতি তিনিও দেশবাসীর কাছ থেকে পাননি। আজ দেশের ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্বন্ধে দেশের লোক অনেক বেশি সচেতন হয়েছেন, তাঁদের আগ্রহ ও কৌতূহলও অনেক বেড়েছে। তাই মনে হয় আজ অন্তত বীরভূমবাসী এঁদের দানের মূল্য বুঝবেন।

সিউড়ীর কথা বলি। সাঁওতাল পরগণার পর্বতমালার পরে ভূপ্রকৃতির তরঙ্গবিক্ষোভ ও উত্থানপতন যেন সিউড়ী পর্যন্ত এসে তারপর বাংলার সমতল-ভূমির সঙ্গে একাকার হয়ে মিশে গেছে। প্রকৃতির এই তরঙ্গায়িত রূপের সঙ্গে বীরভূমের—তথা রাঢ়ের সংস্কৃতির ক্রমায়াত ধারার একটা অপূর্ব সাদৃশ্য আছে। অন্তত আমার তাই মনে হয়েছে। সাঁওতাল-পরগণার সাঁওতালী সংস্কৃতি অর্থাৎ আদি-অস্ট্রাল বা নিষাদ-সংস্কৃতির ধারা যেন উত্থান-পতনের বন্ধুর পথে প্রবাহিত হয়ে এসে বাংলার সুসমন্বিত সংস্কৃতিগঙ্গায় মিলিত হয়েছে এইখানে। সিউড়ী ও তার আশেপাশে অসংখ্য নিদর্শন ছড়িয়ে আছে, যা প্রত্যেক সংস্কৃতি-বিজ্ঞানের (Cultural Anthropology) ছাত্রের কৌতূহল ও অনুসন্ধানের খোরাক যোগাতে পারে। যুগে যুগে বিভিন্ন সংস্কৃতিধারার সংঘাত ও সমন্বয়ের বিশেষত্ব অনুসন্ধান করা আধুনিক সংস্কৃতি-বিজ্ঞানের অন্যতম লক্ষ্য বলে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞরা স্বীকার করেছেন। সম্প্রতি ইউরোপ ও আমেরিকায় এ-বিষয়ে অনেক মূল্যবান অনুসন্ধানের কাজও তাঁরা করেছেন। এশিয়া মহাদেশে 'চীনের সংস্কৃতি' সম্বন্ধেও এক্ষেত্রে অনেক মূল্যবান কাজ করা হয়েছে। আমাদের দেশে এখনও বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন কাজ হয়নি, সংস্কৃতি-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একেবারেই হয়নি বললেও ভুল হয় না। আমাদের অনুসন্ধানের ক্ষেত্র অত্যন্ত সীমাবদ্ধ, পাঠাগার-কেন্দ্রিক ও পুঁথিগত। প্রবীণ ঐতিহাসিকরা আমাদের

বীরভূম জেলা
রেলপথ
রাস্তা-পাকা
কাঁচা
পাকুড়
মুরারই
পাইকর
নলহাটী
ভদ্রপুর
রামপুরহাট
তারাপীঠ
কান্দী
সাঁইথিয়া
রাজনগর
বক্রেশ্বর
সিউড়ি
আহম্মদপুর
দুবরাজপুর
নানুর
বোলপুর
কেন্দুলী
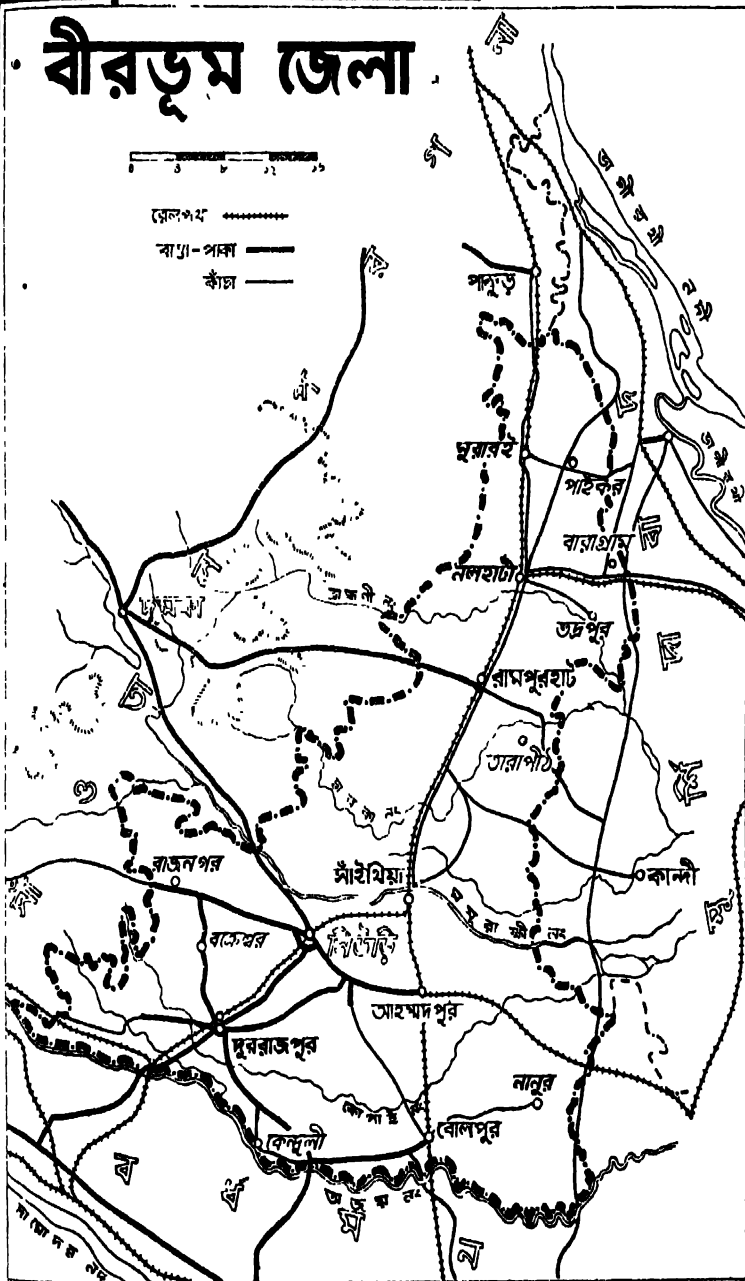
কেবল শিলালিপি, তাম্রলিপি ও পুঁথি পড়তে শিখিয়েছেন এবং ইতিহাসের পরিধি তার মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে বাইরের বৃহত্তর মানবসমাজের দিকে তাকাতে নিষেধ করেছেন। তাই লিপি ও পুঁথির পাঠবিতর্কের মধ্যে ইতিহাস নীরস ন্যায়শাস্ত্রের নতুন শাখা ছাড়া আর কিছু হয়নি। মূর্তিতত্ত্ববিদ্‌রাও কালনির্ণয় নিয়ে যে পরিমাণ কালাতিপাত করেছেন, তার শতাংশের একাংশও যদি তাঁরা সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান ও অন্যান্য বিচিত্র সব সাংস্কৃতিক নিদর্শন অনুধাবনে অতিবাহিত করতেন, তাহলে আজ আমরা দেশের গতিশীল ইতিহাসের ধারা সম্বন্ধে অনেক বেশি জ্ঞানলাভ করতে পারতাম। শিলামূর্তি, লিপি-পুঁথি ও মুদ্রার গুরুত্ব ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের উপাদান হিসাবে কেউই অস্বীকার করবেন না। অলিখিত ইতিহাস এই সব উপকরণের সাহায্যেই লেখা হয়েছে এতদিন এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আচারের অনেক অজানা তথ্য ও রহস্যও তার দ্বারা উদ্ঘাটন করা সম্ভব হয়েছে। আজও এই সব প্রত্নতাত্ত্বিক হাতিয়ার ও উপকরণের অসাধারণ মূল্য আছে। পূর্বে কিংবদন্তী ও কুলজীগ্রন্থের মধ্যে যে ঐতিহাসিক গবেষণা সীমাবদ্ধ ছিল তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রোমাঞ্চকর উপাখ্যান রচনায় সাহায্য করেছে (যদিও ঐতিহাসিক উপাদান তার মধ্যে যে একেবারে নেই তা নয়)। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌ ও পুঁথিবিশারদ্‌রা এই গবেষণাকে প্রামাণিক ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়েছেন। কিন্তু আধুনিকযুগের নৃবিজ্ঞানী, বিশেষ করে সংস্কৃতি-বিজ্ঞানীরা দেখিয়ে দিয়েছেন যে, শিলা, লিপি ও পুঁথির ক্ষেত্র ছাড়িয়েও অনুসন্ধানের আরও ক্ষেত্র আছে। মানুষের সমাজ ও তার আচার-অনুষ্ঠানের ক্ষেত্র। শিলা, লিপি ও পুঁথি সবই ধ্বংস হয়ে যেতে পারে, কিন্তু মানুষের ধ্যানধারণা আচার-অনুষ্ঠান যুগ-যুগান্তের উত্তাল তরঙ্গের মধ্যেও আশ্চর্যভাবে আত্মরক্ষা করতে পারে। ইংরেজীতে বলে "Customs die hard" এবং এই কথার অন্তরালে 'কালচারের' সঙ্গে 'বায়োলজির' সম্পর্কের ইঙ্গিতও স্পষ্ট। কোন কোন অত্যুৎসাহী মুসলমান শাসক আমাদের দেশের অনেক শিলামূর্তি, পুঁথি ও লিপি ধ্বংস করেছেন, কিন্তু সাংস্কৃতিক আচার-অনুষ্ঠানকে ধ্বংস করতে পারেননি। উপরন্তু তার অনেক কিছু নিজেরাই আত্মসাৎ করে তার প্রাণশক্তির প্রচণ্ডতা প্রমাণ করেছেন। এমন কি ধর্মান্তরের ফলেও যে আচারগুলি লুপ্ত হয়ে যায়নি এবং রূপান্তরিত সংস্কৃতির মধ্যে তার প্রচুর ধ্বংসাবশেষ আছে, তার প্রমাণ আমাদের দেশের সামাজিক ইতিহাসে যথেষ্ট

পরিমাণে আছে। হিন্দু চাষী মুসলমান হয়েছে, হিন্দু ও মুসলমান চাষী উভয়েই খৃষ্টান হয়েছে, নামও তাদের একাধিকবার বদলেছে, মন্দির থেকে মসজিদে এবং মসজিদ থেকে গির্জায় গেছে তারা—কিন্তু সবসময় দেশীয় আচার-অনুষ্ঠান-গুলি তাদের সঙ্গী হয়েছে, তাদের বর্জন করা সম্ভব হয়নি। আজও আমরা যখন বৃক্ষপূজা করি, গঙ্গাস্নান করি, জন্মোৎসব ও শ্রাদ্ধ করি, তাবিজ-মাদুলি-কবচ পরি, স্বস্ত্যয়ন করি, ভূত-প্রেত-পিশাচ স্বচক্ষে দেখি, জাদুমন্ত্রে বিশ্বাস করি, তখন আমাদের হাজার হাজার বছরের অলিখিত ইতিহাসের স্তরগুলি, পাথুরে প্রমাণ ছাড়াও, আমাদের চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ভেসে ওঠে।

সিউড়ীতে ঠিক তাই উঠেছিল। সিউড়ীর অলিগলিতে ও আশেপাশে প্রত্যেক পাড়ায় পাড়ায় ঘুরলে শুধু সিউড়ীর নয়, বীরভূমের এক বিচিত্র রূপ চোখের সামনে ভেসে ওঠে। উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিমে অর্ধবৃত্তাকারে ধাঙড়-পাড়া, বাউরীপাড়া, হাড়িপাড়া, ডোমপাড়া, মালপাড়া, কেওটপাড়া ইত্যাদির অবস্থান। শুধু যে শহরের প্রান্তসীমায় এদের বসবাস, তা নয়, শহরের মধ্যেও ইতস্তত হাড়ি বাউরী ডোম প্রভৃতি জাতির বাস আছে। এছাড়া বারুইপাড়া, চর্মকারপাড়া ইত্যাদিও আছে। পাড়ায় পাড়ায় প্রচুর দেব-দেবী ও অসংখ্য মন্দির আছে। দেব-দেবী যাঁরা আছেন তাঁদের মধ্যে মনসা, চণ্ডী, কালী ও ধর্মঠাকুর শতকরা নিরানব্বই জন। এমন কোন পাড়া নেই, যেখানে মনসা, কালী ও ধর্মঠাকুর নেই। বীরভূমের অন্যতম সাংস্কৃতিক বিশেষত্ব যেন সিউড়ীর পাড়ায় পাড়ায় লিপিবদ্ধ রয়েছে। বাউরীপাড়ায় আছে 'সাঁউডালি পূজা'র স্থান। নিম-গাছের তলায় দোচালা পর্ণকুটীর, তার মধ্যে দু'টি মাটির ডেলা দুই বোন মনসা, একপাশে আরও তিনটি মাটির ডেলা হল গোঁসাই, আর এক পাশে আরও দু'টি মাটির ডেলা কালী। মনসা, কালী গোঁসাই সকলেই তাল তাল মৃত্তিকাপিণ্ডে মূর্ত। ভয়ানক জ্যান্ত দেবতা, ভাদ্র ও পৌষ সংক্রান্তির বিশেষ পূজার সময় আরও বেশি জ্যান্ত হয়ে ওঠেন। পাশে যে নিমগাছটি আছে, তাতেও একজন থাকেন, তাঁকে দেখা যায় না, তাঁর নাম 'ঝেঁটেনি বুড়ি'। 'বাঁদরি ভূত'ও ঐ গাছে বিরাজ করেন। উৎসবের সময় 'ঝেঁটেনি বুড়ি' যার স্কন্ধে ভর করেন, তিনি উপস্থিত ব্যক্তিদের ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান গল্‌গল করে বলে দিতে পারেন। বাঁদরি ভূত যার স্কন্ধে ভর করেন, তাঁর হুপ্ হুপ্ করে বাঁদরের মতন লম্ফঝম্ফ দ্রষ্টব্য ব্যাপার। সারারাত ধরে নৃত্যগীতবাদ্যসহ উৎসব হয়, মুর্গী, ছাগল,

ভেড়া বলিদান হয়। একেবারে খাঁটি 'সাঁওতালী পূজা' (তাই থেকে কি 'সাউডালি'?), একটুও বিকৃত হয়নি মনে হয়। সিউড়ী শহরের উপকণ্ঠেই এই পূজার স্থান। এ-ছাড়া ডোমপাড়ায় শ্মশানকালী আছেন, উন্মুক্ত স্থানে নিমগাছের তলায়। পর্ণকুটির-মন্দিরে এমনি কালী আছেন, সঙ্গে ধর্মরাজ ঠিক আছেন। কেওটপাড়ার অশ্বত্থতলায় কয়েকখণ্ড পাথর আছে, কি তা কেউ জানে না, অথচ পূজা হয় নিয়মিত। দত্তপুকুরের কাছে রক্ষাকালী পীঠ আছে। পাষাণকালীও আছেন। ধর্মরাজের তো কথাই নেই। শহরের দিকে বারুই-পাড়ায় অন্নপূর্ণাসহ শিবমন্দির আছে, কিন্তু ধর্মরাজও আছেন। শহরের মধ্যে রাধাবল্লভের বিশাল মণ্ডপসহ মন্দির আছে। মধ্যে মালিপাড়ায় পুরাতন ধর্ম-ঠাকুরের মন্দিরও আছে। বৃত্তাকারে ক্রমে শহরের কেন্দ্রস্থলে এগিয়ে এলে মনে হয় যেন সংস্কৃতির একটি পিরামিড সিউড়ী। পিরামিডের পাদমূলে প্রাগৈতিহাসিক নিষাদ-সংস্কৃতির সুদৃঢ় ভিত্তি এবং ক্রমে যত শীর্ষস্থানের দিকে ওঠা যায়, তত উচ্চস্তরের সংস্কৃতির (যেমন বৈষ্ণব সংস্কৃতির) নিদর্শন। সাঁউ-ডালি পূজার স্থান থেকে রাধাবল্লভের মন্দির ও মণ্ডপ পর্যন্ত কয়েক যুগের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের প্রত্যেকটি স্তরের নিদর্শন বিকীর্ণ হয়ে রয়েছে। বীর-ভূমের যা অন্যতম বৈশিষ্ট্য, সিউড়ীতে যেন তার সবই আছে। আফিস-আদালত স্কুল-কলেজ, অট্টালিকায় নয়, চারিদিকের বিভিন্ন জাতির পাড়ায় পাড়ায়। ঠিক এই ধরনের নিদর্শনের এমন প্রাচুর্য আর কোথাও দেখা যায় না।

আশপাশের মন্দিরগুলি অধিকাংশ বাংলা চালাঘর—বাঁকানো চারচালা বাংলা চালাঘর। অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, অনেক মন্দিরের সামনে একটি করে চারচালা মণ্ডপ আছে। বাঁকানো চাল, চারদিক খোলা। ঠিক তারই অনুকরণে যেন ইটের মন্দিরগুলি হুবহু গড়ে উঠেছে। শিল্পীরা যেন পাশাপাশি বাংলা চালাঘরের 'মডেল' দেখে মন্দির তৈরি করেছেন। একথা বীরভূম, বাঁকুড়া বর্ধমানে খুব বেশি করে মনে হয়, সিউড়ীর স্বল্প পরিসরের মধ্যে আরও বেশি করে মনে হয়। শহর থেকে স্টেশনের পথে যেতে কাছেই বিখ্যাত 'ঘুন্সা' মন্দিরটি তার অপূর্ব নিদর্শনস্বরূপ প্রত্নতত্ত্ববিভাগ কর্তৃক সংরক্ষিত। পোড়া-মাটির কারুকাজের মধ্যে মনে হয় বৈষ্ণব প্রভাব খুব বেশি, ঠিক সিউড়ীর প্রধান সাংস্কৃতিক সুরের সঙ্গে একসুরে বাঁধা নয়। কিন্তু অপূর্ব নিদর্শন, এখনও নিখুঁত রয়েছে।

ক

৬

৮

রাজনগর

বীরভূমের রাজধানী ছিল রাজনগর, নগর বা লক্ষোর (?)। মুণ্ডারী অভিধানে 'বীর' কথার অর্থ জঙ্গল। জঙ্গলাকীর্ণ দেশ বলে নাম 'বীরভূম'। দোর্দণ্ডপ্রতাপ রাজারা বীরভূমে রাজত্ব করেছেন বলে লোকের বিশ্বাস, বীরের দেশ থেকে বীরভূম নাম হয়েছে। কিন্তু জঙ্গলের দেশেও তো বীর থাকতে বাধা নেই। হিন্দু বীর রাজারা ছিলেন, দুর্ধর্ষ পাঠান জায়গীরদাররা ছিলেন। তাঁদের রাজধানী ছিল নগর বা রাজনগর। আজ কেউ নেই, রাজ্য নেই—রাজাও নেই, জায়গীর নেই—জায়গীরদারও নেই। অগ্রগামী ইতিহাসের নিষ্ঠুর চাকার তলায় একে একে সব নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। আছে কেবল রাজনগর, আর বিস্তৃত ভগ্নস্তূপের মধ্যে অতীত স্মৃতির এলোমেলো টুক্‌রো রয়েছে।

এইসব টুকরো স্মৃতি জড়ো করে রাজনগরের কাহিনী রচনা করছি। সিউড়ী থেকে প্রায় ষোল মাইল পশ্চিমে রাজনগর। বক্রেশ্বর থেকে রাজনগর গেলাম। বীরভূমের অন্যতম ঐতিহাসিক নগর রাজনগরে যুগের পর যুগের অভিযানের অনেক পদচিহ্ন দেখতে পাব, এই আশায় উন্মুখ হয়ে উঠল মন। শক্ত রাঙা মাটির পথের কাব্যিক সৌন্দর্য থাকলেও পথচলার ক্লান্তি আছে। পাথুরে পথে ঝাঁকুনি খেয়ে হয়রাণ হয়ে, রঙিন ধুলোয় বৈরাগীর মতন গৈরিক বেশ ধারণ করে যখন রাজনগরে গিয়ে উপস্থিত হলাম তখন দু' একটি মাত্র ছবি তোলার পর ক্যামেরা অচল হয়ে গেল। কালীদহের কূলে সঙ্গীদের নিয়ে বসে বসে 'স্কেচ' করা ছাড়া আর উপায় ছিল না।

কেবল কিংবদন্তী বেঁচে আছে রাজনগরে, আর কিছু নেই। সেই কিংবদন্তীকে আশ্রয় করে অতীত ইতিহাসের ছিন্নভিন্ন কঙ্কালের টুকরো ছড়িয়ে আছে চতুর্দিকে। সেইসব টুকরো জোড়াতালি দিয়ে কোন মূর্তি রচনা করা সত্যিই কষ্টকর। প্রথমেই মনে হয় বীরদেশের বীর রাজারা কারা? কোন প্রামাণিক ইতিহাস নেই। শোনা যায়, সিউড়ী থেকে ছয় মাইল আন্দাজ উত্তর-পশ্চিমে, ভাণ্ডীরবন থেকে প্রায় আধমাইল দূরে বীরসিংহপুর বা বীরপুর নামে যে গ্রাম আছে, বীরভূমের বীর রাজারা মুসলমান অভিযানের সময় নগর রাজধানী ছেড়ে সেইখানে চলে আসেন। মাঠের জঙ্গল ও ইটপাটকেলের দিকে

আঙুল দেখিয়ে স্থানীয় লোকেরা বলেন যে, ঐখানে রাজাদের রাজপ্রাসাদ ছিল। কিন্তু বীরসিংহ কে? খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত 'রামচরিত' কাব্যে বাঙালী কবি সন্ধ্যাকরনন্দী রামপালের মিত্র সামন্তরাজাদের একটি নামের তালিকা দিয়েছেন; যেমন—

বন্দ্যগুণসিংহবিক্রমশূরশিখরভাস্করপ্রতাপৈস্তৈঃ।
স মহাবলৈরুপেতো জেতুং জগতীমলম্ভূষ্ণুঃ॥
(রামচরিত—২।৫)

প্রাপ্তপ্রবর্ধিতার্জুনবিজয়োঽর্থিতবর্ধনঃ সোমমুখশ্চ।
অনুগতমাতুলসূনুপ্রবলভুজালম্ব নো রাম॥
(২।৬)

অর্থাৎ সেই (রামপাল) প্রকাণ্ড বল বা সেনাযুক্ত বন্দ্য (ভীমযশাঃ), গুণ (বীরগুণ), সিংহ (জয়সিংহ), বিক্রম (বিক্রমরাজ), শূর (লক্ষ্মীশূর ও শূরপাল), শিখর (রুদ্রশিখর), ভাস্কর (ময়গলসীহ—সিংহ) ও প্রতাপ (প্রতাপসীহ—সিংহ) —নামক বীরশ্রেষ্ঠ সামন্তদের সঙ্গে মিলিত হয়ে সমস্ত জগৎ জয় করতে সমর্থ হয়েছিলেন। যিনি অর্জুন (নরসিংহার্জুন ও চণ্ডার্জুন) ও বিজয় (বিজয়রাজাকে) মিত্ররূপে পেয়ে (দেশ-কোষাদিদ্বারা) তাঁদের সংবর্ধিত করেছিলেন, যিনি বর্ধনের (দ্বোরপবর্ধনের) সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন, যিনি সোমকে (সামন্ত-প্রধানভাবে) সঙ্গে নিয়েছিলেন, সেই রামপাল অনুরক্ত মাতুলপুত্রদের প্রবল বাহুবলকেও অবলম্বন করেছিলেন (ডাঃ রাধাগোবিন্দ বসাক: রামচরিত, ৪১-৪২ পৃঃ)। এর মধ্যে টীকাকারের নির্দেশ অনুসারে দেখা যায় যে, মেদিনীপুর, মানভূম, বর্ধমান, বীরভূম অঞ্চলের স্বাধীন সামন্তরাজা অনেকে ছিলেন। বীরগুণকে টীকাকার কোটাটবী নামক স্থানের 'কণ্ঠীরব' বা সিংহ বলে নির্দেশ করে 'দক্ষিণ-সিংহাসন-চক্রবর্তী' বলে বিশেষিত করেছেন। মনে হয়, উড়িষ্যার কাছাকাছি বাংলা ভূভাগের কোন অটবীরাজ্য ছিল কোটাটবী (ময়ূরভঞ্জ-ভঞ্জভূম?) এবং বীরসিংহ সেখানকার রাজা ছিলেন। লক্ষ্মীশূর অপর মন্দারের (গড় মন্দারণ, আরমবাগ) সামন্ত ছিলেন, রুদ্রশিখর তৈলকম্প-তেলকুপির (মানভূম), প্রতাপসিংহ ঢেক্করীর (কাটোয়া-বর্ধমান), ভাস্কর উচ্ছালের (বীরভূম?)। বীরসিংহ নামে কোন রাজা বীরভূমে ছিলেন বলে সন্ধ্যাকরনন্দী বা তাঁর টীকাকার উল্লেখ করেননি। তাহলে বীরসিংহ নামে

কথিত হিন্দু রাজা কে? পুরাণকাররা রাঢ়দেশের গভীর অরণ্য, কৃষ্ণবর্ণ আদিম জাতি, লৌহখনি ইত্যাদির কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে, তাঁরা খুব সুদক্ষ তীরন্দাজ ও পরিশ্রমী চাষী। বীরদেশে 'নগর', 'সিপুল্য' প্রভৃতি নগরের কথাও তাঁরা বলেছেন। হয়ত স্থানীয় কোন কৌম বা 'গণের' রাজা ছিলেন 'বীরসিংহ'—'বীরের' সিংহ অর্থে জঙ্গলের সিংহের মতন পরাক্রমশালী ছিলেন তিনি। মুসলমান অভিযানের পর তাঁর নগর-ত্যাগের কাহিনী মিথ্যা নাও হতে পারে। এমনও হতে পারে যে, রাঢ়দেশের সামন্তদের কথা সন্ধ্যা-করনন্দী সম্পূর্ণ উল্লেখ করেননি, করবার প্রয়োজনবোধ করেননি। আশেপাশে একাধিক সামন্ত রাজা ছিলেন, এবং বীরভূমে যে কেউ ছিলেন না তা মনে হয় না।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতেই বীরভূম জেলা বিজয়ী মুসলমানদের করতলগত হয়। বীরভূম হল সীমান্ত-প্রদেশ, তাই বীরভূমে তাঁরা একটি ঘাঁটি স্থাপন করেন। অনেকে বলেন, লক্ষোর (লক্ষোটি বা লক্ষ্মণাবতী নয়) বীরভূম সীমান্তের অন্তর্গত এবং মুসলমানদের প্রধান শাসন-কেন্দ্র ছিল। স্টুয়ার্ট লক্ষোর ও নগর-রাজনগর অভিন্ন বলে মনে করেন। ব্লকম্যান সাহেব মনে করেন, লক্ষোর বীরভূমের তুবরাজপুরের কাছে কোন স্থান (এসিয়াটিক সোসাইটি জার্নাল, ১৮৭৩)। মনমোহন চক্রবর্তীও লক্ষোর প্রসঙ্গে নগর-রাজনগরের কথা উল্লেখ করেছেন (এ. সো জার্নাল, ১৯০৮)। কিন্তু লক্ষোর 'রাজনগর' কিনা তা এখনও সঠিক প্রমাণ-সাপেক্ষ বলে জোর করে কিছু বলা যায় না। তবে বাংলাদেশে, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে, মুসলমান শাসকদের অন্যতম প্রধান শাসনকেন্দ্র যে বীরভূমের রাজনগর ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। পশ্চিম-বঙ্গের প্রায়-স্বাধীন মুসলমান জায়গীরদারদের মধ্যে রাজনগরের 'রাজারা' যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন, তা সকলেই স্বীকার করেছেন। সারা বাংলার স্বাধীন হিন্দু ও মুসলমান সামন্তদের মধ্যে রাজনগরের পাঠান জায়গীরদার-বংশের রাজারা অন্যতম 'প্রধান' ছিলেন। এদিকে মেদিনীপুরের সামন্ত রাজাদের বাদ দিলে, বাংলার পশ্চিম সীমান্তের সবচেয়ে শক্তিশালী রাজা ছিলেন—বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরের হিন্দু রাজারা এবং বীরভূম-রাজনগরের মুসলমান রাজারা। শুধু যে শক্তিশালী ছিলেন তাঁরা তা নয়, তাঁদের মতন স্বাধীনচেতা সামন্ত রাজা বাংলাদেশে আর

কেউ ছিলেন কি-না সন্দেহ। মোগলযুগেও রাজনগরের পাঠান ও বিষ্ণুপুরের হিন্দু সামন্ত-রাজারা মাথা হেঁট করেননি এবং কোনদিন তাঁরা প্রাদেশিক নবাবের সামনে হাজিরা দেননি, অথবা রাজস্ব দিতে যাননি। স্বাধীন রাজ্যের প্রতিনিধির মতন তাঁদের প্রতিনিধিরা নবাব-দরবারের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেছেন। মুতাক্ষরীণ-কার লিখেছেন: "বাংলার জমিদারদের মধ্যে মুর্শিদাবাদের এত কাছাকাছি ও এত শক্তিশালী বীরভূমের রাজাদের মতন আর কেউ ছিলেন না। তাঁদের নিজেদের সৈন্য-সংখ্যাও যথেষ্ট ছিল এবং চারিত্রিক উদারতায় ও স্বাধীনতাপ্রিয়তায় তাঁদের সমকক্ষ আর কেউ ছিলেন কিনা সন্দেহ" (সায়র-উলা-মুতাক্ষরীণ, ২য়, ৩৯৩—'৯৪)। 'রিয়াজ' ও স্টুয়ার্টও তাই বলেছেন। বিষ্ণুপুরের হিন্দু রাজা ও রাজনগরের মুসলমান রাজা ছিলেন বাংলার স্বাধীন সামন্তরাজাদের দুই স্তম্ভস্বরূপ। বাংলার সীমান্তে ছিলেন বাংলার স্বাধীনতা-রক্ষার দুই পরাক্রমশালী প্রহরী—হিন্দু ও মুসলমান সামন্ত-রাজা। কেউ কোন দিন নিজেদের মধ্যে লড়াই করেননি এবং বিদেশীর আক্রমণ দু'জনেই সমানভাবে প্রতিরোধ করেছেন। মারাঠাদের লুঠতরাজ আক্রমণের বিরুদ্ধে দু'জনেই দুর্ভেদ্য ব্যূহ রচনা করেছেন এবং শেষে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের জুলুম-জবরদস্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে দুজনেই পথের ভিখারী হয়েছেন। একজন হিন্দু ও আর একজন মুসলমান সামন্ত-রাজা। বাংলার ইতিহাসের একটা লুপ্ত অধ্যায়, আজ মনে হয় রূপকথা। হিন্দু ও মুসলমান বাঙালীর গৌরবময় স্মৃতিকথা আজ বেদনায় ও বিষণ্ণতায় ম্লান ও কলঙ্কিত।

রাজনগরের জীর্ণ রাজপ্রাসাদ ও ইমামবাড়ার পাশে দাঁড়িয়ে, ভগ্ন মসজিদ ও মন্দিরের ধ্বংসস্তূপের দিকে চেয়ে, এই কথাই আমার বারবার মনে পড়ছিল। কোথায় রাজনগরের পাঠান জায়গীরদারদের ও বিষ্ণুপুরের হিন্দু রাজাদের সেই ঘাটোয়াল, পাইক নায়করা? বৃটিশ আমলের গ্রাম্য চৌকিদারে পরিণত হয়েছে তারা এবং ঘাটোয়ালী অধিকার রক্ষার জন্য বিদ্রোহ করে সর্বস্বান্ত হয়ে গেছে। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে তারা হয়েছে ডাকাতের দলের সর্দার। নাম-করা সব বীরভূম-বিষ্ণুপুরের ডাকাত, বাংলার বিখ্যাত সব রোবিনহুড, যাদের ইতিহাস আজও লেখা হয়নি। মধ্যযুগের রাজা-রাজড়ারা সকলেই স্বৈরাচারী

ছিলেন—হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান নির্বিশেষে। তেমনি মধ্যযুগীয় বদান্যতাও প্রায় সকলেরই ছিল—অর্থাৎ জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলেই 'বেনাভলেণ্ট ডেস্পট' ছিলেন। হিন্দু সামন্তরাজা ও জমিদাররা যেমন মুসলমানদের ফকিরাণ, পীরোত্তর ইত্যাদি ভূমি দান করেছেন, মুসলমান সামন্তরাও তেমনি হিন্দুদের দেবোত্তর ও নান্‌কর দান করেছেন। মন্দির ও মসজিদ উভয়েই যথেষ্ট নির্মাণ করেছেন। আজও বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়ায় হিন্দু-মুসলমান সামন্তরাজাদের এই সব বদান্যতার নিদর্শন প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। রাজনগরের পাঠান জায়গীরদার রাজা আসাদ-উল্লা খাঁ (১৬৯৭—১৭১৮) ও তাঁর বংশধররা এইরকম প্রচুর জমি হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলকে দান করেছিলেন। প্রসিদ্ধ বক্রেশ্বর তীর্থ সম্বন্ধে রাজনগরের মুসলমান রাজার প্রদত্ত একটি সনদ (প্রায় দু'শ বছর আগেকার) এখানে আংশিক উদ্ধৃত করছি। সনদখানি বক্রেশ্বরের পাণ্ডা কৃষ্ণবিহারী আচার্যের গৃহে সযত্নে রক্ষিত ছিল, শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় তাকে উদ্ধার করেছিলেন—

"•• বক্রেশ্বরনাথ শিবঠাকুরের নিষ্কর দেবত্তর মুদ্দ্যুতে পুরুস পুরুস হইতে ৺জীয়ের সেবা পূজা করিয়া দখলিকার আছে। বীররাজার দত্ত সনন্দ রাখে। এক্ষণে বক্রেশ্বরের মেলাতে হুজুরের লোক-লস্কর হাতী-ঘোড়াতে বাজারে জুলুম হাঙ্গাম করে। এজন্য দরখাস্ত করি বক্রেশ্বরের মেলাতে জুলুম না করে তেঁহায় যেমত হুকুম।...উক্ত দেবত্তর বৃত্তি বেশাদে কেহ জুলুম, হাঙ্গামা করিবে না ও কখন শর্মা মজকুরদিগকে তলপ করিবেক না। যেন পাণ্ডা মজকুর সাবেক স্বরত ৺জীয়ের সেবা পূজা করিয়া পুত্রপৌত্রাদি ভোগদখল করে। পরত্তা লিগি মুন্সী রেয়াজউদ্দীন মহম্মদ। ইতি সন ১১৭২ সাল, তাং ৯ই ফাল্গুন।"

কালীদহের কূলে বসে রাজনগরের এই সব ঐতিহাসিক স্মৃতি টুকরো টুকরো মনে পড়ছিল। বাংলার হিন্দু ও মুসলমান সামন্তরাজাদের কাহিনী। বিশাল কালীদহ, হ্রদের মতন। আজও রয়েছে। ইমামবাড়া আছে। সামনে আছে দ্বাদশ গম্বুজবিশিষ্ট মতিচর মসজিদ। নহবৎখানা আছে, নহবৎ আজ আর বাজে না। কবরখানা আছে, নগর-রাজাদের কবর। তার মধ্যে অতীতকালের সেই নহবৎখানা থেকে যেন সানাইয়ের করুণ সুর ভেসে আসছে মনে হয়।

বক্রেশ্বর

গৌড়দেশে মহৎ ক্ষেত্রং বক্রেশ্বরং সুসঙ্গতং।
যন্নাম স্মরণেনাপি মুচ্যতে সর্বপাতকাৎ॥
একয়া পাপহারিণ্যা জাহ্নব্যাচ বিশেষতঃ।
বক্রেশ্বর ক্ষেত্রেণ পুণ্যো গৌড় প্রকীর্তিতঃ॥

মহৎ তীর্থক্ষেত্র বক্রেশ্বর গৌড়দেশে অবস্থিত। একদিকে পাপহরা নদী, অন্যদিকে জাহ্নবী-বেষ্টিত এই বক্রেশ্বর ক্ষেত্র বক্ষে ধারণ করে গৌড়দেশ পুণ্যের আধার হয়েছে।

অণ্ডাল-সাঁইথিয়া রেলপথের দুবরাজপুর স্টেশন থেকে বক্রেশ্বর প্রায় ছয় মাইল উত্তর-পশ্চিমে এবং সিউড়ী থেকে চৌদ্দ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে। যাতায়াতের পথ আছে ভাল, কিন্তু কোন যানবাহন নেই। পায়ে হেঁটে বা গরুর গাড়ি ও মোটর গাড়িতে যেতে হয়। বীরভূম জেলায় একাধিক তন্ত্রোক্ত পীঠস্থান ও উপ-পীঠস্থান আছে। 'বক্রেশ্বরের' নাম কোন তন্ত্রশাস্ত্রে বা পীঠ-মালায় পাওয়া যায় না। না পাওয়া গেলেও, বীরভূমের বা বাংলাদেশের শৈবতীর্থের মধ্যে বক্রেশ্বর অন্যতম। বিখ্যাত তান্ত্রিক সাধকরা বক্রেশ্বরে সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেছেন। তাঁদের মধ্যে 'অঘোরী বাবা'র নাম অনেকেই জানেন। তারাপীঠের (বীরভূম) 'বামাক্ষ্যাপা' ও বক্রেশ্বরের 'অঘোরীবাবা' এ-অঞ্চলের প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক সিদ্ধপুরুষ। সাধনক্ষেত্র ও তীর্থস্থানরূপে 'বক্রেশ্বর' কতকালের প্রাচীন, তার সঠিক কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। সব তীর্থস্থানের মত বক্রেশ্বরকেও কেন্দ্র করে একাধিক কিংবদন্তীর সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু তার ঐতিহাসিক মূল এখনও তমসাচ্ছন্ন।

পুণ্যলোভাতুর যাত্রীরা বহু দূর দেশদেশান্তর থেকে বক্রেশ্বর তীর্থে এসেছেন ও এখনও আসেন। সাধকরা আসেন তীর্থান্তর থেকে, সুদূর কামরূপ থেকে পর্যন্ত। তান্ত্রিক সাধক ও বাউলরাই আসেন বেশি। তাঁদেরই দর্শনলাভের লোভ ছিল প্রবল। বক্রেশ্বর যাওয়ার প্রধান উদ্দেশ্যও ছিল তাই। তন্দ্রাভিলাষী দুঃসাহসী শিল্পীর মতন 'সাধুসঙ্গের' বাসনা ততটা উগ্র ছিল না, যতটা সাধুসন্দর্শনের বাসনা ছিল। অষ্টাবক্র মুনি যেখানে

সিদ্ধিলাভ করেছিলেন এবং যাঁর কঠোর তপস্যায় তুষ্ট হয়ে পার্বতীনাথ বলেছিলেন :

সততং ত্বঞ্চ মন্তক্তোহপ্যসৌখ্যেন্দ্রিয়ভৃতঃ সদা।
কৃত্বা ভবন্নাম চাগ্রন্তং মম চাত্র স্থিতির্ভবেৎ॥

—"অন্তাবধি তোমার পূজার পর ভক্তরা আমার অর্চনা করবে এবং তোমার নামেই আমার স্থিতি হবে" এবং "ইদানীং সিদ্ধপীঠস্ত লোকে খ্যাতো ভবিষ্যতি"—এখন থেকে এই ক্ষেত্র সিদ্ধপীঠ নামে খ্যাত হবে ;—দূরদূরান্তর থেকে যেখানে সাধকরা এসেছেন সাধনের জন্য, তা স্বচক্ষে দর্শন করার বাসনা কার না থাকে !

দূর থেকে বক্রেশ্বর যখন দৃষ্টিপথে ভেসে উঠল তখন মনে হল যেন বক্রেশ্বর দেবতাদের গ্রাম, মানুষের গ্রাম নয়। মানুষের গ্রাম দেখতে অভ্যস্ত, দেবতাদের গ্রাম দেখিনি। মানুষের গ্রামে দেখেছি মানুষের বসতবাড়ি ও পর্ণকুটিরের সমাবেশ, তার মধ্যে হয়ত কোন দেবালয়ে দেবতা বিরাজ করেন। বক্রেশ্বরে দেখলাম, ঠিক তার বিপরীত দৃশ্য। অসংখ্য দেবালয়ে দেবতারা বিরাজ করছেন, লোকালয় নেই কোথাও। দেবতা আছেন, মানুষ নেই—দেবালয় আছে, লোকালয় নেই, এরকম বিচিত্র স্থান, তা সে যত বড় তীর্থস্থানই হোক না কেন, সচরাচর দেখা যায় না। সেবায়েত আছেন, পূজারী আছেন, পাণ্ডারা আছেন, দোকানীরা আছেন, তীর্থযাত্রীরা আছেন, দূরে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত লোকালয়ে লোকও আছেন—কিন্তু সকলেই আছেন দেবতাদের প্রয়োজনে। সুতরাং বক্রেশ্বর 'দেবগ্রাম' ছাড়া কি ? মানুষের গ্রামে দেবতা থাকেন মানুষের প্রয়োজনে—দেবগ্রাম 'বক্রেশ্বরে' মানুষের বসবাস দেবতার প্রয়োজনে। সবচেয়ে আশ্চর্য হল, কুটির ও মনুষ্যালয়ের সংখ্যার চেয়ে বক্রেশ্বরে দেবালয়ের সংখ্যা বেশি। দূর থেকে দেখলে দেবালয়-গ্রাম ছাড়া আর কিছু মনে হতে পারে না। বিচিত্র দৃশ্য, আর কোথাও দেখিনি এখনও—।

দূর থেকে দেখেই রোমাঞ্চ যে হয়নি, এমন কথা বলব না। অসংখ্য মন্দিরের এরকম একত্র সমাবেশ এমনিতেই রোমাঞ্চিত করে তোলে। অধিকাংশই খাঁটি চারচালা বাংলা মন্দির, গ্রামের শিবমন্দিরের মতন। বাহুল্য নেই, আড়ম্বর নেই, কিন্তু দেবালয়ের চালের বঙ্কিমরেখাগুলি বীরভূমের মনুষ্যালয়ের মতন সুস্পষ্ট। ছোট-বড়-মাঝারি অসংখ্য মন্দির, অতি প্রাচীন জীর্ণ

মন্দির থেকে নতুন হালের তৈরি মন্দির পর্যন্ত। দেবালয় আছে, দেবতা নেই, এমন দেবালয়ের সংখ্যাও বক্রেশ্বরে কম নয়। বাংলা মন্দির ছাড়াও ছোট ছোট রেখ-মন্দির অনেক আছে বক্রেশ্বরে। বক্রনাথের মূল মন্দিরটি বৃহৎ মন্দির, কিন্তু বাংলা মন্দির নয়, উড়িষ্যার রেখদেউলের মতন। মনে হয়, বাংলাদেশ ও উড়িষ্যার দেবালয়ের একটি মিলনক্ষেত্র বীরভূমের বক্রেশ্বর। বক্রনাথের দেউলের সুউচ্চ শিখর ও আমলক চতুর্দিকের পরিবেশকে প্রভাবান্বিত করে রেখেছে। তারই আশেপাশে অসংখ্য বাংলা মন্দিরের অনাড়ম্বর সমাবেশ দেখে মনে হয় যেন বাংলা ও উড়িষ্যার শিল্পীদের শিল্পবিদ্যার লেনদেন বক্রেশ্বরেও হয়েছিল কোন সময়। অন্তত বাঙালী শিল্পীরা দুই দেশেরই দেবালয়-স্থাপত্য-রীতির অনুশীলন করেছিলেন বক্রেশ্বরে।

বক্রেশ্বর "গুহ্যতীর্থং পরং মহৎ" বলে পুরাণে কথিত। প্রকৃতির নিভৃত কোণে বলে নয়, বোধ হয় তান্ত্রিক সাধকদের গুহ্যসাধনার অন্যতম কেন্দ্র বলেই বক্রেশ্বর 'গুহ্যতীর্থ' বলে পরিচিত। তীর্থক্ষেত্রের পুবে ও উত্তরে বক্রেশ্বর নদ ও দক্ষিণে পাপহরা নদী। তার পাশেই শ্মশানভূমি। মনে হয় যেন শ্মশানের বুকেই এই শৈবতীর্থটি গড়ে উঠেছে। শ্মশানের রূপটিও ভয়ঙ্কর। গ্রাম্য শ্মশানের মতন হলেও বক্রেশ্বরের শ্মশানের একটি বিকট বিশেষত্ব আছে। অন্তত আমার তাই প্রথমেই মনে হয়েছে। মন্দির-এলাকার মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে শ্মশানের বুকে একেবারে জ্বলন্ত চিতার পাশে এসে দাঁড়িয়ে চমকে উঠতে হয়। সামান্য শ্মশান নয়, মহাশ্মশান বলে পরিচিত বক্রেশ্বরের এই শ্মশানে, পাপহরার তীরে বহু দূরের গ্রাম থেকে শব বহন করে আনা হয় সৎকারের জন্য। সেইজন্য শ্মশানের চিতার আগুন কখন নিভে যায় না, জ্বলতেই থাকে। শবেরও অভাব হয় না। শবযাত্রীদের মনে হয় যেন তীর্থযাত্রী। সমস্ত তীর্থক্ষেত্রটাই ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ মনে হয় মহাশ্মশান। দ্বিপ্রহরের প্রচণ্ড সূর্যালোকেও গা ছম্‌ছম্ করে, রীতিমত ভয় হয়। চারিদিকের অসংখ্য দেবালয়ের মধ্যে দেবতারা সব নির্জনে বসে থাকেন, নির্বাক তাঁরা। 'শব্দ'ই যে ব্রহ্ম তা বক্রেশ্বরে গেলে প্রতি মুহূর্তে উপলব্ধি করা যায়। সেবায়েত, পূজারী, পাণ্ডা বা দু'চারজন যাত্রীদের আলাপ পরিপার্শ্বের নিরেট নিস্তব্ধতার মধ্যে ফিস্‌ফিসানি বলে মনে হয়। পূর্বদিকে বনভূমি তাকে আরও রহস্যময় করে তোলে। একমাত্র শিবাধ্বনি বা শকুনের কুৎসিত আর্তনাদ

ছাড়া শব্দব্রহ্মের কোন পরিচয় কানের ভিতর দিয়ে মর্মে প্রবেশ করে না। এমন কি কোন এক নির্জন নিভৃত কোণের জীর্ণ দেবালয়ের গায়ে হেলান দিয়ে বসে ভ্রাম্যমাণ যাযাবর কোন পথশ্রান্ত বাউল যখন তার সঙ্গিনীকে নিয়ে একতারা বাজিয়ে দ্বৈতসঙ্গীত গায়, তখনও তা নিঃশব্দতার ঐকতান বলে মনে হয়। দিনের আলোয় দ্বিপ্রহরেই যে-বক্রেশ্বরের এই মূর্তি, জানি না গভীর রাতে আজও সে কী মূর্তি ধারণ করে!

শব্দব্রহ্মের সবচেয়ে বড় পরিচয় শিবাধ্বনি ছাড়াও শবযাত্রীদের হরিধ্বনি। তারই সঙ্গে সুর মিলিয়ে দেবালয়ের একোণ-সেকোণ থেকে হাই তুলে দু'চারজন জটাজুটধারী সাধু শিবশঙ্করধ্বনি দিয়ে ওঠেন। পাপহরার তীরে মহাশ্মশানে শবযাত্রীদের গুঞ্জনধ্বনি শোনা যায়। শ্মশানের দৃশ্য দেখা যায় না। আশ্চর্যভাবে আত্মসমাহিত যদি কেউ হতে পারেন তাহলে তীরে দাঁড়িয়ে সে-দৃশ্য দেখতে পারেন। উপুড় করে চিৎ করে, উব্‌দোপাব্‌দা করে শবদাহ করা হচ্ছে, মধ্যে মধ্যে বংশদণ্ডের প্রচণ্ড আঘাতে নারকেলের খোল ফাটার মতন মাথার খুলি ফাটার শব্দ হচ্ছে। দেখার মতন দৃশ্য নয়, শোনার মতন শব্দও নয়। সাধুসঙ্গলোভাতুর তন্ত্রাভিলাষীদেরও যে রীতিমত হৃৎকম্প হয়েছে, তা তাঁরা স্বীকার করেছেন। হৃৎকম্প হত না শুধু তন্ত্রসিদ্ধ সাধকদের। মহাশ্মশানের মহান নিস্তব্ধতার মধ্যে বক্রেশ্বর ক্ষেত্রে তান্ত্রিক সাধকরা কঠোর গুহ্যসাধনা করেছেন এবং সমস্ত রকমের ভয়-ভাবনালোভ জয় করে সিদ্ধপুরুষ হয়েছেন।

শ্মশানের উপরেই ছিল বিখ্যাত তান্ত্রিক সিদ্ধপুরুষ অঘোরীবাবার আস্তানা। এখন আর অঘোরীবাবা জীবিত নেই, তাঁর কোন উত্তরসাধকও কেউ নেই বক্রেশ্বরে। অনেক খোঁজ-খবর করেও কোন তান্ত্রিক সাধকের সন্ধান পাইনি বক্রেশ্বরে। সেবায়েত ভোলানাথ চক্রবর্তী মশায় বললেন যে, আগেকার সেই সাধকদের মতন এখন আর কোন সাধক নেই। ক্বচিৎ কখন দু'একজন সাধক ভিন্ন স্থান থেকে বক্রেশ্বরে আসেন এখন, হয়ত দু'চার দশ দিন থাকেন, তারপর আবার চলে যান। অঘোরীবাবা ছাড়াও প্রমথ চক্রবর্তী নামে আর একজন তান্ত্রিক সাধক বক্রেশ্বরে তন্ত্রসাধনা করেছিলেন, তাঁর সমাধি রয়েছে। অঘোরীবাবাও আজ সমাধিস্থ হয়েছেন এবং তাঁর সমাধিটি রয়েছে একেবারে শ্মশানের মধ্যে। সাধারণত ঐ স্থানটিতেই নাকি তিনি থাকতেন, সাধনা করতেন এবং গভীর রাতে 'চক্রে' বসতেন।

তন্ত্র ও মন্ত্রের যুগ নিঃসন্দেহে আজ অস্ত গেছে, তবুও আজও কত কথা-উপকথা, কত কাহিনী-কিংবদন্তীই না বীরভূমের একাধিক সিদ্ধ পীঠস্থানের সাধকদের কেন্দ্র করে রচিত হচ্ছে! তান্ত্রিক সাধনা ও সাধক পুরুষদের রোমাঞ্চকর সব অবিশ্বাস্য কাহিনী যদি কেউ শুনতে চান, বীরভূমের বিখ্যাত পীঠস্থানগুলিতে যাবেন। সাধকরা প্রায় নেই বললেও চলে, কিন্তু সাধনার ঐতিহ্য আজও জাগ্রত রয়েছে লোকের মুখে মুখে অজস্র কিংবদন্তী ও কাহিনীর মধ্যে। বামাক্ষ্যাপার কাহিনী, অঘোরীবাবার কাহিনী ইত্যাদি তার দৃষ্টান্ত। অঘোরীবাবার কত কাহিনী যে শোনা যায় তার ইয়ত্তা নেই। 'তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গ' রচয়িতার বিবরণের মধ্যে প্রত্যক্ষদর্শী শিল্পীর স্পর্শ তাকে আরও যেন জীবন্ত করে তুলেছে। পাপহরার শ্মশানেই অঘোরীবাবা থাকতেন, শবসাধনা করতেন। 'চক্রে' বসতেন তিনি গভীর রাতে, মৃতের মাথার খুলিতে কারণপান করতেন এবং মধ্যে মধ্যে ভক্ষণ করতেন সদ্যোদগ্ধ শবের বিস্ফারিত মস্তিষ্কপ্রসূত উত্তপ্ত ঘিলু। ঝড়-বিদ্যুতে বর্ষার রাতে যখন তিনি তাঁর চামুণ্ডাদের নিয়ে চক্রে বসতেন তখন উপস্থিত ভৈরব-ভৈরবীরা বিবস্ত্র হয়ে শবাসনে বসে কারণবারি পান করে এক ভয়ঙ্কর পরিবেশের সৃষ্টি করত। জলের মতন মদ্যপান করতেন অঘোরীবাবা এবং দিনের আলোয় ও রাতের অন্ধকারে সব সময় বিবস্ত্র হয়ে থাকতেন। দূর-দূরান্তর থেকে আরও অনেক সাধক ও ভৈরব-ভৈরবীদের সমাগম হত বক্রেশ্বরে। এখন অঘোরী-বাবাও নেই, তাঁর সেই সাধনার কোন রেশ পর্যন্ত নেই। পরিবেশ, কিংবদন্তী ও ঐতিহ্যের মধ্যে কেবল অশরীরী স্মৃতিটুকু রয়েছে।

শৈবতীর্থে শক্তিও বিরাজ করেন। বক্রেশ্বরেও দেবী মহিষমর্দিনী আছেন। পীঠমালাতন্ত্রে তাঁর বর্ণনাও আছে—

বক্রেশ্বরে মনঃ পাতু দেবী মহিষমর্দিনী।
ভৈরবো বক্রনাথস্তু নদী তত্র পাপহরা॥

শিবমন্দির-সংলগ্ন মন্দিরে এখন যে দশভূজা মহিষমর্দিনীর ধাতুমূর্তি আছে তা বেশিদিনের প্রতিষ্ঠিত নয়। প্রাচীন মূর্তি লোপ পেয়ে গেছে মনে হয়। কিছুকাল আগে 'বীরভূম অনুসন্ধান সমিতি' পাণ্ডাদের পাড়ার কাছে একটি পুষ্করিণীগর্ভে একটি অষ্টাদশভুজা মহিষমর্দিনীর পাষাণমূর্তি পান এবং উদ্যোগীরা

মনে করেন, এইটিই আসল মূর্তি। মূর্তিটি বক্রেশ্বর তীর্থক্ষেত্রের কাছে ভিহি বক্রেশ্বরে পূজারীদের বাড়িতেই আছে। মূর্তির দুই পাশে ও উর্ধ্বে চাল-চিত্রাকারে ইন্দ্রাণী, বরাহী, কৌমারী প্রভৃতি নয়টি শক্তিমূর্তি খোদিত আছে। শ্বেতাঙ্গকুণ্ডের উত্তরতটে বটবৃক্ষমূলে একটি ভাঙা হরগৌরীর যুগলমূর্তি বহুদিন ধরে পড়ে রয়েছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বক্রেশ্বরে গিয়ে মূর্তিটিকে দেখে বেশ প্রাচীন মূর্তি বলেই অনুমান করেছিলেন। ভাঙা মূর্তি মাত্রই, কিংবদন্তী অনুসারে কালাপাহাড়ের ভাঙা। এখানেও সেই কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। শ্বেতগঙ্গার পশ্চিমোত্তর কোণে একটি প্রাচীন শাল্মলী বৃক্ষের তলায়, ইটের গোলাকার বেদীর উপরে ভৈরবের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। বিখ্যাত খাঁকীবাবা তাকে সংস্কার করে একখণ্ড পাথরে নিজের নাম খোদাই করে স্থাপন করেন। খাঁকীবাবাও একজন সাধক পুরুষ ছিলেন। কিংবদন্তী, ঐতিহ্য, ইতিহাস, তান্ত্রিক সাধনার ধারা ও এই সব পাথুরে প্রমাণ থেকে এইটুকু পরিষ্কার বোঝা যায় যে, বক্রেশ্বর একটি শৈব ও শাক্ততীর্থ এবং তার প্রাচীনতাও অতীতের হিন্দুযুগ পর্যন্ত বিস্তৃত হওয়া আশ্চর্য নয়।

বক্রেশ্বরের কুণ্ডমাহাত্ম্যের মধ্যে অলৌকিকতত্ত্ব থাক বা না থাক, ভূতাত্ত্বিক বিস্ময় যে আছে, তা বুঝতে কষ্ট হয় না। ভৈরবকুণ্ড, জীবিতকুণ্ড, অগ্নিকুণ্ড, ব্রহ্মকুণ্ড, শ্বেতগঙ্গা ইত্যাদি ভূতত্ত্বের বিষয়বস্তু। গরম ফুটন্ত জল ও গন্ধকের গন্ধের মধ্যে ভূতত্ত্ব ছাড়া আর কোন ভৌতিক তত্ত্ব আছে বলে মনে হয় না। কিন্তু কুণ্ডগুলি এতবড় পীঠস্থানের মধ্যে থাকায়, সেগুলিও অলৌকিক হয়ে উঠেছে। আসলে বীরভূমের মাটির এই বিশেষত্ব এবং এই ধরনের কুণ্ড আরও অন্যান্য স্থানে আছে। সেইজন্য যেখানেই কুণ্ড আছে ও শিবমন্দির আছে সেইস্থানই 'বক্রেশ্বর' বলে পরিচিত। যেমন দুবরাজপুর স্টেশন থেকে প্রায় দশ মাইল পশ্চিমে দেগঞ্জ গ্রামে এবং রাজনগর থেকে কিছু দূরে একস্থানে কুণ্ড ও উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। তাই কেউ কেউ বলেন, এগুলি পুরাতন বক্রেশ্বর। আসলে বক্রেশ্বরের সঙ্গে ভূগর্ভোত্থিত কুণ্ডের ও প্রস্রবণের কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই। ইতিহাসে বক্রেশ্বর প্রাচীন শৈবতীর্থ ও শাক্ত পীঠ বলেই পরিচিত এবং বীরভূমের একাধিক পীঠস্থানের মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য পীঠস্থান।

জয়দেব-কেঁদুলি

"কেন্দুবিল্বসম্ভবরোহিণীরমণ।" গীতগোবিন্দের পদাবলীর ভণিতা থেকে জানা যায় যে, কবি জয়দেবের জন্মস্থান ও নিবাস ছিল 'কেন্দুবিল্ব' গ্রাম। কেন্দুবিল্ব থেকে কেঁদুলি, বর্তমান নাম 'জয়দেব-কেঁদুলি'। বর্ধমান-বীরভূম সীমান্তে অজয় নদের তীরে কেঁদুলি গ্রাম। বহুকাল থেকে পৌষ সংক্রান্তিতে জয়দেব-স্মারক মেলা হয়ে আসছে এই গ্রামে। রাজা লক্ষ্মণসেনের সভাকবি জয়দেব মিশ্র। সুতরাং প্রায় আটশত বছরের ঐতিহ্য-বিজড়িত গ্রাম কেঁদুলি। ধারাবাহিক স্মারকমেলারও ইতিহাস প্রাচীনতম। এতকালের প্রাচীন মেলা শুধু বাংলাদেশে নয়, পৃথিবীতেও বিরল।

প্রাচীন সাহিত্যের সঙ্গে নবীন সাহিত্যের সেতুবন্ধন হয়েছে জয়দেবের গীতগোবিন্দে। গীতগোবিন্দের পদাবলীর ভাষা সংস্কৃত, ছন্দ প্রাকৃত, কিন্তু ভাব বাংলা।

ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলনকোমলমলয়সমীরে
মধুকরনিকরকরম্বিতকোকিলকূজিতকুঞ্জকুটীরে।

বসন্তরাগ যতিতালবিশিষ্ট এই পদের কোন টীকা বা ভাষ্য প্রয়োজন হয় না। পরিষ্কার বোঝা যায়, বসন্তের আগমনে মলয় সমীরণ সুকোমল লবঙ্গ-লতাকে বার-বার সাদরে আলিঙ্গন করছে; কুঞ্জকুটিরে ভ্রমরের গুণগুণ রব ও কোকিলের সুমধুর কুহুধ্বনি শোনা যাচ্ছে। এই সময় হরি কি করছেন?

বিহরহি হরিরিহ সরসবসন্তে
নৃত্যতি যুবতিজনেন সমংসখি
বিরহিজনস্য দুরন্তে॥

এই মধুর সময়ে হরি কোন ভাগ্যবতী যুবতীর সঙ্গে বিহার করছেন এবং প্রেমোৎসবে নৃত্য করছেন। বিরহীজনের কাছে বসন্ত সত্যিই অতি দুরন্ত!

গীতগোবিন্দের এই গীতিময় উচ্ছ্বাস, এই উচ্ছল রসতরঙ্গ, পরবর্তীকালে বৈষ্ণব পদাবলীর মন্দাকিনী বেয়ে এসে আধুনিক বাংলা গীতিকাব্যের প্রাণ সঞ্চার করেছে। গীতিগোবিন্দ বাংলা গীতিকাব্যের অন্যতম প্রধান উৎস এবং গীতিকাব্যই বাংলার ও বাঙালীর প্রাণের কাব্য। অজয়ের তীরে কেঁদুলি গ্রামে

পা দিয়েই মনে হয় এই কথা। মনে হয় যেন বাংলার গীতিগঙ্গার উৎস সন্ধানে কেঁদুলি গ্রামে এসে পৌঁছেছি। এই সেই উৎস! অবশ্য বোঝবার উপায় নেই। বীরভূমের এক প্রান্তের একটি উপেক্ষিত গ্রাম, সমস্ত যোগাযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন। যেমন নির্জন, তেমনি নিঃস্ব। ধনৈশ্বর্যের কোন চিহ্ন নেই কোথাও। অখ্যাত অজ্ঞাত বাংলার অসংখ্য পল্লীর মতনই কেন্দুবিল্বের শ্রী। ব্রজবাসী মোহন্ত আছেন, তাঁর প্রচুর দেবোত্তর সম্পত্তি আছে। কয়েকটি মন্দির আছে, তার মধ্যে রাধাবিনোদের মন্দির একটি। এছাড়া সাধুসন্ন্যাসীদের আশ্রম আছে। আর কিছু নেই। জীর্ণ কুটির ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। পৌষ-সংক্রান্তির জয়দেব-স্মারক মেলায় হঠাৎ যেন এই নগণ্য গ্রামটি কয়েকদিনের জন্য জীবন্ত হয়ে ওঠে। হাজার হাজার যাত্রীর স্রোত বইতে থাকে গ্রামে। হাজার হাজার বাউল একতারা বাজিয়ে গান গাইতে গাইতে কেঁদুলিতে এসে জমা হয় বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে। মাথা গোঁজার কোন স্থান নেই, কোন আশ্রয় নেই। বিশাল বটগাছের তলাই হল সবচেয়ে বড় আশ্রয়-শিবির। সাময়িক তাঁবু থাকে কিছু, আর হাজার গরুমহিষের গাড়ি। সেই গাড়ির মধ্যেই যাত্রীরা রাত্রি যাপন করে। মাঘের গোড়ায় যদি ঝড়বৃষ্টি হয় (গত বছরেই হয়েছিল), তাহলে যাত্রীদের দুর্গতির আর সীমা থাকে না। হাজার হাজার যাত্রীকে স্বচক্ষে দেখেছি অসহায় জন্তুর মতন প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে অনিশ্চিত পরিণামের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপতে। পালাবার পর্যন্ত পথ নেই। দু'দিকেই (বর্ধমান ও বীরভূম) যে কাঁচাপথ আছে তা সামান্য বৃষ্টিতে দুর্গম হয়ে ওঠে। তাছাড়া, বেওয়ারিস মরুপ্রান্তরে অসংখ্য নরনারী-শিশুর জীবন বিপন্ন হয়ে ওঠে চোরডাকাতের আতঙ্কে। কারও কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। বিশাল দেবোত্তর-সম্পত্তির মালিক, জয়দেব-কেঁদুলির মোহন্ত থেকে দেশের সর্দার-সামন্তরা পর্যন্ত সকলেই নির্মম উদাসীন। ইদানীং দেখেছি, ব্রজবাসী মোহন্ত প্রায় তাঁর ঘরের দরজা বন্ধ করে বসে থাকেন এবং সরকারী পুলিশ কর্মচারী থেকে মহকুমা হাকিম, ম্যাজিস্ট্রেট কেউ এসেছেন খবর পেলে (উপ-মোহন্তদের মারফৎ) তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে এসে দু'হাত তুলে নমস্কার করেন, তাঁদের পিছন পিছন হাত জোড় করে মেলা দেখিয়ে ঘুরে বেড়ান এবং খানাটেবিলে স্বহস্তে খাদ্য পরিবেশন করে তাঁদের আপ্যায়ন করেন। করুন, তাতে আপত্তি নেই, কিন্তু আরও যে অসংখ্য যাত্রী ও দর্শক মেলাতে

যান, তাঁদের একেবারে মানুষ বলে গণ্য না করার কি সঙ্গত কারণ থাকতে পারে জানি না। যে-সম্পত্তি মোহন্তরা বংশ-পরম্পরায় ভোগ করে এসেছেন, তাতে কেঁদুলি গ্রাম আজ বীরভূমের শ্রেষ্ঠ বর্ধিষ্ণু গ্রামে পরিণত হওয়া উচিত ছিল। কয়েকটি যাত্রীনিবাস, অতিথিশালা অন্তত সেখানে গড়ে উঠতে পারত। যাতায়াতের পথ স্বচ্ছন্দে ভাল হতে পারত। স্থানীয় লোকের জন্য স্কুল, হাসপাতাল ইত্যাদিও প্রতিষ্ঠিত হতে পারত। কিন্তু শুনেছি সারা ইলামবাজার থানা এলাকার মধ্যে আজও একটি হাইস্কুল নেই, আর কেঁদুলির রূপ আজ পরিত্যক্ত গ্রামের মতন করুণ ও ভয়াবহ। বোঝা যায়, এক সময় মোহন্তদের সম্পত্তির স্বার্থ ছিল, তাই তাঁরা সম্পত্তিই দেখতেন। আজ নানাকারণে সেই স্বার্থে তাঁদের আঘাত লেগেছে, তাই আজ তাঁরা কিছুই দেখেন না। কবি জয়দেবের স্মৃতি সম্বন্ধে মোহন্তদের যে কোন রকম চেতনা আছে তা মনে হয় না। বর্ধমানের মহারাজার তৈরি মন্দির এবং বর্ধমানবাসী ব্রজবাসীরা তার মোহন্ত ও দেবোত্তরের মালিক। কবি জয়দেবের সঙ্গে এসবের কোন সম্পর্ক নেই। অথচ হাজার হাজার যাত্রী এই গ্রামটিতে আসেন দীর্ঘকাল থেকে, কোন মোহন্ত বা সামন্তের জন্য নয়, জয়দেবের স্মৃতির জন্য। দেশের পণ্ডিত, ঐতিহাসিক, সাধক, ভক্ত, দর্শক এমন লোক অল্পই আছেন, যিনি এই কেঁদুলি গ্রামে একবার যাননি। ভবিষ্যতেও যাবেন। বাংলার শ্রেষ্ঠ গীতিকবি জয়দেবের স্মৃতি-বিজড়িত গ্রামে তাঁর স্মারক-মেলায় অসংখ্য যাত্রীর সমাগম রোধ করাও সম্ভব নয়। তাই শুধু মোহন্তের নয়, দেশের সামন্তদেরও একটা ইতিকর্তব্য আছে বলে মনে হয়। প্রতি বছর কিছু সেপাই পাঠিয়ে, একবার মেলায় বেড়িয়ে গেলে সে-কর্তব্য শেষ হয়ে যায় না। হাজার হাজার যাত্রী ও অতিথিদের জন্য কিছু করা উচিত এবং সবার উপরে, কেঁদুলি গ্রামের জন্য অনেক কিছু করা কর্তব্য। কয়েক বছরের মধ্যেই গ্রামটি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাবে বলে মনে হয়। তার জন্য নদীর পাড়টি পাথর দিয়ে বেঁধে দেওয়া এখনই প্রয়োজন। তা না হলে, উপেক্ষা ও উদাসীনতার জন্য তো বটেই, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে অজয়ের বন্যায় অদূর ভবিষ্যতে জয়দেবের স্মৃতিবিজড়িত কেন্দুবিল্ব গ্রামের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাবে বাংলার মাটি থেকে।

জয়দেব-কেঁদুলির মেলার মতন এত বড় মেলা পশ্চিমবাংলায় খুব কমই

হয়। দূরদূরান্তর থেকে কারিগর, শিল্পী ও ব্যবসায়ীরা মেলাতে আসেন। শুনেছি, বর্ধমান জেলার দধিয়াবর্গীতলার শ্রীপঞ্চমীর মেলাও খুব বড় মেলা। অন্নসত্র মেলার অন্যতম বৈশিষ্ট্য, জয়দেবেরও। বিভিন্ন আশ্রম ও প্রতিষ্ঠান থেকে অন্নসত্রের ব্যবস্থা করা হয়। মেলা হয় পৌষ-সংক্রান্তিতে যেমন কেঁদুলিতে, অথবা মাঘমাসে যেমন দধিয়াবর্গীতলায়। নতুন ধান চাষী ও গৃহস্থের ঘরে ওঠে। মেলার অর্থনৈতিক বনিয়াদ তৈরি হয়ে থাকে। যে বছর ধান হয়, সে-বছর তো কথাই নেই। এ বছর প্রচুর পরিমাণে ধান হয়েছে, সুতরাং মেলাও জমেছে খুব এবং মেলার অন্নসত্রও। হাজার হাজার যাত্রী কেঁদুলির মেলায় অন্নসত্রে খেয়েছেন দেখেছি। কত শত মণ চাল রান্না হয়েছে যে তার ঠিক নেই।

অন্নসত্র ছাড়া জয়দেব-কেঁদুলির মেলার অন্যতম প্রধান বিশেষত্ব হল আউল-বাউলদের সমাবেশ। জয়দেব-কেঁদুলির অন্যতম আকর্ষণ এই বাউলরা। এর জন্য অনেক অনুসন্ধানী ও ঐতিহাসিক কেঁদুলির মেলায় এসেছেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী থেকে সিলভ্যাঁ লেভী পর্যন্ত দেশী ও বিদেশী পণ্ডিত সকলকেই এখানে বাউল-সান্নিধ্যের জন্য আসতে হয়েছে। বাউলের কথা পরে সবিস্তারে বলব। পুরো দু'দিন মেলায় ছিলাম এবং অধিকাংশ সময় বাউলদের সংস্পর্শেই কাটিয়েছি। রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্যন্ত বাউলদের নৃত্যগীত শুনেছি, বটগাছের তলায়, ছোট ছোট অগ্নিকুণ্ডের চারপাশে। বিচিত্র অভিজ্ঞতা! বর্ণনার সাধ্য হবে কিনা জানি না, চেষ্টা করব। আউল-বাউল ছাড়া জয়দেব-কেঁদুলিতে বাকি যা আছে তার কিছুটা প্রত্নতত্ত্ব, কিছুটা ইতিহাস, আর বেশির ভাগ কিংবদন্তী। তাই যথেষ্ট। কারণ বাংলার বাউলরাই জয়দেবের গীতিগঙ্গার শেষ প্রবাহ মনে হয়। বাউলরাই তাঁর উত্তরাধিকারী। গীতগোবিন্দ আজও কেঁদুলির বালকের দল গান করে বেড়ায়। কিন্তু আউল-বাউলেরা যে একতারা বাজিয়ে গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে মাঠপ্রান্তর নদনদী পার হয়ে, বীরভূমের এই প্রান্তপল্লীতে হাজারে হাজারে এসে সমবেত হন, মনে হয় তার চেয়ে বড় জয়দেবের স্মৃতির নিদর্শন আর কিছু হতে পারে না।

সকলেই জানেন, কবি জয়দেব রাজা লক্ষ্মণসেনের অন্যতম সভাকবি ছিলেন—

গোবর্ধনশ্চ শরণো জয়দেব উমাপতিঃ।
কবিরাজশ্চ রত্নানি সমিতৌ লক্ষ্মণস্য চ॥

গোবর্ধন আচার্য, শরণ, জয়দেব, উমাপতি ও কবিরাজ (ধোয়ী)—এঁরা ছিলেন লক্ষ্মণসেনের রাজসভার পঞ্চরত্নস্বরূপ। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর কথা। 'সেকশুভোদয়া'য় জয়দেব ও তাঁর পত্নী পদ্মাবতীর সঙ্গীতবিদ্যা-পারদর্শিতার একটি মনোরম কাহিনী আছে (সেকশুভোদয়া,-হৃষীকেশ গ্রন্থমালা, পৃ ৬৯-৭১); কিছুটা উদ্ধৃত করছি, যেমন:

"ততঃ পদ্মাবতী জয়দেবস্য ব্রাহ্মণী গান্ধারনামা ধ্বনিরুগদাহ্বিতা চ। তদুদগীরিতে সতি সমস্ত নৌকাঃ, গঙ্গায়াং-যদ্ বিদ্যন্তে, শ্রুত্বা তৎসন্নিধানং সমায়াতা চ। তত স্তাং সর্বে সভাসদাঃ পূজয়ামাস তৎক্ষণাৎ। 'ধন্যেয়ং ব্রাহ্মণী। ঈদৃশং ন দৃষ্টং ন শ্রুতমিতি দ্বয়োরপি। ধন্যোহসৌ'।"—
—(সেকশুভোদয়া: ৭০)

অর্থ পরিষ্কার, টীকা নিষ্প্রয়োজন। সঙ্গীতকলায় জয়দের ও তাঁর ব্রাহ্মণী পদ্মাবতীর কি রকম পারদর্শিতা ছিল, তা এই কাহিনী থেকে বোঝা যায়। গান শুনে গঙ্গার বুকে যত নৌকা ছিল, কাছে তীরে চলে এসেছিল সব। সভাসদরা শুনে ধন্য ধন্য করে বলেছিলেন, এরকম নাচ ও গান তাঁরা কখনও দেখেননি ও শোনেননি। জয়দেব ও পদ্মাবতীর এই নৃত্যগীতের কথা কোচবিহারের রাজা নরনারায়ণের ভ্রাতা শুক্লধ্বজের সভাকবি রামসরস্বতীও তাঁর 'জয়দেব' কাব্যে উল্লেখ করেছেন—

জয়দেব মাধবর স্তুতিক বর্ণাবে,
পদ্মাবতী আগত নাচন্ত ভঙ্গিভাবে।
কৃষ্ণর গীতক জয়দেবে নিদগতি,
রূপক তালর চেবে নাচে পদ্মাবতী।

মনে হয়, জয়দেব গীতগোবিন্দ গান করতেন আর পদ্মাবতী নাচতেন। তখনকার দিনে কবিদের গায়ন থাকত। সেদিনও মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় ভারতচন্দ্রের কাব্য নীলমণি সমাদার নামক গায়ন গেয়ে শোনাতেন। জয়দেবের জীবন সম্বন্ধে আর অন্য কিছু জানা যায় না। তাঁর গীতগোবিন্দে যে আত্মপরিচয় আছে তা থেকে তাঁর পিতামাতা বন্ধু গায়ন দোহার, জন্মস্থান নিবাস ও স্ত্রী পদ্মাবতীর কথা শুধু জানা যায়। যেমন:

শ্রীভোজদেবপ্রভবস্য বামাদেবীসুতশ্রী

জয়দেবকস্য

পরাশরাদিপ্রিয়বন্ধুকণ্ঠে শ্রীগীতগোবিন্দ

এই শ্লোক থেকে জানা যায়, জয়দেবের পিতার নাম ভোজদেব, মাতার নাম বামাদেবী, পরাশর প্রভৃতি প্রিয়বন্ধু তাঁর দোহার ও গায়ন। এছাড়া বাকি সব উপাখ্যান। বোঝা যায়, জয়দেব-পদ্মাবতীকে নিয়ে পরবর্তীকালে বিচিত্র সব কাহিনীর সৃষ্টি হয়েছে। বনমালী দাসের 'জয়দেব চরিত্রে' (অষ্টাদশ শতক), কৃষ্ণদাসের 'ভক্তমাল' ও জগন্নাথ দাসের 'ভক্তচরিতামৃতে' (অষ্টাদশ শতকের শেষে) এই সব কাহিনীর বিবরণ আছে। আধুনিককালে শ্রীঅধরচাঁদ চক্রবর্তী 'লীলা ও নিত্যভাবে শ্রীজয়দেব পদ্মাবতী উপাখ্যান' নামে এক বৃহৎ পুরাণজাতীয় কাব্য রচনা করেছেন। কাহিনীগুলির মধ্যে "দেহি পদপল্লবমুদারমের" কাহিনীটি সবচেয়ে রোমাঞ্চকর। কাহিনীটি হল: কবি জয়দেব একবার "স্মরগরল খণ্ডনং, মম শিরসি মণ্ডনং" পর্যন্ত লিখে ভাবতে ভাবতে গঙ্গাস্নানে গিয়েছিলেন। ইত্যবসরে স্বয়ং ভগবান কবি জয়দেবের রূপ ধরে পদ্মাবতীর অতিথি হয়ে গীতগোবিন্দের পুঁথি খুলে লিখে দিয়ে যান—'দেহি পদপল্লবমুদারম্।' বোঝা যায়, কাহিনীর মধ্যে ভক্তিরসাপ্লুত লোকচিত্তের কল্পনা পক্ষবিস্তার করেছে, ভক্ত-কবির প্রতি শ্রদ্ধানিবেদনে। ইতিহাসের পক্ষে এখানে নীরব থাকা ছাড়া উপায় নেই। কাহিনী যাই হোক, কেন্দুবিল্ব-কেঁদুলির সঙ্গে কবি জয়দেবের স্মৃতি সত্যই আজও জীবন্ত। এই স্মৃতিটুকুই যদি ঐতিহাসিক হয়, তাহলে তার চেয়ে রোমাঞ্চকর আর কিছু নেই। বাংলার গীতিকাব্যের প্রথম ও প্রধান স্রষ্টার স্মৃতিবিজড়িত গ্রাম কেঁদুলি গীতিকাব্যের গঙ্গোত্রীর সম্মান স্বচ্ছন্দে দাবি করতে পারে।

জয়দেবের সিদ্ধিলাভের স্থান, পদ্মাসন, কাঙাল ক্ষেপার আশ্রম ইত্যাদি ছাড়া, কেঁদুলির অন্যতম দ্রষ্টব্য হল রাধাবিনোদের মন্দির। মন্দিরটি সম্বন্ধে প্রত্নতত্ত্ববিভাগের বাৎসরিক রিপোর্টে বলা হয়েছে:

The existing temple here is supposed to have been erected in the seventeenth century on the site of the poet's

house, and apart from its historical interest, is of no mean value from the architectural point of view. It is an example of the Nava-ratna or the nine-towered type of temple, in which one central tower is surrounded by two sets of corner towers at two different levels...The facade of the temple is richly decorated with brick tiles representing the various incarnations of Vishnu and scenes from the Ramayana, including the war between the monkeys and the demons. (Archaeological Survey—Annual Report, 1923-24, p 33).

রাধাবিনোদের মন্দির জয়দেবের বাসগৃহের ভিটের উপর তৈরি বলে জনশ্রুতি আছে। মন্দিরের গড়ন বাংলা দেশের নবরত্ন মন্দিরের মতন এবং মন্দিরের গায়ে পোড়ামাটির কারুকার্যের অপূর্ব নিদর্শন আছে। ১৯১৫ সাল থেকে মন্দিরটি ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক সংরক্ষিত। পোড়ামাটির নিদর্শনের মধ্যে বিষ্ণুর দশাবতার ছাড়া রাম-রাবণের যুদ্ধের কাহিনী-দৃশ্যই প্রধান। রামচন্দ্রের বানরসেনা ও রাবণের দানবসেনার মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধের ভয়ঙ্কর দৃশ্য মন্দিরগাত্রে শিল্পীরা ইটের উপর উৎকীর্ণ করেছেন। রাধাকৃষ্ণের কোন কাহিনীর কোন চিহ্ন নেই কোথাও মন্দিরের গায়ে, এইটাই আশ্চর্য। মন্দিরের গায়ে দশভুজা মহিষমর্দিনী ও অন্যান্য দেবদেবীর মূর্তিও খোদিত আছে। জয়দেব-কেঁদুলির অন্যতম দ্রষ্টব্য এই মন্দিরটি। বাংলা নবরত্ন-মন্দিরের মধ্যে রাধাবিনোদের মন্দির একটি প্রাচীনতম নিদর্শন হিসাবেও তার প্রত্নতাত্ত্বিক মূল্যও যথেষ্ট আছে।

চণ্ডীদাস-নান্নুর

১৩৪১ সনের অগ্রহায়ণ মাসে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কাছে নান্নুরের প্রতিনিধিরা চণ্ডীদাস-বিতর্কের মীমাংসার জন্য একবার গিয়েছিলেন। কথা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাঁদের বলেছিলেন: "তোমরা চণ্ডীদাকে নিয়ে যেরকম টানা-হেঁচড়া আরম্ভ করেছ, আমার মৃত্যুর পরেও লোকে সেই রকম টানাটানি করবে না কি? তার আগে শান্তিনিকেতনের প্রত্যেক ইঁটটাকে আমি সাক্ষী রেখে যাব যে আমি শান্তিনিকেতনের।" তাঁকে অনুরোধ করা হয়েছিল বোলপুর থেকে নান্নুর যাবার জন্য। দুর্গম পথের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন: "এক কবি তো বহুদিন গত হয়েছেন, তার জন্য আর এক কবিকে মারা কেন?"

টানা-হেঁচড়ার মধ্যে না যাওয়াই উচিত ছিল, কিন্তু এক্ষেত্রে না গিয়ে তো উপায় নেই। দুর্গম পথ হলেও বীরভূমের চণ্ডীদাস-নান্নুরে যেতে হল। অবশ্য পথের কষ্ট হয়নি, কারণ কীর্ণাহার ও নান্নুরের অধিবাসীরা আমার যাতায়াতের ও অনুসন্ধানের যাবতীয় সুব্যবস্থা করেছিলেন। নান্নুরের নাম এখন "চণ্ডীদাস-নান্নুর", সরকারী ডাকবিভাগও "চণ্ডীদাস-নান্নুর" নাম দিয়েছেন। নান্নুর যেতে যেতে মনে পড়ছিল চণ্ডীদাসের কথা—

নান্নুরের মাঠে গ্রামের নিকটে
বাসুলী আছ'য়ে যথা।
তাহার আদেশে কহে চণ্ডীদাস
সুখ যে পাইবে কোথা॥

এ চণ্ডীদাস তাহলে কোন্‌ 'চণ্ডীদাস'? স্বভাবতঃই এ প্রশ্ন সকলের মনে জাগবে, বিশেষ করে সাধারণ পাঠকদের মনে। যাঁরা ভাষাতত্ত্ববিদ্‌ বা সাহিত্যতত্ত্ববিদ্‌ নন, অথচ সাহিত্যের অনুরাগী তাঁরা বাংলাদেশে বহু চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আদৌ সচেতন নন। চণ্ডীদাস প্রসঙ্গে একথা বিশেষ স্মরণীয়। 'রবীন্দ্রনাথ' নামে আর কোন কবি যে বাংলাদেশে কবিতা লিখবেন না বা লেখেননি তা নয়। লিখবেন এবং লিখে তিনি খ্যাতিও অর্জন করবেন, কিন্তু তাঁর পর্বতপ্রমাণ খ্যাতি কোনদিন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে দ্বৈতসত্তায় পরিণত

করতে পারবে না। বাঙালীর মনে একজন 'রবীন্দ্রনাথ'ই সগৌরবে সমাসীন থাকবেন। তেমনি বাঙালীর মনে একজন চণ্ডীদাস-ই সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে আছেন —তিনি বড়ু, দ্বিজ, না দীন, তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাবে না কোনদিন। একটার-পর একটা আরও একাধিক পুঁথি যে ভবিষ্যতে পাওয়া যাবে না তা নয়। সেই সব পুঁথির ভাষায় তারতম্য থাকবে, ভণিতায় 'বড়ু', 'দ্বিজ', 'দীন' ছাড়াও আরও অনেক নতুন কথাও হয়ত থাকবে এবং কবি চণ্ডীদাস ক্রমেই হয়ত দু'জন তিনজন থেকে দ্বাদশচণ্ডীদাসে পরিণত হবেন। খণ্ডিত সতীদেহের একান্ন-বাহান্ন পীঠস্থানের মতন বিবিধ তত্ত্ববিদদের তর্কচক্রে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে হয়ত ভবিষ্যতে বাংলাদেশে 'চণ্ডীদাসের' একান্ন-বাহান্ন পীঠস্থান গজিয়ে উঠবে। এক-এক জেলার এক একজন পণ্ডিত প্রতিনিধি যুক্তির ঢাল-তলোয়ার নিয়ে চণ্ডীদাস-বিতর্কে অবতীর্ণ হবেন। ১৩০৫ সাল থেকে ১৩৪১ সালের মধ্যে যেভাবে 'চণ্ডীদাস' ত্রি-সত্তা প্রাপ্ত হয়েছেন, অর্থাৎ গড়পড়তা হিসাবে বারো বছরে একজন করে) তাতে মনে হয়, এই হারে চণ্ডীদাসের সংখ্যাবৃদ্ধি হতে থাকলে এই শতাব্দীর মধ্যেই চণ্ডীদাস দ্বাদশসত্তা লাভ করবেন। সুতরাং চণ্ডীদাসের সত্তা নিয়ে আমরা তর্ক করব না।

চণ্ডীদাস প্রসঙ্গে পরলোকগত দীনেশচন্দ্র সেনের একটি কথা আমার মনে পড়ে। দীনেশবাবু বলেছিলেন : "আমি ভাষা বিচার করিয়া কে খাঁটি চণ্ডীদাস কে দীন চণ্ডীদাস, কে বড়ু চণ্ডীদাস, কে দ্বিজ চণ্ডীদাস, কে বাশুলী-সেবক চণ্ডীদাস, কে তরুণীরমণ চণ্ডীদাস—এই চণ্ডীদাস-ব্যূহের সমস্যা ভেদ করিতে যাইব না ; আমার নিকট চণ্ডীদাস এক ভিন্ন দ্বিতীয় নাই (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ১৯৩ পৃঃ)।" ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছেও তাই চণ্ডীদাস এক ভিন্ন দ্বিতীয় নেই। অন্তত 'চণ্ডীদাস' নামোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার কাব্যাকাশে যে মূর্তিটি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, সে-চণ্ডীদাস এক ও অদ্বিতীয়। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বিচার করলে 'চণ্ডীদাস' নামে একাধিক কবি যে ছিলেন না তা বলা যায় না। হয়ত তিন বা ততোধিক 'চণ্ডীদাস' নামে কবি ছিলেন, বিশেষ করে চণ্ডীদাস যখন আসল নাম বা উপাধি নয়—বড়ু চণ্ডীদাস, দ্বিজ চণ্ডীদাস বা দীন চণ্ডীদাস যাই হোক না কেন—তখন থাকা তো খুবই স্বাভাবিক। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' রচয়িতা, বাশুলী-সেবক 'বড়ু চণ্ডীদাস' নামে একজন কবি ছিলেন এবং থাকলে [illegible] জেলার ছাতনাতেই যে ছিলেন একথা আগে বলেছি। কিন্তু

তবু 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' বা 'বড়ু চণ্ডীদাস' কেউই বাঙালীর অন্তরে বাসা বাঁধতে পারেনি। একথা ডাঃ সুকুমার সেনও দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন: "ত্রিশ বৎসর হইয়া গেল শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু আজিও শিক্ষিত বাঙালীর কথা দূরে থাক, যাঁহারা আধুনিক সাহিত্যরসিক এবং যাঁহারা বৈষ্ণবপদাবলীভক্ত তাঁদেরও দৃষ্টি কাব্যটির প্রতি আকৃষ্ট হয় নাই। কাব্যামোদী পদাবলীভক্ত বাঙালীর পক্ষে ইহা প্রশংসার কথা নয় (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ২০০)।" প্রশংসার কথা নয় ঠিকই, কিন্তু কেন পদাবলীভক্ত ও কাব্যামোদী বাঙালীর কাছে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' প্রিয় হয়ে ওঠেনি, সে-কথা বিচারসাপেক্ষ। হয়নি তার কারণ কৃষ্ণকীর্তনের চণ্ডীদাস আর পদাবলীর চণ্ডীদাসের ভাষা ও ভাবের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। শুধু কৃষ্ণকীর্তনের গ্রাম্যতাদোষ তার কারণ নয়, সে-দোষ জয়দেবের 'গীতগোবিন্দেরও' আছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও গীতগোবিন্দের লোকপ্রিয়তার পথ রুদ্ধ হয়ে যায়নি। তার কারণ অন্য এবং তা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কৃষ্ণকীর্তনের চণ্ডীদাস ও পদাবলীর চণ্ডীদাসের মধ্যে ভাবগত ও ভঙ্গিগত ব্যবধান বিরাট, তার মধ্যে কোন সেতুবন্ধই রচনা করা যায় না। বাঙালীর মন, বাঙালীর প্রাণ তাই কৃষ্ণকীর্তন কোনদিক দিয়েই জয় করতে পারেনি। দীন চণ্ডীদাস যিনি, কোথায় তাঁর ঘর বা বসতি তা আমরা কিছুই জানি না। আমরা জানি বড়ু চণ্ডীদাস ও দীন চণ্ডীদাস ছাড়াও এমন আরও একজন পদকর্তা ছিলেন যিনি শুধু চণ্ডীদাস বা দ্বিজ চণ্ডীদাস নামে পদ রচনা করতেন। শুধু তাই নয়। বড়ু চণ্ডীদাস যেমন ধারাবাহিক কৃষ্ণধামালী রচনা করেছেন, দীন চণ্ডীদাসও তেমনি একটি ধারাবাহিক কৃষ্ণগাথা রচনা করেছেন বলা চলে। কিন্তু আমাদের চণ্ডীদাস, অর্থাৎ দ্বিজ চণ্ডীদাস কোন ধারাবাহিক কৃষ্ণলীলার বই কিছু রচনা করেননি। তিনি রচনা করেছেন সুমধুর সুললিত গীতকাব্যের মালা, যা বসন্ত-নির্ঝরের উচ্ছ্বসিত ধারার মতন বাঙালীর মনপ্রাণ উদ্বেল করে তুলেছে। বাংলার গীতিকাব্যের লীলায়িত ধারার যিনি অন্যতম প্রবর্তক বাংলার অমর পদাবলীর স্রষ্টা সেই চণ্ডীদাস—দ্বিজ চণ্ডীদাসের কথা আমরা বলছি। এই চণ্ডীদাস বীরভূম জেলার নানুরেরই অধিবাসী ছিলেন বলে আমাদের মনে হয়। চণ্ডীদাস-নানুর তাঁরই লীলাক্ষেত্র।

কেন মনে হয় তাই বলছি। নামূলা জনশ্রুতিঃ, অর্থাৎ জনশ্রুতি মূলহীন

নয়! তা জেনেও জনশ্রুতির কথা এখানে উল্লেখ করব না। কীর্ণাহার, নান্নুর ও তার আশপাশে চণ্ডীদাস সম্পর্কে কাহিনী ও কিংবদন্তীর অন্ত নেই। চণ্ডীদাসের রজকিনী-প্রেম কাহিনী, চণ্ডীদাসের সাধন-ভজন কাহিনী, চণ্ডীদাসের মৃত্যু-কাহিনী ইত্যাদি অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে নান্নুরে ও কীর্ণাহারে। কাহিনীগুলি অন্যান্য স্থানের চণ্ডীদাস-কাহিনীর তুলনায় অনেক বেশি জীবন্ত মনে হয় নান্নুরে। মানুষের মন কল্পনার রঙে রাঙিয়ে দেবার জন্য আপনা থেকেই যেন কাহিনীগুলির বিকাশ হয়েছে নান্নুরের মাটিতে। কাহিনী সম্বন্ধে এর বেশি আর কিছু বলব না। অন্যান্য নিদর্শন সম্বন্ধে বলব। নিদর্শনগুলিকে প্রধানত তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—(১) প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক নিদর্শন; (২) ধর্মসাধনার ধারা; এবং (৩) সাহিত্যের ধারা। এই তিনদিক থেকে নান্নুরের বিচার করেছি আমি এবং বিচার করে মনে হয়েছে, বাংলার যিনি সর্বজনপ্রিয় গীতিকবি ও পদকর্তা চণ্ডীদাস, তিনি দ্বিজই হন, আর যাই হন, তিনি নান্নুরের চণ্ডীদাস।

চণ্ডীদাস-নান্নুরের যেখানে বাশুলি মন্দিরাদি আছে এবং যে স্থানটি কবি চণ্ডীদাসের ধর্মসাধনার স্মৃতিবিজড়িত, সেই স্থানটি দেখতে ঠিক একটি স্তূপের মতন। স্তূপটি খনন করা অনেক আগেই উচিত ছিল সরকারী প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাংলাদেশের একাধিক ঐতিহাসিক স্থানের অনুসন্ধান ও খননাদি সম্বন্ধে আমাদের কেন্দ্রীয় প্রত্নতত্ত্ববিভাগ বিশেষভাবে উদাসীন। মেদিনীপুরের তমলুক অঞ্চলই যাঁরা আজ পর্যন্ত অনুসন্ধান করার প্রয়োজনবোধ করলেন না, তাঁরা যে নান্নুরের স্তূপ খুঁড়ে দেখবেন তা কল্পনা করার কোন কারণ নেই। অবশেষে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে নান্নুরের স্তূপটির দু'একদিক সামান্য খোঁড়া হয়েছিল এবং তার একটি রিপোর্ট 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকায় (Excavations at Nanoor: By K. G. Goswami: Calcutta Review, *March* 1950) প্রকাশিত হয়েছিল। স্তূপটির বেড় হবে প্রায় ৫৫০ ফুট এবং উচ্চতা হবে প্রায় ১৭ ফুট। খুঁড়ে দেখা গেছে স্তূপটির নিচে পাঁচটি স্বতন্ত্র আবাস-স্তর (occupational levels) সমাধিস্থ হয়ে আছে এবং তার নিম্নতম স্তরটি গুপ্তযুগের। ইঁট, মৃৎপাত্র ছাড়া গুপ্তযুগের আরও যে উল্লেখযোগ্য নিদর্শন নান্নুর গ্রাম থেকে

পাওয়া গেছে, তা হল স্বর্ণমুদ্রা। শুনলাম, কিছুদিন আগে একটি ট্যাঙ্ক খুঁড়তে নান্নুরে একসঙ্গে একজায়গা থেকে প্রায় ছয় সাতটি স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া যায়। তার মধ্যে কয়েকটি স্থানান্তরিত হয়ে যায় এবং একটি এখনও গ্রামে আছে। মুদ্রাটি আমি দেখেছি। একদিকে যোদ্ধার মূর্তি, অন্যদিকে পদ্মাসনা কোন দেবীমূর্তি। গুপ্তযুগের মুদ্রা। ঠিক এইরকম দু'একটি স্বর্ণমুদ্রা মেদিনীপুরের তিল্দা গ্রাম থেকে সম্প্রতি পাওয়া গেছে। স্তূপের নিম্নতম স্তর, ইঁট, মৃৎপাত্র ও স্বর্ণমুদ্রার এই সব নিদর্শন থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, নান্নুর অঞ্চলে দেড়হাজার বছর আগেও এক সমৃদ্ধিশালী সভ্যতার বিকাশ হয়েছিল। গুপ্তবংশের কোন শাখাবংশ অথবা সামন্ত এই অঞ্চলে বাস করতেন। এইসব নিদর্শন সম্বন্ধে আরও অনুসন্ধান করলে হয়ত গুপ্ত রাজবংশের উৎপত্তি ও বিস্তার সম্বন্ধে অনেক কুয়াশাচ্ছন্ন ধারণা পরিষ্কার হতে পারে। গুপ্তরা যে-ভাগবতধর্মী ছিলেন তা বিষ্ণু (বৈদিক ব্রাহ্মণ), নারায়ণ (পাঞ্চরাত্র) কৃষ্ণ-বাসুদেব ও গোপালের সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছিল এবং পরে এই বৈষ্ণব ধর্মেরই বিকাশ ও প্রতিষ্ঠা হয়েছিল পালযুগে। শশাঙ্ক ছিলেন শৈবধর্মী এবং বৌদ্ধবিদ্বেষ সম্বন্ধে তাঁর বিরুদ্ধে যত অপবাদই থাক, তিনি যে বৌদ্ধদের উচ্ছেদ করেননি তার যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণসুবর্ণও বীরভূমের এই অঞ্চল থেকে খুব বেশি দূরে নয়। কামরূপের ভাস্করবর্মণ এই সময় এই অঞ্চলে এসে তান্ত্রিক ধর্মের প্রতিষ্ঠা না করুন, প্রেরণা যুগিয়েছিলেন নিশ্চয়। গুপ্তযুগ ও তার আগে থেকেই বৌদ্ধদের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল বাংলাদেশে। পালযুগে মহাযান বৌদ্ধধর্মের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায় এবং বজ্রযান, তন্ত্রযান ইত্যাদির বিকাশ হয়। পালযুগের সামন্তরা কেউ কেউ যে বীরভূমে এই সব অঞ্চলে থাকতেন তার আভাস সন্ধ্যাকরনন্দীর 'রামচরিত' কাব্য থেকে পাওয়া যায়। চণ্ডীদাসের ইতিহাস খুব বেশি হলে ৫০০ বছরের বেশি নয় এবং হিন্দু ও মুসলমান যুগের সন্ধিক্ষণের ইতিহাস বলা চলে। তার আগেই রাজা লক্ষ্মণসেনের সভায় কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দ গীত হয়েছে। তারও আগে তন্ত্রযানী ও বজ্রযানী বৌদ্ধদের আচার-ব্যবহারে নানারকম বিকৃতির পরিচয় পাওয়া গেছে। কিন্তু তা পাওয়া গেলেও সেন-আমলে সাধারণ জনসমাজে তার প্রতিপত্তি বিশেষ কমেনি। এইরকম কোন ঐতিহাসিক পটভূমিকায় চণ্ডীদাসের মতন একজন তান্ত্রিক দেবীর পূজারী, সহজিয়া সাধক-কবির আবির্ভাব হবে এবং তিনি মানবপ্রেমের

গান শোনাবেন তাতে বিস্ময়ের কোন কারণ নেই। বাংলার ঐতিহাসিক যুগসন্ধিক্ষণে এইরকম একজন সাধক-কবি, চারণ-কবি চণ্ডীদাসই হয়ত শ্রীচৈতন্যের পথ-প্রদর্শক ছিলেন এবং শ্রীচৈতন্য সেইজন্যই হয়ত তাঁর পদাবলীর আবৃত্তি শুনতে ভালোবাসতেন। এই চণ্ডীদাস, যিনি তন্ত্রযানী সহজসাধক হয়েও প্রেমের সুরে বাংলার জাগরণের গান গেয়েছেন, তিনি বীরভূমের চণ্ডীদাস-নান্নুরের অধিবাসী হওয়াই সম্ভব।

ধর্মসাধনার ধারা ও সাহিত্যের ধারার দিক থেকেও তাই মনে হয়। চৈতন্যপূর্ব যুগেই সহজিয়া ধর্মের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। চণ্ডীদাস তন্ত্রযানী সহজ-সাধক ছিলেন এবং বাঁশুলির পূজক ছিলেন। বাঁশুলি তন্ত্রসম্মতা মহাবিদ্যা। নান্নুরে যে মূর্তি বাঁশুলি বলে পূজিত হয় তা 'বাগীশ্বরী' মূর্তি। কিন্তু তাতে চণ্ডীদাসের ধর্ম অপ্রমাণিত হয় না এবং তার জন্য বাগীশ্বরী-বাইসরী-বাসরী-বসলী করার কোন দরকার নেই। বিশালাক্ষী থেকেই বাঁশুলি' হয়েছে বলে মনে হয়। কিন্তু বাগীশ্বরী ও সরস্বতীও তন্ত্রসম্মতা মহাবিদ্যা। সরস্বতীকে পুষ্পাঞ্জলি দেবার সময় আমরা যে—ওঁ ভদ্রকাল্যৈ নমো নিত্যং—বলি, সেই ভদ্রকালী কে? কালী, ভদ্রকালী ও চণ্ডীর ছড়াছড়ি বীরভূমে। কীর্ণাহার থেকে নান্নুরের মধ্যে অসংখ্য কালী, ভদ্রকালী আছে। নান্নুর যে বৌদ্ধতান্ত্রিক বিশেষ করে সহজধর্মীদের একটা কেন্দ্র ছিল তাতে সন্দেহ নেই। চণ্ডীদাসের সাধনার আশ্রয় এখানে থাকা খুবই স্বাভাবিক। চণ্ডীদাস বিশালাক্ষী ও বাগীশ্বরী দুয়েরই পূজক হতে পারেন। রজকিনী-প্রেমের কাহিনীও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। বজ্রযানী বৌদ্ধদের পঞ্চকুলের নাম—বজ্র, পদ্ম, কর্ম, তথাগত ও রত্ন। এই পঞ্চকুলের অন্য নামও আছে:

ব জ্র—ডো ম্বি
প দ্ম—ন টী
ক র্ম=র জ কী
ত থা গত=ব্রা হ্ম ণী
র ত্ন=চ ণ্ডা লী

চণ্ডীদাসের বহু-প্রচলিত রজকিনী-প্রেম কাহিনীর মধ্যে বজ্রযানীদের এই পঞ্চ-কুলের একটি কুল ও বিশেষ সাধনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। মনে হয়, কবির

জীবনের কোন প্রেমকাহিনী পরে তাঁর বিশেষ কুলসাধনার প্রতীকের সঙ্গে মিশে গিয়ে জনশ্রুতির বর্ণচ্ছটায় রঙিন হয়ে উঠেছে।

সাহিত্যের ধারার দিক থেকেও মনে হয় যেন পদাবলীর চণ্ডীদাস বীরভূমের নান্নুরেই আত্মপ্রকাশ করতে পারেন। উত্তরপশ্চিম রাঢ় থেকে উত্তর-পূর্ব রাঢ়ের দিকেই যেন গীতিকাব্যে ঝর্নাধারার স্বাভাবিক গতি দেখা যায়। বর্ধমান ও বীরভূমের এই অঞ্চল ঘেঁষেই খ্যাতনামা পদকর্তাদের বিকাশ হয়েছে যখন দেখি, গীতগোবিন্দ রচয়িতার কেন্দুবিল্ব থেকে নান্নুর এবং নান্নুর থেকে কেন্দুবিল্ব পর্যন্ত যখন পায়ে হেঁটে শত শত ভক্তযাত্রী আজও যাতায়াত করছেন দেখতে পাই, তখন মনে হয়, পদাবলীর দ্বিজ চণ্ডীদাস বীরভূমের নান্নুরে যেন স্বাভাবিক ধারায় আত্মপ্রকাশ করেছেন। জয়দেব-কেঁদুলি থেকে উত্তরে বীরভূমে ও দক্ষিণে বর্ধমানে যেন বাংলার গীতিকাব্যের মন্দাকিনীধারা বয়ে গেছে। আরও আশ্চর্য মনে হয় যখন দেখি, উত্তরে চণ্ডীদাস-নান্নুর ও দক্ষিণে জয়দেব-কেঁদুলি থেকে দুই গীতিকাব্যের ধারা এসে মধ্যে বোলপুর-শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রকাব্যের ধারায় নতুন রূপ নিয়ে মিলিত হয়েছে।

পাইকোড়

স্বাধীন ও সমৃদ্ধ বাংলার রাষ্ট্রিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের ভাঙা-গড়ার বিচিত্র সব চিহ্ন রয়েছে পাইকোড় গ্রামে। রামপুরহাট-নলহাটি-মুরারই ; অনতিদূরে বীরভূম জেলার—তথা পশ্চিমবাংলার সীমান্ত। বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলা এখানে এসে মিশেছে সাঁওতাল পরগণার সঙ্গে। বাংলার রাষ্ট্রিক জীবনের অনেক উত্থান-পতন, ঘাত-প্রতিঘাত হয়েছে এইখানে, রাঢ়দেশের এই উত্তর প্রান্তে। বিবিধ সংস্কৃতি-স্রোত নানাদিক থেকে বয়ে এসে ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি করেছে। অনেক চিহ্ন আজ তার নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। সামান্য যা আছে তাও বিক্ষিপ্ত। তার মধ্যে শুধু পাইকোড় গ্রামেই যা আছে তা পর্যাপ্ত বলা চলে।

অন্ধকার শ্রীপঞ্চমীর রাত। গরুর গাড়িতে করে মুরারই স্টেশন থেকে পাইকোড় চলেছি। কাছেই ভাদীশ্বর গ্রাম। গ্রামবাসী একজন বললেন: "এই গাছতলায় আছে বিশাল হরগৌরী মূর্তি।" গাড়ি থেকে টর্চ ফেলতেই মূর্তিটি চোখে পড়ল। পাশেই গ্রাম্য মন্দিরে সপ্তফণাবিশিষ্ট মনসামূর্তি। লীলাসন ভঙ্গিতে দুই পদ্মের উপর উপবিষ্ট মনসার শুধু মাথায় নয়, হাতেও সাপ, বুকেও সাপ, ঘটেও সাপ, পাশে নাগিনী। গ্রামের উত্তর প্রান্তে ষষ্ঠীতলায় একটি ভগ্নস্তূপ আছে, 'এক-যে-ছিল-রাজার' প্রাসাদ-স্তূপ। স্তূপের চারিদিকে বড় বড় টালির মতন ইট ছড়ানো। প্রায় সাড়ে এগারো ইঞ্চি লম্বা ও সাড়ে নয় ইঞ্চি চওড়া ইট। স্তূপের অবশেষ দেখে মনে হয় দশম-একাদশ শতাব্দীর কোন স্মৃতিচিহ্ন। প্রত্নতত্ত্ববিভাগ কর্তৃক রক্ষিত।

মধ্যে গোপালপুর গ্রামে রাতে অবস্থান করে ষষ্ঠীর দিন সকালে পাইকোড় পৌঁছলাম। এই বিশেষ দিনটাতে যে কোন উপায়ে পাইকোড় পৌঁছানোর একটা উদ্দেশ্য ছিল! শ্রীপঞ্চমীর সময় পাইকোড়ে বহু কালের প্রাচীন একটি উৎসব অনুষ্ঠিত হয় শুনেছিলাম। উৎসবটির বিশেষত্ব আছে, তাই স্বচক্ষে দেখার ইচ্ছা ছিল। 'বাণব্রতের' উৎসব। জানি না বাংলাদেশের আর কোথাও এই উৎসব হয় কি না। পরে নলহাটি-আজিমগঞ্জ লাইনে লোহাপুরের পাশে প্রসিদ্ধ বারা গ্রামে যখন গিয়েছিলাম, তখন সেখানেও এই উৎসবের কথা শুনেছিলাম। তাতে মনে হয়, শুধু পাইকোড়ে নয়, বীরভূম-

মুর্শিদাবাদ-সাঁওতাল পরগণার এই মিলনক্ষেত্রের কয়েকটি অঞ্চলে এখনও উৎসবটি পালন করা হয় এবং হয়ত এককালে আরও বেশি হত। উৎসবের উৎসটি আজ বিচিত্র সব অনুষ্ঠানের অরণ্যে হারিয়ে গেছে মনে হয়।

প্রায় বছর পঁয়ত্রিশ আগে শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় পাইকোড়ের শ্রীহৃষীকেশ পাণ্ডা ও শ্রীকুলেশ পাণ্ডার কাছ থেকে এই বাণব্রতের 'পাঁচালী' ও বিবরণ সংগ্রহ করেছিলেন।* কিন্তু বাণব্রতের অনেক ছড়া ও মন্ত্র, অনেক আচার-অনুষ্ঠান তাঁর কাছেও দুর্বোধ্য মনে হয়েছিল। যে কোন দর্শকের কাছেই তাই মনে হওয়া স্বাভাবিক। উৎসবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই :

উৎসব হয় শ্রীপঞ্চমীতে সরস্বতী পূজার সময়, কিন্তু উৎসব উপলক্ষে সমারোহে পূজা হয় গ্রামের বুড়ো শিবের ও ক্ষ্যাপা কালীর। প্রধান হোতা দেয়াসী ও বালাভক্ত। জাতিবর্ণনির্বিশেষে আরও অনেকে ভক্ত হন। চতুর্থীর দিন শ্মশানে গিয়ে একটি নরমুণ্ডের কঙ্কাল কুড়িয়ে এনে তাতে তেল-সিঁদুর লেপন করা হয় এবং পরে একজন ভক্ত সেই নরমুণ্ড এক হাতে, আর একটি বেল অন্য হাতে নিয়ে কয়েকজন ভক্তসহ নৃত্য করতে থাকেন। শ্রীপঞ্চমীর দিন শিবের অভিষেক হয়। ভক্তরা নদীতে স্নান করতে যাবার সময় শিব-মন্দিরের আঙিনায় দাঁড়ান এবং পাণ্ডা মন্দিরের পৈঁঠায় দাঁড়িয়ে বেত ঘুরিয়ে মন্ত্রপাঠ করান। তারপর 'দণ্ডবতী' পাঠ করে ভক্তরা চলে যান। নদীর ঘাটে পাণ্ডা 'ঘাট-শুদ্ধি' মন্ত্র পাঠ করান। ষষ্ঠীর দিন গদাধর শিবকে নদী থেকে তোলা হয়। পরে বাণফোঁড়া হয় এবং দেয়াসী কলার ভেলার সঙ্গে গাঁথা তিনটি খাঁড়ার উপর চড়ে ভক্তদের স্কন্ধে অনেকটা পথ প্রদক্ষিণ করে ক্ষ্যাপাকালীর প্রাঙ্গণে আসেন। সেখানে 'পাঁচালী' পাঠ হয় এবং ভক্তরা পরে পাণ্ডার বাড়ি এসে কোন স্ত্রীলোকের কাছে ষষ্ঠীর কথা শোনেন। কয়েকটি ছড়া ও মন্ত্র আংশিক উদ্ধৃত করছি :

(দণ্ডবতী)

আদি বন্দ অনাদি বন্দ
মূল ধর্মের পাট।
ত্রিশ কোটি দেবতা বন্দ
বৃদ্ধ মা বাপ ॥

* 'বীরভূম বিবরণ' ২য় খণ্ড দ্রষ্টব্য।

ডাইনে দামোদর বন্দ
বামে হনুমান।
শিরে তুলি বন্দি
গোসাঞী জাজল্যমান।
আকাশে চণ্ডিকা বন্দ
পাতালে বাসুকীনাথ।
আপন আপন গুরুর চরণে
দ্বাদশ প্রণাম॥
(পাঁচালী)
দুয়ার ঘুচাও গোসাঞী হুড়ুক ধুরুকে।
গোসাঞী দেখি আমি শমন তুরুকে॥
শমন তুরুকে মার ঘোর তালি,
পূজ দেবতা মার তালি,
শঙ্কর পূজে দাও করতালি।
—ইত্যাদি

এই সব মন্ত্র, ছড়া ও পাঁচালীর মধ্যে এমন অনেক শব্দ (হুড়ুক, ধুরুক, তুরুক ইত্যাদি) ও দেবদেবীর নাম (ধর্ম, গোসাঞী, হনুমান, চণ্ডিকা ইত্যাদি) আছে যার সঙ্গে 'বাণব্রতের' উৎসবের কোন সম্পর্ক নেই। বুড়ো শিব ও ক্ষ্যাপা কালীর পূজার সঙ্গেও তার কোন যোগসূত্র আছে বলে মনে হয় না। এমন কি পাণ্ডারাও অনেক কথার, অনেক অনুষ্ঠানের, মন্ত্রের ও ছড়ার অর্থ বা তাৎপর্য কি বলতে পারেন না। তাঁরা কেবল "বহুকাল থেকে চলে আসার" কথা বলেন। কিন্তু এই সব শব্দ ও দেবদেবীর নাম বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। আমার মনে হয়, পাইকোড়ের 'বাণব্রত' অনুষ্ঠানের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে সাঁওতালী উৎসবের অনুষ্ঠানাদি ওতপ্রোতভাবে মিশে রয়েছে। দণ্ডবতী মন্ত্র ও পাঁচালীর কোন কোন অংশ পাঠ করলে সাঁওতালদের 'বোঙ্গা-বন্দনা' ও সাঁওতালী ওঝাদের ঝাড়ন-মন্ত্রাদির কথা বিশেষভাবে মনে হয়। সন্দেহ হয়, অনেক সাঁওতালী শব্দ পর্যন্ত বাণব্রতের মন্ত্র ইত্যাদির মধ্যে আত্মগোপন করে রয়েছে। ধর্ম, গোসাঞী, হনুমান, চণ্ডী ইত্যাদি বিখ্যাত সাঁওতালী বোঙ্গা (দেবতা)। হুড়ুক, ধুরুক ইত্যাদি শব্দও যেন সাঁওতালী শব্দের প্রতিধ্বনি।

সাঁওতালী উৎসবের সঙ্গে তান্ত্রিক ও শৈব উৎসবের ধারাও মিলিত হয়েছে। জাগ্রত ক্ষ্যাপা কালী, নরমুণ্ডসহ নৃত্য, শিবের গাজন ইত্যাদি তার নিদর্শন। পাওার—'বল মন হরিবোল, হরি বল ভক্ত ভাই, নেচে-গেয়ে ঘর যাই'—মন্ত্রের মধ্যেও হিন্দু-বৈষ্ণব ধারার ছাপ স্পষ্ট। ষষ্ঠীর ব্রতকথাও বিচিত্র দৃষ্টান্ত। মনে হয় রাঢ়ের সীমান্তে একাধিক সংস্কৃতিধারার মিলন-মিশ্রণ হয়েছে পাইকোড়ের বাণব্রত উৎসবে এবং তার মূল অতীতে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত।

পাইকোড়ের উৎসব-অনুষ্ঠানই শুধু প্রাচীনতার সাক্ষী নয়, অন্যান্য প্রত্নতাত্ত্বিক মূল্যবান নিদর্শনও তার সাক্ষী। তার মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় দু'টি শিলালিপির কথা—একটি কলচুরীরাজ কর্ণদেবের, আর একটি বিজয়সেনের। দু'টি শিলাস্তম্ভের উপরেই কোন দেবদেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল বলে মনে হয়। বিজয়সেনের শিলাস্তম্ভের উপরের মুণ্ডহীন মূর্তিটি যে যে মনসা মূর্তি (ভাদীশ্বরের মনসা মূর্তির মতন) তা পরিষ্কার বোঝা যায়। কর্ণদেবের শিলাস্তম্ভের উপরের মূর্তিটি ভেঙে গেছে, বোধ হয় পাশের ভগ্নমূর্তির স্তূপের মধ্যে পড়ে আছে। কর্ণদেবের শিলাস্তম্ভের গায়ে খোদাই করা কারুকার্য (মঙ্গলকলস, পদ্ম, কীর্তিমুখ) এত সুন্দর যে, কোন সুদক্ষ ভাস্করের কীর্তি বলে মনে হয়। শিল্পী যে কর্ণদেবের চেদীরাজ্যের নন, এই বাংলাদেশের, তাতেও কোন সন্দেহ নেই, কারণ রাজমহল পাহাড়ের কালো আগ্নেয়-পাথরের (Basalt Stone) উপর এই ধরনের কারুকাজ বাঙালী শিল্পী ছাড়া ভিন্নদেশী শিল্পীর পক্ষে করা সম্ভব নয়। প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগের রিপোর্টেও এই কথা বলা হয়েছে :

> The carving of this pillar has been done so beautifully as to entitle the sculptor to a high rank. It is very probable that the artist belonged to Bengal, rather than to the Chedi country, firstly because the polish and finish of the black basalt stone from the Rajmahal hills used in the sculpture indicates a thorough mastery over the material, which cannot be acquired without the efforts of generations ; and secondly, the inscription engraved on the pillar is not in Central Indian script, but in the

Proto-Bengali characters prevalent in N.-E. India, (Archaeological Survey of India—Annual Report, 1921-22, P. 79).

কলচুরীরাজ কর্ণদেবের শিলালিপিতে ছয়টি লাইন আছে। খোদাইয়ের ভঙ্গি দেখে মনে হয়, যত্নে খোদাই করা নয়, ব্যস্তভাবে খোদাই করা। অক্ষর গুলিও দশম-একাদশ শতাব্দীর উত্তর-পূর্ব ভারতে প্রচলিত আদি-বঙ্গাক্ষর। পাঠোদ্ধার করা খুব কঠিন। 'বীরভূম বিবরণে' (২য় খণ্ডে) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের পাঠ লিপিবদ্ধ আছে। ডাঃ স্পুনার (পূর্বোক্ত রিপোর্ট, ১৯২১-২২, ৮০ পৃষ্ঠা) এইভাবে পাঠোদ্ধার করেছেন—

১ম। শ্রীশ্রীগণপতি

২য়। — — — —

৩য়। ওঁ দেব-দ্বিজ-গুরু (ভক্তঃ) স্তরি···দয় ভক্তিনাস্ত

৪র্থ। নেহয়ন— — (শ্রদ্ধ) য়া-স্মিন্ কর্মণি রাজশ্রী কর্ণদেব

৫ম। ওঁ স্বস্তি সমৃদ্ধ রাজ্য-শ্রী-চেদী র (আজ্য) শ্রী-কর্ণদেব (স্য) জ্য নস্তর কীর্তি প্রশস্তি (?)

৬ষ্ঠ। শ্রীবিশ্বকর্মা চরণ-প্রসাদাৎ দেবীমূর্তি নৃমিত— —পতিয় শ্রীকার্তি— —

ভাবার্থ হল: কলচুরীরাজ কর্ণদেবের আদেশে কোন ভাস্কর কোন দেবীমূর্তি নির্মাণ করছেন। অন্য শিলালিপিটিতে আছে— "রাজেন্দ্র শ্রীবিজয়সেন।"

পাইকোড়ে কলচুরীরাজ কর্ণদেবের এই শিলালিপি থেকে বাংলার ইতিহাসের এক যুগসন্ধিক্ষণ আলোকিত হয়ে ওঠে। বাংলার গৌরবময় পালযুগের অবসানকালের ইতিহাস। একাদশ শতাব্দীতে বাংলার বাইরে থেকে উপর্যুপরি অভিযান চলতে থাকে বাংলার উপর এবং এই অভিযান প্রতিরোধ করতে পালসাম্রাজ্যের শক্তিও ক্ষয় হতে থাকে। মহীপালের রাজত্বকালে কলচুরীরাজ গাঙ্গেয়দেব অভিযান করেন (আঃ ১০২৬ খৃঃ অঃ)। মহীপালের পর তাঁর পুত্র নয়পাল প্রায় পনের বৎসর রাজত্ব করেন (আঃ ১০৩৮-১০৫৫ খৃঃ অঃ)। এই সময় গাঙ্গেয়দেবনন্দন কর্ণদেব বা লক্ষ্মীকর্ণ পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। কিন্তু কর্ণদেব প্রথমে মগধ পর্যন্ত অভিযান করেছিলেন এবং যুদ্ধে প্রথমে পরাজিত হয়ে তিনি বহু বৌদ্ধ বিহার ও মঠ ধ্বংস

করেছিলেন। মগধে তখন ছিলেন দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান (অতীশ)। তিব্বতী কাহিনীতে বলা হয়েছে যে, এই সময় নাকি প্রধানত দীপঙ্করের মধ্যস্থতাতেই যুদ্ধবিরতি ঘটে, এবং কলচুরীরাজ ও পালরাজাদের সঙ্গে সন্ধি-চুক্তি হয়। তার কিছুদিন পরে দীপঙ্কর এদেশ ছেড়ে তিব্বতে চলে যান (৫৯ বছর বয়সে) এবং তিব্বতেই মারা যান (৭৩ বছর বয়সে)। আনুমানিক ১০৪২ খৃঃ অব্দে দীপঙ্কর তিব্বতে যাত্রা করেন মনে হয়। এদিকে সন্ধিচুক্তি হলেও, কলচুরীরাজ অভিযানের লোভ সংবরণ করতে পারেননি বেশিদিন। নয়পালের পুত্র তৃতীয় বিগ্রহপালের রাজত্বকালে (আঃ ১০৫৫-১০৭০ খৃঃ অঃ) কর্ণদেব মগধ ছাড়িয়ে গৌড় ও বঙ্গদেশে অভিযান করেন। কলচুরী রেকর্ড থেকে জানা যায় যে, কর্ণের দাপটে বঙ্গের রাজারা নাকি ভয়ে কাঁপতেন (পূর্ববঙ্গের 'চন্দ্র' অথবা 'বর্মণ' রাজারা) এবং গৌড়ের রাজা করজোড়ে থাকতেন। এই দ্বিতীয় অভিযানের সময় কর্ণদেব যে মগধদেশ অতিক্রম করে পশ্চিমবঙ্গের উত্তর সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন, বীরভূমের পাইকোড় শিলালিপিটি তার ঐতিহাসিক সাক্ষীস্বরূপ আজও পুকুরপাড়ে নারায়ণচত্বরে অবহেলিত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। শিলালিপিটি যে অবহেলার বস্তু নয়, তা বলা বাহুল্য। দ্বিতীয় অভিযানেও যে কর্ণদেব পালরাজাদের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন, সন্ধ্যাকর-নন্দীর 'রামচরিত' কাব্য থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। মনে হয়, দ্বিতীয় বারেও তিনি সন্ধি করতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং সন্ধির পর তাঁর কন্যা যৌবনশ্রীর সঙ্গে তৃতীয় বিগ্রহপালের বিবাহ হয়েছিল। 'রামচরিত' কাব্যে আছে:

সহসাবিতরণজিতকর্ণঃ ক্ষোণীং যৌবনশ্রিয়োদূহে।
অশ্রান্তদানবারাতিশয়ো যোভূদবৃষানুচরঃ।
(১।৯)

অনুবাদ: "যিনি স্বপরাক্রমে (ডাহলাধিপতি) কর্ণ নামক রাজাকে রণে পরাজিত করিয়াও রক্ষা করিয়াছিলেন, যাঁহার নানাপ্রকার (ভূম্যাদি) দান অবিচ্ছিন্ন থাকিত এবং যিনি ধর্মানুগত ছিলেন, সেই (বিগ্রহপাল) যৌবনশ্রী নাম্নী (কর্ণ-দুহিতার) সহিত পৃথিবী পালন করিয়াছিলেন। [অথবা যৌবনশ্রী সহ পৃথিবীরূপিণী দ্বিতীয় পত্নীকে স্বীকার করিয়াছিলেন]"।—ডাঃ রাধাগোবিন্দ বসাক: 'রামচরিত', ৭ পৃষ্ঠা।

মনে হয়, কর্ণদেব কিছুদিন রাঢ়দেশের এই অঞ্চল দখল করেছিলেন, সন্ধিশর্তেই হোক বা বলপ্রয়োগেই হোক এবং সেই সময় দেবদেবীও কিছু প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পাইকোড়ের শিলালিপিতে তারই পরিচয় পাওয়া যায়। পালরাজাদের এই পতনের সময় রাঢ়ে একাধিক সামন্ত স্বাধীনভাবে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠেন। তাঁদের মধ্যে ঢেকরীর (বর্ধমান জেলায়) ঈশ্বর ঘোষ অন্যতম। কলচুরীরাজের এই অভিযানের পরে কর্ণাটের চালুক্যরা বাংলাদেশ আক্রমণ করেন এবং চালুক্য অভিযানের সময় কর্ণাট-ক্ষত্রিয় সেনবংশের প্রতিষ্ঠা হয় বাংলাদেশে। পালরাজাদের পর এই সেনবংশই বাংলার রাজা হন এবং তাঁদেরই পূর্বপুরুষ বিজয়সেনের শিলালিপিও পাইকোড়ে আছে।

শিলালিপি ছাড়াও পাইকোড়ে পাল-যুগের বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ভাস্কর্যের নিদর্শন প্রচুর পরিমাণে ছড়িয়ে আছে।

পাইকোড়ের বুড়ো শিবের মন্দিরটিকে একটি ছোটখাট মিউজিয়ম বলা যায়। এত বিচিত্র মূর্তির একত্র সমাবেশ একটি গ্রাম্য দেবমন্দিরে আর কোথাও দেখিনি। মনসা, বিষ্ণু, গণেশ, সূর্য ও নানারকমের তান্ত্রিক দেবীমূর্তি তার মধ্যে আছে। খুব ছোট তিন-চার ইঞ্চি মূর্তি থেকে তিন-চার ফুট পর্যন্ত বড় বড় মূর্তি। বুড়ো শিবের মন্দির ছাড়া নারায়ণচত্বরে উন্মুক্ত দেবীর উপর গাছতলায় প্রচুর ভাঙা মূর্তি আছে, তার মধ্যে মুণ্ডভাঙা নৃসিংহ মূর্তি ও কতকগুলি দেবীমূর্তি উল্লেখযোগ্য। গ্রামের প্রান্তে জয়দুর্গা আছেন, চমৎকার মহিষমর্দিনী মূর্তি। মূর্তিগুলি দেখে মনে হয়, অধিকাংশই পাল-যুগের—একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর। মূর্তির সমাবেশ থেকে কোন বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ের আধিপত্য সম্বন্ধে স্পষ্ট কিছু বোঝা যায় না। তবু মনে হয়, পালযুগের অন্যতম সমৃদ্ধিশালী সভ্যতার কেন্দ্র ছিল পাইকোড় এবং বৌদ্ধ তন্ত্রযানী ও হিন্দু তান্ত্রিকদের বেশ প্রাধান্য ছিল সেখানে। ব্রাহ্মণ্যধর্ম, বৈষ্ণবধর্ম ও শৈবধর্মেরও প্রতিপত্তি কম ছিল না। পালরাজারা নিজেরা বৌদ্ধ হলেও কোন বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতি যে বিদ্বেষপরায়ণ ছিলেন না, তার প্রমাণ পাইকোড়ে এখনও যেরকম পাওয়া যায় তা সত্যই বিস্ময়কর।

নলহাটি ও ভদ্রপুর

পীঠমালা মহাতন্ত্রে বলা হয়েছে—"নলাহট্টাং নলাপাতো যোগেশো নাম ভৈরবঃ। কালিকা দেবতা তত্র, তত্র সিদ্ধির্ন সংশয়ঃ।" তন্ত্রপীঠ ও সিদ্ধপীঠের প্রাধান্য বীরভূমের এই অঞ্চলে খুব বেশি। এদিকে সাঁইথিয়া লাভপুর, ওদিকে নলহাটি ও তারাপীঠ। তান্ত্রিক ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতিপত্তি যেখানে এত বেশি, সেখানে পরবর্তীকালে পীঠস্থানের ঐতিহাসিক বিকাশও খুব স্বাভাবিক। পীঠস্থানগুলি কেন্দ্র করে, অনেক রোমাঞ্চকর কিংবদন্তীর সৃষ্টি হয়েছে। পৌরাণিক অতিকথায় তাদের প্রকৃত ইতিহাস আজ রহস্যাবৃত। কিন্তু তাহলেও, রহস্যের অন্তরালে দৃষ্টি প্রসারিত করলে বাংলার পালযুগের কথাই মনে পড়ে পীঠস্থান প্রসঙ্গে।

পাইকোড়-মুরারই ঘুরে, উত্তর থেকে দক্ষিণে নলহাটি পৌঁছলাম এবং নলহাটি থেকে পূর্বে ভদ্রপুরে (নলহাটি-আজিমগঞ্জ রেলপথে)। স্টেশনের পশ্চিমে নলহাটি গ্রাম। গ্রামের পশ্চিমে একটি ছোট টিলা, টিলার উপরে নলহাটির পার্বতী মন্দির। কেউ বলেন, সতীর দেহাংশ নলা (নলো, কনুইয়ের নিম্নভাগ) এখানে পড়েছিল বলে নলহাটিতে দেবী কালিকা ও ভৈরব যোগেশ বিরাজ করেন। কেউ বলেন, দেবীর ললাট পড়েছিল বলে দেবীর নাম ললাটেশ্বরী। নলহাট্টেশ্বরী থেকে ললাটেশ্বরী বা তার বিপরীত কিছু যাই হোক হয়েছে, কারণ তন্ত্রে নলাপাতের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। পাহাড়ে অধিষ্ঠিতা বলে দেবী পার্বতী নামেও পরিচিতা। টিলার উপরেই দেবীর মন্দির হঠাৎ দেখলে মনে হয় যেন টিলারই বক্ষভেদ করে উঠে দাঁড়িয়েছে। সাধারণ চারতলা বাংলা মন্দিরের গড়ন। মধ্যে কোন দেবীমূর্তি নেই কিছু, পাষাণ-খণ্ডের মাধ্যমেই দেবীর পূজা হয়। দেবীমন্দিরের অনতিদূরে একটি মসজিদ ও সমাধি। পার্বতী ও পীর যেন পাশাপাশি বিরাজ করছেন নলহাটিতে। রামপুরহাট মহকুমায় ঘুরে হিন্দু-মুসলমানের বিদ্বেষ-বর্জিত যে পারস্পরিক প্রীতির বন্ধন দেখেছি, মনে হয় যেন নলহাটির পার্বতী ও পীর সেই একই বন্ধনে বাঁধা। ইতিহাসের কোন্ পর্বে ঠিক কোন্ সময় এই বন্ধন হয়েছিল আজ আর তা কেউ বলতে পারেন না, জানেনও না, জানার তেমন আগ্রহও নেই।

বাংলার এই পশ্চিম সীমান্তে, বীরভূমের এই সব অঞ্চলে বখ্‌তিয়ারের অভিযানের পর থেকেই মুসলমানদের আনাগোনা হয়েছে। রামপুরহাট মহকুমার এমন অনেক গ্রামে গেছি যেখানে এখনও মুসলমানরাই প্রধান। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট মুসলমান। গ্রামের উৎসব-পার্বণে তাঁরা হিন্দুর মতন যোগদান করেন। কথাবার্তা বলে দেখেছি, গ্রাম্য হিন্দু দেবদেবীর মন্দির ও মূর্তির মধ্যে কোন্‌গুলি উল্লেখযোগ্য ও দ্রষ্টব্য তা তাঁরা অনর্গল বলে যেতে পারেন। পুকুর কাটতে মূর্তি পাওয়া গেছে—বিষ্ণুমূর্তি, গণেশমূর্তি, সূর্যমূর্তি, বুদ্ধমূর্তি, শক্তিমূর্তি—সাধারণ মুসলমান চাষীরা সেগুলি সযত্নে ঘরে তুলে রেখেছে। কেউ কেউ অভাবের তাড়নায় হয়ত কিউরিও-ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রীও করেছে, কিন্তু সকলে তা করেনি। নিজের গ্রামের মূল্যবান ঐতিহাসিক নিদর্শন, হিন্দু ও মুসলমান আমলের, সকলেই রক্ষা করতে চেয়েছে। সম্প্রদায়-ভেদে এই বোধশক্তির কোন পার্থক্য নেই।

নলহাটির কথা বলি। পীঠস্থানরূপে নলহাটির উৎপত্তির কোন সঠিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। দেবীর পূজারীরা চৌদ্দপুরুষ আগে স্মরনাথ শর্মার স্বপ্নদর্শনের কথা বলেন এবং নলহাটির কোন 'সাহা' জমিদার দ্বারা মন্দির প্রতিষ্ঠার কথা উল্লেখ করেন। এ ইতিহাসও তিনশ-সাড়ে তিনশ বছরের বেশি প্রাচীন নয়। অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত নলহাটির ইতিহাসের জের টানা যায়। প্রায় এই সময় রচিত 'পীঠনির্ণয়' বা 'মহাপীঠ-নিরূপণ' গ্রন্থে 'নলহাটির' নাম পাওয়া যায়। কোন প্রাচীন তন্ত্রগ্রন্থে নলহাটির নাম নেই। পরবর্তীকালের গ্রন্থে 'উপপীঠ' বলে নলহাটির উল্লেখ আছে :

নলাহাট্টাং নলাপাতো যোগীশো ভৈরবস্তথা।
তত্র সা কালিকা দেবী সর্বসিদ্ধিপ্রদায়িকা॥
কালীঘাটে মুণ্ডপাতঃ ক্রোধীশো ভৈরবস্তথা।
দেবতা জয়দুর্গাস্যাং নানাভোগপ্রদায়িনী॥
বক্রেশ্বরে মনঃপাতো বক্রনাথস্তু ভৈরবঃ।
নদী পাপহরা তত্র দেবী মহিষমর্দিনী॥
হারপাতো নন্দিপুরে ভৈরবো নন্দিকেশ্বরঃ।
নন্দিনী সা মহাদেবী তত্র সিদ্ধিমবাপ্নুয়াত॥

(পীঠনির্ণয়—মহাপীঠনিরূপণম)

ডক্টর দীনেশচন্দ্র সরকার বলেন যে, সম্ভবত সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে এই 'পীঠনির্ণয়' গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। পূর্বের কোন প্রাচীন তন্ত্রগ্রন্থে এমন কি 'পীঠনির্ণয়ের' অন্যান্য পুঁথিতেও নলহাটি, কালীঘাট, বক্রেশ্বর, নন্দীপুর ইত্যাদির নাম নেই। তাই মনে হয়, তান্ত্রিক পীঠস্থানরূপে এগুলির তেমন প্রাধান্য সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বে বিশেষ ছিল না। বৌদ্ধ ও হিন্দু তন্ত্রের ক্রমাবনতির যুগে, মোগল রাজত্বের শেষে, কেন্দ্রচ্যুত ও বিচ্ছিন্ন তান্ত্রিক সাধনার ধারা বাংলার পশ্চিম প্রান্তের এই অঞ্চলগুলিতে কোনরকমে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হয়। তার মধ্যে নন্দীপুর (সাঁইথিয়া), বক্রেশ্বর, নলহাটি ইত্যাদি অন্যতম বলা চলে।

নলহাটি থেকে ভদ্রপুরের পথে যাত্রা করলাম। নলহাটি-আজিমগঞ্জ রেল-পথে লোহাপুর স্টেশন থেকে প্রায় চার-পাঁচ মাইল দূরে ভদ্রপুর গ্রাম। মুর্শিদাবাদ-সীমান্ত এখান থেকে খুব বেশি দূর নয়। ইতিহাস-বিশ্রুত মহারাজা নন্দকুমারের জন্মস্থান বলে ভদ্রপুরের প্রসিদ্ধি। এখনও নন্দকুমার-বংশের শাখা-প্রশাখার বংশধররা এই গ্রামে বসবাস করেন। গ্রামের দৃশ্য ও ঐতিহাসিক নিদর্শন দেখে মনে হয় ভদ্রপুর বেশ প্রাচীন গ্রাম।

আনুমানিক ১৭০০ খৃষ্টাব্দে, অথবা অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে নন্দকুমারের জন্ম হয় এবং ভদ্রপুরেই তিনি জন্মগ্রহণ করেন। জীর্ণ রাজবাড়ির সংলগ্ন একটি ইট-কাঠের কঙ্কালসার কক্ষের দিকে চেয়ে গ্রামবৃদ্ধরা বলেন যে, এই ঘরেই নন্দকুমারের জন্ম হয়েছিল। প্রাগৈতিহাসিক যুগের অতিকায় দানবের কঙ্কালের মতন মহারাজের অট্টালিকা হঠাৎ চোখের সামনে ভেসে ওঠে। পায়রা আর চামচিকেরা অতীত স্মৃতির টুকরো নিয়ে ভগ্নস্তূপের মধ্যে কিচিরমিচির করে। সেই বিশাল ফটকের উন্নতশিরের দিকে দেখিয়ে গ্রামবাসীরা বলেন যে, এখান দিয়ে হাতির পিঠে চড়ে বাড়ির ভিতরে অঙ্গনে যাওয়া হত। ভিতরে দেওয়ানখানা, লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির ইত্যাদি। রাজ-বাড়ির উত্তরাংশে ন'বাড়ি। মহারাজার ন'মধ্যম কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাধাকৃষ্ণ রায়ের বাড়ির নামই ন'বাড়ি। রাজবাড়ি ও ন'বাড়ির পশ্চিমে ছোট রায়বাড়িতে মহারাজার বৈমাত্রেয় ভাই রঘুনাথ রায় ও তাঁর বংশধররা বাস করেন। ভদ্রপুরের ক্রমাবনতির কথা উল্লেখ করে শ্রীনবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর

'ভদ্রপুর ইতিবৃত্ত' নামক পুস্তিকায় লিখেছেন (১৩১৭ সনে প্রকাশিত): "এখন আর সেরূপ নাই। ব্রাহ্মণ জাতি চৌধুরী, কায়স্থ জাতি সিংহ ও গন্ধবণিক জাতি পালদিগের এবং মুসলমান জাতি মিরদিগেরই এই গ্রামে আদিম বাস ছিল, ইহা স্পষ্ট জানা যায়। আমারই চক্ষুরগ্রে এই গ্রামের লালাগোষ্ঠী, মজুমদারগোষ্ঠী ও অন্যান্য অনেক ব্রাহ্মণ, তন্তুবায়, স্বর্ণকার ও সূত্রধরবংশ লুপ্ত হওয়ায় ন্যূনাধিক একশত ঘর বস্তী বিগত ৪০ বৎসরের মধ্যে কমিয়া গিয়াছে।" মহারাজা নন্দকুমারের অট্টালিকা থেকে রেশমের কুঠি পর্যন্ত সবই আজ ভগ্নস্তূপে পরিণত হয়েছে।

সবার আগে ভদ্রপুরে পৌঁছে মনে হয় যেন মহারাজা নন্দকুমারের স্মৃতি সারা গ্রামটিকে আছন্ন করে আছে। স্থানীয় লোকের দুঃখ হল, ইংরেজের ইতিহাসের নজির ভাল করে যাচাই করা হল না, তখনকার 'দেশপ্রেম' বা 'জাতীয়তাবোধের' (অষ্টাদশ শতাব্দীর) স্বরূপ কি তা সুস্থ মস্তিষ্কে বিচার করা হল না, নন্দকুমারের প্রতি ইংরেজের বিদ্বেষপ্রসূত প্রচণ্ড অবিচারকে মাথা হেঁট করে মেনে নেওয়া হল। আজও নাকি স্থানীয় লোকের অনুরোধ সত্ত্বেও ভারত গবর্ণমেণ্ট ভদ্রপুর গ্রামে নন্দকুমারের স্মৃতিরক্ষার জন্য কিছু করতে নারাজ। তাঁরা বলেন, মুর্শিদাবাদের কুঞ্জঘাটায় যে কীর্তি ও স্মৃতি রক্ষিত হয়েছে তাই যথেষ্ট।

সাম্রাজ্যবাদীর ইতিহাসে নন্দকুমারের চরিত্র যেভাবেই কলঙ্কিত করা হোক না কেন, বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের কাছে তাঁর লোকপ্রিয়তা আজও ম্লান হয়নি। অসংখ্য ছড়া ও গানে তার প্রমাণ আজও পাওয়া যায়। যেমন—

ভাদুরের নন্দকুমার
লক্ষ বামুন করলে সুমার।
কেউ খেলে মাছের মুড়ো
কেউ খেলে বন্দুকের হুড়ো।

অথবা—

নন্দকুমার রায় ছিল বাঙ্গালার অধিকারী।
হেস্টিংস সাহেব এল জান করিবারে বারি॥
নন্দকুমারের মা কাঁদে ঐ গাঙ্গের পানে চেয়ে।
আর না আসিবে বাছা জোড়া ডিঙ্গি বেয়ে॥

খোপেতে কৌতর কাঁদে, কাঁদে ফোয়ারায় হাঁস।
যোড়া বাঙ্গালায় কাঁদে সোনার গুলৃতি বাঁশ॥

দলিল-দস্তাবেজের মাহাত্ম্য অথবা মহাফেজখানার মাহাত্ম্য ও রহস্য সাধারণ মানুষ জানে না বা বোঝে না। কত জাল দলিলের দৌলতে, মহাফেজখানার অন্ধকারে বসে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা আমাদের দেশের ইতিহাসের কত অধ্যায় যে বিকৃতভাবে রচনা করে গেছেন, ভবিষ্যতে অনেক-দিন পর্যন্ত অনুসন্ধানীদের কর্তব্য হবে তাই প্রমাণ করা। নন্দকুমারের ইতিহাস পুনরালোচনা করার দরকার নেই এখানে। আজ পর্যন্ত এরকম বিচার এই অবস্থায় কখনও হয়েছে কিনা সন্দেহ। ১৭৭৫ সালের মে মাসে মোহনপ্রসাদ অভিযোগ করেন নন্দকুমারের বিরুদ্ধে, জালিয়াতির অভিযোগ। সুপ্রীম কোর্টের বিচারকরা তাঁর বিচার করেন এবং ১৬ই জুন তাঁর প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। তার ২২ দিন পর তাঁকে কলকাতার ময়দানে ফাঁসি দেওয়া হয়। জালিয়াতির অপরাধে প্রাণদণ্ড দেওয়া এবং অত তাড়াতাড়ি সমস্ত তদন্ত, বিচার ও দণ্ডবিধানের কাজ শেষ করে ফেলার মধ্যেই ষড়যন্ত্রের আভাস পাওয়া যায়। বৃটিশ আমলে নন্দকুমার অবশ্য বাংলাদেশের প্রথম শহীদ নন। একথা ভুল। তাঁর আগে বাংলার সাধারণ চাষী ও মানুষ সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে অনেকে প্রাণ দিয়েছেন। কিন্তু উল্লেখযোগ্য হল, নন্দকুমারের মতন একজন দেশের প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিকে এইভাবে বিচার করে প্রাণদণ্ড দেওয়ার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল। বর্তমান যুগে অবশ্য বিরল নয়, কিন্তু তখন বিরল ছিল। দেশের কয়েকজন গণ্যমান্য অসাধারণ ক্ষমতাশালী ব্যক্তির মধ্যে নন্দকুমার নিঃসন্দেহে অন্যতম ছিলেন। তাঁকে যে-পদ্ধতিতে হত্যা করা হয়েছিল তাতে সমস্ত ব্যাপারটি হেষ্টিংস ও তাঁর পার্শ্বচরদের চক্রান্ত ছাড়া আর কিছু ভাবা যায় না। তার মানে এ নয় যে, নন্দকুমার নিষ্কলঙ্ক-চরিত্র ছিলেন, তাঁর অর্থলোভ ছিল না, তিনি জাল-জালিয়াতি করেননি। নবাবী আমলের শেষে এবং ইংরেজের কোম্পানীর আমলে আমাদের দেশে যে সব পরিবার বা ব্যক্তি আর্থিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন, তাঁরা কেউ সাধুতার জোরে তা করেননি। ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত ও অসাধুতা তাঁদের চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। নন্দকুমার যদি সেই দোষে দোষী হন,

তাহলে তার জন্ম প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হতে পারেননা। এ-সব কথা বাঙালীর আজ মনে হওয়া স্বাভাবিক।

ভদ্রপুরের কাছে আকালীপুরে মহারাজ নন্দকুমারের প্রতিষ্ঠিত বলে কথিত সর্পাসীনা সর্পভূষিতা দ্বিভুজা গুহ্যকালী দেবী প্রতিষ্ঠিত আছেন। মন্দিরটি আজও অসম্পূর্ণ রয়েছে। ব্রাহ্মণী নদীর পাশে শ্মশান এবং শ্মশানের কোলে কালীমন্দির। শোনা যায়, দেবীপ্রতিষ্ঠার সময় মহারাজা নিজে উপস্থিত থাকতে পারেননি বলে তাঁর পুত্র গুরুদাসকে তান্ত্রিক মতে কালীপ্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়েছিলেন। দেবীমন্দিরের দক্ষিণে একটি সিদ্ধাসন আছে, 'পঞ্চমুণ্ডী' বলে পরিচিত। এই অঞ্চল থেকে বৌদ্ধমূর্তিও কয়েকটি পাওয়া গেছে। মূর্তিগুলি সংগ্রাহক-ব্যবসায়ীদের কৃপায় স্থানান্তরিত হয়েছে। ভদ্রপুরও মনে হয় তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মতন বৌদ্ধ তন্ত্রযানের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল, পরে হিন্দু তান্ত্রিক, শৈব ও বৈষ্ণবদের প্রতিপত্তিও বাড়ে। গুহ্যকালী প্রতিষ্ঠা থেকে মহারাজা নন্দকুমারের শক্তি উপাসনার কথা মনে হয়। বাংলাদেশের অনেক প্রতিপত্তিশালী রাজা ও জমিদারের মতন নন্দকুমারও শক্তির পূজারী ছিলেন। বৈষ্ণবধর্মের প্রতিও তাঁর অনুরাগ ছিল। কিন্তু এসব আজ ভদ্রপুরের অতীত ইতিবৃত্ত। আজ সেই অতীত সমৃদ্ধির প্রায় সবটাই লুপ্ত হয়ে গেছে। ইতিহাসের উত্থান-পতনের আঘাতের চিহ্ন, আরও অনেক গ্রামের মতন, ভদ্রপুরের বুকেও অঙ্কিত রয়েছে।

বারাগ্রাম

চৈনিক পরিব্রাজক ইউয়ান চোয়াঙ (হিউয়েন সাঙ) সপ্তম শতাব্দীতে যখন বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল পর্যটন করেছিলেন তখন পৌণ্ড্রবর্ধন, সমতট, কর্ণসুবর্ণ ও তাম্রলিপ্তিতে বৌদ্ধধর্মের অনেক নিদর্শন তিনি দেখতে পেয়েছিলেন। কর্ণসুবর্ণ ও তাম্রলিপ্তি মুর্শিদাবাদ ও মেদিনীপুর জেলায়, পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তে। কর্ণসুবর্ণ রাজ্য তখন বহুদূর বিস্তৃত ছিল। বারাগ্রাম মুর্শিদাবাদ সীমান্তে, বীরভূম জেলার উত্তর-পূর্ব প্রান্তে। শশাঙ্কের আমল থেকে পাল রাজাদের কাল পর্যন্ত বাংলার এই অঞ্চলে বৌদ্ধপ্রাধান্য অক্ষুন্ন ছিল। বীরভূমের বারাগ্রামে আজও তার চমকপ্রদ ঐতিহাসিক নিদর্শন রয়েছে যথেষ্ট।

নলহাটি-আজিমগঞ্জ শাখা-রেলপথে লোহাপুর স্টেশনের পাশেই বারাগ্রাম। কেউ বলেন, 'বালানগর' থেকে 'বারা' হয়েছে। 'এক যে ছিল রাজার' কাহিনী এখানকার হাটেমাঠেও লোকমুখে শোনা যায়। আঠারো মহল্লায় বিভক্ত গ্রাম, কিন্তু হিন্দুর সংখ্যা খুব কম, মুসলমানের সংখ্যা বেশি। পশ্চিম-বাংলায় কেন এ রকম বিচ্ছিন্ন ব্যতিক্রম? কেনই বা পূর্ববাংলার তুলনায় পশ্চিমবাংলায় ধর্মান্তরিতের সংখ্যা কম? কৌতূহলী কেউ কেউ এই ধরনের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। এক কথায় উত্তর দেওয়া যায় না, কারণ এ প্রশ্নের উত্তর সামাজিক ইতিহাসের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে। পশ্চিমবাংলার সামন্ত রাজাদের (যেমন মল্লভূম) সুদীর্ঘ স্বায়ত্ত-শাসনের ঐতিহ্য ছিল, মুসলমান শাসকরা তাঁদের বিশেষ বিব্রত করেননি। হিন্দুধর্মের বনিয়াদ কৌমধর্মের সঙ্গে মিশে এখানে যে-রকম পাকাপোক্ত হয়েছিল, পূর্ববঙ্গে সে রকম হয়নি। বৌদ্ধধর্মের প্রধান কেন্দ্র ছিল পূর্ব ও উত্তরবঙ্গ এবং বৌদ্ধদের হিন্দুবিদ্বেষের জন্য ধর্মান্তরিত করাও সহজ হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গে বৌদ্ধ-প্রাধান্য থাকলেও হিন্দুরা তাকে প্রায় আত্মসাৎ করে নিয়েছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের 'ধর্মঠাকুর' বোধ হয় তারই বিচিত্র ঐতিহাসিক নিদর্শন। ধর্মের পণ্ডিতরা একধর্মপাশে অবজ্ঞাত মানুষকে জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে আবদ্ধ করে ইসলামের অভিযান প্রতিরোধ করেছিলেন, যেমন করেছিলেন শ্রীচৈতন্য তাঁর উদার বৈষ্ণব ধর্মের মানবিক আহ্বানে। ধর্মঠাকুর

ও শ্রীচৈতন্য প্রধানত পশ্চিমবাংলাকে ইসলাম-মুক্ত করেছেন। কিন্তু বৌদ্ধ-তান্ত্রিকরা যেখানে প্রাধান্য বজায় রেখেছেন সেখানেই মুসলমান পীর ও সিদ্ধপুরুষদের আস্তানা করা সহজ হয়েছে দেখা যায়। রামপুরহাট মহকুমার একাধিক অঞ্চলের ইতিহাস থেকে এই কথাই মনে হয়। আরও উল্লেখযোগ্য হল, এই সব অঞ্চলে ধর্মঠাকুরের তেমন প্রতিপত্তি নেই। বোঝা যায়, প্রতিরোধের প্রাচীর কোনদিক থেকেই শক্ত ছিল না।

কথাটা আরও পরিষ্কার হবে বজ্রযানী বৌদ্ধদের হিন্দুবিদ্বেষের দৃষ্টান্ত দিলে। বজ্রযানী বৌদ্ধদের প্রচণ্ড হিন্দুবিদ্বেষ ছিল এবং মনে হয় এই বিদ্বেষ বৌদ্ধধর্মের ভয়াবহ অবনতির যুগেই প্রকট হয়েছিল। এমনভাবে প্রকট হয়েছিল যে, হিন্দু দেবদেবীদের বজ্রযানীরা তাঁদের দেবদেবীর বাহন ও অনুচর করতেও কুণ্ঠিত হননি। শ্রীবিনয়তোষ ভট্টাচার্য তাঁর 'ভারতীয় বৌদ্ধ মূর্তিতত্ত্ব' (ইংরেজী গ্রন্থ), 'সাধনমালা' (ভূমিকা) ও 'নিষ্পন্নযোগাবলী' (ভূমিকা) গ্রন্থের মধ্যে বজ্রযানীদের এই হিন্দুবিদ্বেষের অনেক দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। তিনি বলেছেন :

> The Vajrayanists displayed a great hatred towards the gods of the Hindu religion and a large number of remarks made by a number of Vajrayana authors on the Hindu gods in the 'Shadhanmala' fully bears us out......A large number of images were carved by followers of Vajrayana where the Hindu gods were represented in stone and in pictures as humiliated by Buddhist gods. (Sadhanmala, Vol. 2, P. 130-133.)

একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যেই বাংলার বজ্রযানী বৌদ্ধদের এই শোচনীয় পরিণতি হয়েছিল বলে মনে হয়। তার পরেই মুসলমানদের অভিযান আরম্ভ হয় বাংলাদেশে। মুসলমান পীর ও গাজীসাহেবদের পক্ষে তাই এই বৌদ্ধদের ধর্মান্তরিত করা অনেক সহজ হয়েছিল। পশ্চিমবাংলায় এই রকম বৌদ্ধপ্রধান কেন্দ্রই কিছু-কিছু মুসলমানপ্রধান অঞ্চলে পরিণত হয়েছে মনে হয়। বারাগ্রাম তারই একটা উল্লেখযোগ্য নিদর্শন।

বোখারা সমরকন্দ, বোগদাদ তেহারাণ থেকে বারার মুসলমানদের পূর্ব-পুরুষরা আসেননি। দু'একজন পীর বা সিদ্ধপুরুষ আসতে পারেন, কিন্তু

তাঁদের বংশধররাই বারার মুসলমান অধিবাসী নন। লোহাজঙ্গ সাহেব বা বোগদাদের সৈয়দশাহ গোলাম আলীর বংশধর সকলে নন। স্থানীয় অধিবাসীরাই ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন। শোনা যায়, বারায় নাকি একসময় ব্রাহ্মণের বাস ছিল যথেষ্ট, কিন্তু এখন বারা প্রায় ব্রাহ্মণশূন্য গ্রাম। প্রচুর মুসলমান পীরের সমাধি আছে বারাগ্রামে। বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলায় বারার মুসলমান সাধুদের অনেক শিষ্য আছেন। বারার বৈচিত্র্যময় ইতিহাসে এগুলি যে যুগবিপ্লবের নিদর্শন তাতে কোন সন্দেহ নেই। গ্রামের মধ্যে ঢুকেই প্রথমে দেখা যায় লোহাজঙ্গ পীরের সমাধি এবং তার কাছে আরবী ভাষায় 'তোগরা' অক্ষরে উৎকীর্ণ বড় একটি শিলালিপি। লোহাজঙ্গ ছাড়াও আরও অনেক পীর ও সিদ্ধপুরুষের নাম শোনা যায় বারায়, যেমন সুলতান শাহ, ন্যাংটা শাহ, জামাল শাহ, মোখদুম জিলানী, মোখদুম হোসেনী, সৈয়দ শাহ, মেহের আলি, মহরম আলি, লাঙ্গ শাহ, দড়ব শাহ ইত্যাদি। এই সব মুসলমান ধর্মপ্রচারক বারাগ্রামে এসে বৌদ্ধতান্ত্রিকদের সাহচর্যে সিদ্ধপুরুষ ও ন্যাংটা শাহ হয়েছিলেন কিনা, ভাববার বিষয়।

আরবী শিলালিপি ও পীর-পয়গম্বরের সমাধির অন্তরালে কিন্তু বারাগ্রামের সুদীর্ঘ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও ঐশ্বর্য সমাধিস্থ হয়ে আছে। দেখলে বিস্ময়কর মনে হয়। পালযুগের ভাস্কর্যের এরকম প্রাচুর্য একটি গ্রামের সীমানার মধ্যে আর কোথাও দেখিনি। পদে পদে এক-একটি নিদর্শনের সামনে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়াতে হয়। মাটির তলা থেকে অধিকাংশ নিদর্শনই গ্রামবাসীদের কোদালির মুখে উঠেছে। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌রা দু'একবার খোঁজখবর পেয়ে গেছেন এবং 'ভিজিটিঙে'র নামে কেবল চোখের দেখা দেখে এসেছেন। ১৯২০-'২১ সালে প্রত্নতত্ত্ববিভাগের বাৎসরিক রিপোর্টে (পূর্ব-বিভাগের) বারাগ্রামের মূর্তি-ভাস্কর্যের ঐশ্বর্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের কেউ খোন্তা-কোদাল দিয়ে খুঁড়ে দেখেননি, এই গ্রামটির মাটির তলায় কি রয়েছে না রয়েছে। গ্রামের লোকরা বলেন, বিশেষ করে যাঁরা খোন্তা-কোদাল নিয়ে কাজ করেন, অর্থাৎ চাষী মজুররা, যে বারাগ্রামে এরকম স্থান খুব কমই আছে যেখানে কোদাল চালালে কিছু পাথর, ইট বা মূর্তির টুকরো ইত্যাদি পাওয়া না যায়। প্রচুর পাথরের ভাঙা দরজা ও কার্নিসের টুকরো (চমৎকার কারুকাজ ও খোদাই করা) বারার চারিদিকে ছড়িয়ে

রয়েছে, গাছতলায়, খোলা মাঠে, পুকুরপাড়ে, পাড়ায় পাড়ায়। মূর্তির প্রাচুর্য দেখলে সত্যিই স্তম্ভিত হতে হয়। অধিকাংশ মূর্তিই অসাবধান কোদালের-সাবোলের ঘায়ে ভগ্ন ও বিকৃত। কারও মাথা নেই, কারও হাত নেই, কারও পা নেই, কারও চালচিত্র নেই, কারও বা পাদপীঠ নেই। না থাকলেও, চেনবার মতন দেবদেবীর মূর্তি বারাগ্রামে এখনও এত প্রচুর পরিমাণে আছে যে, তাই দিয়ে একটি মিউজিয়ম বা সংগ্রহশালা গড়ে তোলা যায়। দরিদ্র গ্রামবাসীর মিউজিয়ম গড়বার সাধ্য নেই। বিলাসী কলেক্টর ও ব্যবসায়ীর লোলুপ দৃষ্টি পড়েছে তার উপর। গ্রামবাসীর দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে সস্তায় সেইসব মূর্তি তাঁরা কিনে নিয়ে (অনেক ক্ষেত্রে অপহরণ করে) বিক্রী করেছেন।

বারাগ্রামের দেবদেবীর মূর্তি-বৈচিত্র্য এত বেশি যে, হঠাৎ কোন মূর্তিবিদ্যা-বিশারদের পক্ষেও প্রত্যেক মূর্তির সঠিক পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। মূর্তি-বৈচিত্র্যের সামনে প্রথমে বিহ্বল হয়ে যেতে হয়। মনে হয়, রাজমহল পাহাড় এখান থেকে বেশি দূরে নয় বলে ভাস্করদের উপাদানের অভাব হয়নি এবং মনের আনন্দে তাঁরা পুঁথি দেখে মূর্তি নির্মাণ করেছেন। তার উপর এই অঞ্চলের বজ্রযানী বৌদ্ধদের দেবদেবীর বৈচিত্র্য-বিলাস তাঁদের প্রেরণায় ইন্ধন জুগিয়েছিল খুব বেশি। বারাগ্রামে দেবদেবীর মূর্তি যা পাওয়া গেছে তার মধ্যে হিন্দু দেবদেবীর সংখ্যা কম নয়, কিন্তু বৌদ্ধ দেবদেবীর সংখ্যা বেশি মনে হয় এবং তার গুরুত্বও বেশি। মূর্তিগুলি বজ্রযানী বৌদ্ধদের। বজ্রাসনে উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্তি একাধিক পাওয়া গেছে বারায়। বজ্রযান হল কালচক্রযান ও সহজযানের মতন বৌদ্ধ তন্ত্রযানের শাখা বিশেষ। সাধারণভাবে একে তন্ত্রযান বা বৌদ্ধতান্ত্রিক বলা যেতে পারে। বজ্রযানীদের মূর্তি-বৈচিত্র্য সম্বন্ধে বিনয়তোষবাবু বলেছেন :

> The Buddhist Pantheon in an elaborate form is a product of the Vajrayana school which most probably took its origin with Asanga in the fourth century. (Nisponnayogabali : intro. P. 15).

তন্ত্রযান-বজ্রযানাদির উৎপত্তি নিয়ে মতভেদ আছে অবশ্য। সপ্তম শতকের মাঝামাঝি ইউয়ান চোয়াঙ যখন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে শীলভদ্রের কাছে

যোগাচার-দর্শন অধ্যয়ন করেছিলেন তখনও সেখানে তান্ত্রিক মতের প্রতিষ্ঠা হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন না। কিন্তু অষ্টম শতক থেকে নালন্দা, বিক্রমশীলা প্রভৃতি বিদ্যায়তনের বৌদ্ধ আচার্যদের হাতে যে বৌদ্ধদর্শন নতুন রূপ নিয়ে সমস্ত পূর্ব-ভারত ও তিব্বতে প্রভাব বিস্তার করল, তা এক অভিনব বৌদ্ধদর্শন এবং তাকেই তন্ত্রযান বলা যায়। মনে হয়, বীরভূমের উত্তর প্রান্তের এই সব অঞ্চলে (পাইকোড়, বারা, ভদ্রপুর, আকালীপুর, তারাপুর) অষ্টম-নবম শতক থেকে তন্ত্রযানী বৌদ্ধমতের প্রসার হতে থাকে এবং দশম-একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে তার পরিপূর্ণ বিকাশ হয়। খৃষ্টীয় দশম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যেই অধিকাংশ বৌদ্ধতান্ত্রিক দেবদেবীর মূর্তি (পাইকোড় ও বারাগ্রামের) নির্মিত হয়েছে বলে মনে হয়। কয়েকটি বৌদ্ধ দেবদেবীর পরিচয় থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে।

বারাগ্রামে 'ভুবনেশ্বরী' নামে এক সিংহাসীনা দেবীমূর্তি পূজিত হন। মূর্তিটিকে কেউ বলেছেন 'ভুবনেশ্বরী-গৌরী' মূর্তি, কেউ বলেছেন 'সিংহনাদ-লোকেশ্বর' মূর্তি, কেউ বলেছেন 'মঞ্জুবর মূর্তি,' কেউ 'প্রজ্ঞাপারমিতা।' বিশেষজ্ঞদের মতামত অজ্ঞদের মনে কি বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে পারে, এটি তার একটি দৃষ্টান্ত। প্রত্নতত্ত্ববিভাগের রিপোর্টে (পূর্ব বিভাগ, ১৯২০-২১) গ্রামবাসীরা যে 'ভুবনেশ্বরী' এই ভুল নামে পূজা করেন, তাও উল্লেখ করা হয়েছে। 'সিংহনাদ লোকেশ্বর' অথবা 'মঞ্জুশ্রী' মূর্তি বলে পরিচয় দেওয়া হয়েছে (পৃষ্ঠা ২৭) এবং ডক্টর ভট্টাচার্য তাঁর বৌদ্ধ মূর্তিতত্ত্বের গ্রন্থে (Indian Buddhist Iconography, P. 25) এই পরিচয়ও ভুল বলেছেন। 'সাধনমালা'র ধ্যানের সঙ্গে মিলিয়ে তিনি এই কথিত 'ভুবনেশ্বরীকে' বলেছেন বৌদ্ধ 'মঞ্জুবর'। ধ্যানটি এই :

"......তপ্তকাঞ্চনাভম্ পঞ্চবীরকুমারম্ ধর্মচক্রমুদ্রাসমাযুক্তম্ প্রজ্ঞাপারমিতান্বিতনীলোৎপলধারীণম্ সিংহস্থম্ ললিতাক্ষেপম্ সর্বালঙ্কারভূষিতম্...ওঁ মঞ্জুবর হুম।"

ধ্যানের সঙ্গে ভুবনেশ্বরীমূর্তির মিল আছে—ধর্মচক্রমুদ্রা, নীলোৎপলের উপর প্রজ্ঞাপারমিতা, সিংহাসীনা, ললিতভঙ্গি ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য ঠিকই আছে, কিন্তু মূর্তিটি দেবমূর্তি নয়, দেবীমূর্তি। বিনয়তোষবাবু বলেছেন—

...I am not sure as to the sex of the figure. It is a

female figure. We will have no other alternative than to identify the image as that of Prajnaparamita. (Ibid, P. 25 fn).

তাই যদি হয়, তাহলে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বারাগ্রামের 'ভুবনেশ্বরী' হলেন বৌদ্ধ প্রজ্ঞাপারমিতা। এ-মূর্তি খুব বেশি নেই বাংলাদেশে।

বারাগ্রামে আরও একটি বিচিত্র দেবীমূর্তি আছে, দুঃখের বিষয়, মূর্তিটির কোন হাতই অটুট নেই, সব ভাঙা। সুতরাং কোন্ হাতে কি ছিল জানার উপায় নেই। চতুর্মুখ দেবীমূর্তি, তিনটি মুখ সামনে, একটি পিছনে। পদ্মের উপর বজ্রাসনে উপবিষ্ট। মাথার মুকুটটির চৈত্যের মতন গড়ন। এই লক্ষণগুলি দেখে মনে হয়, মূর্তিটি কোন বৌদ্ধ দেবীমূর্তি। কেউ এই মূর্তিটির কোন পরিচয় দেননি। প্রত্নতত্ত্ববিভাগের উক্ত রিপোর্টে বোধ হয় এই মূর্তিটিকেই 'উষ্ণীষবিজয়া' বলা হয়েছে। কিন্তু 'সাধনমালা'র ধ্যানের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে মনে হয় মূর্তিটি 'মহাপ্রতিসরা'র মূর্তি। ধ্যান এই :

"মহাপ্রতিসরা গৌরবর্ণা দ্বিরষ্টবর্ষাকৃতিঃ চৈত্যালঙ্কৃতামূর্ধা সূর্যমণ্ডলালীঢ়া বজ্রপর্যঙ্কিনী ত্রিনেত্রা অষ্টভুজা চতুর্মুখা চলৎকুণ্ডলশোভিতা হারনূপুরভূষিতা কনককেয়ূরমণ্ডিতমেখলা সর্বালঙ্কারধারিণী। তস্যা ভগবত্যাঃ প্রথমমুখং গৌরং দক্ষিণং কৃষ্ণং পৃষ্ঠে পীতং বামে রক্তং। দক্ষিণ প্রথমভুজে চক্রং দ্বিতীয়ে বজ্রং তৃতীয়ে শরঃ চতুর্থে খড়্গঃ। বামপ্রথম ভুজে বজ্রপাশঃ দ্বিতীয়ে ত্রিশূলঃ তৃতীয়ে ধনুঃ চতুর্থে পরশু। বোধিবৃক্ষোপশোভিতা..."

যদিও হাতে কি ছিল জানার উপায় নেই, তবু এই ধ্যানের সঙ্গে বারার এই মূর্তির এত মিল আছে যে মূর্তিটি মহাপ্রতিসরামূর্তি মনে হয়। তন্ত্রযানী বৌদ্ধ দেবদেবীর মধ্যে মহাপ্রতিসরা অন্যতম ও প্রধান। চতুর্মুখবিশিষ্ট মহা-প্রতিসরা মূর্তি বাংলাদেশে অত্যন্ত বিরল।

এছাড়াও বারাগ্রামে আরও অনেক বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তি আছে। ধ্যানের সঙ্গে মূর্তি মিলিয়ে দু'একটির পরিচয় ঠিক করতে পারিনি। ভগ্নমূর্তির কয়েকটি বিভিন্ন তারামূর্তি বলে মনে হয়। এইসব মূর্তি থেকে এইটুকু নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বারাগ্রাম পালযুগে বৌদ্ধতন্ত্রযানের একটি অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ছিল।

তারাপীঠ

যদিও পথ অত্যন্ত দুর্গম, তবু তারাপীঠে যেতেই হল। বীরভূমের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত পাইকোড় নলহাটি, ভদ্রপুর আকালীপুর, বারাগ্রাম ইত্যাদি অঞ্চলের ভিতর দিয়ে বৌদ্ধ ও হিন্দুতন্ত্রের স্রোত ক্রমেই যেন তারাপীঠের দিকে প্রবাহিত হয়েছে। আজও পথ যে-রকম দুর্গম তাতে মনে হয় 'বামাক্ষ্যাপা'র যুগে এ-পথ না জানি কি ছিল! আর তারও আগে, সেই জনশ্রুতির বশিষ্ঠের যুগে, এ-পথ অতিকায় দানব ছাড়া মানবের গম্য ছিল বলে মনে হয় না। এ-হেন পথে কেবল তন্ত্রমার্গের নির্বিকার সাধকরাই চলাফেরা করতে পারেন। মাটির পৃথিবীর নশ্বর মানুষ যাঁরা তাঁদের কাছে তারাপীঠের পথ সুগম নয়।

অবশেষে তারাপীঠে পৌঁছলাম। দূর থেকে তারাদেবীর মন্দিরের শিখরটি দেখা যায়। আধুনিককালে তৈরি চারচালা বাংলা মন্দির, অনেক ভাঙাগড়ার পর তৈরি হয়েছে। পাশেই দ্বারকা নদীর কোলে শ্মশান। আজও অসংখ্য শব মাটির তলায় পুতে রাখা হয়, দাহ করা হয় না। শৃগাল-শকুনির লীলাক্ষেত্র এবং তান্ত্রিক সাধকের। পীঠের সীমানার মধ্যে চারিদিকে ছড়ানো পর্ণকুটির, আর কিছু আশ্রম। কোন তান্ত্রিক সাধক এখন আর তারাপীঠে নেই, পাণ্ডারা বলেন। প্রসিদ্ধ সাধক 'বামাক্ষ্যাপা'র ভক্ত অনেকে আছেন, যাযাবর সাধুদের কয়েকটি সাময়িক আস্তানা নীড়ের মতন গড়ে ওঠে, আবার হয়ত ভেঙে যায়। পথের ধারে জঙ্গলের মধ্যে, যাবার পথে, তারাপীঠের কোলে এইরকম কয়েকটি সাধুর আশ্রম দেখলাম। যা দেখলাম বর্ণনা করা যায় না! অবর্ণনীয় বীভৎসতা! আগাগোড়া নরমুণ্ড ও কঙ্কাল দিয়ে তৈরি কুটিরে সাধুরা বাস করেন। সে এক ভয়াবহ দৃশ্য! মাটির দেয়ালে অজস্র নরমুণ্ড গাঁথা। দরজায় নরমুণ্ড, সামনের প্রাঙ্গণে বৃত্তাকারে আলপনার মতন মুণ্ড বসানো। ঢুকেই থমকে দাঁড়াতে হয় এবং দ্বিপ্রহরের খররৌদ্রে কয়েকজন সঙ্গীসহ না দেখলে আঁতকে ওঠার সম্ভাবনা। সায়াহ্নের বা অন্ধকার মধ্যরাত্রের কথা কল্পনা না করাই ভাল। দু'তিনজন সাধুকে দেখলাম, ডাক দিতে এ-কোণ সে-কোণ থেকে বেরিয়ে এলেন। কিন্তু নির্বাক, একটি কথাও বললেন না। কেবল মুখের দিকে রক্তচক্ষু বিস্ফারিত করে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন। চক্ষু দেখে এবং চলার

লায়মান ভঙ্গি দেখে বোঝা যায়, পঞ্চ 'ম'-কারের একটিতে আচ্ছন্ন হয়ে আছেন।

এঁরা কেউ তারাপীঠের উত্তরসাধক তো ননই, তান্ত্রিক সাধকও নন। একথা পাণ্ডারা জোর দিয়ে বললেন এবং বোঝাতে চাইলেন যে, তারাপীঠে এসে কপাল কঙ্কাল নিয়ে কারণপানাদি করলেই তান্ত্রিক সাধক হওয়া যায়, এরকম ভ্রান্তধারণা নিয়ে অনেকে এখানে আসেন এবং নিন্দনীয় আচরণ করেন। শেষ জীবনে বামাক্ষ্যাপার সঙ্গী হয়ে সেবাশুশ্রূষা করেছেন, এরকম দু'একজন এখনও যাঁরা তারাপীঠে আছেন তাঁরাও তাই বললেন।

বামাক্ষ্যাপা সম্বন্ধে অনেক কাহিনী, অনেক কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। শুধু তারাপীঠে বা বীরভূমে নয়, বাংলার সর্বত্র সাধক বামাক্ষ্যাপার নাম সর্বজন পরিচিত। যতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, হরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেকে তাঁর জীবনের বিচিত্র কাহিনী লিখেছেন। তারাপীঠের কাছে আটলা গ্রামে বামাচরণ জন্মেছিলেন। তারপর কিভাবে তিনি তারাপীঠে এসে তারার উপাসনায় আত্মহারা হয়ে গেলেন, সে-কাহিনীর পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই। অনেকেই তা জানেন।

তন্ত্রসাধনায় ও তন্ত্রসাহিত্যে বাঙালী সাধকদের একটা বিশেষ দান আছে। তান্ত্রিক নিবন্ধের মধ্যে ব্রহ্মানন্দ গিরির 'তারারহস্য' ও 'শাক্তানন্দ-তরঙ্গিণী', পূর্ণানন্দ গিরির 'শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি', 'শাক্তক্রম' ও 'শ্যামারহস্য', গৌড়ীয় শঙ্করাচার্যের 'তারারহস্য-বৃত্তিকা', জগদানন্দ মিশ্রের 'কৌলার্চন-দীপিকা', সর্বানন্দের 'সর্বোল্লাসতন্ত্র', শ্রীকৃষ্ণ বিদ্যাবাগীশের 'তন্ত্ররত্ন', কৃষ্ণানন্দ আগম-বাগীশের 'তন্ত্রসার', কৃষ্ণানন্দের বৃদ্ধ-প্রপৌত্র রামতোষণ বিদ্যালঙ্কার ও প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাসের 'প্রাণতোষণীতন্ত্র' ইত্যাদি পণ্ডিতমহলে প্রামাণ্য গ্রন্থ বলে গৃহীত। মঙ্গলকাব্যের রচয়িতা মুকুন্দরাম, বিজয় গুপ্ত, ভারতচন্দ্র প্রমুখ বাঙালী কবিও তান্ত্রিক দেবদেবী ও পীঠস্থানের মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন তাঁদের কাব্যে। হালিশহরের সাধক রামপ্রসাদ, বর্ধমানের সাধক কমলাকান্ত প্রভৃতি সাধক-কবিদের গান আজও বাংলার সবচেয়ে জনপ্রিয় গান। অনেক প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক সাধকও জন্মেছেন বাংলাদেশে। তাঁদের মধ্যে রাঢ়দেশের ব্রহ্মানন্দ, ময়মনসিংহের পূর্ণানন্দ গিরি, ত্রিপুরার মেহার কালীবাড়ির সর্বানন্দ ঠাকুর, ঢাকার মিতরার রাঘবানন্দ, দক্ষিণেশ্বরের রামকৃষ্ণ পরমহংস ও তাঁর গুরু সাধিকা ভৈরবী

যোগেশ্বরী, নাটোরের মহারাজা রামকৃষ্ণ, ঢাকা-রমনার ব্রহ্মাণ্ডগিরি, বীরভূম-তারাপীঠের বামাক্ষ্যাপা প্রমুখ সাধকদের নাম সর্বজনবিদিত। বাংলার তান্ত্রিক সাধনার এই ঐতিহাসিক ধারার শেষ বিকাশ যে-কয়েক স্থানে হয়েছিল তার মধ্যে 'তারাপীঠ' অন্যতম। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে বাংলার তান্ত্রিক সাধকদের শেষ উত্তরাধিকারী ছিলেন বোধ হয় বামাক্ষ্যাপা।

এইবার 'তারাপীঠের' ইতিহাসের কথা বলি। তারাদেবীর উপাসনার ইতিহাসের সঙ্গে নিশ্চয় তারাপীঠের ইতিহাসও জড়িত। তারার নামেই তারাপীঠ। তারাপীঠের অনতিদূরে তারাপুর গ্রামও তারা নাম জড়িত। 'তারা', 'তারা' যে কেবল বামাক্ষ্যাপারই মুখের বুলি ছিল তা নয়। বাংলাদেশে এমন কেউ আছেন কি না জানি না, যিনি একবারও ঘটনাচক্রে অবলীলাক্রমে 'তারা' নাম উচ্চারণ করেননি। 'তারা' নামের লোকপ্রিয়তা বোধ হয় সমস্ত দেবদেবীকে ছাড়িয়ে যায়, এমন কি দুর্গা, কালী পর্যন্ত। তা ছাড়া, দুর্গা কালী, চণ্ডী চামুণ্ডা, সবই 'তারা' ছাড়া কি? যে-গ্রামে তারাপীঠ, তার নামই তো চণ্ডীপুর। রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, বামদেব প্রভৃতি সাধক-কবির কণ্ঠে 'তারা' নাম যেমনভাবে উৎসারিত হয়ে উঠেছে, এমন আর কোন নাম হয়নি। উচ্চারণের সাবলীলতার দিক থেকে অন্য নামের কোথায় বাধা আছে যেন। 'মা' ও তার সঙ্গে 'তারা' বাংলার শ্যামাসঙ্গীতের ছত্রে ছত্রে লোককণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে অত্যন্ত সহজে। সেই তারার নামে তারাপীঠ, তারাপুর। তারা-সাধনায় সাধকরা এখানে সিদ্ধিলাভ করেছেন বলে অনেকে তারাপীঠকে 'সিদ্ধপীঠ' বলেন। প্রাচীন তন্ত্রগ্রন্থে 'মহাপীঠ', এমন কি 'উপপীঠ' বলেও তারাপীঠের নাম পাওয়া যায় না। আগমবাগীশের গ্রন্থে না, এমন কি ভারতচন্দ্রের পীঠমালার তালিকাতেও না। 'শিবচরিত' গ্রন্থে তারাপীঠকে 'মহাপীঠ' বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, সতীর নেত্রাংশ-তারা এখানে পড়েছিল বলে নাম তারাপীঠ। তারাপীঠের দেবী 'তারিণী' এবং ভৈরব 'উন্মত্ত'।[১] কিন্তু 'শিবচরিত' প্রাচীন গ্রন্থ নয়। সুতরাং শিবচরিতের সাক্ষী থেকে তারাপীঠের ইতিহাস জানার উপায় নেই। একমাত্র ভরসা

হলেন 'তারা'। কিন্তু তার আগে তারাপীঠের উৎপত্তি সম্পর্কে একটি কিংবদন্তীর কথা বলি।

ব্রহ্মার মানসপুত্র বশিষ্ঠ তারামন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে, কামাখ্যা প্রভৃতি বহু স্থানে কঠোর তপস্যা করেও সিদ্ধিলাভ করতে পারেননি। ব্যর্থ হয়ে অবশেষে তিনি বুদ্ধের কাছে উপদেশ প্রার্থনা করেন। বুদ্ধ তাঁকে এইস্থানে (তারাপীঠে) উগ্রতারার সাধনা করতে বলেন। বুদ্ধের আদেশে বশিষ্ঠ উগ্রতারার সাধনা আরম্ভ করেন এবং সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। তারাপীঠের সকলের বিশ্বাস, বশিষ্ঠ এইখানেই তারা-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। তারাপীঠের একটি কুণ্ডকে বশিষ্ঠকুণ্ড বলা হয় এবং লোকের বিশ্বাস এই কুণ্ডে স্নান করলে মৃতবৎসা নারী সন্তান লাভ করেন। বশিষ্ঠের সাধনার স্থানও নির্দিষ্ট আছে তারাপীঠে।

তারাপীঠের এই বুদ্ধ-বশিষ্ঠ কাহিনীটি তন্ত্রগ্রন্থ থেকে গৃহীত হয়েছে। 'রুদ্রযামলের' মতন বিখ্যাত তন্ত্রগ্রন্থেও এই কাহিনীটি স্থান পেয়েছে দেখা যায়। ব্রহ্মার আদেশে বশিষ্ঠ চীনদেশে বা মহাচীনে গিয়েছিলেন, তারা-সাধনার আচার শিক্ষা করতে, কারণ তন্ত্রমতে চীনাচারই হল তারা উপাসনার শ্রেষ্ঠ আচার। 'চীনাচার' সম্বন্ধে অনেক তন্ত্রগ্রন্থে প্রশংসা করা হয়েছে। 'নীলতন্ত্র', 'তারারহস্য-বৃত্তিকা', 'রুদ্রযামল', 'শিবশক্তি-সঙ্গমতন্ত্র' প্রভৃতি গ্রন্থে চীনাচারক্রমকে তারা-সাধনার শ্রেষ্ঠ ক্রম বা পদ্ধতি বলা হয়েছে। বশিষ্ঠ সেই জন্যই চীনদেশে গিয়েছিলেন:

ততো গত্বা মহাচীনদেশে জ্ঞানময়ী মুনিঃ
দদর্শ হিমবত-পার্শ্বে সাধকেশ্বরসেবিতে।

বশিষ্ঠের এই চীনদেশে ও কামাখ্যায় গিয়ে তারাসাধনায় ব্যর্থ হওয়ার কাহিনী তারাপীঠে প্রচলিত আছে। মূল কাহিনীটি বশিষ্ঠের তন্ত্রসাধন, বিশেষ করে তারার সাধন-পদ্ধতি শিক্ষার কাহিনী। তন্ত্রমতে দেখা যায়, তারার সাধনপদ্ধতির মধ্যে চীনাচারই শ্রেষ্ঠ এবং বশিষ্ঠ সেই চীনাচার শিক্ষা করতেই চীনদেশে গিয়েছিলেন।

কাহিনীর অন্তরালে একটি বিরাট ঐতিহাসিক সত্য আত্মগোপন করে আছে। তারার সঙ্গে চীনদেশ প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। তারা-সাধনার উৎপত্তি হয়েছিল চীনদেশে, পরিষ্কার বোঝা যায়। চীনদেশ কোথায়? বর্তমান

চীনদেশ, না মঙ্গোল-জাতীয় লোকের অন্য কোন দেশ—যেমন নেপাল, ভুটান, তিব্বত। তারাতন্ত্রে 'হিমবতপার্শ্বে' বলে চীনদেশের ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ নেপাল-ভুটান-তিব্বত অঞ্চল। এই অঞ্চলেই তারা-সাধনার উৎপত্তি হয়েছে মনে হয়। ডক্টর হীরানন্দ শাস্ত্রী তাঁর 'তারা-সাধনার' উৎপত্তি শীর্ষক একটি মূল্যবান নিবন্ধে বলেছেন :

> Regarding the place of origin of Tara or Tara-worship, I am of opinion that we should rather look towards the Indo-Tibetan borderland or Indian Tibet than any other region. (Archaeological Survey Memoir, No. 20; The Origin and Cult of Tara, P. 15)

শ্রীবিনয়তোষ ভট্টাচার্য ও শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচীও এই মত সমর্থন করেন। ডক্টর বাগচী 'সম্মোহতন্ত্রের' পুঁথি থেকে নীলোগ্রতারা বা নীলসরস্বতীর উৎপত্তির কাহিনী উদ্ধৃত করে বলেছেন যে,—'চোলনামঃ মহাহ্রদঃ'—ইত্যাদি উক্তির 'চোল' কথার সঙ্গে হ্রদ অর্থে মঙ্গোলিয়ান 'কোল' 'কুল' কথার সম্পর্ক দেখে মনে হয় কোন মঙ্গোল অঞ্চল থেকেই তারাদেবীর উৎপত্তি হয়েছে।[১]

এইবার দেখা যাক, মূলত 'তারা' কাদের উপাস্য দেবী ছিলেন, হিন্দুদের না বৌদ্ধদের? বৌদ্ধ 'সাধনমালা'য় মহাচীনতারার দুটি সাধন আছে। একটি ধ্যানে এই রূপকল্পনা করা হয়েছে :

> প্রত্যালীড়পদাম্ ঘোরাম্ মুণ্ডমালাপ্রলম্বিতাম্।
> খর্বলম্বোদরাম্ ভীমাম্ নীলনীরজরাজিতম্॥
> ত্র্যম্বকৈকমুখাম্ দিব্যাম্ ঘোরাট্টহাসভাস্বরাম্।
> সুপ্রহৃষ্টাম্ শবারূঢ়াম্ নাগষ্টকবিভূষিতাম্॥—ইত্যাদি।

'সাধনমালা'য় মহাচীনতারার এই ধ্যানের সঙ্গে 'তন্ত্রসার' গ্রন্থের তারার ধ্যান মিলিয়ে দেখা যেতে পারে। তন্ত্রসারের ধ্যান এই :

> প্রত্যালীড়পদাম্ ঘোরাম্ মুণ্ডমালাবিভূষিতাম্।
> খর্বাম্ লম্বোদরীম্ ভীমাম্ ব্যাঘ্রচর্মাবৃতাম্ কটৌ॥
> নবযৌবনসম্পন্নাম্ পঞ্চমুদ্রাবিভূষিতাম্।
> চতুর্ভুজাম্ লোলজিহ্বাম্ মহাভীমাম্ বরপ্রদাম্॥—ইত্যাদি।

---

১ P. C. Bagchi : Studies in the Tantras, Pt. I, P. 44.

দুটি ধ্যানের আশ্চর্য মিল আছে। সাধনমালার ধ্যানের ভাষাগত ভুল-ভ্রান্তি তন্ত্রসারের ধ্যানে সংশোধন করে নতুন দুচারটি লাইন যোগ করা হয়েছে মাত্র। এছাড়া বৌদ্ধ মহাচীনতারা ও হিন্দু তারার ধ্যানের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। শ্রীবিনয়তোষ ভট্টাচার্য তাই বলেছেন যে, বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের মহাচীনতারা ও উগ্রতারাই হিন্দু তান্ত্রিকদের তারায় পরিণত হয়েছেন :

> This Ugratara or Mahacinatara of the Buddhists has been incorporated by the Hindus in their Pantheon under the name of Tara and the latter count her among the ten Mahavidya goddesses. (The Indian Buddhist Iconography : Ch. 6, P. 76-78),

সাধনমালার ভূমিকাতেও (দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ১৩৫-১৩৮) ডক্টর ভট্টাচার্য তন্ত্রসারের তারা-ধ্যানের বিস্তৃত আলোচনা করে বলেছেন যে, 'পিঙ্গোগ্রৈকজটাং' ও 'অক্ষোভ্যদেবীমূর্ধণ্য' প্রভৃতি বর্ণনা থেকে 'একজটা' ও 'অক্ষোভ্য' সম্বন্ধে যে হদিশ পাওয়া যায় তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তারা 'একজটা' এবং তাঁর মাথায় অক্ষোভ্য মূর্তি। হিন্দু দেবদেবীর মধ্যে অক্ষোভ্য বা একজটার কোন অস্তিত্ব নেই। বৌদ্ধদের 'একজটা' নামে এক দেবী আছেন, তিনি উগ্রতারা, মহাচীনতারা ইত্যাদি নামেও খ্যাত। ডক্টর বাগচী বলেছেন যে, 'অক্ষোভ্য দেবীমূর্ধণ্য' কথা থেকে তারার বৌদ্ধ উৎপত্তি সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না। তাহলে তারা-সাধনা সম্বন্ধে এইটুকু জানা গেল যে, তারা বৌদ্ধ-তান্ত্রিক দেবী এবং বৌদ্ধতন্ত্র থেকে তারা হিন্দুতন্ত্রের আরাধ্যাদেবী হয়েছেন। এই তারা-সাধনার উৎপত্তি হয়েছে ভোটদেশে, তিব্বত-নেপাল অঞ্চলে। বাঙালীর সংস্কৃতিতে এটি একটি বিশিষ্ট 'মঙ্গোলয়েড ট্রেট' বা মঙ্গোল উপাদান।

এখন প্রশ্ন হল, কোন্ সময় তারাসাধনার উৎপত্তি হয়েছে এবং তারাপীঠেই বা কখন হয়েছে? "আর্যনাগার্জুনপাদৈর্ভোটেষু উদ্ধৃতম্"—আর্য নাগার্জুন ভোটদেশ থেকে এই তারা-সাধনার পুনরুদ্ধার করেছিলেন। নাগার্জুনের কাল আনুমানিক সপ্তম শতাব্দী। এই সপ্তম শতাব্দেই হর্ষবর্ধন ও কামরূপের ভাস্করবর্মণ বাংলার শশাঙ্কের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। এই বিশৃঙ্খলার সুযোগ নিয়ে এই সময় তিব্বতের রাজা স্রঙ-সন-গ্যাম্পো ভারতে (বিহার পর্যন্ত) অভিযান করেন এবং আসাম ও নেপাল দখল করেন। তিব্বত ও আসামের

সঙ্গে এই সপ্তম শতাব্দেই বাংলার (গৌড়-রাঢ়ের) সাংস্কৃতিক সংঘাত হয় এবং সেই সংঘাতের ফলেই তান্ত্রিক আচার-অনুষ্ঠান নবজীবন লাভ করে। এই সময়ই বৌদ্ধতন্ত্রের গোড়াপত্তন হয় বলে মনে হয়, বিশেষ করে তারা-সাধনার। তারপর অরাজকতার শেষে পালযুগের শৃঙ্খলা ও সমৃদ্ধির মধ্যে পূর্ণবিকাশ হয় বৌদ্ধতন্ত্রের এবং মনে হয় তারা-সাধনারও। যে-অঞ্চলে বৌদ্ধতন্ত্রের বিকাশ হয় তার মধ্যে বীরভূমের এই অঞ্চল অন্যতম—উত্তর-পূর্ব-অঞ্চল। চণ্ডীপুর-তারাপুর ও তারাপীঠ এই অঞ্চলের সীমানার মধ্যেই অবস্থিত। তারা-সাধনার অন্যতম কেন্দ্র এই অঞ্চল হয়ত সপ্তম-অষ্টম খৃষ্টাব্দ থেকেই ছিল। পরে হিন্দুতন্ত্রের তারাসাধনার যুগে সিদ্ধ নাগার্জুনের ভোটদেশ থেকে তারাসাধনা পুনরুদ্ধারের কাহিনী বর্জন করে বশিষ্ঠের কাহিনী যোগ করা হয়েছে। মূল কাহিনীর কাঠামো ঠিক আছে। কেবল নাগার্জুনই বোধ হয় বশিষ্ঠ হয়েছেন। ঐতিহাসিক কাহিনী রূপান্তরিত হয়ে ইতিহাসে এই ভাবেই কিংবদন্তীর উৎপত্তি হয়।

বীরভূমের ধর্মপূজা

"With the materials obtained upto this time, I humbly believe a case has been made out for considering the worshippers of Dharma to be the ancient Buddhists of India. If further investigation confirms my views, a very large proportion of the population of Bengal will have to be taken out from the list of Hindus and put down under the head of Buddhists."—Haraprasad Sastri.

প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে শাস্ত্রী মহাশয়ের সময় থেকে, বাংলাদেশে ধর্মঠাকুর সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছে। একসময় ধর্মঠাকুর প্রসঙ্গে শাস্ত্রী মহাশয়ের 'Discovery of Living Buddhism in Bengal' নিবন্ধ বাংলাদেশের ঐতিহাসিক ও অনুসন্ধানী মহলে রীতিমত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। পরবর্তীকালে একাধিক অনুসন্ধানীর দৃষ্টি, প্রধানত তাঁরই জন্য, অবহেলিত ধর্মঠাকুরের দিকে আকৃষ্ট হয়েছে। গভীর ঐতিহাসিক অন্তর্দৃষ্টি ও কল্পনাশক্তি নিয়ে বাংলাদেশে যে দু'একজন সন্ধানী জন্মেছেন, তাঁদের মধ্যে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী অন্যতম। ধর্মঠাকুরের উৎসবের মধ্যে তিনি যে বৌদ্ধ ধর্মানুষ্ঠানের চিহ্ন পেয়েছিলেন, আজকের অনুসন্ধানের ফলে হয়ত তার মধ্যে আরও প্রাচীনতর লোকাচারের নিদর্শন পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু তার জন্য আমাদের তাঁর কাছেই কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। শাস্ত্রী মহাশয় এমন কথা বলেননি যে, সমস্ত অনুসন্ধান তিনি করে ফেলেছেন। যে কথা তাঁর উদ্ধৃত করেছি তার গোড়াতেই তিনি বলেছেন—"With the materials obtained upto this time"—অর্থাৎ সেই সময় পর্যন্ত সংগৃহীত উপাদান থেকে তাঁর যা মনে হয়েছে তাই তিনি বলেছেন।

পরবর্তীকালের অনুসন্ধানীরা ধর্মপূজা প্রসঙ্গে অনেক নতুন কথা বলেছেন এবং নতুন আলোকপাত করবার চেষ্টা করেছেন ঠিকই, কিন্তু আজ পর্যন্ত এ-বিষয়ে বিস্তারিত অনুসন্ধান করে কেউ আধুনিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করেছেন বলে আমার জানা নেই। অথচ

বিতর্ক হয়েছে যথেষ্ট। প্রত্যক্ষ অনুসন্ধান ছাড়া কেবল অধীত বিদ্যার জোরে এ-সমস্যার মীমাংসা করা সম্ভবপর নয়। দু'একস্থানের উৎসবের বিবরণ লিপিবদ্ধ করাও যথেষ্ট নয়। সর্বপ্রথম, অনুসন্ধান করা প্রয়োজন, ধর্মঠাকুরের উৎসব কোন্‌খান থেকে কতদূর পর্যন্ত প্রচলিত (Distribution)। উৎসবের পদ্ধতি ও অনুষ্ঠানাদি সবিস্তারে অনুধাবন করা প্রয়োজন। তারপর তার উৎপত্তি (Origin), বিকাশ ও বিস্তার (Diffusion) সম্বন্ধে ধারণা হওয়া সম্ভবপর। এ-কাজ এখনও পর্যন্ত করা হয়নি। করতে হলে বীরভূম, বর্ধমান, বাঁকুড়া, হুগলী-হাওড়া, মেদিনীপুর এবং দক্ষিণ চব্বিশ-পরগণার ধর্মোৎসবের প্রত্যক্ষ বিবরণ সংগ্রহ করতে হয়, কারণ প্রধানত বাংলাদেশের এই অঞ্চলেই (কিছুটা মুর্শিদাবাদেও) ধর্মঠাকুরের উৎসব প্রচলিত। তার মধ্যেও এমন অঞ্চল সঠিকভাবে নির্দেশ করা যায় যেখানে ধর্মোৎসব অন্যতম প্রধান লোকোৎসব এবং যার বাইরে ক্রমেই তার প্রাধান্য হ্রাস পেয়ে পরে একেবারে লুপ্ত হয়ে গেছে। প্রত্যক্ষ ক্ষেত্রে অনুসন্ধান করলে এও দেখা যায়, ধর্মপূজা ও উৎসব কিভাবে ভিন্ন উৎসবে রূপান্তরিত হয়েছে। এই সব তথ্য বিস্তারিত-ভাবে সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করলে, তবে ধর্মপূজার প্রকৃতি-বিচার করা সম্ভবপর। বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্ধমান, মেদিনীপুর ও হুগলী জেলার ধর্মপূজা সম্পর্কে আমি পৃথকভাবে আলোচনা করব, আলোচনাপ্রসঙ্গে প্রত্যেক জেলায় এই উৎসবের পদ্ধতির বৈচিত্র্য ও বিশেষত্বের দিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করা আমার প্রাথমিক উদ্দেশ্য। জেলার বিবরণ শেষ হলে, ধর্মোৎসবের ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক রূপও পরিষ্কার ধরা পড়বে, অন্তত বিচার করা সম্ভব হবে। বাঁকুড়া ময়না-পুরের কথা আগে বলেছি। এবার বীরভূমের ধর্মপূজার কথা বলব।

প্রথমে বীরভূম জেলার প্রধান শহর সিউড়ীর কথা বলি। সিউড়ী শহরের মধ্যে অন্যান্য অনেক দেবতার মন্দির আছে। তার মধ্যে ধর্মরাজের একটি সাধারণ প্রাচীন মন্দির আছে যার গুরুত্ব উৎসবের দিক থেকে অসাধারণ। আজ পর্যন্ত সিউড়ী শহরের সবচেয়ে জমকালো উৎসব, এই ধর্মোৎসব। সিউড়ীর ধর্মঠাকুর মালিপাড়া বা মালাকর পাড়ায় প্রতিষ্ঠিত। একাধিক কিংবদন্তী আছে এই ধর্মঠাকুর সম্বন্ধে। প্রায় একশ সওয়াশ বছর আগেকার কথা। তখন ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় সিউড়ীর অন্যতম উকিল ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন। সেই সময় সেহাড়াপাড়ায় ধর্মপূজা হত এবং পূজা উপলক্ষ্যে কোন-

কারণে একবার গণ্ডগোল হয়। ত্রৈলোক্যনাথের উদ্‌যোগে তখন সিউড়ীতে ধর্মপূজার ব্যবস্থা হয়। কোন মুদিখানা থেকে একটি সের পাঁচেক ওজনের পাথর নিয়ে জলে চুবিয়ে তেলসিঁদুর দিয়ে, ঢাক-ঢোল বাজিয়ে ধর্মরাজ প্রতিষ্ঠা করা হয়। পূজার জন্য ত্রৈলোক্যবাবু একটি টাকা দেন। চার আনায় একটি পাঁঠা এবং বারো আনায় পূজার অন্যান্য খরচ তখন স্বচ্ছন্দে কুলিয়ে যেত। আজও ধর্মপূজার পুণ্যার দিনে মুখোপাধ্যায় বংশের কাছ থেকে সর্বপ্রথম একটি টাকা নেবার প্রথা প্রচলিত আছে। ধর্মরাজতলার কাছে যে মালাকররা থাকেন, তাঁরা বলেন যে, ধর্মরাজ তাঁদেরই পূর্বপুরুষদের প্রতিষ্ঠিত। বারুই-পাড়ায় ধর্মপূজা দেখতে গিয়ে মেয়েরা একবার অপমানিত হন বলে তাঁরা ধর্মশিলা এনে এই ধর্মঠাকুর প্রতিষ্ঠা করেন। সত্য মিথ্যা যাই হোক, প্রথম উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল, পুণ্যার দিন মুখোপাধ্যায়-গৃহ থেকে প্রথমে একটি টাকা নেওয়ার প্রথা। দ্বিতীয়ত, দলাদলির জন্য ধর্মঠাকুরের সংখ্যা সিউড়ীর চারিদিকে এত বেশি হলেও, বনেদী ধর্মঠাকুর বাউরী, হাড়ি-ডোম পাড়ায় অনেক আছেন। তাছাড়া, দুর্গোৎসব নিয়ে দলাদলি, ধর্মঠাকুরের উৎসব নিয়ে দলাদলিটাও উল্লেখযোগ্য। ধর্মঠাকুরের অসাধারণ লোকপ্রিয়তার অকাট্য প্রমাণ।

সাধারণত আষাঢ় বা শ্রাবণ-পূর্ণিমায় সিউড়ীর ধর্মপূজা হয়। বৈশাখ থেকে শ্রাবণ-পূর্ণিমা পর্যন্ত বীরভূম জেলার নানাস্থানে ধর্মপূজা হয় এবং পূর্ণিমার পরিবর্তনও দেখা যায় প্রায় ঐ প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকেই হয়েছে। পাশের পাড়ায় বৈশাখী পূর্ণিমায় হয় বলে অন্য পাড়ায় পরবর্তী বা অন্য কোন পূর্ণিমায় উৎসব হয়। সিউড়ীতে পূজার পনের-কুড়িদিন আগে মাটির ভাঁড় আর ফুলের মালা দিয়ে ধর্মতলা সাজানো হয় (মালদহের গম্ভীরা সাজানোর কথা মনে পড়ে)। পরে বাজনা বাজিয়ে একটি ভাঁড় স্থানীয় জমিদার পূর্বোক্ত মুখোপাধ্যায়-গৃহে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তাঁরা একটি টাকা দান করেন। তারপর থেকে 'কয়েলীর' বা চাঁদা সংগ্রহের কাজ শুরু হয়। পূজার আগের দিন মশাল নিয়ে, বাজনা বাজিয়ে উপবাসী ভক্ত্যারা কাছে দত্তপুকুরে স্নান করে গলায় মোটা সুতোর পৈতা ধারণ করেন। পরদিন ভোর হবার আগেই ধর্মতলায় প্রচুর কাঠ জড়ো করে অগ্নিকুণ্ড তৈরি করা হয়। অগ্নিকুণ্ড যখন জ্বলন্ত অঙ্গারে পরিণত হয় তখন ভক্ত্যারা অঞ্জলি ভরে সেই অঙ্গার ধর্মরাজের কাছে নিয়ে আসেন।

তারপর 'ব্যোম্ ব্যোম্' ও 'জয় বাবা ধর্মরাজের জয়' শব্দে চতুর্দিক প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে। পায়ে করে আগুন খেলা শুরু হয়। একে ফুলখেলা বলে। আগুনখেলার পর কাঁটাখেলা। একজন ভক্ত্যা চিত হয়ে শুয়ে পড়েন, আর একজন তাঁর বুকের উপর চাপানো সের আড়াই ওজনের শুব্‌নো কাঁটার উপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়েন। তারপর দু'জনে জড়াজড়ি করে মাটিতে গড়াতে থাকেন। ভক্ত্যারা একে-একে সকলেই এই কাঁটাখেলায় যোগদান করেন। এই সময় সজোরে ঢাক বাজতে থাকে। খেলা শেষ হলে ভক্ত্যাদের সমবেত নৃত্য শুরু হয়। বেলা একপ্রহরের সময় পূজা, হোম, যজ্ঞ ইত্যাদি হয়। আগে বলিদান হত, এখন হয় না। দ্বিপ্রহরে ধর্মরাজের মাথায় পদ্মফুল চড়ানো হয় এবং ভক্ত্যারা ভাঁড় মাথায় করে দাঁড়ান। ভাঁড়ের কণ্ঠে থাকে ফুলের মালা, ভিতরে থাকে পিটুলি-গোলা (মদ পরিণত হয়েছে পিটুলি-গোলায়)। পুরোহিত মন্ত্রপাঠ করে পদ্মগুলিকে ধর্মরাজের মাথায় সাজিয়ে দেন। প্রচণ্ড জোরে ঢাকঢোল বাজানো হয় এবং সাজানো পদ্ম থেকে একটি ফুল গড়িয়ে পড়ে। 'ফুলপড়া' বলে। মূল দেয়াসীর (ধর্মের পূজারীকে বীরভূমে 'দেয়াসী'—'দেবাংশী' বলে) ভাঁড়ের ভিতর ফুলটি দেওয়া হয়। তারপর বিরাট শোভাযাত্রা সহকারে বিভিন্ন পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে ভক্ত্যারা দত্তপুকুরের ঘাটে এসে উপস্থিত হন। কয়েক বছর আগেও এই শোভাযাত্রায় প্রচুর সং, পুতুল ইত্যাদি থাকত। নানারকমের বিচিত্র সব সং। এখন সাধারণত লাঠিখেলা ইত্যাদি হয়। মধ্যে মধ্যে আশপাশের গ্রামের ধর্মরাজতলা থেকে সং এসে সিউড়ীর শোভাযাত্রায় যোগদান করে। দত্তপুকুরের ঘাট থেকে গঙ্গাজল ও দুধভরা ভাঁড় মাথায় করে ভক্ত্যারা যখন ধর্মরাজতলার দিকে যাত্রা করেন, তখনও সং থাকে শোভাযাত্রায়। বাদ্যকাররা এই সময় প্রায় উন্মত্ত হয়ে ওঠে। শোভাযাত্রার সময় রাস্তার মধ্যেই কয়েকপদ অন্তর এক-একজন ভক্ত্যা ধরে তাঁর নাকে প্রচুর পরিমাণে ধূপের ধোঁয়া দেওয়া হয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই উপবাসী ভক্ত্যা মূর্ছা যান। সেই অবস্থায় তাঁকে ধরাধরি করে ধর্মরাজতলায় আনা হয়। বলা হয় 'ধর্মরাজের ভর হয়েছে।' এই সময় গরুর গাড়ির উপর চড়িয়ে নানারকমের সং শোভাযাত্রায় যোগদান করে। রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণের কাহিনী অবলম্বন করে তৈরি সং সাজানো হয়। আধুনিক সামাজিক সমস্যা নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেও সং গড়া হয়।

প্রায় সাতদিন ধরে উৎসব চলতে থাকে। ধর্মরাজের উৎসব উপলক্ষ্যে নানা রকমের সং ছাড়াও কবিগান, বাউলগান, যাত্রা ইত্যাদিও হয়। এরকম সমারোহ সচরাচর আর অন্য কোন উৎসবে হয় না বীরভূমে।

সিউড়ীর কথা বলেছি। তাও সব বলিনি। সিউড়ীর বিভিন্ন পাড়ার কথা বলা হয়নি, আশপাশের গ্রামের কথা বলিনি। বীরভূম জেলার আরও অনেক গ্রামে যেসব বিখ্যাত ও অখ্যাত ধর্মঠাকুর আছেন, তাঁদের কথাও বলা হয়নি। সিউড়ীর মধ্যেই বারুইপাড়া আছে। সেখানেও ধর্মঠাকুরের বারোয়ারী পূজা হয়। ভক্ত্যা হয় প্রধানত হাড়ি ও মাল জাতির লোকেরা। কিন্তু কোন স্বতন্ত্র 'দেয়াসী' নেই, ব্রাহ্মণেই পূজা করেন। সাধারণভাবেই পূজা হয়। কোন কোন বছর সং হয়। ভক্ত্যারা উপবাস করে ও ভাঁড়াল আনে। তাছাড়া আর বিশেষ কিছু উল্লেখযোগ্য হয় না। সিউড়ীর অনতিদূরেই করিধ্যা গ্রাম। করিধ্যা ও কালিপুর পাশাপাশি গ্রাম, তাঁতশিল্পের জন্য বিখ্যাত। করিধ্যায় ধর্মঠাকুর আছেন, টিনের চালাঘর আছে। কালিপুরেও ধর্মঠাকুর আছেন। করিধ্যায় যে পূর্ণিমায় পূজা হয়, তার পরের পূর্ণিমায় কালিপুরে হয়। কিছু কিছু সং হয়। দেবাংসী জাতিতে ডোম। সিউড়ী থানার অধীন পুরন্দরপুর ও লাঙ্গুলিয়া গ্রামেও ধর্মঠাকুরের পূজা হয়। পুরন্দর-পুরের ধর্মরাজ প্রস্তরখণ্ড, কাষ্ঠসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত। বৈশাখী বা জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমায় পূজা হয়। আগের দিন ভক্ত্যারা বাজনা বাজাতে বাজাতে একটা উন্মুক্ত স্থানে সমবেত হয়। সেখানে নাচগান বাজনা বাজী ইত্যাদির অনুষ্ঠান গভীর রাত পর্যন্ত হয়। পরদিন দুপুরে ভাঁড়াল আনা হয়। রাতে যাত্রাগান হয়। মধ্যে মধ্যে সং হয়। লাঙ্গুলিয়া গ্রামের ধর্মরাজের সেবায়েৎ ব্যগ্রক্ষত্রিয়, কিন্তু পূজারী ব্রাহ্মণ। ভগবতীর গৃহে ধর্মরাজ বারোমাস থাকেন। পুজোর সময় কাছের খোলা জায়গায় পুজো ও পাঁঠাবলি হয়। কিন্তু ধর্মরাজকে সেখানে ঘর থেকে বার করে আনা হয় না। ধর্মরাজের আলাদা কোন মন্দির বা গৃহ নেই। নামডাক আছে। পেটবেদনা, হাত-পা-ফোলার দেবতা হিসাবে। গাজন বা সং এখন আর হয় না। ওষুধ বিতরণ করা হয়।

সিউড়ী থেকে প্রায় বারো মাইল পশ্চিমে তাঁতিপাড়া গ্রাম, রাজনগর থানার মধ্যে। বিশাল সমৃদ্ধ গ্রাম, তন্তুবায়-প্রধান। বীরভূমের তাঁতশিল্পের অন্যতম কেন্দ্র। কাছাকাছি মাইল খানেকের মধ্যে ধানকুনে গ্রাম। দুই

গ্রামেই ধর্মরাজ আছেন এবং ধর্মরাজের জমকালো উৎসবও হয়। গ্রামের সর্বপ্রধান বারোয়ারী পূজাই এই ধর্মপূজা। পাশাপাশি গ্রামে প্রতিযোগিতা হয় ধর্মপূজার। গরুর গাড়ির উপর নানারকমের সব বিরাটাকার সং সাজিয়ে নিয়ে গ্রাম প্রদক্ষিণ করা হয়। বিচিত্র দৃশ্য, কদাচিৎ অন্য কোথাও দেখা যায়। প্রথমদিন শোভাযাত্রা হয় তাঁতিপাড়ার সং-এর, দ্বিতীয় দিন হয় ধানকুনের। গ্রামের কৃষক মহিন্দররা শোভাযাত্রায় গরুর গাড়ি টানা তাদের কর্তব্য বলে মনে করে! তাঁতিপাড়ার ধর্মরাজের দেয়াসী জাতিতে বণিক, ধানকুনের তন্তুবায়। ধর্মপূজায় এরকম সমারোহ বীরভূমের অন্য কোথাও বিশেষ হয় না। শুধু সং-এর জন্যই গ্রাম্য পূজায় আজও হাজার টাকার বেশি খরচা করা হয়।

খয়রাশোল থানার অধীন বাবুইজোড়, অবজরপুর, বড়রা, সিরে, ভাদুলে প্রভৃতি স্থানে ধর্মপূজা হয়। গ্রামদেবতাই ধর্মরাজ ঠাকুর। খয়রাশোল থানায় কদমডাঙ্গা গ্রামে এক বিচিত্র দেবতা আছেন, নাম 'মালঞ্চবুড়ী'। আর এক বুড়ী সিউড়ী শহরে বাউরীপাড়ায় আছেন, তিনি অপদেবতা, নাম 'ঝেঁটেনিবুড়ী।' ভক্তের ঘাড়ে ভর করে তার মুখ দিয়ে তিনি যে কোন লোকের ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান বলিয়ে ছাড়েন। কিন্তু মালঞ্চবুড়ী সেরকম কিছু নন। সিঁদুর-লেপা পাথরের খণ্ডই তাঁর মূর্তি, থাকেন তিনি খোলা জায়গায় গাছতলায়। বাহন তাঁর বাঘ। পয়লা মাঘ তাঁর পূজা হয়। পূজায় পাঁঠাবলিও হয়, আবার হরির লুটও হয়। গ্রামের প্রত্যেক বাড়ি পিছু একজোড়া করে মাটির ঘোড়া লাগে পূজায়। পূজার উপকরণ ঘোড়া, বুড়ীর বাহন বাঘ। চিন্তার খোরাক আছে অনেক।

'সিজেকড্ডাং' গ্রামের নাম। সংস্কৃত বাংলা অভিধানে এরকম কোন কথা বা শব্দ নেই। কিন্তু এরকম অনেক নাম বীরভূমের গ্রামের আছে (বর্ধমান, বাঁকুড়া, হুগলী, মেদিনীপুরেও আছে যথেষ্ট) যা কোন চলিত অভিধানে নেই। কোথায় কোন্ অস্ট্রিক, কি দ্রাবিড় ভাষার মূলে এইসব নামের উৎস লুকিয়ে আছে, তা খুঁজে বার করার সাধ্য আমার নেই। ভাষাতত্ত্বের অনুসন্ধানীরা রাঢ়দেশের গ্রামের নামের উৎস নিয়ে অনুসন্ধান করলে বাংলার সংস্কৃতির ইতিহাসের একটা গুপ্ত ও লুপ্ত অধ্যায় রচনা করতে পারেন বলে মনে হয়। যাই হোক, সিজেকড্ডাং গ্রাম সিউড়ীর মাইল পনের দক্ষিণে। ধর্মপূজা উপলক্ষ্যে বৈশাখী পূর্ণিমার সময় দিনদুই যাবৎ বিরাট একটি মেলা হয় এই

গ্রামে। মেলায় পাঁচ ছয় হাজার লোক সমাগম হয়। এখানকার ধর্মরাজের আরও একটি কারণে বিশেষ খ্যাতি আছে। হাঁপানি রোগ তিনি সারিয়ে দেন। পাঁচসিকার কবচ ধর্মরাজের নামে বারোমাসই দেওয়া হয় এবং হাঁপানির কবচ নিতে প্রচুর হেঁপোরুগীর আমদানি হয় সেখানে।

আর এক ধর্মরাজ আছেন, তিনি বাতরোগের বিশেষজ্ঞ। তিনি বেলের ধর্মঠাকুর। বেলে গ্রাম সাঁইথিয়া থানায়। আহ্‌মদপুর স্টেশনের মাইল দেড়েক দূরে। বেলের ধর্মরাজ অত্যন্ত জাগ্রত দেবতা বলে বীরভূমে তাঁর বিশেষ প্রসিদ্ধি আছে। একডাকে সকলে তাঁকে চেনেন। ধর্মের দেয়াসীরা বাতের ওষুধ দেন। পূজারী ব্রাহ্মণ, কিন্তু মধ্যে মধ্যে অন্য দেয়াসীরাও পূজা করেন। শোনা যায়, বেলের ধর্মরাজের বাতের ওষুধের নামডাক শুনে আগে নাকি বেতো সাহেবরাও আসতেন এখানে ওষুধ নিতে। পূজা হয় ধর্মরাজের বৈশাখী পূর্ণিমায়। পূজার দিন ধর্মরাজকে একটি কাঠের ঘোড়ার উপর চড়িয়ে নাচানো হয়। শেষরাত্রির দিকে ধর্মের মন্দিরের সামনে কতকগুলো আগাছা পুড়িয়ে তার উপর ভক্ত্যারা নাচে। তার নাম ফুলখেলা। পুজোর দিন সন্ধ্যায় বাণফোঁড়া হয়। প্রবাদ আছে যে, আষাঢ়ের প্রথম রবিবারে (প্রথম দিনে নয়) বেলের ধর্মরাজের কাছ থেকে ওষুধ নিলে সারা বছর আর বাতব্যাধিতে আক্রান্ত হতে হয় না। রবিবারটি কি ছুটির দিন বলে তার মাহাত্ম্য বেড়েছে? সেইজন্য প্রতি বছর আষাঢ়ের প্রথম রবিবারে বেলে অভিমুখে যাত্রীদের স্রোত বইতে থাকে। দেয়াসীদের কাছ থেকে বাতের ওষুধ নিয়ে যাত্রীরা আবার ফিরে যান।

সাঁইথিয়া থানায় ঈশ্বরপুর গ্রামে 'সুন্দর রায়' নামে এক ধর্মরাজ ঠাকুর আছেন। তাঁর নামে কয়েকবিঘা লাখেরাজ জমিও আছে। আগে পূজারী ছিলেন গন্ধবণিক, এখন ব্রাহ্মণ। বৈশাখী পূর্ণিমায় পূজা হয়। পূজা উপলক্ষ্যে চারদিন ধরে মনসার গান হয়, কারণ ধর্মরাজের সঙ্গে মনসাদেবীও আছেন। ঈশ্বরপুরের ধর্মরাজ 'সুন্দর রায়ের' পূজায় এই মনসার গান উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

'বড় সাংড়া'ও গ্রামের নাম, সিজেকড্‌াং-এর মতন। এ নামও কোন আর্যভাষার অভিধানে নেই। আহমদপুর থানার মধ্যে গ্রামটি। ধর্মরাজের নাম পুরন্দর। বৈশাখী পূর্ণিমায় পূজা হয়। ব্রাহ্মণে পূজা করেন। প্রথম

দিন উপবাসের পর, সন্ধ্যার সময় পরম ভক্ত্যার ভর হয়। ভর অবস্থায় তিনি পূজার অনুষ্ঠান সে-বছর কেমন হবে, ক'টা পাঁঠা লাগবে, ক'দল বাজনা দরকার, সারা বছর কে কি অপরাধ করেছে—ইত্যাদি ধরনের নানাকথা বলেন। দ্বিতীয় দিন সারাদিন উপবাসের পর সন্ধ্যার সময় ভক্ত্যারা 'বাণেশ্বরী'কে পুকুরঘাটে ধরাধরি করে নিয়ে যায়। 'বাণেশ্বরী' কোন ব্যক্তি নয়। 'বাণেশ্বরী' হল লৌহশলাকা-বিদ্ধ একটি কাঠের পাটাতন। সাধারণত সাতজন ভক্ত্যা ধরাধরি করে তাকে স্নান করাতে নিয়ে যায়। বাণেশ্বরীর সঙ্গে তারা পর-পর নয়বার স্নান করে, পরে নির্দিষ্ট স্থানে তারা বাণেশ্বরী স্থাপন করে। পূজার পর বাণেশ্বরীর উপর একজন ভক্ত্যা শুয়ে পড়ে এবং তাকে কাঁধে করে মন্দিরের মধ্যে আনা হয়। অন্যান্য ভক্ত্যারা স্নানান্তে নিজেদের দেহে বাণ ফোঁড়ে—পাঁজরবাণ, জিহ্বাবাণ ইত্যাদি। জিহ্বাবাণের দু'পাশে এবং পাঁজরবাণের সামনে কাপড় জড়িয়ে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। তার উপর মধ্যে মধ্যে ধূপ-ধুনা ছিটিয়ে ঢাক-ঢোল বাজাতে বাজাতে ধর্মরাজের মন্দিরের কাছে ভক্ত্যারা আসে। মন্দিরের কাছে এসে বাণগুলি খুলে ফেলা হয়। একে 'মুক্তিস্নান' বলে। রাত প্রায় দেড়টা-দুটোর সময় ধর্মরাজকে কাঠের ঘোড়ার উপর বসিয়ে কয়েকজন ভক্ত্যা সেই ঘোড়া কাঁধে করে পাশের মালিগ্রামে যায়। বড় সাংড়ার ধর্মরাজ যাওয়ার পর মালিগ্রামের ধর্মরাজ বেড়িয়ে আসেন। দুজন ধর্মরাজের মুখোমুখি দেখা হয়। অতঃপর বড় সাংড়ার ধর্মরাজ মালিগ্রাম থেকে শিববাঁধ গ্রামের ভিতর দিয়ে নিজের মন্দিরে ফিরে আসেন। এই অনুষ্ঠানটির নাম—'বন-বেড়া'। মনে হয় 'বনের মধ্যে বেড়ানো' থেকেই এই 'বনবেড়া' কথার প্রচলন হয়েছে। বনবেড়া অনুষ্ঠানের পর ভক্ত্যারা ফলজল খায়। তৃতীয় দিনও ভক্ত্যারা উপবাস করে থাকে। সকালে পুকুরঘাটে গিয়ে তারা ঘট ভরে। তারপর ঘট মাথায় নিয়ে এক-এক স্থানে দাঁড়ায়। ধূপের ধোঁয়া দিয়ে ও ঢাক পিটিয়ে ভক্ত্যাদের ক্রমে অচৈতন্য করে ফেলা হয়। ভক্ত্যাদের আত্মীয়স্বজনরা এসে অচৈতন্য অসাড় দেহগুলিকে তুলে দাঁড় করায় এবং ধর্মতলায় নিয়ে এসে মাথা থেকে ঘটগুলি নামিয়ে দেয়। তারপর ধর্মরাজের পূজা আরম্ভ হয়। পূজায় বলিদান হয় এবং পূজার পর ভক্ত্যারা বাইরে গিয়ে চড়ক অনুষ্ঠান করে। এছাড়া ইলামবাজার থানায় জয়দেব-কেঁদুলিতে, বোলপুর থানায় সুরুল ও অন্যান্য নানাস্থানে ধর্মপূজা হয়।

এককথায় যদি বলা যায় যে, ধর্মঠাকুরই বীরভূমের অন্যতম প্রধান 'গ্রামদেবতা' তাহলে ভুল হয় না। একই গ্রামে বিভিন্ন পাড়ায় একাধিক ধর্মঠাকুর আছেন, এরকম গ্রামের সংখ্যাও বীরভূমে কম নয়। পূর্বোক্ত বিবরণগুলি থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, ধর্মপূজার মধ্যে বীরভূম জেলায় বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য আছে যথেষ্ট। সিউড়ী, তাঁতিপাড়া, বেলে, সিজেকড্‌ডাং, বড় সাংড়া, ঈশ্বরপুর প্রভৃতি স্থানের ধর্মপূজার বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। প্রথম লক্ষণীয় হল—ধর্মপূজা অব্রাহ্মণদের মধ্যেই বেশি প্রচলিত, উৎসবটা প্রধানত তাদেরই। হাঁড়ি, ডোম, বাউরী, ধীবর প্রভৃতিদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রচলিত, তন্তুবায় বনিক কর্মকার প্রভৃতিদের মধ্যেও কম নয়। ক্রমে ব্রাহ্মণরা যে পূজারী হয়েছেন পরে, তাও অত্যন্ত স্পষ্ট। যেখানে পূজারী ব্রাহ্মণ হয়েছেন, সেখানে অব্রাহ্মণ কেউ সেবায়েৎ আছেন এখনও, দেয়াসী তো আছেনই। কোথাও বলিদান ও হরির লুট একসঙ্গেই হচ্ছে, কোথাও বলিদান বন্ধ হয়েছে। সংস্কৃতি-সংঘাত ও সংমিশ্রণের দৃষ্টান্ত এগুলি। দ্বিতীয় লক্ষণীয় হল—চড়ক, গাজন, বাণফোঁড়া ও সং ধর্মপূজানুষ্ঠানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। 'ভর' নামার ব্যাপারও উপেক্ষণীয় নয়। তৃতীয় লক্ষণীয়—ঘোড়া পূজার অন্যতম উপকরণ। চতুর্থ লক্ষণীয়—ধর্মরাজ সাধারণত মনসা, চণ্ডী বা কালী-সহ বিরাজ করেন। বৈশাখী পূর্ণিমায় সাধারণত পূজা হয়, প্রধানত প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে শ্রাবণ-পূর্ণিমা পর্যন্ত উৎসব বিস্তৃত হয়েছে। বীরভূমে প্রস্তরখণ্ডই ধর্মরাজ, মনসা, চণ্ডী ও কালী বলে পূজিত হন, কোন মূর্তি বিশেষ নেই। কোন কোন জায়গায় ধর্মরাজের কূর্মমূর্তি আছে।

অনুসন্ধানীর কাছে ধর্মপূজানুষ্ঠানের এই উপাদানগুলির সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক মূল্য খুব বেশি। এই সব উপাদানের উৎস বৌদ্ধযুগ ছাড়িয়েও আরও অনেক পশ্চাতে খুঁজতে হয়। তারপর বৌদ্ধযুগেও যে এই উৎসবের প্রাধান্য ছিল, তাও বুঝতে কষ্ট হয় না। পরবর্তীযুগে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি, তান্ত্রিক ও বৈষ্ণব সংস্কৃতির প্রভাব থেকেও ধর্মঠাকুর একেবারে যে মুক্ত হতে পারেননি, তাতেও কোন সন্দেহ নেই।
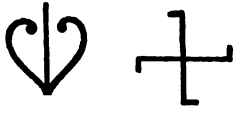
বর্ধমান

মানচিত্রের দিকে চেয়ে দেখলে বর্ধমান জেলাকে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যমণি বলে মনে হয়। উত্তর থেকে পশ্চিমে মানভূম ও বাঁকুড়া জেলা, আরও দক্ষিণে মেদিনীপুর ও হুগলী। উত্তর থেকে পুবে সাঁওতাল পরগণা, বীরভূম, আরও দক্ষিণে মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া সংলগ্ন। দক্ষিণ জুড়ে অনেকটা হুগলী এবং ভাগীরথীর পূর্বতীরে কিছুটা নদীয়া। মধ্যে অনেকটা হাতুড়ির মতন বর্ধমান জেলা বিরাজ করছে। হাতুড়ির হাতলটা হল আসানসোল মহকুমা, বাঁকুড়া ও বীরভূমের মধ্যে প্রসারিত বাহুর মতন। মনে হয়, সাঁওতাল পরগণা ও ছোটনাগপুর অঞ্চল থেকে প্রাগৈতিহাসিক সংস্কৃতিধারা বিচিত্র সব ঐতিহাসিক ধারার সঙ্গে মিলিত হয়ে অজয়, দামোদর ও বরাকর নদ-নদীর প্রবাহপথে বর্ধমানে এসে মিশেছে।

সম্প্রতি বর্ধমান জেলার দুর্গাপুর অঞ্চলে প্রাগৈতিহাসিক যুগের নানারকমের পাথরের অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গেছে বলে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। পাথুরে হাতিয়ারগুলি প্রস্তরযুগের সভ্যতার নিদর্শন বলে বিশেষজ্ঞরা অনুমান করেছেন। সংবাদে বলা হয়েছে যে, এর আগে গাঙ্গেয় উপত্যকায় প্রাগৈতিহাসিক প্রস্তরযুগের সভ্যতার কোন উল্লেখযোগ্য নিদর্শন বিশেষ পাওয়া যায়নি। কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নয়। দামোদরের বাঁধ নির্মাণের অনেক আগে সিংভূম, মানভূম, বাঁকুড়া, ঝাড়খণ্ড প্রভৃতি অঞ্চল থেকে একাধিক পাথুরে হাতিয়ার পাওয়া গেছে এবং বিশেষজ্ঞরা সেগুলি প্রস্তরযুগের সভ্যতার নিদর্শন বলে মনে করেছেন।

পরলোকগত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ননীগোপাল মজুমদার তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে এই অঞ্চলে খননকার্য চালিয়েছিলেন এবং নানারকমের পাথুরে হাতিয়ারের সন্ধান পেয়েছিলেন। পুরানো সংবাদটা নতুন করে প্রচার করা হয়েছে। আসল ব্যাপার হচ্ছে, প্রত্নতত্ত্ববিভাগ থেকে কোনদিন বাংলাদেশের ঐতিহাসিক অঞ্চলগুলিতে খনন ও অনুসন্ধানের কাজ সযত্নে পরিচালনা করা হয়নি এবং একাধিক বিশেষজ্ঞের অনুমান কতখানি প্রমাণসহ তা তাঁরা যাচাই করে দেখেননি। প্রত্নতত্ত্ববিভাগের বিস্ময়কর উদাসীনতার জন্য বাংলাদেশের সুদীর্ঘ ইতিহাসের অনেক পর্ব আজও প্রায় তমসাচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। তমলুক, কর্ণসুবর্ণ প্রভৃতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক অঞ্চলগুলিও যখন আজও উপেক্ষিত রয়েছে, তখন মাটির গভীর অন্ধকারে প্রাগৈতিহাসিক প্রস্তরসভ্যতার স্তরান্বেষণের আশা দুরাশা মাত্র। যাই হোক, নানাবিধ নিদর্শন আজ পর্যন্ত যা সংগৃহীত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে তা থেকে এইটুকু বোঝা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাস প্রাগৈতিহাসিক প্রস্তরযুগ পর্যন্ত বিস্তৃত এবং প্রস্তর, তাম্র-ব্রোঞ্জ, লৌহ প্রভৃতি যুগ অতিক্রম করে সে-সভ্যতা ঐতিহাসিক ধারার সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

প্রাচীন ইতিহাস আলোচনাকালে বর্ধমান জেলার বর্তমান মানচিত্রের কথা ভুলে গিয়ে, উত্তরাঞ্চলে ছোটনাগপুর ও সাঁওতাল পরগণার সংলগ্ন এক বিস্তৃত পার্বত্য ও অরণ্যভূমির কথা মনে করতে হবে। জেলার মানচিত্র বৃটিশ শাসকদের সুবিধার জন্য তৈরি হয়েছে, অনেক অদলবদলের পর। ইতিহাস তার অনেককাল আগেকার। বাঁকুড়া থেকে বীরভূমের পূর্বসীমান্ত পর্যন্ত পশ্চিমবাংলার যে উত্তরাঞ্চল, তারই অন্তর্ভুক্ত হল বর্তমান বর্ধমানের বরাকর আসানসোল, দুর্গাপুর, পানাগড়-কাঁকসা, মানকর-অমরারগড়, ভাল্কী, বুদবুদ, গৌরাঙ্গপুর, রাজগড়, গুস্করা, মঙ্গলকোট পর্যন্ত। এই অঞ্চলের পাথুরে মাটি ও অরণ্যভূমির সঙ্গে বর্ধমানবাসী অন্তত নিশ্চয় পরিচিত। এই অঞ্চলেই বন্য শিকারীরা বাস করত একসময়। দুর্গাপুরে পাথুরে মাটির কয়েক ফুট নিচে থেকে তাদেরই ব্যবহারের অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গেছে। আরও খুঁড়লে ভবিষ্যতে আরও পাওয়া যাবে। বাঘ-ভাল্লুকের উপদ্রব যে একসময় কিরকম ছিল এসব অঞ্চলে আজও পদে পদে তার আভাস পাওয়া যায়। দুর্গাপুরের শালবনের আঁকাবাঁকা পথে ঢুকলে আজও শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে, দল বেঁধে ছাড়া

বর্ধমান জেলা
সাঁওতাল পরগনা
বীরভূম
মুর্শিদাবাদ
বাঁকুড়া
হুগলী
বরাকর
আসানসোল
অণ্ডাল
কেঁদুলী
টেঁকুর
কাটোয়া
শ্রীখণ্ড
উজানি কোগ্রাম
মঙ্গলকোট
অমরারগড়
মানকর
দেনুড়
পাতুন
মন্তেশ্বর
কুড়মুন
বর্ধমান
বাঘনাপাড়া
কালনা
বাঁকুড়া
বিষ্ণুপুর
রায়না
জামালপুর
দামুন্যা
০ ৪ ৮ ১২ ১৬ মাইল
রেলপথ
রাস্তা-পথ
বাঁধ

যাওয়া যায় না। গৌরাঙ্গপুর, রাজগড়, শ্যামারূপার গড় অঞ্চলে ভ্রমণের সময় গ্রামবাসীরা হাতে দা ও কুঠার নিয়ে সামনে চলার পথ তৈরি করে গেছেন, আমি তাঁদের পশ্চাদনুসরণ করেছি। প্রাগৈতিহাসিক যুগে বন্য শিকারীরাই যে এখানে বাস করত, পশু শিকার করে, অরণ্যের ফলমূল সংগ্রহ করে জীবনধারণ করত, তা কল্পনা করতে আজও এতটুকু কষ্ট হয় না। দুর্গাপুরের অস্ত্রশস্ত্র আবিষ্কারে স্তম্ভিত হবার কিছু নেই। এ-অঞ্চল পলিমাটির তৈরি নয়, পাথুরে মাটির তৈরি এবং ভূতাত্ত্বিক যুগ পর্যন্ত তার অতীত ইতিহাস। এই বন্য শিকারীরাই পরে পশুপালন করতে শিখেছে এবং চাষবাস করেছে। হয়ত একদল পশুপালন করেছে, এবং আর একদল কৃষিকাজে মন দিয়েছে। বর্ধমান জেলার বর্তমান গোপদের আদিপুরুষ তারাই যারা সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগে প্রথম পশুপালন করে স্থায়ী ও উন্নত সভ্যতার স্তরে উন্নীত হয়েছিল। কৃষির পত্তন করেছিল যারা, তারাই বর্তমান সদ্‌গোপদের আদিপুরুষ। আর বর্ধমান জেলার এই অঞ্চলের নাম আজও তো পরগণা গোপভূম। পশুপালন ও কৃষিকাজ দুইই খাদ্য-উৎপাদন। সুতরাং প্রকৃতির উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে খাদ্য-সংগ্রহ করার যাযাবর স্তর থেকে প্রকৃতিকে জয় করে খাদ্য-উৎপাদন করার স্থায়ী সভ্য স্তরে উন্নীত হওয়ার পথে আদিম পশুপালক ও কৃষক উভয়েরই দান সমান, মর্যাদাও সমান। যাঁরা আর্যশ্রেষ্ঠতার মিথ্যা ধারণার বশবর্তী হয়ে নিজেদের আর্যোৎপত্তি প্রমাণ করতে চান, তাঁদের মনে রাখা উচিত যে, আর্যরা প্রধানত পশুপালক ছিলেন এবং কোন উন্নততর সভ্যতা বহন করে আনেননি। পশুপালনের চেয়ে কৃষিই উন্নততর স্তর, এ-ধারণা ভুল, নৃবিজ্ঞানীরা এমত সমর্থন করেন না। দীর্ঘকাল ধরে বন্য হিংস্র পশুর আচরণ ও স্বভাব লক্ষ্য করে তাকে বন্দী করার, পোষ-মানানোর ও পালন করার কৌশল আয়ত্ত করা এবং তার বংশবৃদ্ধি করে তার মাংস, দুধ ইত্যাদি খাদ্যের সংস্থান করা, চাষ করে ফসল ফলানোর চেয়ে কম যুগান্তকারী নয়। পশুপালনের তুলনায় কৃষিকে উন্নততর স্তর মনে করা মারাত্মক ভুল। কৃষি যেমন, পশুপালনও তেমনি স্থায়ী গ্রামীণ সভ্যতার বিকাশে সাহায্য করেছে। পার্বত্য অঞ্চলের কৃষককে যেমন ক্ষেত পুড়িয়ে নতুন ক্ষেতের সন্ধানে স্থানান্তরে যেতে হয়েছে, পশুপালককেও তেমনি চারণ ও পালনের জন্য মধ্যে মধ্যে বাসস্থান ছাড়তে হয়েছে। যাই হোক, গোপ ও সদ্‌গোপরাই পশ্চিমবাংলার

পশুপালন ও কৃষিসভ্যতার অন্যতম ধারক ও বাহক বলে মনে হয়। কে বড়, কে ছোট তাই নিয়ে তর্ক করা কুশিক্ষা ও কুসংস্কারের পরিচয় দেওয়া ছাড়া কিছু নয়। জাতিবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীর কাছে কোন জাতির ছোট-বড়ত্বের বা বিশুদ্ধতার অস্তিত্ব নেই। বর্ধমানের গোপভূম অঞ্চলে প্রাচীনকাল থেকে সদ্‌গোপ ও গোপদের পূর্বপুরুষদের প্রতিপত্তি ছিল যে তাতে কোন সন্দেহ নেই। বন্য যাযাবরের স্তর থেকে তাঁরা এই অঞ্চলের সভ্যতাকে পশুপালন ও কৃষির স্তরে উন্নীত করেছিলেন। দলপতি, গোষ্ঠীপতি ও কৌমপতি থেকে তাঁদের মধ্যে অনেকে পরে 'রাজা'ও হয়েছিলেন। গোপভূমের সদ্‌গোপ রাজবংশের ইতিহাস বর্ধমান তথা রাঢ়ের এক গৌরবময় যুগের ইতিহাস। আজও সেই অতীতের স্মৃতিচিহ্ন ভাল্কী, অমরার গড়, কাঁকসা, রাজগড়-গৌরাঙ্গপুর প্রভৃতি অঞ্চলে রয়েছে। বাংলার সংস্কৃতির ইতিহাসে সদ্‌গোপদের যে বিরাট দান আছে, আজও তার গুরুত্ব নির্ণয় করা হয়নি। গোপভূম অঞ্চলের একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে আমার মনে হয়েছে, বাংলার শৈবসাধনার অন্যতম ধারক ও বাহক তাঁরাই। শিবের উৎপত্তি সম্বন্ধে একই কিংবদন্তীর বিচিত্র বিস্তার দেখেছি এই অঞ্চলে ও তার আশেপাশে। সর্বত্রই গোপদের সঙ্গে শিবের উৎপত্তি জড়িত। গরু দুধ দিয়ে আসত জঙ্গলে, তারপর সেই জঙ্গল থেকে শিবের আবির্ভাব হল। গরুর মালিকই আবিষ্কার করলেন। এই কিংবদন্তীর গভীর তাৎপর্য আছে মনে হয়। শৈবসাধনার প্রতিপত্তি গোপভূমে খুব বেশি। শিবের সঙ্গে শক্তিও আছেন। ধর্মঠাকুরেরও অভাব নেই। মোট কথা, রাঢ়ের সংস্কৃতির যে বিশেষত্ব তাতে পশ্চিমবাংলার সদ্‌গোপদের দান আছে যথেষ্ট।

বর্ধমানের উগ্রক্ষত্রিয়দেরও সুপ্রাচীন ঐতিহ্য আছে। অনেকে মনে করেন, উগ্রক্ষত্রিয়রা বাংলার বাইরে থেকে অভিযাত্রী রাজাদের সঙ্গে যোদ্ধা হয়ে এদেশে এসেছিলেন। এই ধরনের যুক্তি অনেকটা অর্থহীন, কারণ বাইরে থেকে সকলেই প্রায় ভিতরে এসেছেন, সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে ঐতিহাসিক যুগ পর্যন্ত—নেগ্রিটোরা থেকে আরম্ভ করে আদিঅস্ট্রাল জাতির পূর্বপুরুষরা, দ্রাবিড় আর্য শক হুন পাঠান মোগল সকলেই। কথাটা তা নয়। উগ্রক্ষত্রিয়রা সম্পূর্ণ বাঙালী এবং বাংলাদেশেই তাঁদের বিকাশ হয়েছে। তাঁরা প্রধানত কৃষিজীবীই ছিলেন এবং প্রাচীনকালে শৌর্যবীর্যে তাঁদের সমকক্ষ জাতি

খুব বেশি ছিল না। আজও তার প্রভাব তাঁদের মধ্যে রয়েছে। গোষ্ঠীপতি ও দলপতি থেকে তাঁরাও বিভিন্ন অঞ্চলের রাজা হয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গে। হিন্দুযুগে আঞ্চলিক সামন্তরাজা ছাড়াও 'অগ্রহারিক' ও জমিদার ছিলেন, পরবর্তীকালের জায়গীরদারদের মতন। বৈদেশিক অভিযান ও যুদ্ধবিগ্রহের সময় তাঁরা নিজের দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য নির্ভয়ে সংগ্রাম করেছেন। তখনকার দিনে স্থানীয় সামন্তরাই ছিলেন স্বাধীন রাজার মতন। দেশরক্ষার ভার ছিল তাঁদের উপর। বাংলাদেশে অভিযান হয়েছে অসংখ্য এবং পশ্চিমবাংলার উপর দিয়েই তার বেশির ভাগ চোট গেছে। সদ্‌গোপ, মাহিষ্য, ব্যগ্রক্ষত্রিয়দের মধ্যে হিন্দুযুগে প্রায়-স্বাধীন সামন্তরাজা অনেকে ছিলেন পশ্চিমবঙ্গে—বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, বর্ধমান, বীরভূম প্রভৃতি অঞ্চলে। বর্ধমানের উগ্রক্ষত্রিয়রাও তাঁদের মধ্যে অন্যতম। আজও দেখা যায়, এঁরা অনেকেই শক্তির উপাসক, শাকম্ভরী, চণ্ডী, চামুণ্ডা, মহিষ-মর্দিনী প্রভৃতির। মুসলমানযুগেও এঁদের মধ্যে অনেকে রাজস্ব-আদায়কারী ছিলেন, স্থানীয় জমিদার ছিলেন। 'রায়', 'চৌধুরী' ইত্যাদি উপাধির মধ্যে তার প্রমাণ রয়েছে। বাংলার ঐতিহাসিক 'পাল-রাজবংশের' সঙ্গে উগ্র-ক্ষত্রিয়দের কোন সম্পর্ক আছে কি না, তাও অনুসন্ধানের যোগ্য। পাল রাজবংশের উৎপত্তি আজও রহস্যাবৃত হয়ে রয়েছে। পালরা বিদেশ থেকে এসেছিলেন, একথা আজ অনেক ঐতিহাসিক স্বীকার করেন না। অরাজকতার সময় কোন বিদেশীকে দেশের লোক উৎসাহী হয়ে রাজপদে নির্বাচন করত না। পাল রাজবংশের উৎপত্তি যদি বাংলাদেশেই হয়ে থাকে, তবে কোথায় হয়েছিল এবং সেই 'পাল'রা কারা? উগ্রক্ষত্রিয়দের ঐতিহ্যের কথা মনে হলে এ প্রশ্ন তাঁদের সম্পর্কে মনে জাগে। আজ একথাও তো অনেক ঐতিহাসিক বলছেন যে, বাংলাদেশের মুর্শিদাবাদ অঞ্চলেই গুপ্ত-রাজবংশের বিকাশ হয়েছিল।[১] 'পাল' রাজবংশের উৎপত্তি সম্বন্ধে এরকম অনুসন্ধান করলে ভবিষ্যতে হয়ত নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হবে।

বর্ধমানের প্রশস্ত বদ্বীপাংশে ব্যগ্রক্ষত্রিয়দের প্রাধান্য উল্লেখযোগ্য। বাংলার ইতিহাসে মাহিষ্য ও ব্যগ্রক্ষত্রিয়দের মৌলিক অবদান অপরিসীম। বাংলার ধীবর ও বাংলার চাষীদের পূর্বপুরুষরাই বাঙালীর সংস্কৃতির মূল উপাদানগুলি

---

১. ডাঃ ডি. সি. গাঙ্গুলি: ইণ্ডিয়ান হিস্টোরিকাল কোয়ার্টারলি: ১৪নং, পৃ ৫৩২—৫৩৫; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বাংলার ইতিহাস', ১ম, পরিশিষ্ট ১।

সরবরাহ করেছেন যে তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। বাংলার লোক-সাহিত্য, লোকসংস্কৃতি ও লোকশিল্পের মধ্যে তার অজস্র প্রমাণ রয়েছে। বর্ধমানের কথাই বলি। বর্ধমানের ব্যগ্রক্ষত্রিয়, বাউরী প্রভৃতিদের মধ্যে মনসা ও চণ্ডীর প্রতিপত্তি খুব বেশি এবং মনসা ও চণ্ডী নিয়ে বাংলার মঙ্গলকাব্য সমৃদ্ধ হয়েছে। ধর্মঠাকুরের ধর্মমঙ্গলও আছে। 'মনসামঙ্গল' সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য হল বিপ্রদাস ও বিজয়গুপ্ত ছাড়া অধিকাংশ মনসামঙ্গলের রচয়িতা রাঢ়ের লোক। বিপ্রদাসকেও রাঢ়ের প্রত্যক্ষ প্রভাব-সীমানার বাইরে ধরা যায় না। রাঢ়ের সাধারণ লোকের মধ্যে ক্ষেমানন্দ প্রভৃতির মনসার গান প্রচলিত। ক্ষেমানন্দের কাব্যে বেহুলার নিরুদ্দেশ যাত্রাপথে যেসব স্থানের উল্লেখ আছে তা সবই প্রায় বর্ধমান জেলার মধ্যে এবং দামোদরের প্রাচীন প্রবাহপথের চিহ্নাবশেষ বাঁকা, বেহুলা, বল্লুকা, গাঙ্গুরের তীরে তীরে অবস্থিত। এখনও এগুলি মনসাপূজার অন্যতম পীঠস্থান বলা চলে। যেমন—জুঝাটি, গোবিন্দপুর বর্ধমান, গাঙ্গপুর, দেপুর, নেয়াদা, কেঝুয়া, আমদপুর. হাসনহাটি, বৈগুপুর, পিড়তলী প্রভৃতি। নৃবিজ্ঞানীরা জানেন, কোন 'কাল্ট্' বা কোন 'টেকনিক' তার উৎপত্তিস্থল থেকে ক্রমে তরঙ্গায়িত হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে, যেমন জলে পাথরখণ্ড ফেললে তার ঢেউ চারিদিকে ছড়ায়। উৎসকেন্দ্রের কাছে সবচেয়ে তার প্রাধান্য বেশি হয়। বিশেষজ্ঞের ভাষায়:

> It is an axiom of anthropology that a given technique will spread normally, in a widening circle like the ripples caused by a pebble dropped into a pool. It will appear earliest, and its influence will be strongest near its point of origin.

এই কারণে মনে হয় পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষ করে বর্ধমানের এই অঞ্চলের কোথাও আদিম সর্পদেবতা, জাগুলী ও বিষহরির পূজা মনসাপূজার রূপ নিয়েছিল। সেন-আমলে যদি 'মনসা' নাম হয়ে থাকে, তাতেও এই অনুমান সত্য হবার সম্ভাবনা থাকে, কারণ সেনরা পশ্চিমবঙ্গেই প্রথম থেকে ছিলেন। প্রাগার্য যুগ থেকে হিন্দুযুগ পর্যন্ত মনসার ইতিহাস। বর্ধমানেরও তাই।

যাযাবর শিকারির স্তর থেকে পশুপালন ও কৃষিসভ্যতার স্তরের নিদর্শন বর্ধমানে পাওয়া গেছে। ব্রাত্য আর্যরা হয়ত জৈন ও বৌদ্ধযুগের আগে

থেকেই এই অঞ্চলে এসেছিলেন। জৈন ও বৌদ্ধযুগের সঙ্গে রাঢ়ের সম্পর্ক যে কত ঘনিষ্ঠ ছিল দু'হাজার আড়াই হাজার বছর আগে, আজ আমরা তা কল্পনা করতে পারব না। পার্শ্বনাথ পাহাড় বর্ধমানের বর্তমান সীমান্ত থেকে খুব বেশি দূরে নয়। জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর রাঢ় অঞ্চলে ধর্ম প্রচারের জন্য নিজে এসেছিলেন কিনা, তার সঠিক প্রমাণ নেই। তবে দক্ষিণ বিহারে তিনি যদি ভ্রমণ করে থাকেন তাহলে প্রাচীন বর্ধমানে আসা তাঁর পক্ষে বিচিত্র নয়। রাঢ়ের রূঢ় অধিবাসীরা তাঁর পশ্চাতে কুকুর লেলিয়ে দিয়েছিল। বর্ধমানের বাউরীদের অন্যতম টোটেম্ 'কুকুর' এবং বাউরীরা এই অঞ্চলের আদিবাসী। মহাবীর নিজে না এলেও, তাঁর জীবিতকালেই যে হাজার হাজার শিষ্য তাঁর ছিল তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ স্বচ্ছন্দে আসতে পারেন। জৈনদের শেষ তীর্থঙ্কর বর্ধমান-মহাবীরের নামেই এই অঞ্চলের নাম হয়ত বর্ধমান। এছাড়া 'বর্ধমান' নামের উৎপত্তি সহজে ব্যাখ্যা করা যায় না। জাতক ও তাঁর পরিবারবর্গের শ্রীবৃদ্ধি কামনায় মহাবীরের জন্মনাম 'বর্ধমান' রাখা হয়। সেই নামেরই স্মৃতি বহন করছে 'বর্ধমান' জেলা। জৈনদের নিদর্শন বর্ধমান ও তার পরিপার্শ্ব থেকে অনেক পাওয়া গেছে, তীর্থঙ্করদের প্রস্তরমূর্তি। সুতরাং নামের মূল কারণ সত্য হবারই সম্ভাবনা।

জৈন ও বৌদ্ধযুগের পরবর্তীকালের প্রচুর নিদর্শন বর্ধমানে পাওয়া গেছে—গোপচন্দ্রের ও গুপ্তদের যুগ থেকে সেনযুগ পর্যন্ত। সুতরাং হিন্দুযুগের সভ্যতার সমস্ত ধারা যে বর্ধমানের উপর দিয়ে বয়ে গেছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। বৈষ্ণব, শৈব, বৌদ্ধ (পালযুগের) ও তান্ত্রিকধারার বিচিত্র মিলন-মিশ্রণ হয়েছে বর্ধমানে। পরবর্তীকালে মুসলমানযুগে বর্ধমানের ঐতিহাসিক ভূমিকার কথা অনেকেই জানেন। বখ্তিয়ারের পশ্চাদনুগমন করেছিলেন যাঁরা, বর্ধমানের উপর দিয়েই তাঁরা গিয়েছিলেন। মোগলযুগেও বর্ধমান অন্যতম ঐতিহাসিক ক্ষেত্র ছিল। বর্ধমান জেলায় বহু বনেদী মুসলমান বংশের বাস আছে যেমন, তেমনি মুসলমানযুগের সাংস্কৃতিক নিদর্শনেরও অভাব নেই। প্রসিদ্ধ পীর ও ফকির অনেক আছেন বর্ধমানে। তারপর বণিকের ছদ্মবেশে এসে ইংরেজরা যেমন রাজা হয়েছিলেন, তেমনি বর্ধমানের রাজারাও বণিকের বেশে পাঞ্জাব থেকে এসে মোগলযুগে জমিদার এবং ইংরেজযুগে মহারাজাধিরাজ পর্যন্ত হন। রাজকীয় বিলাসিতা ও বদান্যতার নিদর্শন

তাঁদের বর্ধমানে প্রচুর আছে। ঐতিহাসিক নিয়মে আজ তার অধিকাংশই অবলুপ্তির পথে। আজ বর্ধমানে যে নতুন যুগের অভ্যুদয় হচ্ছে, ভবিষ্যতের ঐতিহাসিক তার ইতিহাস রচনা করবেন।

গাঙ্গেয় উপত্যকার প্রস্তরযুগের সভ্যতার সীমানার মধ্যে যে বর্ধমানের অনেকটা অংশ ছিল, দুর্গাপুরের ভূগর্ভস্থ নিদর্শন থেকে তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ভাস্কর্য ও সাহিত্যের বিক্ষিপ্ত নিদর্শন থেকে জৈন ও বৌদ্ধযুগের প্রবাহের যে চিহ্ন পাওয়া যায়, তাও উপেক্ষণীয় নয়। গুপ্তযুগেরও নিদর্শন বর্ধমান থেকে পাওয়া গেছে, তার মধ্যে মশাগ্রামের প্রথম চন্দ্রগুপ্তের মুদ্রা উল্লেখযোগ্য। শশাঙ্কের কর্ণসুবর্ণ রাজ্যেরও অন্তর্ভুক্ত ছিল বর্ধমান। পাল ও সেন রাজ্যের তো ছিলই। কিন্তু মুসলমান-রাজত্বকালে, বাংলার ইতিহাসে বর্ধমান একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল এবং এই মুসলমান যুগেই বাংলার সাংস্কৃতিতে বর্ধমানের দান খুব বেশি। তার মধ্যে 'বৈষ্ণব সাহিত্যে' বোধ হয় সবচেয়ে বেশি। নবদ্বীপ ছাড়া শ্রীখণ্ড, কাটোয়া, কালনা, দেনুড়, ঝামটপুর, বাগনাপাড়া প্রভৃতি বৈষ্ণবদের ঐতিহাসিক স্থান অধিকাংশই বর্ধমানে এবং কেশবভারতী, নরহরি সরকার, বৃন্দাবনদাস, লোচনদাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, গৌরীদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতি বর্ধমানবাসী।

বর্ধমানের নাম প্রথমে সঠিকভাবে জানা যায় মুসলমানযুগে। মোগলসৈন্য যখন দাউদ কররাণীকে বাংলাদেশ থেকে উড়িষ্যার দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন টাণ্ডা (মালদহ জেলায়, গৌড়ের কাছে) প্রধান ঘাঁটি হলেও, বর্ধমান ছিল অগ্রগামী মোগলসৈন্যের সম্মুখ-ঘাঁটি। ১৫৭৪-'৭৫ সালের কথা। রাজা তোডরমল নিজে মোগলসৈন্যদের পরিচালনার ভার নিয়েছিলেন তখন। বিজয়ী মোগলসৈন্যের পদধ্বনিতে তখন বর্ধমান শহর থেকে গড়-মন্দারণ পর্যন্ত পথ কেঁপে উঠেছিল এবং দাউদ কররাণী মন্দারণ (আরামবাগ, হুগলী) থেকে মেদিনীপুরের ভিতর দিয়ে উড়িষ্যার দিকে পালাচ্ছিলেন। রাজা তোডরমলের এই অভিযানের স্মৃতি ছাড়াও সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়া থেকে একাধিক মোগল শাসকের স্মৃতিবিজড়িত বর্ধমান শহর। কুতবউদ্দীন, শের আফগান, আজিমুখান, আলিবর্দী খাঁ সকলকেই বর্ধমান শহরে বাস করতে হয়েছিল একদিন। সম্রাট আকবরের মৃত্যুর পর

জাহাঙ্গীর মানসিংহকে পাঠালেন তৃতীয়বার বাংলার সুবাদার করে। এই সময় বাদ্‌শাহ জাহাঙ্গীরের জীবনের রোমান্টিক নায়িকা নূরজাহান ছিলেন বর্ধমান শহরে এবং বর্ধমানের তুর্কী জায়গীরদার শের আফগানের প্রিয়তমা বিবি তখন তিনি। অর্থাৎ পরস্ত্রী। রাজসিংহাসনে বসেও জাহাঙ্গীরের মনে তাই শান্তি ছিল না। সারা ভারতবর্ষের মধ্যে বর্ধমান শহরের কথাই তখন তাঁর সব সময় মনে হত। কি করে নূরজাহানকে পাওয়া যায়, বর্ধমান শহরের এক জায়গীরদারপত্নীকে কেমন করে আগ্রায় নিয়ে এসে হিন্দুস্থানের সম্রাজ্ঞী করা যায়—এই ছিল জাহাঙ্গীরের একমাত্র চিন্তা। দরদী কুতবউদ্দীন খাঁ-র সঙ্গে তিনি মতলব করলেন, জোর করেই নূরজাহানকে ছিনিয়ে আনবেন। কুতবউদ্দীন খাঁকে সেই উদ্দেশ্যে সুবাদার করে পাঠালেন বাংলাদেশে এবং মানসিংহকে বিহারে সরিয়ে দিলেন। নানাভাবে চক্রান্ত করে কুতবউদ্দীন চেষ্টা করলেন শের আফগানকে হত্যা করতে। ব্যর্থ হলেন। অবশেষে সামনা-সামনি লড়াই হল। বর্তমান বর্ধমান রেলস্টেশনের কাছাকাছি কোন স্থানে এই লড়াই হয়েছিল। লড়াইয়ে শের ও কুতব উভয়েই নিহত হন। দু'জনকেই পাশাপাশি কবর দেওয়া হয়। বর্ধমান শহরের একদিকে সেই প্রস্তরমণ্ডিত কবর দু'টি রয়েছে—শের আফগানের ও কুতবউদ্দীনের। কবরের সামনে দাঁড়িয়ে মনে হয়—হতভাগ্য শের আফগান! আর মনে হয়, যাঁর রূপে পৃথিবী আলোকিত হয়ে উঠত এবং যিনি বিলাসপ্রিয় জাহাঙ্গীরের রাজ্যপরিচালনার ভার নিজের হাতে নিয়েছিলেন, সেই ভারতসম্রাজ্ঞী নূরজাহান একদিন বর্ধমান শহরের ক্ষুদ্র আকাশেই তারকার মতন বিরাজ করতেন, সামান্য জায়গীরদার-পত্নীরূপে।

সম্রাট শাজাহান কুমারজীবনে বিদ্রোহী হয়ে বর্ধমান শহর দখল করেছিলেন। শোভা সিং ও রহিম খাঁও বিদ্রোহ করে বর্ধমান শহরে নিহত হন। সম্রাট ঔরঙ্গজীব তাঁর পুত্র আজিমুশ্বানকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করেন এবং ১৬৯৭ সালে আজিমুশ্বান বর্ধমান শহরে আসেন। বর্ধমান শহরেই প্রায় তিন বছর তিনি থাকেন। মোগল আমল তখন অস্তাচলে। রাজ্যের মধ্যে শৃঙ্খলা নেই। কলকাতা, চন্দননগর ও চুঁচুড়ায় এই সময় ইউরোপীয় বণিকদের দুর্গ গড়ার অনুমতি দেওয়া হয় আত্মরক্ষার জন্য। ১৬৯৮ সালের জুলাই মাসে আজিমুশ্বান সুতানুটি, কলকাতা ও গোবিন্দপুর নামে তিনটি গ্রামের

জমিদারীস্বত্ব ১৬,০০০৲ টাকা নজর নিয়ে, স্থানীয় জমিদারের কাছ থেকে তাঁদের কিনে নেবার অনুমতি দেন। কলকাতা শহর তথা বৃটিশ সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন হয় বর্ধমান শহর থেকে।

কটক থেকে ফেরার পথে আলিবর্দী খাঁ আরামবাগের 'মুবারক মঞ্জিলে' শুনলেন যে, নাগপুর থেকে একটি মারাঠাবাহিনী পঞ্চকোট পার হয়ে এসে বর্ধমান জেলায় লুণ্ঠনাভিযান চালিয়েছে। ১৭৪২ সালের ১৫ই এপ্রিল নবাব আলিবর্দী খাঁ বর্ধমান শহরে উপস্থিত হন, মারাঠা অভিযান প্রতিরোধ করার জন্য। পরদিন সকালে তিনি শোনেন যে, মারাঠা অশ্বারোহী সৈন্য বর্ধমান শহর ঘেরাও করে ফেলেছে। প্রায় এক সপ্তাহ আলিবর্দী খাঁ তাঁর সৈন্যসামন্ত নিয়ে বর্ধমানে থাকতে বাধ্য হন, বন্দী অবস্থায়। তারপর লড়াই করতে করতে কাটোয়া হয়ে মুর্শিদাবাদ যাবার চেষ্টা করেন। এই সময় বর্ধমান শহরের আশেপাশে, বর্ধমান থেকে কাটোয়ার পথে চারিদিকের গ্রামাঞ্চলে বর্গীরা যে অত্যাচর করে তা অবর্ণনীয়। বাংলাদেশের দুরন্ত ছেলেরা আজও যে বর্গীর ভয়ে ঘুমিয়ে পড়ে তার ঐতিহাসিক কারণ আছে। পশ্চিমবাংলায় নবাবী শাসন বেশ কিছুদিনের জন্য প্রায় শেষ হয়ে যায় বলা চলে। এই সময় হুগলী, বর্ধমান, বীরভূম প্রভৃতি অঞ্চল থেকে স্থানীয় বহু বনেদী পরিবার ভাগীরথীর পূর্বতীরে পালিয়ে এসে বসবাস করতে আরম্ভ করেন। একটা সামাজিক বিপর্যয় হয়ে যায় পশ্চিম-বাংলায়।

অগ্রগামী ইতিহাসের এইরকম অনেক পদচিহ্ন আছে বর্ধমান শহরে ও বর্ধমান জেলায়—মুসলমানযুগ থেকে বৃটিশযুগ পর্যন্ত। বর্ধমান শহরে মুসলমান সুবাদার ও নবাবরা বসবাস করতেন না। একমাত্র আজিমুশ্বান ছিলেন প্রায় তিন বছর। কিন্তু তাহলেও তাঁরা মধ্যে মধ্যে পশ্চিমবাংলার প্রাণকেন্দ্র বর্ধমানে যে আসতে বাধ্য হতেন এবং কিছুদিন করে থাকতেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কোথায় থাকতেন তাঁরা? তার কোন চিহ্ন নেই বর্ধমান শহরে বা তার আশেপাশে। কোথায় ছিল তাঁদের সেই প্রাসাদ ও বাসভবন? বর্ধমানবাসী নিশ্চয় জানতে চাইবেন, আফগান জায়গীরদার বীর শের আফগান কোথায় বাস করতেন? কোথায় সেই জীর্ণ গৃহের পরিত্যক্ত কক্ষ, যেখানে একদিন নূরজাহান ছিলেন? কেউ বলতে পারেন না। বর্ধমান শহর ও তার

আশেপাশে জীর্ণ অট্টালিকা অনেক আছে, কিন্তু তার কোন ইতিহাস জানা নেই। বাকি যা প্রাসাদ, দীঘি ও প্রমোদ-উদ্যান ইত্যাদি আছে বর্ধমানে, তা সবই প্রায় বর্ধমানের মহারাজাদের কীর্তিস্তম্ভ। নবাবী আমলের কোন উল্লেখযোগ্য বাস্তু নিদর্শন নেই, ইট পাথরের নিদর্শন। একটি মসজিদ আছে বর্ধমান শহরে—নবাব আজিমুশ্বানের আদেশে তৈরি, নবাবী আমলের অন্যতম নিদর্শন। এছাড়া, বাকি সব বোধ হয় আশেপাশে কোথাও জঙ্গলে বা মাটির তলায় চাপা পড়ে আছে। অথবা বারংবার বিদ্রোহীদের দুর্ধর্ষ অভিযানে (শোভা সিং, রহিম খাঁ প্রভৃতি) এবং বর্গীদের অত্যাচারে সেই সব কীর্তিস্তম্ভ হয়ত ধ্বংস হয়ে গেছে। তারই ইট পাথর দিয়ে হয়ত অন্যান্য অট্টালিকা তৈরি হয়েছে। এমনও হতে পারে যে বাংলার নবাবরা ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে প্রাসাদবহুল কোন দ্বিতীয় রাজধানী গড়ে তোলা যুক্তিসম্মত বিবেচনা করেননি, নিরাপদ নয় মনে করে।

আজিমুশ্বানের মসজিদ, শের আফগান ও কুতবউদ্দীনের কবর ছাড়া বর্ধমান শহরে পীর বহরমের স্থানটিও উল্লেখযোগ্য। আকবর বাদ্‌শাহের রাজত্বকালে পীর বহরম এদেশে আসেন এবং আবুল ফজল ও ফৈজির চক্রান্তে নাকি রাজধানী ছেড়ে বাংলাদেশে বর্ধমানে চলে আসতে বাধ্য হন। বর্ধমান শহরে পৌঁছবার কয়েকদিনের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়। শহরের প্রান্তে জয়পাল নামে একজন বিখ্যাত হিন্দু সাধুর সঙ্গে পরিচয় হয় পীর বহরমের। তাঁরা পরস্পরের গুণমুগ্ধ হয়ে ওঠেন। মুসলমান পীর ও হিন্দু সাধুর আধ্যাত্মিক মৈত্রীবন্ধন দৃঢ় হয়, সাধক জয়পাল অভিভূত হয়ে পীর বহরমের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। বর্ধমান শহরের প্রান্তে দুই হিন্দু মুসলমান সাধুর একাত্মতার স্মৃতিচিহ্ন আজও রয়েছে দেখা যায়। পীর বহরম ও জয়পালের নাম হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে সকলে শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারণ করে থাকেন।

বাংলার বিখ্যাত শাক্তসাধক কমলাকান্তের উপাস্য দেবী ও উপাসনার স্থান আছে বর্ধমান শহরে। রামপ্রসাদ ও কমলাকান্ত—বাংলার শক্তিসাধনার দুই জনপ্রিয় সাধক ও চারণ-কবি, একজন হালিশহরের, আর একজন বর্ধমানের। বর্ধমান-সংলগ্ন কাঞ্চননগর গোবিন্দদাসের স্মৃতিবিজড়িত বলে অনেকে মনে করেন। বর্তমানে আমরা বাংলাদেশের যে কয়েকটি বিদ্যাসুন্দর কাব্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত তার মধ্যে গোবিন্দদাসের কাব্যটি প্রাচীনতম মনে হয়।

বিদ্যাসুন্দর কাব্য তাঁর কালিকামঙ্গলের অন্তর্গত একটি উপাখ্যান। গোবিন্দ-দাসের বিদ্যার জন্মভূমি 'রত্নপুর', কৃষ্ণরামের বিদ্যার জন্মভূমি বীরসিংহের রাজধানী 'বীরসিংহপুর' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দরের স্থান উজ্জয়িনী। ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ, বলরাম, রাধাকান্ত 'বর্ধমান' বলে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং বর্ধমান কেন্দ্র করে বিদ্যাসুন্দরের কাহিনীও পল্লবিত হয়ে উঠেছে এবং স্থানীয় লোক বিদ্যা ও সুন্দরের স্মৃতিবিজড়িত স্থানগুলিও আমাকে দেখিয়েছেন। দেখতে দেখতে মনে হয়েছে, সংস্কৃতের 'উজ্জয়িনী' কিভাবে ও কেন বাংলার 'বর্ধমানে' পরিণত হল। ভারতচন্দ্রের কাব্যে বলা হয়েছে, বর্ধমানের রাজা বীরসিংহের কন্যা বিদ্যা স্বয়ং পণ করেছেন, তাঁকে যিনি বিদ্যায় পরাস্ত করতে পারবেন, তিনিই তাঁর পাত হবেন। বিদ্যার বিবাহের জন্য রাজা চিন্তিত হয়ে পড়লেন। শেষে লোকমুখে কাঞ্চীদেশের রাজা গুণসিন্ধু রায়ের পুত্র সুন্দরের সংবাদ পেয়ে তিনি ভাট পাঠালেন পত্র দিয়ে। ভাটের পত্র পেয়ে সুন্দরের ইচ্ছা হল বর্ধমান আসার। সুন্দর ঠিক করলেন :

একা যাব বর্ধমান করিয়া যতন।
যতন নহিলে কোথা মিলয়ে রতন ॥

সুন্দর কালীসাধনা করলেন। দেবী বললেন :

চল বাছা বর্ধমান বিদ্যালাভ হবে।

কে সুন্দর, কোথাকার সুন্দর, কে বিদ্যা, কোথাকার বিদ্যা, তার কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি থাকুক বা না থাকুক, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যের 'গড়বর্ণন' ও 'পুরবর্ণন' থেকে, প্রায় দু'শ বছর আগেকার বর্ধমান শহরের মূল্যবান ঐতিহাসিক পরিচয় পাওয়া যায়। মধ্যযুগের নগরের সমস্ত বৈশিষ্ট্য যে বর্ধমানের ছিল তা ভারতচন্দ্রের গড় ও পুরবর্ণনা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়। গড়খাই-প্রধান বর্ধমানের ছয়টি গড় বর্ণনা করেছেন ভারতচন্দ্র :

প্রথম গড়েতে কোলাপোষের নিবাস।
ইঙ্গরেজ ওলন্দাজ ফিরিঙ্গি ফরাস॥
দ্বিতীয় গড়েতে দেখে যত মুসলমান।
সৈয়দ মল্লিক শেখ মোগল পাঠান ॥
তৃতীয় গড়েতে দেখে ক্ষত্রিয় সকল।
অস্ত্রশাস্ত্রে বিশারদ সমরে অটল ॥

চতুর্থ গড়েতে দেখে যত রাজপুত।
পঞ্চম গড়েতে দেখে যতেক রাহুত ॥
ষষ্ঠ গড়ে দেখে যত বোঁদেলার থান।
সেই গড়ে নানা জাতি বৈসে মহাজন ॥

—ইত্যাদি

বর্ধমান শহরের চমৎকার চিত্র এই বর্ণনার মধ্যে ফুটে উঠেছে। পুরবর্ণনার সামাজিক চিত্রটি আরও সুন্দর। যেমন—

ব্রাহ্মণ মণ্ডলে দেখে বেদ অধ্যয়ন।
ব্যাকরণ অলঙ্কার স্মৃতি দরশন ॥
ঘরে ঘরে দেবালয় শঙ্খঘণ্টারব।
শিবপূজা চণ্ডীপাঠ যজ্ঞ মহোৎসব ॥
বৈদ্য দেখে নাড়ী ধরি কহে ব্যাধিভেদ…
কায়স্থ বিবিধ জাতি দেখে রোজগারি…
আগরি প্রভৃতি আর নাগরী যতেক…
কোল কলু ব্যাধ বেদে মাল বাজীকর…
অবধূত জটাভস্মধারী সারি সারি ॥

সমাজ-জীবনের নিখুঁত ছবি। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, শিব চণ্ডী ও ভবানীর পূজারী, বৈদ্য কায়স্থ উগ্রক্ষত্রিয় প্রভৃতি নাগরিক, অবধূত কোল ব্যাধ বেদে মাল বাজীকর ইত্যাদি বিভিন্ন জাতিসম্প্রদায়ের বাস ছিল বর্ধমান শহরে। মধ্যযুগীয় নগরের মতন এক একটি অঞ্চলের মধ্যে তাঁদের প্রাধান্য গণ্ডিবদ্ধ ছিল। আধুনিক জীবনযাত্রার টানে নবাবী আমলের সেই সব নাগরিক বৈশিষ্ট্য বর্ধমান শহরে আর দেখা যায় না।

মধ্যযুগের আর একটি উল্লেখযোগ্য সামাজিক স্মৃতিচিহ্ন বর্ধমান শহরের উপান্তে রয়েছে—সতীদাহের বিস্ময়কর স্মৃতিচিহ্ন। অনেকেই জানেন না। 'সতীর মাঠ' নামে পরিচিত স্থানটি। একেবারে পাড়ার লোক ছাড়া বাইরের লোক অনেকেই সতীর মাঠের কথা ভুলে গেছেন। বিরাট একটি বাগান এবং প্রধানত আমগাছের বাগানই যে সতীদাহের স্থান ছিল তা পরিষ্কার বোঝা যায়। আমগাছের তলা সতীদাহের ও সহমরণের শ্রেষ্ঠ স্থান। অনেক সতী-মন্দির আছে এখানে, এখন গভীর জঙ্গলে পরিপূর্ণ। অনেক মন্দির ভগ্নস্তূপে

পরিণত হয়েছে। দেখলে মনে হয়, সতীমন্দিরগুলি দু'তিনশ বছরের পুরানো। মোগলযুগে সপ্তদশ শতাব্দীতেও যে সতীদাহের ও সহমরণের কি রকম প্রাধান্য ছিল এদেশে, তা বার্ণিয়ের ও অন্যান্য পর্যটকদের প্রত্যক্ষ ভ্রমণবৃত্তান্ত থেকে জানা যায়। মনে হয়, তখন থেকেই বর্ধমান শহরের উপকণ্ঠের এই স্থানটি সতীদাহের কেন্দ্ররূপে পরিচিতি লাভ করে এবং ক্রমে 'সতীর মাঠ' নাম হয় তার। একসময়ে এই স্থানটি ধর্মান্ধ মানুষের কাছে পবিত্র স্থান ছিল নিশ্চয়। আজ সেই কুসংস্কারের বেদনাময় কীর্তিস্তম্ভগুলি ধুলোয় মিশে যাচ্ছে। ইতিহাসের অগ্রগতির পথে অতীতের সেই মর্মান্তিক স্মৃতিবিজড়িত 'সতীর মাঠ' আজ বর্ধমানবাসীর চেতনা থেকে পর্যন্ত লুপ্ত হয়ে গেছে। হওয়াই স্বাভাবিক।

অমরাগড়

প্রাচীন গোপভূমের অন্তর্গত অমরাগড়। স্টেশন থেকে মাইল দুই দূরে। সদ্‌গোপ-রাজা মহেন্দ্রনাথ (মাহিন্দি রাজা বলে কথিত) তাঁর মহিষী অমরাবতীর নামে দুর্গের নামকরণ করেন অমরার গড়। গড় বা দুর্গের কোন চিহ্ন নেই আজ। গড়ের রেখা আছে, ঢাকা। জীর্ণ দেবালয় আছে, আর রাজবংশের কুলদেবতা আছেন। রাজা নেই, রাজ্যও নেই। শূন্য নামের প্রতিধ্বনি আছে ফাঁকা মাঠে—হাতশালা (হাতিশালা), ভাল্লুকশোল (ভালুক-শালা), রঙ্গাল (রঙ্গালয়), ধলার (ধনাগার), মরাইতলা। বাংলার অধুনালুপ্ত সদ্‌গোপ-রাজবংশের নিরবয়ব সাক্ষী।

গোপভূমের রাজাদের ইতিহাস কোথাও লেখা নেই। এরকম অনেক রাজার কোন ইতিহাস জানা নেই, জানবার চেষ্টাও করা হয়নি। বাংলার ইতিহাসের এই সব শূন্য স্থান যতদিন না পূর্ণ করা হবে, ততদিন বাঙালীর মনে অনেক প্রশ্ন জাগবে এবং তার কোন সদুত্তর কোন ঐতিহাসিকই দিতে পারবেন না। যেমন 'বর্ধমান' প্রসঙ্গে বলেছি, পালরাজবংশের কথা। পাল রাজারা যদি বাংলাদেশের বাইরে থেকে উড়ে এসে জুড়ে না বসে থাকেন, তাহলে তাঁদের আসল পরিচয় পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করা উচিত। তাঁরা যদি ব্রাহ্মণ বৈদ্য বা কায়স্থ রাজবংশ না হন, তাহলে তাঁদের লুপ্ত বংশ-পরিচয়ও জানা প্রয়োজন। বর্ধমান জেলার নানাস্থানে ভ্রমণের সময় লোকমুখে দু'টি কথা খুব বেশি শুনেছি। উগ্রক্ষত্রিয়দের মধ্যে যাঁরা ইতিহাস সম্বন্ধে বিশেষ কৌতূহলী তাঁরা বলেন, পালরাজারা সম্ভবত উগ্রক্ষত্রিয় ছিলেন। 'উগ্রক্ষত্রিয়' সম্বন্ধে কয়েকখানি কুলগ্রন্থেও এই কথার উল্লেখ দেখেছি; তার মধ্যে শ্রীহরিচরণ বন্ধুর 'উগ্রক্ষত্রিয়' একটি। সদ্‌গোপরা বলেন যে, পালরাজারা সদ্‌গোপবংশীয় ছিলেন। শ্রীশরৎচন্দ্র ঘোষের 'সদ্‌গোপ-তত্ত্ব' (দুই খণ্ড), শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমারের 'সদ্‌গোপ জাতির ইতিহাস' ইত্যাদি গ্রন্থে এ বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। এগুলি প্রামাণিক ইতিহাস নয়, কুলপঞ্জী ও কিংবদন্তী থেকে রচিত। তাহলেও ঐতিহাসিকের কাছে উপেক্ষণীয় নয়। কোন কাহিনী, প্রবাদ বা কল্পনা যখন জনচিত্তে শিকড় বিস্তার করে, তখন মাটিতেও তার মূল থাকা

সম্ভবপর। উগ্রক্ষত্রিয় বা সদ্‌গোপ, কারও দাবি বা যুক্তি 'ঐতিহাসিক' নাও হতে পারে। তথ্য ও প্রমাণের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের কুলপঞ্জীর প্রমাণ বা কিংবদন্তীর সাক্ষী 'ইতিহাস' বলে গ্রহণ করা যায় না। তবু সদ্‌গোপ-রাজবংশ একাধিক ছিল রাঢ়দেশে এবং পালবংশ তার মধ্যে অন্যতম। মেদিনীপুরের নারায়ণগড় রাজবংশ সম্বন্ধে প্রবাদ আছে, এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা গন্ধর্বপাল গড় অমরাবতীর কাছে দিগ্‌নগর গ্রামে জন্মেছিলেন এবং সেখান থেকে এসে নারায়ণগড়ে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। গড়-অমরাবতী বা অমরার গড় ও দিগ্‌নগর দুই-ই বর্ধমানে। অমরার গড়ের পাঁচ ছয় মাইল পূর্ব-উত্তরে ভাল্কী, ভাল্কীর মাইল চারেক দক্ষিণে দিগ্‌নগর। সবটাই গোপভূমের মধ্যে। নারায়ণগড় রাজবংশের কুলপঞ্জীতেও এই কথা বলা হয়েছে। মেদিনীপুরের কর্ণগড় রাজবংশ সম্বন্ধেও প্রবাদ আছে যে, তাঁরা জাতিতে সদ্‌গোপ এবং বর্ধমান জেলার নীলপুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। কেউ কেউ বলেন, তাঁরা ক্ষত্রিয়-সন্তান।[১] কিন্তু বাংলার সামন্ত রাজাদের 'ক্ষত্রিয়ত্বের' দাবির যৌক্তিকতা সম্বন্ধে ইতিহাসের ছাত্রদের নতুন করে কিছু বলার নেই। রাজবংশ হলেই 'ক্ষত্রিয়' হতে হবে এবং উত্তরভারত থেকে আসতে হবে, এরকম একটা বিজাতীয় ধারণার আশ্রয় নিয়েছিলেন এদেশের রাজারা আত্ম-মর্যাদা বৃদ্ধির আশায়। সামাজিক জাতিভেদপ্রথা তার জন্য দায়ী। যাই হোক, এরকম একাধিক সদ্‌গোপ-রাজবংশ রাঢ়দেশে ছিলেন এবং তাঁরা দূরে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। বর্ধমান জেলার গোপভূম পরগণা সদ্‌গোপরাজ্যের অতীত স্মৃতি আজও বহন করছে। ভাল্কী, অমরার গড়, কাঁকসা, দিগ্‌নগর, ঢেক্করী-ঢেকুর (গৌরাঙ্গপুর), মঙ্গলকোট, নীলপুর প্রভৃতি স্থানের সদ্‌গোপ-রাজবংশের রাজাদের (পালবংশ-সহ) এই সুদীর্ঘ ইতিহাস থেকে মনে হয় বাংলার পাল-রাজবংশের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্কের দাবি অন্তত অনুসন্ধানের যোগ্য, উপেক্ষণীয় নয়। উগ্রক্ষত্রিয়দের সম্পর্কেও এই কথা বলা যায়।

ভাল্কীর ও অমরার গড়ের সদ্‌গোপরাজবংশের উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক কিংবদন্তী আছে। তাঁদের কুলপঞ্জীর মধ্যেও পার্থক্য আছে দেখা যায়। সুতরাং সঠিক ইতিহাস কিছু জানবার উপায় নেই। তবু কিংবদন্তী ও কুলপঞ্জীর কথা সামান্য কিছুও হয়ত ঐতিহাসিকদের কাছে গ্রাহ্য বা বিবেচ্য

১ ত্রৈলোক্যনাথ পালের ও যোগেশচন্দ্র বসুর 'মেদিনীপুর ইতিহাস' দ্রষ্টব্য।

হতে পারে মনে করে এখানে উল্লেখ করছি। ভল্লুপাদ (ভল্লুপদ, ভল্লুকপদ) নামে এক ঋষি ছিলেন। ভাল্লুকপালিত বা ভাল্লুকাকৃতি বলে নাম ভল্লুপাদ। আনুমানিক দশম-একাদশ শতাব্দীতে তিনি গোপভূমে যে-স্থানে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন, তারই নাম 'ভাল্কী'। বাহুবলে তিনি অনেক দেশ জয় করেন। তাঁর পুত্র গোপাল। তাঁর পৌত্র (মতান্তরে প্রপৌত্র) হলেন অমরার গড়ের বিখ্যাত মহেন্দ্র-রাজা। মহেন্দ্রের রাজ্য কাটোয়া থেকে পঞ্চকোট পর্যন্ত নাকি বিস্তৃত ছিল। স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে মহেন্দ্র রাজা খেজুরডিহির উগ্রক্ষত্রিয় জগৎসিংহের বাড়ি থেকে জোর করে দশভুজা সিংহবাহিনী দেবীমূর্তি নিয়ে এসে নিজের বাড়িতে স্থাপন করেন। সেই দেবীর নামই শিবাখ্যা দেবী। এই শিবাখ্যা দেবীই এই বংশের কুলদেবতারূপে অমরার গড়ে পূজিত হন। রাজা মহেন্দ্রের দুই রানী (কেউ বলেন, তিন রানী) ছিলেন এবং তাঁর দুই কন্যা ছিল— কালিন্দী ও যমুনা। এক কন্যার বংশ হল সিউড়ের রাজবংশ, আর এক কন্যার বংশ কাঁকসার রাজবংশ। তৃতীয়া রানীর সন্তানের বংশ দিগ্‌নগরের বংশ বলে কথিত। প্রবাদ আছে, রাজা লাউসেন ঢেকুরের ইছাই ঘোষকে যুদ্ধে পরাজিত করে মহেন্দ্রের রাজ্যবিস্তারে সাহায্য করেন। রাজা মহেন্দ্র পরে নিজের রাজ্য দুই ভাগে ভাগ করে দেন। একভাগের রাজধানী অমরার গড়, অন্যভাগের রাজধানী হল দিগ্‌নগর। এই বংশগুলিই পরে 'ভাল্কীর খোঁচ', 'দিগনগুরে খোঁচ', 'কাঁকসার খোঁচ' বলে পরিচিত হয়। কাঁকসার রাজবংশের রাজ্য আনুমানিক ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীতে ধ্বংস হয়ে যায়। সৈয়দ বোখারী কাঁকসার গড় ও দুর্গ দখল করে রাজাকে হত্যা করেন এবং জমিদারী মুসলমানদের 'আয়মা' দেন। কাঁকসা অঞ্চলের আয়মাদার মুসলমানরা তাঁদেরই বংশধর। অমরার গড়ের রাজকীয় অস্তিত্ব প্রায় সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত ছিল। বর্ধমানের রাজাদের সঙ্গে গোপভূমের (অমরার গড়) সদ্‌গোপরাজাদের প্রচণ্ড যুদ্ধ হয় এবং তাঁরা শেষ পর্যন্ত পরাজিত হন। বাংলাদেশে মোগল অধিকারকালে এই ঘটনা ঘটে বলে মনে হয়। বর্ধমানের জমিদার রাজারা তখন থেকেই ক্রমে প্রতিপত্তিশালী হয়ে ওঠেন।

অমরার গড়ে এখন গড় নেই, দুর্গ নেই, রাজবাড়িও নেই। কিন্তু গ্রাম প্রদক্ষিণ করলে পরিষ্কার বোঝা যায়, হঠাৎ-গজিয়ে-ওঠা কোন গ্রাম নয়,

বহু প্রাচীন গণ্ডগ্রাম অমরার গড়। হাতিশালা, ভাল্লুকশালা, রঙ্গালয়, ধনাগার, মরাইতলা নামে যে সব মাঠের দিকে গ্রামবাসীরা আঙুল দিয়ে দেখান, সেখানে উঁচু উঁচু মাটির ঢিবি ও স্তূপ আছে প্রচুর এবং ইটের গাথুনিও সমাধিস্থ হয়ে আছে যথেষ্ট। ইতিহাস যে একটা কিছু আছে এবং অনেক-দিনের প্রাচীন ইতিহাস, তা বেশ বোঝা যায়। ভূগর্ভে যা আত্মগোপন করে আছে তাকে পুনরুদ্ধার করতে হলে কোদাল-কুড়াল নিয়ে মাটি খোঁড়ার দরকার। কিন্তু খুঁড়ছে কে?

সদ্গোপবংশীয় গ্রামবৃদ্ধদের কাছ থেকে অমরার গড়ের একটি কাহিনী শুনেছি, যা আমার কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে। কথায় কথায় একজন প্রবীণ ব্যক্তি বললেন পূর্বে এঁরা ভাল্লুক পুষতেন, পালন করতেন। 'ভাল্লুকশাল' কথা থেকেও তার প্রমাণ পাওয়া যায়। আরও চমকপ্রদ হল, তিনি বললেন, ভাল্লুক মরলে তাঁরা অশৌচ পালন করতেন, হাঁড়ি ফেলতে হত পর্যন্ত। এখন ভাল্লুকও নেই, অশৌচও কেউ পালন করেন না। গোপভূমের রাজবংশের এই সংস্কারের বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য কি, তা সংস্কৃতি-বিজ্ঞানীরা সহজেই বুঝতে পারবেন। ভাল্লুক টোটেম এবং ভাল্লুক সম্পর্কে সমস্ত কাহিনী পশুপালক-সমাজের নিদর্শন। পশুপালন ও চাষবাস গোপভূমে একই সময়ে বিকাশ হওয়া মোটেই আশ্চর্য নয়। তা ছাড়া কৃষি যাঁদের পেশা, পশুপালন যে তাঁদের বৃত্তি নয়, তাও ঠিক নয়। পশুপালন আর্যভাষীদেরও প্রধান বৃত্তি ছিল। আজও কি কৃষকরা পশুপালন করেন না এবং হিন্দু সমাজে পশুপালনের মর্যাদা নেই? যথেষ্ট আছে। তাহলেই অমরার গড়ের সদ্গোপ-রাজবংশের এই সংস্কারের ঐতিহাসিক তাৎপর্য অসাধারণ। কথায় কথায় গ্রামবৃদ্ধরা যখন বললেন, তখন চোখের সামনে অতীত ইতিহাসের অন্দর-মহল যেন খুলে গেল মনে হল।

অমরার গড়ে পুরাতন দেবালয় আছে অনেক। দেবদেবীও অনেক আছেন। কুলদেবতা শিবাখ্যা দেবী আছেন, দুগ্ধেশ্বর শিব আছেন। সাধারণ ইটের বাংলা-মন্দিরে বিরাজ করেন। পঞ্চরত্ন নারায়ণ-মন্দির আছে অপূর্ব কারুকার্য-খচিত। রাঢ়দেশের বাংলা ঘরের মডেলে তৈরি একটি সুন্দর দুর্গামন্দির আছে, যা সচরাচর দেখা যায় না। ঠিক এই ধরনের মন্দিরের গড়ন এই অঞ্চলে আর কোথাও দেখিনি। কাঁকসা রাজবংশের কুলদেবতা কঙ্কেশ্বর

মহাদেব, অনাদিলিঙ্গ। ‘জীবতকুণ্ড’ নামে এক পুষ্করিণীর পাড়ে কঙ্কেশ্বরের মন্দির প্রতিষ্ঠিত। প্রায় পঞ্চাশ ষাট বছর আগে কাঁকসাবাসী মালিক আবদুল সত্তার, শোনা যায়, এই পুকুরের পাড়ের জমি খুঁড়েছিলেন এবং ভাঙা ইঁট, স্তম্ভ ও পাথরের দেবদেবীর মূর্তি পেয়েছিলেন অনেক। এখনও এখানকার অধিবাসীরা বলেন যে, দেবদেবীর মূর্তি খোঁজ করলে পাওয়া যায়, তবে জঙ্গল ভেদ করে সন্ধান করা কঠিন। কাঁকসার বংশধররা অন্যান্য আরও অনেক স্থানে বাস করেন এবং তাঁদের মধ্যে অনেকে মনসাদেবীকে কুলদেবী বলে পূজা করেন। শিব-শক্তি ও মনসার উপাসনা সদ্‌গোপরাজবংশের অন্যতম বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে রাঢ় অঞ্চলে অধিকাংশ শিবের উৎপত্তি সম্বন্ধে কিংবদন্তীটি বিশেষভাবে স্মরণীয়। একই কিংবদন্তী যখন কোন স্থানে একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে, তখন তার ঐতিহাসিক মূল্য কোন সন্ধানীই অস্বীকার করতে পারেন না। বনে গিয়ে গরুর দুধ দেওয়া এবং গোপদের স্বপ্ন দেওয়ার সঙ্গে শিবের উৎপত্তির যে গভীর সম্পর্ক দেখা যায়, তা রাঢ়ের সংস্কৃতির ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়। এ সম্বন্ধে আরও অনুসন্ধান করলে হয়ত আমরা বাংলার শৈব ও শাক্ত-ধর্মের বিকাশের ধারা সম্বন্ধে অনেক অজানা কথা জানতে পারি।

সদ্‌গোপ রাজাদের শৌর্যবীর্যের ঐতিহ্যাশ্রিত কাহিনীও গোপভূমের সর্বত্র যথেষ্ট শোনা যায়। তার মধ্যে অমরার গড়ের ‘মাহিন্দি রাজার’ বীরত্বের কাহিনী অন্যতম। এই ধরনের কাহিনী অবলম্বন করে দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বৃহৎ ‘শিবাখ্যা-কিঙ্কর কাব্য’ রচনা করেছিলেন। কাব্যগ্রন্থখানি লোকসমাজে আদৌ পরিচিত নয়, কারণ কাব্যমূল্য তার বিশেষ নেই। তবু এরকম একখানি বৃহৎ কাব্যগ্রন্থ অমরার গড় কেন্দ্র করে রচিত হয়েছিল এবং বাংলা ১৩১৯ সনে ‘জন্মভূমি প্রেস’ থেকে ছাপা হয়েছিল ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। গ্রন্থারম্ভে কবি শিবাখ্যা দেবীকে বন্দনা করেছেন :

এসো দেবি! মহামায়া শিবাখ্যা জননী,
তোমার প্রসাদে মাগো ধরিনু লেখনী।

মহেন্দ্র রাজার অনেক বীরত্বের কাহিনী এই কাব্যে আছে। অমরার গড়ে অনেক রাজা অভিযান করেছেন এবং বীর রাজা ও তাঁর বীর যোদ্ধারা জীবনপণ করে দেশরক্ষা করেছেন—

অমরার গড় পরিখা বেষ্টিত
নিতান্ত দুর্ভেদ্য জগতে বিদিত,
প্রবেশের পথ, রোধি মহারথ
থাকিবে সতত হয়ে সতর্কিত,
যাবৎ না শত্রু হয় প্রতাড়িত

মহেন্দ্র রাজার বংশবিবরণও আছে এই কাব্যে—

শোন মহারাজ শোন দিয়া মন
কহি মহেন্দ্রের বংশ-বিবরণ,
পিতামহ তার ক্ষত্রিয় কুমার
ভল্লুপদ নাম জানে সর্বজন,
ভল্লুকে তাহারে করিল পালন।···
জাতীয় প্রকৃতি লুকাবার নয়,
শৈশবে সে শিশু নির্ভয় হৃদয়,
মৃগয়া করিত, শ্বাপদ বধিত,
বনের বরাহ করিয়া বিজয়,···

ক্ষত্রিয়-বাতিক বাদ দিলেও, গোপভূমের অনেক কথা এই কাব্য থেকে জানা যায়। বোঝা যায়, রাঢ়ের সদ্‌গোপদের ইতিহাস দীর্ঘকালের ইতিহাস এবং প্রাচীন বনেদী সদ্‌গোপ-বংশের মধ্যে বর্ধমানের সদ্‌গোপরা অন্যতম। বর্ধমানের গোপভূম থেকে—ভাল্কী, অমরার গড়, দিগ্‌নগর, কাঁকসা প্রভৃতি অঞ্চল তাঁদের আদি বসবাসকেন্দ্র কিনা বলা যায় না। তবে এই অঞ্চলের রাজবংশ ও কুলীন সদ্‌গোপ-বংশীয়রাই বাংলার অন্যান্য স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করেছিলেন বলে মনে হয়। বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে নয় শুধু, সাংস্কৃতিক ইতিহাসেও যে সদ্‌গোপদের যথেষ্ট মূল্যবান দান আছে, তা তাঁদের ধর্মকর্ম ও ধ্যানধারণা থেকে আজও পরিষ্কার বোঝা যায়। অমরার গড় বাংলার সদ্‌গোপদের এই প্রাচীন ইতিহাস ও ঐতিহ্যের স্মৃতি বহন করছে—এ যুগের বিষণ্ণ পরিবেশে।

মানকর

পাল ভট্চাজ খাঁ

তিন নিয়ে মানকর গাঁ

—এককালে বর্ধমান জেলার গৌরব ছিল। এখন মানকর বলে চেনা যায় না, এমনকি বিখ্যাত মানকরের কদ্‌মা দেখেও না। চোদ্দ মণ ময়দা লাগত যে মানকরের ব্রাহ্মণদের খাওয়াতে, সেই মানকর পরে মড়কে প্রায় মহাশ্মশানে পরিণত হয়েছিল। পঞ্চাশ বছর আগেও প্রায় সাতশ ঘর ব্রাহ্মণ ও সাতশ ঘর তন্তুবায় বাস করতেন মানকরে। ব্রাহ্মণরা বিদ্যাচর্চা করতেন, আর তাঁতিরা তাঁত বুনতেন। শিল্পকলায় যেমন, পাণ্ডিত্যেও তেমনি অতুলনীয় ছিল মানকর। সারা মানকর গ্রাম চষে ফেললেও এখন আর কেউ তা বুঝতে পারবেন না। ভগ্ন বাস্তুভিটের রুগ্ন ঘুঘুর দিকে চেয়ে হঠাৎ হয়ত মনে হবে—কি ছিল, কি যেন হারিয়ে গেছে। ভিটের পর ভিটে, পরিত্যক্ত, জঙ্গলাকীর্ণ, জনশূন্য। একদা সুপ্রসন্ন মানকর গ্রাম আজ বিষণ্ণতায় ম্লান।

সবার আগে মনে হয় মানকরের শিল্পী ও বণিকদের কথা। মানকরের গ্রাম্যসমাজের কি পাকাপোক্ত অর্থনৈতিক বনিয়াদই না ছিল এক সময়! ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে আজ। আধুনিক যুগের আক্রোশ মেটাতে হতভাগ্য মানকর সর্বস্বান্ত হয়ে গেছে, অথচ কোন আশীর্বাদই তার পায়নি সে। রিক্ত মানকর তার তন্তুবায়দের কথা ভাবে, প্রায় হাজার তাঁতের ধ্বনি যখন প্রতিধ্বনিত হত তার বুকে। মানকরের 'বেনারসী চেলী'র কথা আজ হয়ত সোনার পাথর-বাটির মতনই শোনাবে কানে, কিন্তু এককালে ছিল। মানকরেই তৈরি হত 'বেনারসী চেলী'। মানকরের তসর ছিল বিখ্যাত। আজ তসরের 'ত' পর্যন্ত নেই। মানকরের 'বিশ্বাস'দের পূর্বপুরুষ মহেশ বিশ্বাস পলু-পোকার চাষ সম্বন্ধে 'কীট-কৌতুক' নামে একখানা বইও লিখেছিলেন, আজ সে-বই দেখলাম পোকায় কেটে ঝাঁঝরা করে দিয়েছে। বিশ্বাস মশায়ের মুখের বুলিই ছিল—

পরে তসর, খায় ঘি

তার আবার খরচ কি?

আজ হয়ত হেঁয়ালি মনে হবে, একসময় প্রবাদের মতন চালু ছিল কথাটা।

মানকরের ‘কুতুনি’র নামডাক ছিল খুব। একদিকে রেশমের নক্‌শা, অন্যদিকে সুতোয় নক্‌শা-করা কাপড়কে বলত ‘কুতুনি’। মানকরের বয়ন-শিল্পীদের একচেটে ব্যবসা ছিল ‘মুগো সুতো’র (মাছ ধরবার সুতো)। বাংলাদেশের মধ্যে প্রধানত মানকরেই এই মুগো সুতো তৈরি হত। মানকরের কর্মকাররা গহনার ‘ডাইস্’ তৈরি করতেন, যা বাংলাদেশে আর কোথাও বিশেষ হত না। কর্মকারদের কারিগরির নমুনা স্বচক্ষে দেখে এসেছি মানকরে। যে-কোন সূক্ষ্ম যন্ত্রের সূক্ষ্মতম কলকজা পর্যন্ত তৈরি করতে পারেন ঘরে বসে, এ-রকম কর্মকার এখনও মানকর গ্রামে একজন আছেন। একসময় একাধিক ছিলেন। মানকরের তাম্বুলীরা ধান-চালের আড়তদারি করে লক্ষপতি হয়েছিলেন, তাম্বুলীপাড়ার বড় বড় অট্টালিকাগুলি তার সাক্ষী রয়েছে আজও। বিখ্যাত ‘গোপীনাথ দত্তের’ তামাক মানকরের। হিতলাল মিশ্রের মতন ভক্ত, পণ্ডিত, গীতাভাষ্য-কারেরও একাধিক নীলকুঠি ছিল। তাম্বুলীরাও নীলচাষ করতেন। এ সব ‘আজি হতে শত বর্ষ’ নয় শুধু, ‘শত শত বর্ষ’ আগেকার কথা। তখন মানকরের সুসমৃদ্ধ শ্রী ছিল। কৃষক, কারিগর, কুটিরশিল্পী, বণিক, জমিদার, সাধক, ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, বৈদ্য ইত্যাদি নিয়ে মানকরের বিরাট গ্রাম্যসমাজ আত্মনির্ভর ছিল সম্পূর্ণ। শোনা যায়, আঠারো পাড়া নিয়ে ছিল এই গ্রাম্যসমাজ। এখন পাড়ার নাম আছে, পাড়া বলতে যা বুঝায় তা আর নেই।

মানকর কতদিনের প্রাচীন গ্রাম তা অবশ্য সঠিকভাবে বলা কঠিন। ‘পৌষমুনির ডাঙা’ ও ‘পাণ্ডবক্ষেত্র’ দেখিয়ে গ্রামবাসীরা যে কিংবদন্তীর কথা বলেন, তা আরও অনেক গ্রামে শুনেছি ও দেখেছি। তা দিয়ে ঐতিহাসিক প্রাচীনত্ব নির্ধারণ করা যায় না। তবে মানকর যে গোপভূম পরগণার অন্তর্গত ছিল তাতে সন্দেহ নেই এবং কোন সদ্‌গোপ রাজার রাজ্যভুক্ত থাকাই সম্ভবপর। পালযুগেও এই অঞ্চলে প্রবল প্রতিপত্তিশালী সদ্‌গোপ সামন্তদের অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। এ-রকম কোন সামন্ত রাজার রাজ্য-সীমানার মধ্যে হয়ত ‘মানকর’ও একটি গ্রাম ছিল। কি রকম গ্রাম ছিল, কি তার নাম ছিল, তার কোন প্রামাণিক হদিশ পাওয়া যায় না। কোন নিদর্শনও বিশেষ নেই পাল বা সেন যুগের। প্রাচীন দেবালয় আছে অনেক মানকরে, কিন্তু দু’শ আড়াই’শ বছরের বেশি প্রাচীন নয়। উপাসক ও সাধক সম্প্রদায়ের মধ্যে সামান্য কিছু ইতিহাসের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। শৈব ও তান্ত্রিক ধর্মের অন্যতম

কেন্দ্র যে ছিল মানকর, তা আজও বেশ বোঝা যায়। এই ধর্মাচরণের ধারা বেশ প্রাচীন বলেই মনে হয়। মানকরের গ্রামদেবতা মানকেশ্বর শিব আছেন এবং তাঁরও উৎপত্তির সঙ্গে সেই একই গোপ-কাহিনী জড়িত। এ-কাহিনীর যে রীতিমত গুরুত্ব আছে, একথা আগেও বলেছি। সুপ্রাচীন 'বুড়ো শিব' আছেন। শৈবধর্মের সঙ্গে গোপভূমের সদ্‌গোপদের একটা কোন ঐতিহাসিক সম্পর্ক থাকা সম্ভব বলে মনে হয়। একথা অনেকবার বলেছি। মানকরের একদিকে আজও সদ্‌গোপদের বাস আছে। মনে হয়, একসময় মানকরের ইতিহাসে তাঁদের বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল, হয়ত হিন্দুযুগেই। তারও আগে গ্রামের প্রধান ছিল যারা, তারা আজ নগণ্য অবস্থায় মানকরের চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে—বাউরী, মেটে, হাড়ি, ডোম ইত্যাদি। আর মুসলমানযুগের সাক্ষী রয়েছে মুসলমানপাড়া। গোপভূমে মুসলমান অভিযানের সময় এবং কাঁকসা প্রভৃতি অঞ্চলের সদ্‌গোপ রাজবংশের উচ্ছেদের সময় মানকরের যে কোন ভূমিকাই ছিল না, তা মনে হয় না।

শক্তি পূজারও প্রাধান্য ছিল একসময় মানকরে। মানকরের বৈদ্য-কবিরাজদের কুলদেবী আনন্দময়ী শক্তিমূর্তি। পঞ্চকালী ও বড়কালীও মানকরে বিখ্যাত। বড়কালীর প্রতিষ্ঠাতা রামানন্দ গোস্বামী পঞ্চমুণ্ডির আসন করে সিদ্ধিলাভ করেন। এ-ছাড়া মানকরের 'রাধাবল্লভের মন্দির' আছে, বর্ধমানের মহারাজা কীর্তিচন্দ্রের দীক্ষাগুরু ভক্তলাল গোস্বামী প্রতিষ্ঠিত। এই কনৌজ ব্রাহ্মণবংশই মানকর-রায়পুরের প্রধান জমিদার। রাধাবল্লভ মন্দির প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে এই বংশের হস্তলিখিত বংশ-পরিচয়ে লেখা আছে ঃ

"এই ভগবন্মূর্তি উপস্থিত নবরত্ন মন্দিরে স্থাপন ক্রিয়োপলক্ষে মহাত্মা ভক্তলাল কর্তৃক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত নিমন্ত্রণ বিষয়ীক লিখিত পত্র দ্বারায় এই বিগ্রহ প্রকাশের মূল বিবরণের সংক্ষেপ বার্তার সহিত সন ১১৩৫ সালের উত্তরায়ণ সংক্রান্তির দিবস এই ভগবন্মূর্তি উপস্থিত নবরত্ন মন্দিরে স্থাপিত হইবার বৃত্তান্ত স্পষ্টই প্রকাশ আছে।"

এই বংশের ইতিহাসের সঙ্গে মানকরের ইতিহাসও অনেকটা জড়িত বলে সে সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। এঁদের গৃহে সংরক্ষিত হাতে-লেখা বংশপরিচয় থেকে যেটুকু বিবরণ সংগ্রহ করতে পেরেছি তাই বলছি। এই বংশের পূর্ব-পুরুষদের মধ্যে বদলে দুবে, মনোরথ দুবে ও শ্রীকান্ত দুবের নাম পাওয়া যায়।

শ্রীকান্ত রাধাবল্লভী সম্প্রদায়ের কাছে দীক্ষা নিয়ে চন্দ্রকোণায় (মেদিনীপুর) আসেন। তারপর মধুসূদন গোস্বামী, নিহারীদাস ও শ্যামসুন্দর গোস্বামী। শ্যামসুন্দর বর্ধমানের রাজা জগৎরাম রায় ও তাঁর রানীকে দীক্ষা দেন এবং মানকরের পাশে খাণ্ডারী গ্রামে এসে বসবাস করেন। তাঁর পুত্র ভক্তলাল গোস্বামী মহারাজা কীর্তিচন্দ্র ও চিত্রসেনকে দীক্ষা দেন এবং ১১২৯ সনে রায়পুর গ্রাম (মানকরের একাংশ) ব্রহ্মোত্তর পান। ভক্তলালের প্রপৌত্র অজিতলাল গোস্বামী এবং অজিতলালের দৌহিত্র হিতলাল মিশ্র। হিতলালের দৌহিত্র রাজকৃষ্ণ দীক্ষিত। ১৯০৫ সালের স্বদেশী আন্দোলনের সময় রাজকৃষ্ণ দীক্ষিত তখনকার বাংলার জমিদারের মধ্যে সর্বপ্রথম কারাবরণ করেন। হিতলাল মিশ্র শুধু যে জমিদার ও নীলকুঠির মালিক ছিলেন তা নয়। তিনি তাঁর গৃহে 'ভাগবতালয়' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মানকরে এবং সেখানে বহু মূল্যবান হাতে-লেখা পুঁথি সংগ্রহ করেছিলেন। হিতলাল নিজে গীতার একটি ভাষ্যও রচনা করেছিলেন। সভাপণ্ডিত ছাড়াও তিনি জ্ঞানী-গুণী পণ্ডিতদের সাদরে ও সসম্মানে পোষণ করতেন। একটি টোলও ছিল তাঁর। ভাগবতালয়েব গ্রন্থাগারে পুঁথির সংগ্রহ যা ছিল, তা বর্ধমান জেলার মধ্যে আর অন্য কোথাও ছিল না বোধ হয়। বৈষ্ণবধর্ম, তন্ত্র, দর্শন ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান পুঁথি ভাগবতালয়ে ছিল। অনেক পুঁথি নষ্ট হয়ে গেছে, কিছু কিছু তাঁরা দানও করে দিয়েছেন। তা সত্ত্বেও এখনও দেখলাম, একটি ঘরের মধ্যে প্রায় শতাধিক পুঁথি রয়েছে। আরও অবাক হলাম শুনে যে, ভাগবতালয় যিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তিনি মানকরের মুসলমানদের জন্য মসজিদও তৈরি করে দিয়েছিলেন। নিষ্কর জমি এবং অজু করার জন্য বড় একটি পুষ্করিণীও তিনি দান করেছিলেন তাঁদের। ভাগবতের উদারতাবোধ হিতলালের যে বিশেষভাবে ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই।

পণ্ডিতসমাজের জন্যও মানকরের যে এক সময় বেশ প্রসিদ্ধি ছিল, তা পরিষ্কার বোঝা যায়। মানকরের কনৌজপাড়ার ব্রাহ্মণরা একসময় গুরুগিরি ও বিদ্যাচর্চার জন্যই এখানে এসে বসবাস করেছিলেন। বর্ধমানের রাজবংশের দীক্ষাগুরুরাই যে মানকর-রায়পুর গ্রাম ব্রহ্মোত্তর পেয়েছিলেন, সেকথা আগে বলেছি। হিতলাল মিশ্রের পূর্বোক্ত হাতে-লেখা বিবরণ থেকে এ-সম্বন্ধে তাঁর নিজের উক্তিই উদ্ধৃত করছি :

"উক্ত রাইপুর গ্রাম আমার মাতামহ ৺অজিতলাল গোস্বামী মহাশয়ের প্রপিতামহ স্বর্গীয় ভক্তলাল গোস্বামী মহাশয় আপন মন্ত্রশিষ্য বর্ধমানাধিপতি রাজা কীর্তিচন্দ্র বাহাদুরের স্থানে সন ১১২৯ সালের ১৪ই চৈত্রী তারিখের সনন্দানুসারে ব্রহ্মত্তর পাইয়াছিলেন—"

হিতলাল মিশ্রের আমলে টোল, ভাগবতালয় ইত্যাদির মাধ্যমে মানকরে বিদ্যাচর্চার একটা উৎসাহ সঞ্চারিত হয়েছিল। সভাপণ্ডিত ও সাধারণ পণ্ডিত হিসাবে সেই সময় অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মানকরে এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে কনৌজ ব্রাহ্মণও ছিলেন। মানকরের পণ্ডিতদের মধ্যে মদনমোহন সিদ্ধান্ত (বর্ধমানের রাজসভা থেকে মানকরের ভট্টাচার্যরা এঁকে মানকরে আনেন), গদাধর শিরোমণি, নারায়ণ চূড়ামণি, যাদবেন্দ্র সার্বভৌম (হিতলাল মিশ্রের সভাপণ্ডিত ছিলেন), কৈলাসনাথ ও অযোধ্যানাথ ভট্টাচার্যের নাম উল্লেখযোগ্য। এ-ছাড়া কয়েকজন বিখ্যাত পণ্ডিতের বাসস্থান ও জন্মস্থান ছিল মানকর গ্রাম। তাঁদের মধ্যে রঘুনাথ শিরোমণি ও রঘুনন্দন গোস্বামী (মানকরের কাছে মাড়ো গ্রামে) অন্যতম। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের গুরু উত্তম ভট্টাচার্য মানকরের বাসিন্দা ছিলেন। মানকরে তাঁর নামে 'উত্তম সায়র' এবং তাঁর স্ত্রীর নামে 'ঠাকরুণ পুকুর' আছে। রঘুনাথ শিরোমণি যদিও নবদ্বীপের পণ্ডিত বলে খ্যাত, তাহলেও তাঁর জন্মস্থান ছিল মানকর গ্রাম। কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় এ-সম্বন্ধে তাঁর 'মধ্যযুগে বাঙ্গালা' গ্রন্থে লিখেছেন,—"নবদ্বীপ সারস্বত সমাজের উজ্জ্বলতম রত্ন সুপ্রসিদ্ধ রঘুনাথ শিরোমণি বর্ধমান জেলার কোটা মানকরে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি শৈশবে পিতৃহীন হইলে তাঁহার জননী ভরণপোষণের অভাবে নদীয়ায় আসিয়া এক কুটুম্বের বাটীতে আশ্রয় লন। এই একচক্ষু কাণা বালক রঘুনাথের বুদ্ধিশক্তি বিষয়ে ভবিষ্যতে অনেক গাল-গল্পের সৃষ্টি হইয়াছে (পৃ ৬১-৬২)।" ভট্টপল্লী-নিবাসী শিবচন্দ্র সার্বভৌম কালীপ্রসন্নবাবুকে বলেছিলেন: "গুরুপরম্পরায় সকলে জানে, কোটা মানকর শিরোমণি পিতৃভূমি"। শিরোমণির শেষ বংশধর নবদ্বীপে বিগত শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন, তাঁর নাম রামতনু ন্যায়ালঙ্কার। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য তাঁর 'বঙ্গে নব্যন্যায়চর্চা' গ্রন্থে (পৃ ৯০-৯১) এই বিবাদ-প্রসঙ্গে বলেছেন: "আমরা নবদ্বীপে অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছি, উক্ত রামতনু প্রায় ৯৮ বৎসর পূর্বে নিঃসন্তান পরলোকগমন করেন এবং তিনি

স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় শিতিকণ্ঠ বাচস্পতি মহাশয়ের সপিণ্ড জ্ঞাতি ছিলেন। ইঁহারা মানকরের 'চট্টোপাধ্যায়' বংশীয় বটেন।····· কিন্তু বাচস্পতি মহাশয় শিরোমণিবংশীয় বলিয়া দাবি করিতেন, এরূপ শুনা যায় নাই।" যাই হোক, মনে হয় বিখ্যাত কাণা শিরোমণি মানকর থেকেই নবদ্বীপে গিয়েছিলেন এবং তাঁর পিতৃভূমি মানকর। রঘুনাথ সম্পর্কে ঘটক হুলো পঞ্চাননের কারিকাটি উদ্ধৃত করছি :

বাসুদেবে তিন শিষ্য চৈয়ে রথোদ্বয়।
নদের লোক যাহাদের নামে জীয়ে রয়॥
চৈয়ে ছোঁড়া দুষ্টু বড়ো নিমে তার নাম।
রঘো বেটা বুদ্ধি মোটা ঘটে করে থাম॥
কাণা ছোঁড়া বুদ্ধে দড়ো নাম রঘুনাথ।
মিথিলার পক্ষ ধরে যে করেছে মাথ॥

কাণা রঘুনাথ সম্পর্কে অনেক গল্প আছে। যেমন, রঘুনাথ 'ক' অক্ষর শিক্ষার সময় জিজ্ঞাসা করেন, 'ক' নাম হল কেন? একবার শিশু রঘুনাথ গ্রাম্য গুরুমশায়ের আদেশে তাঁর তামাকের জন্য গুরুপত্নীর রন্ধনশালায় আগুন আনতে যান, কোন পাত্র না নিয়ে। গুরুপত্নী জলন্ত অঙ্গার হাতায় করে যখন নিয়ে আসেন, রঘুনাথ তৎক্ষণাৎ আঁজলা ভরে ধুলো তুলে নিয়ে তার উপর আগুন নেবার জন্যে সামনে এসে উপস্থিত হন। রঘুনাথ জন্মকাণা নন। উধ্ব´দৃষ্টিতে একাগ্রচিত্তে একবার তিনি যখন দার্শনিক বিচারে মগ্ন ছিলেন, তখন তাঁর চোখে একটি পতঙ্গ পড়ে চোখটি কাণা হয়ে যায়। এরকম অনেক গল্প।

রঘুনন্দন গোস্বামী ছিলেন মানকরের পাশে মাড়ো গ্রামের বাসিন্দা। মাড়ো গ্রাম মানকর ইউনিয়নের মধ্যে। অ্যাডাম সাহেব তাঁর বিখ্যাত রিপোর্টে (১৮৩৭ সালের) এই রঘুনন্দন সম্বন্ধে লিখেছিলেন :

The most voluminous native author I have met with is Raghunandan Goswami, dwelling at Maro...

অ্যাডাম সাহেব রঘুনন্দনের রচিত ৩৭ খানি গ্রন্থের দীর্ঘ তালিকা দিয়েছেন। তাঁর মধ্যে ৩৫ খানা সংস্কৃত ভাষায় রচিত এবং দু'খানা বাংলাভাষায়। বাংলা-ভাষায় রচিত গ্রন্থের মধ্যে 'রামরসায়ন' উল্লেখযোগ্য। সংস্কৃত গ্রন্থের মধ্যে

'ছন্দোমঞ্জরীর টীকা', 'সদাচার নির্ণয়', 'রোগার্ণব তারিণী', 'শরীর বিবৃত্তি', 'লেখদর্পণ', 'হরিহর স্তোত্র' ইত্যাদি ৩৫ খানি গ্রন্থের নাম করেছেন অ্যাডাম সাহেব।

এই সামান্য বিবরণ থেকে বোঝা যায়, প্রায় ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দী থেকে মানকর বর্ধমান জেলার অন্যতম প্রধান বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র হয়ে ওঠে। উনবিংশ শতাব্দী, অর্থাৎ হিতলাল মিশ্রের আমল পর্যন্ত মানকরের সারস্বত-সাধনার ধারা প্রায় অব্যাহত থাকে। বিদ্যার পাশাপাশি দেখা যায়, বাণিজ্য ও শিল্প-সাধনাতেও মানকরের বিশেষ খ্যাতি ছিল, অর্ধশতাব্দী আগেও। তারপর একদিকে মড়ক ও মহামারীতে, অন্যদিকে আধুনিক নাগরিক যুগের চক্রান্তে মানকরের সুসমৃদ্ধ আত্মনির্ভর গ্রাম্যসমাজের ভিত পর্যন্ত ভেঙে যায়। সেই প্রচণ্ড আঘাত কাটিয়ে উঠে আজও মানকর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি। ঐতিহ্য-সচেতন মানকর একদিন যে এসব কাটিয়ে উঠে এই উত্তরাধিকার বহন করে এগিয়ে যাবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ঢেকুরের ইছাই ঘোষ

বাংলা 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যের লাউসেন ও ইছাই ঘোষের কাহিনী বাঙালীর কাছে বিশেষ পরিচিত। মঙ্গলকাব্যের কাহিনীর সবটাই ঐতিহাসিক সত্য না হলেও, তার মূল কাঠামোটি অনেকটা ঐতিহাসিক। ঐতিহাসিক চরিত্র লৌকিক কাব্যে যেভাবে কল্পনার সোনার কাঠির স্পর্শে রূপান্তরিত হয়, ধর্মমঙ্গল কাব্যেও তাই হয়েছে। ঐতিহাসিক ঘটনা যখন দীর্ঘকাল ধরে লোকগাথা ও কিংবদন্তীর ভিতর দিয়ে প্রস্থত হয়ে এসে লৌকিক কাব্যে স্থান পায়, তখন নায়ক-নায়িকার আসল চরিত্রের উপর রঙের প্রলেপ পড়ে অনেক। লাউসেন-ইছাই কাহিনীতেও তাই পড়েছে। তাই বলে তা একেবারে কাল্পনিক নয়। কাহিনীর অন্যতম নায়ক 'ইছাই ঘোষ' ঐতিহাসিক ব্যক্তি। ঐতিহাসিকদের কাছে যিনি 'ঢেক্করীর' ঈশ্বর ঘোষ বলে খ্যাত, তিনি ঢেকুরের ইছাই ঘোষ এবং বর্ধমান জেলার গোপভূম রাজ্যের অন্যতম গোপরাজবংশধর, উত্তররাঢ়ের স্বাধীন সামন্তরাজা।

ঢেক্করী বা ঢেকুর বলে কোন গ্রাম নেই গোপভূমে। জয়দেব-কেঁদুলির পূর্বদিকে, অজয় নদের দক্ষিণ তীরে সেনপাহাড়ীর অন্তর্গত গৌরাঙ্গপুর নামে একটি গ্রাম আছে। দামোদরপুর, গৌরাঙ্গপুর, খেরওয়াড়ী—তিনটি গ্রাম, বিষ্ণুপুর মৌজার অন্তর্গত। বিষ্ণুপুর ও খেরওয়াড়ীর মাঝামাঝি শ্যামারূপার গড়। এই শ্যামারূপার গড়ই ত্রিষষ্টিগড় বা ঢেকুর বলে স্থানীয় লোকের কাছে খ্যাত। এই ত্রিষষ্টিগড়েই গোপরাজা ভবানীভক্ত ইছাই ঘোষ ভবানীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেই মন্দিরের কোন চিহ্ন নেই এখন। উঁচু টিলার মতন স্তূপের গভীর জঙ্গলের মধ্যে একটি ছোট চতুষ্কোণাকার ইটের মন্দির আছে, পরবর্তীকালে তৈরি। দক্ষিণে গৌরাঙ্গপুরে 'ইছাই ঘোষের' বিখ্যাত দেউল আছে—বাংলাদেশের কয়েকটি রেখদেউলের মধ্যে একটি অন্যতম নিদর্শন। বিশেষ প্রাচীন নয়। গড়ন ও অন্যান্য বিশেষত্ব দেখে বিশেষজ্ঞরা ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর দেউল বলে মনে করেন। পরবর্তীকালে গোপরাজবংশের কেউ হয়ত ইছাই ঘোষের স্মৃতিরক্ষার্থে এই দেউল নির্মাণ করেছিলেন, এমনও হতে পারে।

ধর্মমঙ্গলের কবি ঘনরাম লিখেছেন, ইছাই ঘোষের গড় পাহাড়-ঘেরা ছিল। কাছাকাছি পাহাড় না থাকলেও, পাহাড় এখান থেকে খুব বেশি দূরে নয়। কবি লিখেছেন যে, দুর্গম গভীর অরণ্য কেটে ইছাই বসতি স্থাপন করেছিলেন। এখনও গভীর জঙ্গল ও দুর্গম বিস্তীর্ণ শালবনের ভিতর দিয়ে গৌরাঙ্গপুর ও শ্যামারূপার গড়ে যেতে হয়। আমরা যখন গিয়েছিলাম তখন স্থানীয় সাধারণ লোক পর্যন্ত ভয়ে আমাদের সঙ্গী হতে চাননি। গৌরাঙ্গপুর পৌঁছে গ্রামে মুসলমান মণ্ডলের গৃহে জলযোগ করে, আমরা ইছাই ঘোষের দেউল ও শ্যামারূপার গড় দেখতে যাত্রা করলাম। তখন মণ্ডলসহ চার-পাঁচজন কুঠার-কাটারি নিয়ে আমাদের পথপ্রদর্শক হলেন। এরকম গভীর জঙ্গলে জীবনে কোনদিন প্রবেশ করিনি। যেতে যেতে পদে-পদে মনে হচ্ছিল, যে-পথ দিয়ে চলেছি, সে-পথ দিয়ে ফিরে আসা বোধ হয় আর সম্ভব হবে না। পথ চলতে গ্রামের মণ্ডল বলছিলেন, কাঠ কাটার সময় কাঠুরেরা পথ তৈরি করে, তারপর পথ আবার জঙ্গলে ঢেকে যায়। পথের কোন চিহ্ন থাকে না কোথাও। দু'হাত দিয়ে ডালপালা, কাঁটাজঙ্গল কেটে কেটে পথ তৈরি করে তাঁরা যাচ্ছিলেন, আমরা তাঁদের অনুসরণ করছিলাম। এইভাবে গৌরাঙ্গপুর থেকে ইছাই ঘোষের দেউল দেখে প্রায় দু'তিন মাইল অরণ্য-পথ অতিক্রম করে আমরা শ্যামারূপার গড়ে পৌঁছলাম। যেতে যেতে ঘনরামের বর্ণনার কথা মনে পড়ছিল :

চৌদিকে পাহাড় বেড়ি বাড়ী গড়
দুর্গম গহন কাটি।
করিয়া চত্বর বসাল নগর
রাজার বসতবাটি ॥

শ্যামারূপার গড়ের চারিদিকে জঙ্গল এত দুর্ভেদ্য যে, আমাদের দলপতি গ্রামের মণ্ডল পর্যন্ত আমাদের তার মধ্যে নিয়ে যেতে সাহস করলেন না। তিনি বললেন যে, ওর মধ্যে ঢুকলে বেরুতে পারবেন না এবং একবার ঢুকে তিনি আর পথ খুঁজে পাননি—কাঠুরেরা তাঁকে উদ্ধার করেছিল। নেকড়ে বাঘ ও বিষাক্ত সাপ আছে প্রচুর জঙ্গলের মধ্যে। চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগে অসংখ্য ময়ূর ছিল এই গড়ের জঙ্গলে। গড়ের পাশে গভীর জঙ্গলের মধ্যে বিস্তীর্ণ রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ আছে। কাঠুরেরা তার টুকরো নিদর্শন

মধ্যে মধ্যে সংগ্রহ করে আনে। গড়ের উপর থেকে মনে হয় পাহাড়ের গর্জের মতন জঙ্গল নেমে গেছে নিচে। সেখান থেকেই আমরা সেই ধ্বংসাবশেষের দিকে চেয়ে দেখলাম, নিরুপায় অসহায়ের মতন। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস, এই হল ঢেক্করী বা ঢেকুর এবং এখানেই ঈশ্বর ঘোষ বা ইছাই ঘোষ তাঁর রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বিশ্বাসের ভিত্তি নেই, এমন কথা জোর করে বলা যায় না। কেন বলা যায় না, তাই বলছি। প্রথমে ঢেক্করী বা ঢেকুর নামটি কোথা থেকে এল, এ-প্রশ্ন অনেকে করতে পারেন।

বীরভূম-বর্ধমানের সীমান্তে ঢেকুর বা ত্রিষষ্টিগড়। পূর্বে লোহার অস্ত্রশস্ত্র নির্মাতা 'ঢেকারু' নামে এক জাতি ছিল। বীরভূম-বর্ধমানের এই অঞ্চলেই তাদের বাস ছিল। এখনও তাদের অস্তিত্ব আছে। এই লোহার ঢেকারু জাতির বসবাসের প্রাধান্যের জন্যই মনে হয় এই অঞ্চলের প্রাচীন নাম ছিল ঢেক্করী বা ঢেকুর। এখন সেই লোহার জাতি ও তার জাত-ব্যবসা দুই-ই প্রায় লুপ্ত হয়েছে। জাতির নাম 'ঢেকারু' ঠিকই আছে, তাদের অস্তিত্বও আছে, স্থানের ঢেক্করী নামটি শুধু লোপ পেয়ে গেছে। তা ছাড়া ঢেকুরের ইছাইয়ের রাজধানী প্রসঙ্গে একথাও বিশেষভাবে মনে রাখা উচিত যে, অজয়ের দক্ষিণ তীরে বর্ধমানের গোপদের শৌর্যবীর্যের খ্যাতি এখনও আছে এবং সে-খ্যাতির ঐতিহাসিক ধারার সঙ্গে রাঢ়ের লোক সুপরিচিত।

এইবার ঐতিহাসিক নিদর্শনের কথা বলা যাক। ১৮৩৩ সালের কিছু আগে দিনাজপুর জেলার রামগঞ্জ গ্রামে ঈশ্বর ঘোষের একখানি তাম্রশাসন পাওয়া যায়। বাংলাদেশে আজ পর্যন্ত যত তাম্রলিপি ও শিলালিপি পাওয়া গেছে তার মধ্যে ঈশ্বর ঘোষের এই তাম্রশাসনখানির ঐতিহাসিক মূল্য খুব বেশি। কেন বেশি সেকথা পরে বলব। প্রায় চল্লিশ বছর আগে 'বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় এই তাম্রশাসনের বঙ্গানুবাদসহ একটি বিবরণ প্রকাশ করেন বাংলা 'সাহিত্য' নামক পত্রিকায় (১৩২০ সন)। পরে স্বর্গীয় ননীগোপাল মজুমদার এর বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করেন তাঁর 'ইন্‌স্ক্রিপ্‌শন্‌স অফ বেঙ্গল' গ্রন্থে। লিপি-বিজ্ঞান, অক্ষরের ছাঁদ, খোদাইয়ের রীতি ইত্যাদি বিচার করে মজুমদার মহাশয় তাম্রশাসনখানি পালযুগের শেষ পর্বের বলে মন্তব্য করেছেন। তাম্রশাসনের বিষয়বস্তু হল—মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষ পিয়োল্লমণ্ডলের

গাল্লিটিপ্যাক বিষয়ান্তর্গত দিগ্‌ঘাসোদিক নামে একখানি গ্রাম ভট্ট নিব্বোকশর্মণকে দান করেছেন এবং ঢেক্করী থেকে তিনি উক্ত তাম্রশাসনাধীন আদেশ জারী করছেন। নগেন্দ্রনাথ বসু[১] ও ননীগোপাল মজুমদার মনে করেন, ঢেক্করী আসামের গোয়ালপাড়া বা কামরূপ জেলায়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মনে করেন বর্ধমান জেলায়। সন্ধ্যাকরনন্দীর 'রামচরিত' কাব্য থেকে ঢেক্করীর অবস্থান সম্পর্কে যে সুস্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যায় তাতে শাস্ত্রী ও মৈত্রেয় মহাশয়ের অনুমানই সত্য বলে মনে হয়। রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় বরেন্দ্রভূমির পুনরুদ্ধারে যে সব সামন্তরাজা রামপালকে সাহায্য করেছিলেন সৈন্য-সামন্ত দিয়ে, সন্ধ্যাকরনন্দী অতি সংক্ষেপে তাঁদের নাম উল্লেখ করে গেছেন। কিন্তু রামচরিত কাব্যের প্রাচীন টীকাকার তাঁদের বিশেষ পরিচয় দিয়ে ঐতিহাসিকদের যে কত বড় উপকার করে গেছেন তা বলা যায় না। এই সব স্বাধীন সামন্তরাজাদের মধ্যে 'বন্দ্য' বা ভীমযশা হলেন দক্ষিণ বিহারের; 'গুণ' বা বীরগুণ হলেন উড়িষ্যা ও বাংলার সীমান্তের কোন অটবী রাজ্যের; 'সিংহ' বা জয়সিংহ হলেন দণ্ডভুক্তির (মেদিনীপুরের); 'শূর' বা লক্ষ্মীশূর হলেন 'অপর-মন্দার' বা মন্দারণের (হুগলী); 'শিখর' বা রুদ্রশিখর হলেন তৈলকম্পীর বা মানভূম জেলার তেলকুপীর, শিখরভূমের; ভাস্কর হলেন উচ্ছালের (বীরভূমের ?); প্রতাপ হলেন ঢেক্করীর (গোপভূম-বর্ধমান); 'অর্জুন' বা নরসিংহার্জুন কজঙ্গলের, অর্থাৎ রাজমহলের দক্ষিণে কঙ্কজোলের।[২] এই পরিচয় থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, রামপালকে যে সামন্তরাজারা সাহায্য করেছিলেন, তাঁরা অধিকাংশই পশ্চিমবঙ্গের ও রাঢ় অঞ্চলের। উড়িষ্যা-বাংলার সীমান্ত ও দক্ষিণ বিহার থেকে আরম্ভ করে মেদিনীপুর, হুগলী, মানভূম, বর্ধমান, বীরভূম, রাজমহল পর্যন্ত তাঁদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য বিস্তৃত ছিল। সেই সব সামন্তরাজ্যের মধ্যে ঢেক্করী একটি। ঢেক্করী আসামে হওয়া সম্ভব নয়, বর্ধমানে হওয়াই সম্ভবপর এবং আমাদের এই ত্রিষষ্টিগড়-ঢেকুরীই সেই প্রাচীন ঢেক্করী। কথা হল প্রতাপকে নিয়ে। প্রতাপকে টীকাকার 'প্রতাপসিংহ' বলেছেন বলে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। বাংলার সামন্তরাজাদের 'সিংহ' উপাধির এবং রাজপুত ক্ষত্রিয়-উৎপত্তির কতখানি গুরুত্ব আছে,

১ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড, ২৫০-৫১।

২ ডাঃ রাধাগোবিন্দ বসাক : রামচরিত, ভূমিকা।

তা ঐতিহাসিকরা জানেন। প্রতাপসিংহ যে ঘোষ বংশজাত নন, তা বলা যায় না। বাকি থাকে ঈশ্বর ঘোষের বা ইছাই ঘোষের বংশপরিচয়। ধর্মমঙ্গল কাব্যে আছে :

সোমের পরম বন্ধু বাঁধে বীরপনা।
তাহার উপরে তুমি হয়ে যাও সানা॥

* * *

নাগড়া নিশান দিল লিখি পরওয়ানা।
বিদায় হইল গোপ করিয়া বন্দনা॥
কোলে পুত্র কেবল ইছাই কুলচাঁদ।

সোম ঘোষের পুত্র ইছাই ঘোষ। কিন্তু রামগঞ্জ তাম্রশাসনে ঈশ্বর ঘোষের যে সংক্ষিপ্ত বংশপরিচয় আছে তাতে দেখা যায়, ধূর্ত ঘোষের পুত্র বাল ঘোষ একজন বীর যোদ্ধা ছিলেন। ধবল ঘোষ নামে তাঁর এক পুত্র ছিলেন। ধবল ঘোষের পুত্র হলেন ঈশ্বর ঘোষ। তাম্রশাসন ও ধর্মমঙ্গল কাব্যের বংশপরিচয়ে মিল নেই। তাতে কিছু আসে যায় না, কারণ প্রাচীন রাজ-কাহিনীকে মঙ্গলকবিরা কুলপঞ্জী মিলিয়ে কাব্যে রূপায়িত করেননি। ঈশ্বর ঘোষ একাদশ শতাব্দীর সামন্ত-রাজা, মহীপালের সমসাময়িক। মহীপালের রাজত্বকালে বৈদেশিক আক্রমণে (চোল ও কলচুরী) পশ্চিমবঙ্গে যে রাজনৈতিক বিপর্যয় ঘটে, সেই সুযোগেই মনে হয় ঈশ্বর ঘোষ বর্ধমানের গোপভূমের বিস্তৃত অঞ্চল দখল করে ঢেকুরে রাজধানী স্থাপন করেন। কর্ণসেন ও তাঁর পুত্র লাউসেন হয়ত মেদিনীপুরের কোন অঞ্চলের সামন্তরাজা ছিলেন এবং দুই সামন্তরাজার মধ্যে স্বার্থ-সংঘর্ষ বা যুদ্ধ হওয়াও অস্বাভাবিক নয়। রাঢ় অঞ্চলে ডোমরাই প্রধান যোদ্ধার জাত এবং গোপদের শৌর্যবীর্যও অতুলনীয়। রাঢ়ের সেই লোকসেনার বীরত্বের কাহিনী ও যুদ্ধযাত্রার চিত্র তাই ধর্মমঙ্গল কাব্যে সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। একাদশ শতাব্দীর ঐতিহাসিক কাহিনী কয়েকশ বছর মুখে মুখে লোকগাথা ও লোককথায় পল্লবিত হয়ে এসে ধর্মমঙ্গল কাব্যে স্থান পেয়েছে। এই প্রসঙ্গে একথাও মনে হয় যে, ধর্মপূজার মধ্যে বৌদ্ধ উৎসবের যদি কোন প্রভাব বা অবশেষ থাকে (আছে মনে হয়), তাহলে সেটাও ঐ পালযুগের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ধ্বংসাবশেষ।

রাজা ইছাই ঘোষ ও লাউসেনের কাহিনী ছাড়াও ধর্মমঙ্গলের আর একটি

কাহিনী আছে—রাজা হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী। ভট্টশালী মহাশয়ের মতে হরিশ্চন্দ্র ঢাকা জেলার সাভারের রাজা ছিলেন। কিন্তু পূর্ববঙ্গে ধর্মপূজার প্রচলন নেই। হরিশ্চন্দ্র ধর্মঠাকুরের ভক্ত ছিলেন এবং পুত্রকে বলিদান দিয়েছিলেন, ব্রাহ্মণবেশী ধর্মের অতিথিসেবার জন্য। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মনে করেন, হরিশ্চন্দ্র পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার অন্তর্গত অমরার গড়ের রাজা ছিলেন[১] এবং খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে তিনি জীবিত ছিলেন। কোন কোন ধর্মমঙ্গল কাব্যে পাওয়া যায়, রাজা হরিশ্চন্দ্রের রাজধানীর নাম 'অমরা'। এই 'অমরা'-কেই বিদ্যানিধি মহাশয় মানকরের অদূরবর্তী অমরার গড় বলেছেন (আগে আমরা অমরার গড়ের পরিচয় দিয়েছি)। এও অনুমান, কিন্তু এ অনুমান সত্য হলেও হতে পারে। যদি হয় তাহলে দেখা যাচ্ছে :

ইছাই ঘোষ বা ঈশ্বর ঘোষ এবং হরিশ্চন্দ্র দু'জনেই সমসাময়িক। বর্ধমান জেলার গোপভূমের রাজা ছিলেন দু'জন এবং গোপরাজা। একজনের রাজধানী ছিল ঢেকুরে, আর একজনের অমরায়। ইছাই ছিলেন ভবানীভক্ত, হরিশ্চন্দ্র ধর্মঠাকুরভক্ত। বাংলার ধর্মমঙ্গল কাব্যের দুটি লোকপ্রিয় কাহিনী বর্ধমানের গোপভূমের দান এবং গোপরাজাদের কাহিনী।

ঐতিহাসিক প্রমাণ ইছাই বা ঈশ্বর ঘোষের আছে, আগে তা বর্ণনা করেছি ; হরিশ্চন্দ্রের নেই। সাংস্কৃতিক প্রমাণ দু'জনেরই স্বপক্ষে। বর্ধমান জেলার সদ্‌গোপ ও গোপরা প্রধানত শৈব ও শাক্ত ধর্মের সাধক। শক্তির পূজারী তাঁরা। 'অমরার গড়' প্রসঙ্গে এ-সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। সুতরাং ইছাই ঘোষ স্বচ্ছন্দে ভবানীভক্ত হতে পারেন। ডাকার্ণব গ্রন্থে বৌদ্ধ তান্ত্রিক পীঠস্থানের মধ্যে 'ঢিক্কর' নামে স্থানের উল্লেখ আছে।[২] ঢিক্কর মনে হয় এই ঢেক্করী বা ঢেকুর ছাড়া অন্য কোন স্থান নয়। বৌদ্ধতান্ত্রিকদের পীঠস্থান ছিল ঢেকুর। পালযুগের গোপরাজা ইছাই ঘোষ মনে হয় তান্ত্রিক সাধক ছিলেন। এছাড়া বর্ধমানের সদ্‌গোপ ও গোপদের মধ্যে ধর্মপূজারও বিশেষ প্রচলন আছে। উত্তর ও পূর্ব বর্ধমানের (প্রাচীন গোপভূমে) অনেক গ্রাম

১ সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ৩৮ খণ্ড, পৃ ৭৭।

২ H. P. Sastri · Descriptive Catalogue of Sanskrit MSS. in the Govt. Coll., Vol I, 1917, P. 92.

দেখেছি, ধর্মঠাকুরের প্রধান সেবায়েত সদ্‌গোপ অথবা গোপ। সুতরাং অমরার গড়ের রাজা যদি হরিশ্চন্দ্র হন তাহলে তিনি ধর্মঠাকুরের ভক্তও হতে পারেন। আর একাদশ শতাব্দীর পালযুগের 'ধর্মের' মধ্যে বৌদ্ধ প্রভাব থাকাও অস্বাভাবিক নয়।

এইবার গোপভূমের অন্তর্গত প্রাচীন ঢেকুরের রাজা ঈশ্বর বা ইছাই ঘোষের প্রভাবপ্রতিপত্তি সম্বন্ধে কিছু বলে আলোচনা শেষ করব। রামগঞ্জ তাম্রশাসনে বলা হয়েছে :

……তস্যা ঈশ্বর ঘোষ এষ তনয়ঃ হে—
ধামা জয়ত্যেকো দুর্ধরসাহসঃ কিম
পরং কান্ত্যা জিত্যেন্দুদ্যুতিঃ
যস্য প্রোজ্জিতশৌর্যনির্জিতরিপোঃ—

চন্দ্রের দ্যুতিকেও ঈশ্বর ঘোষের কান্তি হার মানায়, তাঁর শৌর্যবীর্যের তুলনা হয় না। এই মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষ তাঁর তাম্রশাসনে যাঁদের উপর আদেশ জারী করছেন তাদের মধ্যে আছেন : রাজন, রাজ্ঞী, রাজন্যক, রাণক, রাজপুত্র, কুমারামাত্য, মহাসান্ধিবিগ্রহিক, মহাপ্রতিহার, মহাকরণাধ্যক্ষ, মহামুদ্রাধিকৃত, মহাক্ষপটলিক, মহাসর্বাধিকৃত, মহাসেনাপতি, মহাপাদমূলিক, মহাভোগপতি, মহাতন্ত্রাধিকৃত, মহাব্যূহপতি, মহাদণ্ডনায়ক, মহাকায়স্থ, মহাবলাকোষ্ঠিক, দণ্ডপাণিক, কোট্টপতি, হট্টপতি, ভুক্তিপতি, বিষয়পতি, ঔখিতাসনিক, মহাবলাধিকরণিক, মহাসামন্ত, মহাকটুক, ঠক্কুর, অঙ্গিকরণিক, অন্তঃপ্রতীহার, দণ্ডপাল, খণ্ডপাল, দুঃসাধ্যসাধনিক, চৌরোদ্ধরণিক, উপরিক, তদানিযুক্তক, আভ্যন্তরিক, বাসাগারিক, খড়গগ্রাহ, শিরোরক্ষিক, বৃদ্ধধানুষ্ক, একসরক, খোল, দূত, গমাগমিক, লেখক, দূতপ্রৈষণিক, পানীয়াগারিক, সান্তকিক, কর্মকর, গৌলমিক, শৌলকিক এবং অন্যান্য রাজাজ্ঞাধীন কর্মচারী। এত বিচিত্র রাজকর্মচারী আমলা-অমাত্যের নামের তালিকা পালযুগের কোন শিলালেখ বা তাম্রশাসনে পাওয়া যায়নি। পালযুগের সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থার বিস্তৃত চিত্র ঈশ্বর ঘোষের এই তাম্রশাসন থেকে পাওয়া যায়, যা অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। এই জন্য এর ঐতিহাসিক মূল্য এত বেশি। কিন্তু যে কথা সবচেয়ে বেশি মনে হয় তা হল এই যে, যিনি মহামাণ্ডলিক বা একজন সামন্তরাজা মাত্র ছিলেন, তিনি অন্যান্য রাজা বা রাজন্যকদের হুকুম জারী করেন কি করে?

অন্যান্য সামন্তরাজাদের (রাঢ় অঞ্চলের) কি তাহলে ঈশ্বর ঘোষ নিজের বাহুবলে বশীভূত করেছিলেন ? তাম্রশাসনে সেই ইঙ্গিতই রয়েছে। গোপ-ভূমের রাজা ঢেকুরের ইছাই ঘোষ কেবল যে একজন বীর যোদ্ধা ও প্রভাবশালী সামন্তরাজা ছিলেন তা নয়। মহীপালের রাজত্বকালে একাদশ শতাব্দীতে, আভ্যন্তরিক রাষ্ট্রীয় বিপর্যয়ের সুযোগে হয়ত তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন বলে ঘোষণা করেছিলেন এবং প্রতিবেশী সামন্তরাজাদের মধ্যে দু'চারজনকে বাহুবলে জয়ও করেছিলেন। অমরা ও ঢেকুর কেন্দ্র করে গোপভূম রাজ্যের সীমানা হয়ত তখন বর্ধমান থেকে আরও অনেক দূর পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল এবং তার সঙ্গে বর্ধমানের স্বাধীন গোপরাজাদের মহিমাও ছড়িয়ে পড়েছিল চারিদিকে।

১৩ ।

১৪
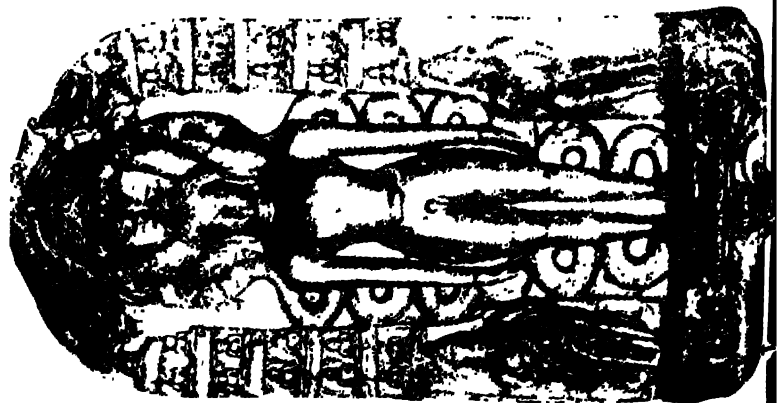
অম্বিকা-কালনা

গঙ্গার তীরে কালনা। শুধু কালনা নয়, অম্বিকা-কালনা। এ পাশে কালনা, ওপাশে পূর্বে শান্তিপুর। শান্তিপুর ডুবু-ডুবু, নদে যখন ভেসে যায়, তখন কালনাও ডুবে গিয়েছিল। বৈষ্ণবধর্মের শ্রীচৈতন্য এসে কালনার তেঁতুল-তলায় বসেছিলেন। গৌরীদাসের সঙ্গে তাঁর মিলন হয়েছিল। এসব মুসলমান আমলের কথা। তার আগে কি কালনার কোন ইতিহাস ছিল না? ভাগীরথীর বুক থেকে হঠাৎ একদিন কি চর ঠেলে উঠেছিল? মনে হয় না কালনার মাটি দেখে, যদিও বর্ধমানের গাঙ্গেয় উপকূলে কালনা। সবচেয়ে বেশি সন্দেহ হয় নাম শুনে। 'অম্বিকা-কালনা'র প্রথম অম্বিকাটি কে? আমাদের কাছে অম্বিকা হলেন দুর্গা। দেবদেবীরও ধর্মান্তরের ইতিহাস আছে। আসলে অম্বিকা হলেন জৈনধর্মীদের বিখ্যাত উপাস্য দেবী, পরে বাংলার পলিমাটিতে দুর্গায় পরিণত হয়েছেন। কালনার ইতিহাস কি তাহলে?

নামে কিছু আসে যায় না বটে, কিন্তু ইতিহাসে আসে যায়। 'বর্ধমান', 'অম্বিকা-কালনা', 'বজাসন' (বজ্রাসন) ইত্যাদি নাম যত সহজে উপেক্ষা করা যায়, তত সহজে ব্যাখ্যা করা যায় না। দৈববাণী শুনে কোন গ্রামের বা স্থানের নাম হয় না। নামের একটা ইতিহাস থাকে। 'যার বৃদ্ধি হচ্ছে' সেই 'বর্ধমান' এরকম নিরবয়ব ভাবের আশ্রয়ে নামের উৎপত্তি সচরাচর হয় না। বর্ধমান মহাবীরপন্থী জৈনদের দেওয়া নাম বললে একটা মানে হয়। তার থেকে ইতিহাসের একটা আভাস পাওয়া যায়। অতীত এইভাবে বর্তমানের সঙ্গে মিশে থাকে। যেমন আছে 'বজ্রাসনে' ও 'অম্বিকা-কালনা'য়। বজ্রযানী বৌদ্ধদের বজ্রাসন 'র-ফলা' ঝেড়ে ফেলে সহজে 'বজাসন' হয়েছে। 'অম্বিকা' উপাসনার উত্তরাধিকার নিয়ে কালনা হয়েছে 'অম্বিকা-কালনা।' এসব বৌদ্ধ বা জৈন বায় নয়, অবধারিত সত্যও নয়। একটা সঙ্কেত মাত্র, লুপ্ত ইতিহাসের তথ্য ও প্রমাণ অনুসন্ধানের অনেক বাতির মধ্যে একটি মাত্র বাতি। যত টিম্‌টিমেই হোক, উপেক্ষণীয় নয়।

জৈনদেবী অম্বিকার উপাসনা শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে খৃষ্টীয় দশম-একাদশ শতাব্দী থেকে ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত বিশেষ

প্রচলিত ছিল মনে হয়। বিভিন্ন কর্মে দেবীর বিভিন্ন মূর্তি ও বিচিত্র বর্ণের কল্পনা করা হত। শান্তিকর্মে শ্বেতবর্ণ, বশ্যকর্মে পীতবর্ণ, মারণ উচাটনাদি কর্মে রক্তবর্ণ ইত্যাদি। উপাসকের ভাবের সঙ্গে উপাস্যের বর্ণের এই সামঞ্জস্য-সাধন বৌদ্ধ ও হিন্দুতন্ত্রের বড় কথা। জৈন দেবদেবীও ক্রমে বৌদ্ধ ও হিন্দু তান্ত্রিক দেবদেবীর গুণাগুণের অধিকারী হয়ে উঠেছিলেন মনে হয়। অম্বিকার রূপও নানাভাবে তাঁরা কল্পনা করেছিলেন। দ্বিভুজা, চতুর্ভুজা, অষ্টভুজা, এমন কি বিংশতিভুজা অম্বিকা পর্যন্ত। অম্বিকা সিংহবাহিনী, হাতে আম্রপল্লব ও শিশু। কখন দু'হাতে আম্রলুম্বি, এক হাতে বরদমুদ্রা, অন্যহাতে শিশু। অষ্টভুজার হাতে শঙ্খ, চক্র, ধনু, খড়্গ, শস্য, আম্রলুম্বি, পাশ ইত্যাদিও আছে। বিংশতিভুজার হাতে খড়্গ, শক্তি, সর্প, ঢাল, কমণ্ডলু, পদ্ম, অভয় ও বরদমুদ্রা দেখা যায়।[১]

বোঝা যায় জৈনদেবী অম্বিকা খুব সহজেই বাংলার দুর্গার ধ্যানমূর্তির মধ্যে লীন হয়ে গেছেন। বর্তমানে অম্বিকা-কালনার অধিষ্ঠাত্রী দেবী হলেন সিদ্ধেশ্বরী, চতুর্ভুজা কালীমূর্তি, সিংহবাহিনী দুর্গা নন। কিন্তু তাতে কি? যিনি দুর্গা তিনিই কালী এবং যিনি অম্বিকা, তিনিই দুর্গা ও সিদ্ধেশ্বরী। মিলনে বাধা নেই। প্রথমত হিন্দুধর্মের একাত্মীকরণের অসাধারণ শক্তি, দ্বিতীয়ত বাংলার উদার মাটিতে তার বিশিষ্টতার কথা ভাবলেই বোঝা যায়, এ-মিলন কতখানি সম্ভবপর। এইজন্যই মনে হয়, অম্বিকা-কালনার অম্বিকা জৈনদেবী ছিলেন, পরে তিনি হিন্দু শক্তিপূজায় স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিয়েছেন। বৌদ্ধতন্ত্রের প্রভাবের যুগেই বাংলাদেশে অম্বিকা-পূজার প্রচলন ছিল মনে হয়। অর্থাৎ পালযুগে। অম্বিকা-কালনার ইতিহাস হিন্দু পালযুগ পর্যন্ত বিস্তৃত না হলে 'অম্বিকা' কথার ব্যাখ্যা করা যায় না। অম্বিকা-কালনাই বৈষ্ণব-কবিদের কাছে 'আম্বুয়া' বলে পরিচিত ছিল। বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবতে 'আম্বুয়া' নামের উল্লেখ আছে। সুতরাং অম্বিকা নামটি অর্বাচনীয় নয়, প্রাচীন। পালযুগ পর্যন্ত তার প্রাচীনত্ব প্রতিপাদন করা অযৌক্তিক নয়।

ভাগীরথী তীরে অম্বিকা যে হিন্দুযুগেও বেশ সমৃদ্ধিশালী সভ্যতার কেন্দ্র ছিল, তার পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন এখনও আছে। কালনায় মুসলমানযুগের যে কয়েকটি বিখ্যাত ঐতিহাসিক নিদর্শন আছে তার মধ্যে কয়েকটি মসজিদ

১ Iconography of the Jain Goddess Ambika: U. P. Shah: Journal of the Univ. of Bombay, Vol 9, Part 2, 1940.

ও একটি দুর্গ প্রধান। জীর্ণ জঙ্গলাকীর্ণ মসজিদের মধ্যে ঢুকলেই দেখা যায়, হিন্দু দেবালয়ের অসংখ্য ভগ্নাবশেষ দিয়ে মসজিদ তৈরি। পাথরের টুকরোর উপর এখনও হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি খোদাই করা রয়েছে। সংঘাতের চিহ্ন মসজিদের গায়ে যেন খোদাই করা। ১৯১৬ সালে খাঁ সাহেব মৌলবী আবদুল ওয়ালী কালনার মসজিদ ও অন্যান্য মুসলমানযুগের নিদর্শন পরিদর্শন করে বলেছিলেন :

It appears that it was a celebrated place during the Muhammedan rule, and earlier, during the Hindu Period. Being situated on the river, it was no doubt considered to be a healthy and suitable place for strategical purposes. Nothing of the period of the Hindus can now be traced, except that some of the later Archaeological remains reveal the fact that the Muhammedans built out of the materials of the older and Hindu ruins. (The Antiquities of Kalna : Bengal Past & Present, Vol 14, Jan-June, 1917).

খাঁ সাহেবের কথাই ঠিক। প্রাচীন হিন্দুযুগে এবং মুসলমানযুগেও অম্বিকা-কালনার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব ছিল যথেষ্ট। পত্তন ছিল অম্বিকা। বাণিজ্য-প্রধান পত্তন। সামরিক কারণে রাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল। মুসলমানযুগে তো ছিলই। তারপর ভাগীরথীর গতির পরিবর্তন হয়েছে, কালনার ইতিহাসের ধারাও বদলেছে। নদীনির্ভর গঞ্জ, বন্দর বা পত্তনের যেমন হয়, সাতগাঁ বা সপ্তগ্রামের যেমন হয়েছে। কালনায় তার ব্যতিক্রম হয়নি।

কালনার মুসলমান যুগের নিদর্শনগুলি তুর্কী-আফগান রাজত্বকালের। বর্তমান কালনা শহর থেকে প্রায় দেড় মাইল পুবে সেই সব নিদর্শনের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। অঞ্চলটি 'শাসপুর' বলে পরিচিত। তিনটি পুরাতন মসজিদের অস্তিত্ব দেখা যায় এখানে। এখন অবশ্য জাদুঘরের কঙ্কালের মতন তার অবস্থা, তার উপর গাছগাছড়া ও জঙ্গলে ঢাকা। সবচেয়ে বড় মসজিদটি যে কত বড় ও কত সুন্দর স্থাপত্যের নিদর্শন ছিল তা তার পাঁজরের মতন

জীর্ণ খিলানগুলি দেখলে আজও পরিষ্কার বোঝা যায়। বিরাট মসজিদ—মাথার গম্বুজ ও মিনারগুলি ভেঙে গেছে, তবে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি। খানদানি মুসলমান-সমাজের একসময় বেশ প্রতিপত্তি ছিল কালনায়। থাকারই কথা, কারণ মুসলমান রাজত্বকালে অন্যতম প্রধান স্থান ছিল কালনা। শোনা যায়, এই মসজিদে তখন কালনা অঞ্চলের সমস্ত মুসলমান ঈদের নমাজ পড়তে আসতেন। অভিজাত ও ধনী মুসলমানরা পাল্‌কি করে আসতেন এবং প্রায় সাত-আটশত পাল্‌কির ভিড় হত মসজিদের সামনে, গঙ্গার তীরে। প্রধান মসজিদটির অনতিদূরে আর একটি মসজিদ আছে, চমৎকার মসজিদ। একটি দীঘির ধারে মসজিদটি প্রতিষ্ঠিত। দীঘির স্থানীয় নাম 'মজলিস সাহেব কি দীঘি'। দীঘিটি একজন আফগান-প্রধান কাটিয়েছিলেন। তাঁর তৈরি আর একটি মসজিদ আছে, কালনা মিশন-হাউসের কাছে। পয়লা মাঘ প্রতি বছর একটি মেলা হয় এখানে এবং দীঘির ধারে জমায়েত হন সকলে। প্রবাদ আছে, পূর্বে নাকি একটি সোনালি মসজিদ ও চৌকি মজলিস সাহেবের দীঘি থেকে উপরে ভেসে উঠত মেলার সময়। প্রবাদের মধ্যে হিন্দুদের প্রভাব স্পষ্ট। মজলিস সাহেবের ঘেরা আস্তানা আছে মসজিদের পাশে। পীরের আস্তানায় যে মাটির ঘোড়া দেখা যায় তারও অভাব নেই।

কালনার মসজিদের তিনটি শিলালেখ পাওয়া গেছে। বহুদিন পর্যন্ত শিলালেখগুলি কালনা কোর্টের কাছে পড়ে ছিল। ১৯০৩ সালে, প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে, ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের ডক্টর ব্লক সাহেব সেগুলি তাঁর পরিদর্শনের পথে দেখতে পেয়ে কলকাতার মিউজিয়মে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেন। তারও অনেক আগে ব্লকম্যান সাহেব এই শিলালেখ সম্বন্ধে এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে আলোচনা করেন (১৮৭২ সাল, প্রথম খণ্ড)। প্রথমে ব্লকম্যান সাহেব মনে করেছিলেন যে, শিলালিপিগুলি হোসেন শাহের আমলের। পরে বিশেষজ্ঞরা পাঠোদ্ধার করে বলেছেন যে, কালনার মসজিদের শিলালিপি হাব্‌সী রাজাদের আমলের। একটি শিলালিপির তারিখ হিজ্‌রা ৮৯৫, অর্থাৎ ১৪৯০ খৃষ্টাব্দ।

হাব্‌সীরা কিছুকাল বাংলাদেশে প্রভুত্ব করেছিলেন। ব্লকম্যানের ভাষায়, 'From protectors of the dynasty, the Abyssinians became masters of the Kingdom.'

সৈফুদ্দিন ফিরোজ রাজত্ব করেন ১৪৮৭ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৪৯০ খৃষ্টাব্দ পযন্ত। খুনজখমের কাহিনীতে হাব্সীদের রাজত্বের ইতিহাস রক্তাক্ত ও কলঙ্কিত হয়ে আছে। দ্বিতীয় নাসিরুদ্দিন মামুদ শাহ্ রাজত্ব করেন মাত্র এক বছর—১৪৯০-৯১ খৃষ্টাব্দ। তাঁরই রাজত্বকালে কালনার একটি মসজিদ তৈরি হয়েছিল। বাকি দুটি মসজিদের মধ্যে একটি তৈরি হয় আলাউদ্দীন আবুল মুজফ্ফর ফিরোজ শাহের আমলে, ১৫৩৩ সালে, আর একটি তৈরি হয় ১৫৬০ সালে আবুল মুজফ্ফর বাহাদুর শাহের আমলে। অর্থাৎ মসজিদগুলি প্রায় চারশ সাড়ে-চারশ বছরের পুরানো। বাংলাদেশের মুসলমানযুগের শিলালিপির মধ্যে কালনার মসজিদের শিলালিপিগুলি অত্যন্ত মূল্যবান। পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যেই যে মুসলমান শাসকরা পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান অঞ্চলে বেশ প্রভুত্ব বিস্তার করেছিলেন, তা এই লিপিনিদর্শন থেকে বোঝা যায়।

কালনার যে বড় মসজিদটির কথা আগে বলেছি, সেটি মনে হয় মুজফ্ফর ফিরোজ শাহের আমলে ১৫৩৩ সালে তৈরি। 'মসজিদ-ই-জামিয়া' বা শহরের প্রধান মসজিদ এইটি। নমাজের জন্য মুসলমানরা এখানে জমায়েত হতেন। মুজফ্ফর ফিরোজ শাহ হলেন নসরৎ শাহের পুত্র এবং বিখ্যাত হুসেন শাহের পৌত্র। মাত্র কয়েক মাসের জন্য তিনি রাজত্ব করেন। সেই সময় তাঁর সেনাধ্যক্ষ ও অমাত্য উলুগ্ মসজদ খাঁ মালিক তাঁর আদেশে এই মসজিদ নির্মাণ করেন। এত বড় মসজিদ্-ই-জামিয়া তিনি কালনায় ভাগীরথীর তীরে তৈরি করতে অকারণে আদেশ করেছিলেন বলে মনে হয় না। বর্ধমান জেলায় অজয় ও ভাগীরথীর তীরে মুসলমানদের বাস বেশি দেখা যায় এবং তার মধ্যে বনেদী মুসলমানবংশও অনেক আছেন। আয়মাদার মুসলমানদের কথা অমরার গড় কাঁকসা প্রসঙ্গে বলেছি। এই সব আয়মাদার, জায়গীরদার মুসলমান-পরিবার মুসলমান অভিযানের সময় থেকে এ-অঞ্চলে বসবাস করছেন বলে মনে হয়। অভিযাত্রীদের সঙ্গী হয়েছিলেন যারা তারাই পরে আয়মা ও জায়গীর পেয়ে পুরস্কৃত হয়েছিলেন। মুসলমান অভিযানের অন্যতম পথ ছিল নদীর তীরবর্তী পথ। বিজয় অভিযানের পথের উপর, অজয় ও ভাগীরথীর সংলগ্ন স্থানে তাই মুসলমানপ্রাধান্য আজও দেখা যায়। এই পথের উপর অম্বিকা-কালনা ছিল প্রাচীন পত্তন ও গঞ্জের মতন, যেমন ছিল সপ্তগ্রাম। তাই কালনাকে বিজয়ী মুসলমানরা তাঁদের প্রধান বাসস্থান করে তুলেছিলেন। প্রধানত সামরিক

কারণে শাসকদের আশ্রয়ে তাঁরা এসেছিলেন কালনায়। তারপর অর্থনৈতিক স্বার্থে, ব্যাবসাবাণিজ্যের সুবিধার জন্য স্থায়ীভাবে বসবাস করতে আরম্ভ করেন। বর্তমানের মধ্যে কালনা অন্যতম মুসলমানপ্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে। আজ থেকে প্রায় চারশ বছর আগেই। তা না হলে হুসেন শাহের পৌত্র কালনায় অত সুন্দর করে মসজিদ-ই-জামিয়া তৈরি করার আদেশ দিতেন না। তারও প্রায় পঞ্চাশ বছর আগের মাত্র এক বছরের হাব্সী নবাবও তাহলে কালনায় মস্‌জিদ তৈরি করার জন্য ব্যস্ত হতেন না।

সাত-আটশ পাল্‌কি জমা হত কালনার প্রধান মস্‌জিদ-ই-জামিয়ার সামনে, গঙ্গার তীরে, ঈদের নমাজের সময়। তখন বাংলাদেশে সামাজিক পদমর্যাদার সঙ্গে পাল্‌কি, ঘোড়া ও হাতিতে চড়ার অধিকারের একটা প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল। মধ্যযুগে এই জাতীয় মর্যাদা ও অধিকারের মূল্য ছিল খুব বেশি। সেই উত্তরাধিকার আমাদের দেশে আধুনিক যুগের প্রবর্তক ইংরেজরাও অনেকদিন পর্যন্ত বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন। যাই হোক, পাল্‌কি ঘোড়া বা হাতিতে চড়ার অধিকার সকলের ছিল না সমাজে। পাল্‌কিরও আবার তারতম্য ছিল মর্যাদাভেদে। মর্যাদা যত বেশি, পাল্‌কি-বেহারার সংখ্যা তার তত বেশি। কালনার মসজিদের সামনে যে সাত-আটশ পাল্‌কি জমা হত, তার বেহারার সংখ্যা কার কত ছিল জানা যায় না। জানলে, তখনকার মুসলমান-সমাজের স্তরবিন্যাস পরিষ্কার বোঝা যেত। না জানলেও, শুধু পাল্‌কিই যে পদমর্যাদার আভাস দেয় তাতে বোঝা যায় যে, অন্তত সাত আটশ সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারের বাস ছিল কালনায়। কালনার সেই সম্ভ্রান্ত মুসলমানদের মধ্যে একজন মির্জা মেহ্‌দী 'কলকাতা মাদ্রাসা' তৈরির জন্য জমি দান করেছিলেন কলকাতায়। তাঁর জমিতেই নাকি কলকাতার বিখ্যাত মাদ্রাসা তৈরি। 'ক্যালকাটা মাদ্রাসা'র পশ্চিমদিকে আজও একটি ছোট্ট গলি আছে—মির্জা মেহদীর নামে। কালনার প্রায়লুপ্ত সম্ভ্রান্ত মুসলমান-সমাজের অনাদৃত নগণ্য স্মৃতিচিহ্ন।

ইতিহাসের প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ধারায় অবগাহন করে অম্বিকা-কালনা আধুনিক যুগে গাত্রোত্থান করেছে। শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ-গৌরীদাস থেকে

পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি ও বিদ্যাসাগর পর্যন্ত কালনার বিচিত্র সংস্কৃতি-ধারা প্রবাহিত হয়েছে। কলকাতা শহর থেকে কালনা বেশি দূর নয়। নব্যযুগের সংস্কৃতির তরঙ্গ কালনার গাঙ্গেয় উপকূলেও আঘাত করেছে। নৌকায় করে পায়ে হেঁটে স্বয়ং বিদ্যাসাগর নতুন আদর্শ বহন করে নিয়ে গেছেন কালনায়। কালনাবাসী বিখ্যাত পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি হয়েছেন তার অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিভূ। সে এক বিচিত্র কাহিনী! কালনার ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়। গৌরবময় ঐতিহ্য-সম্পদ,—যার উপর দু'পায়ে ভর দিয়ে বর্তমান কালনা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আগামীকালের স্বপ্ন দেখতে পারে নির্ভয়ে।

প্রাচীন হিন্দুযুগ ও মুসলমানযুগের অম্বিকা-কালনার কথা বলেছি। মুসলমানযুগে কেবল অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক প্রাধান্যই যে ছিল অম্বিকা-কালনার, তা নয়। তার সাংস্কৃতিক প্রাধান্যও ছিল যথেষ্ট। পঞ্চদশ শতকের শেষদিক থেকে শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণবধর্ম প্রবর্তনের পর, তার আদিকেন্দ্ররূপে বর্ধমান জেলার গুরুত্ব যখন বেড়ে যায়, তখন থেকেই ওপারে শান্তিপুর এবং এপারে কালনার ঐতিহাসিক প্রাধান্য বাড়ে। ষোড়শ শতকের গোড়া থেকে যে বৈষ্ণব শ্রীপাটগুলি বাংলাদেশে প্রখ্যাত হয়ে ওঠে, তার মধ্যে প্রাচীন 'বৈদ্যখণ্ড' বা শ্রীখণ্ড, কণ্টকনগরী বা কাটোয়া ও আম্বুয়া বা অম্বিকা-কালনা অন্যতম। শ্রীচৈতন্য যে সন্ন্যাস গ্রহণের পর রাঢ়দেশে কয়েকদিন ভ্রমণ করেছিলেন, একথা কৃষ্ণদাস কবিরাজ উল্লেখ করেছেন :

চব্বিশ বৎসর শেষ যেই মাঘ মাস।
তার শুক্লপক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস ॥
সন্ন্যাস করি প্রেমাবেশে চলিলা বৃন্দাবন।
রাঢ়দেশে তিনদিন করিলা ভ্রমণ ॥
এই শ্লোক পড়ি কভু ভাবের আবেশে।
ভ্রমিতে পবিত্র কৈল সব রাঢ়দেশে ॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য : ৩য়)

নিত্যানন্দ গঙ্গার উপকূলবর্তী অঞ্চলে ভ্রমণ করেছিলেন ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে। ত্রিবেণী, সপ্তগ্রাম, আম্বুয়া, শান্তিপুর প্রভৃতি নিত্যানন্দের প্রেমের বাণীতে মুখর হয়ে উঠেছিল। বৃন্দাবন দাস 'চৈতন্যভাগবতে' তার উল্লেখ করেছেন :

জয় জয় অবধূতচন্দ্র মহাশয়।
যাঁহার কৃপায় হেন সব রঙ্গ হয়॥
এই মতে সপ্তগ্রামে আম্বুয়া-মুলুকে।
বিহরেন নিত্যানন্দ-স্বরূপ কৌতুকে॥
তবে কথোদিনে আইলেন শান্তিপুরে।
আচার্য গোসাঞি প্রিয় বিগ্রহের ঘরে॥

(অন্ত্য—৫ম)

বৃন্দাবন দাসের এই 'আম্বুয়া-মুলুক'ই হল অম্বিকা-কালনা। শ্রীচৈতন্যের বিশ্রামস্থান বলে কথিত প্রাচীন তেঁতুলতলা কালনায় আজও দেখা যায়। শ্রীপাট-অম্বিকা গৌর-গৌরীদাসের মিলনস্থান বলে প্রসিদ্ধ। আরও উল্লেখযোগ্য হল, গৌরাঙ্গপূজার প্রথম প্রবর্তন হয়েছিল শ্রীখণ্ডে ও অম্বিকা-কালনায়। ষোড়শ শতকের প্রথম দিকে কালনায় যে মুসলমান-সমাজের যথেষ্ট প্রাধান্য ছিল, সেকথা আগে বলেছি। অভিজাত মুসলমানদেরও বাস ছিল বেশ, কারণ তা না হলে সাত-আটশত পাল্‌কি মসজিদ-ই-জামিয়াতে জড়ো হত না ঈদের নমাজের সময়। কালনায় মুসলমানদের এই প্রতিপত্তির সময় শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ তাঁদের পার্ষদবৃন্দসহ যখন ধর্মপ্রচারের জন্য ভ্রমণ করছিলেন, তখন অম্বিকা-কালনা কি রূপ ধারণ করেছিল, আজ তা ভাবা যায় না। কালনার মতন সপ্তগ্রামের কথাও মনে পড়ে। বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবতে' সেই সামাজিক রূপের ছবি কিছুটা ফুটে উঠেছে। যেমন—

নিত্যানন্দস্বরূপ আবেশ দেখিতে।
হেন নাহি যে বিহ্বল না হয় জগতে॥
অন্যের কি দায়, বিষ্ণুদ্রোহী যে যবন।
তাহারও পাদপদ্মে লইল শরণ॥
যবনের নয়নে দেখিতে প্রেমধার।
ব্রাহ্মণেও আপনারে জন্মায়ে ধিক্কার॥

(অন্ত্য : ৫ম)

কাব্যিক উচ্ছ্বাস বা অতিরঞ্জন যে নেই তা নয়। কিন্তু তার মধ্যেও ইতিহাসের সামান্য যে আভাস আছে, তার মূল্য অনেক।

তারপর মোগল ও বৃটিশ যুগের সন্ধিক্ষণ এবং বৃটিশযুগকে বর্ধমানের দিক

থেকে বর্ধমান মহারাজাদের যুগ বলা যায়। রাঢ়দেশের প্রাচীন সামন্ত রাজবংশগুলিকে (গোপভূম, বিষ্ণুপুর ইত্যাদি) মোগল ও বৃটিশের যোগসাজসে বর্ধমানের মহারাজারা একে-একে উচ্ছেদ করেছেন এবং তাঁদের রাজ্যগুলিকে আত্মসাৎ করে বা নিলামে কিনে বাংলার অন্যতম প্রতিপত্তিশালী জমিদারে পরিণত হয়েছেন। বিশাল জমিদারীর 'মহারাজা' হয়ে, পত্তনি-ব্যবস্থার উদ্ভাবন করে, তাঁরা যেমন জমিদারী-স্বার্থ রক্ষা করেছেন, তেমনি অন্যান্য জমিদারদের মতন মধ্যযুগীয় দয়াদাক্ষিণ্য ও বদান্যতার পরিচয় দিতেও পশ্চাৎপদ হননি। বর্ধমানের পথঘাট (প্রধানত সৈন্য চলাচল বা তীর্থযাত্রার সুবিধার জন্য) তাঁরা তৈরি করেছেন, দীঘি-পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং গ্রামে গ্রামে, শহরে শহরে অসংখ্য দেবালয়ে দেব-দেবী প্রতিষ্ঠা করে ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের দেবোত্তর ও বৃত্তি দান করেছেন। অর্থাৎ মধ্যযুগের স্থাবর সমাজের স্তম্ভগুলিকে যতদূর সম্ভব মজবুত করে তৈরি করেছিলেন। জমিদারী বদান্যতার গাথায় তাই বর্ধমানেরও উল্লেখ আছে দেখা যায়—

দিনাজপুরের নগদ দান, রানী ভবানীর কীর্তি।
কৃষ্ণচন্দ্রের ব্রহ্মোত্তর, বর্ধমানের বৃত্তি ॥

অম্বিকা-কালনাতেও তাঁদের প্রতিষ্ঠিত অনেক দেব-দেবী ও দেবালয় আছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, ১৭৪০ খৃস্টাব্দে চিত্রসেন প্রতিষ্ঠিত কালনার সিদ্ধেশ্বরী মন্দির। মন্দিরের শিলালিপিতে আছে—"শুভমস্তু শকাব্দা ১৬৬১। ২।২৬।৬ শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী দেবী শ্রীযুক্ত মহারাজা চিত্রসেন রায়সা। মিস্ত্রি শ্রীরামচন্দ্র —"। মন্দিরটির গড়ন 'জোড়বাংলা'র মতন, অর্থাৎ একজোড়া দোচালা বাংলা ঘরের মতন। কাঞ্চননগরে ঠিক অনুরূপ একটি দোতালা জোড়বাংলা মন্দির জীর্ণাবস্থায় পড়ে আছে; আগে তার কথা উল্লেখ করেছি। আকারে, গড়নে এবং পোড়ামাটির কারুকার্যের সাদৃশ্য দেখে মনে হয়, একই সময়, হয়ত একই মিস্ত্রীর হাতে তৈরি। এ-ছাড়া কালনার অধিকাংশ মন্দিরই সাধারণ বাংলা মন্দিরের মতন, ১০৮টি শিবমন্দিরসহ। সিদ্ধেশ্বরী-বাড়িতে যে কয়েকটি শিব-মন্দির আছে, তার মধ্যে একটি প্রতিষ্ঠা করেন তিলকচন্দ্রের মাতা ১৭৬৪ খৃস্টাব্দে, আর একটি প্রতিষ্ঠা করেন রাজবাড়ির বিখ্যাত অমাত্য রামদেব নাগ, ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে। কবি ভারতচন্দ্র 'নাগাষ্টক' রচনা করে বর্ধমান রাজবাড়ির অমাত্য এই রামদেব নাগকে অমর করে রেখে গেছেন। রামদেব নাগ 'মূলাযোড়'

(২৪-পরগণা) গ্রাম পত্তনি নিয়ে এমনভাবে সেখানকার লোকজন এবং কবি ভারতচন্দ্রের উপর পর্যন্ত অত্যাচার উৎপীড়ন করেছিলেন যে, ভারতচন্দ্র 'নাগাষ্টক' রচনা করতে বাধ্য হয়েছিলেন। নাগাষ্টকের যৎকিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করছি :

স্থিতং মূলাজোড়ে ভবদনুবলাৎ কালহরণং।
সমস্তং মে নাগো গ্রসতি সবিরাগ্যো হরি হরি ॥···
পিতা বৃদ্ধঃ পুত্রঃ শিশুরহহ নারী বিরহিণী
হতাশা দাশাদ্যাশ্চকিতমনসো বান্ধবগণাঃ।
যশঃ শাস্ত্রং শস্ত্রং ধনমপিচ বস্ত্রং চিরচিতং
সমস্তং মে নাগো গ্রসতি সবিরাগো হরি হরি ॥

সবই নাগ মশায় গ্রাস করে ফেলছেন বলে ভারতচন্দ্র অভিযোগ করছেন। অমাত্য রামদেব নাগের উৎপীড়ন-নির্যাতন এমনই সীমাহীন। এ-হেন রামদেব নাগ সিদ্ধেশ্বরী বাড়িতে দেবালয় নির্মাণ করে শিব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, বোধ হয় অন্যায়ের পাপ থেকে মুক্তি পাবার আশায়। নাগ মশায় তাঁর প্রভুদের পদাঙ্কই অনুসরণ করেছিলেন, এমন কিছু দোষ করেননি।

বর্ধমানের জমিদারদের পোষকতায় যে-সব বিদ্যাস্থান প্রসিদ্ধি লাভ করে, তার মধ্যে অম্বিকা-কালনা অন্যতম। একসময়, অষ্টাদশ উনবিংশ শতাব্দীতে, কালনা বহু সংস্কৃতজ্ঞ ও শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের সমাবেশে শীর্ষস্থানীয় বিদ্যাকেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। ১৮৩৭ সালে অ্যাডাম সাহেবের রিপোর্টে দেখা যায় যে, কালনা থানার মধ্যেই সংস্কৃত টোলের সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশি (বর্ধমান জেলায়)। বিদ্যালয়, টোল ও মক্তবের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে এই :

কালনা থানা	৭৩	৩৭	৬
পূর্বস্থলী থানা	৩৩	১৮	৩
গাঙ্গুরিয়া থানা	১৬	৭	১
রায়না থানা	৭২	১৪	১৪
বর্ধমান থানা	৩৭	২	১০
মঙ্গলকোট থানা	৪৫	১০	৪
আউসগ্রাম থানা	৯১	৩২	১৯

ইত্যাদি।

উল্লেখযোগ্য হল, সদর বর্ধমান থানায় বাংলা বিদ্যালয় ও সংস্কৃত টোলের সংখ্যা অত্যন্ত কম এবং সেই অনুপাতে ফারসী, আরবী শিক্ষার মক্তবের সংখ্যা বেশি। রাজবাড়ির চারপাশের কালচারের মধ্যে মোগলযুগের ঐতিহ্যেরই যে প্রাধান্য ছিল তা পরিষ্কার বোঝা যায়—এবং তারপর বৃটিশ যুগের প্রাধান্য বাড়ে। কালনা থানায় সংস্কৃত টোলের সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশি। কালনা ছাড়া আউসগ্রামও ছিল বর্ধমানের অন্যতম প্রধান বিদ্যাকেন্দ্র। কালনার পণ্ডিতদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন তারানাথ তর্কবাচস্পতি, শ্রীরাম ন্যায়বাগীশ, দুর্গাদাস ন্যায়রত্ন, অযোধ্যারাম বিদ্যাবাগীশ প্রভৃতি। তারানাথ তর্কবাচস্পতি ও তাঁর বংশের ইতিহাস অম্বিকা-কালনার ইতিহাসের একটি গৌরবময় অধ্যায় জুড়ে রয়েছে। পণ্ডিত তারানাথের জীবনে একাধারে বিদ্যা ও বাণিজ্যের যে বিচিত্র স্ফূরণ দেখা যায়, তা উনিশ শতকের আর কোন বাঙালী পণ্ডিতের জীবনে বিশেষ দেখা যায় না। নবযুগের বাংলার আদর্শ প্রতিভূ ছিলেন পণ্ডিত তারানাথ।

তারানাথের পূর্বপুরুষরা যশোহর জেলার 'সারল' গ্রামে বাস করতেন। তখন যশোহরের এই গ্রাম সংস্কৃত বিদ্যাশিক্ষার প্রধান সমাজ বলে গণ্য ছিল। তারানাথের পূর্বপুরুষ রামরাম তর্কসিদ্ধান্ত বরিশাল জেলায় বৈচণ্ডী গ্রামে বাস করতেন। বর্ধমানাধিপতি তিলকচন্দ্র যখন কালনায় তাঁদের সমাজবাড়ির সামনের দীঘি প্রতিষ্ঠা করেন, তখন দেশ-বিদেশ থেকে অনেক পণ্ডিত এনে তিনি সভাস্থ করেছিলেন। সেই সময় রামরাম তর্কসিদ্ধান্ত কালনায় আসেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের কথা। ষড়দর্শনের বিচারে তিনি সভাস্থ পণ্ডিতদের পরাস্ত করে তিলকচন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং তাঁর অনুরোধে ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি গ্রহণ করে কালনায় বসবাস করতে আরম্ভ করেন। রামরাম তর্কসিদ্ধান্ত পূর্ব বাংলা থেকে এসেছিলেন বলে আজও তাঁর বংশধররা এই অঞ্চলে 'বাঙাল ভট্টাচার্য' বলে পরিচিত। তর্কসিদ্ধান্তের তিন পুত্র—শিবদাস, দুর্গাদাস ও কালিদাস। কালিদাস সার্বভৌমের পুত্র তারানাথ তর্কবাচস্পতি ১৮১২ খৃষ্টাব্দে কালনায় জন্মগ্রহণ করেন। বিদ্যাসাগরের চেয়ে বয়সে তারানাথ প্রায় আট নয় বছরের বড় ছিলেন।

সংস্কৃত কলেজের তাৎকালিক অধ্যক্ষ, বেঙ্গল ব্যাঙ্কের দেওয়ান রামকমল সেন মশায়ের সঙ্গে কালনার 'বাঙাল ভট্টাচার্য' পরিবারের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল।

রামকমল প্রায়ই কালনায় যেতেন। তিনিই তারানাথ ও তাঁর জ্যেষ্ঠতাতপুত্র তারাকান্তকে কলকাতায় নিয়ে এসে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি করে দেন। তারানাথ প্রথমে অলঙ্কারশ্রেণীতে ভর্তি হন। পরে প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক নিমচাঁদ শিরোমণির কাছে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। যখন তিনি ন্যায়শাস্ত্রের ছাত্র, তখন বিদ্যাসাগর অলঙ্কারশ্রেণীর ছাত্র। প্রতিদিন বিকেলবেলা ছুটির পর বিদ্যাসাগর তারানাথের ঠনঠনিয়াস্থ বাসায় যেতেন। তখনকার কলকাতার বড় বড় পণ্ডিতসভায় তারানাথ বিচারের জন্য আমন্ত্রিত হতেন এবং বালক ছাত্র বিদ্যাসাগরকে সঙ্গে করে তিনি নিয়ে যেতেন সভায়। বিদ্যাসাগরকে দিয়েই তিনি সভায় প্রায়ই 'পূর্বপক্ষ' করাতেন। পনের বছরের বালক বিদ্যাসাগরের 'পূর্বপক্ষ' করা দেখে সকলে বিস্মিত হতেন। পরে তারানাথ উঠে সভাস্থ পণ্ডিতদের বিচারে পরাস্ত করতেন।

কলেজের পাঠ শেষ হবার পর বাচস্পতি মশায় বর্ধমানের সদর আমিন পদের নিয়োগপত্র প্রত্যাখ্যান করেন। বৃত্তিভোগ করা বা চাকুরী করার মতন মনোভাব তাঁর কোনকালেই ছিল না। স্বাধীনভাবে ব্যবসা করে উন্নতি করাই বাচস্পতি মশায়ের কাম্য ছিল। সেকালের এই শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের মাথায় কোথা থেকে, কেমন করে যে বণিকযুগের স্বাধীন বাণিজ্যের আদর্শ প্রবেশ করেছিল তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। যুগাদর্শের কি আশ্চর্য ও বিচিত্র প্রকাশ যে এই পণ্ডিতমশায়ের মধ্যে হয়েছিল, তা সত্যিই কল্পনা করা যায় না। বাংলাদেশে এরকম দৃষ্টান্ত অত্যন্ত বিরল। কালনায় নিজ বাড়িতে টোল খুলে তিনি ছাত্রদের বিদ্যাদান করতে আরম্ভ করলেন এবং তার সঙ্গে নানারকমের ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে লাগলেন। তারানাথ তর্কবাচস্পতি মশায়ের বাণিজ্যের সেই কীর্তিকাহিনী তাঁর পাণ্ডিত্যের কীর্তির তুলনায় বোধ হয় অনেক বেশি গৌরবমণ্ডিত। আজও শুনলে রোমাঞ্চ হয় এবং মনে হয় নবযুগের এরকম রোমাণ্টিক নায়ক উনিশ শতকে বাংলাদেশে খুব অল্পই জন্মেছিলেন। বাচস্পতি মশায় কালনাতে টোল খুললেন বাড়িতে এবং কাপড়ের দোকান খুললেন বাজারে। তখন বিলেতী কাপড়ের আমদানি পূর্ণোদ্যমে শুরু হয় নি। বিলেতী সুতো কিনে অম্বিকা-কালনায় প্রায় বারোশ তন্তুবায়কে দিয়ে তিনি কাপড় বুনিয়ে ব্যবসা করতেন এবং বাইরেতেও কাপড় চালান দিতেন। কিছুদিন পরে তারানাথ মেদিনীপুর

জেলার রাধানগর গ্রামে কাপড়ের কুঠি প্রতিষ্ঠা করেন। কাশী, মির্জাপুর, কানপুর, মথুরা, গোয়ালিয়র প্রভৃতি অঞ্চলে তিনি কাপড় পাঠাতেন। তখনও কিন্তু রেলপথ সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি। গরুর গাড়িতে অথবা মুটের মাথায় পণ্ডিত মশায় লক্ষ লক্ষ টাকার কাপড় চালান দিতেন। কলকাতার বড়বাজারেও তাঁর কাপড়ের দোকান ছিল। কাশী-অমৃতশহর থেকে তখন প্রায় ছয় লক্ষ টাকার শাল বাংলাদেশে আমদানি হত। তার মধ্যে প্রায় এক লক্ষ টাকার শাল বাচস্পতি মশায় নিজে আমদানি করতেন। এ-ছাড়া হীরা-জহরৎ, সোনা-রূপার অলঙ্কারেরও তাঁর ব্যাবসা ছিল। বীরভূমে দশ হাজার বিঘে জঙ্গল কিনে তিনি চাষ করতে আরম্ভ করেন এবং পাঁচশ গরু কেনেন দুধ-ঘিয়ের ব্যবসায়ের জন্য। মুটের মাথায় করে কলকাতায় ঘি এনে তিনি বিক্রী করতেন। কালনাতে তিনি নেপাল ও তরাই অঞ্চল থেকে কাঠ আমদানি করে ব্যাবসা শুরু করেন এবং কাঠের ব্যবসাতেই কয়েক লক্ষ টাকা উপার্জন করেন। এই সময় কালনায় তিনি প্রাসাদের মতন বিরাট অট্টালিকা তৈরি করেন বাসের জন্য। কাপড়, কাঠ ছাড়া চালের ব্যাবসা করতেও বাচস্পতি মশায় ছাড়েননি। কালনায় কয়েক শত ঢেঁকি বসিয়ে তিনি ধান ভানাতে আরম্ভ করেন, কারণ চালের কল তখনও তেমন আমদানি হয় নি। ঢেঁকির শব্দে অতিষ্ঠ হয়ে কালনাবাসী যখন অভিযোগ করেন, তখন তিনি তাঁর ঢেঁকিশাল বা ঢেঁকির কারখানা দূরের গাঁয়ে সরিয়ে নিয়ে যান। বাণিজ্যের কি অদম্য আগ্রহ ও সক্রিয় প্রতিভা! কলকাতার শীল-মল্লিক-লাহারাও কালনার বাচস্পতি মশায়ের কাছে হার মেনে যাবেন! বণিকযুগের আদর্শ প্রতিভূ পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি! তাই বিদ্যাসাগর মশায় যখন নিজে কলকাতা থেকে কালনা পর্যন্ত পায়ে হেঁটে গিয়ে সংস্কৃত কলেজে চাকরীর জন্য তাঁকে অনুরোধ করেন, তখন তিনি কিছুতেই গ্রহণ করতে রাজী হন না। বলেন, চাকরী-বাকরীতে তাঁর পোষাবে না। পরে যখন বিদ্যাসাগর মশায় প্রতিশ্রুতি দেন যে, অধ্যাপনার জন্য যেটুকু সময় তাঁর ব্যবসায়ে নষ্ট হবে, সেটুকু তিনি ও তাঁর সহোদর ভাই মিলে দেখাশুনা করে ক্ষতিপূরণ করে দেবেন, তখন বাচস্পতি মশায় চাকরী নিয়ে কলকাতায় আসেন।

তখনকার কলকাতাকেন্দ্রিক প্রগতিশীল সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গেও

বাচস্পতি মশায়ের প্রত্যক্ষ সংযোগ ছিল। বেথুন সাহেব যখন প্রথম বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন, তখন তিনি তাঁর কন্যা জ্ঞানদা দেবীকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেন। বিধবা-বিবাহের শাস্ত্রীয় যৌক্তিকতা প্রতিপাদনে এবং বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহের বিরোধিতায় বাচস্পতি মশায় বিদ্যাসাগরের অন্যতম পরামর্শদাতা ছিলেন। নবযুগের বাংলার এতগুলি যুগোপযোগী গুণের এমন বিচিত্র সমন্বয় একটি চরিত্রে আর কারও মধ্যে এতটা সার্থক হয়েছে কিনা জানি না। অথচ কালনার তারানাথ তর্কবাচস্পতিকে অনেকে কেবল একজন অসাধারণ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত বলেই জানেন। বিদ্যা ও বাণিজ্য, বিত্ত ও পাণ্ডিত্য তাঁর মধ্যে যুগের ধর্মে মূর্ত হয়ে উঠেছিল মনে হয়। এদেশে তো দূরের কথা, ইউরোপেও প্রাথমিক মার্কাণ্টাইল যুগে এরকম চরিত্রের বিকাশ হয়েছিল কিনা সন্দেহ।

জামালপুরের বুড়োরাজ

বুড়োশিবের 'বুড়ো', আর ধর্ম রাজের 'রাজা', ছ'য়ে মিলিয়ে 'বুড়োরাজ'। সাধারণত 'নাথ' বা 'ঈশ্বর' যোগ করেই শিবের নামকরণ হয় এদেশে, 'রাজ' দিয়ে হয় না। জামালপুরে হয়েছে, কারণ সেখানে দুই দেবতা মিলিত হয়ে সর্বজনপূজ্য লোকদেবতায় পরিণত হয়েছেন। রাঢ়ের ধর্মঠাকুরের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ-প্রসঙ্গে, সংস্কৃতি-তত্ত্বের দিক দিয়ে, জামালপুরের বুড়োরাজের গুরুত্ব যে কতখানি, অনুসন্ধানী ও কৌতূহলীরা তা বুঝতে পারবেন। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় প্রত্যক্ষ অনুসন্ধানের পর আমার মনে হয়েছে, রাঢ়ের অন্যতম গণদেবতা (তথাকথিত অনুন্নত সমাজের) ধর্মঠাকুরকে ক্রমে হিন্দুসমাজের শ্রেষ্ঠ দেবতা শিবঠাকুর আত্মসাৎ করে ফেলেছেন। জামালপুরের বুড়োরাজ তার অন্যতম ঐতিহাসিক সাক্ষী।

বর্ধমান জেলার কালনা মহকুমার পূর্বস্থলী থানার অন্তর্গত একটি নগণ্য গ্রাম জামালপুর। পাটুলী স্টেশনে নেমে প্রায় পাঁচ ছয় মাইল হেঁটে গ্রামে পৌঁছতে হয়। পথের মধ্যে মধ্যে জঙ্গল এবং বিচ্ছিন্ন দু'একটি গ্রাম। নদী নালা, খাল বিল পুকুর বিশেষ নেই। গঙ্গা অনেক দূর। গ্রামের একদিকে একটি ছোট বিল আর মরা-গঙ্গা একমাত্র সম্বল। গ্রীষ্মকালে যেখানে যেটুকু জলের চিহ্ন থাকে, সব নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। বুড়োরাজের উৎসব হয় বৈশাখী বুদ্ধপূর্ণিমায়। বিরাট মেলা বসে। নবদ্বীপ, কাটোয়া, দাঁইহাট, কালনা, কৃষ্ণনগর, শান্তিপুর, কলকাতা প্রভৃতি অঞ্চল থেকে ব্যবসায়ীরা যান নানারকম পণ্যের পসরা নিয়ে। সুদূর গ্রাম থেকে গ্রাম্য কারিগররা আসেন। প্রায় একমাস ধরে মেলা চলে। প্রতিদিন গ্রাম গ্রামান্তর থেকে হাজার হাজার যাত্রীর সমাগম হয়। জল নেই, মাথা গোঁজার স্থানও নেই। অন্নকষ্ট দেখেছি, যাযাবর জীবনও দেখেছি। কিন্তু এরকম জলকষ্ট দেখিনি বাংলাদেশে। কি রকম যেন আতঙ্ক হয় দেখলে। টিউবওয়েল যা আছে তার সাধ্য নেই যাত্রীদের জল যোগান দেওয়ার। কাতারে কাতারে নলকূপের সামনে যাত্রীরা কিউ দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। আবালবৃদ্ধ-বনিতার কণ্ঠ থেকে কাতর আর্তনাদ শোনা যায়—'একটু জল দাও'! নদীমাতৃক শস্যশ্যামল বাংলাদেশের ভৌগোলিক

অস্তিত্ব চোখের সামনে বিবর্ণ পাণ্ডুর হয়ে ওঠে। মনে হয়, পথ ভুলে মরুপ্রান্তরে এসেছি। ইউনিয়ন বোর্ড, মেলার কর্তৃপক্ষ, বুড়োরাজের সেবায়েৎ ও অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবকেরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেও এই নিদারুণ জলসঙ্কটের সমাধান করতে পারেন না। পুকুরের তলা পর্যন্ত ফাটা, মাটিও চৌচির। অথচ বর্ধমান জেলার মধ্যে এতবড় উৎসব ও মেলা খুব বেশি হয় না।

এই পূজার পুরোহিত হলেন একজন ব্রাহ্মণ। পৌরোহিত্য-পদে প্রতিষ্ঠার কাহিনীটি এই : যদু ঘোষ নামে স্থানীয় কোন গোপ একদা দেখল যে, তার শ্যামলী নামে গাইগরুটি জামালপুরের একস্থানে দাঁড়িয়ে আছে, আর তার বাঁট থেকে ঠিক ফোয়ারার মতন দুধ ঝরে পড়ছে। স্থানীয় বিজ্ঞ ব্যক্তি চাটুয্যে মশায়ের কাছে গেল সে, রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য। চাটুয্যে মশায় দেখলেন, একটি পাথরের মাথায় দুধ জমা হচ্ছে। বলা বাহুল্য, পাথরটি অনাদিলিঙ্গ শিব। সেই রাত্রেই চাটুয্যে মশায় স্বপ্ন দেখলেন, দেবতার পুজোর ব্যবস্থা করতে হবে অনাড়ম্বরে। তাই করা হল। পুজো আরম্ভ হল। চাটুয্যে মশায় পুজো করেন, আর যদু দূরে গলবস্ত্র হয়ে বসে থাকে। পুজোর পর ব্রাহ্মণঠাকুর বলেন, 'যদু, তোর পুজোই আগে করলাম, ভগবান তোকেই আগে কৃপা করেছেন কিনা!' যদুর বাড়ি ছিল পাশের নিমদহ গ্রামে। এইজন্য এখনও সর্বাগ্রে নিমদহের পূজা হয়। এই চট্টোপাধ্যায়ের দৌহিত্র-বংশই (নদীয়াবাসী) এখন বুড়োরাজের সেবায়েত।

খুব পরিচ্ছন্ন কিংবদন্তী। বোঝা যায়, এক সময় রাঢ়ের কোন প্রতিভাবান ব্রাহ্মণঠাকুর পরিপাটি করে রচনা করেছিলেন, তথাকথিত অনুচ্চসমাজের জন-প্রিয় গ্রামদেবতাদের হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্যে। কিংবদন্তীটি জামালপুরের বিশেষত্ব নয়। পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সমস্ত অনাদিলিঙ্গ শিবের উৎপত্তি প্রসঙ্গে এই একই কিংবদন্তী প্রচলিত আছে দেখা যায়। সর্বত্রই গোপদের সঙ্গে শিবের আবির্ভাবরহস্য জড়িত। একথা আগে একাধিকবার উল্লেখ করেছি এবং এর সাংস্কৃতিক গুরুত্বের প্রতিও ইঙ্গিত করেছি। শৈবধর্মের সঙ্গে অন্তত বাংলাদেশের, বিশেষ করে রাঢ়ের গোপদের যে কোন ঐতিহাসিক সম্পর্ক আছে, তাতে সন্দেহ নেই। কিংবদন্তীর মধ্যে ব্রাহ্মণ-প্রভাবিত হিন্দু-সমাজের সাংস্কৃতিক সমীকরণের কৌশলটিও অত্যন্ত প্রকট।

বৈশাখী পূর্ণিমায় বুড়োরাজের পূজা ও গাজন হয়। শিবের পূজা ও গাজন

হয় চৈত্রসংক্রান্তিতে। সারা রাঢ় অঞ্চলে সাধারণত বৈশাখী বুদ্ধপূর্ণিমায় ধর্মরাজের গাজন হয়। তাহলে বুড়োরাজ কি শিব, না ধর্মরাজ? কেউ কেউ বলেন, আদিপুরোহিত চাটুজ্যে মশাই এই ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন, অনাদিলিঙ্গ শিব বলে। অনাদিলিঙ্গ শিবের অভাব নেই বাংলাদেশে। বাংলার অন্যতম গ্রামদেবতা শিব। সর্বত্রই চৈত্রসংক্রান্তিতে শিবের পূজা ও গাজন হয়। সমগ্র রাঢ় অঞ্চলের মধ্যে বোধ হয় সবচেয়ে জনপ্রিয় ও প্রতিপত্তিশালী 'অনাদিলিঙ্গ' শিব তারকেশ্বরের তারকনাথ। সেখানেও এর ব্যতিক্রম নেই। হঠাৎ কোন ব্যবস্থার জন্য বুড়োরাজের পূজা বৈশাখী পূর্ণিমায় হয়নি। শিবের পূজা বৈশাখী পূর্ণিমায় কোন জায়গায় হয় না। কয়েকটি খুব বড় বড় মনসার মেলা, গাজনের মেলা, পীর সাহেবের মেলা বর্ধমানে হয়। জামালপুরের উৎসব ও মেলা তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

জামালপুর গ্রাম ব্যগ্রক্ষত্রিয়প্রধান। তা ছাড়া বাউরী গোপ ও সদ্গোপদেরও বাস আছে যথেষ্ট। পাশের নিমদহ গ্রামে একসময় গোপদেরই প্রাধান্য ছিল। এখন আর নেই। আশপাশের গ্রামের জনসংস্থান দেখে পরিষ্কার বোঝা যায়, একসময় সদ্গোপ ও গোপরাই এই অঞ্চলে বিশেষ প্রতিপত্তিশালী ছিলেন। ব্যগ্রক্ষত্রিয়েরও বাস ছিল যথেষ্ট। বাউরীদের সংখ্যাও এ অঞ্চলে অল্প নয়। জামালপুর ও তার পরিপার্শ্বের এই জনসংস্থান বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার, বুড়োরাজ প্রসঙ্গে। জনপদের জনের সঙ্গে জনসংস্কৃতির যোগাযোগ এত প্রত্যক্ষ ও গভীর যে এই সংস্থান উপেক্ষা করা যায় না।

বুড়োরাজের আবির্ভাব সম্বন্ধে একটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। নিমদহে যদু ঘোষ নামে এক সঙ্গতিপন্ন গোপ বাস করত। তার শতাধিক গরুমহিষ ছিল। তারা রোজ মাঠে ও বনে-জঙ্গলে চরতে যেত। দেখা গেল, সেই গরুর পালের মধ্যে শ্যামলী নামে একটি গরুর দুধ রোজ কে চুরি করে নিয়ে যায়। কিছুতেই দুধ-চুরির কোন হদিশ পাওয়া যায় না। রাখালদের চাকরি গেল। অবশেষে যদু নিজে একদিন গরুর পশ্চাদনুসরণ করে দেখল, জামালপুরের জঙ্গলের দিকে শ্যামলী ছুটে চলেছে। জঙ্গলের মধ্য এক জায়গায় গিয়ে শ্যামলী স্থির হয়ে দাঁড়াল, আর তার বাঁট দিয়ে ফোয়ারার মতন দুধ ঝরে পড়তে লাগল। যদু বিমূঢ় হয়ে গ্রামের ব্রাহ্মণঠাকুর মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়ের কাছে গেল। চাটুজ্যে মশাই দাওয়ায় বসে হুঁকো খাচ্ছিলেন। যদুর মুখে

সব কথা শুনে চাটুজ্যে মশাই জঙ্গলে গিয়ে দেখলেন, সব দুধ একটা পাথরের মাথায় জমছে। দেখে ব্রাহ্মণঠাকুর বাড়িতে ফিরলেন এবং সেই রাত্রেই স্বপ্ন দেখলেন। স্বপ্নের কথা সকলে জানল, পূজার ব্যবস্থা হল অনাদিলিঙ্গ শিবের। পূর্ণিমায় ব্যবস্থা হয়নি। দীর্ঘকালের প্রথা অনুযায়ীই ব্যবস্থা হয়েছে, ধর্মপূজার প্রথা। ধর্মরাজ থেকে বুড়োশিবে রূপান্তরিত হবার মধ্যপথে, সংস্কার ও প্রথার টানে, আপোষ করে রয়েছেন বুড়োরাজ। ব্রাহ্মণ পুরোহিতের দূরদর্শিতা এবং হিন্দুধর্মের অন্তর্নিহিত উদারতার জন্যই এই আপোষ সম্ভব হয়েছে। হিন্দুধর্ম বা সংস্কৃতি প্রত্যক্ষ বিরোধ বা সংঘর্ষ কোনদিনই কাম্য মনে করেনি। বিদেশীর ও বিজাতির ধর্মসংস্কৃতি তাই অনায়াসে তার পক্ষে আত্মসাৎ করা সম্ভব হয়েছে। বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের এত প্রাধান্যের পরেও তাই হিন্দুধর্মের বিজয়ী পুনরভ্যুত্থানের পথ পরিষ্কার হয়েছে। নানাজাতি ও বর্ণের অসংখ্য গ্রামদেবতা তাই সহজেই হিন্দু দেবতামণ্ডলীর মধ্যে স্থান পেয়েছেন।

জামালপুরের বুড়োরাজ প্রসঙ্গে একথা বিশেষভাবে মনে রাখা উচিত। সাক্ষাৎ যমের হাত থেকে ভক্ত রুগীরা মুক্তি পান বলে যমরাজ তথা ধর্মরাজের পূজার ব্যবস্থা হয়নি। শক্তি বা মাহাত্ম্যের প্রশ্ন উঠলে, শিবেরও সে-শক্তি আছে, তার জন্য শিবের সঙ্গে স্বতন্ত্রভাবে ধর্মরাজের পূজার প্রশ্ন ওঠে না। একটা সাংস্কৃতিক সমস্যাকে নিছক ধর্মতত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করতে গেলে এই ধরনের উভয়সঙ্কটে পড়তে হয়। অথচ সমস্যাটি খুব যে জটিল তা নয়। পূর্বস্থলী থানায় এই অঞ্চলে গ্রামে গ্রামে ধর্মপূজার প্রতিপত্তি যে কতখানি তা গ্রাম প্রদক্ষিণ করলেই বোঝা যায়। ধর্মরাজ এই অঞ্চলের অন্যতম প্রধান গ্রামদেবতা এবং ধর্মরাজ কেবল যমরাজ নন। রাঢ়ের লোকদেবতা ও গ্রাম্যদেবতার মধ্যে ধর্মরাজ প্রাচীন ও প্রধান। জাতিবর্ণনির্বিশেষে তিনি সকল শ্রেণীর দেবতা। আদিতে ধর্মরাজ যে সাধারণ অবহেলিত ও উপেক্ষিত জনের উপাস্য দেবতা ছিলেন, তাও পরিষ্কার বোঝা যায়। রাঢ়ের এই জনসাধারণই বীর যোদ্ধা ছিল, স্থানীয় সামন্তদের অধীনে লাঠিয়াল ও সৈনিকের কাজ করাই ছিল তাদের বংশগত পেশা। ধর্মরাজ এই বীর যোদ্ধাদেরও দেবতা ছিলেন। বীরত্ব ও শক্তিরও প্রতিভূ ছিলেন তিনি। আজও ধর্মরাজের অনেক আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে তার স্মৃতিচিহ্ন রয়েছে। তার মধ্যে

জামালপুরের বুড়োরাজের উৎসবে লাঠিয়াল গোপ ও ব্যগ্রক্ষত্রিয়দের বিশাল সমাবেশ ও পাঁঠা কাড়াকাড়ি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বলে মনে হয়।

জামালপুরের বুড়োরাজ কোন ইট-পাথরের মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত নন। রাঢ়ের সাধারণ বাঁকানো-চালের খড়ো ঘরে প্রতিষ্ঠিত। মন্দির করা দেবতার নিষেধ বলে কথিত। নতুন ঘর ছাইলেও নাকি চাল ফুটো হয়ে যায়। বুড়োরাজের ঘর তৈরি করে ব্যগ্রক্ষত্রিয়রাই। নিমদহ থেকে পূজা এলে তবে অন্যের পূজা হয়। নিমদহের গোপরা আজ কেউ নেই বিশেষ, থাকলেও তেমন সঙ্গতি নেই। তাই গ্রামের জমিদার ও গ্রামবাসীরা পূজা পাঠান। হাড়ি ও ডোম জাতির লোকেরা শূয়োর বলি দেয়। হাঁসও বলি হয়। পাঁঠা যে কত হাজার বলি হয় তার ঠিক নেই। সাধারণত মন্দিরের সামনে বলি হয় না, শিবের নামেও পাঁঠা উৎসর্গ করা হয় না। চারিদিকে হাজার হাজার লোক বড় বড় লাঠি ও পাঁঠা নিয়ে জমা হয়ে থাকে। অধিকাংশই হল গোপ ও ব্যগ্রক্ষত্রিয়। সুন্দর বলিষ্ঠ চেহারা, হাতে মজবুত পাকা বাঁশের তেলচুক্‌চুকে লাঠি। দেখলেই সেই রণ্‌পার যুগের কথা মনে হয়, আর 'বাংলার লাঠি'র কথা। পাঁঠাবলির সময়ের সঙ্কেত পেলেই যে যেখানে থাকে পাঁঠা বলি দিতে আরম্ভ করে, রক্তের স্রোত বইতে থাকে পথে পথে, মাঠে মাঠে। সকলেই প্রায় ছোট ছোট দল বেঁধে আসে লাঠিসোটা নিয়ে। পাঁঠা কাড়াকাড়ি হয়, অর্থাৎ প্রচণ্ড লাঠালাঠি। আগে খুন-জখমও হত যথেষ্ট, এখন সশস্ত্র পুলিশ মোতায়েন থাকে। আজ যা বর্বরতা বলে মনে হয়, একসময় সেটা যে বীরত্বের খেলা বলে গণ্য হত, তাতে কোন সন্দেহ নেই। পাঁঠা কাড়াকাড়ি উপলক্ষ্য করে লাঠিখেলা হত এবং সেটা ছিল ধর্মরাজের উৎসবের একটা প্রধান অঙ্গ। বেশ বোঝা যায়, ধর্মরাজের উৎসব কেন্দ্র করে রাঢ় অঞ্চলে এই রকম বীরত্বের ক্রীড়াপ্রদর্শনী হত। এখন তার বিকৃত অবশেষটুকু আছে মাত্র। কাঁধের লাঠিতে ছিন্নমুণ্ড পাঁঠা ঝুলিয়ে লাঠি ঘুরিয়ে হৈ-হৈ-রৈ-রৈ করে এখনও যখন তারা ছুটে যায়, তখন ত্রাসের সঞ্চার হয় চারিদিকে। যাত্রীদেরও ভয় পেয়ে চারিদিকে ছুটে পালাতে দেখেছি। বাস্তবিকই ভয়াবহ দৃশ্য, না দেখলে ভাবা যায় না।

এই হল বুড়োরাজের উৎসবের প্রধান বিশেষত্ব। বুড়োরাজকে যে নৈবেদ্য দেওয়া হয় তার মাঝখানে একটা দাগ কাটা থাকে। অর্থাৎ নৈবেদ্যের অর্ধেক

হল শিবের, আর অর্ধেক ধর্মরাজের। আগে যে মধ্যপথে আপোষের কথা বলেছি, তার বড় প্রমাণ এর চেয়ে আর কিছু নেই। উদারতারও এমন বিচিত্র পরিচয় আর কোথায় আছে? ধর্মঠাকুরের সেবায়েত পরে ব্রাহ্মণরাও হয়েছেন। কিন্তু রাঢ় অঞ্চলে ধর্মঠাকুরের অধিকাংশ সেবায়েত এখনও ডোমপণ্ডিত, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, গোপ, সদ্গোপ প্রভৃতি অব্রাহ্মণ জাতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ব্রাহ্মণরা যখন ধর্মরাজকে হিন্দুদেবতামণ্ডলীর মধ্যে গ্রহণ করেছেন, তখন কোন বিরোধের পথে না গিয়ে আপোষের পথে অগ্রসর হয়েছেন। বুড়োরাজ তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। একই পাত্রে নৈবেদ্য গ্রহণ করছেন শিব ও ধর্মরাজ। কোন সঙ্কীর্ণতা নেই, দীনতা নেই। নৈবেদ্যের মধ্যে একটি দাগই উভয় দেবতার কাছে গ্রহণযোগ্য করার পক্ষে যথেষ্ট। শিবের সামনে বলিদান হয় না। অবশ্য শিবের কাছে শক্তি থাকেন এবং শক্তির কাছে বলিদানের বিধি আছে। কিন্তু তাই বলে শূয়োর বলি নয়। বুড়োরাজের মন্দিরের একপাশে হাড়িরা শূয়োর বলি দেয়, কোন বাধা নেই। 'বুড়োরাজের' জয়ধ্বনি করেই গোপ ও ব্যগ্রক্ষত্রিয়রা হাজার হাজার পাঁঠাবলি দেয়, তাতেও কোন বাধা নেই। গ্রাম-গ্রামান্তরের মুসলমানরাও পাঁঠা মানত্ করে, কোন সংস্কার নেই। সর্বসংস্কারমুক্ত উদারতার প্রতীক 'বুড়োরাজ' বাংলার নিজস্ব মানবধর্মের প্রতিমূর্তি।

শ্রীপাট দেনুড়

শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাসগুরু কেশবভারতী এবং প্রাচীনতম বাংলা চৈতন্যচরিত-কাব্য 'চৈতন্যভাগবত' রচয়িতা বৃন্দাবন দাস বর্ধমান জেলার দেনুড় গ্রামে বাস করতেন। মন্তেশ্বর থানার অধীন দেনুড় গ্রাম, প্রাচীন নাম 'দেন্দুড়'। ভারতীসম্প্রদায়ের কেশব এবং বাংলার অন্যতম আদি বৈষ্ণব কবি বৃন্দাবন দাসের জন্মস্থান কোথায় ঠিক বলা যায় না। তাঁদের জন্মকাহিনীর মধ্যে পরবর্তীকালে এত অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ করা হয়েছে যে আজ আর তা ভেদ করে সত্য ইতিহাস জানার উপায় নেই। তা হলেও, দেনুড়ে উভয়েই কিছুকাল বসবাস করেছিলেন এবং তাঁদের জীবনের পবিত্র স্মৃতি শ্রীপাট-দেনুড় আজও বহন করছে।

বর্ধমান বা কালনা থেকে দেনুড় সহজে যাবার কোন উপায় নেই। সুদীর্ঘ পথ মোটরে গিয়ে, মন্তেশ্বর থেকে প্রায় চার-পাঁচ মাইল মাঠের উপর দিয়ে হেঁটে দেনুড় পৌঁছতে হয়। কেশবভারতী ও বৃন্দাবন দাসের স্মৃতিবিজড়িত দেনুড় রীতিমত বর্ধিষ্ণু গ্রাম। ঘর-বাড়ির সন্নিবেশ এত সুন্দর যে অবাক হয়ে চেয়ে থাকতে হয়। খড়ের বাংলা ঘর যে কত সুন্দর হতে পারে এবং তার বাঁকানো চাল স্থাপত্যশিল্পের যে কি অপূর্ব নিদর্শন, তা বর্ধমান জেলার এই সব গ্রামে গেলে বোঝা যায়। কেশবভারতীর বংশধররা যেখানে থাকেন, সেখানে এই ধরনের কয়েকটি সুন্দর চালাঘরের দিকে একদৃষ্টে যখন চেয়েছিলাম, তখন একজন বললেন, 'আর বেশিদিন এরকম ঘর বাংলা দেশে থাকবে না, কারণ এই জাতের ঘরামিরা ক্রমেই লোপ পেয়ে যাচ্ছে।' কথাটা বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুর ও বীরভূমেও শুনেছি। যাই হোক, চালাঘরের পাশে কেশবভারতীর 'মন্দির পরবর্তীকালে তৈরি। অনেক পার্থক্য, ঘরের সঙ্গে তার তুলনা হয় না। উল্লেখযোগ্য হল, এই ধরনের স্মৃতি-মন্দির ও দেবালয় যা পরে তৈরি হয়েছে বা হচ্ছে গ্রামে গ্রামে, তার মধ্যে দেখেছি বাংলার সেই নিজস্ব স্থাপত্যরীতির স্বকীয়তার কোন ছাপ নেই। মিস্ত্রী ও কারিগরের অভাব বলে কেউ কেউ তার কৈফিয়ৎ দিয়েছেন, আবার কেউ বলেছেন লোকরুচির পরিবর্তন হয়েছে। প্রথম

অভিযোগ অনেকটা সত্য, কিন্তু দ্বিতীয় অভিযোগ পুরোটাই প্রায় মিথ্যা। যুগে যুগে লোকরুচির পরিবর্তন হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু সেই পরিবর্তনের একটা সুস্থ জাতীয় ধারা যদি না থাকে তাহলে বুঝতে হবে, তার মধ্যে গলদ আছে। প্রসঙ্গত কথাটা উল্লেখ করতে হল, কারণ এরকম দৃষ্টান্ত অনেক গ্রামে দেখেছি। দেনুড়েও শ্রীপাটের সংস্কার করা হয়েছে যখন, তখন সেবাইতরা এ সম্বন্ধে সচেতন থাকলে আরও ভাল হত।

সকলেই জানেন ঈশ্বর পুরী ছিলেন শ্রীচৈতন্যের দীক্ষাগুরু এবং কেশবভারতী সন্ন্যাসগুরু। 'ভারতী' সম্প্রদায়ভুক্ত বলে নাম কেশবভারতী। 'প্রেমবিলাসের' (১৩ অধ্যায়) মতে কেশবের আসল নাম কালীনাথ আচার্য এবং তাঁর আদি বাসস্থান নবদ্বীপের কুলিয়া গ্রামে। অধিকাংশ সময় তিনি 'কণ্টকনগর' বা কাটোয়ায় বাস করতেন এবং কাটোয়াতেই তিনি ১৫১০ খৃষ্টাব্দে শ্রীচৈতন্যকে সন্ন্যাসদীক্ষা দেন। 'শ্রীপাট পরিক্রমা'তে কেশবের দেনুড় গ্রামে অবস্থানের কথা বলা হয়েছে :

বাল্যকালে কেশবের দেন্দুরাতে স্থিতি,
বৃন্দাবন দাসের হয় যেথায় বসতি।

বাঙালী ব্রাহ্মণবংশে কেশবের জন্ম। এ সম্বন্ধে অন্যত্র বলা হয়েছে :

He is said to have belonged to the village of Denud, in the district of Burdwan and born of Bengali Brahmin ancestry. According to 'Prema-vilasa' (ch 13) Kesava's former name was Kalinath Acarya, and his native place was Kuliya in Navadvipa. But he appears to have resided chiefly at Katwa (Kantaka-nagara). (Dr. S. K. De. Vaisnava Faith & Movement : P. 15, Fn, 2).

কেশবভারতীর বংশের 'ব্রহ্মচারী'রা (উপাধি) এখন দেনুড়ে বাস করেন। বর্ধমানের অন্যান্য স্থানে কেশবের অন্য বংশধররা বাস করেন। দেনুড়ে কেশবভারতীর একটি মন্দির ও মূর্তিও প্রতিষ্ঠিত আছে।

বৃন্দাবন দাসের জন্মস্থান কোথায় ঠিক বলা যায় না। যতদূর জানা যায়, তাতে মনে হয় কুমারহট্ট-হালিশহরে (২৪ পরগণায়) তাঁর জন্মস্থান। 'পাটপর্যটন' গ্রন্থে বলা হয়েছে :

হালিশহর নতি গ্রামে নারায়ণী-সুত।
দাস বৃন্দাবন নামে জগতে বিদিত ॥
নতি গ্রামে জন্ম তায় দেন্দুড়াতে স্থিতি।
শ্রীচৈতন্য ভাগবত রচিলেন তথি।

নারায়ণীর গর্ভে বৃন্দাবন দাসের জন্ম সম্বন্ধে যে সব অলৌকিক কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, তার অধিকাংশই মিথ্যা ও আজগুবি।[১] কুমারহট্ট-হালিশহর ছেড়ে নারায়ণী শিশু বৃন্দাবনসহ কিছুদিন নবদ্বীপের কাছে মামগাছি গ্রামেও বাস করেছিলেন। পরবর্তী জীবনে বৃন্দাবন দাস বর্ধমান জেলার দেনুড় গ্রামে গিয়ে বসবাস করেন। শোনা যায় এই দেনুড় গ্রামে অবস্থানকালেই তিনি 'চৈতন্যভাগবত' রচনা করেছিলেন।

'চৈতন্যভাগবত' রচনা সম্বন্ধেও নানামত প্রচলিত আছে। অল্পবয়সে বৃন্দাবন দাস নিত্যানন্দের অনুচর হন। তিনি শ্রীচৈতন্যেরও অনুগ্রহ লাভে বঞ্চিত হননি—"সর্বশেষ ভৃত্য তান বৃন্দাবন দাস।" তবে নবদ্বীপলীলা দেখার সৌভাগ্য তাঁর হয়নি বলে তিনি বারবার দুঃখ করেছেন, শ্রীচৈতন্যকে দেখেননি বলে নয়ঃ

হইল পাপিষ্ঠ জন্ম এখন না হইল।
হেন মহোৎসব দেখিতে না পাইল ॥

নিত্যানন্দের তিরোধানের পর বৃন্দাবন দাস দেনুড়ে গিয়ে বাস করেন। তাই যদি হয়, তাহলে 'চৈতন্যভাগবত' তিনি কোথায় রচনা করেছিলেন?

চৈতন্যভাগবতে বারবার বৃন্দাবন দাস উল্লেখ করেছেন যে, তিনি নিত্যানন্দ-প্রভুর উৎসাহে শ্রীচৈতন্যের জীবনী রচনায় প্রবৃত্ত হন। যেমন—

অন্তর্যামী নিত্যানন্দ বলিলা কৌতুকে।
চৈতন্য-চরিত্র কিছু লিখিতে পুস্তকে ॥

অথবা—

অন্তর্যামীরূপ বলরাম ভগবান
আজ্ঞা কৈল চৈতন্যের গাইতে আখ্যান ॥

চৈতন্যজীবনীর অধিকাংশ উপকরণও তিনি নিত্যানন্দের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। বৃন্দাবন দাস শ্রীবাস পণ্ডিতের অনুজ শ্রীরামের কন্যা নারায়ণীর

১ শ্রীসুশীলকুমার দে'র পূর্বোদ্ধৃত গ্রন্থের ৩৭ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

পুত্র ছিলেন। শ্রীবাসের আঙিনাতেই চৈতন্য-জীবনের অনেক ঘটনা তিনি প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। শ্রীচৈতন্যের অন্যান্য পারিষদদের মুখ থেকেও তিনি অনেক বৃত্তান্ত শুনেছিলেন। এই কারণেই চৈতন্যের জীবন-চরিতের মধ্যে 'চৈতন্যভাগবতের' মূল্য অত্যন্ত বেশি। কোন কল্পিত ঘটনা বৃন্দাবন দাসের রচনার মধ্যে বিশেষ নেই। সহজ সরল ভক্তির উচ্ছ্বাস আছে, অনাড়ম্বর আবেগ আছে, ঘটনার নিজস্ব ব্যাখ্যাও আছে, কিন্তু কোন নিছক আজগুবি অলৌকিক কাহিনীর উৎকট বর্ণনা নেই। 'চৈতন্যভাগবতের' এই হল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব।

কিন্তু 'চৈতন্যভাগবতের' রচনাকাল কি ও রচনাস্থান কোথায়? বৃন্দাবন দাসের কাব্য যখন লেখা হয় তখন শ্রীবাস পণ্ডিত ও সনাতন-রূপ জীবিত ছিলেন বলে মনে হয়। "অদ্যাপিও শ্রীবাসের চৈতন্য কৃপায়, দ্বারে সব উপসন্ন হতেছে লীলায়"; "অদ্যাপিও দুই ভাই রূপ-সনাতন, চৈতন্যকৃপায় হৈল বিদিত ভুবন"—এই সব উক্তির মধ্যে 'অদ্যাপিও' কথা কবি অকারণে ব্যবহার করেছেন বলে মনে হয় না। এইসব কারণে মনে হয়, শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের পূর্বে গ্রন্থরচনা আরম্ভ হয় এবং নিত্যানন্দ-পুত্র বীরভদ্রের (বা বীরচন্দ্র) জন্মের পূর্বে গ্রন্থরচনা শেষ হয়। 'চৈতন্যভাগবতের' আকস্মিক সমাপ্তি দেখে অনেকে মনে করেন যে কবি বৃদ্ধাবস্থায় এই গ্রন্থ রচনা করেছিলেন এবং রচনা শেষ হবার পূর্বেই পরলোকগমন করেছিলেন। একথাও সমীচীন বলে মনে হয় না। শ্রীসুকুমার সেন মনে করেন যে, শ্রীচৈতন্যের জীবৎকালেই 'চৈতন্য-ভাগবত' রচনা সম্পূর্ণ হয়েছিল।[১] চৈতন্যের জীবদ্দশায় যদি 'চৈতন্য-ভাগবত' রচিত হয়ে থাকে এবং নিত্যানন্দের তিরোধানের পর যদি বৃন্দাবন দাস দেনুড়ে বসবাসের জন্য গিয়ে থাকেন, তাহলে দেনুড়ে তিনি চৈতন্যভাগবত রচনা করতে পারেন না। চৈতন্যভাগবত তার আগেই অন্য কোথাও রচিত হয়েছিল। হয়ত নবদ্বীপের মাতুলালয়ে বৃন্দাবন দাস তাঁর কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

চৈতন্যভাগবত যেখানেই রচিত হোক না কেন, তার ঐতিহাসিক ও সামাজিক মূল্য যথেষ্ট। অন্য স্থানে রচিত হলেও বর্ধমান জেলার দেনুড় গ্রামের গুরুত্ব তাতে কমছে না। কারণ কবি শেষজীবনে যে গ্রামটিকে

১ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড: শ্রীসুকুমার সেন, পৃঃ ২৪০—২৪১।

নিজের জীবনসাধনার তীর্থস্থান বলে বরণ করে নিয়েছিলেন, সেই গ্রামই তাঁর নিজস্ব গ্রাম মনে করা উচিত। দেনুড়ের ধুলোমাটি যখন বৃন্দাবন দাসের সেই জীবনস্মৃতি-বিজড়িত, তখন বাংলার বৈষ্ণব শ্রীপাটগুলির মধ্যে তার স্থানও অন্যতম। কবি হিসাবে বৃন্দাবন দাসের স্থান তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে অনেক উচ্চে। বৃন্দাবন দাসের অনুমতি নিয়ে কৃষ্ণদাস কবিরাজ 'চৈতন্যচরিতামৃত' রচনা করেছিলেন :

বৃন্দাবন দাসের পাদপদ্ম করি ধ্যান।
তাঁর আজ্ঞা লয়ে লিখি যাহাতে কল্যাণ॥

কাটোয়ার উত্তরে নৈহাটির কাছে ঝামটপুর গ্রামে কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজের বাস ছিল। এইখানে বল্লালসেনের একখানি অনুশাসন পাওয়া গিয়েছিল এবং সনাতন-রূপের পিতৃভূমিও ছিল এইখানে। ঝামটপুরের কবি কৃষ্ণদাস দেনুড়ের বৃন্দাবন দাসকে কি চোখে দেখতেন এবং কতখানি শ্রদ্ধা করতেন তা তার এই বিখ্যাত উক্তি থেকেই পরিষ্কার বোঝা যায় :

কৃষ্ণলীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস
চৈতন্যলীলায় ব্যাস বৃন্দাবন দাস।
বৃন্দাবন দাস কৈল চৈতন্যমঙ্গল
যাহার শ্রবণে নাশে সর্ব অমঙ্গল।
মনুষ্যে রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য
বৃন্দাবন দাস মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য।

কৃষ্ণদাস যে অতিশয়োক্তি করেননি, তা চৈতন্যভাগবতের পাঠকমাত্রই স্বীকার করবেন।

চৈতন্যভাগবতের ঐতিহাসিক মূল্যের কথা আগে বলেছি। রাঢ়ের তথা পশ্চিমবাংলার ইতিহাস রচনায় বৃন্দাবন দাসের তথ্যগুলি অত্যন্ত মূল্যবান। 'পাষণ্ড' ও 'পাষণ্ডী'রা বৈষ্ণবদের যে রকম নিন্দাবাদ ও কুৎসা করত তারও সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন বৃন্দাবন দাস :

কিছু নাহি জানে লোক ধনপুত্ররসে।
সকল পাষণ্ড মেলি বৈষ্ণবেরে হাসে॥
কেহ বোলে এ বামনে এই গ্রাম হৈতে।
ঘর ভাঙ্গি ঘুচাই ফেলাইনি স্রোতে॥

এ বামনে ঘুচাইলে গ্রামের মঙ্গল।
অন্যথা যবনে গ্রাম করিবে কবল॥
এই মত বোলে যত পাষণ্ডীর গণ।
শুনি 'কৃষ্ণ' বলি কান্দে ভাগবতগণ॥

এই কথা শুনে ক্রোধে আগুনের মতন জ্বলে উঠে অদ্বৈত বলেছিলেন :

পাষণ্ডীরে কাটিয়া করিমু স্কন্ধ নাশ।
তবে কৃষ্ণ প্রভু মোর, মুঞি তাঁর দাস॥

এই 'পাষণ্ড পাষণ্ডীরা' কারা? মদ্য-মাংস দিয়ে যারা চণ্ডীপূজা করত, ধর্মপূজা করত, তারা নয় কি? মনে হয় তাদেরই বৃন্দাবন দাস 'পাষণ্ড' ও 'পাষণ্ডী' বলেছেন। দেনুড় প্রসঙ্গে কথাটা আরও বিশেষভাবে মনে হল, কারণ দেনুড়ে কেশবভারতী ও বৃন্দাবন দাসের বসবাসের আগে এবং বৈষ্ণব ধর্মের ভক্তি ও প্রেমের বাণী প্রচারিত হবার আগে, শৈব ও শাক্ত ধর্মের বিশেষ প্রাধান্য ছিল বলে মনে হয়। পশ্চিমবঙ্গের তথা রাঢ়ের সর্বত্রই তাই ছিল, দেনুড়েও ছিল। দেনুড়ের আদি গ্রামদেবতা হলেন দেন্দুড়েশ্বব বা দীনেশ্বর শিব। শিব-মন্দিরের মধ্যে একটি প্রাচীন চণ্ডীমূর্তি আছে, কালো পাথরের, নাম 'বিক্রমচণ্ডী'। বৃন্দাবন দাসের শ্রীপাটে যে গৌরনিতাইয়ের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, সেখানেও একটি চমৎকার কালো পাথরের মহিষমর্দিনী মূর্তি আছে। এই বিক্রমচণ্ডী ও মহিষমর্দিনীও দেন্দুড়ের গ্রামদেবতা ছিলেন একসময়। হয়ত পৃথক দেবালয়েও তাঁরা প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। পরে বিক্রমচণ্ডী শিবমন্দিরে এবং মহিষমর্দিনী গৌরনিতাইয়ের মন্দিরে আশ্রয় পেয়েছেন। দেনুড় ও তার আশপাশের গ্রামে (পাতুন, মন্তেশ্বর প্রভৃতি) চণ্ডী, চামুণ্ডা ও ধর্মরাজের প্রতিপত্তি এখনও এত বেশি যে, কেশবভারতী ও বৃন্দাবন দাসের কালে কি ছিল কল্পনা করতেও ভয় হয়। বর্ধমান জেলা যেমন বৈষ্ণবদের তীর্থস্থান, তেমনি শাক্তদেরও পীঠস্থান। শক্তির সাধনা ও ভক্তির আরাধনা এখানে যেন পাশাপাশি খাতে প্রবাহিত হয়েছে। বর্ধমানের বৈষ্ণব শ্রীপাটগুলিতে প্রায়ই দেখা যায় একসময় তান্ত্রিক ও শাক্ত সাধকদের প্রাধান্য ছিল। এখনও অনেক জায়গায় আছে। দেনুড় তার মধ্যে একটি।

পাতুনের শিল্পস্মৃতি

"সেদিন একজন প্রসিদ্ধ আইকনোগ্রাফিস্ট এক সভায় বলিয়াছেন যে, মূর্তিবিদ্যা শিখিবার একমাত্র জায়গা বাংলা। বাস্তবিকই হিন্দু ও বৌদ্ধগণের কত মূর্তিই যে ছিল, আর কত মূর্তিই যে পাথরে গড়া হইত, তাহা ভাবিলে আশ্চর্য হইয়া যাইতে হয়। বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি অনেক মূর্তি সংগ্রহ করিয়াছেন। সাহিত্যপরিষদেও অনেক মূর্ত্তি সংগ্রহ হইয়াছে। সকল মিউজিয়মেই কিছু কিছু মূর্ত্তি সংগ্রহ আছে; তথাপি বনে-জঙ্গলে পুরানো গ্রামে পুরানো নগরে এখনও গাড়ি গাড়ি মূর্ত্তি পাওয়া যাইতে পারে।"

—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

শাস্ত্রী মহাশয়ের কথা ঠিক। বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে পরিত্যক্ত মূর্তির সংখ্যা যে কত তার হিসাব নেই। পূর্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের গ্রাম থেকে এইরকম মূর্তি উদ্‌যোগী অনুসন্ধানীরা অনেক সংগ্রহ করেছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মিউজিয়মে এবং বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির রাজসাহী মিউজিয়মে সেগুলি সযত্নে রক্ষিত ছিল। পূর্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের মতন পশ্চিমবঙ্গ তথা রাঢ়দেশের গ্রামে গ্রামেও অসংখ্য মূর্তি অনাদৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। প্রত্নতত্ত্ববিভাগের ঔদাসীন্যের জন্য মূর্তিব্যবসায়ীরা অনেক মূর্তি অপহরণ করে বিদেশীদের কাছে বিক্রী করে দিয়েছেন এবং এখনও দিচ্ছেন। বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্ধমান প্রভৃতি জেলার একাধিক গ্রামে এই মূর্তি-অপহরণের চাঞ্চল্যকর কাহিনী শুনেছি। অনেক গ্রামে এইসব মূর্তির এখন আর পূজা হয় না, কোন কোন গ্রামে বুদ্ধমূর্তি, বিষ্ণুমূর্তি ইত্যাদি স্থানীয় গ্রামদেবতার নামে পূজিত হয়। পূজা হোক বা নাই হোক, গ্রামবাসীদের যেন একটা নাড়ীর টান আছে দেখেছি মূর্তির প্রতি। মূর্তি চুরি হলে বা হারিয়ে গেলে তাই গ্রামে সাড়া পড়ে যায়। এরকম অনেক অভিযোগ আমি শুনেছি। পূর্ববঙ্গ বা উত্তরবঙ্গের মতন পশ্চিমবঙ্গের দেব-দেবীর বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্য যে কত, তা আজ পর্যন্ত কেউ অনুসন্ধান করে দেখেননি। বৌদ্ধ মহাযান, বজ্রযান ও তন্ত্রযানের প্রভাবে কত নতুন নতুন বুদ্ধ ও নতুন নতুন দেবদেবীর আবির্ভাব হয়েছিল যে বাংলাদেশে তার ঠিক নেই। কেবল পূর্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গেই এই প্রভাব বিস্তৃত হয়নি, পশ্চিমবঙ্গও যে

বৌদ্ধ মহাযান, বজ্রযান ও তন্ত্রযানের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ছিল, তার প্রমাণ বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্ধমান, হুগলী, মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলার গ্রামে গ্রামে ঘুরলে এবং বিভিন্ন দেবদেবীর পরিত্যক্ত সব পাথরের মূর্তি দেখলে পরিষ্কার পাওয়া যায়। দেবদেবীর মূর্তির বৈচিত্র্য ও নির্মাণকুশলতা দেখলে একথাও বোঝা যায় যে, বাংলাদেশে ভাস্কর্যশিল্পের কতখানি উন্নতি হয়েছিল। প্রধানত পাল-রাজাদের আমল থেকেই বাংলার ভাস্কর্যকলার চরম বিকাশ হয়। নতুন নতুন দেবদেবীর আবির্ভাবের ফলে এবং অসংখ্য 'সাধন' ও 'ধ্যান' অনুযায়ী মূর্তি নির্মাণের তাগিদে ভাস্কর্যের দ্রুত উন্নতি হতে থাকে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটা কথা বিশেষভাবে মনে পড়ে, বাংলাদেশের সেই ভাস্কররা কোথায় ছিলেন, কোথায় গেলেন তাঁরা? বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে, উত্তরে পুবে ও পশ্চিমে, ভাস্কর্যের কোন স্থানীয় রীতির বিকাশ হয়েছিল কি, আঞ্চলিক বিশেষত্ব নিয়ে? একই আর্থিক-সামাজিক পরিবেশে এবং একই ধর্মের প্রেরণায় বাংলার ভাস্কর্যের স্বর্ণযুগের বিকাশ হলেও, তার আঞ্চলিক রীতির প্রকরণভেদ থাকা আশ্চর্য নয়। বাংলার ভাস্কর্যের গৌড়ীয় রীতির অন্যতম প্রধান সাধনকেন্দ্র কি রাঢ়দেশ ছিল না? নিশ্চয়ই ছিল। বৌদ্ধ মহাযান, বজ্রযান, তন্ত্রযান ও হিন্দু তন্ত্রের যেখানে এরকম প্রচণ্ড প্রতিপত্তি ছিল, সেখানে যে বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তিপূজারও প্রচলন ছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। মূর্তি গড়ার জন্য ভাস্কররাও নিশ্চয় ছিলেন এবং ভাস্করপ্রধান গ্রাম ছিল, গ্রাম্য স্টুডিও ছিল। বর্ধমান জেলার দাঁইহাট ও পাতুন গ্রাম তার অন্যতম ঐতিহাসিক সাক্ষী।

দাঁইহাটের ভাস্করদের খ্যাতি কিছুকাল আগে পর্যন্তও অক্ষুণ্ণ ছিল। দাঁইহাটের নবীন ভাস্করের হাতে তৈরি দেবদেবীর মূর্তি বর্ধমান জেলায় আজও অনেক আছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, ক্ষীরগ্রামের দশভুজা যোগাদ্যা মূর্তি। দাঁইহাট কাটোয়া মহকুমায়, কাটোয়ার কাছে। পাতুন কালনা মহকুমায়, কালনা-কাটোয়ার প্রায় সীমান্তে বলা চলে। মন্তেশ্বর থেকে দেনুড় যাবার পথে পাতুন গ্রাম। কিংবদন্তী আছে, মহর্ষি পতঞ্জলি নানাস্থানে ঘুরে অবশেষে এই পাতুন গ্রামে এসে বসবাস করেন এবং এক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করে সাধনা করতে থাকেন। গ্রামের নাম তাই 'পাতুন' এবং গ্রামদেবতা শিবের নাম 'পতঞ্জলীশ্বর'। মহর্ষি পতঞ্জলি এতদূরে পাতুন পর্যন্ত আসুন বা নাই আসুন,

গ্রামটি যে প্রাচীন তা দেখলেই বোঝা যায়। যে মন্দিরটিতে গ্রামদেবতা পতঞ্জলীশ্বর থাকেন, সেই মন্দিরটি শতাধিক বছরের প্রাচীন মন্দির বলে মনে হয়। পাশেই একটি পুকুর। এই পুকুর খুঁড়তে গিয়ে অসংখ্য দেবদেবীর মূর্তি পাওয়া গেছে। অনেকদিন আগেই পাওয়া গেছে। মন্তেশ্বর থেকে প্রায় তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে আমরা যখন দেনুড় যাচ্ছিলাম বৃন্দাবন দাসের শ্রীপাটে, তখন পাতুনের লোকজন দৌড়ে এসে এই খবরটা আমাদের দিয়ে গেলেন। ফেরবার পথে আমরা তাই পাতুন দেখার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না।

পাতুন গ্রামে বড় বড় দেবালয় বা উল্লেখযোগ্য কীর্তিস্তম্ভ বিশেষ নেই। গ্রামদেবতা হলেন ধর্মরাজ এবং পতঞ্জলীশ্বর বা পত্রেশ্বর শিব। ধর্মরাজ ঠাকুরের পূজারী ব্যগ্রক্ষত্রিয় কেউই কোনও অভিজাত দেবালয়ে বাস করেন না। গ্রামেও কোন আভিজাত্যের চিহ্ন কোথাও নেই। সহজ সরল অনাড়ম্বর গ্রাম পাতুন। পত্রেশ্বরের প্রাচীন মন্দিরটি গ্রামের পাশে মাঠের মধ্যে একাকী নির্বাসিত বলা চলে। তারই পাশে একটি পুকুর। আশেপাশের জমির অসমতলতা লক্ষণীয়। এই মৃত্তিকাগর্ভে নাকি অসংখ্য দেবদেবীর পাথরের মূর্তি সমাধিস্থ হয়ে রয়েছে। গ্রামবাসীদের তাই বিশ্বাস এবং বিশ্বাস ভিত্তিহীন নয় দেখলাম, মাটিতে কোপ্ দিলেই নাকি মূর্তি পাওয়া যায়। এইভাবে শত শত মূর্তি পাওয়া গেছে এবং মূর্তিগুলি পত্রেশ্বর মন্দিরের ভিতরে বা বাইরে স্তূপাকার করে জড়ো করা রয়েছে। অনেক মূর্তি নাকি অনেকে নিয়ে গেছেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও যা মূর্তি এখনও রয়েছে, তাই দিয়েই একটা ছোটখাট মিউজিয়াম তৈরি করা যায়।

পত্রেশ্বর মন্দিরের ভিতরে ও বাইরে যে-সব পাথরের মূর্তি স্তূপীকৃত করা রয়েছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল :

(ক) বৌদ্ধ তান্ত্রিক দেবদেবীর মূর্তি ,

(খ) অবলোকিতেশ্বর, লোকেশ্বরবিষ্ণু, বিষ্ণু (নানারূপের), সূর্য, গণেশ মূর্তি ;

(গ) ধর্মরাজের নানাকারের কূর্মমূর্তি ,

(ঘ) শিবলিঙ্গ।

মূর্তিগুলি দেখলে মনে হয়, অধিকাংশই পালযুগের শেষে এবং সেনযুগে খোদাই

করা হয়েছে। আরও একটা বৈশিষ্ট্য হল—যা অসাবধানীরও নজরে পড়ে—মূর্তিগুলির আনকোরা নূতনত্ব। অর্থাৎ মূর্তিগুলি কোন কাজেই ব্যবহার করা হয়েছে বলে মনে হয় না। পাথরের খণ্ড ঘষামাজা পর্যন্ত হয়নি, দেখলেই বোঝা যায়। পূজা তো হয়ইনি, এমনকি মন্দির বা প্রাসাদ অলঙ্করণের জন্যও ব্যবহার করা হয়নি। অনেক অসম্পূর্ণ মূর্তিও আছে, দেখলে ছেনি-বাটালির ঘা পর্যন্ত চেনা যায় যেন। এছাড়া, একই মূর্তির সংখ্যাধিক্য এবং একস্থানে একত্র সমাবেশ থেকে এই কথাই মনে হয় যে পাতুন গ্রাম এককালে ঠিক দাঁই-হাটের মতনই ভাস্করদের গ্রাম ছিল। যে-সব দেবদেবীর মূর্তির চাহিদা ছিল এ অঞ্চলে, প্রধানত সেই সব মূর্তিই ভাস্কররা তৈরি করতেন। আজ সেই ভাস্করদের বংশ পর্যন্ত লুপ্ত হয়ে গেছে পাতুনে। আর দাঁইহাটে যাঁরা আছেন তাঁরাও বংশগত পেশা অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণে ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন, ঠিক পটুয়াদের মতন। রাঢ়ের ভাস্করদের লুপ্ত কীর্তির যৎসামান্য নিদর্শন পাতুন গ্রামের মাটি খুঁড়ে পাওয়া গেছে। পরিবর্তনের স্রোতে পাতুনের ভাস্করদের সেই স্টুডিও মৃত্তিকাগর্ভে সমাধিস্থ হয়েছে এবং সেই লুপ্ত স্টুডিওর দেবদেবীর মূর্তিই আজ পত্রেশ্বর মন্দিরের ভিতরে ও বাইরে স্তূপীকৃত হয়ে রয়েছে। বোবা দেবদেবীর মুখে কোন ভাষা নেই, মূর্তিও খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণ। কিন্তু তাহলেও এইসব দেবদেবীর ভগ্নস্তূপ থেকে রাঢ়ের সমাজ-জীবন ও ধর্মাচরণের ইতিহাসের যে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তার মূল্য অসাধারণ। দেবদেবীর সংখ্যা থেকে অনেকটা অনুমান করা যায়, কার প্রতিপত্তি কত বেশি ছিল। যার প্রতিপত্তি যত বেশি ছিল তাঁর মূর্তিই ভাস্করদের স্টুডিওতে তৈরি হত সবচেয়ে বেশি।

তারা, চামুণ্ডা ও মহিষমর্দিনীর মূর্তি ছাড়া পাতুনে অষ্টভুজ ও দশভুজ যে লোকেশ্বর-বিষ্ণু (?) মূর্তি পাওয়া গেছে, তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য বলে মনে হয়। এরকম একাধিক মূর্তি পাওয়া গেছে, কয়েকটি এর মধ্যে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। মূর্তি লোকেশ্বর-বিষ্ণুমূর্তি বলেই মনে হয়। মুর্শিদাবাদের ঘিয়াসা-বাদে প্রাপ্ত বিষ্ণুর বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত একটি মূর্তিতে, পাদপীঠে অবলোকিতেশ্বরের অনুগ প্রেত সূচীমুখের প্রতিমূর্তি খোদিত আছে। রাখালদাস এই মূর্তিকে লোকেশ্বর-বিষ্ণু মূর্তি বলেছেন। এই জেলার সাগরদীঘি অঞ্চলে প্রাপ্ত ত্রিভঙ্গ বা অতিভঙ্গ ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান একটি পিতলের ষড়ভুজ, সপ্ত-ত্রিশির নাগের

আচ্ছাদনসহ হৃষীকেশ-বিষ্ণুমূর্তিকে বোধিসত্ত্ব পদ্মপাণির সমস্ত বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করা হয়েছে এবং একেও 'লোকেশ্বর-বিষ্ণু' বলা হয়েছে।[১]

রাখালদাস বলেছেন, এই লোকেশ্বর-বিষ্ণুমূর্তিগুলি এমন একসময় তৈরি হয়েছিল যখন প্রাচীন ভাগবত-বৈষ্ণব মূর্তির সঙ্গে বৌদ্ধ মহাযানী লোকেশ্বরের মিলন-মিশ্রণ ঘটেছিল :

> This particular class of specimens, therefore, indicates a blending of the older Bhagavata class of Vaishnava images and the Lokesvaras of the later Mahayana school of Buddhism. (E. I. S. M. S.,—P. 96).

হরি-হর, শঙ্কর-নারায়ণ, শিব-বিষ্ণু প্রভৃতির মতন লোকেশ্বর-শিব, লোকেশ্বর-বিষ্ণু ইত্যাদি যুগসন্ধিক্ষণের দেবতা। বৈষ্ণব ও শৈবদের সমন্বয়ের জন্য হরি-হর যেমন, মহাযানী বৌদ্ধ ও শৈব, বৌদ্ধ ও বৈষ্ণবদের সমন্বয়ের জন্য লোকেশ্বর-শিব ও লোকেশ্বর-বিষ্ণুও ঠিক তেমনি। পাতুনের ভাস্কররা লোকেশ্বর-বিষ্ণু মূর্তি তৈরি করতেন যখন, তখন তার স্থানীয় চাহিদা নিশ্চয় ছিল, বোঝা যায়। কোন্ সময় লোকেশ্বর-বিষ্ণু মূর্তি নির্মাণের প্রয়োজন হয়েছিল? এমন এক যুগসন্ধিক্ষণে যখন মহাযানী বৌদ্ধধর্মের অবনতির ফলে তার প্রভাব কমছিল এবং হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুত্থান হচ্ছিল। লোকেশ্বর-বিষ্ণু এই যুগসন্ধিক্ষণের দেবতা। পাতুনের একাধিক লোকেশ্বর-বিষ্ণু মূর্তি থেকে বর্ধমান তথা রাঢ় অঞ্চলের এই যুগসন্ধিক্ষণের ইতিহাস আলোকিত হয়ে ওঠে।

পাতুনের দেবদেবীর মূর্তির মধ্যে সবচেয়ে সংখ্যা বেশি হল শিবলিঙ্গের ও কূর্মাকৃতি ধর্মরাজঠাকুরের। ধর্মরাজের এত বিচিত্র কূর্মমূর্তি একত্রে আর কোথাও দেখিনি। ছোটবড় নানাকারের শতাধিক কূর্মমূর্তি পাতুনে স্তূপাকার করা রয়েছে, আর তার সঙ্গে আছে শিবলিঙ্গ। পরিষ্কার বোঝা যায়, ধর্মঠাকুর ও শিব হলেন এই অঞ্চলের বা রাঢ়ের গ্রামদেবতা ও লোকদেবতা। পাতুনের ভাস্করদের স্টুডিওতে তাই এই দুই দেবতার মূর্তি সবচেয়ে বেশি

১ R. D. Banerjee : Eastern Indian School of Mediaeval Sculpture, P. 125; M Ganguly: Handbook to the Sculptures in Vangiya Sahitya Parisad, P. 130.

তৈরি হত। বিশাল বিশাল কাছিমের মতন কূর্মমূর্তিও অনেক আছে। এই সব বিচিত্র কূর্মমূর্তি দেখে পরিষ্কার বোঝা যায়, রাঢ়দেশে ধর্মঠাকুর কূর্মমূর্তিতেই পূজিত হতেন। কূর্মের সঙ্গে ধর্মঠাকুরের সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ ও অবিচ্ছেদ্য। পাতুনের স্তূপীকৃত কূর্মমূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে এছাড়া অন্য কোন সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া সম্ভব নয়। পরে ধর্মঠাকুর কেবল শিলাখণ্ডে রূপান্তরিত হয়েছেন ভাস্কর্যের অবনতির জন্য। অনেক স্থানে ধর্মঠাকুর শিবে পরিণত হয়েছেন। পাতুনের শিবলিঙ্গের প্রাচুর্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মনে হয়, ধ্বংসস্তূপ ও ভগ্ন অসম্পূর্ণ মূর্তির দিকে চেয়ে যেন পাতুনের ভাস্করদের স্টুডিওর চারভাগের তিনভাগ জুড়ে ছিল কূর্মমূর্তি ধর্মরাজ ও শিবলিঙ্গ। ধর্মরাজ যে কূর্মমূর্তি ছেড়ে ক্রমে শিবলিঙ্গে রূপান্তরিত হয়েছেন, তারও যেন একটা আভাস পাওয়া যায় পাতুনের ধ্বংসাবশেষ থেকে। পাতুনের ভাঙাচোরা দেবদেবীর মূর্তির স্তূপের ভিতর থেকে ইতিহাসের লুপ্তধারার এই যে সব ইঙ্গিত পাওয়া যায়, এর গুরুত্ব খুব বেশি।

১৮

২০
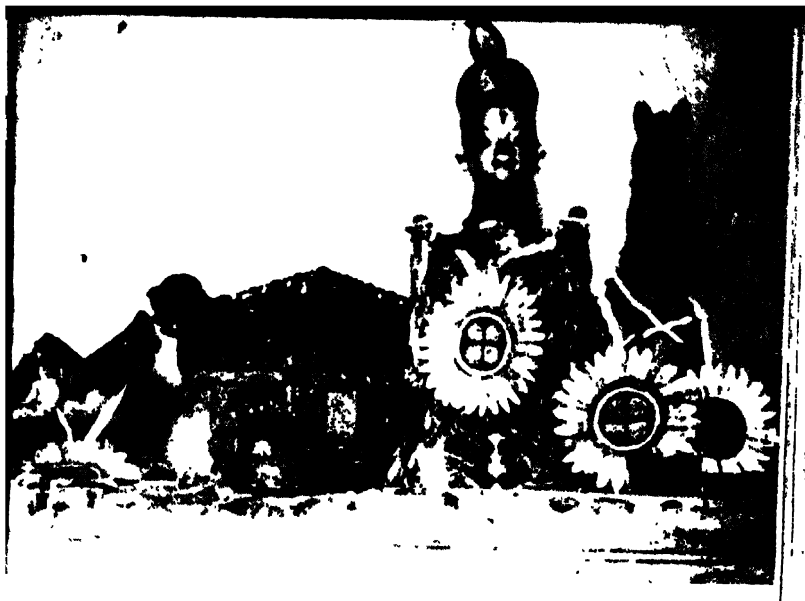
মন্তেশ্বরের চামুণ্ডা পূজা

বেশ বড় গ্রাম মন্তেশ্বর। কালনা মহকুমার মধ্যে এরকম বর্ধিষ্ণু গ্রাম খুব অল্পই আছে। গ্রামের প্রতিপত্তিশালী বাসিন্দারা হলেন উগ্রক্ষত্রিয়। বিভিন্ন পাড়ায় গ্রামটি বিভক্ত—উত্তরপাড়া, মাইচপাড়া, ধাওড়াপাড়া, জোকারীপাড়া, হাটপাড়া। গ্রামের কাছে খড়্গেশ্বরী বা খড়িনদী। ব্রাহ্মণ, চাষী, তিলি, কুম্ভকার ও তন্তুবায়দেরও বাস আছে গ্রামে। ব্যগ্রক্ষত্রিয়, ডোম, বাউরী, চর্মকারদের সংখ্যাও নিতান্ত নগণ্য নয়। গ্রাম্য দেবদেবীর মধ্যে মুক্তেশ্বর শিব, চামুণ্ডা ও সিদ্ধেশ্বরী দেবী এবং ধর্মরাজই প্রধান। চামুণ্ডার উৎসবই সবচেয়ে জমকাল গ্রাম্য উৎসব। উৎসবের বৈশিষ্ট্যের সাংস্কৃতিক তাৎপর্যও গভীর।

মন্তেশ্বর থানায় বিভিন্ন গ্রামে ধর্মরাজ ঠাকুরের প্রতিপত্তি এখনও বেশ অক্ষুণ্ণ আছে দেখা যায়। ধর্মরাজের উৎসবেও বিশেষ ভাটা পড়েনি। মন্তেশ্বর গ্রামে দু'টি ধর্মঠাকুর আছেন, একটির সেবায়েত পরামাণিক, দ্বিতীয়টির সেবায়েত ব্যগ্রক্ষত্রিয়। বৈশাখী পূর্ণিমায় ধর্মের গাজন হয় গ্রামে। বাণফোঁড়া, কাঁটাঝাঁপ, আগুনঝাঁপ ইত্যাদি হয়। মদের হাড়ি মাথায় নিয়ে উন্মত্ত নৃত্য করা আজও উৎসবের অঙ্গরূপে অক্ষুণ্ণ রয়েছে প্রায় বলা চলে। বলিদান তো হয়ই। কিন্তু তার চেয়েও বৈশাখী শুক্লাষ্টমীতে মন্তেশ্বর গ্রামে যে চামুণ্ডার উৎসব ও পূজা হয় তার সাংস্কৃতিক গুরুত্ব অনেক বেশি বলে মনে হয়। চামুণ্ডার পূজা বর্ধমান জেলায় একাধিক স্থানে হয়। কাঞ্চননগরের চামুণ্ডার কথা আগে বলেছি। কোথাও মন্তেশ্বরের মতন এরকম উৎসবের কথা শুনিনি। মনে হয় যেন চামুণ্ডার উৎসবের আদি ও অকৃত্রিম রূপ অনেকটা অবিকৃত অবস্থায় আজও মন্তেশ্বরের গ্রাম্য উৎসবের মধ্যে রয়েছে।

মন্তেশ্বরের চামুণ্ডা-উৎসবের বিবরণ দেবার আগে চামুণ্ডার পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। চক্রবর্তী ব্রাহ্মণরা মন্তেশ্বরের চামুণ্ডার পূজারী। যে ধ্যানে তাঁরা এই চামুণ্ডার পূজা করেন তার মর্মার্থ এই : শ্যামবর্ণ মেঘের মতন দেবীর গায়ের রং। তাঁর চক্ষু তিনটি। নগ্নবেশ, মুণ্ডমালাশোভিত, নতকুচ। চণ্ডমুণ্ডকে সংহার করে দেবী নৃত্য করছেন। পদতলে তাঁর শব ও মহাকাল। ব্রহ্মা-

বিষ্ণু-শিব তাঁকে আরাধনা করছেন। মোক্ষদাত্রী তিনি—কালীমূর্তিতে অভয়বর দিচ্ছেন। ডানহাতে তাঁর পানপাত্র, অসি, ডমরু ও শূল। বাম হাতে ত্রিশূল দিয়ে চণ্ডমুণ্ডকে বধ করছেন এবং অনামিকা কামড়ে জগতের ভয় হরণ করছেন। এই হল মস্তেশ্বরের চামুণ্ডার ধ্যানের মর্মার্থ।

পুরাণে 'চামুণ্ডা'র উৎপত্তি সম্বন্ধে যে কাহিনী আছে তা এই: অসুরপতি দুই ভাই শুম্ভ ও নিশুম্ভের সর্বময় কর্তৃত্বে সন্ত্রস্ত হয়ে স্বর্গের দেবতারা দেবী ভগবতীর শরণাপন্ন হলেন। দেবী দুর্গা-অম্বিকা তাদের অভয় দিয়ে বললেন যে, ভয় নেই—অসুর নিধন করতে হবে। দেবীর রূপের কথা শুনে শুম্ভ প্রলুব্ধ হয়ে তাঁর পাণিপ্রার্থী হল এবং দূত পাঠাল তাঁর কাছে। দেবী বললেন দূতকে—শুম্ভই হোক আর নিশুম্ভই হোক এখানে এসে তাঁকে যে যুদ্ধে জয় করতে পারবে, তারই পাণিগ্রহণ করবেন তিনি। ক্রুদ্ধ শুম্ভের আদেশে চণ্ড ও মুণ্ড চতুরঙ্গবাহিনী নিয়ে যুদ্ধযাত্রা করল। তাদের রণমূর্তি দেখে দেবীর মুখ তৎক্ষণাৎ কালীবর্ণ হয়ে গেল। পরক্ষণেই তাঁর ভ্রূকুটিকুটিল ললাট থেকে করালবদনা কালী আবির্ভূত হলেন। হাতে তাঁর অসি, পাশ ও বিচিত্র খট্বাঙ্গ। ভূষণ নরমালা, বসন ব্যাঘ্রচর্ম। শরীরের মাংস শুকনো। বদনমণ্ডল বিস্তৃত। মূর্তি ভয়াবহ লোলজিহ্বা, রক্তবর্ণ চক্ষু:

> ভ্রূকুটিকুটিলাৎ তস্যা ললাটফলকাদ্দ্রুতম্।
> কালী করালবদনা বিনিষ্ক্রান্তাসিপাশিনী॥
> বিচিত্র খট্বাঙ্গধরা নরমালাবিভূষণা।
> দ্বীপিচর্মপরিধানা শুষ্কমাংসাতিভৈরবা॥
> অতিবিস্তারবদনা জিহ্বাললনভীষণা।
> নিমগ্না রক্তনয়না নাদাপূরিতদিঙ্মুখা॥
>
> (মার্কণ্ডেয়পুরাণ, ৮৭ অ:)

এই মূর্তি ধারণ করে দেবী অসুরসেনাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের ছত্রভঙ্গ করলেন এবং চণ্ড ও মুণ্ড উভয়কে নিহত করে, তাদের শিরসহ দেবী অম্বিকার কাছে উপস্থিত হয়ে উপহার দিলেন। তখন দেবী বললেন:

> যস্মাচ্চণ্ডঞ্চ মুণ্ডঞ্চ গৃহীত্বা ত্বমুপাগতা।
> চামুণ্ডেতি ততো লোকে খ্যাতা দেবি ভবিষ্যসি॥
>
> (মার্কণ্ডেয়পুরাণ—ঐ)

"দেবি! যেহেতু তুমি চণ্ড ও মুণ্ড উভয়কে গ্রহণ করে আমার কাছে এসেছ, সেই হেতু চামুণ্ডা নামে তুমি লোকের কাছে খ্যাত হবে।" এই হল চামুণ্ডার উৎপত্তির পুরাণকাহিনী। কাহিনীর মধ্যে যে সাংস্কৃতিক সত্য রূপকের ছদ্মবেশে আত্মগোপন করে আছে, তা হল আর্য ও অনার্যের সংগ্রাম এবং অনার্য দেবতার আর্যীকরণ। কালী বা চামুণ্ডা কোনকালেই আর্য-দেবতা ছিলেন না, পরে তাঁদের যখন হিন্দু দেবতামণ্ডলীর মধ্যে সসম্মানে গ্রহণ করা হয়েছে তখন এই সব পৌরাণিক কাহিনীর অবতারণা করা হয়েছে। কাহিনীর বিশেষত্ব এই যে, তার মধ্যে অনার্যদের পরাজয়ের কথা সুকৌশলে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, প্রধানত অনার্য দেবদেবীর মাধ্যমেই। হিন্দুধর্মের এই সংস্কৃতি-সমন্বয়ের (acculturation) কৌশল সত্যই অভিনব।

চামুণ্ডার বিভিন্ন মূর্তি ও রূপের বর্ণনা আছে আগমশাস্ত্রে ও পুরাণে। 'অংশুভেদাগম', 'বিষ্ণুধর্মোত্তর' ও 'পূর্বকারণাগম' থেকে চামুণ্ডার বিভিন্ন রূপের বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন শ্রীগোপীনাথ রাও তাঁর বিখ্যাত 'হিন্দু আইকনোগ্রাফি' গ্রন্থের মধ্যে (প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় ভাগ, পরিশিষ্ট 'গ', পৃ ১৫১-১৫২) 'অগ্নিপুরাণেও' (৫০ অধ্যায়) চামুণ্ডার বিভিন্ন রূপের বর্ণনা আছে। তার মধ্যে চামুণ্ডার সাধারণ রূপের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এই ভাবে:

চামুণ্ডা কোটরাক্ষী স্যান্নির্মাংসা তু ত্রিলোচনা।
নির্মাংসা অস্থিসারা বা উর্ধ্বকেশী কৃশোদরী॥
দ্বীপিচর্মধরা বামে কপালং পট্টিশং করে।
শূলং কর্ত্রী দক্ষিণেঽস্যাঃ শবারূঢ়াস্থিভূষণা॥

"চামুণ্ডার তিন নয়ন কোটরে মগ্ন, দেহে মাংস নেই, অস্থিমাত্র সার। কেশ উর্ধ্বগ, উদর কৃশ, পরিধান দ্বীপিচর্ম। বামহাতে কপাল পট্টিশ, ডানহাতে শূল ও কর্ত্রী। ভূষণ অস্থি এবং আসন শব।" এই হল চামুণ্ডার সাধারণ রূপ। এ ছাড়াও আরও নানারকমের রূপ আছে চামুণ্ডার। যেমন:

গজচর্মভৃদূর্ধ্বাস্যপাদা স্যাদ্রুদ্রচর্চিকা।
সৈব চাষ্টভুজা দেবী শিরো-ডমরুকান্বিতা॥
তেন সা রুদ্রচামুণ্ডা নাটেশ্বর্য্যথ নৃত্যতী।
ইয়মেব মহালক্ষ্মীরূপবিষ্টা চতুর্মুখী॥

নৃবাজিমহিষেভাংশ্চ খাদন্তী চ করে স্থিতান।
দশবাহুস্ত্রিনেত্রা চ শস্ত্রাসিডমরুত্রিকম্॥
বিভ্রতী দক্ষিণে হস্তে বামে ঘণ্টাঞ্চ খেটকম্।
খট্বাঙ্গঞ্চ ত্রিশূলঞ্চ সিদ্ধচামুণ্ড কাহ্বয়া॥
সিদ্ধযোগেশ্বরী দেবী সর্বসিদ্ধিপ্রদায়িকা।
এতদ্রূপা ভবেদন্যা পাশাঙ্কুশযুতারুণা॥
ভৈরবী রূপবিদ্যা তু ভুজৈর্দ্বাদশভির্যুতা।
এতাঃ শ্মশানজা রৌদ্রা অম্বাষ্টকমিদং স্মৃতম্॥
ক্ষমা শিবাবৃতা বৃদ্ধা দ্বিভুজা বিবৃতাননা।
দন্তুরা ক্ষেমকারী স্যাদ্ভূমৌ জানুকরা স্থিতা॥

চামুণ্ডার 'রুদ্রচর্চিকা' মূর্তি ঊর্ধ্বাস্যপাদশালিনী ও গজচর্মপরিধানা এবং অষ্টবাহুবিশিষ্টা। 'রুদ্রচামুণ্ডা' নাটের ঈশ্বরী ও নৃত্যরতা। ইনিই মহালক্ষ্মী, চতুর্মুখী এবং সর্বদা উপবিষ্ট হয়ে হস্তস্থিত নৃবাজী, মহিষ ও গজ ভক্ষণ করছেন। এঁর বাহু দশ ও নয়ন তিন। দক্ষিণ হস্তে শস্ত্র, অসি, ডমরু ; বামহস্তে ঘণ্টা, খেটক, খট্বাঙ্গ, ত্রিশূল। ইনিই 'সিদ্ধচামুণ্ডা' নামে সিদ্ধযোগেশ্বরী, সর্ব-সিদ্ধিপ্রদায়িকা। 'রূপবিদ্যা' ভৈরবী দ্বাদশভুজা। শ্মশানে এঁর আবির্ভাব। 'ক্ষমা' দ্বিভুজা, বৃদ্ধা ও শিবা-পরিবৃতা। 'দন্তুরা' জানুকরস্থিতা। এই হল চামুণ্ডার বিভিন্ন মূর্তির বিবরণ। বর্ধমান জেলার একাধিক স্থানে যে চামুণ্ডার মূর্তি পাওয়া গেছে এবং আজও যে চামুণ্ডার পূজা হয় কাঞ্চননগরে বা মন্তেশ্বরে, তা রুদ্রচর্চিকা, রুদ্রচামুণ্ডা বা সিদ্ধচামুণ্ডার মূর্তি। বর্ধমান জেলার অট্টহাসে চামুণ্ডার একটি দন্তুরামূর্তিও পাওয়া গেছে। এই সব বিভিন্ন ও বিশেষ চামুণ্ডা মূর্তি দেখে মনে হয়, একসময় বর্ধমান জেলায় ব্যাপকভাবে চামুণ্ডাপূজার প্রচলন হয়েছিল।

এইবার মন্তেশ্বরের চামুণ্ডাপূজার বিবরণ দেব এবং তারপর তার সাংস্কৃতিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব। চামুণ্ডাপূজা মন্তেশ্বরের সর্বজনীন গ্রাম্য উৎসব বলা চলে। জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলেই এই উৎসবে প্রত্যক্ষভাবে যোগদান করেন এবং বিভিন্ন অ-ব্রাহ্মণ জাতির বিশেষ অধিকার এই উৎসবের মধ্যে এমনভাবে স্বীকার করা হয়েছে যে, উৎসবের প্রধান বিশেষত্ব হিসাবে প্রথমেই সেটা নজরে পড়ে। বৈশাখী শুক্লপক্ষে উৎসব হয়। প্রথমে হয়

ঘাটপূজা। সপ্তমীর রাতে মন্তেশ্বরের গাঁয়ের পুকুরে চামুণ্ডার মূর্তিটি ডুবিয়ে রাখা হয়। পরদিন দ্বিপ্রহরে পুকুর থেকে তোলা হয় সেই মূর্তি। প্রথমে মেঢ়তলার (পূর্বস্থলী থানার) ভট্টাচার্যদের পূজা ও বলিদান হয়। তারপর সন্ধ্যার সময় মাইচতলায় (মঞ্চমাইচ) আনা হয় এবং সেখানে পূজা, ভোগ ও বর্ধমানের রাজাদের মহিষ বলিদান হয়। তারপর ছাগল, শূয়োর, ভেড়া ইত্যাদিও বলিদান দেওয়া হয়। তারপরদিন পূজার পর চামুণ্ডাদেবী গ্রাম প্রদক্ষিণ করেন। ধীবর ও ব্যগ্রক্ষত্রিয়রা পুরোহিতসহ চামুণ্ডাদেবীকে বহন করে গ্রাম প্রদক্ষিণ করে। গ্রামের মধ্যে গ্রাম্য পথের ধারে ধারে মাটির বেদী তৈরি করা হয় বলিদানের জন্য এবং সারা গ্রাম জুড়ে ব্যাপকভাবে বলিদান দেওয়া হয় প্রদক্ষিণের সময়। দশমীর দিন সন্ধ্যার সময় দেবী নিজের মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করেন।

উৎসবের বিশেষত্বগুলি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। প্রথম উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব হল, চামুণ্ডাদেবীকে মন্দিরের বাইরে এনে পূজা ও উৎসব করা হয়। সপ্তমী থেকে দশমীর সন্ধ্যা পর্যন্ত তিনি বাইরে থাকেন, ঘাট থেকে মাইচতলায় আসেন, গ্রাম প্রদক্ষিণ করেন এবং অবশেষে পূজান্তে দশমীর সন্ধ্যায় নিজের মন্দিরে প্রবেশ করেন। মনে হয় যেন ব্রাহ্মণ পূজারীর তত্ত্বাবধানে মন্দিরে অবস্থান অনেক পরবর্তী ঘটনা। তার আগে চামুণ্ডাদেবীর একটা ইতিহাস ছিল, যখন তিনি প্রধানত অ-ব্রাহ্মণদেরই পূজ্য দেবতা ছিলেন এবং হয়ত গ্রামের মধ্যে, কি উপান্তে, কি নদীতীরে শ্মশানে, এমন কোন স্থানে তিনি বিরাজ করতেন। উৎসবের দ্বিতীয় বিশেষত্ব হল, দেবীর গ্রাম-প্রদক্ষিণ। প্রদক্ষিণ ব্যাপারটাই অনার্যদের উৎসবের প্রধান লক্ষণ। 'যাত্রা বা জাত' কথার মধ্যে আজও সেই প্রাগার্যদের উৎসবের গ্রাম-প্রদক্ষিণের বিশেষত্ব অক্ষুণ্ণ রয়েছে। তৃতীয় বিশেষত্ব হল, ধীবর ও ব্যগ্রক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের লোক পুরোহিতসহ দেবীকে বহন করে গ্রাম প্রদক্ষিণ করেন। পরিষ্কার মনে হয় যেন দেবী তাদেরই স্কন্ধে চড়ে গ্রাম প্রদক্ষিণ করেন, যারা তাঁর আদি ও অকৃত্রিম পূজারী। ব্রাহ্মণ পুরোহিত দেবীসহ কাঁধে চড়লেও, সেই সুদীর্ঘকালের অধিকার থেকে তাদের বঞ্চিত করতে পারেননি। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য কি ভাবে জাতীয় উৎসব-পার্বণের বিভিন্ন স্তরে শিলাগাত্রের ফসিলের মতন লিপ্ত হয়ে থাকে, এসব হল তারই নিদর্শন। চতুর্থ বিশেষত্ব হল, ব্যাপক ও নির্বিচার বলিদান।

কেবল ছাগল, ভেড়া বলিদান দেওয়া হয় না, মহিষ ও শূয়োর পর্যন্ত বলি দেওয়া হয়। দু'দশটা নয়, শত শত। কোন নির্দিষ্ট স্থানে নয়—সর্বত্র, গ্রামের পথের ধারে ধারে বেদী করে। মনে হয় যেন, নরবলির ভয়াবহ তাণ্ডবলীলার প্রাগৈতিহাসিক সংস্কারের একটা বৈকল্পিক সমাধান সবেমাত্র করা হয়েছে, তাই বিকল্পের মধ্যে এখনও তার সেই আদিম প্রচণ্ডতার রেশটুকু বজায় রয়েছে।

মন্তেশ্বর গ্রামের চামুণ্ডাপূজার এই বিশেষত্ব থেকে শুধু মন্তেশ্বরের নয়, সারা বর্ধমান জেলার—তথা উত্তররাঢ়ের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের একটা দিক বিশেষভাবে আলোকিত হয়ে ওঠে। চামুণ্ডা হিন্দু দেবী হলেও, একেবারে বৌদ্ধ-প্রভাবমুক্ত নন এবং হিন্দু-বৌদ্ধ যাই হন তিনি, অনার্য বৈশিষ্ট্যও তাঁর অল্প নয়। চীনের নিষিদ্ধ শহর পিপিঙে যে সব দেবদেবীর মূর্তি পাওয়া গেছে তার মধ্যে চামুণ্ডার মূর্তিও আছে। অধ্যাপক ক্লার্ক তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'Two Lamaistic Pantheons'-এর দ্বিতীয় খণ্ডের ১৭৬ পৃষ্ঠায় এই চামুণ্ডার মূর্তির পরিচয় দিয়েছেন।[১] মহাপণ্ডিত অভয়াকর গুপ্তের 'নিষ্পন্নযোগাবলী' গ্রন্থেও চামুণ্ডার বিবরণ আছে।[২] 'চামুণ্ডা' যে বজ্রযানী বৌদ্ধদের দেবদেবীমণ্ডলে গৃহীত হয়েছিলেন তা বেশ বোঝা যায় এবং চামুণ্ডার পূজা পূর্বভারত থেকে নেপাল তিব্বত হয়ে চীন পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল। তাছাড়া 'পঞ্চবুদ্ধ-কিরীটিনম্' মহাকালের যে মূর্তি 'সাধনমালা'র একাধিক সাধনে বর্ণনা করা হয়েছে তা চামুণ্ডার ভৈরবমূর্তি ছাড়া কিছু নয়। বৌদ্ধ 'সাধনমালা'য় একথাও বলা হয়েছে যে, মহাকাল সপ্তদেবী পরিবৃতা হয়ে থাকবেন। পূর্বে মহামায়া, দক্ষিণে যমদূতী, পশ্চিমে কালদূতী, উত্তরে মহাকাল নিজে। প্রত্যেকেরই মূর্তি ভয়াবহ। এছাড়া দক্ষিণ-পূর্ব কোণে কালিকা, দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে চর্চিকা, উত্তর-পশ্চিম কোণে চণ্ডেশ্বরী এবং উত্তর-পূর্ব কোণে কুলিশেশ্বরী থাকবেন। এঁদেরও প্রত্যেকের মূর্তি ভয়াল। সপ্তমাতৃকার রূপায়ণের কথা মনে পড়ে। পল্লব এবং চোল ভাস্কর্যে, গোড়ার দিকে, দক্ষিণভারতে এই সপ্ত-মাতৃকার মূর্তির মধ্যে চামুণ্ডা তরুণীরূপে রূপায়িত হয়েছেন, নাগকুচবন্ধ ও কপাল-যজ্ঞোপবীতসহ। পরবর্তী চালুক্য ভাস্কর্যে এবং উড়িষ্যায় ও বাংলাদেশে

১ শ্রীবিনয়তোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'নিষ্পন্নযোগাবলী' গ্রন্থের পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

২ ঐ: ধর্মধাতুবাগীশ্বরমণ্ডলম্, পৃ ৬২।

চামুণ্ডা অস্থিচর্মসার ও কোটরাক্ষীরূপে রূপায়িত হয়েছেন দেখা যায়। যাই হোক, মনে হয় সপ্তমাতৃকাকেই পরে বৌদ্ধ তান্ত্রিকরা পূর্বভারতে, বিশেষ করে বাংলাদেশে মহাকাল-পরিবৃত সপ্তদেবীতে পরিণত করেছিলেন। তার মধ্যে চর্চিকারূপে চামুণ্ডারও স্থান ছিল। বাংলার বজ্রযানী বৌদ্ধদের এই চর্চিকা-চামুণ্ডাই তিব্বত হয়ে চীনদেশ পর্যন্ত যাত্রা করেন। প্রধানত পালযুগের বৌদ্ধ ও হিন্দু তান্ত্রিক দেবদেবীর মধ্যে এই পারস্পরিক মিলন-মিশ্রণ ও একাত্মীকরণ ঘটতে থাকে। বৌদ্ধ ও হিন্দুতান্ত্রিক উভয়েরই লক্ষ্য ছিল, অসভ্য ও অনার্য আচারপরায়ণ জনসাধারণকে নিজেদের ধর্মসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করা। এই সময় অন্যান্য আরও অনেক দেবদেবীর মতন চামুণ্ডাদেবীও বাংলার ধর্ম ও সংস্কৃতির ইতিহাসে একটা বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। বর্ধমানের মস্তেশ্বর গ্রাম তারই উজ্জ্বল স্মৃতি আজও বহন করছে।

উজানিনগর-কোগ্রাম

'সাধু ধনপতি আমি বসি হে উজানী।
গন্ধবণিক জাতি বিদিত অবনী ॥'

ধনপতি সদাগর এই বলে খুল্লনার কাছে আত্মপরিচয় দিয়েছিলেন। উজানিনগরে লক্ষপতি ধনপতি সদাগরের বাস ছিল। এই হল সেই উজানি-নগর, বর্তমান কোগ্রাম যার একাংশ মাত্র। যেখান থেকে ধনপতি সদাগর পায়রা উড়িয়েছিলেন এবং যে-পায়রা উড়ে গিয়ে খুল্লনার আঁচলে পড়েছিল। যেখানে বিক্রমকেশরী নামে এক রাজা বাস করতেন। অজয় ও কুনুরের সঙ্গম-স্থলের যে উজানি থেকে ধনপতি ও তাঁর পুত্র শ্রীমন্ত সদাগর সিংহল যাত্রা করেছিলেন, যেখানকার মঙ্গলচণ্ডীকে উপেক্ষা করে ধনপতি বলেছিলেন খুল্লনাকে—"কেমন দেবতা এই পূজিস ঘটবারি, স্ত্রীদেবতার আমি পূজা নাহি করি"। এই হল সেই উজানিনগর! ধনপতি ও শ্রীমন্ত সদাগরের বাসস্থান, কবি লোচনদাসের জন্মস্থান। তান্ত্রিক পীঠস্থান ও বৈষ্ণব শ্রীপাট, দুই-ই।

বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমায় মঙ্গলকোট থানার অন্তর্গত উজানি-কোগ্রাম (কোগাঁ নামে পরিচিত)। অজয় ও কুনুরের সঙ্গমস্থলে, অজয়নদের তীরে কোগাঁ। কুনুর একটি ছোট নদী, কোগাঁর দক্ষিণ ও পূর্বদিক বেষ্টন করে অজয়ে মিশেছে। অজয় উত্তরবাহিনী। একদিকে বীরভূম জেলার নানুর থানা আর একদিকে বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট থানা। একদিকে দ্বিজ চণ্ডীদাসের পদাবলী-কীর্তনে মুখর হয়ে উঠেছিল পরিবেশ, আর একদিকে বৈষ্ণবদের 'বড়াইবুড়ী' লোচনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গল' বিচিত্র রাগরাগিণীতে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠেছিল। 'চৈতন্যমঙ্গল' বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবতের' পরবর্তী রচনা। শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার ঠাকুর ছিলেন লোচনদাসের গুরু এবং তাঁর নিবাস ছিল কোগ্রামে। কাব্যের শেষে লোচনদাস যে আত্মপরিচয় দিয়েছেন তাতে স্পষ্টই একথা বলা হয়েছে:

বৈদ্যকুলে জন্ম মোর কোগ্রাম নিবাস।
মাতা সতী শুদ্ধমতি সদানন্দী নাম।
যাহার উদরে জন্মি করি কৃষ্ণকাম।

কমলাকর দাস নামে মোর জন্মদাতা।
যাহার প্রসাদে কহি গৌর গুণগাথা।……
মাতৃকুল পিতৃকুলে বৈসে একগ্রামে।
ধন্য মাতামহী সে অভয়াদাসী নামে।…… ·
মাতৃকুলে পিতৃকুলে কহিল মো কথা।
নরহরিদাস মোর প্রেমভক্তিদাতা।

(চৈতন্যমঙ্গল—শেষখণ্ড)

আধুনিক বাংলার প্রবীণ পল্লীকবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকেরও নিবাস কোগ্রাম। নিষ্ঠুর অজয় কোগ্রামকে ক্রমেই গ্রাস করে ফেলেছে। অজয়ের যে কোন বাঁক থেকে দাঁড়িয়ে দেখলে মনে হয় যেন কোগ্রাম দুর্ধর্ষ নদের ধ্বংসোন্মুখ পাড়ের কিনারায় দাঁড়িয়ে তার পর্ণকুটিরসহ কাঁপছে। কবি কুমুদরঞ্জনের ঘরবাড়ি সব অজয়ের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে, পর্ণকুটির বেঁধে তিনি সরতে সরতে ক্রমে দক্ষিণবাহিনী কুনুরের কোলের দিকে যাচ্ছেন, তবু তাঁর প্রাণের চেয়েও প্রিয় কোগ্রাম তিনি প্রাণ থাকতে ছাড়বেন না। আমরা কবির গৃহেই অতিথি হয়েছিলাম। তাঁর সঙ্গেই ঘুরে ঘুরে গ্রাম দেখেছি এবং গ্রামের কথা শুনেছি। কথাপ্রসঙ্গে কবি বললেন: "তখন তুমি জন্মাওনি, প্রায় বছর চল্লিশ আগেকার কথা। উত্তররাঢ় ভ্রমণে বেরিয়ে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সদলবলে কোগ্রাম এসেছিলেন। আমি যুবক, ঘুরে ঘুরে তাঁকেও গ্রাম দেখিয়েছিলাম।"

বাঁশের কলম দিয়ে তেরেট পাতায় বড় বড় পাতাযোড়া অক্ষরে গান লিখতেন লোচনদাস। তাঁর বাড়ির কুলতলায় একখানি পাথরের উপর বসে পাতাযোড়া অক্ষরে তিনি যখন চৈতন্যমঙ্গল লিখতেন তখন অজয়ের কি রকম রূপ ছিল এবং গ্রামেরই বা কি অবস্থা ছিল তা এখন ঠিক বলা যায় না। অল্পবয়সেই লোচনের বিবাহ হয়েছিল। আমদপুরের কুকুটে গ্রামে ছিল তাঁর শ্বশুরবাড়ি। বিবাহের পর তিনি শ্রীখণ্ডনিবাসী নরহরি সরকার ঠাকুর ও রঘুনন্দনের কাছে বিদ্যাভ্যাস করতে যান। কিংবদন্তী আছে, বিবাহিত হয়েও লোচনদাস দাম্পত্য জীবনযাপন করেননি বলে তাঁর স্ত্রী গ্রামের নাম রেখেছিলেন 'কুগ্রাম'। লোচন তাকে 'কোগ্রাম' করেন এবং এখন সকলে 'কোগাঁ' বলেন। উজানির একাংশ হল কোগ্রাম। মঙ্গলকোটসহ

আশেপাশের কয়েকটি গ্রাম জুড়ে ছিল উজানি-নগর। লোচনদাসের আসল বাস্তুভিটা বা বসতবাড়ির কোন অস্তিত্ব নেই এখন কোগ্রামে। অজয়ের গর্ভে সব বিলীন হয়ে গেছে, যেমন গেছে কবি জয়দেবের অনেক স্মৃতিচিহ্ন কেন্দুবিল্বগ্রামে। লোচনদাসের পাট আছে কোগাঁয়, তার মধ্যে লোচনদাসের সমাধিও আছে। প্রতি বৎসর উৎসবের সময়ে অনেক বৈষ্ণব ও বাউলের সমাবেশ হয় কোগাঁয়।

উজানিনগরের বর্ণনা করেছেন কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম তাঁর 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে। নীলকণ্ঠেরও একটি গান আছে উজানি সম্বন্ধে। গানটি এই :

বলে পরস্পর উজানিনগর
অতি প্রাচীন শহর শুনি,
নয় সামান্য স্থল পরম নির্মল
পূর্বে অজয়ের জল বহিত উজানি।···
চণ্ডীর আভাস তাই করি প্রকাশ,
অত্র স্থানে ছিল শ্রীমন্তের বাস,
সাধুবংশোদ্ভব মঙ্গলারি দাস,
তা'দেরি পূজিতা ঐ মঙ্গলজননী।···
এই ধামের গুণ বর্ণিয়ে বেড়াই
শ্রীবৃন্দাবনে যিনি ছিলেন 'বড়াই'
'লোচন'রূপে হেথায় অবতীর্ণ তিনি।

নীলকণ্ঠের এই গানটি এখনও এই অঞ্চলের লোকমুখে শোনা যায়, বিশেষ করে গ্রাম্য উৎসব-পার্বণের সময়। কবিকঙ্কণ বর্ণিত উজানিনগরের রূপ এই :

উজানিনগর অতি মনোহর
বিক্রমকেশরী রাজা।
করে শিবপূজা উজানির রাজা
কৃপা কৈল দশভুজা॥
উজানির কথা গড়চারি ভিতা
চৌদিকে বেউড় বাঁশ।
রাজার সামন্ত নাহি পায় অন্ত
যদি ভ্রমে একমাস॥

মনে হয় বিক্রমকেশরী উত্তররাঢ়ের কোন সামন্তরাজা ছিলেন। বর্তমান কোগ্রাম, মঙ্গলকোট, আড়াল প্রভৃতি গ্রাম নিয়ে ছিল সেকালের উজানিনগর, দুর্গ ও পরিখা-বেষ্টিত। সেকালের গ্রাম্য দুর্গগুলি বেউড়বাঁশের বনে ঘেরা থাকত। বাঁশবন অত্যন্ত দুর্ভেদ্য। ঘনরামও 'ধর্মমঙ্গলে' এই বাঁশগড়ের কথা বলেছেন :

বেড়ুবাঁশে বেষ্টিত বিষম গড়খানা।
দ্বারবদ্ধ পাষাণে সম্মুখে দিল হানা॥

উজানিনগর সম্বন্ধে মুকুন্দরাম বলেছেন : "বিক্রমকেশরী, তাঁহার নগরী আছে কত সদাগর।" উত্তররাঢ়ের সদাগর-প্রধান স্থান ছিল উজানি। একথা মঙ্গলকাব্যের বিভিন্ন হাতে-লেখা পুঁথিতে আরও পরিষ্কার করে বলা হয়েছে। ১৭০০ শকের হাতে-লেখা কবিকঙ্কণ চণ্ডীর পুঁথিতে আছে—

গন্ধবাণ্যা জাতি উজয়নি স্থিতি
দত্তকুলে উতপতি।
অজয়ের তটে গঙ্গার নিকটে
বসি নাম ধনপতি॥

ক্ষেমানন্দের 'মনসামঙ্গল' পুঁথিতে আছে—"শুনহ সনকা এই কহিএ তোমারে। লখিন্দরের বিভা দিব উজানিনগরে।" নারায়ণদেবের 'পদ্মাপুরাণের' পুঁথিতে আছে—"মাএ জিজ্ঞাসিলে আমি কি দিব উত্তর। কি কথা কহিব আমি উজানিনগর।" ক্ষেমানন্দ কেতকাদাসের 'মনসামঙ্গলে' আছে "সাধু ধনপতি বৈসে উজানিনগরে।" বংশীদাসের 'পদ্মাপুরাণে' আছে :

উজানিনগর তথি গন্ধবণিক জাতি
সাহেরাজা বড় ধনেশ্বর।
তার কন্যা বিপুলা রূপে জিনি চন্দ্রকলা
সেহি কন্যার যোগ্য লখিন্দর।

বিজয়গুপ্তের 'মনসামঙ্গলে' আছে :

চম্পকনগরের রাজা উজানিতে গেলা।
সাত শত চলিয়াছে সোনারূপার দোলা॥

'চম্পকনগর'ও বর্ধমানে। উজানি ধনপতি শ্রীমন্তের বাসস্থান নয় শুধু, লখিন্দরের শ্বশুরবাড়ি, বেহুলার বাপের বাড়ি। মঙ্গলকাব্যের কবিরা প্রায়

সকলেই এই কথা বলেছেন। উত্তররাঢ়েই যে উজানি ও চম্পকনগর দুয়েরই অবস্থান, তারও স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য থেকে। জনার্দন পণ্ডিতের পাত্র নির্বাচন থেকে বণিকদের নাম ও বাসস্থানের একটি তালিকা দিচ্ছি এখানে :

চম্পকনগরী—চাঁদসদাগর
বর্ধমান—ধুস দত্ত ও সোম দত্ত
সাতগাঁ—রাম দাঁ
বড়শূল—হরি দত্ত
ফতেপুর—রাম কুণ্ডু
কর্জনা—হরি লাহা
ভাল্লকি—সোম চন্দ্র

স্থানগুলি বর্ধমান ও হুগলী জেলায়। খুল্লনার পাত্রনির্বাচন-প্রসঙ্গের চেয়ে ধনপতির পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে উজানিতে বিভিন্নস্থান থেকে যে বণিকদের সমাগম হয়েছিল তার অনেক বেশি বিস্তৃত তালিকা দিয়েছেন কবিকঙ্কণ। তালিকাটির ঐতিহাসিক ও সামাজিক মূল্য খুব বেশি। বণিকদের নামধাম এইভাবে দেওয়া হয়েছে :

বর্ধমানের ধুস দত্ত; চম্পাইনগরের চাঁদসদাগর, লক্ষ্মী সদাগর; কর্জনার নীলাম্বর ও তাঁর সাত ভাই; গণেশপুরের সনাতন চন্দ ও তাঁর ভাই গোপাল, গোবিন্দ; দশঘরার বাসুলা; সপ্তগ্রামের শ্রীধর হাজরা; সাঁকোর শঙ্খ দত্ত, বিষ্ণু দত্ত ও তাঁর সাত ভাই; কাঁইতির যাদবেন্দ্র দাস; জাড়গ্রামের রঘু দত্ত; তেঘরার গোপাল দত্ত; ত্রিবেণীর রাম রায় ও তাঁর দশ ভাই; লাউগাঁর রাম দত্ত; পাঁচড়ার চণ্ডীদাস খাঁ; সাতগাঁর রাম দাঁ; বিষ্ণুপুরের ভাগ্যবন্ত খাঁ; খণ্ডঘোষের বাসু দত্ত; গোতানের মধু দত্ত ও তাঁর পাঁচ ভাই, ইত্যাদি—

একে একে বণিকের কত কব নাম।
সাত শত বেনে আইসে ধনপতি ধাম॥

প্রধানত রাঢ়দেশের বর্ধমান ও হুগলী অঞ্চলের বণিকদেরই নাম করেছেন কবিকঙ্কণ। সাতশত বণিকের সমাগম হয়েছিল ধনপতির গৃহে উজানিতে। কেবল কল্পিত সমাগম হলে এত বিস্তারিত বিবরণ মুকুন্দরাম কষ্ট করে দিতেন না। বিশেষ করে কবিকঙ্কণের সামাজিক বাস্তবতাবোধ এত সজাগ

যে, তিনি বণিকদের বাসস্থানের পরিষ্কার ভৌগোলিক নির্দেশ পর্যন্ত দিয়ে দিয়েছেন। বর্ধমানের উজানি, চম্পাইনগর, কর্জনা থেকে হুগলীর সপ্তগ্রাম পর্যন্ত বণিকদের যে বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল তা পরিষ্কার বোঝা যায়। এই বণিকরা কারা? প্রধানত বাংলাদেশের সুবর্ণবণিক, গন্ধবণিক ও তাম্বুলি-বণিকেরা। বর্ধমান ও হুগলী জেলা কেন্দ্র করে একটা অত্যন্ত শক্তিশালী ও সঙ্ঘবদ্ধ বণিকসমাজ গড়ে উঠেছিল একসময় বাংলাদেশে। মধ্যযুগের বাংলার অর্থনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসে এই সুবর্ণবণিক, গন্ধবণিক ও তাম্বুলিবণিকদের একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। এই বণিক সমাজের ইতিহাস বাদ দিয়ে বাংলার সামাজিক ইতিহাস রচনার কোন প্রচেষ্টাই সার্থক হতে পারে না। মধ্যযুগে একালের মতন 'অবাধ বাণিজ্য' বলে কিছু ছিল না, সামন্তরাজাদের বিধিনিষেধ ছিল যথেষ্ট। সাধারণত মধ্যযুগের ভূপতি ও ভূস্বামীরা বণিকদের সুনজরে দেখতেন না এবং নানাভাবে তাঁদের সামাজিক প্রতিপত্তি খর্ব করার চেষ্টা করতেন। ইয়োরোপের ইতিহাসে এই রাজা-বণিকে দ্বন্দ্বের দৃষ্টান্ত বিরল নয় মধ্যযুগে, আমাদের বাংলাদেশেও মনে হয় তার বিশেষ ব্যতিক্রম হয়নি। ইয়োরোপে যেমন বণিকরা রাজারাজড়াদের গড়বেষ্টিত প্রাসাদ ও দুর্গের বাইরে নতুন বসতি ও বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপন করে ধীরে ধীরে 'টাউন' বা বাণিজ্য-নগর গড়ে তুলেছিলেন, আমাদের বাংলাদেশের বণিকরাও কতকটা তাই করেছিলেন। প্রধানত নদনদীর তীরে, জলপথে চলাচলের সুবিধার দিকে দৃষ্টি রেখেই তাঁরা বসতি স্থাপন করতেন। পশ্চিমবঙ্গে সুবর্ণবণিক, গন্ধবণিক ও তাম্বুলিবণিকরা প্রধানত নদনদীবহুল বর্ধমান ও হুগলী জেলায় এইভাবে একাধিক বসতি স্থাপন করেছিলেন এবং তার মধ্যে অনেক বসতি ক্রমে বাণিজ্যপ্রধান কেন্দ্ররূপে নগর বলে পরিচিত হয়েছিল। কতকটা মধ্যযুগীয় 'গিল্ডের' মতন তাঁরা দলবদ্ধভাবে 'সমাজ'ও গঠন করেছিলেন। মধ্যযুগের শেষে দেখা যায়, বাংলার সুবর্ণবণিক সমাজে এইভাবে দু'টি প্রধান সমাজের উৎপত্তি হয়েছিল—একটি বর্ধমানের কর্জনা কেন্দ্র করে 'রাঢ়ী সমাজ' আর একটি 'সপ্তগ্রামিক সমাজ'। রাষ্ট্রদুর্যোগে অথবা নদনদীর গতি-পরিবর্তনের ফলে বাণিজ্যিক বিপর্যয়ে এই ধরনের 'সমাজ' ভেঙে গেছে, আবার নতুন করে গড়ে উঠেছে। সুবর্ণবণিক কুলজীতে বর্ধমানের 'কর্জনা'র সমাজ ভাঙার কথা লেখা আছে:

চৌদ্দশত ছত্রিশ শকে ভাঙ্গিল কর্জনা,
রাজপীড়ায় পীড়িত হইল সর্বজনা।
বিশেষ বণিক সব ছিল সুখবাসী,
পরিবার সহিত হইল নানাদেশী।
নিকটে রহিল কেহ, কেহ গেল দূরে,
নিবাস নিয়ম নাই কেবা তত্ত্ব করে।[১]

আসলে বাণিজ্যিক প্রাধান্যটাই বণিকসমাজের কাছে অগ্রগণ্য। বৈদেশিক আক্রমণ, রাষ্ট্রবিপ্লব, প্রাকৃতিক পরিবর্তনাদির (নদনদীর গতি) ফলে রাঢ়দেশের বাণিজ্যিক গুরুত্ব যেমন কমতে থাকে, বণিকসমাজেরও তেমনি ভাঙন ধরতে থাকে। তারপর পর্তুগীজ, ডাচ, ফরাসী, ইংরেজ আমলে এই বণিকরা ক্রমে তাদের পশ্চাদনুসরণ করে সপ্তগ্রাম থেকে হুগলী, চুঁচুড়া হয়ে ক্রমে কলকাতা মহানগরীতে আসেন। ইংরেজ আমলে বাণিজ্যের অনেক বেশি সুযোগ ও স্বাধীনতা পেয়ে তাঁরা কলকাতার সমাজেও বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেন।

মধ্যযুগের গোড়া থেকেই মনে হয় বাংলাদেশের রাঢ় অঞ্চলে এই গন্ধবণিক সুবর্ণবণিক, তাম্বুলিবণিক প্রভৃতি বণিকশ্রেণীর বাস ছিল। তখন তাঁরা বিভিন্ন বাণিজ্যিক শ্রেণীতে হয়ত বিভক্ত হননি, হওয়াও আশ্চর্য নয়। বর্ধমান জেলার গল্‌সী থানার অন্তর্গত মল্লসারুল গ্রামে আনুমানিক ষষ্ঠ খৃষ্টাব্দের যে তাম্রশাসন পাওয়া গেছে তাতে এই অঞ্চলের মহত্তরদের ও অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তার মধ্যে এই নামগুলি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য বলে মনে হয় বণিকশ্রেণীর প্রসঙ্গে :

বক্কত্তকবীথী-সম্বন্ধ অর্ধকরক-অগ্রহারের মহত্তর হিম দত্ত ;
বটবল্লক অগ্রহারের মহত্তর ষষ্ঠী দত্ত ও শ্রীদত্ত ;
গোধগ্রাম অগ্রহারের মহি দত্ত ও রাজ্যদত্ত—

এই গ্রামগুলি অধিকাংশ এখনও বর্ধমানে আছে, যেমন 'বক্কত্তক' (অধুনা বাকৃতা), গোধগ্রাম (অধুনা গোগাঁ), ইত্যাদি। মহত্তরদের মধ্যে এই হিম দত্ত, ষষ্ঠী দত্ত, শ্রীদত্ত, মহি দত্ত প্রভৃতি কারা? বণিকদের আদিপুরুষ ছাড়া তাঁরা অন্য কেউ নন। সুতরাং প্রায় দেড় হাজার বছর ধরে বর্ধমানে তথা উত্তর রাঢ়ে এই গন্ধবণিক, সুবর্ণবনিক, তাম্বুলিবণিক প্রভৃতি সদাগররা যে বাস

১ নিমাইচাঁদ শীলের 'সুবর্ণবণিক' ও কুঞ্জলাল ভূতির 'সুবর্ণবণিক' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

করছেন তার প্রমাণই পাওয়া যাচ্ছে। শত শত বৎসর ধরে বাণিজ্য করে তাঁরা বংশানুক্রমে বিরাট সঞ্চিত মূলধনের মালিক হবেন, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এই কারণে ধনপতি সদাগর, শ্রীমন্ত সদাগর, চাঁদ সদাগর, লখিন্দর প্রভৃতি বাংলা মঙ্গলকাব্যের সদাগর-নায়করা বর্ধমান জেলার এই সব অঞ্চলের বাসিন্দা হওয়াই সম্ভব বলে মনে হয়। সাতশত ধনিক বণিক যে উজানিতে ধনপতি-গৃহে উপস্থিত হয়েছিলেন, দেড় হাজার বছরের বাণিজ্যের ইতিহাসে তাও আদৌ অসম্ভব নয়। বাংলাদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস যেদিন সত্যই লেখা হবে সেদিন চম্পাইনগর, উজানিনগরের মতন আরও অনেক মধ্যযুগীয় নগরের ইতিহাস এবং চাঁদসদাগর, ধনপতি সদাগরের মতন আরও অনেক সদাগরের লক্ষ লক্ষ টাকা পুঁজি-সঞ্চয়ের কাহিনীও নতুন করে লেখা হবে। তখন একথাও মনে হবে যে মঙ্গলকাব্যের কবিদের উজানিনগরের বর্ণনা, বা মধুকর, দুর্গাবর, শঙ্খচূড়, চন্দ্রপাল, ছোটমুটী, গুয়ারেখী, নাটশালা প্রভৃতি সদাগরী ডিঙার বর্ণনা কেবল নিছক কবি-কল্পনা নয়, তার মধ্যে অনেকখানি ঐতিহাসিক সত্যও লুকিয়ে আছে।

বাংলার অর্থনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসে গন্ধবণিক, সুবর্ণবণিক, তাম্বুলি-বণিক প্রভৃতি বিভিন্ন বণিকজাতির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্বন্ধে পূর্বে আভাস দিয়েছি। ইতালির ফ্রেস্কোবল্ডি, গুয়াল্‌তারত্তি, স্ট্রৎসি, মেডিচি বা জার্মানির ফাগার, ওয়েলসারের মতন, আমাদের বাংলাদেশের ধনপতি সদাগর, চাঁদসদাগর সাহবণিক প্রভৃতিরা ছিলেন। রাঢ়দেশের নদনদীর তীরে তাঁরা বাণিজ্যপ্রধান বর্ধিষ্ণু নগর স্থাপন করেছিলেন, যেমন চম্পাইনগর, কর্জনা, উজানি ইত্যাদি। ক্রমে ভৌগোলিক ও রাষ্ট্রিক ভাগ্যবিপর্যয়ের ফলে তাঁরা কলকাতা শহরে ও অন্যান্য স্থানে ছড়িয়ে পড়েন। বাংলার নবযুগের ইতিহাস বাংলার সদাগর-জাতির এই ইতিহাসের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত।

প্রাচীন গৌড় ও রাঢ়ের ভৌগোলিক বা রাষ্ট্রিক সীমানা তেমন নির্দিষ্ট ছিল বলে মনে হয় না। সুতরাং বণিকরা গৌড়দেশ থেকে, না রাঢ়দেশ থেকে বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছেন, তা নিয়ে তর্ক করা বৃথা। বর্ধমান জেলায় গলসী থানার অন্তর্গত মল্লসারুল গ্রামে যে তাম্রশাসনখানি পাওয়া গেছে, তা

এ অঞ্চলের সবচেয়ে প্রাচীন ঐতিহাসিক নজীর। বিশেষজ্ঞরা অনুমান করেন, তাম্রশাসনখানি ষষ্ঠ খৃষ্টাব্দের, অর্থাৎ প্রায় দেড় হাজার বছর আগেকার। গলসী-মল্লসারুল কেন্দ্র থেকে কর্জনা, উজানি, বর্ধমান, চম্পাইনগর, সাঁকো প্রভৃতি অঞ্চল খুব বেশি দূর নয়। মল্লসারুল তাম্রশাসনের মহত্তরদের মধ্যে হিম দত্ত, ষষ্ঠী দত্ত, শ্রীদত্ত, মহি দত্ত, রাজ্য দত্ত প্রভৃতি যে দত্তদের নাম আছে তাঁরা এই সদাগর-জাতিরই পূর্বপুরুষ বলে মনে হয়। মনে হবার একাধিক কারণ আছে। মল্লসারুল তাম্রশাসনের প্রায় এক হাজার বছর পরে কবি কঙ্কণ-মুকুন্দরাম বণিকদের নামধাম বসতির যে বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন তার মধ্যেও 'দত্ত' উপাধিধারী অনেকের নাম আছে। গন্ধবণিক তাঁরা। আজও অজয় ও দামোদরের দুই তীরবর্তী অনেক গ্রামে গন্ধবণিক, সুবর্ণ-বণিক, তাম্বুলিবণিক প্রভৃতিদের বাস আছে। তাঁদের মধ্যে অনেকে আজও অত্যন্ত অবস্থাপন্ন এবং গ্রামের মধ্যে সবচেয়ে ধনী বলে গণ্য। গ্রামের মধ্যে বিরাট বিরাট অট্টালিকার অধিকাংশই আজও এই বণিকদের অতীত সমৃদ্ধির স্মৃতিচিহ্নরূপে দাঁড়িয়ে আছে। 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যের কবি ঘনরাম লাউসেনকে উজানি-কোগ্রামের পাশে মঙ্গলকোটে হরি তাম্বুলির গৃহে নিয়ে গিয়েছিলেন :

গুরুগতি কর্জনা রাখিয়া দুইজনে।
প্রবেশে মঙ্গলকোট রজনীবদনে ॥···
হরিদাস তাম্বুলিসনে পথে দেখা।
মিলিল বিদুর যেন গোবিন্দের সখা ॥

আজও যদি কেউ বর্ধমান জেলার মানকর গ্রামে যান তাহলে তাম্বুলিপাড়ায় পা দিলেই তাম্বুলিবণিকদের অতীত সমৃদ্ধির চিহ্ন দেখে বিস্মিত হবেন। তেমনি অজয় নদের ওপারে কেউ যদি বীরভূম জেলার কীর্ণাহার ও তার পার্শ্ববর্তী গ্রামে যান, তাহলে এখনও 'দত্ত' উপাধিধারী গন্ধবণিকদের সমৃদ্ধি দেখে স্তম্ভিত হবেন। বর্ধমান ও হুগলী জেলার একাধিক গ্রামে আজও এই বণিকজাতির অতীত প্রতিপত্তি ও সমৃদ্ধির চিহ্ন দেখা যায়। বসতিগুলি সবই প্রায় নদীর তীর ধরে গড়ে উঠেছিল। শীর্ণকায় খাল বা শুকনো খাত ছাড়া সেই সব নদীর কোন চিহ্ন নেই আজ। নদনদীর ভাঙাগড়ার সঙ্গে সঙ্গে বণিকদের ভাগ্য গড়েছে ভেঙেছে। ক্রমে নদীর তীর ধরেই

২১

২২

সপ্তগ্রাম-হুগলী থেকে কলকাতা শহর ও অন্যান্য স্থানে তাঁরা আবার বাসা বেঁধেছেন।

এই বণিকজাতির প্রায় দেড় হাজার বছরের একটা ইতিহাসের আভাস পাওয়া যাচ্ছে এখানে এবং এই রাঢ়দেশেই। তার মধ্যে বর্ধমান জেলার দামোদর, অজয়, খড়েগশ্বরী (খড়িনদী), গাঙ্গুর প্রভৃতি নদনদীর তীরবর্তী এই অঞ্চলগুলিতে বণিকজাতির পুরুষানুক্রমিক বসতির আভাস আরও অনেক স্পষ্টতর বলে মনে হয়। বিপ্রদাস, মুকুন্দরাম, ঘনরাম প্রভৃতি মঙ্গলকাব্যের কবিরা তার বিবরণ পর্যন্ত দিয়েছেন। মল্লসারুল তাম্রশাসন থেকে মুকুন্দরাম-ঘনরাম পর্যন্ত প্রায় হাজার বছর বা ত্রিশ চল্লিশ পুরুষের ব্যবধান। তার কোন লিখিত ইতিহাস নেই। কিন্তু তাম্রশাসনোল্লিখিত হিম দত্ত, ষষ্ঠী দত্ত, শ্রীদত্ত, রাজ্য দত্ত, মহি দত্ত প্রভৃতি মহত্তররা যদি সকলেই নির্বংশ না হয়ে থাকেন তাহলে ত্রিশ-চল্লিশ পুরুষ পরে ধনপতি সদাগর ও চাঁদ সদাগরের কাহিনী মিথ্যা না হবার সম্ভাবনাই বেশি। অন্তত তাঁদের ধনদৌলত সঞ্চয় ও বাণিজ্যের কাহিনী অবাস্তব নয়। যে সাতশত প্রতিষ্ঠিত বণিক-পরিবারের প্রতিনিধিদের সমাগম হয়েছিল ধনপতি-গৃহে উজানিতে, তাঁরা কেউ হঠাৎ গজিয়ে ওঠেননি। তাঁদের স্থানীয় বসতিও এক-আধ শতাব্দীর নয়। বাংলার সদাগরদের প্রাচীন বসতি ও বাণিজ্যকেন্দ্রের ভৌগোলিক সীমানার নির্দেশ যদি এইভাবে পাওয়া যায়, তাহলে বাংলার সংস্কৃতির ইতিহাসের একটা প্রায়ান্ধকার দিক অনেকটা আলোকিত হয়ে ওঠে। ধনপতি-শ্রীমন্ত, বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনীর উৎপত্তি-কেন্দ্র এবং চণ্ডী মনসা প্রভৃতি অনার্য দেবীপূজার সামাজিক প্রচলনের পূর্ব-সংঘাতকেন্দ্র কোথায়, তারও আভাস পাওয়া যায়। পূর্বোক্ত তথ্যাদি থেকে মনে হয়, এই কেন্দ্র রাঢ়দেশের মধ্যস্থলে কোথাও।

তার মানে, বর্ধমানের এই অঞ্চলেই যে অনার্য দেবদেবী, পূজাপদ্ধতি ও ধর্মাচরণের সঙ্গে হিন্দু দেবদেবীর সংঘাত ও বিরোধ হয়েছিল প্রথমে, তা নয়। রাঢ়ের সীমান্ত বীরভূম বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলার ভিতর দিয়ে এই বিরোধের ধারা প্রবাহিত হয়ে এসে হয়ত নিষ্পত্তিকালে রাঢ়কেন্দ্র বর্ধমানে তীব্র রূপ ধারণ করেছিল। শিবের মতন দেবতারা অনেক আগেই এই সংঘাতের স্তর অতিক্রম করে এসেছিলেন। বাংলাদেশে আর্যসংস্কৃতির বিস্তারের আগেই শিব হিন্দু দেবতামণ্ডলের অন্যতম প্রধান দেবতারূপে গৃহীত হয়েছিলেন।

চন্দ্রবর্মা বিষ্ণুভক্ত ছিলেন, শশাঙ্ক ছিলেন শৈব। উদীয়মান বণিকজাতির পক্ষে মধ্যযুগে রাজধর্মের অনুগত হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ অনার্য সংস্কৃতির বাহক তাঁরা ছিলেন না। বৈদিক যুগ থেকেই আমরা দুঃসাহসী বণিক অভিযাত্রীর সন্ধান যখন পাই, তখন অনেকটা বোঝা যায় যে, এই সব বণিকজাতি প্রাগার্য সমাজভুক্ত নন। আর্যসুলভ ধর্মাচরণ, আচার-ব্যবহারই তাঁদের জাতীয় চরিত্রের বিশেষত্ব ছিল বলে মনে হয়। তাঁরা ছিলেন বাংলা-দেশে আর্য-সংস্কৃতির উত্তরসাধক। তারই প্রতিভূ বলে তাঁরা গণ্য হতেন। শিবভক্ত বা বিষ্ণুভক্ত অনেক আগেই তাঁরা হয়েছিলেন। কিন্তু তাতেই সমস্যা মিটে যায়নি, বিশেষ করে বাংলাদেশে। বাংলাদেশের আঞ্চলিক সংস্কৃতিতে আর্য উপাদানের প্রাধান্য ছিল খুব বেশি। চণ্ডী, মনসা ইত্যাদি দেবদেবীর প্রতিপত্তি খর্ব করা সহজসাধ্য ছিল না। পশ্চিমবঙ্গ বা রাঢ়দেশের একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত ঘুরলে আজও পরিষ্কার দেখা যায়, এই সব জনদেবতার প্রাধান্য এখনও অক্ষুণ্ণ আছে, চণ্ডী ও মনসার তো আছেই। বীরভূম বাঁকুড়া জেলায় এমন কোন গ্রাম আছে কিনা সন্দেহ যেখানে একাধিক স্থানে চণ্ডী ও মনসা প্রতিষ্ঠিত নেই। উল্লেখযোগ্য হল, যেখানে ধর্মরাজ ঠাকুর আছেন সেখানে চণ্ডী বা মনসা আছেন এবং প্রস্তরখণ্ডরূপে তাঁরা বিরাজ করছেন। বীরভূম-বাঁকুড়া থেকে বর্ধমানের ভিতর দিয়ে হুগলী-হাওড়া পর্যন্ত এই চণ্ডী-মনসা-ধর্মরাজের বেশ কয়েকটি বিস্তৃত প্রতিপত্তি-কেন্দ্রের বৃত্তরেখা টানা যায়। নৃতত্ত্বের সাংস্কৃতিক সূত্র অনুযায়ী এই সব তথ্যাদি থেকে এইটুকু অনুমান করা যায় যে, ধর্মরাজ ও চণ্ডী-মনসাদি দেবতার উৎপত্তি ও প্রচার হয়েছে এই অঞ্চলের একাধিক কেন্দ্র থেকে। অধিকাংশ সংস্কৃতিবিজ্ঞানী আজকাল কোন সাংস্কৃতিক উপাদানের এককেন্দ্রিক বিকাশে (Single Origin) বিশ্বাস করেন না, বহুকেন্দ্রিক বিকাশে (Multiple Origin) বিশ্বাস করেন। তাই মনে হয়, রাঢ়দেশের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত একাধিক কেন্দ্রে এই আর্য-অনার্যের আদর্শসংঘাত হয়েছিল, ধর্ম চণ্ডী মনসাদি দেবদেবী নিয়ে। ব্রাহ্মণ-প্রধান ও বণিকপ্রধান গ্রাম্যসমাজগুলিই সংঘাতের অন্যতম কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল মনে হয়। এই সংঘাতের ফলে ধর্মরাজ শিবে পরিণত হয়েছেন, এবং চণ্ডী শীতলা মনসাদি দেবতা সমাজের সর্বজনের পূজ্য হয়েছেন। চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল, শীতলামঙ্গল ইত্যাদির কাহিনীর মধ্যে এই সংঘাতের রূপই ফুটে

উঠেছে। সংঘাতকেন্দ্রের মধ্যে বর্ধমানের উজানিনগর, চম্পাইনগর ইত্যাদি অন্যতম। কাহিনীর মূল কাঠামোটি হয়ত অনেক আগে থেকে লোকমুখে লোকগাথা ইত্যাদির মাধ্যমে প্রচলিত ছিল। পরে মঙ্গলকাব্যের মধ্যে গৃহীত হয়েছে।

রাঢ়ের আরও অন্যান্য কেন্দ্রের মতন উজানিনগরেও বৌদ্ধ ও তান্ত্রিকদের প্রাধান্য ছিল মনে হয়। বৌদ্ধ, জৈন, বৌদ্ধতান্ত্রিক ও হিন্দুতান্ত্রিকদের বেশ প্রতিপত্তি ছিল এই অঞ্চলে। তার কিছু কিছু ঐতিহাসিক নিদর্শন এখনও পাওয়া যায়। 'পীঠমালা' গ্রন্থে উজানির উল্লেখ আছে :

উজানিতে কফোনি মঙ্গলচণ্ডী দেবী।
ভৈরব কপিলাম্বর শুভ যাঁরে সেবি ॥

'তন্ত্রচূড়ামণির' মতেও দেখা যায়, উজানিতে দেবী মঙ্গলচণ্ডিকা ও ভৈরব কপিলাম্বর বিরাজ করেন। 'শিবচরিত' গ্রন্থে উজানি মহাপীঠ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। 'কুব্জিকাতন্ত্রে' মঙ্গলকোটে উক্ত পীঠস্থান নির্দেশ করা হয়েছে। 'মঙ্গলকোষ্ঠ' নামে বিখ্যাত তান্ত্রিক কেন্দ্র ছিল ওড্ডিয়ানে, উত্তর-পশ্চিমে (ওড্র-উড়িষ্যা বা উজানি নয়)। বৌদ্ধ তন্ত্রশাস্ত্রে এই 'মঙ্গলকোষ্ঠের' উল্লেখ আছে। মনে হয়, পরবর্তীকালে বাংলাদেশে বৌদ্ধতন্ত্রের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হবার পর বৌদ্ধ তান্ত্রিকরাই উত্তর-পশ্চিমের 'মঙ্গলকোষ্ঠের' অনুকরণে বাংলা 'মঙ্গলকোট ও উজানি' নামকরণ করেন। সেই মঙ্গলকোটের দেবী বলে চণ্ডীর নাম হয় 'মঙ্গলচণ্ডী'। বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের দেওয়া নাম যদি হয়, তাহলে উজানি-কোগ্রাম-মঙ্গলকোট অঞ্চলে একসময় বৌদ্ধ তন্ত্রযানীদের যে রীতিমত প্রাধান্য ছিল, তাতে সন্দেহের বিশেষ অবকাশ থাকে না। কোন্ সময়? পাল রাজত্বকালে। মুসলমানদের অভিযানকাল পর্যন্ত হয়ত তার সামাজিক প্রভাব ছিল, তারপর নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। বাকি তার যে লোকায়ত রূপ ছিল তা সহজিয়া সাধকরা এবং অজয়ের ওপারের দ্বিজ চণ্ডীদাস থেকে এপারের লোচনদাস পর্যন্ত পদাবলী রচয়িতারা আত্মসাৎ করে নিয়েছেন সহজেই। শ্রীখণ্ডের ইতিহাসও তাই।

উজানি-মঙ্গলকোটের তান্ত্রিক প্রাধান্যের স্মৃতি একটি নামের মধ্যে মঙ্গলকাব্যের কবিরা চিরস্থায়ী করে রেখে গেছেন। নামটি হল 'ভ্রমরার দহ'। আমার মনে হয়, নামটি তন্ত্রপ্রসঙ্গে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, যদিও সহজে তা মনে

হবার কথা নয়। উজানিনগরে যখন বণিকদের বসতি ছিল তখন তাঁদের বাণিজ্যডিঙা সব এই ভ্রমরার দহে নোঙর করা বা ডোবানো থাকত। ধনপতি দত্ত এই ভ্রমরার দহ থেকে ডিঙায় চেপে সিংহলে বাণিজ্য যাত্রা করেছিলেন। ধনপতির পুত্র শ্রীমন্ত দত্তও এই ভ্রমরার দহে সাতখানা সমুদ্রগামী পোত ভাসিয়ে পিতার সন্ধানে সিংহল যাত্রা করেন ঃ

প্রথমে ভ্রমরাজলে শ্রীমন্ত নৌকায় চলে
পূজিয়া মঙ্গলচণ্ডিকায়।
এড়ায় ভ্রমরা-পাণি, সম্মুখেতে উজানি,
নিজ গ্রাম এড়াইয়া যায় ॥

—কবিকঙ্কণ

সদাগররা যখন স্বগ্রামেই থাকতেন, বাণিজ্যে যেতেন না, তখন ডিঙাগুলি ভ্রমরার জলে ডোবানো থাকত। বাণিজ্য যাত্রার আগে নৌকাগুলি জল থেকে তুলে মেরামত করে গাবকালি করা হত। ভ্রমরার দহ তখন খুব গভীর ছিল। ডুবুরী নামিয়ে ডিঙা তুলতে হত ঃ

পূর্ব হইতে ছিল ডিঙা ভ্রমরার জলে।
ডুবুরী লইয়া সাধু গেল তার কূলে।
ঘাটে জলদেবতার করিল পূজন।
জলেতে ডুবুরী গিয়া নামে দুইজন ॥

অজয় ও কুনুর নদীর সঙ্গমস্থলের পাশেই 'ভ্রমরার দহ'। গ্রামের লোকের এখনও সমাগম হয় এখানে। কিন্তু 'ভ্রমরার দহ' নাম কেন? 'ভ্রমরা' কি? দেবী চণ্ডী ও দুর্গার এক নাম ভ্রমরা বা ভ্রামরী। 'পীঠনির্ণয়ে' 'ভ্রমরাম্বা' দেবীর উল্লেখ আছে। কহ্লনের 'রাজতরঙ্গিণীতে' দেবী বিন্ধ্যবাসিনীকে ভ্রমরবাসিনী বলা হয়েছে। 'মার্কণ্ডেয়পুরাণে' দেবীর ভ্রমরার রূপধারণ ও ভ্রামরী নামের কারণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে এইভাবে ঃ

যদারুণাখ্যস্ত্রৈলোক্যে মহাবাধাং করিষ্যতি।
তদাহং ভ্রামরং রূপং কৃত্বাসঙ্খ্যেয়ষট্পদম্ ॥
ত্রৈলোক্যস্য হিতার্থায় বধিষ্যামি মহাসুরম্।
ভ্রামরীতি চ মাং লোকাস্তদা স্তোষ্যন্তি সর্বতঃ।

(মার্কণ্ডেয়পুরাণ—৯১ অঃ)

অর্থ হল : "অনন্তর অরুণ নামে অসুর যখন ত্রিভুবনের বিপুল বাধা সৃষ্টি করবে, তখন আমি অসংখ্য ষট্পদবিশিষ্ট ভ্রমরমূর্তি ধারণ করে, ত্রৈলোক্যের হিতার্থে তার বিনাশ করব। তখন লোকে আমাকে 'ভ্রামরী' বলে স্তব করবে।" উজানির দেবী মঙ্গলচণ্ডী ভ্রামরী বা ভ্রমরা নামেও খ্যাত ছিলেন এবং তাঁরই নামে ঐ দহের নাম হয়েছে। এছাড়া 'ভ্রমরার দহের' আর অন্য কোন অর্থ বোধ হয় না।

উজানি-কোগ্রামের মঙ্গলচণ্ডীর মন্দিরের মধ্যে একটি অতি সুন্দর বজ্রাসনে উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্তি এখনও আছে। লোচনদাসের পাটের কাছে একটি জৈন তীর্থঙ্করের মূর্তি ছিল, সেটি রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে'র জন্য সংগ্রহ করে এনেছিলেন। এখন সেটি পরিষদের জাদুঘরে রয়েছে। বুদ্ধমূর্তিটি রাখালদাস অনেক চেষ্টা ও অনুনয়-বিনয় করেও স্থানান্তরিত করতে পারেননি। শ্রদ্ধেয় কবি কুমুদরঞ্জনের মুখে শুনলাম, অজয় ও কুনুরের গর্ভ থেকে প্রচুর বৌদ্ধ ও তান্ত্রিক দেবদেবীর মূর্তি পাওয়া গেছে একসময়, ছোটবড় ভাঙাচোরা নানারকমের মূর্তি। চামুণ্ডার মূর্তি, মহিষমর্দিনীর মূর্তি ইত্যাদি। অনেক মূর্তি গ্রামের বাইরে চলে গেছে, বিতরণও করা হয়েছে। যে বুদ্ধমূর্তিটি এখনও আছে তার অনাড়ম্বর চালচিত্র ও প্রভামণ্ডল থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, বেশ প্রাচীন মূর্তি। পালযুগের মূর্তি, নবম-দশম শতাব্দীর পরের নয়। জৈনমূর্তিটি তীর্থঙ্কর শান্তিনাথের মূর্তি বলে নির্ধারিত হয়েছে (রাখালদাস)। এইরকম আরও অনেক বৌদ্ধ ও জৈনমূর্তি এখান থেকে পাওয়া গেছে। তার মধ্যে একটি জৈন দিগম্বর মূর্তি (কবি কুমুদরঞ্জনের মুখে শুনলাম) কোগ্রাম-মঙ্গলকোটের অনতিদূরে বাবলাডিহি গ্রামে (এখন শঙ্করপুর বলে পরিচিত) 'ন্যাংটেশ্বর' শিব বলে পূজিত হচ্ছেন। দিগম্বর জৈন তীর্থঙ্করের 'ন্যাংটেশ্বর' নামটি যথার্থ হয়েছে যে তাতে কোন সন্দেহ নেই। পাথরের বৌদ্ধ ও হিন্দু তান্ত্রিক দেবীমূর্তিও অনেক পাওয়া গেছে।

এই সব পাথুরে নিদর্শন, 'ভ্রমরার দহ' নাম, মঙ্গলকাব্যের কবিদের কাহিনী ইত্যাদি থেকে এইটুকু বেশ বোঝা যায় যে, মঙ্গলকোট-কোগ্রাম-উজানি অঞ্চলে একসময় চণ্ডী-মনসা-ধর্মরাজ ইত্যাদির অনার্য পূজারীদের বেশ প্রাধান্য ছিল। তন্ত্রযানী বৌদ্ধধর্মের প্রসারও হয় সেইজন্য এই অঞ্চলে। তারপর হিন্দু তান্ত্রিক ও বৈষ্ণব সহজিয়া বাউলরা তা আত্মসাৎ করে ফেলেন অনায়াসে। আদর্শগত

সংঘাত ও বিরোধ যে হয় না তা নয়। শৈবধর্মী বাংলার সদাগররা সহজে লোকায়ত ধর্মকে মানতে চাননি। লোকসাধারণের প্রতিনিধি নারী বা নায়িকার মাধ্যমে এই লোকায়ত ধর্মের প্রচার করা হয়েছে। সেই সংস্কৃতি-সংঘাত ও সমন্বয়ের বিস্তৃত অঞ্চলের মধ্যে (রাঢ়দেশে) উজানি-কোগ্রাম-মঙ্গলকোটও অন্যতম কেন্দ্র ছিল। অন্যতম কেন্দ্র হবার প্রধান কারণ ছিল, এই অঞ্চলের বণিকজাতির আধিপত্য।

মঙ্গলকোট

হুগলীর ত্রিবেণী-পাণ্ডুয়া, ভুরশুট-মন্দারণ, বীরভূমের লক্ষোর বা রাজনগরের মতন বর্ধমানের মঙ্গলকোটও পশ্চিমবাংলার ঐতিহাসিক মুসলমান সংস্কৃতিকেন্দ্রের মধ্যে অন্যতম। কিন্তু মুসলমানযুগ থেকে এসব অঞ্চলের ইতিহাস শুরু হয়নি। তার পূর্বেরও একটা সুদীর্ঘ ইতিহাস ও সুপ্রাচীন ঐতিহ্য ছিল এইসব অঞ্চলের। পাণ্ডুয়া, ভুরশুট ইত্যাদির মতন মঙ্গলকোটেরও ছিল। উজানিপ্রসঙ্গে বলেছি, পালযুগে বৌদ্ধতান্ত্রিকরাই হয়ত উত্তর-পশ্চিমের প্রসিদ্ধ বৌদ্ধকেন্দ্র 'উড্ডিয়ান' ও 'মঙ্গলকোষ্ঠের' অনুকরণে রাঢ়ের উজানি ও মঙ্গলকোটের নামকরণ করেছিলেন। কোন হিন্দু সামন্তরাজার গড়বেষ্টিত দুর্গ ও প্রাসাদ ছিল মঙ্গলকোটে (বিক্রমকেশরীর ?) এবং তারই পাশে নদীতীরে উজানিতে বাংলার হিন্দু সদাগররা একটি বিখ্যাত বাণিজ্যনগর গড়ে তুলেছিলেন।

উজানির ঐতিহাসিক স্মৃতিচিহ্ন দুর্ধর্ষ অজয়ের গর্ভে যেমন বিলীন হয়ে গেছে, মঙ্গলকোটের তা যায় নি। কুনুরের মধ্যস্থতায় মঙ্গলকোট তার কীর্তির ধ্বংসাবশেষসহ আজও টিকে রয়েছে। যা ভেঙেছে বা যা লোপ পেয়েছে তা কালের যাত্রায়। মঙ্গলকোটের মাটিতে পা দিলেই তা বোঝা যায়। গ্রামের পথে পথে, পথের আশেপাশে ইট-পাথরের অফুরন্ত চিহ্ন গোরস্থানের টুকরো কঙ্কালের মতন বিকীর্ণ হয়ে রয়েছে। সরু সরু পথ, যেন ইট দিয়ে গাঁথা সব। পাকা ইটের পথ নয়, কাঁচা মাটির পথ। ইটগুলো সব সমাধিস্থ ঘরবাড়ির নিদর্শন। বেশ প্রাচীন কোন সুসমৃদ্ধ জনপদের ছাপ মঙ্গলকোটের সর্বাঙ্গে। স্থানীয় কোন হিন্দু সামন্তরাজার গড়দুর্গ ছিল বলেই মনে হয়। কিন্তু কে সেই রাজা, তাঁর নাম গোত্র কি, ইতিহাস কি, তা আর জানবার কোন উপায় নেই। কবিরা বিক্রমকেশরী রাজার কথা বলে গেছেন :

বিক্রমকেশরী তাঁহার নগরী
আছে কত সদাগর—

কে এই বিক্রমকেশরী ? রাজার কাব্যিক বিশেষণ, না রাজা নিজে ? জানবার উপায় নেই। অর্বাচীন 'বক্রেশ্বরমাহাত্ম্য' গ্রন্থে এই বিক্রমকেশরী ও তাঁর পূর্বের এক শ্বেতরাজার উল্লেখ আছে :

শ্বেতরাজা মহানাসীৎ সত্যবক্তা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সত্যসন্ধো মহোদারঃ সত্যবাগ্‌দান তৎপরঃ॥
রাজ্য কৃতযুগে আসীৎ শিবপাদার্চনে রতঃ।
মঙ্গলকোটকং নাম পুরং অস্য প্রতিষ্ঠিতম্‌॥

শ্বেত নামে এক মহাদানশীল উদার রাজা ছিলেন, মঙ্গলকোটে তাঁর রাজধানী ছিল। তিনি শৈবধর্মী ছিলেন। রাঢ়ের সদাগররাও শৈবধর্মী ছিলেন। রাজনীতি তথা রাজার বাণিজ্য-নীতির সঙ্গে তাঁদের বিরোধ থাকলেও, রাজ-ধর্মের সঙ্গে কোন বিরোধ ছিল না। বিরোধ ছিল লৌকিক ধর্মাচরণের সঙ্গে। কেউ কেউ বলেন, মঙ্গলকোটে হয়ত গোপভূমের সদ্‌গোপ রাজাদের কোন এক শাখার বংশধররা রাজত্ব করতেন (বর্ধমান গেজেটিয়ার)। অনুমান সত্য হতেও পারে, কারণ অমরার গড়, ভাল্কী, দিগনগর, মঙ্গলকোট—গোপভূমের সদ্‌গোপ রাজাদের স্মৃতিবিজড়িত। সদ্‌গোপ রাজারাও শৈবধর্মী ছিলেন। এ ছাড়া মঙ্গলকোটে নূতনহাটের কাছে হুসেনশাহের আমলের প্রাচীন মসজিদে পাথরের উপর একটি খোদিত লিপি পাওয়া গেছে। তাতে শ্রীচন্দ্রসেন নৃপতির নাম আছে। কে এই চন্দ্রসেন? বাংলার রাজকাহিনীতে এঁরও কোন পরিচয় নেই। তবু বর্ধমানের সেনভূম, সেনপাহাড়ী ইত্যাদি নামের সঙ্গে যে 'সেন' জড়িত আছে, মনে হয় তা সেনবংশের রাজাদের নামের স্মৃতিই বহন করছে। বাংলার সেন রাজাদের পূর্বপুরুষরা রাঢ় দেশেই প্রথমে এসেছিলেন। চন্দ্রসেন তাঁদের বংশের কেউ হতে পারেন এবং তাঁর কোন রাজধানী এই অঞ্চলে থাকা আশ্চর্য নয়। আবার বিক্রমকেশরী নামেও কোনও সামন্তরাজা থাকতে পারেন, হয়ত গোপভূমের সদ্‌গোপ রাজবংশধরই কেউ। এখন কোন প্রমাণ নেই তার। 'বিক্রমাদিত্যের ডাঙা' বা বিক্রমজিতের বাড়ির ঢিবি আছে একটি মঙ্গলকোটে এবং সেই ঢিবি কেন্দ্র করে কিংবদন্তী। এরকম অনেক বিক্রমাদিত্য ও অনেক রাজা বহু গ্রামের ঢিবির তলায় বিরাজ করছেন, জন-মনের কল্পনারাজ্যে। ধনদৌলত ও প্রতাপ-প্রতিপত্তি যাঁর থাকে দণ্ডমুণ্ডের কর্তা যিনি, তিনি সাধারণ মানুষের কাছে 'রাজা।' আজও অসহায় দরিদ্র যারা, তারা ধনীদের 'রাজা' বলে। সুতরাং মধ্যযুগে 'রাজা' হওয়া খুব কঠিন ছিল না। দোর্দণ্ডপ্রতাপ স্থানীয় জমিদার-জায়গীরদার ও সামন্তরা সহজেই জনসাধারণের কাছ থেকে 'রাজা' খেতাব পেতেন, সম্রাটের শীলমোহরের

প্রয়োজন হত না তার জন্য। গ্রামে গ্রামে যে রাজার প্রাচুর্য দেখা যায় বাংলাদেশে এবং সেই রাজাদের স্মৃতিবিজড়িত অসংখ্য ঢিবি, মজা দীঘি-পুষ্করিণী ও ভাঙা অট্টালিকা, তার অধিকাংশই অখ্যাত স্থানীয় সামন্তদের স্মৃতিচিহ্ন ছাড়া কিছু নয়। তাঁদের অখণ্ড প্রতাপের যুগ অনেকদিন শেষ হয়ে গেছে। আজ শূন্য ঢিবিতে কিংবদন্তীর ঘুঘু বিচরণ করছে শুধু—সেই 'এক যে ছিল রাজার'— !

সেইরকম কোন একজন সামন্তরাজা হয়ত মঙ্গলকোটেও ছিলেন। প্রতাপ ও প্রতিপত্তি হয়ত তাঁর একটু বেশিই ছিল। হতে পারে, তিনি গোপভূমের শৈবধর্মী সদ্‌গোপ রাজাদের কোন বংশধর, অথবা সেনরাজবংশের কেউ। সেনবংশীয় কেউ হলেও শৈবধর্মী হওয়াই সম্ভবপর। যেই হন তিনি, মঙ্গলকোটে বেউড়বাঁশ-বেষ্টিত দুর্গে তিনি বাস করতেন। বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে ছিল তার সীমানা। থাকাই স্বাভাবিক, কারণ রাঢ়দেশের অভ্যন্তরে এই সব দুর্গম অঞ্চলের সামন্তরা একরকম নিশ্চিন্তেই বাস করতেন, রাষ্ট্রদুর্যোগের ঝড়ঝঞ্ঝা তাঁদের বিশেষ স্পর্শ করতে পারত না। অতএব—

রাজার সামন্ত নাহি পায় অন্ত
যদি ভ্রমে একমাস—

—এই ধরনের গড়বেষ্টিত বিস্তৃত রাজধানী গড়ে, গদীয়ান হয়ে বসে রাজত্ব করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব নয়। উজানি-মঙ্গলকোট যে সত্যই সুসমৃদ্ধ ও সুবিস্তৃত জনপদ ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। কবিকঙ্কণ যে প্রত্যক্ষ বর্ণনা দিয়েছেন, তার মধ্যেই তার ইঙ্গিত রয়েছে স্পষ্ট। "স্থান মঙ্গলকোট, উজাবনী গ্রাম" এই কথা থেকেই বোঝা যায়, উজানি ও মঙ্গলকোট পৃথক ছিল। উজানির বণিকপল্লীর পাশে কায়স্থপাড়া ও ব্রাহ্মণপাড়া পার হয়ে মঙ্গলকোটে রাজদর্শনে যেতে হত :

বামভাগে এড়াইল কায়স্থের পাড়া ॥
প্রবেশে ব্রাহ্মণপাড়া হয়ে হরষিত।
... ...
কাড়িয়া জাঙ্গাল এড়ে বামন শাসন।
ভূপতির দ্বারে আসি দিল দরশন ॥

ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতেও উজানি-মঙ্গলকোটের এই সামাজিক রূপ

অনেকটা অক্ষুণ্ণ ছিল। আরও আগে, মুসলমান অভিযানের পূর্বে মঙ্গলকোটের সমৃদ্ধি অনেক বেশি ছিল বলে মনে হয়। মুসলমান অভিযানের প্রথম পর্বে রাঢ়দেশের সংঘাতকেন্দ্রের মধ্যে মঙ্গলকোট ছিল অন্যতম। কোন্ সময় এই অভিযান হয় রাঢ়দেশের এইসব অঞ্চলে?

বখ্তিয়ার খিল্জীর সময় নয়। 'তবকৎ-ই-নাসিরী'-তে বখ্তিয়ারের অভিযানের যে নির্দেশ পাওয়া যায়, তাতে মনে হয় তিনি দক্ষিণ বিহার থেকে বাংলার রাজধানী নদীয়ায় হঠাৎ অতর্কিতে ছদ্মবেশে এসে রাজধানী দখল করেছিলেন। রাঢ়দেশ সম্পূর্ণ জয় করে আসেননি। লক্ষ্ণোর বা নগরে (বীরভূম জেলার রাজনগরে) একটি মুসলমান ঘাঁটি ছিল বটে, কিন্তু তার প্রভাব কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল তা বলা যায় না। বখ্তিয়ারের পর সুলতান গিয়াসউদ্দীন খিল্জী (১২১৩—১২২৭ খৃঃ অঃ) যখন গৌড়ের সিংহাসন দখল করেন, তখন গঙ্গরাজা তৃতীয় অনঙ্গভীমের (১২১১—১২৩৮ খৃঃ) বীর মন্ত্রী বিষ্ণু রাঢ়দেশে অভিযান আরম্ভ করেন। পশ্চিম সীমান্তে মুসলমান ঘাঁটি লক্ষ্ণোর (রাজনগর) গঙ্গমন্ত্রী দখল করেন এবং উড়িষ্যার যাজপুর পর্যন্ত তাঁর অধিকার বিস্তৃত করেন। এই গঙ্গ-অভিযানের ফলে মুসলমান অভিযাত্রীদের মধ্যে হতাশার সঞ্চার হয় এবং তাঁরা নিরুৎসাহ হয়ে পড়েন। এই সময় ইসলামের মর্যাদা ও সুলতানের সম্মান রক্ষার জন্য রীতিমত জিহাদের (ধর্মযুদ্ধের) জিগির তোলা হয়। গিয়াসউদ্দীন লক্ষ্ণোর অভিযান করে পুনরুদ্ধার করেন প্রচণ্ড যুদ্ধের পর। গঙ্গসেনার সঙ্গে সুলতান সেনাদের ঘোরতর যুদ্ধ হয় রাঢ়দেশে (১২১৪—'১৫ খৃঃ অঃ)। লক্ষ্ণোর পুনর্দখল করে গিয়াসউদ্দীন গঙ্গসেনাদের অজয়, দামোদর অতিক্রম করে প্রায় বিষ্ণুপুর পর্যন্ত পশ্চাদ্ধাবন করেন। বীরভূমের রাজনগর থেকে বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর ও দক্ষিণ উড়িষ্যা পর্যন্ত সুলতান গিয়াসউদ্দীনের এই অভিযানের সময় অজয় ও দামোদরের মধ্যবর্তী যে সব অঞ্চল সুলতানের পদানত হয়, তার মধ্যে মনে হয় মঙ্গলকোট অন্যতম। এই সময় থেকেই মঙ্গলকোটের মুসলমানযুগের ইতিহাসের সূচনা হয়। জিহাদের জিগির তুলে সুলতান তখন নিরুৎসাহ ইসলামধর্মীদের উৎসাহিত করছিলেন। রাঢ়দেশে এই জিহাদে যারা অনেকটা সহজে আত্মসমর্পণ করেছিল, তারা হিন্দুসমাজের অবহেলিত সম্প্রদায়, বৌদ্ধতান্ত্রিক ও অন্যান্য লৌকিক ধর্মপন্থীরা। তবু রাঢ়দেশে ব্যাপক-

ভাবে ধর্মান্তরিত করা উৎসাহী গাজীদের পক্ষে সম্ভব হয়নি, তার কারণ রাঢ়ের রাষ্ট্রিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় অনেক বেশি প্রাচীন ও দৃঢ়মূল ছিল। সহজে তাকে উপ্‌ড়ে ফেলা বা বদ্‌লে ফেলা সম্ভব হয়নি। দুই ধর্মের মধ্যে সংঘাত হয়েছিল রাঢ়ের যেসব কেন্দ্রে, মুসলমান অভিযানের প্রথমপর্বে, তার মধ্যে মঙ্গলকোট অন্যতম। সংঘাতের প্রাথমিক পর্ব শেষ হবার পর, হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির যুক্তধারার মিলনও হয়েছে রাঢ়দেশে। বর্ধমানে পীর ও পীরস্থানের সংখ্যা অল্প নয়। হিন্দুরা যেমন পীরস্থানে পূজামানত করে, মুসলমানরাও তেমনি ধর্মরাজ মনসাদির কাছে পাঁঠাবলি দেয় ও মানত করে। এই মিলন ও সমন্বয়ের নিদর্শন মঙ্গলকোটেও রয়েছে।

মঙ্গলকোট 'আঠারো আওলিয়া'র স্থান বলে পরিচিত। 'আলি' অর্থে সাধুপুরুষ, বহুবচনে 'আওলিয়া'। আঠারোজন মুসলমান সাধুপুরুষের স্মৃতি-বিজড়িত মঙ্গলকোট বাংলার মুসলমানদের অন্যতম তীর্থস্থান বললেও বিশেষ ভুল হয় না। মঙ্গলকোটনিবাসী মৌলবী মহম্মদ ইসমাইল সাহেব রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে প্রায় চল্লিশ বছর আগে যে ইতিহাস বলেছিলেন তা সংক্ষেপে এই : মঙ্গলকোটে বিক্রমজিৎ নামে এক হিন্দুরাজা ছিলেন। তিনি বীর যোদ্ধা ছিলেন। সেই সময় সতের জন (না, আঠারো ?) ধর্মযোদ্ধা বা গাজীসাহেব কাফেরদের পরাজিত করে মঙ্গলকোট দখল করতে আসেন। ধর্মযুদ্ধে গাজীরা একে একে নিহত হন, মঙ্গলকোটে তাঁদের সমাধি আছে। শেষে গজনবী নামে একজন গাজী বা পীর মঙ্গলকোট অধিকার করেন এবং হিন্দুরাজা নিহত হন। গাজী ও পীরদের মধ্যে তিনি নাম করেছিলেন এঁদের : (১) মহম্মদ, (২) হাজি ফিরোজ, (৩) গোলাম পঞ্জতন, (৪) মহম্মদ ইসমাইল গাজী, (৫) আবদুল্লা গুজরাটি, (৬) মকদুম বিলায়েৎ, (৭) গজনবী। মঙ্গলকোটের আঠারোজন আওলিয়ার সকলের নাম জানা যায় না। পীর পঞ্জতনের মেলা হয় আজও মঙ্গলকোটে। আমরা যে সব সমাধি দেখেছি মঙ্গলকোটে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, দানেশমন্দ খাঁ'য়ের সমাধি, আবদুল্লা গুজরাটির সমাধি, শাহ জাকের আলির সমাধি।

দানেশমন্দ খাঁ মহাপণ্ডিত ছিলেন। হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি বিভিন্ন

ধর্মশাস্ত্রে তাঁর মতন পাণ্ডিত্য উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে তখন আর কারও ছিল কিনা সন্দেহ। তাঁর সমাধির গায়ে শিলাফলকে উৎকীর্ণ যে নাম আছে তাতে লেখা আছে—'হামিদ দানেশমন্দ বাঙ্গালী'। তিনি নিজেকে সর্বাগ্রে বাঙালী বলে পরিচয় দিতে নিশ্চয় গর্ববোধ করতেন এবং হিন্দু মুসলমান সকলের উপরে তাঁর 'বাঙালী' পরিচয়টিই বড় ছিল বলে দানেশমন্দ নামের পাশে 'বাঙ্গালী' লিখতেন। শোনা যায়, দানেশমন্দের অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পেয়ে সম্রাট শাজাহান তাঁকে ৯৪,০০০ মুদ্রা দান করেন এবং সেই অর্থ দিয়ে তিনি মঙ্গলকোটের মসজিদ নির্মাণ করেন। দানেশমন্দের সমাধিলগ্ন শাজাহানের আদেশে তৈরি একটি প্রাচীন মসজিদ আছে, এখন পুনর্গঠিত। মসজিদের গায়ে শিলাফলকে যে লিপি খোদিত আছে, তার একাংশ হল (অনুবাদ) :

"এই মসজিদ দ্বিতীয় সাহেব করাণ সম্রাট সাহার-উদ্দীন মহম্মদ শাহজহান বাদশাহ গাজির রাজত্বকালে নির্মিত হয়েছে। যদি এর নির্মাণের তারিখ তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হয় তাহলে ওকে বয়তুল আতিক বলবে, বলে সম্বোধন করবে, হিঃ ১০৬৫।"

হিজরি ১০৬৫, অর্থাৎ ১৬৫৪-৫৫ সালে মসজিদটি তৈরি। এই মসজিদটি ছাড়া আরও কয়েকটি প্রাচীন মসজিদ আছে মঙ্গলকোটে। তার মধ্যে একটি মসজিদ বেশ প্রাচীন বলে মনে হয়, ষোল ইঞ্চি লম্বা ও তিন ইঞ্চি পুরু টালির মতন ইঁট দিয়ে গাঁথা। খিলানের গাঁথুনির দক্ষতা জীর্ণতার মধ্যেও এখনও বোঝা যায়। স্থানীয় প্রবীণরাও কেউ মসজিদটি সম্বন্ধে কিছু বলতে পারেন না। মঙ্গলকোটে নূতনহাটের কাছে আর একটি প্রাচীন মসজিদ আছে। হুসেন শাহের আমলে তৈরি। 'হুসেনশাহী মসজিদ' বলে খ্যাত। উল্লেখযোগ্য হল, মসজিদটি বিশাল একটি উঁচু মৃত্তিকা-স্তূপের উপর প্রতিষ্ঠিত। স্তূপটির উচ্চতা প্রায় বিশ হাত হবে। অনেকে মনে করেন, এটি বৌদ্ধদের স্তূপ হতে পারে। হওয়া আশ্চর্য নয়, যদিও খননের আগে কিছু বলা যায় না। তবে এতখানি উঁচু একটি বিরাট স্তূপের ভিত্তির উপর মসজিদ প্রতিষ্ঠার কারণ কি বোঝা যায় না। রহস্যময় মনে হয়। একমাত্র প্রত্নতাত্ত্বিকের খোন্তা-কোদালই এই রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে পারে। মসজিদের খিলান, ইঁট, লতাপাতা-ফুলের চমৎকার নক্সা এবং প্রচুর বড় বড় প্রস্তরখণ্ড

আরও বিস্ময়কর। এই মসজিদেই চন্দ্রসেনের নামোৎকীর্ণ শিলাফলক আছে। বড় বড় শিলাখণ্ডগুলি মসজিদের সঙ্গে গাঁথা হয়েছে, অনেক শিলাখণ্ড চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে আছে। মূর্তি বা অন্যান্য নিদর্শন এই ধ্বংসস্তূপ থেকে আর কিছু পাওয়া গেছে কিনা, কেউ বলতে পারলেন না। না পারলেও, মসজিদের চারিদিকে ও দেয়ালের গায়ে গাঁথা শিলাখণ্ড ইত্যাদি দেখে মনে হয়, হিন্দু বা বৌদ্ধ কোন ধর্মস্থানের স্মৃতিচিহ্ন হতে পারে। তাই দিয়েই মসজিদ তৈরি হয়েছিল।

গাজী ও পীর সাহেবদের কীর্তিকাহিনী মঙ্গলকোটের এইসব নিদর্শন থেকে বোঝা যায়। মঙ্গলকোট যে রাঢ় অঞ্চলের মুসলমান সমাজ ও সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ছিল, তাও বুঝতে কষ্ট হয় না। মৌলানা হামিদ দানেশমন্দের মতন মহাপণ্ডিত যেখানে বাস করতেন, আঠারোজন আওলিয়া এসেছিলেন যেস্থানে, সেখানে যে মক্তব-মাদ্রাসা ইত্যাদি ছিল এবং রীতিমত বিদ্যাচর্চা হত, তাতেও কোন সন্দেহ নেই। সংঘাতের পর তাই হিন্দু ও মুসলমান দুই ধর্ম ও সংস্কৃতির আদর্শ-সমন্বয়ও হয়েছিল মঙ্গলকোটে। আজও মঙ্গলকোট মুসলমান-প্রধান এবং কাজী নওয়াজ খোজা সাহেব, খোন্দকার মোফজুলুঝ কাদির, মোল্লা আব্দুল হাই, মৌলানা মহম্মদ প্রভৃতির পরিবার ও বংশধর যাঁরা মঙ্গলকোটে বাস করেন তাঁদের উদার ও নির্বিরোধ দৃষ্টিভঙ্গি সত্যই বিস্ময়কর। মঙ্গলকোট শুধু বাঙালী মুসলমানদের কাছে পবিত্র স্থান নয়। এখানকার মেলায় ও উৎসবে বাংলার বাইরে থেকেও মুসলমানরা আসেন। 'হামিদ দানেশমন্দ বাঙালীর' তিরোধান উৎসব হয় ফাল্গুন মাসে। শাহ জাকের আলি কাদেরির মৃত্যুবার্ষিকীও মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। মকদুম শাহ আবদুল্লা গুজরাটিরও মৃত্যুবার্ষিকী উৎসব হয়। পীর পঞ্জতনের মেলা হয়। এইসব উৎসব-মেলায় দেশ-বিদেশের মুসলমানরা মঙ্গলকোটে সমবেত হন। কারণ 'আঠারো আওলিয়ার' স্থান মঙ্গলকোটকে তাঁরা পবিত্রস্থান বলে মনে করেন। হিন্দুদেরও উৎসব-মেলা হয়। হিন্দুদের গ্রাম্যদেবতাও গ্রামের মধ্যস্থলে আপন মহিমায় বিরাজ করছেন দেখেছি। রাজনীতির কাটাখাল দিয়েও কোন বিদ্বেষের স্রোত প্রবেশ করে মঙ্গলকোটের পরিবেশকে কলুষিত করতে পারেনি। দানেশমন্দের সর্বশাস্ত্রচর্চা সার্থক হয়েছে মঙ্গলকোটে সবদিক দিয়ে—মৌলানা হামিদ দানেশমন্দ 'বাঙ্গালীর'।

শ্রীখণ্ড

শ্রীখণ্ড ও কুলীনগ্রাম পশ্চিমবাংলার বৈষ্ণব-সংস্কৃতির মহাকেন্দ্রের মধ্যে অন্যতম। নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্য যখন জন্মাননি, তার আগে বর্ধমান জেলার কুলীন-গ্রামে গুণরাজ খান বা মালাধর বসু 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্য লিখে ভাগবতভক্তির স্রোত বইয়ে দিয়েছিলেন বাংলাদেশে। যবন হরিদাসের সিদ্ধির স্থানও কুলীনগাঁ। শ্রীচৈতন্য তাই নিজেই বলেছিলেন—"কুলীন গ্রামের মধ্যে যে হয় কুক্কুর, সেহ মোর প্রিয় অন্যজন রহু দূর"—এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ মন্তব্য করেছিলেন—"কুলীন গ্রামীর ভাগ্য কহনে না যায়, শূকর চরায় ডোম সেই কৃষ্ণ গায়।" শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার ঠাকুরও বয়সে শ্রীচৈতন্যের চেয়ে বড় ছিলেন এবং তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদদের মধ্যে প্রিয়তম বলে গণ্য হতেন। তাঁর সময় সেই পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষকাল থেকে আজ পর্যন্ত নবদ্বীপের মতন শ্রীখণ্ডও পাণ্ডিত্যে ও কবিত্বে বৈষ্ণব সংস্কৃতির উত্তরাধিকার বহন করে আসছে। আরও মনে হয়, নবদ্বীপের মতন শ্রীখণ্ডেও তান্ত্রিকধর্মের প্রাবল্য ছিল এবং তার মধ্যেই বৈষ্ণবধর্মের ভক্তি ও প্রেমের পদ্ম ফুটে উঠেছিল। বাঙালী সংস্কৃতির এই অন্যতম বৈশিষ্ট্যের রাজটীকা শ্রীখণ্ডের ললাটেও জাজ্বল্যমান।

শ্রীখণ্ডের প্রাচীন নাম 'বৈদ্যখণ্ড'। উত্তর-রাঢ়ের বৈদ্যপ্রধান স্থান বলে নাম ছিল বৈদ্যখণ্ড। বৈদ্যরা বিদ্যায় ও বুদ্ধিতে সমাজে অগ্রগণ্য ছিলেন। স্বভাবতঃই গৌড়দরবারে তাঁদের যথেষ্ট প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল এবং তাঁদের 'সরকার' উপাধি আজও তার সাক্ষী দিচ্ছে। নরহরি সরকারের অগ্রজ মুকুন্দ দাস গৌড়-দরবারে রাজবৈদ্য ছিলেন। বৈদ্যদের মতন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদের মধ্যেও অনেকে গৌড়-দরবারের উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ছিলেন, পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে। কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত, বর্ধমান জেলার উত্তরপ্রান্তে কৃষ্ণদাস কবিরাজের নিবাস, গ্রাম ঝামটপুর। ঝামটপুর থেকে মাইল তিনেক দূরে নৈহাটি গ্রাম। এখানে বল্লালসেনের একটি তাম্রপট্টলিপি পাওয়া গেছে। মনে হয়, এই নৈহাটিতেই বল্লালসেনের গুরুপুরোহিতদের বাস ছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর গোড়ায় রাজা দনুজমর্দনের অনুরোধে একজন সদ্‌ব্রাহ্মণ 'সুরতরঙ্গিণী নিবাসপর্যুৎসুক' হয়ে শিখরভূম (পঞ্চকোট-মানভূম) থেকে এই 'নবহট্টক' গ্রামে

(নৈহাটি) এসে বাস করেছিলেন। ইনি সনাতন গোস্বামী ও রূপ গোস্বামীর প্রপিতামহ পদ্মনাভ। সনাতন ও রূপ গোস্বামীর কথা সকলেই জানেন। মহাকবি ও মহাপণ্ডিত এই দুই ভাই ছিলেন বাংলার বিখ্যাত সুলতান হুসেন শাহের ডাঁন হাত, বাঁ হাত। এঁরা ছিলেন ভরদ্বাজগোত্রীয় ব্রাহ্মণ। সনাতন ছিলেন হুসেন শাহের 'সাকর মল্লিক' বা চীফ সেক্রেটারী আর রূপ গোস্বামী ছিলেন 'দবীর খাস' বা প্রাইভেট সেক্রেটারী। নৈহাটির এই ব্রাহ্মণদের যে অসাধারণ প্রতিপত্তি ছিল গৌড়-দরবারে তা সহজেই বোঝা যায়। শ্রীখণ্ডের বৈদ্যরাও এই সময় থেকেই রাজদরবারে তাঁদের প্রভাব বিস্তার করার সুযোগ পেয়েছিলেন। অনেকে গৌড়-দরবারে রাজকাজ করতেন। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন মহাকবি দামোদর। ইনি গৌড়-দরবার থেকে 'যশোরাজ খান' উপাধি পেয়েছিলেন এবং কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যে হুসেন শাহের নাম করেছেন। বিখ্যাত পদকর্তা গোবিন্দদাস কবিরাজ এই যশোরাজ খান বা দামোদরেরই দৌহিত্র। নৈহাটির ব্রাহ্মণ ও শ্রীখণ্ডের বৈদ্যদের মতন পূর্ব-দক্ষিণ বর্ধমানের কুলীনগ্রামের কায়স্থ মালাধর বসুও বারবক শাহের (১৪৫৯-১৪৭৪ খৃঃ অঃ) একজন প্রধান কর্মচারী ছিলেন। সুলতান তাঁকে উপাধি দিয়েছিলেন 'গুণরাজ খান'—"গৌড়েশ্বর দিলা নাম গুণরাজ খান"। কুলীনগাঁয়ের এই কায়স্থদের বংশধররা দীর্ঘকাল গৌড়-দরবারে কাজ করে গেছেন। তাহলে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে, উত্তরের নবহট্টক-নৈহাটি, বৈদ্যখণ্ড-শ্রীখণ্ড থেকে দক্ষিণের কুলীনগ্রাম পর্যন্ত বর্ধমান জেলার ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ বংশের অনেকের সঙ্গে মুসলমান রাজত্বের প্রায় প্রারম্ভ থেকেই ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল এবং তাঁরা অনেকেই নবাব-দরবারে গুরুত্বপূর্ণ রাজকার্যে নিযুক্ত ছিলেন। তখনকার দিনে এই কারণে তাঁদের সামাজিক প্রভাবপ্রতিপত্তি যে কতখানি ছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়। এই ধরনের আর্থিক ও সামাজিক প্রতিপত্তি ছিল বলেই নৈহাটির সনাতন ও রূপ শ্রীখণ্ডের মুকুন্দ, নরহরি ও রঘুনন্দন বা কুলীনগাঁয়ের মালাধর বসুর বৈষ্ণবধর্মমত রাঢ়ীয় উচ্চসমাজে এতটা প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল।

রাঢ়দেশে বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব-বিস্তারের ইতিহাস আলোচনায় এই আর্থনীতিক-সামাজিক পটভূমিকার কথা বিশেষভাবে স্মরণীয়। যে-কোন প্রত্যক্ষ অনুসন্ধানীর চোখে রাঢ়ীয় সমাজের লোকসাধারণের স্তরে লৌকিক ও তান্ত্রিক ধর্মের বিচিত্র প্রাধান্য অত্যন্ত সহজে নজরে পড়বে এবং বৈষ্ণবধর্মের প্রাধান্য যে

সমাজের উচ্চ ও মধ্যস্তরের মধ্যেই গণ্ডীবদ্ধ, তাও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। তার একমাত্র কারণ না হলেও, অন্যতম প্রধান কারণ হল—চৈতন্য-নিত্যানন্দের কালে রাঢ়দেশে যাঁরা বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন, তাঁরা সমাজের প্রতিপত্তিশালী অবস্থাপন্ন শ্রেণীভুক্ত এবং ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ বণিক বংশজাত। শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দের মানবতার ও প্রেমের আদর্শকে সামাজিক ক্ষেত্রে বাস্তব রূপ দেবার চেষ্টা করেও তাঁরা খুব বেশি আশানুরূপ কৃতকার্য হতে পারেননি। রাঢ়দেশে বিশেষ করে তাই আজও লৌকিক ও তান্ত্রিক ধর্মের প্রচণ্ড প্রাধান্য দেখা যায়।

শ্রীখণ্ড অঞ্চলেই একসময় তন্ত্রের প্রাধান্য ছিল বলে মনে হয়। শ্রীখণ্ডের চারিদিকে এখনও সব বিখ্যাত তান্ত্রিক পীঠস্থান রয়েছে। ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যা, কেতুগ্রামের বহুলা, অট্টহাসের ফুল্লরা, মাঝিগ্রাম, উজানি-মঙ্গলকোটের শাকম্ভরী ও ভ্রামরী-মঙ্গলচণ্ডী, সবই তান্ত্রিক দেবী। শ্রীখণ্ডকে যেন তান্ত্রিক দেবদেবী এখনও বেষ্টন করে রেখেছেন। শ্রীখণ্ডের মধ্যেই এখনও উত্তরদিকে রয়েছেন অনাদিলিঙ্গ শিব, প্রাণতোষণী তন্ত্রমতে ইনিই দেবতা 'ভীরুক', কেতুগ্রামের বহুলা দেবীর ভৈরব। বর্তমান শিবমন্দিরটি মহারাজা রাজবল্লভের তৈরি, শিলাফলক থেকে জানা যায়। গ্রামের পুবদিকে রয়েছেন গ্রাম্যদেবী কালী। পশ্চিমে বহু প্রাচীন একটি মন্দির, খণ্ডেশ্বরীতলা। বৈদ্যখণ্ড বা শ্রীখণ্ডের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলে 'খণ্ডেশ্বরী'। পঞ্চমুণ্ডির আসন বলে কথিত তান্ত্রিক সাধনার স্থানও আছে শ্রীখণ্ডে। এসব তান্ত্রিক সাধনার পূর্বস্মৃতি নিঃসন্দেহে বহন করছে। তার মধ্যে একদিকে আছে বড়ডাঙা, নরহরির ভজনস্থান, পূর্বাচার্যদের মিলনক্ষেত্র।

নরহরি সরকার ঠাকুর ও রঘুনন্দনের সাধনায় তান্ত্রিক পদ্ধতির কোন প্রভাব ছিল কিনা বলা যায় না। নরহরি সরকার ও লোচনদাসের রাগাত্মিকা বা রাগানুগা ভজনপদ্ধতি, রাধাভাব ও নাগরভাব, পদের মধ্যে বাউল-বাউলিনীর কথা ইত্যাদির মধ্যে কোনরকম তান্ত্রিক সহজ-সাধনধারার প্রভাব যে একেবারেই নাই, এমন কথা জোর করে বলা যায় না। নরহরি-রঘুনন্দনের অনুবর্তীদের সাধনায় তান্ত্রিকরীতির প্রভাব আরও অনেক বেশি স্পষ্ট। লোকানন্দ ও লোচনানন্দ হলেন নরহরির দুটি প্রধান শাখা। লোকানন্দ বিধিমার্গে গৌরাঙ্গ উপাসনার অঙ্গগুলি প্রকাশ করেছেন, আর লোচনানন্দ

২৩

২৪

রাগমার্গে গৌরাঙ্গভজনের তত্ত্বকথা প্রচার করেছেন। গৌরাঙ্গ উপাসনার রীতি লোকানন্দ তাঁর 'ভক্তিচন্দ্রিকা' গ্রন্থে নির্দেশ করে গেছেন। উপাসনার পদ্ধতিটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্বয়ং নরহরি সরকার ঠাকুরই নাকি এই উপাসনা-পদ্ধতির কথা নিজ মুখে বলে গিয়েছিলেন। পদ্ধতির মধ্যে আগাগোড়া তান্ত্রিক রীতিনীতি ও আচার-ব্যবহারের প্রাধান্য দেখা যায়। তার মধ্যে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য হল—তান্ত্রিক পদ্ম-মণ্ডলের ছয়কোণে শ্রীচৈতন্যের ছয়জন প্রধান পার্শ্বচরকে প্রতিষ্ঠা করে উপাসনা করার কথা। যেমন, সামনে গদাধর পণ্ডিত থাকবেন, দক্ষিণে স্বরূপ থাকবেন ইত্যাদি। নরহরির আসন সর্বপ্রধান, একেবারে মণ্ডল-কেন্দ্রে, কিন্তু নিত্যানন্দ অদ্বৈত মাধবেন্দ্র সকলে বাইরে। 'ভক্তিচন্দ্রিকা'র ঐতিহাসিক মূল্য কতখানি সঠিক বলা যায় না। না বলা গেলেও, নরহরির কোন অনুবর্তীর রচনা যে তাতে অন্তত সন্দেহ করার কোন কারণ নেই। প্রশ্ন হল, শ্রীখণ্ডের উত্তরসাধকদের মধ্যে এই তান্ত্রিক প্রভাব কোথা থেকে এল হঠাৎ এবং হঠাৎ-ই বা আসবে কেন?

শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার ও তাঁর শিষ্য লোচনদাসের রচিত পদাবলীর মধ্যে সহজমতের বেশ প্রভাব আছে দেখা যায়। তান্ত্রিক সাধনধারার প্রভাব প্রসঙ্গে এই বৈশিষ্ট্যও লক্ষণীয়। এখানে আরও একটি কথা বিশেষভাবে মনে রাখা উচিত। রাঢ়দেশে বড়ু চণ্ডীদাস ও দ্বিজ চণ্ডীদাসের সহজসাধনের ধারার উত্তরাধিকারী হওয়া শ্রীখণ্ডের নরহরি ও কোগ্রামের লোচনদাসের পক্ষে আদৌ অস্বাভাবিক নয়। বড়ু ও দ্বিজ চণ্ডীদাস যে সহজপন্থী ছিলেন তা তাঁদের পদাবলী থেকে পরিষ্কার বুঝতে পারা যায়। যেমন:

অহোনিশি যোগ ধেআই।
মন পবন গগন রহাই॥
মূল কমলে কয়িলে মধুপান।
এবে পাইএগ আহ্মে ব্রহ্মগেআন॥ ··
ইড়া পিঙ্গলা সুসমনা সন্ধী।
মন পবন তাতে কৈল বন্দী॥
দশমী দুয়ারে দিলোঁ কপাট।
এবে চড়িলোঁ মো সে যোগবাট॥

—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

দ্বিজ চণ্ডীদাসের পদের মধ্যে 'সহজ' কথার অন্ত নেই। বৌদ্ধ সহজযানীদের এই সাধনপদ্ধতির ধারা পঞ্চদশ শতাব্দীতে বড়ু ও দ্বিজ চণ্ডীদাসের পদাবলী কীর্তনে যে বেশ প্রভাব বিস্তার করেছিল রাঢ়দেশে, তাতেও কোন সন্দেহ নেই। শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে যদি সেই সাধনার উত্তরসাধক হয়ে জন্মগ্রহণ করেন, তাতে আশ্চর্য হবার কি আছে? এই কারণেই মনে হয় শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকারের উপর তান্ত্রিক সহজযানের সাধনধারার প্রভাব ছিল কিছুটা।

নরহরি সরকারের পদগুলিতে চণ্ডীদাসের প্রভাব এত বেশি যে, অনেক সময় মনে হয় সেগুলি একসুরে, এমন কি একভাষায় পর্যন্ত রচিত। যেমন, রাধামোহন ঠাকুর সঙ্কলিত 'পদামৃতসমুদ্রে' নরহরি ভণিতায় যে পদটি আছে :

কিনা হৈল সই মোরে কানুর পিরীতি
আঁখি ঝুরে পুলকেতে প্রাণ কাঁদে নিতি।
খাইতে সোয়াথ নাই নিন্দ গেল দূরে
নিরবধি প্রাণ মোর কানু লাগি ঝুরে।
যে না জানে এই রস সেই আছে ভাল
মরমে রহল মোর কানুপ্রেম-শেল।...

—পড়লেই মনে হয় চণ্ডীদাসের পদ পড়ছি। দীনবন্ধু দাসের 'সঙ্কীর্তনামৃতে' উদ্ধৃত এই পদটি এদিক দিয়ে আরও উল্লেখযোগ্য :

সই কত না সহিব ইহা
আমার বন্ধুয়া আন বাড়ী যায়
আমার আঙ্গিনা দিয়া।
যেদিনে দেখিব আপন নয়ানে
কহে কার সনে কথা
কেশ ছিঁড়িব বেশ দূরে থোব
ভাঙ্গিব আপন মাথা।...

'শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব' গ্রন্থে নরহরি সরকারের অনেকগুলি পদ উদ্ধৃত করা হয়েছে। ১৩৩৪ সাল থেকে প্রকাশিত (শ্রীখণ্ড থেকে) 'শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-মাধুরী' মাসিক পত্রিকায় (শ্রীরাখালানন্দ ঠাকুর শাস্ত্রী সম্পাদিত) নরহরির অনেক পদ প্রকাশিত হয়েছে ধারাবাহিকভাবে। বর্তমানে এই বংশেরই অন্যতম প্রবীণ

বংশধর শ্রীগৌরগুণানন্দ ঠাকুর শ্রীখণ্ডের বৈষ্ণব-সাধনার ইতিহাস রচনায় ব্রতী হয়েছেন; তাঁর কাছ থেকেও নরহরির কয়েকটি পদ শুনেছি। তার মধ্যে এই পদাংশগুলি বিশেষভাবে বিচার্য:

বামেতে ডাহিনে সমুখে পিছনে
জলের ভিতর গোরা।
এ জন্মের মত অঞ্জন হইয়ে
লাগিয়ে রহল পারা॥
তোরাও দেখিবি তখনি ভুলিবি
আমার মতন হবি।
বাউলিনী হঞা কাঁদিয়া বেড়াবি
যাচিয়া যৌবন দিবি॥
পরাণ সহিতে টানাটানি হবে
গরলে ভরিবে দেহা।
কহে নরহরি তখনই জানিবি
নবীন গৌরাঙ্গ লেহা॥

অথবা এই পদটি—

রসের ভ্রমরা মোর গোরা।
কিবা জানে পিরীতি নব নব যুবতী
বদন কমল মধু চোরা॥…
হিয়ায় ধরয়ে হিয়া গৌরাঙ্গ রসিয়া গো
সঘনে কাঁপই মোর দেহা।
নরহরি প্রাণ বঁধু কত না জানয়ে গো
অমিয়া পাথার তার লেহা॥

নরহরি সরকারের এই নাগরভাবে ভজনপদ্ধতিতে সহজসাধনের প্রভাব এত স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ যে, ব্যাখ্যা করে বোঝাবার দরকার হয় না। এই কারণেই বৃন্দাবন দাস তাঁর 'চৈতন্যভাগবতে' নরহরির কথা একেবারে উল্লেখ করেননি। নরহরির এই সহজধর্মানুরাগ ও নাগরভাব তিনি সমর্থন করতেন না। লোচনদাস তা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করেছিলেন এবং 'চৈতন্যমঙ্গলে' তা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে গেছেন:

শ্রীনরহরি দাস ঠাকুর আমার।
বৈদ্যকুলে মহাকুল প্রভাব যাঁহার॥
অনর্গল কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণময় তনু।
অনুমতি জনে না বুঝান প্রেম বিনু॥…
ক্ষণে রাধাকৃষ্ণরসে নির্মল পিরীতি।
শ্রীখণ্ডভূখণ্ড মাঝে যাঁর অবস্থিতি॥…
বৃন্দাবনে মধুমতী নাম ছিল যার।
রাধাপ্রিয় সঙ্গী তিঁহো মধুর ভাণ্ডার॥
এবে কলিকালে গৌর-সঙ্গে নরহরি।
রাধাকৃষ্ণ প্রেমের ভাণ্ডারে অধিকারী॥

(চৈতন্যমঙ্গল, সূত্রখণ্ড)

বৈষ্ণব সহজিয়া ও বাউল-সম্প্রদায়ের উপর এই কারণেই মনে হয় শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার ঠাকুর, তাঁর শিষ্য লোচনদাস ও তাঁদের অনুবর্তীরা বেশ প্রভাব বিস্তার করেছেন। বৈষ্ণব-সংস্কৃতিতে শ্রীখণ্ডের বৈদ্যবংশের এইটাই হল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দান। এইদিক দিয়ে রাঢ়দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারা তাঁরা চৈতন্য ও তাঁর পরবর্তী যুগেও অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন দেখা যায়।

বৈদ্যখণ্ড বা শ্রীখণ্ড উত্তররাঢ়ের অন্যতম প্রধান সংস্কৃতিকেন্দ্র হয়ে উঠেছিল বৈষ্ণবযুগে। লোচনদাস কোগ্রাম থেকে শ্রীখণ্ডে গিয়েছিলেন অধ্যয়নের জন্য। নরহরি সরকার নবদ্বীপে থেকে লেখাপড়া করতেন। শ্রীচৈতন্যের চেয়ে বয়সে তিনি কয়েক বছরের বড় ছিলেন। নবদ্বীপেই তাঁর সঙ্গে চৈতন্যের সাক্ষাৎ ও মিলন হয়। চৈতন্যবিষয়ক প্রথম পদরচয়িতাদের মধ্যে নরহরি সরকার একজন। নরহরির অন্যান্য পদাবলীর কথা তো আগেই বলেছি। নরহরির শিষ্য লোচনদাসেরও কাব্যপ্রেরণার উৎস শ্রীখণ্ড। নরহরির ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুনন্দন, চিরঞ্জীব, সুলোচন, সুকবি দামোদর, রামচন্দ্র, গোবিন্দ, বলরাম দাস, রতিকান্ত, শচীনন্দন, কানাই ঠাকুর, নয়নানন্দ, রায়শেখর, জগদানন্দ প্রভৃতি আরও অনেকের কাব্যপ্রতিভার বিকাশ হয়েছিল শ্রীখণ্ডে। এত ভক্ত ও কবির আবির্ভাবকেন্দ্র বলে গোপাল দাস 'নরহরির শাখা-নির্ণয়ে' বলেছেন—

"ক্ষিতি নবখণ্ড মাঝে খণ্ড মহাস্থান, সর্বত্র সৌরভ যার মলয়জ সমান।"

শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে নরহরি প্রথম যে পদটি রচনা করেছিলেন, তার ঐতিহাসিক মূল্য আছে। পদটি এই :

গৌরলীলা দরশনে ইচ্ছা বড় হয় মনে
ভাষায় লিখিয়া সব রাখি
মুঞি তো অতি অধম লিখিতে না জানি ক্রম
কেমন করিয়া তাহা লিখি।
এ গ্রন্থ লিখিবে যে এখন জন্মে নাই সে
জন্মিতে বিলম্ব আছে বহু
ভাষায় রচনা হইলে বুঝিবে লোকসকলে
কবে বাঞ্ছা পুরাবেন পহু।...

নরহরি ভণিতায় সহজসাধন ঘটিত কয়েকটি পদ পাওয়া গেছে। শ্রী সুকুমার সেন তাঁর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসগ্রন্থে একটি পদ উদ্ধৃত করেছেন এবং বলেছেন যে, পদটি নরহরির লেখা না হওয়াই সম্ভবপর। পদটি এই :

সহজ মানুষ কোথায় নাই
খুঁজিলে তাহারে নিকট পাই।...
মরা মানুষ হয়্যা যদি কাড়য়ে রা
তবে সে লাগিবে প্রেমের বা।
কহে নরহরি অমিঞা রাশি
সদা রহু মন সহজে পশি।

শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকারের উপর সহজসাধনের প্রভাব পড়া যে আদৌ বিচিত্র নয়, একথা আগে আলোচনা করেছি। স্থান ও কাল উভয় দিক দিয়েই বরং তাঁর পক্ষে সেই সাধনধারার ঐতিহ্যপুষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। চণ্ডীদাসের প্রভাব তাঁর পদাবলীতে যে খুব বেশি, তা যে কোন পাঠক একবার পড়েই বুঝতে পারবেন। সুতরাং উদ্ধৃত পদটি, অথবা নরহরি-ভণিতায় অন্যান্য সহজসাধনের পদগুলি শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকারের রচনা হওয়া অসম্ভব নাও হতে পারে। শ্রীখণ্ডের বৈষ্ণব কবিরা পদাবলী সাহিত্যে একটা যে বিশেষ ধারার প্রবর্তন করেছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

শ্রীচৈতন্য ও নরহরির মিলন হয় নবদ্বীপে। এই প্রথম মিলনের কথা

নরহরি তাঁর একাধিক পদে প্রকাশ করে গেছেন। প্রথম থেকেই তিনি যে নাগরভাবে শ্রীচৈতন্যকে ভক্তি-নিবেদন করতেন, তাও তাঁর পদাবলী থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়। এই জন্যই শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার বৃন্দাবনের 'মধুমতী' বলে বৈষ্ণবসমাজে পরিচিত। 'শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায়' বলা হয়েছে:

পুরা মধুমতী প্রাণসখীবৃন্দাবনেস্থিত।
অধুনা নরহর্য্যাখ্যঃ সরকারঃ প্রভোঃ প্রিয়ঃ॥

শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দ শ্রীখণ্ডে এসে নরহরির কাছে মধুপানের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন বলে কথিত আছে। যে পুষ্করিণীর জল অঞ্জলিভরে নরহরি তাঁদের পান করতে দিয়েছিলেন আজও তা 'মধুপুষ্করিণী' নামে খ্যাত। উদ্ধব দাসের পদে আছে:

কহে নিত্যানন্দ রাম শুনি মধুমতী নাম
আসিয়াছি তৃষিত হইয়া।
এত শুনি নরহরি নিকটেতে জল হেরি
সেই জল ভাজনে ভরিয়া।...
মধুমতীর মধু দান সপার্ষদে করি পান
উনমত অবধূত রায়।
হাসে কাঁদে নাচে গায় ভূমে গড়াগড়ি যায়,
উদ্ধব দাস রস গায়॥

নরহরির পিতা নরনারায়ণ দেব সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর তিন পুত্রের মধ্যে নরহরি কনিষ্ঠ এবং মুকুন্দ জ্যেষ্ঠ। মুকুন্দ দাস গৌড় দরবারে রাজবৈদ্য ছিলেন। নরহরি পিতার কাছে শ্রীখণ্ডেই থাকতেন এবং তাঁর কাছেই শৈশবে সংস্কৃত ব্যাকরণাদি শিক্ষা করেন। পরে নবদ্বীপ যান শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য। রাজবৈদ্য মুকুন্দ দাসের অর্থেই সংসার চলত এবং তাঁদের কুলদেবতা গোপীনাথের সেবা হত। নবদ্বীপে না গেলে তখন অধ্যয়ন সম্পূর্ণ হত না বলে, সকলেই নবদ্বীপ যেতেন:

চতুর্দিক হইতে লোক নবদ্বীপ যায়।
নবদ্বীপে পড়িলে সে বিদ্যারস পায়॥

শ্রীখণ্ড থেকে নবদ্বীপ মাত্র বারো-তেরো ক্রোশ দূরে, এক বেলার বা এক দিনের পথ। সুতরাং যাতায়াত করাও কষ্টকর ছিল না। নরহরি হয়ত তাই

করতেন। মুকুন্দ বিবাহ করেন, নরহরি অবিবাহিতই ছিলেন। মুকুন্দ-পুত্র রঘুনন্দন বাল্যকাল থেকে নরহরির সাহচর্যেই পালিত হন। তাঁর শিক্ষা ও দীক্ষা দুই-ই তাঁর কাছে হয়।

নরহরির সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের নবদ্বীপে মিলন হয়েছিল কিনা, তাই নিয়ে মতভেদ আছে। কোন দ্বন্দ্বের মধ্যে না গিয়েও বলা যায় যে, মিলন হওয়া অস্বাভাবিক নয়। নরহরি শ্রীচৈতন্যের চেয়ে কয়েক বছরের বড় ছিলেন। নবদ্বীপে থেকে যখন তিনি অধ্যয়ন করতেন, তখন অদ্বৈতাচার্য, শ্রীবাস, হরিদাস, মুরারি গুপ্ত, গদাধর প্রভৃতির সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। তখন চৈতন্যের দর্শনলাভ করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব নয়। এই প্রসঙ্গে রঘুনন্দন-শিষ্য রায়শেখরের এই পদটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য :

রঘুনন্দনের পিতা মুকুন্দ যাঁহার ভ্রাতা
নাম তাঁর নরহরি দাস।
রাঢ়ে বঙ্গে সুপ্রচার পদবী যে সরকার,
শ্রীখণ্ড গ্রামেতে বসবাস॥
গৌরাঙ্গ জন্মের আগে বিবিধ রাগিণী রাগে,
ব্রজরস করিলেন গান।
হেন নরহরি সঙ্গ পাইয়া পঁহু শ্রীগৌরাঙ্গ
কত সুখে জুড়াইল প্রাণ॥

নীলাচলে চৈতন্যের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য গৌড়ের বৈষ্ণবরা যখন শান্তিপুরে অদ্বৈতভবনে মিলিত হয়েছিলেন, তখন কুলীনগ্রাম ও শ্রীখণ্ডের ভক্তরাও সেখানে গিয়েছিলেন। 'চৈতন্যচরিতামৃতে' তার বর্ণনা আছে :

প্রভুর সমাচার শুনি কুলীনগ্রামবাসী।
সত্যরাজ রামানন্দ মিলিলা তাঁহা আসি॥
মুকুন্দ নরহরি রঘুনন্দন খণ্ড হৈতে।
আচার্যের ঠাঁই আইলা নীলাচল যাইতে॥

প্রথম থেকেই নরহরি নাগরভাবেই যে চৈতন্যকে দেখতেন এবং ভাবোন্মত্ত সঙ্কীর্তনেই তিনি যে তা প্রকাশ করতেন, তারও অনেক প্রমাণ আছে। এ বিষয়ে হয়ত তাঁর সঙ্গে অন্যান্য ভক্তদের মতভেদও ছিল। এই প্রসঙ্গে কৃষ্ণদাস কবিরাজের এই উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য :

খণ্ডের সম্প্রদায় করে অন্যত্র কীর্তন।
নরহরি নাচে তাঁহা শ্রীরঘুনন্দন ॥

'খণ্ড সম্প্রদায় করে অন্যত্র কীর্তন' কথাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নরহরির ভজন-স্বাতন্ত্র্যের প্রমাণ পাওয়া যায়, এই উক্তির মধ্যে। তা ছাড়া, কীর্তন গানের এক বিশেষ ভঙ্গির প্রবর্তকও তিনি ছিলেন বলে মনে হয়। বাংলা দেশের কীর্তন গানের বিবিধ ঢঙের মধ্যে 'মনোহরশাহী' ও 'রানীহাটি (রেনেটি)' ঢঙই প্রসিদ্ধ। মনোহরশাহী বর্ধমান জেলার উত্তরে, রানীহাটি দক্ষিণে। কুলীনগ্রাম রানীহাটি পরগণার অন্তর্গত। উত্তর ও দক্ষিণের এই দুই ঢঙের মধ্যে উত্তররাঢ়ের মনোহরশাহী কীর্তনে শ্রীখণ্ড সম্প্রদায়ের বিশেষ দান আছে বলে মনে হয়। শ্রীখণ্ডের কীর্তন-শিক্ষার টোলও ছিল শুনেছি। এখনও শ্রীগৌরগুণানন্দ ঠাকুর নিয়মিত কীর্তন গান করেন এবং ছাত্রদের কীর্তন শিক্ষা দিয়ে থাকেন। বৃদ্ধ বয়সেও তাঁর কীর্তন গানের দক্ষতা ও ক্ষমতা দেখলে বিস্মিত হতে হয়।

নরহরি সরকারের অন্যতম কীর্তি হল, গৌরাঙ্গপূজার প্রবর্তন এবং গৌরমূর্তি নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠা। মুরারি গুপ্ত বলেন, বিষ্ণুপ্রিয়াও গৌরাঙ্গমূর্তি পূজা করতেন। অম্বিকা-কালনার গৌরীদাস পণ্ডিতও শ্রীচৈতন্যের জীবদ্দশায় গৌর-নিতাইয়ের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন।[১] শ্রীচৈতন্যের তিনটি নদীয়া-নাগর মূর্তি নির্মাণ করিয়ে নরহরি সরকার একটি নিজগ্রাম শ্রীখণ্ডে, একটি গঙ্গানগরে এবং সবচেয়ে-বড় মূর্তিটি দাস গদাধরের শিষ্য বিদ্যানন্দ পণ্ডিতের দ্বারা কাটোয়ায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কাটোয়ায় সবচেয়ে বড় মূর্তিটি প্রতিষ্ঠা করার প্রধান কারণ হল, শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণের স্মৃতিবিজড়িত স্থান কাটোয়া এবং এইদিক দিয়ে বৈষ্ণবতীর্থ হিসেবে কাটোয়ার প্রাধান্য বেশি। এখন দু'টি মূর্তি শ্রীখণ্ডে আছে, বড়টি আছে কাটোয়ায়। জীবনের শেষ অবস্থায় গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার যুগলমূর্তি স্থাপনেরও ইচ্ছা হয়েছিল নরহরির মনে। কথিত আছে, সন্ন্যাস গ্রহণ করে শ্রীচৈতন্য নীলাচল যাত্রার সময় নরহরিকে নদীয়ায় শচী-বিষ্ণুপ্রিয়ার তত্ত্বাবধানের ভার দিয়ে গিয়েছিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়ার দুঃখে কাতর হয়ে হয়ত ঠাকুর নরহরি যুগলমূর্তি প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেন। এই বাসনা নরহরির জীবদ্দশায় পূর্ণ হয়নি। নরহরির ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুনন্দনের

১ S. K. De: Vaishnava Faith & Movement, P. 333fn.

পুত্র কানাই ঠাকুর পরে এই বিষ্ণুপ্রিয়ার মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। সুতরাং শ্রীচৈতন্যের মূর্তি এবং বিষ্ণুপ্রিয়ার মূর্তি প্রথম শ্রীখণ্ডেই প্রতিষ্ঠিত হয়।[১]

শ্রীখণ্ডের দক্ষিণে 'বড় ডাঙা' নামক স্থানে নরহরি সরকার ঠাকুর ভজন করতেন। আরও অনেক বৈষ্ণব আচার্য সাধনা করে এইখানে সিদ্ধিলাভ করেছেন বলে শোনা যায়। এই বড়ডাঙাতেই রঘুনন্দন ও অভিরাম গোস্বামীর মিলন হয়। বড়ডাঙাতেই নরহরি ঠাকুরের তিরোভাব হয়। 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থে বলা হয়েছে :

কার্তিকে শ্রীদাস গদাধর সঙ্গোপনে।
প্রভু নরহরি শীর্ণ হৈলা ক্ষণে ক্ষণে॥
কে বুঝিতে পারে তাঁর অন্তরের ব্যথা।
সে দিবস হৈতে কারো সনে নাই কথা॥
মার্গশীর্ষ মাসে কৃষ্ণা একাদশী দিনে।
অকস্মাৎ অদর্শন হৈলা এই স্থানে॥

যে বৎসর কার্তিক মাসে দাস গদাধরের তিরোভাব হয়, সেই বৎসর অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণা একাদশীদিনে নরহরি সরকার ঠাকুরেরও তিরোভাব হয়। অগ্রহায়ণ মাসের এই তিথিতে প্রতি বৎসর 'বড়ডাঙার মহোৎসব' হয়। ঠাকুর নরহরির প্রথম বার্ষিক উৎসব শ্রীখণ্ড গ্রামের গৌরাঙ্গ-প্রাঙ্গণেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল। রঘুনন্দন ও শ্রীনিবাসের চেষ্টায় তাঁর দ্বিতীয় বার্ষিক উৎসব 'বড়-ডাঙাতে'ই অনুষ্ঠিত হয়। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত এই বড়ডাঙাতেই উৎসব হচ্ছে। নানাস্থান থেকে বৈষ্ণব মহান্ত, আচার্য, কবি, কীর্তনিয়া, বাউল প্রভৃতির সমাবেশ হয়েছিল উৎসবে। 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থে তাঁদের সুদীর্ঘ নামের তালিকা আছে—প্রভু শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্রের পুত্রদ্বয়। কৃষ্ণ মিশ্র গোপাল পরমানন্দময়॥ প্রভু নিত্যানন্দের নন্দন বীরভদ্র। ভুবন মোহন যেঁহো গুণের সমুদ্র॥

এখনও শ্রীখণ্ডের বড়ডাঙায় মহোৎসবের সময় নানাস্থান থেকে বৈষ্ণব ও বাউলরা আসেন এবং কয়েকদিন ধরে অনুষ্ঠান চলতে থাকে। কীর্তন ও বাউল গানের সুরে শ্রীখণ্ড গ্রাম মুখর হয়ে ওঠে।

---

১ শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ—শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর : শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গমাধুরী পত্রিকা, ভাদ্র ১৩৩৬।

কণ্টকনগর-কাটোয়া

ছেলেবেলায় 'নদের নিমাই' বা 'নিমাই সন্ন্যাস' যাত্রাগান শুনে বিমর্ষ হয়ে ঘরে ফেরেননি বাংলাদেশে এমন লোক কেউ আছেন কিনা সন্দেহ। কে 'নিমাই', 'সন্ন্যাসই' বা কেন, এসব কথা না জেনেও বালকের চিত্ত বেদনার্দ্র হয়ে উঠেছে। কেন নিমাই সংসারী হয়েও যৌবনের প্রারম্ভে গৃহত্যাগী হলেন তার ঐতিহাসিক বা নৈতিক কোন তাৎপর্যই তখন আমাদের কাছে পরিষ্কার ধরা পড়েনি। পুত্রকে সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষা দেবার জন্য নাকি গঙ্গাতীরস্থ এই নগরকে নিমাই-জননী 'কণ্টকনগর' বলেছিলেন মনের দুঃখে। সেই কণ্টকনগর থেকে কেউ বলেন 'কাটোয়া' নাম হয়েছে। কেউ বলেন কাঁটাদিয়া বা কাঁটাদ্বীপ থেকে 'কাটোয়া' নামের উৎপত্তি। নবদ্বীপ অগ্রদ্বীপের মতন কাঁটাদ্বীপ হওয়া অসম্ভব নয়। 'দ্বীপ' ও 'দহ' দিয়ে গঙ্গাতীরে একাধিক গ্রামের নাম আছে। এরকম কোন কণ্টকময় দ্বীপ ষোড়শ শতকের গোড়ায় বিশ্বম্ভরকে সন্ন্যাস-দীক্ষা দিয়ে 'শ্রীচৈতন্যে' রূপান্তরিত করে ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। তারই নাম কাটোয়া।

চৈতন্যপূর্ব যুগের কাটোয়ার কোন সঠিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। অনুমান করা যায় শুধু, যদিও প্রমাণ-নিরপেক্ষ অনুমান ঠিক ইতিহাসপদবাচ্য নয়। বখ্‌তিয়ার যখন অতর্কিতে নদীয়া আক্রমণ করে লক্ষ্মণসেনকে সিংহাসনচ্যুত করেছিলেন, তখন কোন্ পথ দিয়ে গিয়েছিলেন তিনি? তখনকার কাটোয়া বা কাঁটাদ্বীপ গ্রাম কি সেই পথের উপর পড়েনি? পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কালে বর্ধমানের দক্ষিণ পর্যন্ত যে গৌড়েশ্বরের প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল, কুলীনগ্রামের 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'-রচয়িতা মালাধর বসুর স্বীকারোক্তি থেকেই তা বোঝা যায়। তার আগে মুসলমান যুগের বাকি দু'শ বছরের ইতিহাসের ধারা যে ভাগীরথীর ধারা ধরেই প্রবাহিত হয়েছে, তাতেও সন্দেহের বিশেষ কোন কারণ নেই। উত্তররাঢ়ের গঙ্গাতীরবর্তী অঞ্চলে মুসলমান আধিপত্য ও মুসলিম সংস্কৃতির চিহ্ন দেখেই তা বোঝা যায়। কাটোয়া মুর্শিদাবাদের 'দ্বার' বলে গণ্য হয়েছে পরবর্তীকালে। তার আগেও কাটোয়ার ভৌগোলিক গুরুত্ব থাকা আশ্চর্য নয়। সুতরাং মুসলমান আমলের গোড়া

থেকেই মনে হয় এই অঞ্চলের অন্যান্য আরও অনেক গ্রামের মতন কাটোয়াতেও মুসলমানদের আধিপত্য বাড়ে। আধিপত্য মানে সর্বক্ষেত্রে সংখ্যাধিক্য নয় অবশ্য। আধিপত্য অর্থে ইসলামের প্রতিপত্তি বাড়তে থাকে, প্রতিষ্ঠা হতে থাকে। অর্থাৎ গাজীসাহেবদের জিহাদ চলতে থাকে সোৎসাহে। বিশেষ করে মঙ্গলকোট ও কালনা যখন কাটোয়া থেকে বেশি দূর নয়, তখন মনে হয় না যে গাজীসাহেবদের প্রভাব থেকে কাটোয়া মুক্ত ছিল। গ্রামের অনুন্নত সম্প্রদায়ের লোক, ছন্নছাড়া বৌদ্ধ ও তান্ত্রিকরা ধর্মান্তরিত যে হয়েছিল তাতেও কোন সন্দেহ নেই। 'ধর্মরাজ' ঠাকুর তখন একবার সমাজটাকে বাঁচাবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন। কাটোয়াতে এখনও 'ধর্মরাজ' আছেন। বৃন্দাবন দাস যাদের 'পাষণ্ড' বলেছেন, তারাও যে একেবারে ছিল না কাটোয়াতে তা নয়। অর্থাৎ তান্ত্রিক উপাসকের সংখ্যাও কম ছিল না কাটোয়াতে। আজও কাটোয়ায় শক্তিপূজা মহাসমারোহেই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। চৈতন্যপূর্ব নবদ্বীপের সাংস্কৃতিক পরিবেশ কাটোয়া শ্রীখণ্ড প্রভৃতি অঞ্চলেও ছিল বলে মনে হয়। মদ্য-মাংস দিয়ে যারা দেব-দেবীর পূজা করে, তাদের বেশ প্রতিপত্তি ছিল লোকসমাজে।

চৈতন্যযুগের গোড়া থেকে, অর্থাৎ পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষদিক থেকে দুই ধর্ম ও সংস্কৃতির সংঘাতের পর্ব শেষ না হলেও, সমন্বয় যে শুরু হয়েছিল, তা বেশ বোঝা যায়। কাজীর ঐতিহাসিক উক্তি তার অকাট্য প্রমাণ। নগর-কীর্তনের দল যখন নবদ্বীপের কাজীর বাড়ি চড়াও হল, তখন কাজী ঘরে পালিয়ে গেলেন। তারপর ফিরে এসে কাজী সাহেব শ্রীচৈতন্যকে বললেন :

গ্রাম সম্বন্ধে চক্রবর্তী হয় মোর চাচা।
তেহ সম্বন্ধ হৈতে হয় গ্রাম সম্বন্ধ সাঁচা॥
নীলাম্বর চক্রবর্তী হয় তোমার নানা।
সে সম্বন্ধে হও তুমি আমার ভাগিনা॥
ভাগিনার ক্রোধ মামা অবশ্য সহয়।
মাতুলের অপরাধ ভাগিনা না লয়॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত : আদি)

"তেহ সম্বন্ধ হৈতে হয় গ্রাম সম্বন্ধ সাঁচা"—কাজীর এই উক্তি থেকে বোঝা যায়, দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমীকরণের কাজ তখন

অনেকদূর অগ্রসর হয়েছে। নবদ্বীপে যখন হয়েছিল, তখন কাটোয়াতেও মনে হয় একটা সাম্প্রদায়িক উদারতার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল শ্রীচৈতন্যের দীক্ষা-কালে। উল্লেখযোগ্য হল, শ্রীচৈতন্য ইসলামধর্মের আশঙ্কা যতটা প্রকাশ করেননি, এমনকি তাঁর চরিতকাররা পর্যন্ত, তার চেয়ে অনেক বেশি ব্যাকুলতা প্রকাশ করেছেন ধর্মাচরণের নামে হিন্দুধর্মের ব্যভিচার সম্বন্ধে। শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাসগ্রহণ প্রসঙ্গে কথাটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য মনে হয় এবং কাটোয়া প্রসঙ্গে সেইজন্যই বিষয়টির অবতারণা করতে হল। কেন শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন?

সন্ন্যাস গ্রহণের কারণ সঠিক জানা যায় না। চরিতকারদের মধ্যে কৃষ্ণদাস কবিরাজ যা বলেছেন তা থেকে মনে হয়, ধর্মসংস্কারই তাঁর সন্ন্যাস গ্রহণের অন্যতম লক্ষ্য ছিল। ধর্মের আচারের নামে যে ব্যভিচার চলছিল সমাজে, তাকে প্রতিরোধ করতে চেয়েছিলেন চৈতন্য। চৈতন্যচরিতামৃতে তাঁর নিজের এই উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য :

যত অধ্যাপক আর তাঁর শিষ্যগণ।
ধর্মী ধর্মী তপোনিষ্ঠ নিন্দুক দুর্জন॥
এই সব মোর নিন্দা অপরাধ হইতে।
আমি না লওয়াইলে ভক্তি না পারে লইতে॥
নিস্তারিতে আইলাম আমি হইল বিপরীত।
এ সব দুর্জনের কৈছে হইবেক হিত॥...
মোরে নিন্দা করে যে না করে নমস্কার।
এ সব জীবের অবশ্য করিব উদ্ধার॥
অতএব অবশ্য আমি সন্ন্যাস করিব।
সন্ন্যাসীর বুদ্ধে মোর প্রণত হইব॥...
এ সব পাষণ্ডীর তবে হইতে নিস্তার।
আর কোন উপায় নাহি এই যুক্তি সার॥

(আদি—১৭অ)

সার্বভৌম, আগমবাগীশ প্রভৃতি বৈদান্তিক, তান্ত্রিক ও অন্যান্য আচার্যরা নবদ্বীপে যে মানসিক পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন, তাতে বিশ্বম্ভরের ভক্তির আলোড়ন এবং প্রচারের জন্য কীর্তনের 'মাধ্যম' অত্যন্ত বেমানান মনে হচ্ছিল। তাঁদের

কাছে ব্যাপারটা খুব প্রীতিকরও মনে হচ্ছিল না। টোলের পড়ুয়ারা পর্যন্ত এই কীর্তনীয়াদলের নিন্দা করত—"তথাপি দাম্ভিক পড়ুয়া নম্র নাহি হয়, যাঁহা তাঁহা প্রভুর নিন্দা হাসি সে করয়।" এই বিরোধিতা দূর করার জন্যই বিশ্বম্ভর সন্ন্যাস গ্রহণ করবেন মনস্থ করেন এবং কাটোয়াতে কেশবভারতীর কাছে এসে দীক্ষা নেন :

এত বলি ভারতী গোসাঞি কাটোয়াতে গেলা।
মহাপ্রভু তাঁহা যাই সন্ন্যাস করিলা॥
সঙ্গে নিত্যানন্দ চন্দ্রশেখর আচার্য।
মুকুন্দ দত্ত এই তিন করিল সর্বকার্য॥
এই আদিলীলার কৈল সূত্রগণন।
বিস্তারি বর্ণিলা ইহা দাস বৃন্দাবন॥

(আদি, ১৭অ)

বৃন্দাবন দাস 'চৈতন্যভাগবতে' সন্ন্যাস গ্রহণের আরও বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, গঙ্গা পার হয়ে শ্রীচৈতন্য কণ্টকনগরে এলেন। আগে থেকে তিনি যাঁদের বলেছিলেন, তাঁরাও এসে একে-একে মিলিত হলেন কাটোয়ায়। তাঁদের মধ্যে বৃন্দাবন দাস নাম করেছেন অবধূতচন্দ্র বা নিত্যানন্দের, গদাধর, মুকুন্দ, চন্দ্রশেখর ও ব্রহ্মানন্দের। সন্ন্যাস গ্রহণের পর কেশবভারতী তাঁর নাম দিলেন 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য', যা থেকে বিশ্বম্ভর 'চৈতন্য' নামে পরিচিত হলেন—"এতেকে তোমার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। সর্বলোকে তোমা হইতে যাতে হৈল ধন্য।" সন্ন্যাস গ্রহণ করে কাটোয়ায় শ্রীচৈতন্য মাত্র এক রাত্রি বাস করেন। সারা রাত্রি ধরে কাটোয়ায় তিনি কীর্তন করেছিলেন :

করিয়া সন্ন্যাস বৈকুণ্ঠের অধীশ্বর।
সে রাত্রি আছিলা প্রভু কণ্টকনগর॥
করিলেন প্রভু মাত্র সন্ন্যাস গ্রহণ।
মুকুন্দেরে আজ্ঞা হৈল করিতে কীর্তন॥
বোল বোল বলি প্রভু আরম্ভিলা নৃত্য।
চতুর্দিকে গাইতে লাগিল সব ভৃত্য॥...
পাক দিয়া দণ্ড কমণ্ডলু দূরে ফেলি।
সুকৃতি ভারতী নাচে হরি হরি বলি॥...

পরদিন সকালে উঠে চৈতন্য তাঁর গুরুকে বললেন—"অরণ্যে প্রবিষ্ট মুঞি হইমু সর্বথা। প্রাণনাথ কৃষ্ণচন্দ্র মুঞি পাঙ যথা॥" গুরু কেশবভারতীও তাঁর সঙ্গী হতে চাইলেন। তারপর—"অগ্রে গুরু করিয়া চলিলা প্রভু বনে।"

কাটোয়ার গৌরাঙ্গবাড়ির সিংদরজা দিয়ে ঢুকেই বাঁ দিকে শ্রীচৈতন্যের মস্তকমুণ্ডনের স্থানটি চিহ্নিত রয়েছে দেখা যায়। তার পাশে ভিতরে রয়েছে 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম প্রকাশের ও সন্ন্যাস-গ্রহণের স্থান।' মধু পরামাণিকের সমাধিও আছে সেখানে। ঠিক তারই সংলগ্ন কেশবভারতীর সমাধি বা সমাজ। দাস গদাধরের সমাধিও রয়েছে দরজার সামনে। সন্ন্যাস গ্রহণের স্থানে মধুর সমাধি ছাড়া, চৈতন্যের দীক্ষার আসন ও গুরু-শিষ্যের পদচিহ্নও আছে। দীক্ষাস্থানের কাছে কাটোয়ার গৌরাঙ্গবাড়ির সেবাইতদের সমাধি। বাড়ির ভিতরে আছে দাস গদাধর প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার কল্পিত গৌরাঙ্গমূর্তি। পাশে পরে নিত্যানন্দের মূর্তিও প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। শ্রীখণ্ড প্রসঙ্গে বলেছি, যে তিনটি গৌরাঙ্গমূর্তি নরহরি সরকার ঠাকুর তৈরি করিয়েছিলেন, তার মধ্যে সবচেয়ে বড় মূর্তিটি তিনি দাস গদাধরকে দিয়ে কাটোয়ায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মূর্তিটি দেখবার মতন। কাটোয়ার মূর্তিটি শ্রীখণ্ডের মূর্তিটিরই বর্ধিত এবং ভাবপ্রধান রূপ।

দাস গদাধর তাঁর প্রিয় শিষ্য যদুনন্দন ঠাকুরকেই কাটোয়ার গৌরাঙ্গ-সেবার ভার দিয়ে যান। এই যদুনন্দন ঠাকুরের বংশধর রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণরাই কাটোয়ার গৌরাঙ্গবাড়ির সেবাইত। উল্লেখযোগ্য হল, ভক্তদের ভেট নিয়ে গৌরাঙ্গের সেবা চলে, কোন দেবোত্তর সম্পত্তিতে চলে না। গৌরাঙ্গবাড়ি ছাড়িয়ে কিছুদূরে গঙ্গা-অজয়-সঙ্গম। সঙ্গম ছাড়িয়ে আরও কিছু দূরে গৌরাঙ্গ-ঘাট ছিল, এখন গঙ্গাগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। কাটোয়া থেকে প্রায় এক মাইল দূরে, দাঁইহাটের পথে মাধাইতলা। পথ চলতে 'ঘোষেশ্বর শিব' এখনও যে তাঁর রীতিমত প্রতিপত্তি ঘোষণা করছেন তা বেশ বোঝা যায়।

ধর্মরাজ আছেন, ঘোষেশ্বর শিব আছেন এবং কালীও আছেন কাটোয়ায়। শ্রীচৈতন্য যাঁদের উদ্ধার করার জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করতে এসেছিলেন কাটোয়ায়, সেই 'পাষণ্ডদের' প্রতাপ তখনকার কাটোয়া গ্রামেও অল্প ছিল না। সন্ন্যাস-গ্রহণকালে তিনি মাত্র একরাত্রি বাস করেছিলেন কাটোয়ায় এবং সেই রাত্রি

কীর্তন-গান ও নৃত্য করেই কাটিয়েছিলেন। গৌরাঙ্গবাড়ির প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছিল—"চব্বিশ বৎসর শেষ সেই মাঘ মাস। তার শুক্লপক্ষে প্রভু করিল সন্ন্যাস"—অর্থাৎ ১৫১০ সালের মাঘমাসের (জানুয়ারী) শুক্লপক্ষের সেই রাত্রিটি কেমনভাবে কেটেছিল তাঁর? আজ থেকে প্রায় সাড়ে চারশ বছর আগেকার একরাতের কথা মনে পড়ছিল আষাঢ়ের এক দ্বিপ্রহরে। তখনও রাঢ়দেশে শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মের প্রচারকার্য আরম্ভ হয়নি। সন্ন্যাসের পর পায়ে হেঁটে বৃন্দাবন যাত্রার পথে তিনি যে তিনদিন রাঢ়দেশ ভ্রমণ করেছিলেন—"সন্ন্যাস করি প্রেমাবেশে চলিলা বৃন্দাবন, রাঢ়দেশে তিনদিন করিলা ভ্রমণ"—তখনই বা পথে ভিন্নধর্মীরা কিরকম ব্যবহার করেছিল, জানতে ইচ্ছা হয়। নবদ্বীপের অধ্যাপক ও পড়ুয়ারাই যদি তাঁর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে থাকেন—"প্রভুর নিন্দায় সবার বুদ্ধি হৈল নাশ, সুপঠিত বিদ্যা কারো না হয় প্রকাশ"—তাহলে কাটোয়া ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের তদানীন্তন অশিক্ষিত ভিন্নধর্মাচারী (বৌদ্ধ, তান্ত্রিক, ধর্ম চণ্ডী ইত্যাদির উপাসক) জনসাধারণ খুব যে মার্জিত ব্যবহার করেছিল তা মনে হয় না। কাটোয়া-দাঁইহাটের পথে 'ঘোষেশ্বর শিব' ছাড়াও পাতাইহাটে পাতাইচণ্ডী, একাইহাটে একাইচণ্ডী ইত্যাদির এবং আশপাশের গ্রামে ধর্মরাজের এখনও যে প্রতিপত্তি আছে তা দেখলে বৃন্দাবন দাসের সামাজিক চিত্রটি চোখের সামনে স্পষ্ট ভেসে ওঠে:

মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে।
বামাচারী সন্ন্যাসী মদ্যপান করে।
দেবতা জানেন সভে চণ্ডী বিষহরি।
তাও যে পূজেন সেহো মহাদম্ভ করি॥
ধনবংশ বাঢ়ুক করিয়া কাম্য মনে।
মদ্যমাংস দানব পূজয়ে কোন জনে॥

এই যখন রাঢ়দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ, শ্রীচৈতন্য তখন কাটোয়ায় সন্ন্যাস নিয়ে নতুন ধর্মপ্রবর্তনের জন্য গৃহত্যাগী হন। "বিষ্ণুভক্তিশূন্য হইল সকল সংসার" যখন, তখন তিনি ভক্তির বন্যায় ব্যভিচারের আবর্জনা ভাসিয়ে দেবার সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। সেই সন্ন্যাস ও সঙ্কল্প-গ্রহণের ঐতিহাসিক স্থান কাটোয়া, কেবল তীর্থস্থান নয়। কাটোয়া তাই শুধু বৈষ্ণবতীর্থ নয়, বাঙালীর সংস্কৃতি-তীর্থও।

মনে হয় ষোড়শ শতাব্দীতে হুসেন শাহের আমল থেকেই কাটোয়া শ্রীখণ্ড নৈহাটি ঝামটপুর অঞ্চল উত্তররাঢ়ের অন্যতম সংস্কৃতিকেন্দ্র হয়ে ওঠে। ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থরা নবাবের দরবারে আধিপত্য বিস্তার করে দেশীয় সমাজেও প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি অর্জন করেন। এই নতুন অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রতিপত্তির ফলে তাঁরা অনেকেই চৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণব সংস্কৃতির প্রধান ধারক ও বাহক হন। এঁরা ছাড়াও উত্তর ও দক্ষিণরাঢ়ে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বাংলার বণিক-সম্প্রদায়ের আধিপত্য ছিল খুব বেশি। বর্ধমান হুগলী প্রভৃতি জেলার গ্রামে গ্রামে ঘুরলে আমাদের সামাজিক-অর্থনৈতিক ইতিহাসের এই উপেক্ষিত অধ্যায়ের অজস্র নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়। কাটোয়াতেও তার অভাব নেই। গন্ধবণিক সুবর্ণবণিক প্রভৃতিদের বিপুল ঐশ্বর্যের প্রতীকস্বরূপ বড় বড় ইমারত ও অট্টালিকা আজও কাটোয়ায় বিরাজ করছে। বণিকরাও বৈষ্ণব-ধর্মের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

বণিকদের বৈষ্ণবধর্মের পোষকতার কথা নিত্যানন্দের ধর্মপ্রচারের কাহিনী থেকেই জানা যায়। ত্রিবেণী-সপ্তগ্রাম অঞ্চলে নিত্যানন্দ বণিকদের ঘরে ঘরে কীর্তন করে বেড়িয়েছিলেন। বৃন্দাবন দাস তার সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন।

উত্তররাঢ়ের কাটোয়ার বণিকরা যে ভিন্নধর্ম আচরণ করতেন তা ভাববার কোন কারণ নেই। শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণের পর তাঁরাও বৈষ্ণবধর্ম প্রচারে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন বলে মনে হয়। ষোড়শ শতাব্দীর পর প্রায় দু'শ বছর কাটোয়া অঞ্চলের কোন উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক ভূমিকার কথা জানা যায় না। এই সময় এখানকার প্রতিপত্তিশালী ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ ও বণিকদের নেতৃত্বে বৈষ্ণবধর্মের প্রচারকার্য চলতে থাকে বলে মনে হয়। মধ্যে মধ্যে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে তাঁদের সংঘাতও হত বলে অনুমান করা যায়। বৈষ্ণবধর্মের পেট্রনদের আর্থিক ও সামাজিক প্রতিপত্তিই হয়ত সাধারণ লোকের মনে সন্দেহের ইন্ধন যোগাত বেশি এবং প্রচলিত শৈব তান্ত্রিক প্রভৃতি লোকধর্মের সঙ্গে তার সংঘাতের অন্যতম কারণও সেটা হওয়া অসম্ভব নয়।

শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণের প্রায় দু'শ বছর পরে, অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে, ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে কাটোয়াকে আর-এক নতুন ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখা যায়। এবারে শ্রীচৈতন্য নন, মারাঠা বীর ভাস্কর পণ্ডিত, শঠচূড়ামণি ক্লাইভ ও তাঁর সাঙ্গপাঙ্গরা কাটোয়ার রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হলেন একে-একে। শ্রীচৈতন্যের

মতন তাঁরা কেউ নতুন মানবতার ধর্মপ্রচারের জন্য আসেননি। ইতিহাসের এক করুণ যুগসন্ধিক্ষণে তাঁরা এসেছিলেন, সোনার বাংলার 'মগের মুল্লুকে' লুটতরাজ করতে, গোলামির মাহাত্ম্য জাহির করতে। কাটোয়া এই নির্লজ্জ নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করেছে, এই গোলামির উদ্ধত অভিযান প্রতিরোধ করেছে প্রাণপণে, অবশেষে হার মেনেছে অসভ্য অস্ত্রবল ও কূটবুদ্ধির কাছে। বাংলার সৌভাগ্য-সূর্য অস্ত গেছে ভাগীরথীর পশ্চিমে কাটোয়ায়, তারপর পুবে পলাশীর মাঠে সন্ধ্যার কালো অন্ধকার তাকে গ্রাস করে ফেলেছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়াতে বাংলার বিধাতা হয়ে ওঠেন মুর্শিদকুলী খাঁ। 'মুর্শিদাবাদ' যখন তাঁরই নামে নতুন রাজধানী হয়ে ওঠে, তখন কাটোয়ার ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক গুরুত্ব তাঁর দূরদৃষ্টিতে সহজেই ধরা পড়ে। এই সময়, সম্রাট ফররোখ-শায়র যখন দিল্লীর সিংহাসনে বসেছেন তখন, ১৭১৩ সালে, সৈয়দ শাহ আলম খাঁ নামে জহান্দার-শাহ বাদশাহের জনৈক উজীর দিল্লীতে বাস করা নিরাপদ নয় মনে করে, নানাদেশ ঘুরে ঘুরে শেষে কাটোয়ায় আসেন। বাকি জীবন ধর্মসাধনা করে কাটাবেন মনস্থ করে, তিনি কাটোয়ার একদিকে বনজঙ্গল সাফ্ করে বসতবাড়ি ও একটি মসজিদ তৈরি করেন। মসজিদের ব্যয়নির্বাহের জন্য তিনি সম্রাটের কাছ থেকে প্রায় ১৭,০০০৲ টাকা মুনাফার নিষ্কর সম্পত্তি পান। শাহ আলম খাঁ নিজে বীর যোদ্ধা ছিলেন এবং শোনা যায় ২৫০ জন জোয়ান মর্দ সঙ্গে করে কাটোয়া এসেছিলেন। তিনি যে বর্মটি পরতেন সেটা নাকি সাড়ে তিন মণ লোহা দিয়ে তৈরি ছিল। তাঁরই এক বংশধর সফিওর রহমান সেটি কাটোয়ার এক কর্মকারের কাছে বিক্রী করে দেন এবং কর্মকার তাই দিয়ে ছুরি কাঁচি দা কুড়ুল তৈরি করে বেচে ফেলে নিশ্চিন্ত হন। কাটোয়ায় শাহ আলম খাঁর তৈরি এই মসজিদটি আছে। তাছাড়া তাঁর নিজের ও তাঁর বংশধরদের সমাধিও আছে। তাঁরই বাস্তুভিটেয় তাঁর বর্তমান বংশধর ও মুতঅল্লি সৈয়দ মোহম্মদ খোদা হাফিজ নতুন বাড়ি ও সুন্দর ফুলবাগান তৈরি করেছেন। শাহ আলমের তৈরি পুরনো সিংদরজাটি এখনও আছে এবং তাঁর মসজিদ ও গৃহের চারিদিকে গড়খাইয়ের অস্তিত্ব আজও পরিষ্কার দেখা যায়।[১] শাহ আলম খাঁ তাঁর সাধনার স্থান থেকে গঙ্গা পর্যন্ত

১ ১৯১৭ সালের এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে, ১৩ খণ্ড, ৩নং—শাহ আলম খাঁর মসজিদ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

একটি সুড়ঙ্গ তৈরি করেছিলেন শোনা যায়। গঙ্গার তীরে শানবাঁধানো ঘাটও তিনি করে দিয়েছিলেন স্নানার্থীদের জন্য।

শাহ আলম খাঁর নিভৃতে ধর্মসাধনার এই ইতিবৃত্তটি 'ইণ্টারল্যুডের' মতন। শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণের স্থানে শাহ আলম খাঁও যে বৈরাগ্য-সাধনার প্রেরণা পেয়েছিলেন, কাটোয়ার ইতিহাসে তা বেমানান মনে হয় না। বরং তার মধ্যে সুরের একটা সুন্দর সঙ্গতিই দেখা যায়। কিন্তু সমস্ত সাধনার নির্লিপ্ত পরিবেশ বর্গীদের রণহুংকারে কেঁপে উঠল কাটোয়ায় এবং ইংরেজরা তার পরে দীর্ঘস্থায়ী বিভীষিকার পর্দা উন্মোচন করলেন। বৈষ্ণবতীর্থ কাটোয়ায় খোল-করতালের ধ্বনি কিছুকালের জন্য যে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। ১৭৪২ সালে বর্গীদের অভিযান আরম্ভ হল বাংলাদেশে, আর বাংলার যত দুরন্ত ছেলেদের ভয় দেখিয়ে বিব্রত মায়েরা ঘুম পাড়িয়ে ফেললেন। নবাব আলিবর্দি খাঁ আরামবাগের 'মুবারক মঞ্জিল' থেকে খবর পেয়ে ছুটে এলেন লোকলস্কর নিয়ে, কিন্তু বর্ধমান শহরে ঘেরাও হয়ে রইলেন। বর্ধমান থেকে কাটোয়া আসার পথে নিগনে বর্গীদের সঙ্গে যুদ্ধ হল। ১৭৪২ সালের ২৬শে এপ্রিল আলিবর্দি খাঁ কাটোয়া পৌঁছলেন। প্রত্যক্ষদর্শী কবি গঙ্গারাম তাঁর 'মহারাষ্ট্র-পুরাণে' লিখেছেন:

ঘেরাও হইতে নবাব আইল কাটঞাতে।
শুনিয়া ভাস্কর তবে লাগিল ভাবিতে ॥
ছি ছি ছি হাএ হাএ গেল পলাইয়া।
এতদিন বৃথা আনিয়া হিলাম ঘেরিয়া ॥

১৭৪২ সালের জুন মাস থেকে কাটোয়ায় বর্গীরা ঘাঁটি গেড়ে বসে। মীর হবিব তাদের পরামর্শদাতা ও এজেন্টের কাজ করেন। এই সময় ভাগীরথীর পশ্চিম তীরবর্তী অঞ্চল মারাঠা দস্যুদের অত্যাচারে সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। নবাবী শাসন কিছুদিনের জন্য লোপ পেয়ে যায়, বর্গীর শাসন চলতে থাকে। সলিমুল্লাহ তাঁর 'তারিখ-ই-বঙ্গাল' গ্রন্থে বলেছেন যে, এই সময় গঙ্গার পশ্চিমতীর থেকে অনেক বনেদী পরিবার ও গণ্যমান্য লোক সব পালিয়ে গঙ্গার পূর্বতীরে বসবাসের জন্য চলে আসেন। সলিমুল্লাহের কথা মিথ্যা নয়। 'মহারাষ্ট্রপুরাণ' রচয়িতা প্রত্যক্ষদর্শী গঙ্গারামের বিবরণের মধ্যেও এই ভিটেমাটি ছেড়ে পলায়নের দৃশ্য ভয়াবহভাবে ফুটে উঠেছে। যেমন:

তবে সব বরগি গ্রাম লুটিতে লাগিল।
জত গ্রামের লোক সব পলাইল ॥
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পলাএ পুথির ভার লইয়া।
সোনার বাইনা পলায় কত নিক্তি হড়পি লইয়া ॥
গন্ধবণিক পলাএ দোকান লইয়া জত।
তামা পিতল লইয়া কাঁসারি পলাএ কত ॥···
সঙ্ক বণিক পলাএ করা লইয়া যত।
চতুর্দিকে লোক পলাএ কি বলিব কত ॥
কাএস্ত বৈদ্য যত গ্রামে ছিল।
বরগির নাম স্তইনা সব পলাইল ॥···
গোশাঞি মোহান্ত জত চোপালাএ চড়িয়া।
বোচকা বুচকি লয় জয় বাহুকে করিয়া ॥ ··
সেক সৈয়দ মোগল পাঠান জত গ্রামে ছিল।
বরগির নাম স্তইনা সব পলাইল ॥

পর্তুগীজ দস্যু বণিক ও গোলাম ব্যবসায়ীরা, ইংরেজ কুঠিয়ালরা, ডাচ ও ফরাসী বণিকরা পশ্চিমবাংলার গ্রাম্যসমাজকে যখন ভাঙতে আরম্ভ করে, সেই সময় মারাঠা দস্যুরা নির্মমভাবে লুঠতরাজ করে সেই নিশ্চিন্ত সমাজ-জীবনকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। কূপমণ্ডূক শান্তিপ্রিয় গ্রামবাসীদের তারা নিষ্ঠুর অস্ত্রবলে যাযাবর উদ্বাস্তু দলে পরিণত করে। বিশেষ করে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরের গ্রামগুলিকে একেবারে তছনছ করে দেয়। গঙ্গারামের বিবরণ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, ভাগীরথীর পশ্চিম তীরবর্তী গ্রামগুলি থেকে অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত-পরিবার পুঁথিপত্র নিয়ে পালিয়ে যান, কায়স্থ বৈদ্য ও বণিকরাও তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। বাংলার সামাজিক ইতিহাসে পশ্চিমবাংলার গ্রাম্যসমাজের এই ভাঙন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পশ্চিম থেকে পুবে যাঁরা পালিয়ে আসেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই তখনকার নতুন কলকাতা শহরে এসে বসবাস করতে আরম্ভ করেন। তাঁরাই গ্রাম্যসমাজের মতন সমাজ গড়ে তোলেন কলকাতায়। কাঁসারিপাড়া, শাঁখারিপাড়া, যোগীপাড়া, বামুনবস্তি ইত্যাদি তখন থেকেই দানা বাঁধতে আরম্ভ করে কলকাতা শহরে। পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম্যসমাজের ভাঙনের সঙ্গে কলকাতা শহরের নতুন সমাজের

গড়নের সম্পর্ক প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠ। তার জন্য ম্যালেরিয়া বা কালাজ্বর যতটা দায়ী, তার চেয়ে অনেক বেশি দায়ী পর্তুগীজ ডাচ ইংরেজ ফরাসী বণিকদের শোষণ এবং মারাঠী বর্গীদের নিষ্ঠুর লুণ্ঠন

১৭৪২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে (আশ্বিন) ভাস্কর পণ্ডিত কাটোয়ায় দুর্গাপূজা করেছিলেন মহাসমারোহে। স্থানীয় জমিদার ও গ্রামবাসীদের ভয় দেখিয়ে ভেট আদায় করে তিনি পূজার সামগ্রী সংগ্রহ করেন। গঙ্গারাম তারও বর্ণনা দিয়েছেন এইভাবে :

ভাস্কর করিবে পূজা বলি দিবার তরে।
ছাগ মহিষ আইসে কত হাজারে হাজারে ॥
এই মতে করে ভাস্কর পূজা আরম্ভন।
এথা মির হবিব বরগী লইয়া করিল গমন ॥

পূজা হচ্ছিল ধুমধাম করে। এমন সময় মহানবমীর দিন সকালে (২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৭৪২) রাতারাতি গঙ্গা পার হয়ে নবাব আলিবর্দি খাঁ বর্গীদের আক্রমণ করেন। নবাবের বিপুল সেনাবাহিনীর চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন কবি গঙ্গারাম :

একে একে জমাদার লাগিল সাজিতে।
ডঙ্কা নাগারা কত লাগিল বাজিতে ॥
মুস্তাফা খাঁ সমসের খাঁ দুই জমাদার।
জার সঙ্গে যায় ঘোড়া বিস হাজার ॥
যেই মাত্র নবাব সাহেব তারকপুর আইল।
ফৌজের ধমক দেইখা বরগি পিছাইল ॥
তবে বরগি পিঠ দিয়া শীঘ্র চইলা জাএ।
নবাব সাহেবের ফৌজ পিছে পিছে ধাএ ॥

নবাবের সৈন্য কাটোয়া থেকে কটক পর্যন্ত ধাওয়া করে বর্গীদের চিল্কা হ্রদ পার করে দিয়ে আসে। আলিবর্দি খাঁ বাংলার মুখরক্ষা করেন।

মাত্র পনের বছর পরের কথা। ১৭৫৭ সাল। ১৭৪২ সালের জুন মাসে বর্গীরা কাটোয়ায় ঘাঁটি গেড়ে বসেছিল। ১৭৫৭ সালের ঠিক ঐ জুন মাসেই (১৯শে জুন) মেজর কুটে কাটোয়া দুর্গ দখল করেন ক্লাইভের নির্দেশে। অজয় ও ভাগীরথীর সঙ্গমস্থলে শাঁকাই গ্রামে এই দুর্গের মাটির ধ্বংসস্তূপ

দেখিয়ে স্থানীয় অধিবাসীরা সেই কথা আজও স্মরণ করেন। আসল স্থান গঙ্গা ও অজয়ের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে মনে হয়। সেই রাতেই ক্লাইভ সসৈন্যে পাটুলি থেকে কাটোয়া আসেন। ২১শে জুনের এক বৈঠকে তিনি কাটোয়াতে অবস্থান করা ঠিক করেন। কিন্তু বৈঠকের ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ক্লাইভ তাঁর সিদ্ধান্ত বদলে ফেলেন। ২২শে জুন কাটোয়া থেকে ইংরেজ সৈন্য গঙ্গা পার হয়ে অভিযান আরম্ভ করে। মাঝরাতে পলাশীতে নবাব সৈন্যের সংস্পর্শে আসে। ২৩শে জুন বৃহস্পতিবার (১৭৫৭) পলাশীর যুদ্ধে বাংলার, তথা ভারতের ভাগ্য প্রায় দুই শতাব্দীর জন্য নির্ধারিত হয়ে যায়। আচার্য যদুনাথ বলেছেন :

Thus ended Muslim rule in Bengal : the foreign master of the sword had become its King-maker (Dacca Hist. of Bengal, II. P. 495).

তারপর বাংলার তথা ভারতের ইতিহাস আবার নতুন করে আরম্ভ হল। তাই বলেছিলাম, বাংলার সূর্য অস্ত গিয়েছিল কাটোয়ায়, আর পলাশীতে রাত্রির কালো অন্ধকার তাকে গ্রাস করে ফেলেছিল।

বরাকরের দেউল

বরাকর নদী মানভূম ও বর্ধমান জেলার মধ্যে সীমারেখা টেনে পশ্চিমবঙ্গে। নদীর বামতীরে বহুদূর থেকে বরাকরের দেউলগুলি দেখা যায়। বাংলাদেশে উড়িষ্যার রেখ-মন্দিরের নিদর্শন যা পাওয়া গেছে তার মধ্যে বরাকরের এই মন্দিরগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পাথরের তৈরি মন্দির বলে আজও প্রত্যেকটি মন্দির প্রায় অবিকৃত রয়েছে। মনে হয় যেন মন্দিরগুলি পশ্চিমবঙ্গের সীমানাস্তম্ভ। মন্দিরের শিখরের ক্রমসূক্ষ্মায়মান গুণ্ডাকার গড়ন অনেকটা বেগুনের মতন দেখতে বলে বরাকরের দেউলের স্থানীয় নাম হল 'বেগুনিয়া মন্দির'।

অনেকদিন আগেই বরাকরের মন্দিরগুলি প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌দের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। প্রায় আশী-বিরাশী বছর আগে বেগলার সাহেব বরাকরের মন্দির সম্বন্ধে প্রথমে লেখেন এবং তাঁর বিবরণ ১৮৭২-৭৩ সালের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের রিপোর্টে প্রকাশিত হয়। বেগলারের পর ডক্টর ব্লক বরাকরের মন্দির সম্বন্ধে আলোচনা করেন ১৯০২-'০৩ সালের বাৎসরিক রিপোর্টে (বাংলা বিভাগ)। ১৯২২-'২৩ সালের বাৎসরিক রিপোর্টে শ্রীদীক্ষিত মন্দিরের শিলালিপি ও মন্দির সম্বন্ধে আবার আলোচনা করেন। তারপর শ্রীসরসীকুমার সরস্বতী বরাকরের মন্দিরের সঙ্গে উড়িষ্যার প্রাচীন রেখ-মন্দিরের তুলনা করে আলোচনা করেন এবং বরাকরের মন্দিরের প্রাচীনত্ব নির্ধারণের চেষ্টা করেন।[১] ভারতীয় মন্দির, বিশেষ করে রেখ-মন্দির সম্বন্ধে শ্রীনির্মলকুমার বসু দীর্ঘকাল ধরে অনুসন্ধান করছেন এবং বরাকরের দেউল সম্বন্ধে তিনিও নানাদিক থেকে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞদের এত বিস্তৃত আলোচনার পর আবার নতুন করে আলোচনার কোন প্রয়োজন আছে কি? তেমন প্রয়োজন নেই। তবু এখানে আলোচনা করা হচ্ছে তার প্রথম কারণ, এই আলোচনা প্রধানত সাধারণের জন্য, পণ্ডিতদের জন্য নয়। দ্বিতীয় কারণ, ভারতীয় মন্দির সম্বন্ধে যে সব আলোচনা আজ পর্যন্ত হয়েছে, তা ঐতিহাসিক ও আর্টিস্টিক। তার মূল্য আছে যথেষ্ট। কিন্তু তা সত্ত্বেও অনুসন্ধানীর মনে ভারতীয় মন্দিরের

---

১ ইণ্ডিয়ান ওরিয়েণ্টাল সোসাইটির জার্নাল, ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা।

বিশেষ বিশেষ গড়ন সম্বন্ধে অনেক মৌলিক প্রশ্ন জাগে, যার কোন উত্তর মন্দিরের গতানুগতিক অ্যাকাডেমিক আলোচনা থেকে পাওয়া যায় না। এই ধরনের একটি মূল প্রশ্ন হল—দীর্ঘকাল ভারতীয় ইতিহাসে কোন দেবালয় ছিল না, থাকলেও মন্দির বলতে যা বোঝায় তার মতন নয়। মহাভারতে স্থাপত্য-বিদ্যার কথা অনেক আছে, বড় বড় প্রাসাদ অট্টালিকা নির্মাণের বিস্তারিত বিবরণও আছে, কিন্তু উল্লেখযোগ্য হল কোন দেবালয় বা মন্দির নির্মাণের কোন বিবরণ নেই। দেবতাদের আশ্রয়-প্রসঙ্গে যে সব কথা আছে মহাভারতে তার মধ্যে প্রধান হল—'দেবায়তন', 'দেবগৃহ', 'দেবাগার'। এর কোনটাই আধুনিক মন্দির অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। হপ্‌কিন্স পরিষ্কারভাবে আলোচনা করে তা প্রমাণ করেছেন :

> When, however, a determining factor shows what they mean, it is evident that in Mbh, they are not temples. (Hopkins : Epic Mythology, P. 71)

তা হলে মন্দির নির্মাণ শুরু হল কবে থেকে? 'মন্দির' কথার মূল অর্থ কি? প্রেরণার উৎস কোথায়? শিখরের এমন বিচিত্র বিকাশ হল কেন, শিখর এল কোথা থেকে? কেনই বা সেটা রেখারূপে পূর্বভারতের উড়িষ্যায় ও পশ্চিমবঙ্গে এমন উৎকর্ষ লাভ করল? এরকম অনেক মৌলিক প্রশ্নের কোন উত্তর পাওয়া যায় না, মন্দির সম্বন্ধে বড় বড় বই পড়েও। তার কারণ এখানে প্রত্নতত্ত্ব ছাড়াও, সমাজবিজ্ঞান এসে পড়ে। মন্দিরের সঙ্গে সমাজ, দেবতা ও ধর্মের ক্রমবিকাশের ধারা অনুসন্ধান করতে হয়। গভীরভাবে ভাবতে হয়, কেন এই ভারতবর্ষে যখন বিরাট বিরাট 'নৃপাগার' বা রাজপ্রাসাদ তৈরি হয়েছে, তখন 'দেবাগার' নগণ্য ছিল? এত জটিল কথার দরকার নেই। মন্দির সম্বন্ধে এত আলোচনা হয়েছে কিন্তু 'মন্দির' কথাটার উৎপত্তি হল কোথা থেকে? অনেককে জিজ্ঞাসা করেও কোন সন্তোষজনক জবাব পাইনি।

অনেকে বলেন, শিখর ও রেখ-মন্দিরের বিকাশ হয়েছে বাঁশের তৈরি কোন মডেল থেকে। হতে পারে, হওয়া আশ্চর্য নয়। কিন্তু তার চেয়েও আরও গুরুত্বপূর্ণ মডেল অন্যত্র আছে বলে মনে হয়। ভারতের শ্মশানভূমিতে তার সন্ধান পাওয়া যায়। শ্মশানের মৃত্তিকাস্তূপ ও বৌদ্ধস্তূপ যদি ক্রমে দীর্ঘাকার হয়ে বাড়তে থাকে, তাহলে কি দাঁড়ায়? বৌদ্ধযুগের আগেও ভারতের

আদিবাসীদের শ্মশানে (মেগালিথিক সমাধিস্তম্ভ) তার প্রচুর নিদর্শন পাওয়া যায়। সবচেয়ে বড় কথা হল, শ্মশানের এই সব সমাধিস্তূপ ও স্তম্ভ পূজা করা হয়। দেবতা শ্মশানেই থাকেন বেশি, ঘর ও গ্রামের চেয়ে। অর্থাৎ গৃহদেবতা ও গ্রাম্যদেবতা ছাড়াও শ্মশানদেবতা যথেষ্ট আছেন। তাঁদের আগারি বা আয়তন থেকে মন্দির নির্মাণের প্রেরণা আসা আশ্চর্য নয়, বরং স্বাভাবিক। তাই মনে হয়, স্তূপের ক্রমবিকাশ চরমে পৌঁছেচে ভারতবর্ষের রেখ-মন্দিরে, আর তার ছত্রটির ক্রমবিস্তার হয়েছে বর্মা থেকে চীনের মন্দিরে। ফার্গুসন, ম্যাক্‌ডোনেল, সিম্পসন প্রমুখ পণ্ডিতবর্গ এ-সম্বন্ধে অনেক আগেই আভাস দিয়ে গেছেন এবং শিখরের উৎপত্তি নিয়ে আলোচনা করেছেন। কুমারস্বামীও তাঁর একাধিক গ্রন্থে মন্দিরের গড়নের উৎপত্তি সম্বন্ধে এই প্রস্তাব সশ্রদ্ধভাবে বিবেচনার যোগ্য বলে মন্তব্য করেছেন। এই দিক্‌পালদের আভাস-ইঙ্গিত থেকে সামান্য যেটুকু পুঁথিগত অনুসন্ধান আমি করেছি তাতে মনে হয়, প্রাগৈতিহাসিক যুগের (মেগালিথিক) শ্মশানের সমাধি-মন্দির, মৃত্তিকাস্তূপ ও বৌদ্ধস্তূপের বিচিত্র বিকাশের ধারা অনুসরণ করলে হয়ত ভারতীয় মন্দিরের শিখর ও রেখ-মন্দিরের গড়নের অর্থ ও তাৎপর্য খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।

আপাতত এই অ্যাকাডেমিক প্রশ্ন বাদ দিয়ে বরাকরের দেউল সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। বরাকর দেউলের স্থানীয় 'বেগুনিয়া মন্দির' নামটি সত্যই সুন্দর। শিল্পশাস্ত্রকাররা মন্দিরের গড়ন-প্রসঙ্গে 'শুকনাস' (শুকপাখির নাক বা চঞ্চুর মতন বাঁকানো), 'গজপৃষ্ঠ' (হাতির পিঠ থেকে পিছনের মতন অ্যাপসাইডাল) ইত্যাদির কথা বলেছেন। তা যদি বলা যায় তাহলে রেখ-মন্দিরের 'টেপারিং' শিখরকে 'বেগুনিয়া' বা বেগুনের মতন বলা যাবেনা কেন? চারটি মন্দির আছে বরাকরে এক জায়গায়। তার মধ্যে চতুর্থ মন্দিরটি (পথ দিয়ে ঢুকতে একেবারে শেষের যেটি), সরসীবাবুর মতে, সবচেয়ে প্রাচীন। রথ-বিন্যাস, শিখরের পগ ইত্যাদি দেখে তিনি মনে করেন, উড়িষ্যার প্রাচীনতম রেখ-মন্দিরের (ভুবনেশ্বরের পরশুরামেশ্বর মন্দির) সঙ্গে এই মন্দিরটির গড়নের সাদৃশ্য আছে। সুতরাং এই চতুর্থ মন্দিরটিকে তিনি অষ্টম-নবম শতাব্দীর বলে মনে করেন। তা যদি হয়, তাহলে এই মন্দিরটিকে পশ্চিমবঙ্গের রেখ-দেউলের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন নিদর্শন বলতে হয়। সুন্দরবনের জটার দেউল, বর্ধমানের ইছাই ঘোষের দেউল, বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরের দুর্গের ভিতরের

ছ'টি রেখ-দেউল (সাধারণত কেউ উল্লেখ করেন না) ছাড়াও বাঁকুড়া ও বর্ধমানে আরও কয়েকটি রেখ-দেউল দেখেছি এবং সে সম্বন্ধে আলোচনা করেছি আগে। এগুলির মধ্যে (সরসীবাবুর অনুমান সত্য হলে) বরাকরের চতুর্থ রেখ-দেউলটিকেই বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন রেখ-মন্দিরের নিদর্শন বলতে হয়। সম্প্রতি শ্রীনির্মলকুমার বসু বরাকর মন্দিরের কোন বিশেষ অঙ্গের গড়নের মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পেয়েছেন। বরাকর মন্দিরের উপরে যে আমলক আছে তার খাঁজগুলি 'কন্‌ভেক্স' নয়, 'কনকেভ'। উড়িষ্যার রেখ-মন্দিরের আমলকের খাঁজ 'কনভেক্স' বা বহিঃবর্তুলাকার, বরাকর মন্দিরের আমলকের খাঁজ অন্তঃবর্তুলাকার বা কন্‌কেভ। সুতরাং বরাকর মন্দিরের একটি অন্যতম অঙ্গের গড়ন উড়িষ্যার মতন নয় দেখা যাচ্ছে, দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতের মন্দিরের মতন। হঠাৎ দক্ষিণ-পশ্চিম ভারত থেকে আমলকের বিশেষ গড়ন প্রক্ষিপ্ত হয়ে বরাকরে এল কেন এবং কি করে? আর এক নতুন সমস্যার সৃষ্টি হল বরাকরের মন্দির প্রসঙ্গে।

বরাকরের একটি মন্দির থেকে শিলালিপিও পাওয়া গেছে। ১৯২২-'২৩ সালের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের বাৎসরিক রিপোর্টে শ্রী দীক্ষিত এই শিলালিপি সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। ১৯৩৬ সালের এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে (২য় খণ্ড) শ্রী চক্রবর্তী লিপিতত্ত্বের দিক থেকে বরাকরের শিলালিপি সম্বন্ধে মূল্যবান আলোচনা করেছেন। ছ'টি শিলালিপির মধ্যে প্রথমটিতে বলা হয়েছে যে, ১৩৮২ শকাব্দে ফাল্গুন মাসের শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথিতে, বুধবার, রাজা হরিশ্চন্দ্রের প্রিয়তমা ভার্যা হরিপ্রিয়া দেবতা শিবের উদ্দেশে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। দ্বিতীয় শিলালিপিতে বলা হয়েছে যে, ১৪৬৮ শকাব্দে নন্দ নামে একজন সৎ ব্রাহ্মণ ও তাঁর স্ত্রী মন্দিরটিকে সংস্কার করে দেন। ১৩৮২ শকাব্দ বা ১৪৬২ সাল, এবং ১৪৬৮ শকাব্দ বা ১৫৪৬ সাল, এই ছ'টি তারিখ শিলালিপি থেকে পাওয়া যায়। শিলালিপি থেকে এইটুকু বোঝা যায় যে, পঞ্চদশ শতাব্দীতে হরিশ্চন্দ্র নামে কোন এক রাজা ছিলেন, এবং হরিপ্রিয়া নামে তাঁর রানী ছিলেন। তাঁরা শিবের উপাসক ছিলেন, একথাও জানা যায়। লিপিতত্ত্বের দিক থেকে বরাকরের শিলালিপির ঐতিহাসিক গুরুত্বের কথা শ্রী চক্রবর্তী উল্লেখ করেছেন। বরাকর লিপির ছাঁদ (প্রথম শিলালিপি) আর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' পুঁথির লিপির ছাঁদ একই

ধরনের, দুয়ের মধ্যে অদ্ভুত সাদৃশ্য দেখা যায়। বরাকরের দ্বিতীয় শিলা-লিপির ছাঁদ এবং এশিয়াটিক সোসাইটির পুঁথিশালায় রক্ষিত রঘুনন্দনের 'ধর্ম-পূজাবিধি'র লিপির ছাঁদের মধ্যে সাদৃশ্য আছে। পুঁথির প্রাচীনত্ব লিপির এই ছাঁদ থেকে বিচার করা যেতে পারে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, রাজা হরিশ্চন্দ্র কে? বর্ধমানের গোপভূম অঞ্চলে হরিশ্চন্দ্র নামে কি কোন রাজা ছিলেন? সঠিক বলা যায় না, যদিও কেউ কেউ সে রকম আভাস দিয়েছেন। থাকলেও তিনি যে পঞ্চদশ শতাব্দীতে রাজত্ব করতেন, তা পরিষ্কার বোঝা যায়। আরও বোঝা যায়, তিনি শৈব ছিলেন। গোপভূমের রাজবংশের বিভিন্ন শাখায় শৈব উপাসনার বিশেষ প্রাধান্য দেখা যায়। গোপভূম অঞ্চলে শিব ও শক্তির আধিপত্যও সবচেয়ে বেশি মনে হয়। একথা আগে একাধিকবার উল্লেখ করেছি। বরাকর কি তাহলে শৈব উপাসনার বড় কেন্দ্র ছিল? পঞ্চদশ শতাব্দীতে তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। সব মন্দিরেই এখনও শিবলিঙ্গ আছে, গণেশ ও দুর্গাও আছে। বোঝা যায়, শিব ও শক্তি উভয়েই ছিলেন এখানে। কিন্তু চতুর্থ মন্দির যদি অষ্টম-নবম শতাব্দীর হয়, তাহলে তখন ঐ মন্দির কোন্ দেবতার উদ্দেশে নির্মিত হয়েছিল তা জানা যায় না। তাছাড়া বরাকরে যে সব পাথরের মূর্তি পাওয়া গেছে, তার সংখ্যাও কম নয়। মূর্তিগুলির মধ্যে বিষ্ণুর বিভিন্ন মূর্তি এবং কয়েকটি জৈন মূর্তিও আছে বলে মনে হয়। এত ভাঙাচোরা ও বিকৃত মূর্তি যে, সঠিক ভাবে নির্ধারণ করা কঠিন। বড় বড় ভারি মূর্তি। গড়নও খুব স্থূল। বেশ প্রাচীন বলেই মনে হয়, যদিও লিপি ছাড়া কেবল গড়ন দেখে প্রাচীনত্ব বিচার করা ঠিক নয়। মনে হয়, বরাকরের মূর্তিগুলির মধ্যে একাধিক প্রাচীন জৈন মূর্তি আছে। যদি থাকে তাহলে চতুর্থ মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকালের সমসাময়িক হতে পারে মূর্তিগুলি। এসব থেকে বরাকরের বিচিত্র সাংস্কৃতিক ধারারও একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ধারাটি মোটামুটি এই—পালযুগে জৈন ও বৌদ্ধধর্মের কেন্দ্র বরাকর অঞ্চলেও ছিল। তারপর শৈব ও তান্ত্রিক ধর্মের প্রতিষ্ঠা হয়। বিষ্ণুপূজাও যে প্রচলিত ছিল, তাও বোঝা যায়। জৈনধর্ম প্রসঙ্গে এখানে উল্লেখযোগ্য হল: বরাকর সংলগ্ন মানভূম জেলার পার্শ্বনাথ পাহাড়ই জৈন তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের সাধনার স্মৃতিবিজড়িত স্থান। জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীরও শোনা যায় রাঢ় অঞ্চলে ধর্ম প্রচারের জন্য নিজে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন এবং রাঢ়ের

রূঢ় আদিম অধিবাসীরা তাঁর পিছনে কুকুর লেলিয়ে দিয়েছিল। কাহিনীগুলি একেবারে কাল্পনিক নাও হতে পারে। জৈন ও বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি ও প্রচারকেন্দ্রের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যেই সেকালের উত্তররাঢ় ছিল বলে মনে হয়, বরাকর অঞ্চল যে ছিল তাতে সন্দেহের অবকাশ অনেক কম।

বরাকর থেকে মাইল চারেক দূরে কল্যাণেশ্বরীর মন্দির। শক্তিপূজার অন্যতম কেন্দ্র বলে বিখ্যাত। মানভূম-পঞ্চকোটের রাজা এই মন্দির নির্মাণ করে দেন। মন্দিরের তেমন কোন বিশেষত্ব নেই, প্রাচীনও নয় খুব। কিন্তু স্থানটির বিশেষত্ব ও প্রাচীনত্ব দুইই আছে বলে মনে হয়। হয়ত একসময় এখানে তান্ত্রিকদের একটা বড় ঘাঁটি ছিল। মানভূম ও উত্তররাঢ়ের সীমানা জুড়ে এরকম ঘাঁটি আরও অনেক ছিল। তাই আদিবাসীদের নরবলির উপাদানও তান্ত্রিক বা শক্তি-সাধনার মধ্যে সহজেই মিশে যায় এখানে। কল্যাণেশ্বরী ও কাত্রাসগড়ের (মানভূম) নীলকণ্ঠেশ্বরী বা বিন্ধ্যবাসিনীর পূজায় একসময় নরবলির প্রচলন ছিল, এরকম কিংবদন্তী শোনা যায়। কাত্রাসগড় পর্যন্ত আমি গিয়ে পুরোহিতের কাছে অনুসন্ধান করে এসেছি। তাঁরা এই কথাই বলেন। তাই থেকে মনে হয়, জৈন ও বৌদ্ধধর্মের কেন্দ্র হলেও বরাকর থেকে মানভূম জুড়ে তান্ত্রিকদের একটা শক্তিশালী ঘাঁটি গড়ে উঠেছিল পরে। তাতে আদিবাসীদের ধর্মাচরণের প্রভাব পড়েছিল যথেষ্ট। নরবলি তার মধ্যে প্রধান। উত্তররাঢ় ও ছোটনাগপুর জুড়ে এই যে সংস্কৃতির প্যাটার্ন দেখা যায়, এর মধ্যেই বরাকর একটি 'ডিজাইন' ছিল মাত্র। বরাকরের দেউলের চেয়েও বরাকরের সংস্কৃতিধারা তাই অনেক বেশি আকর্ষণীয় বলে মনে হয়।

কবিকঙ্কণতীর্থ দামুন্যা

কোথায় দামুন্যা? দামোদরের দক্ষিণে, হুগলী ও বর্ধমান জেলার সীমানায় কবিকঙ্কণতীর্থ দামুন্যা গ্রাম।

ধনি ধনি কলিকালে রত্না নদীর কূলে
অবতার করিলা শঙ্কর
ধরি চক্রাদিত্য নাম দামুন্যা করিল ধাম
তীর্থ কৈলা সেই ত নগর।

গোতানের দক্ষিণ-পশ্চিমে ও দামিন্যার উত্তর-পূর্বে রত্নাকর, মুকুন্দরামের রত্না। চার-পাঁচশ বছর আগে, মুকুন্দরাম ও তাঁর পূর্বপুরুষদের আমলে, দক্ষিণরাঢ়ের দামুন্যা গ্রামের কি অবস্থা ছিল, তার আভাস কবিকঙ্কণের কাব্যে পাওয়া গেলেও, এখন কিছু বোঝা যায় না। স্বগ্রাম ছাড়তে বাধ্য হয়ে মুকুন্দরাম নানাস্থানে, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। দামুন্যা যাবার দুর্গম পথ দেখে বোঝা যায় আজও, কি ভয়ানক দুর্ভোগই না তখন ভুগতে হয়েছিল তাঁকে। দামুন্যা যাবার পথে এইটুকুই ছিল আমাদের সান্ত্বনা। প্রথমে বর্ধমান থেকে দামোদর পার হয়ে, আরামবাগ রোড ধরে এগিয়ে গিয়ে, উচালন থেকে বেঁকে ছোটবৈনান ও দামুন্যার পথে আমরা যাত্রা করলাম। যাত্রা শুভ হল না। সারাটা পথ কেবল দক্ষিণ দামোদরের গ্রামপরিক্রমণ হল। অবশেষে ছোটবৈনান পৌঁছে শোনা গেল যে মুকুন্দরামের বংশধরেরা অনেকেই সেখানে বাস করেন। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে প্রবীণ যিনি তিনি ছোটবৈনানেই থাকেন। মুকুন্দরাম পূজিত চণ্ডীদেবী পালা করে ঘুরে ঘুরে বংশের বিভিন্ন শাখার গৃহে অবস্থান করেন। ছোটবৈনান পরিক্রমান্তে পথের অনেক কষ্ট সহ্য করে, খাল বিল আল মাঠ পেরিয়ে অবশেষে দামুন্যায় উপস্থিত হলাম।

সহর সিলিমাবাজ তাহাতে সজ্জন রাজ
নিবসে নিয়োগী গোপীনাথ।
তাঁহার তালুকে বসি দামিন্যায় চাষ করি
নিবাস পুরুষ ছয় সাত॥

চক্রবর্তীবংশ কতদিন ধরে দামুন্যায় বাস করছেন, তার ইঙ্গিত পাওয়া যায় কবিকঙ্কণের এই উক্তি থেকে। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল রচনার সময় যদি মোটামুটি ১৫৭৪ থেকে ১৬০৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে হয়, তাহলে ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি কবির বাল্যকাল অনুমান করা অন্যায় হয় না। তার ছয় সাত পুরুষ আগে হলে প্রায় চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে চক্রবর্তী-বংশ দামুন্যায় বাস করছেন দেখা যায়। অর্থাৎ পাঠান আমল থেকে মুকুন্দরামের পূর্বপুরুষরা দামুন্যাবাসী হয়েছেন। তার আগে তাঁরা কোথায় ছিলেন, জানা যায় না। মনে হয়, দক্ষিণরাঢ়ের কোন রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণপ্রধান অঞ্চলে চক্রবর্তীবংশের পূর্বনিবাস ছিল। সেখান থেকে প্রায় চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি, যে কোন কারণেই হোক, তাঁরা দামুন্যায় উঠে আসেন। ঠিক সেই সময় দামুন্যার গ্রাম্যসমাজের চেহারা কেমন ছিল অনুমান করা কঠিন। কারণ, কবিকঙ্কণ দামুন্যার যে গ্রাম্যসমাজের নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছেন তা ষোড়শ শতাব্দীর শেষকালের বলে মনে হয়। যেমন—

কাটাদিয়া বন্দ্যঘাটি বেদান্তনিগম-পাঠী
কুশাল পণ্ডিত মহাশয়
দামুন্যা নগরবাসী বন্দ্যঘাটি বাগালপাশী
কুলক্রমা তিন মহাশয়।
নিজ বৃত্তি অনুপদ্য কায়স্থ ব্রাহ্মণ বৈদ্য
দামুন্যাতে বৈসে কবিরাজ
কুলে শীলে গুণে বাড়া সুধন্য দক্ষিণ রাঢ়া
সুপণ্ডিত সুকবি-সমাজ॥

মুকুন্দরামের এই বর্ণনা থেকে মনে হয়, ষোড়শ শতাব্দীর শেষ থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে দক্ষিণরাঢ়ের বিদ্যাসমাজের মধ্যে দামুন্যার সমাজ বেশ প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিল। মুকুন্দরামের বংশেও অনেক পণ্ডিত জন্মেছিলেন এবং কবি নিজেও বেশ পণ্ডিত ছিলেন। একথা আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে কবি নিজেই বলেছেন:

তস্য সুত গুণধাম গুণিরাজ মিশ্র নাম
কবিচন্দ্র তার বংশধর।

অনুজ মুকুন্দ শর্মা   সুকবি সুকৃতকর্মা
নানা শাস্ত্রবিদ্যায় বিদ্বান।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ   পাঁচালি করিয়া বন্ধ
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥

দক্ষিণরাঢ়ের গ্রাম্যসমাজ ও বিদ্যাসমাজগুলি যে পাঠান ও মোগল আমলের সন্ধিক্ষণের বিপর্যয়ের মধ্যে বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এবং কোন কোন সমাজে ভাঙনও ধরেছিল, তা মুকুন্দরামের দামুন্যাবর্ণনা থেকে অনেকটা আন্দাজ করা যায়। বিপর্যয় নানাদিক থেকে দেখা দিয়েছিল এবং দেওয়াই স্বাভাবিক। মোগল অভিযান ও পাঠান রাজশক্তির দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে স্থানীয় সামন্তরা, জায়গীরদার ও জমিদারেরা চরম স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠেছিলেন। ফিউডালিজমের বা সামন্তপ্রথার এইটাই অন্যতম বিশেষত্ব। কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় কোন কারণে শৈথিল্য বা দৌর্বল্য দেখা দিলে, সামন্তরা তাঁদের বাইরের নামমাত্র বশ্যতার মুখোস খুলে ফেলে দিয়ে যে যার কর্তৃত্ব নিয়ে কাটাকাটি করতে আরম্ভ করেন। দেশের মধ্যে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। "রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, আর উলুখড়ের প্রাণ যায়," কথাটার উৎপত্তি হয়েছে এই ধরনের অবস্থা থেকে। ক্ষুদে সামন্তরাজারা যখন জমিদারী, রাজ্য ও কর্তৃত্ব নিয়ে মারামারি করেন, তখন সাধারণ প্রজাদের দুর্ভোগের আর সীমা থাকে না। ঠিক এই ধরনের সামাজিক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল পাঠান-মোগল যুগের সন্ধিক্ষণে। মুকুন্দরাম তার চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন:

উজীর হৈল রায়জাদা   বেপারি বৈশ্যের খেদা
ব্রাহ্মণে বৈষ্ণবে হৈল অরি
কোণে কোণে দিয়া দড়া   পনর কাঠায়ে কুড়া
নাহি শুনে প্রজার গোহারি।
সরকার হৈল কাল   খিলভূমি করে লাল
বিনি উপকারে লিখায় ধুতি
পোতদার হৈল যম   তঙ্কায় আড়াই আনা কম
পাই লভ্য খায় তঙ্কা প্রতি। ইত্যাদি।

থাকবন্দী সামন্তসমাজের প্রত্যেকটি থাক তার নিচের থাককে নির্মমভাবে শোষণ করতে আরম্ভ করল। শিকদার ডিহিদার উজীর কোটাল থেকে

আরম্ভ করে পোদ্দার পর্যন্ত সকলে লুটতে লাগল। মুকুন্দরাম সপরিবারে দেশত্যাগী হলেন। গ্রাম ছাড়ার আগে তিনি সকলের সঙ্গে পরামর্শ করলেন, কেউ কেউ তাঁকে গ্রাম ছাড়তে নিষেধ করলেন, কিন্তু তিনি না ছেড়ে পারলেন না। স্ত্রী-পুত্র-ভাই সঙ্গে নিয়ে তিনি দামুন্যা ছেড়ে ভেলিয়া গ্রামে পৌছলেন। দুর্বৃত্তরা পথে তাঁর যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করল, যদু কুণ্ডু তাঁকে আশ্রয় দিলেন—"দিয়া আপনার ঘর, নিবারণ কৈল ডর, তিন দিবসের দিল ভিক্ষা।" মুড়াই নদী (মুণ্ডেশ্বরী) বেয়ে মুকুন্দরাম ভেঙট্যা গাঁয়ে পৌছলেন এবং তারপর দারকেশ্বর পার হয়ে পাতুলে এলেন। পাতুল থেকে দামোদর পার হয়ে গেলেন গোচড়্যা গ্রামে। এই গোচড়্যা গ্রামে চণ্ডীদেবী তাঁর মায়ের রূপ ধরে তাঁকে দেখা দেন। চণ্ডীর আদেশ পেয়ে, শিলাই নদী পার হয়ে কবি আরড়া গ্রামে পৌছলেন। আরড়া ব্রাহ্মণভূমির মধ্যে, স্থানীয় ভূস্বামীও ব্রাহ্মণ। তাঁর দ্বারস্থ হয়ে আত্মপরিচয় দিতে 'সুধন্য বাঁকুড়া রায়' তাঁকে অবিলম্বে দশ আড়ি ধান মেপে দিয়ে ছেলেদের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করলেন। সুখে-দুঃখে কবির দিন কাটতে লাগল। বাঁকুড়া রায়ের পর রঘুনাথ রায় রাজা হলেন। এর মধ্যে স্বপ্নে চণ্ডী-দর্শনের কথা কবি প্রায় একরকম ভুলে গিয়েছিলেন বলা চলে। যদিও নন্দী তাঁকে স্বপ্নের কথা প্রায় মনে করিয়ে দিত, তবু তাঁর কাব্যরচনার অবসর হয়নি এর মধ্যে। তল্পীদার ডামাল নন্দীর অনুনয় ব্যর্থ হল। অবশেষে পুত্রের মৃত্যুতে কবি সচকিত হয়ে উঠলেন। মনের দুঃখে একদিন তিনি রাজার কাছে দুঃখ করে বললেন :

কি আর কহিব কাজ কহিতে বড়ই লাজ
গীত না করিয়া মৈল ছাল্যা
শুন রঘু নরপতি দুঃখে কর অবগতি
আকালে বিকাইল মোর হাল্যা॥

কথা শুনে রঘুনাথ তাঁকে চণ্ডীমঙ্গল রচনা করতে বললেন। চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচিত হল। যে নির্মম সত্য এই কাহিনী থেকে প্রকাশ পেল তা হল এই :

দেবদেবীর স্বপ্নাদেশেও কাব্যরচনা করা সম্ভব হয় না. যদি না রাজারাজড়ার পোষকতা ও অনুমতি পাওয়া যায়। মধ্যযুগের ইতিহাসের এইটাই বিশেষত্ব। পেট্রন চাই সবার আগে, সাহিত্যেও।

মধ্যযুগের বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দরাম দামুন্যাবাসী হয়ে দামুন্যাকে ধন্য করে গেছেন। অম্বিকাচরণ গুপ্ত লিখেছেন যে বৃদ্ধবয়সে মুকুন্দরাম দামুন্যায় ফিরে এসেছিলেন।[১] ফিরে আসার পর তদানীন্তন ডিহিদার তাঁকে দামুন্যা গ্রামে ষোল বিঘা নিষ্কর বাস্তু জমি, কিছু ধানি জমি এবং চারিদিকের বহু গ্রামের সভাপণ্ডিতের পদ দান করেন। সেই সব জমির যে সনদ আছে তাতে কুতর খাঁ নামক কর্মচারীর স্বাক্ষর দেখা যায়। একথা কতদূর সত্য বলা যায় না। হয়ত মুকুন্দরামের পুত্র শিবরাম দেশে ফিরে এই সব সম্পত্তি পেয়েছিলেন। মুকুন্দরামের বংশধররা এখন বর্ধমান জেলার রায়না থানার ছোটবৈনানে এবং পৈতৃক গ্রাম দামুন্যায় বাস করেন। কেউ কেউ বলেন মেদিনীপুরের বীরসিংহে ও হুগলীর রাধাবল্লভপুরেও তাঁর বংশধররা আছেন। বংশধররা বহু জায়গায় থাকতে পারেন, নাও পারেন। তা নিয়ে গবেষণা করার দরকার নেই।

মুকুন্দরাম পূজিত চণ্ডীদেবী ও তাঁর পুঁথি সম্বন্ধে অনেক কথা শোনা যায়। ছোটবৈনানে আমরা ধাতুনির্মিত যে ছোট চণ্ডীমূর্তি দেখেছি, তা মূর্তি হিসাবে খুবই সুন্দর, কিন্তু সেটা মুকুন্দরামের আমলের কি না বলা যায় না। মুকুন্দরামের বংশধররা বলেন যে, বংশানুক্রমে তাঁরা কবিকঙ্কণের আমল থেকে এই মূর্তি পূজা করে আসছেন এবং পালাক্রমে এই মূর্তি এখন ছোটবৈনান ও দামুন্যায় বিরাজ করেন। বর্তমানে কবির বংশধররা মুকুন্দরাম থেকে অধস্তন দ্বাদশ পুরুষ। দ্বাদশ পুরুষ ধরে বিগ্রহের পূজা চলছে, এ রকম অনেক বিগ্রহ ও বংশ বাংলাদেশে আছে এখনও। সুতরাং কবিকঙ্কণের বংশধর বা জ্ঞাতিদের কথা মিথ্যা না হতেও পারে। চণ্ডীর যে মূর্তিটি ছোটবৈনানে দেখেছি তার বৈশিষ্ট্য এই : চার হাতের উপরের দু'হাতে পদ্ম (বামে) ও চক্র (দক্ষিণে), এবং নিচের দু'হাতে ত্রিশূল। বামে সিংহ, দক্ষিণে মহিষাসুর। দক্ষিণ পা মহিষের উপর, বাম পা মহিষের ছিন্নমুণ্ডের উপর।

দামুন্যায় মুকুন্দরামের জ্ঞাতি চক্রবর্তীদের ঘরে যে পুঁথি পাওয়া গেছে তা অনেকে মনে করেন কবিকঙ্কণের কাব্যের মূল পুঁথি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বহু অর্থ ব্যয় করে এই পুঁথি প্রকাশ করেছিলেন। পুঁথি আসল কি নকল সে সম্বন্ধে শ্রীসুকুমার সেনের মন্তব্য উল্লেখ

১ 'কবিকঙ্কণ ও তাঁহার চণ্ডীকাব্য'—প্রদীপ, ১৩১২ অগ্রহায়ণ।

২৮

২৬

২৭

করাই সমীচীন মনে হয়। সুকুমারবাবু লিখেছেন: "১৩৫১ সালে দামিন্যায় গিয়া এই পুঁথি পরীক্ষা করিয়া আসিয়াছি। পুঁথি তেরেট পাতায় লেখা। অর্বাচীন হাতের ছাঁদ। মলাট চামড়ায়। পুঁথির বয়স দেড়শত বৎসরের অনধিক। লিপিকাল ছিল বলিয়া শেষের পাতাটি ইচ্ছা করিয়া নষ্ট করা হইয়াছে। তাহা না হইলে শেষ পাতার পরবর্তী শাদা পাতাগুলি ও মলাট থাকিত না। এই সংস্করণ পুনর্মুদ্রিত না করিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ সুবুদ্ধির পরিচয় দিবেন।" (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ৩৬৭ পৃষ্ঠার পাদটীকা)। এর উপর কোন মন্তব্য করা অপ্রয়োজনীয়।

শ্রীপাট বাঘনাপাড়া

পশ্চিমবাংলার বৈষ্ণব শ্রীপাটগুলির মধ্যে বর্ধমান জেলার বাঘনাপাড়ার একটা বিশেষ গুরুত্ব আছে। কাটোয়া বা অম্বিকা-কালনার তুলনায় বাঘনাপাড়ার গুরুত্ব কম নয়, যদিও গুরুত্বটা অন্যদিক দিয়ে বিচার্য। বাংলার বৈষ্ণব-সংস্কৃতিতে বাঘনাপাড়ার গোস্বামীরা একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, খড়দহ শান্তিপুর জীরাট প্রভৃতি অঞ্চলের গোস্বামীদের মতন। বৈষ্ণবসমাজে তাঁদের প্রতিপত্তি আজও তাঁরা অক্ষুন্ন রেখেছেন বলে মনে হয়। প্রায় শ্রীচৈতন্যের কাল থেকেই বাংলাদেশে তাঁদের ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে দেখা যায়।

বাঘনাপাড়ার নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে কয়েকটি চমৎকার কিংবদন্তী শুনেছি, গোস্বামীদের মুখে। একটি কিংবদন্তী হল, শাপগ্রস্ত ব্যাঘ্রপাদ মুনি ব্যাঘ্রকলেবর ধারণ করে এখানে তপস্যা করেন। কঠোর তপস্যার ফলে তিনি শাপমুক্ত হন। এই ব্যাঘ্রপাদ মুনির স্মৃতিবিজড়িত গ্রাম বলে এর নাম হল বাঘনাপাড়া। দ্বিতীয় কিংবদন্তীর উৎপত্তি হল 'বংশীশিক্ষা' গ্রন্থ থেকে। এই গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, এই অঞ্চলে আগে গভীর জঙ্গল ছিল এবং তাতে বাঘও বাস করত। রামচন্দ্র গোস্বামী (বাঘনাপাড়ার গোস্বামীবংশের প্রতিষ্ঠাতা) জঙ্গলের হিংস্র বাঘকেও হরিনাম দিয়ে উদ্ধার করেন বলে এই গ্রামের নাম হয়েছে বাঘনাপাড়া। দুটি কিংবদন্তী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, প্রথমটি চিরাচরিত ধারায় রচিত হয়েছে। অর্থাৎ একজন ঋষি বা মুনির স্মৃতি গ্রামের সঙ্গে জড়ানো দরকার, তা না হলে গ্রামের প্রাচীনত্বের আভিজাত্য থাকে না। গ্রামের নাম যখন বাঘনাপাড়া, তখন মুনির নাম ব্যাঘ্রপাদ বা ঐ জাতীয় ব্যাঘ্রসংশ্লিষ্ট কিছু হওয়া দরকার। তাই থেকে শাপভ্রষ্ট ব্যাঘ্রপাদ মুনির তপস্যার স্থান হয়েছে বাঘনা-পাড়া। বাস্তব ইতিহাসের সঙ্গে এই কিংবদন্তীর বিশেষ কোন সম্পর্ক আছে বলে মনে হয় না। দ্বিতীয় কিংবদন্তীর কল্পনাবিলাস যতই উগ্র হোক, তবু তার মধ্যে বাস্তবতার গন্ধ আছে। বাঘনাপাড়া অঞ্চল জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল এবং সেই জঙ্গলে যে বাঘের বাস ছিল, একথা যে অতিরঞ্জিত নয় তা এ অঞ্চলে আজও গেলে পরিষ্কার বোঝা যায়। বাঘনাপাড়া গ্রাম প্রধানত গোস্বামীদের চেষ্টায় এখন বেশ সমৃদ্ধ গ্রামে পরিণত হলেও, এক সময় যে শ্বাপদসঙ্কুল জঙ্গলে

পরিবেষ্টিত ছিল, বিশেষ করে তিন-চার শ' বছর আগে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। বাঘনাপাড়া কেন, গঙ্গার পুবে ও পশ্চিমে অনেক পাড়াই তখন জঙ্গলাকীর্ণ ছিল এবং বন্য বাঘ-ভাল্লুকের বাস ছিল তাতে।

রামচন্দ্র গোস্বামী বনের বাঘকে হরিনাম শুনিয়ে উদ্ধার করেছিলেন। এই কিংবদন্তীর একটা গভীর তাৎপর্য আছে। তার আগে রামচন্দ্র গোস্বামী ও বাঘনাপাড়ার গোস্বামীদের বংশপরিচয়ের প্রয়োজন। বংশীবদন গোস্বামী হলেন শ্রীচৈতন্যের পার্ষদ, তাঁর পুত্র চৈতন্যদাস। চৈতন্যদাসের পুত্র রামচন্দ্র গোস্বামী ও শচীনন্দন গোস্বামী :

বংশীবদন গোস্বামী
|
চৈতন্যদাস
|
রামচন্দ্র গোস্বামী ও শচীনন্দন গোস্বামী

নিত্যানন্দের স্ত্রী জাহ্নবী দেবী রামচন্দ্র গোস্বামীকে দীক্ষা দেন এবং পালিত পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। রামচন্দ্র গোস্বামী বা রামাই বৃন্দাবন থেকে বলদেব বিগ্রহ নিয়ে এসে বাঘনাপাড়ায় প্রতিষ্ঠা করেন, শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের সাতচল্লিশ বছর পরে, অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে। এই বংশলতা থেকে বাঘনাপাড়ার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে আভাস পাওয়া যায়। বংশীবদন বা বংশীদাসের জীবনচরিত 'বংশীশিক্ষা' গ্রন্থে বাঘনাপাড়ার যে ইতিহাস উল্লেখ করা হয়েছে সে-সম্বন্ধে কেনেডি তাঁর গ্রন্থে বলেছেন :

In a book called Vamsisiksha, which is largely descriptive of the life of a Brahmin friend and disciple of Chaitanya named Vamsivadan, or Vamsidas, we get an illustration of the process of the sect's growth. This disciple, to whose care Chaitanya had committed his mother and sister, migrated from Navadwip after Chaitanya's death and established himself at a place called Baghnapara. Here he set up a temple and gathered about him a considerable Vaishnava community. His sons and grandsons followed in his steps, increased their

following and thus established the line of Baghnapara Goswamins. (Kennedy: The Chaitanya Movement, P. 64).

বংশীবদন গোস্বামী ছিলেন শ্রীচৈতন্যের পার্শ্বচর। সন্ন্যাস গ্রহণের পর শ্রীচৈতন্য যখন তীর্থযাত্রা করেন তখন নবদ্বীপে তাঁর মা ও স্ত্রীর দেখাশুনার ভার দিয়ে যান বংশীবদনের উপর। শোনা যায়, এই সময় নাকি বংশীবদন বিষ্ণুপ্রিয়ার বিরহবেদনায় কাতর হয়ে শ্রীচৈতন্যের মূর্তি তৈরি করান। যাই হোক, শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের পর বংশীবদন ও অন্যান্য পার্শ্বচরদের উপর বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের ভার পড়ে। খড়দহে নিত্যানন্দ বসবাস করেন বলে, বাঘনাপাড়ায় আসেন বংশীবদন। বাঘনাপাড়ায় এসে তিনি মন্দির ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন এবং অনেককে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা দেন। তখন থেকে বাঘনাপাড়া বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের অন্যতম কেন্দ্র হয়ে ওঠে। তারপর বংশীবদনের পুত্র চৈতন্যদাস ও তাঁর পুত্র রামাই-এর সময় বাঘনাপাড়ার প্রতিপত্তি আরও অনেক বেড়ে যায়।

তাহলে বৈষ্ণবকেন্দ্র হিসাবে বাঘনাপাড়ার ইতিহাস প্রায় চারশ' বছরের দেখা যাচ্ছে। ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি কোন সময়ে বংশীবদন বাঘনাপাড়ায় এসে বসতি স্থাপন করেন। তার বছর চল্লিশ পরে রামাই গোস্বামী নিত্যানন্দের স্ত্রী জাহ্নবী দেবীর কাছে দীক্ষিত হন এবং বৃন্দাবন থেকে বিগ্রহ এনে প্রতিষ্ঠা করেন। বাঘনাপাড়ার উৎসবের মধ্যে রামাই-এর তিরোভাবের উৎসবই প্রধান। মাঘ মাসের কৃষ্ণাতৃতীয়া তিথিতে বেশ জাঁকজমক সহকারে রামাই-এর তিরোভাব উৎসব হয়। পশ্চিমবাংলার নানাস্থান থেকে বৈষ্ণব মহান্ত বাবাজী বৈরাগী ও গোস্বামীরা উৎসব উপলক্ষে বাঘনাপাডায় সমবেত হন। মেলা ও ফলারের ভোজের মধ্যে উৎসব সুসম্পন্ন হয়। রামকৃষ্ণ জীউএর দোলযাত্রা উপলক্ষ্যেও বাঘনাপাড়ায় বহু যাত্রীর সমাগম হয়।

বাঘনাপাড়ার বাঘপ্রসঙ্গে আগে বলেছি যে, বাঘের একটা তাৎপর্য আছে। সাংস্কৃতিক তাৎপর্য। রামাই গোস্বামী বাঘনাপাড়ার বাঘকে হরিনাম শুনিয়ে উদ্ধার করেছিলেন। বাঘমাত্রই যে জগাই-মাধাই-এর মতন উদ্ধারকাতর, তা নয়। তাহলে বাঘ-উদ্ধারের কাহিনীর তাৎপর্য কি? চারশ' বছর আগে বংশীবদন ও তাঁর বংশধরদের সঙ্কীর্তন ও খোলকরতালের শব্দে বাঘনাপাড়া হঠাৎ যখন মুখর হয়ে উঠেছিল, তখন চারিদিকের জঙ্গলের বাঘ তাই শুনে কি

অবস্থার সৃষ্টি করেছিল, তা আজ কল্পনা করা যায় না। খোলকরতালের প্রচণ্ড শব্দে বাঘের পক্ষে ভয় পেয়ে পালিয়ে যাওয়াও অসম্ভব নয়। আখড়ায় অনবরত কীর্তন হতে থাকলে তা খুবই সম্ভবপর। শ্রীচৈতন্যের তীর্থযাত্রাকালেও দেখা গেছে, তিনি এই রকম সঙ্কীর্তন করে পথের অনেক বিপদের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছেন। বাঘের প্রতিপত্তি এইভাবে নাম-সঙ্কীর্তনের ফলে বাঘনাপাড়ায় কমে যাওয়া আশ্চর্য নয়। তাছাড়া গোস্বামীদের বসবাসের পর নিশ্চয় লোক-বসতি আরও অনেক বাড়তে থাকে। লোকের বসবাস বাড়লে বাঘের বাস এমনিতেও উঠে যায়। সুতরাং বাঘনাপাড়ায় বাঘের সঙ্গে হরিনামের সম্পর্ক প্রত্যক্ষ ও গভীর হওয়া স্বাভাবিক। কিংবদন্তীর খোরাক এই ধরনের বাস্তব ইতিহাস থেকেই পাওয়া গেছে মনে হয়।

বাঘের গল্পের এটা একটা দিক মাত্র। এ ছাড়াও আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে, যার সঙ্গে রামাই-এর বাঘ-উদ্ধারের কাহিনীর কিছু সম্পর্ক আছে বলে মনে হয়। গোস্বামীরা আসার আগে বাঘনাপাড়ায় অন্য লোকের বসতি ছিল নিশ্চয়। কারণ, গোস্বামীরা যে একেবারে জঙ্গল হাসিল করে নতুন বসতি স্থাপন করেছিলেন তা মনে হয় না। তার কোন ইঙ্গিত কোন জায়গায় পাওয়া যায় না। কি জাতীয় লোকের বাস ছিল? বর্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল না তখন বাঘনাপাড়া, ধর্মকেন্দ্র বা বিদ্যাকেন্দ্রও ছিল না। সুতরাং ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থাদির বাস ছিল বলে মনে হয় না। এখন অবশ্য বাঘনাপাড়া ব্রাহ্মণপ্রধান গ্রাম। তখন ছিল অব্রাহ্মণ-প্রধান গ্রাম। অর্থাৎ গ্রামে ধীবর ব্যগ্রক্ষত্রিয় ইত্যাদিদের বাস ছিল বেশি। বাঘনাপাড়া গ্রামের দক্ষিণ থেকে পুবে বইত বল্লুকা নদী। এই বল্লুকা নদীই ধর্মপূজার আদিপীঠস্থান বলে প্রসিদ্ধ। হরিশ্চন্দ্র রাজার কাহিনী থেকে জানা যায়, বল্লুকা নদীর তীরে ছদ্মবেশী ধর্মের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ হয়। রামাই পণ্ডিতের নামে প্রসিদ্ধ 'শূন্যপুরাণেও' দেখা যায়—"বৈকুণ্ঠেতে জীয়ে ধর্ম, বল্লুকাতে স্থিতি"। ধর্মমঙ্গল সাহিত্যে যে সৃষ্টিতত্ত্বের উপাখ্যান আছে তাতেও দেখা যায় যে, আদিদেব সর্বপ্রথম বল্লুকাকেই সৃষ্টি করলেন। ধর্মের নিন্দুক মার্কণ্ড মুনি কুষ্ঠরোগ থেকে মুক্তি পাবার জন্য বল্লুকা নদীর তীরেই চন্দনকাঠের ধুনা জেলে ধর্মপূজা করেছিলেন। ধর্মপূজাবিধানেও আছে—"শনিবার ব্রত করিল বল্লুকার তীরে"। সুতরাং বল্লুকা নদীর তীর ধরে যে ধর্মপূজার প্রাচীন ইতিহাস জড়িত, তাতে সন্দেহের কোন কারণ নেই।

বর্ধমান জেলার ভিতর দিয়েই বল্লুকা নদী বয়ে গেছে। এই বল্লুকার তীরেই বাঘনাপাড়া গ্রাম। বাঘনাপাড়ার অব্রাহ্মণ জাতির মধ্যে ধর্মপূজার যে রীতিমত প্রতিপত্তি ছিল তা অনুমান করা অন্যায় নয়। ধর্মের এই পূজারীদের বৈষ্ণবরা কি চোখে দেখতেন তার স্পষ্ট প্রমাণ আছে চৈতন্যভাগবতে। এই পাষণ্ডদের বৈষ্ণব গোস্বামীরা বাঘের চেয়েও ভয় করতেন। গোস্বামীদের সঙ্গে তাদের যে বিরোধ হয়েছে প্রথমে তাও অনুমান করা যায়। পরে রামাই গোস্বামী এই শ্রেণীর পাষণ্ডদের কাউকে কাউকে যদি বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা দিয়ে থাকেন, তাহলে তারই প্রতীকোপাখ্যান হিসাবে বাঘকে হরিনাম শুনিয়ে উদ্ধার করার কাহিনীর উৎপত্তি হওয়া অস্বাভাবিক নয়। বল্লুকার তীরে বাঘনাপাড়ার ধর্মপূজার ঐতিহ্য আজও বিখ্যাত গোপেশ্বর শিবের গাজন ও পূজার মধ্যে বেঁচে রয়েছে। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সহজে মরে না, রূপান্তরিত হয়। গোপেশ্বর শিব গোস্বামীবাড়ির প্রাঙ্গণেই আজ বিরাজিত। চৈত্রসংক্রান্তির উৎসবের সময় খুব ধূমধাম হয়। আগে পিঠবাণ হত, এখনও কপালবাণ হয়। কালী-পূজা, দুর্গাপূজাও হয়, তবে কোন পূজাতেই পশুবলি হয় না। এইভাবে 'পাষণ্ড'দের পূজাকে বৈষ্ণব রূপ দেওয়া হয়েছে।

বাঘনাপাড়ার বাঘের জনশ্রুতির মূল হয়ত এর মধ্যেই লুকিয়ে আছে—এই পাষণ্ডদের ধর্মপূজা ও শক্তিপূজার বৈষ্ণব রূপান্তরের মধ্যে। আজও গোস্বামীরা ঠাকুরের পূজার সময় বাঘ-বাঘিনীর নামে ভোগ দিয়ে থাকেন। কানাই-বলাইয়ের সঙ্গে আজও বাঘনাপাড়ায় গোপেশ্বর শিবের গাজনোৎসব হয় সমারোহে। বল্লুকা তীরস্থ 'পাষণ্ড' সংস্কৃতির এই রূপান্তর হয়েছে বাঘনাপাড়ায় গোস্বামীদের জন্য।

বর্ধমানের সংস্কৃতিধারা

বর্ধমান জেলার প্রায় কয়েকটি উল্লেখযোগ্য স্থানের ঐতিহাসিক ধারার পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছি। অধিকাংশ স্থানের প্রাচীন ইতিহাস আজ অবলুপ্ত, তার কোন চিহ্ন বা ধ্বংসাবশেষ পর্যন্ত নেই। তাই অনেক ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক ইঙ্গিত দিতে হয়েছে অনুমানের উপর নির্ভর করে। ইতিহাসের ছাত্ররা জানেন, প্রাচীন অলিখিত ইতিহাস যা আজ পর্যন্ত লেখা হয়েছে তার কতটা অংশ দুঃসাহসিক অনুমানের নড়বড়ে খুঁটির উপর দাঁড়িয়ে আছে। আজকের অনুমান হয়ত আগামীকালের অকাট্য তথ্যনির্ভর প্রমাণের আঘাতে ধূলিসাৎ হয়ে যেতে পারে। কয়েকটা লিপি বা একখানা পুঁথি সম্বল করে আজ যা পুনর্গঠিত হয়েছে, তা হয়ত কালই ভেঙে পড়তে পারে। তবু একথা বলতেই হয় যে, তথ্যতালিকা আর ইতিহাস এক বস্তু নয়। ইতিহাসেও যুক্তিযুক্ত সীমানার মধ্যে, অন্তর্দৃষ্টি ও অনুমানের স্থান আছে। তথ্যের অরণ্যে তালকাণা হয়ে থাকাই ঐতিহাসিকের ধর্ম নয়, নিষ্ঠারও পরিচয় নয়। ঐতিহাসিক ধারার প্রতি ইঙ্গিত করার অধিকার প্রত্যেক অনুসন্ধানীর আছে।

বর্ধমানের সংস্কৃতিধারার অনুসন্ধান করতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে এরকম ইঙ্গিত আমি করেছি। কৌতূহলী পাঠকরা নিশ্চয় তা লক্ষ করেছেন। ইঙ্গিতের একমাত্র অর্থ হল, ভবিষ্যতে আরও বিস্তৃত অনুসন্ধানের পথনির্দেশ করা। এ ছাড়া ইঙ্গিতের আর কোন উদ্দেশ্য নেই। কোন মতামত কোথাও ব্যক্ত করা হয়নি, মতামত অর্থে যদি স্থির সিদ্ধান্ত বোঝায়, সে রকম মতামত ব্যক্ত করার ক্ষমতা কোন অনুসন্ধানীর নেই। সংগৃহীত উপাদান থেকে যা আভাস পাওয়া যায়, অনুসন্ধানীরা শুধু তাই নির্দেশ করতে পারেন। তাই করেছি আমি। কোথাও যদি সেটা আমার নির্দিষ্ট মতামত মনে হয়ে থাকে, তাহলে সেটা অনিচ্ছাকৃত এবং অক্ষম প্রকাশভঙ্গির জন্য। বিজ্ঞান আর ইতিহাসের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হলেও, ইতিহাস কোনদিন ফলিত বিজ্ঞানের মতন ঘটনার ল্যাবোরেটরীতে কোন সত্যকে অব্যর্থ বলে প্রমাণ করতে পারে না। সাধারণত পারে না। তবু বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের মতন ঐতিহাসিক তত্ত্ব কতকগুলি নিয়মের ভিত্তির উপর রচনা করা যায় এবং তার উপর নির্ভর করে অতীত,

বর্তমান ও ভবিষ্যতের ঐতিহাসিক ধারার ইঙ্গিত করা যায়। বর্ধমানের অতীত সংস্কৃতিধারা সম্পর্কে কোন ইঙ্গিত যদি করে থাকি, তাহলে এই ধরনের নিয়মের নির্দেশেই করেছি।

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা যত বেড়েছে তত মনে হয়েছে ইতিহাস সম্বন্ধে পুঁথিগত বিদ্যা কত অসম্পূর্ণ। প্রাচীন ইতিহাসের ক্ষেত্রে একথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। যেমন, সাধারণত ঐতিহাসিকরা বলে থাকেন যে, পালরাজারা বিদেশাগত। কিন্তু দেশের যুগসন্ধিক্ষণে এবং গৃহবিপ্লবের সময় দেশের জনসাধারণ গোপাল নামে এমন একজনকে তাদের রাজা নির্বাচন করল যিনি বিদেশাগত, এদেশের লোক নন, একথা বিশ্বাসের অযোগ্য বলে মনে হয়। একথার কোন সদুত্তর কোন ঐতিহাসিক দেননি। এরকম আরও অনেক জটিল প্রশ্নের উত্তরকে ঐতিহাসিকরা এড়িয়ে গেছেন, অথবা দুর্বোধ্য টীকা-টিপ্পনি দিয়ে ধামাচাপা দিয়েছেন। যেমন 'কৈবর্তবিদ্রোহ' বলে কথিত পালযুগের শেষকালের বিদ্রোহ। দিব্বোক, রুদ্রোক ও ভীমের কোন ইতিহাস নেই। পালযুগের এই সামন্তরাজারা কারা? কেন তাঁরা বিদ্রোহ করেছিলেন? পালরাজার অনুগ্রহজীবী হয়েও স্বয়ং সন্ধ্যাকরনন্দী তাঁর রামচরিত কাব্যে ভীমের যে প্রশংসা করেছেন তা থেকে বোঝা যায় যে, তাঁদের প্রতিপত্তি ও জনপ্রিয়তা পালরাজাদের চেয়ে কম ছিল না। সন্ধ্যাকরনন্দী বলেছেন:

যস্মিন রত্নামাশ্রয়ে সরস্বত্যপি স্বয়ং লক্ষ্মীঃ।
তে পারিজাতবাজিপ্রবরকরীন্দ্রা দয়োঽপ্যাসন॥ (২।২৩)

অর্থাৎ সর্বপ্রকার রত্নের আশ্রয় যে ভীমের মধ্যে স্বয়ং সরস্বতী ও লক্ষ্মীদেবী আশ্রয় করেছিলেন এবং যাঁর অধিকারে শ্রেষ্ঠ অশ্ব ও হস্তী প্রভৃতি সহ সেই সেই জনেরাও শত্রুচিন্তামুক্ত হয়ে বাস করত। এই অযাচিত প্রশংসা থেকে বোঝা যায় যে, এই সামন্তরাজারা সাধারণ সামন্ত ছিলেন না। তাঁদের ইতিহাস কি? জানা নেই। পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, মোটামুটি দক্ষিণরাঢ়ে (মেদিনীপুর সহ) ব্যগ্রক্ষত্রিয় ও মাহিষ্য এবং উত্তররাঢ়ে সদ্গোপ, গোপ ও উগ্রক্ষত্রিয়দের জনসমাজে এখনও অখণ্ড প্রতিপত্তি আছে। মেদিনীপুরের সদ্গোপ ও মাহিষ্য রাজবংশ, বিষ্ণুপুরের রাজবংশ, বর্ধমানের গোপভূমের সদ্গোপ রাজবংশ, উগ্রক্ষত্রিয়ের শৌর্যবীর্যের ঐতিহ্য ইত্যাদি উপেক্ষণীয় নয়। 'পাল' উপাধিও এঁদের যথেষ্ট আছে। সবচেয়ে বড় কথা,

এঁদের মতো এরকম স্বাধীনচিত্ত বলিষ্ঠ জাতি সারা বাংলাদেশে নেই। ঘটনা-চক্রে এঁরা যে অতীতের স্বাধীন রাজকীয় মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন, এরকম একটা ক্ষোভ যেন এঁদের জাতিমানসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে রয়েছে দেখা যায়। সেটা অবজ্ঞার বস্তু নয়। "এক যে ছিল রাজার" অসংখ্য কিংবদন্তী রাঢ়ের গ্রামে গ্রামে আজও শোনা যায় এবং দেখা যায় যে, তাঁরা অধিকাংশই গোপ সদ্‌গোপ মাহিষ্য ও ব্যগ্রক্ষত্রিয় রাজা। গোপরা গোপালক এবং গোপালক যে গোপাল, একথা বাংলাদেশে অন্তত কারও অজানা নেই। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই গোপালক ছিলেন এবং পশুপালকের সমাজ থেকেই তাঁর উৎপত্তি হয়েছে, তার মধ্যেই তিনি মানুষ হয়েছেন। বাংলাদেশে (পশ্চিমবঙ্গে) প্রাগৈতিহাসিক যুগে তিন শ্রেণীর বৃত্তিজীবীর প্রাধান্য ছিল—শিকারী, পশু-পালক ও কৃষিজীবী। ধীবর ও মৎস্যজীবীরাই ছিল শিকারীদের মধ্যে প্রধান, পশুপালকদের মধ্যে ছিল গোপরা এবং কৃষিজীবীদের মধ্যে সদ্‌গোপ, মাহিষ্য ও উগ্রক্ষত্রিয়রা। গন্ধবণিক, তাম্বুলবণিক, সুবর্ণবণিক প্রভৃতিদের বৃত্তি ছিল বাণিজ্য। বিস্তৃত জনপদের উপর এঁদের কর্তৃত্ব ছিল এবং রাজা ও রাজ্যেরও বিকাশ হয়েছিল এঁদের মধ্যে। ঐতিহাসিক যুগে এঁরা দিগ্বিজয়ী সম্রাটদের অধীনে সামন্তশ্রেণীভুক্ত হয়েছিলেন; কিন্তু সেটা নামমাত্র অধীনতা। আসলে তাঁরা নিজ নিজ জনপদের স্বাধীন রাজা ছিলেন। কেন্দ্রীয় শাসনের সঙ্কটকালে তাঁরা প্রভুত্ব বিস্তারের চেষ্টাও করতেন। সামন্তযুগের বৈশিষ্ট্যই তাই। পাল-রাজাদের অভ্যুদয় এই রকম সঙ্কটকালেই হয়েছিল এবং তথাকথিত 'কৈবর্ত-বিদ্রোহেরও' কারণ তাই। বরেন্দ্রভূমের দিব্বোক রুদ্রোক ও ভীম মাহিষ্য অধিপতি ছিলেন বলেই মনে হয় এবং রাঢ় অঞ্চল থেকে গিয়েই হয়ত তাঁরা উত্তরবঙ্গে প্রভুত্ব বিস্তার করেছিলেন। পালরাজাদের অভ্যুদয় মনে হয় রাঢ়-দেশেই হয়েছিল এবং সেখান থেকেই তাঁরা আশেপাশে আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। ইতিহাসের এই উত্থান-পতনে বর্ধমান জেলার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল—রাঢ়ের মধ্যমণি ও প্রাণকেন্দ্র বলে। বিশেষ করে বর্ধমান জেলার গোপভূমের ইতিহাস এই প্রসঙ্গে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়।

বর্ধমানের লোকধর্মের ধারার মধ্যে সাংস্কৃতিক ইতিহাসের অনেক মূল্যবান উপাদান সঞ্চিত রয়েছে। বিস্তৃত অনুসন্ধান করলে অনেক হারানো মণিমুক্তারও সন্ধান পাওয়া যেতে পারে বলে আমার ধারণা। বাংলাদেশের গ্রামদেবতাদের

কাহিনী যতদিন না কেউ কষ্ট করে সংগ্রহ করে লিখবেন, ততদিন বাংলার গ্রামীণ সংস্কৃতির একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় অলিখিত থাকবে। বর্ধমান জেলার গ্রামদেবতাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন ও প্রতিপত্তিশালী হলেন ধর্মঠাকুর ও মনসা। মনসার সঙ্গে চণ্ডী ও বিশালাক্ষীও আছেন। রাঢ় অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে মনে হয়েছে, ধর্মঠাকুর সম্বন্ধে যা আমরা জানি বা আজ পর্যন্ত যা লেখা হয়েছে, তা কত অসম্পূর্ণ। সাধারণত কয়েকটি স্থানের ধর্মঠাকুরের বিবরণ সংগ্রহ করে যে সব নিবন্ধ 'রিসার্চ জার্নালে' লেখা হয়েছে তা এত অসম্পূর্ণ যে তা থেকে কোন ধারণাই করা যায় না। যা ধারণা ছিল, তা আজ ভুল মনে হয়। রাঢ় অঞ্চলের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে মনে হয়—ধর্মঠাকুরের সর্বাধিক প্রাধান্য-কেন্দ্র হল বর্ধমান জেলার দক্ষিণ, হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমা, মেদিনীপুরের ঘাটাল অঞ্চল এবং বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর মহকুমা নিয়ে। সংস্কৃতিবিজ্ঞানের নিয়মানুযায়ী প্রাধান্য-কেন্দ্রই সাধারণত উৎসকেন্দ্র হয়। তবে হবেই যে এমন কোন কথা নেই, নাও হতে পারে। উৎসকেন্দ্র থেকে নানাধারায় বিচ্ছুরিত হয়ে, কোন বিশেষ আঞ্চলিক কারণে হয়ত কোন সাংস্কৃতিক আচার বা অনুষ্ঠান প্রাধান্য ও প্রতিষ্ঠা পেতে পারে। হয়ত উত্তর-রাঢ়ের আদি-অস্ট্রাল জাতির টোটেমপূজা ক্রমে ধর্মঠাকুরের ধ্যানধারণায় পরিণত হয়েছে দক্ষিণরাঢ়ের দিকে এসে। এরকম হবার সম্ভাবনা আছে। মোট কথা ধর্মপূজা রাঢ়ের গণপূজা এবং তার ইতিহাস অতি প্রাচীনকাল পর্যন্ত বিস্তৃত। কূর্মপূজার সঙ্গে যে তার প্রত্যক্ষ ও প্রাথমিক সম্পর্ক আছে, তাতেও কোন সন্দেহ নেই এবং কূর্মপূজা যে টোটেমপূজা, সে সম্বন্ধেও আমার বিশ্বাস ক্রমেই দৃঢ়মূল হয়েছে। ধর্মঠাকুরের যত মূর্তি দেখছি তার মধ্যে শতকরা নব্বুইটি মূর্তি কূর্মমূর্তি। রাঢ়ের ভাস্কররা যে একসময় প্রচুর পরিমাণে এই মূর্তি তৈরি করতেন, বর্ধমান জেলার মন্তেশ্বর থানার পাতুন গ্রামের মূর্তির প্রাচুর্য (খুঁড়ে পাওয়া) দেখে তা বোঝা যায়। পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে প্রাচীন তাম্রপট্টলিপি থেকে জানা যায়:

> লোকনাথঃ যঃ পুংসাং সুকৃতকর্মফলহেতুঃ
> সত্যতপোময় মূর্তিল্লোকদ্বয় সাধনো ধর্মঃ
> তদনুজিতদনম্ভ (স্ত) লোভা জয়…

(মল্লসারুল লিপি)

ধর্মঠাকুরকে কিভাবে লোকদেবতা শিব ক্রমে আত্মসাৎ করে নিয়েছেন ও এখনও নিচ্ছেন, তারও চমৎকার দৃষ্টান্ত বর্ধমানে পাওয়া যায়। জামালপুরের বুড়োরাজ তার অন্যতম দৃষ্টান্ত। চণ্ডী ও মনসার প্রতিপত্তিও প্রায় ধর্মঠাকুরের মতন। অনেক স্থানে তাঁরা একত্রে বিরাজ করেন। বোঝা যায়, একেবারে গোড়ার লৌকিক স্তর থেকে তাঁদের উৎপত্তি। পরবর্তীকালে বৌদ্ধ ও হিন্দুযুগে তাঁদের নাম বদলেছে এবং ক্রমে বৌদ্ধ থেকে তাঁরা হিন্দু দেবদেবী হয়ে গেছেন। তাহলেও লৌকিক আচার-অনুষ্ঠান ছেড়ে তাঁরা সম্পূর্ণ ব্রাহ্মণ্যরূপ ধারণ করতে পারেননি। ব্রাহ্মণরা তাঁদের প্রয়োজন মতন এই সব দেবদেবীকে সর্বজনশ্রদ্ধেয় ও পূজ্য করে নিয়েছেন। ধনপতি, শ্রীমন্ত, চাঁদসদাগর, বেহুলার উপাখ্যানও রাঢ়েই সৃষ্টি হয়েছে এবং আমার ধারণা নদনদীবহুল বর্ধমান অঞ্চলেই তার ঐতিহাসিক ভিত্তি ছিল। দামোদর, অজয়, খড়্গেশ্বরী (খড়ি নদী) কুনুর, বাঁকা বল্লুকার তীরে তীরে আজও যে বিস্তৃত বণিকসমাজের প্রতিপত্তির চিহ্ন দেখা যায় বর্ধমান জেলায়, তার ইতিহাস লুপ্ত হলেও মিথ্যা নয় বা উপেক্ষণীয় নয়। হিন্দু সমাজের সর্বস্তরে, জাতিনির্বিশেষে, চণ্ডী মনসা প্রভৃতি লৌকিক দেবদেবীর প্রতিষ্ঠার যে সংঘাতমুখর ইতিহাসের ধারাও রাঢ়ের বর্ধমান অঞ্চলে অনুসন্ধান করতে হবে, অন্যত্র পাওয়া যাবে না। শৈব ও শাক্ত বা তান্ত্রিক সাধনার প্রাধান্য রাঢ়ের অন্যতম বিশেষত্ব। বর্ধমান জেলারও বিশেষত্ব তাই। চামুণ্ডা পূজা ও চামুণ্ডার বিভিন্ন মূর্তি যা বর্ধমানে পাওয়া গেছে, তা এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শিবপূজা প্রসঙ্গে গোপদের জড়িত কিংবদন্তীটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শৈবদের মধ্যে বর্ধমান জেলার গোপ ও সদ্‌গোপরা যে অন্যতম ছিলেন, তা আজও বোঝা যায়। মনে হয়, রাঢ় অঞ্চলে শৈবধর্মের প্রসারে তাঁদের একটা ঐতিহাসিক ভূমিকা আছে। শিবের গাজনে আসল নরমুণ্ড নিয়ে নৃত্য বর্ধমান জেলার কুড়মন-পলাশী ও অন্য কয়েকটি অঞ্চলে হয়। এটি একটি উল্লেখযোগ্য আনুষ্ঠানিক অবশেষ, শিব ও ধর্মপূজার প্রাথমিক রূপের উপর আলোকসম্পাত করতে পারে বলে মনে হয়। শৈব ও শাক্ত ছাড়া, বৈষ্ণবদেরও একাধিক পীঠস্থান আছে বর্ধমানে। বৈষ্ণবধর্মের প্রসারে ও বৈষ্ণবসাহিত্যের সমৃদ্ধিতে বর্ধমান জেলার কাটোয়া শ্রীখণ্ড নৈহাটি কোগ্রাম দেনুড় ঝামটপুর ও কুলীন-গ্রামের দান অসামান্য। মালাধর বসু, বৃন্দাবন দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ,

লোচনদাস, নরহরি দাস, জ্ঞানদাস, এঁরা বর্ধমানের মাটিতেই প্রতিষ্ঠা পান। রাঢ়ের বিষ্ণুপুর ও বর্ধমান থেকেই প্রধানত বৈষ্ণবধর্মের প্রসার ও প্রচার হয় বাংলাদেশে। সমাজের উপরের স্তরেই বৈষ্ণবধর্মের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তলার স্তরে লৌকিক ধর্মের জোয়ার সমানভাবেই বইতে থাকে দেখা যায়। বর্ধমান তথা রাঢ় দেশে তার অজস্র প্রমাণ পাওয়া যায়। আরও দেখা যায়, ধর্মের সঙ্গে ধর্মের বিরোধ নেই কোথাও। বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত ও লৌকিক দেবদেবী পাশাপাশি বিরাজ করছেন, এমন স্থান বর্ধমানে অনেক আছে। কাটোয়ায় আজও ধর্মঠাকুর রয়েছেন, বাঘনাপাড়ায় গোপেশ্বর শিব গোস্বামীদের বাড়িতেই আছেন এবং তাঁর গাজনও হয়। মুসলমান পীররাও বর্ধমানের হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কাছে সমান শ্রদ্ধেয় ও পূজ্য। বর্ধমান জেলার মুসলমান সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান কেন্দ্র মঙ্গলকোটের বাজারে আজও হিন্দু গ্রাম্যদেবতা নির্বিঘ্নে পূজিত হচ্ছেন। সেই প্রাগৈতিহাসিক 'জন'-সংস্কৃতির যুগ থেকে, জৈন বৌদ্ধ হিন্দু মুসলমান, এমনকি খৃস্টান যুগের মধ্য দিয়েও, বাংলার সংস্কৃতি-সমন্বয়ের একটা অবিচ্ছিন্ন ধারা বয়ে গেছে রাঢ়ের বর্ধমানের উপর দিয়ে। সংঘাত যে হয়নি তা নয়, কিন্তু সেটা কেবল হিন্দু মুসলমান খৃষ্টানের সাম্প্রদায়িক সংঘাত নয়। হিন্দু বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের মধ্যেও সংঘাত হয়েছে, হিন্দুদের মধ্যে লৌকিক ও ব্রাহ্মণ্যধর্মেরও সংঘাত হয়েছে। কিন্তু সমস্ত সংঘাতের ধারা বিরোধবন্ধুর পথ দিয়ে এসে এক বিচিত্র সংস্কৃতি-সমন্বয়ের মহাসাগরে মিলিত হয়েছে।

মেদিনীপর

মেদিনীপুরের ঐতিহ্য

পশ্চিমবাংলার ইতিহাসে নানাদিক থেকে মেদিনীপুরের দান বিশেষ মূল্যবান। ইতিহাসের ধারাবাহিকতার নিদর্শন মাইলস্টোনের মতন মেদিনীপুরের মধ্যে প্রোথিত রয়েছে বললেও ভুল হয় না। অবশ্য সুপ্রাচীন অতীতের অনেক ইতিহাসের উপাদান মেদিনীপুরের ভূগর্ভে সমাধিস্থ হয়ে আছে, প্রত্নতাত্ত্বিকের কোদালের ঘায়ে আজও তা পুনরুদ্ধৃত হয়নি। তবু যেসব বিক্ষিপ্ত উপকরণ ইতস্তত পাওয়া গেছে, কৌতূহলী অনুসন্ধানীর কাছে তার মূল্য কম নয়। ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতাই হল মেদিনীপুরের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। যুগে যুগে বিভিন্ন সংস্কৃতিধারার লেন-দেন ঘাত-প্রতিঘাত, মিলনমিশ্রণ ও সমন্বয় মেদিনীপুরে যেমন হয়েছে, তেমন আর পশ্চিমবাংলার কোথাও হয়েছে কিনা সন্দেহ। তার প্রধান কারণ মেদিনীপুরের ভৌগোলিক প্রকৃতি ও স্থিতি।

প্রাচীন পাথুরে মাটি বনজঙ্গল থেকে আরম্ভ করে নবীন পলিমাটি দিয়ে ঢাকা মেদিনীপুর। রানীগঞ্জ কেন, আরও উত্তর-পূর্বে নলহাটি রামপুরহাট থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম ঘেঁষে যদি একটি রেখা টানা যায়—দুবরাজপুর রানীগঞ্জ অণ্ডাল, গঙ্গাজলঘাটি বাঁকুড়া, শিমলাপাল গড়বেতা শালবনি মেদিনীপুর দাঁতন জলেশ্বর বালেশ্বর পর্যন্ত দক্ষিণে—তাহলে সেই রেখার পশ্চিমে যে অংশ পড়ে তার ভৌগোলিক প্রকৃতি একরকম এবং পূর্বাংশের অন্যরকম দেখা যায়। সাঁওতাল পরগণার নয়া-দুমকা থেকে বালেশ্বর পর্যন্ত সোজা উত্তর-দক্ষিণে

একটি সরলরেখার দ্বারা এই দুই অংশের মোটামুটি সীমানা টানা যায়। বর্ধমান বিভাগের মানচিত্রের দিকে চেয়ে দেখলে পরিষ্কার বোঝা যায় এই সীমানা-রেখার দুই পাশের দুই অংশের প্রকৃতি কি রকম। বীরভূমের কিছুটা অংশ, বাঁকুড়া জেলার অধিকাংশ এবং মেদিনীপুরের অনেকটা অংশ (প্রধানত উত্তর মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম মহকুমা) এই রেখার পশ্চিমদিকে পড়ে। পশ্চিম-বাংলা কেন, সারা বাংলাদেশের মধ্যে এই অঞ্চলই হল প্রাকৃতিক বয়সের দিক দিয়ে সবচেয়ে প্রবীণ ও প্রাচীন। আয়তনের দিক দিয়ে বিচার করলে এই অঞ্চলের সর্বাধিক অংশ দেখা যায়, বর্তমান মেদিনীপুরের অন্তর্গত। মধ্যভারতের উচ্চভূমি, পর্বতশ্রেণী ও অরণ্য পশ্চিমবাংলার সীমান্তে এই বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে অভিনবরূপে বিরাজ করছে। মনে হয় যেন সাঁওতাল পরগণা ও ছোটনাগপুরের ভিতর দিয়ে ক্রমে পর্বতমালা পশ্চিমবাংলার এই অঞ্চলে এসে হুমড়ি খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়েছে। সেই আদিম প্রত্নজীবক কালের পার্বত্য অভ্যুত্থানের বিস্ময়কর স্মৃতি এগুলি। মানুষ তখন কোথায়? আদিম অরণ্যও যেন এই অঞ্চল পর্যন্ত অভিযান করে হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেছে নদীমাতৃক বাংলার উর্বরা পলিমাটির সামনে। সত্যই এক বিচিত্র রূপ এই বাংলার! সবুজ ও সমতলতার মনোরম একঘেঁয়েমি থেকে মুক্ত উঁচুনিচু বনময় রুক্ষ গৈরিক পাথুরে বাংলার এই মূর্তি অনভ্যস্ত বাঙালীর চোখে প্রকৃতির এক বিচিত্র প্রকাশ বলে মনে হয়। অথচ বাংলার সভ্যতার ও বাঙালী সংস্কৃতির অনেক উত্থানপতন, অনেক ভাঙাগড়া, অনেক ঘাতপ্রতিঘাত হয়েছে পশ্চিমবাংলার এই প্রাচীনতম অঞ্চলে। এপাশ থেকে আদিম পার্বত্য ও বন্য সংস্কৃতির উত্তরাধিকার নিয়ে বাংলার আদিম মানুষের বংশধররা যেন ওপাশের নদীমাতৃক উর্বর অঞ্চলের উন্নত সভ্যতার উত্তরাধিকারীদের মুখোমুখী দাঁড়িয়েছে, আদান-প্রদানের আশায়। দু'পাশের একই মানুষের একই বাঙালীর চেনাপরিচয় ও সম্বন্ধনির্ণয়ের সুযোগ এইখানে যেমন আছে, তেমন আর কোথাও নেই। মেদিনীপুর টাউন থেকে উত্তর-মেদিনীপুরসহ সারা ঝাড়গ্রাম মহকুমা এই সঙ্গমক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত।

মেদিনীপুরের, তথা সারা পশ্চিমবাংলার ইতিহাসের প্রাচীনতম যুগের অনেক উপকরণ এই অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে। পাথুরে মাটির স্তরে স্তরে, গভীর অরণ্যের মধ্যে লুকিয়েও আছে অনেক। আজ পর্যন্ত যা কুড়িয়ে

মেদিনীপুর জেলা
বাঁকুড়া
হুগলী
হাওড়া
২৪ পরগণা
ময়ূরভঞ্জ
বালেশ্বর
বঙ্গোপসাগর
মেদিনীপুর
খড়গপুর
গড়বেতা
বীরসিংহ
চন্দ্রকোণা
ক্ষীরপাই
ঘাটাল
বরদা
দাসপুর
কেশপুর
শিলদা
বিনপুর
ঝাটিবনি
দহিজুড়ি
চিলকিগড়
ঝাড়গ্রাম
লোধাশুলি
কিয়ারচাঁদ
গোপীবল্লভপুর
বেলদা
নারায়নগড়
পাঁশকুড়া
তমলুক
ময়না
মহিষাদল
নীরপুর
পটাশপুর
দাঁতন
এগরা
কাঁথি
নন্দীগ্রাম
খেজুরী
রেলপথ
রাস্তা - পাকা
কাঁচা
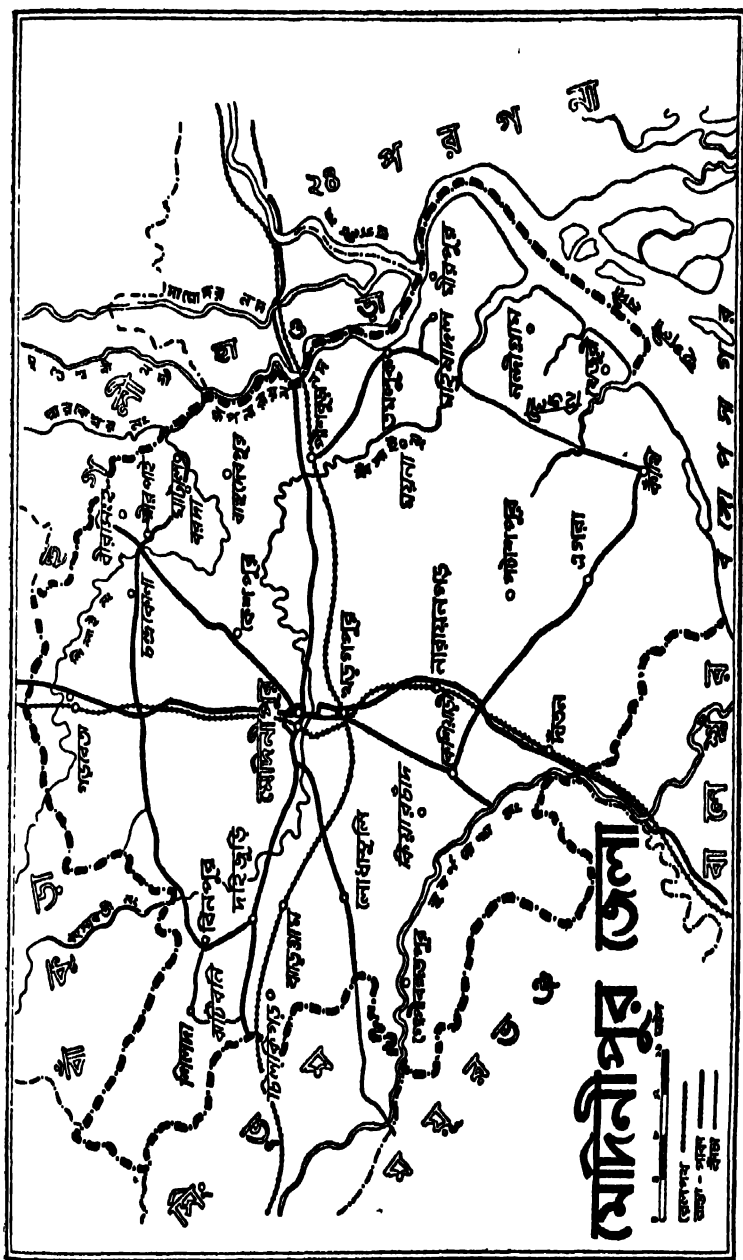
পাওয়া গেছে, বিশেষ অনুসন্ধান না করেও, তার গুরুত্বও কম নয়। সিংভূম মানভূম থেকে আরম্ভ করে তার সংলগ্ন বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরের এই অঞ্চলে প্রস্তরযুগের নানা ধরনের হাতিয়ার পাওয়া গেছে। বাঁকুড়ার বনআসুরিয়া গ্রামে প্রস্তরযুগের আয়ুধ পাওয়া গেছে। 'বনআসুরিয়া' নামটিও লক্ষণীয়। বন্য অসুর বলা হত আদিমবাসীদের, পরবর্তীকালের 'চোয়াড়' বা 'চুয়াড়ের' মতন। কিছুদিন আগে ঝাড়গ্রাম মহকুমার লালগড় অঞ্চল থেকে নব্যপ্রস্তর যুগের হাতিয়ার পাওয়া গেছে। রানীগঞ্জ, দুর্গাপুর অঞ্চল থেকেও যে পাথুরে অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গেছে, তা বর্ধমান প্রসঙ্গে পূর্বে উল্লেখ করেছি। যে সীমানারেখার কথা আগে বলেছি তার পশ্চিমেই এই অঞ্চলগুলি অবস্থিত। ছোটনাগপুর সিংভূম ধলভূম মানভূম অঞ্চলেও পাথুরে হাতিয়ার যথেষ্ট পাওয়া গেছে। কৌতূহলী পাঠকরা বল্ সাহেবের বিবরণগুলি দেখতে পারেন।[১] সিংভূম ধলভূম মানভূম থেকে বাঁকুড়ার বনআসুরিয়া, কাঁসাই নদীর তীর,[২] ঝাড়গ্রাম মহকুমার লালগড়-রামগড়, বর্ধমানের রানীগঞ্জ-দুর্গাপুর প্রভৃতি অঞ্চল পর্যন্ত যেসব পাথুরে হাতিয়ারের নিদর্শন পাওয়া গেছে, তা থেকে এইটুকু বোঝা যায় যে, মানবসভ্যতার আদিমতম যুগেও পশ্চিমবাংলার একটা সক্রিয় ভূমিকা ছিল সভ্যতার গোড়াপত্তনে। বিনা অনুসন্ধানেও যা নিদর্শন পাওয়া গেছে, অনুসন্ধান করলে তার চেয়ে আরও অনেক বেশি পাওয়া যাবে আশা করা যায়। বোঝা যায়, সভ্যতার গোড়াপত্তনের সময় আমাদের আদিম পূর্বপুরুষরা পশ্চিম-বাংলার এই অঞ্চলের পাথর দিয়ে হাতিয়ার তৈরি করে প্রকৃতির বিরুদ্ধে জীবন-সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম মহকুমা নিঃসন্দেহে সেই আদিম সংগ্রামক্ষেত্রের একাংশ জুড়ে রয়েছে। ঝাড়গ্রাম কেন্দ্র করে উত্তর-পশ্চিমে বিনপুর শিলদা বেলপাহাড়ী, উত্তর-পুবে লালগড়-রামগড় এবং দক্ষিণে নয়াগ্রাম

১ Proceedings of the Asiatic Society of Bengal—1865, P. 127-128 : 1867, P. 136-153 ; 1870, P. 268 ; 1875, P. 118-120 ; 1878, P. 125—এবং Indian Antiquary, 1872, P. 291-292.

২ সম্প্রতি বিষ্ণুপুর সাহিত্য-পরিষদ শাখার সম্পাদক শ্রীমাণিকলাল সিংহ কাঁসাই অঞ্চল থেকে প্রস্তরযুগের হাতিয়ার পেয়েছেন।

মেদিনীপুরের লালগড় অঞ্চলের আয়ুধ সম্বন্ধে শ্রীধরণী সেন লিখিত 'A Note on Some Celts and Chisels from West Bengal' দ্রষ্টব্য (Science and Culture, vol 14, PP 252-253, December 1948)

পর্যন্ত অঞ্চল এই এলাকার অন্তর্ভুক্ত। এই অঞ্চলের প্রাচীনতম ইতিহাসের পাথুরে প্রমাণও রয়েছে।

পশ্চিমবাংলার এই প্রান্তে প্রস্তরযুগ থেকে সভ্যতার এই বনিয়াদ গঠন করেছিল কারা? মনে হয়, আদি-অস্ট্রালয়েডরা। তাদের বংশধর হল মেদিনীপুরের লক্ষ লক্ষ সাঁওতাল এবং বিচ্ছিন্ন ও বিপর্যস্ত শবর, লোধা, কোড়া প্রভৃতি জাতি। একসময় মেদিনীপুরের জঙ্গলখণ্ডে তীরধনুক ও পাথুরে হাতিয়ার নিয়ে তারা বন্যজন্তু শিকার করে বেড়াত, বনজ ফলমূলও আহরণ করত। বন হাসিল করে বসতি গড়েছিল প্রথমে তারাই। আজও তার সূত্রস্বরূপ অনেক নিদর্শন এইসব জাতির আচারব্যবহার, ধর্মানুষ্ঠান ও উৎসব-পার্বণের মধ্যে রয়েছে। এই প্রসঙ্গে সাঁওতালদের কথা মনে হয় সবচেয়ে বেশি। মেদিনীপুরের উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলেই সাঁওতালদের বাস সবচেয়ে বেশি। কোথা থেকে কিভাবে কবে তারা মেদিনীপুরের এই অঞ্চলে এসে বসতি স্থাপন করে, তার কোন সঠিক ইতিহাস আজও জানা যায়নি। কিন্তু সাঁওতালী পুরাণকথায় 'সাঁওন্থ' দেশই তাদের আদি বাসস্থান বলা হয়। এই সাঁওন্থ দেশই হল আধুনিক শিলদা পরগণা। সাঁওনাথ বা সাঁওতল থেকেই সাঁওতাল জাতির নামকরণ হয়েছে বলে তাদের বিশ্বাস এবং শিলদা ও ঝাড়গ্রামের এই অঞ্চলকে তারা সাঁন্থভুঁই বলে। সাঁওতালী ভাষায় রচিত 'মারে হাপ্‌রাম' গ্রন্থে সাঁওতালদের স্থানান্তরের সুদীর্ঘ ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। সম্প্রতি ঝাড়গ্রামের শ্রীবৈদ্যনাথ হাঁসদা এই গ্রন্থখানির বাংলা তর্জমা প্রকাশ করেছেন। নিজে সাঁওতাল হয়েও শ্রীহাঁসদা বাংলাভাষায় এত সুন্দর করে তর্জমা করেছেন যে, বইখানি বাংলা সাহিত্যের মূল্যবান সম্পদ বলে গণ্য হবে। সাঁওতাল জাতির ইতিবৃত্ত বাঙালী জাতির ও সংস্কৃতির ইতিহাসের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে নানাদিক থেকে জড়িত। সেই ইতিবৃত্তের অনেক সূত্রও উপাদান শ্রীহাঁসদা অনূদিত 'মারে হাপ্‌রাম' গ্রন্থে পাওয়া যায়।

সাঁওন্থভূমি শিল্‌দা পরগণা কিনা এবং শিলদা সাঁওতালদের আদি বাসস্থান কিনা, তা নিয়ে বিতর্কের সুযোগ অবশ্যই আছে। কিন্তু শিল্‌দা ও তার সংলগ্ন অঞ্চলের পক্ষেও যুক্তি আছে যথেষ্ট। ঝাড়গ্রামের উত্তর-পশ্চিমে বিনপুর থেকে শিল্‌দা অঞ্চলের মধ্যে সাঁওতাল বসতি আছে অনেক। উত্তর-পুবে লালগড়-রামগড় অঞ্চলে সাঁওতালদের ঘনবসতিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আরও

পুবে গড়বেতা থানার পশ্চিমে ও দক্ষিণে প্রধানত, এবং উত্তরে কিছু কিছু সাঁওতালদের বাস আছে। গড়বেতার দক্ষিণে শালবনি ও মেদিনীপুরের ভিতর দিয়ে ঝাড়গ্রামের দক্ষিণে যত সুবর্ণরেখা নদীর দিকে এগিয়ে যাওয়া যায় (গোপীবল্লভপুর নয়াগ্রামের দিকে) তত জঙ্গল-হাসিল করা উর্বর বসতি অঞ্চল নজরে পড়ে। সুবর্ণরেখার দক্ষিণে ময়ূরভঞ্জের পার্বত্যাঞ্চলের গোড়া থেকে আবার সাঁওতাল-বসতির আধিক্য দেখা যায়। উত্তরের রেখা বীরভূম-সাঁওতাল পরগণা পর্যন্ত বিস্তৃত করলে বলা যায় যে, আগে যে নয়া-দুমকা থেকে উত্তর-দক্ষিণে বালেশ্বর পর্যন্ত সীমানারেখার কথা বলেছি এবং তার পশ্চিমাংশের যে প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের বিষয় উল্লেখ করেছি, সেই পশ্চিমাংশের সর্বপ্রধান প্রতিপত্তিশালী বাসিন্দা হল সাঁওতালরা। এই অঞ্চলে এবং তার কাছাকাছি অঞ্চলে সাঁওতালী ভাষা ও সংস্কৃতির প্রভাবও যথেষ্ট দেখা যায়।

এইখানে অস্ট্রিকভাষাভাষী অন্য কোন জাতি সাঁওতালদের পূর্বে বসতি স্থাপন করেছিল কিনা এবং কবে করেছিল, তা বলা যায় না। তা করলেও, অস্ট্রিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির সৌধ-গড়ন প্রধানত সাঁওতালদের দ্বারাই যে হয়েছে এ অঞ্চলে, তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। বাঙালীর সংস্কৃতিতে অস্ট্রিক উপাদান যে কত মিলে মিশে রয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। পশলুস্কি, লেভী প্রমুখ মনীষীরা তার বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। আজও তার অনুসন্ধানের অপূর্ব সুযোগ রয়েছে এই অঞ্চলে, বিশেষ করে উত্তর-মেদিনীপুরে ও ঝাড়গ্রামে।

দশ-বারো হাজার বছরের প্রাচীন প্রস্তরযুগের সভ্যতার প্রামাণিক পাথুরে নিদর্শন যে উত্তর-মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম থেকে পাওয়া গেছে সেকথা আগে বলেছি। পরবর্তী তাম্রযুগের নিদর্শনও পাওয়া গেছে এই অঞ্চল থেকে। ঝাড়গ্রামের উত্তর-পশ্চিমে বিনপুর থানার অন্তর্গত 'তামাজুড়ী' গ্রামে একখানি তামার কুঠারফলক পাওয়া গিয়েছিল।[১]

তামাজুড়ী গ্রামের নামের সঙ্গে তামা কথাটিও লক্ষণীয়। তাম্রখনি মেদিনীপুরের পশ্চিমসীমান্তে, ঝাড়গ্রাম-সংলগ্ন সিংভূমে। খনিজ উপকরণ থেকে প্রাচীন পদ্ধতিতে এখানে তামার কাজও যে হত তার নিদর্শন এখনও পাওয়া যায়। খনিজ তাম্রসম্পদের প্রাচুর্য যেখানে ছিল সেখানে তাম্রপ্রস্তর

১ Catalogue and Handbook of the Archaeological collections in the Indian Museum, Part II P. 485.

(Chalcolithic) যুগের সভ্যতার কোন বিকাশ হয়নি বলে মনে হয় না।[১] সিন্ধু-উপত্যকা তাম্র-প্রস্তরযুগের সভ্যতার অন্যতম বিশিষ্ট কেন্দ্র হলেও একমাত্র কেন্দ্র ছিল না। সুবর্ণরেখা ও কাঁসাই উপত্যকাতেও পশ্চিমবঙ্গে তার বিকাশ হয়েছিল মনে হয়। তাম্রলিপ্ত নামের যত ব্যাখ্যাই হোক না কেন, তাম্র বা তামার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই, এমন কথা সহজে ভাবা যায় না। সুবর্ণরেখা থেকে কাঁসাই উপত্যকা পর্যন্ত যদি তাম্রপ্রস্তর যুগের সভ্যতার বিকাশ হয়ে থাকে, তামার হাতিয়ার ইত্যাদি তৈরি হয়ে থাকে, তাহলে তখনকার সমুদ্রতীরবর্তী কোন বন্দর পরবর্তীকালে 'তাম্র' নামের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে জড়িত হতে পারে।

প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে ঐতিহাসিক যুগ পর্যন্ত এই ধারাবাহিকতা মেদিনীপুরে অক্ষুণ্ণ আছে দেখা যায়। বৌদ্ধ ও জৈন যুগে তাম্রলিপ্তের ঐতিহাসিক ভূমিকার কথা অনেকেই জানেন। এখানে তার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। হিন্দু গুপ্তযুগে ফাহিয়ান্ প্রমুখ পর্যটকরা তাম্রলিপ্তিতে এসেছিলেন এবং তার বর্ণনাও লিপিবদ্ধ করে গেছেন। শশাঙ্ক ও হর্ষবর্ধনের রাজ্যও মেদিনীপুর ছাড়িয়ে গঞ্জাম পযন্ত বিস্তৃত ছিল। দাঁতনের সরশঙ্ক নামক বিশাল দীঘি, আজও নাকি স্থানীয় লোকের বিশ্বাস, রাজা শশাঙ্কের স্মৃতি বহন করছে। আশ্চর্য নয়। এই সময়েই বিখ্যাত চীনা পর্যটক হিউয়েন সাঙ তান-মো-লি-টি বা তাম্রলিপ্তিতে এসেছিলেন এবং সেখানে পঞ্চাশটি হিন্দু দেবালয় এবং দশটি বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম দেখেছিলেন। সপ্তম শতাব্দীর কথা। একাদশ শতাব্দীতে রাজেন্দ্রচোলদেব এবং দ্বাদশ শতাব্দীতে চোড়গঙ্গদেব দক্ষিণভারত থেকে বাংলাদেশে অভিযান করে দণ্ডভুক্তি (আধুনিক দাঁতন অঞ্চল) ও অপরমন্দার (আরামবাগের মান্দারণ অঞ্চল) পর্যন্ত আসেন। মেদিনীপুর গঙ্গরাজদের অধীন হয়। ভারতের মানচিত্রের দিকে চেয়ে দেখলে মেদিনীপুরের ভৌগোলিক অবস্থানের আর একটি বৈশিষ্ট্য নজরে পড়ে। দক্ষিণভারত ও উত্তরভারত দু'য়েরই সীমান্তে পশ্চিমবাংলায় মেদিনীপুরের স্থান। একদিকে দাক্ষিণাত্যের, অন্যদিকে আর্যাবর্তের সংস্কৃতিধারা এসে মিলিত হয়েছে বাংলাদেশে মেদিনীপুরের ভিতর দিয়ে। মেদিনীপুর দু'য়েরই

১ V. Ball : On the Ancient Copper Miners of Singhbhum : Proceedings A. S. *B.* 1869, P. 170-175

সীমান্ত জুড়ে রয়েছে, দুই সংস্কৃতিধারার ঘাতপ্রতিঘাতের অন্যতম প্রধান ক্ষেত্ররূপে।

পাঠান, মোগল ও বৃটিশযুগেও মেদিনীপুরের এই ঐতিহাসিক বিশেষত্ব অক্ষুণ্ণ ছিল দেখা যায়। সুদীর্ঘকালের এই ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতাই মেদিনীপুরের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে ঐতিহাসিক ও আধুনিক যুগ পর্যন্ত এই ধারাবাহিকতার নিদর্শন মেদিনীপুরের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে রয়েছে।

ঝাড়গ্রাম

মানভূম-সিংভূমের সীমান্ত ঘেঁষে, উত্তরে বাঁকুড়া থেকে দক্ষিণে মেদিনীপুর পর্যন্ত যে বিস্তৃত ভূখণ্ড, তার প্রাকৃতিক স্বাতন্ত্র্য যেমন লক্ষণীয়, ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্যও তেমনি উল্লেখযোগ্য। এই বিস্তৃত ভূখণ্ডের ইতিহাস যে প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রস্তরযুগ পর্যন্ত বিসর্পিত, তার নিদর্শন আমরা পেয়েছি। পূর্বে প্রমাণসহ তার পরিচয়ও দিয়েছি। অস্ট্রিকভাষী বিভিন্ন জাতির বাস ছিল এখানে এবং এখানকার সভ্যতার বনিয়াদ গঠনে তাদের দানও যথেষ্ট। দীর্ঘকাল এই অঞ্চলে এইসব নিষাদ (পৌরাণিক নাম) জাতির দলপতি বা সর্দাররা আঞ্চলিক আধিপত্য বিস্তার করে রাজত্ব করত। সেই অতীতের ইতিহাস আজ পুনরুদ্ধার করার উপায় নেই। পরবর্তীকালে বিষ্ণুপুরের মল্লরাজবংশ এই বিস্তৃত ভূখণ্ডে সর্বাধিক আধিপত্য বিস্তার করেন এবং এই মল্লবংশের নামেই এ অঞ্চলের নাম হয় মল্লভূম। কিন্তু সর্বাধিক আধিপত্য হলেও, কোনদিন কোন রাজবংশ এ-অঞ্চলের একচ্ছত্র শাসক হিসাবে (আধুনিক অর্থে) প্রতিষ্ঠা পাননি। তখনকার দিনে তা পাওয়া সম্ভব ছিল না। বিষ্ণুপুরের মল্লরাজবংশের অধীনে মল্লভূমের বিভিন্ন অঞ্চলে সর্দার-রাজাদের প্রতিপত্তি একরকম অক্ষুন্ন ছিল বললেও ভুল হয় না। হিন্দুযুগে মোটামুটি এই ব্যবস্থাই বজায় ছিল বলে মনে হয়। মুসলমান আমলে হয়ত (নিশ্চিত নয়) কোন কোন বাসচ্যুত বা উদ্বাস্তু রাজপুত বংশ এই জঙ্গলখণ্ডে এসে স্থানীয় সর্দার-রাজাদের কাছ থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে আঞ্চলিক আধিপত্য বিস্তার করেন। আবার কোন কোন সর্দার-রাজা ক্ষত্রিয়ত্বের মর্যাদা-লোভে ব্রাহ্মণ রাজপুরোহিত দিয়ে এক কাল্পনিক ক্ষত্রিয় রাজপুত আদিপুরুষ থেকে নিজেদের একটি পৃথক বংশলতা রচনা করিয়ে নেন। এমন হওয়াও বিচিত্র নয়। পরে রাজকীয় মর্যাদার জোরে প্রকৃত রাজপুত-ক্ষত্রিয়দের সঙ্গে এঁদের বৈবাহিক-সামাজিক আদান-প্রদান হওয়াও অস্বাভাবিক নয়। এইরকম কোন ঐতিহাসিক পটভূমি থেকেই ঝাড়গ্রাম জামবনি লালগড় রামগড় চন্দ্রকোণা বগড়ী প্রভৃতি রাজ্যের ছোট ছোট রাজবংশের ইতিবৃত্ত রচিত হওয়া সম্ভবপর।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল, এইসব স্থানীয় রাজবংশের প্রতিষ্ঠার কাহিনী-

গুলি। প্রতিষ্ঠা-কাহিনীর মধ্যে বিচিত্র সাদৃশ্য আছে দেখা যায়। সেই শ্রীক্ষেত্রে পুণ্যলোভাতুর হয়ে এদিকে আসা এবং ঘটনাচক্রে রাজ্যলোভাতুর হয়ে রাজ-তখ্‌তে বসা। সকলেরই সেই একই ইতিহাস। মনে হয় যেন, কোন এক সময়ে, স্থানীয় সর্দার-রাজারা একটি সভায় মিলিত হয়ে, নিজেদের এই রাজপুত-বংশধরের কাহিনী রচনা করার সিদ্ধান্ত করেছিলেন এবং রাজপোষ্য ঘটক ও পুরোহিতরা ভেবেচিন্তে সুন্দর একটি কিংবদন্তী রচনা করেছিলেন। তাছাড়া, এমন কাহিনীর সাদৃশ্য কি করে সম্ভব, ভাবা যায় না।

ঝাড়গ্রাম রাজবংশের যে ইতিবৃত্ত পাওয়া যায়, তাতে দেখা যায় যে, ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ফতেপুর সিক্রি অঞ্চল থেকে এঁদের পূর্বপুরুষ পুরীর জগন্নাথধামে তীর্থ করতে আসেন এবং দেশের আভ্যন্তরিক বিশৃঙ্খলার সুযোগ নিয়ে রাজ্য দখল করেন। রাজবংশের যে লিখিত বিবরণ আমি পেয়েছি তাতে সর্বেশ্বর মল্লদেব ১৫১৯ খৃষ্টাব্দে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন বলে উল্লেখ আছে। তার আগেই হয়ত তাঁরা স্থানীয় সর্দার-রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহ করে আধিপত্য কায়েম করেছিলেন। শোনা যায়, বিষ্ণুপুরের মল্লরাজাদের সঙ্গে ঝাড়গ্রাম-রাজ মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হন এবং উভয় রাজবংশের মধ্যে বৈবাহিক আদান-প্রদানও হয়। পরে এঁরা 'রাজা' ও 'উগালষণ্ডদেব' উপাধি পান। যে সময় ঝাড়গ্রাম-রাজারা তাঁদের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন, তখন শ্রীচৈতন্যের যুগ। উড়িষ্যার পশ্চিমদিকের পর্বত ও বনাকীর্ণ প্রদেশের ভিতর দিয়ে শ্রীচৈতন্য কাশীর দিকে যখন যাত্রা করেন, 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে' তখনকার সেই পথের বর্ণনা আছে :

প্রসিদ্ধ পথ ছাড়ি প্রভু উপপথে চলিলা।
কটক ডাহিনে করি বনে প্রবেশিলা॥
নির্জন বনে চলেন প্রভু কৃষ্ণনাম লৈয়া।
হস্তী ব্যাঘ্র পথ ছাড়ে প্রভুকে দেখিয়া॥
পালে পালে ব্যাঘ্র হস্তী গণ্ডার শূকরগণ।
তার মধ্যে আবেশে প্রভু করেন গমন॥…
ঝারিখণ্ডে স্থাবর জঙ্গম আছে যত।
কৃষ্ণনাম দিয়া কৈল প্রেমেতে উন্মত্ত॥
যেই গ্রাম দিয়া যান যাঁহা করেন স্থিতি।
সে সব গ্রামের লোকের হয় প্রেমভক্তি॥

মথুরা যাবার ছলে আসি ঝারিখণ্ড।
ভিল্লপ্রায় লোক তাঁহা পরম পাষণ্ড॥

উড়িষ্যা ও ময়ূরভঞ্জের বনপথ ও বন্যজাতির বর্ণনা যে তা পরিষ্কার বোঝা যায়। তার সংলগ্ন ঝারিখণ্ড বা ঝাড়গ্রামের বর্ণনাও আছে। প্রায় একটানা পার্বত্য ও গভীর অরণ্যপথ। ঝারিখণ্ডের 'পরম পাষণ্ড' যে ভিল্লপ্রায় লোকদের কথা চরিতকার বলেছেন, তারা মনে হয় ঝাড়গ্রাম অঞ্চলের শবর সাঁওতাল প্রভৃতি আদিবাসী। ষোড়শ শতাব্দীতে ঝারিখণ্ড বা ঝাড়গ্রামের এই রূপ ছিল, এখনও তার বিশেষ পরিবর্তন হয়নি, যদিও বন অনেক শূন্য ও খর্বাকৃতি হয়ে গেছে। এই 'পরম পাষণ্ড'দের পরাজিত করে যাঁরা এই মুল্লুকের রাজা হয়েছিলেন, তাঁরা যে পরে 'উগালষণ্ডদেব' বলে অভিহিত হবেন, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। 'উগালষণ্ডদেব' কথার অর্থ হল, উগালের বা আলবেষ্টিত (গড় ও প্রাচীর) দুর্গের ষণ্ডবিশেষ (Bull of the Fort) যিনি। নয়াবসান পরগণায় পুতিনার কাছে (ময়ূরভঞ্জ-রাজের জমিদারীর অন্তর্গত) উগালষণ্ডহাট নামে একটি হাট আছে এবং সেখানে উগালষণ্ডদেবের পূজাও করে লোকে। ঝারিখণ্ড বা ঝাডগ্রামের সীমানা কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, তা এর থেকে অনুমান করা যায়। ঝাড়গ্রাম-রাজের প্রভুত্বের সীমানা এককালে ময়ূরভঞ্জ ও উড়িষ্যা পর্যন্ত স্পর্শ করত বোঝা যায়।

মল্লভূম জঙ্গলমহল ও ঝাড়খণ্ড অঞ্চলে শৈব ও শাক্ত ধর্মের প্রাবল্য বেশি। বিষ্ণুপুরের মল্লরাজা বীর হাম্বীরের সময় থেকে রাজপোষকতায় বৈষ্ণব ধর্মের প্রসার ও প্রচার হলেও, এখানকার জনসংস্কৃতির মূল ধারায় কোন বিশেষ পরিবর্তন তার ফলে হয়েছে বলে মনে হয় না। স্থানীয় সর্দার-রাজারা যে মদ্যমাংসাদি দিয়ে নানারকম বনদেবতার পূজা করতেন, তা পরিষ্কার বোঝা যায়। এখনও সর্বত্র তার যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। পরে শৈব ও শাক্ত ধর্মের প্রসারের ফলে আদিবাসীদের বনদেবতার পূজা এবং শৈব ও শাক্ত পূজার মধ্যে অনুষ্ঠানাদির অনেক মিলন-মিশ্রণ হয়েছে। শৈব-শাক্ত ধর্মের প্রাবল্য প্রসঙ্গে বলা যায় যে, এই অঞ্চলে এই ধারার প্রচলন হয়েছে অনেক আগে থেকেই। পোখর্নাধিপতি চন্দ্রবর্মা (বাঁকুড়ার) বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। প্রয়াগ-প্রশস্তি অনুসারে সমুদ্রগুপ্ত যে চন্দ্রবর্মা রাজাকে উৎখাত করেছিলেন দেখা যায়, তিনি শুশুনিয়া-লিপি প্রোক্ত বাংলাদেশের এই অঞ্চলের রাজা চন্দ্রবর্মা

বলেই পণ্ডিতেরা এখন প্রায় সিদ্ধান্ত করেছেন। চন্দ্রবর্মাকে পরাজিত করেই সমুদ্রগুপ্ত বাংলাদেশে রাজ্য বিস্তার করেন। পশ্চিমবঙ্গ গুপ্ত রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, হুগলী (আরামবাগ, মহানাদ ইত্যাদি) প্রভৃতি অঞ্চলে গুপ্তযুগের অনেক মুদ্রা পাওয়া গেছে।[১] গুপ্ত রাজাদের আমলে বিষ্ণুপূজা, শিবপূজা, সূর্যপূজা ইত্যাদির প্রচলন বাড়ে। কর্ণসুবর্ণের (মুর্শিদাবাদ) রাজা শশাঙ্কের আমলে, সপ্তম শতাব্দীতে, মেদিনীপুর তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কঙ্গোদরাজের সপ্তম শতাব্দীর (৬১৯ খৃষ্টাব্দ) একটি লিপিতে শশাঙ্কের প্রতিপত্তির সীমানার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কঙ্গোদরাজ শ্রীমাধব ছিলেন শশাঙ্কের অধীন সামন্ত। উড়িষ্যার চিল্কা হ্রদ ও গঞ্জাম প্রদেশ এই কঙ্গোদরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরিষ্কার বোঝা যায়, শশাঙ্ক উড়িষ্যার গঞ্জাম পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেছিলেন।

But whatever may be the extent of his rule in Bengal, Sasanka's dominions probably included Magadha from the very beginning, and he soon felt powerful enough to follow an aggressive foreign policy. He extended his suzerainty as far south as the Chilka Lake in Orissa..... and probably extended south to the Ganjam district. (History of Bengal: Dac. Univ : Vol. 1, P. 60).

মেদিনীপুরের দাঁতন অঞ্চলের শশাঙ্কের স্মৃতিবিজড়িত বিশাল দীঘিগুলি 'ঐতিহাসিক' হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। সরশঙ্ক দীঘির নামের সঙ্গে শশাঙ্কের নামের সাদৃশ্য লোককল্পিত নাও হতে পারে। এই অঞ্চলের শিবের একাধিপত্যও বিশেষ লক্ষণীয়। শশাঙ্ক পরম শৈব ছিলেন। তাঁর মুদ্রায় সেইজন্য বৃষভবাহন মহাদেবের মূর্তি দেখতে পাওয়া যায়। মেদিনীপুরের এইসব অঞ্চলে যেখানে শৈবধর্মের প্রাধান্য দেখা যায়, তার প্রাচীনতা অনেক ক্ষেত্রে শশাঙ্কের আমল ও গুপ্তযুগ পর্যন্ত টানা যেতে পারে।

ঝাড়গ্রাম রাজাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হলেন সাবিত্রী দেবী। শাক্ত দেবী যে বলাই বাহুল্য। সাবিত্রী দেবীর বর্তমান মন্দিরটি আধুনিক কালে তৈরি, কিন্তু

১ এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নাল, ১৮৮১, ১৮৮৪, ১৮৮৯ এবং প্রসিডিংস ১৮৮২, ১৮৯৩ দ্রষ্টব্য।

তার অনেক আগে থেকেই সাবিত্রী দেবীর পূজা হয়ে আসছে। সাবিত্রী দেবীর মন্দিরের মধ্যে ঝাড়গ্রাম থেকে পাওয়া কয়েকটি পাথরের দেবমূর্তি আছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল :

১। চতুর্মুখ লিঙ্গমূর্তি। একটি প্রায় নিখুঁত অবস্থায় আছে, আর একটি ভাঙা।

২। একটি সর্পফণার ছত্রসহ দ্বাদশভুজা মূর্তি—মনে হয় লোকেশ্বর বিষ্ণুমূর্তি। মূর্তিটির নিম্নার্ধ ভাঙা।

৩। একটি ছোট মনসামূর্তি, কোলে শিশুসহ।

মূর্তিগুলির বিবরণ এর আগে কোথাও প্রকাশিত হয়েছে বলে আমার জানা নেই। কিন্তু মূর্তিগুলির গুরুত্ব যে ইতিহাসের দিক থেকে কতখানি, তা মূর্তিতত্ত্ববিদ্‌রা বুঝতে পারবেন। পাথরের চতুর্মুখ লিঙ্গমূর্তি বাংলাদেশে সুদুর্লভ বললেও ভুল হয় না। দ্বাদশভুজা লোকেশ্বর মূর্তিও, যতদূর জানি, সহজলভ্য নয় এবং আজ পর্যন্ত খুব বেশি পাওয়াও যায়নি।

বাংলাদেশে চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তি ও সাধারণ লিঙ্গমূর্তি শিবের প্রাচুর্য দেখা যায় :

...representations of the standing four-armed Vishnu and the phallic emblem of Siva were more popular than any other image, whether of the orthodox or of the heterodox-pantheons... (R. D. Banerjee : Eastern Indian School of Mediæval Sculpture, P. 101)

রাখালদাসবাবু ঠিকই বলেছেন। মুখলিঙ্গমূর্তি কম পাওয়া যায়, তার মধ্যে যাও বা পাওয়া গেছে তাতে একমুখলিঙ্গমূর্তিই বেশি দেখা যায়।

Of the stone mukhalingas discovered in Bengal, the ekamukha variety is the commonest one (History of Bengal : Dac. Univ. : Vol. 1, P.441).

পাথরের চতুর্মুখ লিঙ্গমূর্তি অত্যন্ত দুর্লভ। ঝাড়গ্রামের দুটি মুখলিঙ্গ মূর্তিই চতুর্মুখলিঙ্গ এবং একটি এখনও নিখুঁত রয়েছে। সঠিক না বলা গেলেও মনে হয় এগুলি গুপ্তযুগের মুখলিঙ্গ মূর্তি। কারণ রাখালদাসবাবুর মতে :

The use of natural lingas appears to have ceased before the beginning of the Gupta period proper,

because all Lingas which can be definitely assigned to the Gupta period are either plain shafts or Eka-mukha and Caturmukha Lingas. (R. D. Banerjee : The Age of the Imperial Guptas, P. 125).

পালযুগেরও চতুর্মুখলিঙ্গমূর্তি পাওয়া গেছে। পাহাড়পুরের মৃৎফলক চিত্রে একটি পাওয়া গেছে, একমুখ ভাঙা। উত্তরবঙ্গের অনেক জায়গা থেকে চারদিকে চারটি উপবিষ্ট শক্তিমূর্তিসহ লিঙ্গমূর্তি পাওয়া গেছে। একটি ব্রোঞ্জের চতুর্মুখলিঙ্গমূর্তি মুর্শিদাবাদ থেকে পাওয়া গেছে, দশম একাদশ শতাব্দীর। পাথরের মূর্তি নেই বললেই হয়। ঝাড়গ্রামের চতুর্মুখ মূর্তি পালযুগের হওয়াও সম্ভব। খোদিত লিপি ভিন্ন কোন মূর্তির সঠিক তারিখ বলা কারও দ্বারা সম্ভব নয়, অনুমান করা যায় মাত্র। তাহলেও ঝাড়গ্রামের এই চতুর্মুখলিঙ্গমূর্তিগুলি যে খুবই প্রাচীন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এ-অঞ্চলে শৈবধর্মের প্রাধান্যের প্রাচীন ইতিহাসের লুপ্ত ধারার ইঙ্গিত এই মূর্তিগুলি থেকে পাওয়া যায়। ঝাড়গ্রামে নিষাদ-সংস্কৃতির মূল প্রবাহে যে বৌদ্ধ ও হিন্দু যুগ থেকে বিভিন্ন সংস্কৃতিধারা আলোড়ন সৃষ্টি করেছে, তাও বেশ বোঝা যায়। সেই ঘাতপ্রতিঘাতের ফলে নিষাদ, বৌদ্ধ ও হিন্দু সংস্কৃতির মধ্যে যে লেনদেন হয়েছে, তার ইতিহাসও চমকপ্রদ। ঝাড়গ্রামে সেই সব সাংস্কৃতিক নিদর্শনেরও অভাব নেই।

ঝাড়গ্রামের উৎসব-পার্বণ

মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম অঞ্চল বিচিত্র সব উৎসব-পার্বণের গিরিনির্ঝর বিশেষ। পশ্চিমবঙ্গের উত্তর সীমানা জুড়ে এই সব উৎসবগুলির প্রচলন বেশি দেখা যায়। বিশেষ বিশেষ উৎসবের এই ধরনের আঞ্চলিক আধিপত্যের নির্দিষ্ট কারণ থাকে। সাংস্কৃতিক উপাদানের প্রসার সম্বন্ধে যাঁরা অনুসন্ধান করেন, তাঁরা জানেন যে, উৎসবের আঞ্চলিক আধিপত্য থেকে সাধারণত সাংস্কৃতিক উৎসের হদিশ পাওয়া যায়। 'কালচার-ট্রেটের' 'ডিস্ট্রিবিউশন' অনুশীলন করলে এবং তার 'ডিফিউজানের' ধারাপথগুলি খুঁজে বার করলে, অনেক সময় উৎস-সন্ধানে কৃতকার্য হওয়া যায়। ইন্দ্রধ্বজের উৎসব, টুসু ভাদু প্রভৃতি উৎসবের প্রচলন ও প্রসার সম্বন্ধেও এই ধরনের কথা বলা যায়।

সাঁওতালদের মধ্যে সোহরায় পরব হচ্ছে সবচেয়ে বড় পর্ব। সোহরায়কে শস্য-উৎসবের মহানন্দময় পরিসমাপ্তির উৎসব বা পরিপূর্ণতার উৎসব বলা যায়। আষাঢ় মাসের 'এরঃ কি সিম্' হল বছরের প্রথম উৎসব, বীজ বপনের উৎসব। বীজ লাগানো শেষ করে শ্রাবণ মাসে সবুজ রঙের মুর্গী পূজা দিতে হয়, ধান যাতে সবুজ হয় সেই জন্যে। কি চমৎকার কল্পনা ও কামনার সংমিশ্রণ! পূজার মন্ত্র হল :

নে তবে এরঃ ক সিম এ্তুমতে এমাম চালাম কানা,
মিৎ ঠেনলে এরা, গেল বার ঠেন কানাইয়ঃ মুনাইয়ঃ মা।
জারগে দাঃ জুগি দাঃ ক হোত্র আগু
চাপে আগুই মার নিয়া আতোরে মনোহরে
তুকাঃ ক পাপাঃ ক রগ বিঘিনাঃ।

অর্থ হল : "এই যে আমরা বীজ বুনবার নামে দিচ্ছি, এক জায়গায় বুনলে যেন দশ জায়গায় হয়। জল যেন প্রচুর হয়। বৃষ্টির জলে যেন ভরিয়ে দেয়, ভাসিয়ে নিয়ে যায়, গ্রামের মধ্যে যত দুঃখের ও পাপের অসুখ-বিসুখ আছে সব।" তারপর অগ্রহায়ণ মাসে জানথাড় পুজো হয়। গ্রামের লোক শূয়োর কিংবা ভেড়া বলি দেয়, তাকে জানথাড় বলি বলে। প্রার্থনা হল : "হে বাপু

ঠাকুর! ধানচালের যেন শোধ বাড়ে, জমিতে যেন খামার তৈরি করতে পারি। ইঁদুর ইত্যাদি যারা ক্ষেতের ধান নষ্ট করবে, হে ঠাকুর, তাদের তাড়িয়ে দেবেন।" এরপর নায়েক নতুন ধানের পুজো করবে এবং গ্রামের লোক ঘরে ঘরে ধান 'নাওয়াই' (বনাম) করবে।

পৌষ মাসে ধান কাটা-ঝাড়ার পর হবে সোহরায় পরব, সাঁওতালদের সবচেয়ে বড় পরব এবং বাংলার লোকসাধারণেরও। আমরা বলি পৌষালি, পৌষ-পার্বণ। কয়েকদিন ধরে বিরাট উৎসব, বিবিধ তার অনুষ্ঠান। তার মধ্যে গো-উৎসবটি বিশেষ লক্ষণীয়। গান হয়:

কো নাহি সিরিজালা
বোমা পিরথিমা হো,
কো নাহি সিরিজালা
গাইয়া যো য়ো রে;

কে সৃষ্টি করেছে এই পৃথিবী? কে-ই বা সৃষ্টি করেছে গরু?

ঠাকুরাহি সিরিজালা
বোমা পিরিথিমা হো;
ঠাকুরাহি সিরিজালা
গাইয়া যো য়ো রে;

গরু খেদিয়ে নিয়ে আসে চালের গুড়ি দিয়ে গোলঘেরা 'খণ্ডের' কাছে। খণ্ডের ভিতরের ডিম গরু মাড়িয়ে দিলে বা শুঁকলে, গরুর পা ধুইয়ে, শিঙে তেল মাখিয়ে সিঁদুর দেওয়া হয়। তারপর নাগরা, মাদল বাজাতে বাজাতে তারা ঘরে যায়। নায়কে ও মাঝিরা তাদের হাড়িয়া খাওয়ায়। সন্ধ্যা হলে বুড়ো-বুড়ীরা যখন ঘুমিয়ে পড়ে, তখন যুবকরা গরু জাগায়, গোয়ালঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে মাদল বাজায় আর গান গায়:

গাইয়িনী আওয়ে বেরেনা ডুবায়েতে,
মাহিসিনি আওয়ে আধা রাতা যো য়ো রে,
মাহিসিনি আওয়ে আধা রাতা যো—

গরু ফিরে আসে সূর্য অস্ত যাবার আগে, মহিষ ফিরে আসে আধা রাতে। এই রকম সব গান গেয়ে গেয়ে ঘরে ঘরে যায় তারা, মাদল বাজায়, বাঁশি বাজায়, পথে পথে অশ্লীল সব কথা বলে। ঘরে যারা থাকে তারা যেন শুনেও

শোনে না। তারপর মেয়েরা গরু বরণ করে। দুর্বাঘাস, আতপচাল, ধান ইত্যাদি গরুর দিকে আর গোয়ালের দিকে ছড়াতে ছড়াতে গান গায়—

হাতে লেলা আওয়া চাল,
গোছা লেলা পাকাল পান,
চালি বেলা আমকি দেবী
গাইয়ে চুম্বাই।

হাতে নিল আতপ চাল, কোঁচড়ে নিল পাকাল পান, চল আমকি দেবী গরু চুম্বাই। এইভাবে উৎসব চলতে থাকে। গরু-খেলানো হয়। গরুগুলিকে খুঁটিতে বেঁধে শিঙ দিয়ে গুঁতোগুঁতির খেলা। অতঃপর মাঝির ঘরে দেশ-কুটুমদের অভ্যর্থনার জন্যে খাট, পিঁড়ি, মাচি পেতে দেওয়া হয়। জগ মাঝি গ্রামের ছেলেদের বলে : যাও, কুটুমদের হাড়িয়া দাও, দুই খলা করে ভাল, দুই খলা করে চটকান, আর এক মুঠো করে চিড়ে-মুড়ি সকলকে দাও। গান গাওয়া হয় :

ডুডু ডুডুসোনায়াতে
আয়েলে হো সাঙ্গা ভাইয়া
বাইসা হে সোনেরে পালাকে ;
কিছুই নাহি করালা হো,
সাঙ্গা ভাইয়া, মাঁহিতে মরি।

ডুডু ডুডু বাজনা শুনে, সাঙ্গা (বন্ধু) ভাই, তুমি যখন এলে, তখন বস সোনার পালঙ্কে। কিছুই করিনি সাঙ্গা ভাই, তোমাদের কিছুই অভ্যর্থনা করতে পারিনি, লজ্জায় মরে যাই।

একার ছিলিম তামাকুর
খায়েলে হো সাঙ্গা ভাই,
বড়োরে বেওহাররে ;
একার ঘুটি পানিয়ো পিলে হো,
সাঙ্গা ভাই বড়োরে সুলাং।

একছিলিম তামাক খেয়ে নাও হে সাঙ্গা ভাই, সেইটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় সম্মান। একঘটি জল খেয়ে নাও হে সাঙ্গা ভাই, সেইটাই হল বড় আনন্দ। এইভাবে বিচিত্র উৎসবের ফোয়ারা ছুটতে থাকে।

সাঁওতালী উৎসব কিভাবে ঝাড়গ্রামের সমস্ত লোকোৎসবের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করেছে, তার অন্যতম দৃষ্টান্ত ঝাড়গ্রামের বিখ্যাত বাঁধ্‌না পরব। কালীপুজোর পরদিন থেকে তিনচারদিন ধরে এই উৎসব হয়। প্রধানত মাহাতো শ্রেণীর মধ্যে প্রচলিত। বাঁধ্‌না-পরবের প্রথম দিনে গোঠপূজা হয়। কোন ফাঁকা মাঠের একটি স্থান পরিষ্কার করে নিয়ে পুজোর আয়োজন করা হয়। গ্রামের গরুর সমাবেশ হয় সেখানে। গরুর পায়ে ডিমভাঙার ব্যাপার এখানেও হয়। তাতে গোধন বাড়ে, বাঘের উপদ্রব থাকে না, এই রকম বিশ্বাস সকলের। গোজাগরণ পর্ব চলে। ধামসা ও ঢোলের বাদ্যসহ পাড়ায় পাড়ায় গান গেয়ে ঘুরে বেড়ানো হয়। দ্বিতীয় দিন হয় গোপূজা। তৃতীয় দিন্ হয় আনন্দের অনুষ্ঠান। গরু-খেলানো হয়, হাড়িয়াও খাওয়া হয়। অবিরাম ঢোল ধামসা বাজিয়ে গরুকে উত্তেজিত করা হয় লড়াই করতে। গান গাওয়া হয় :

রিমি ঝিমি রিমি ঝিমি পানিয়া বরষিল
আঙ্গিনাতো কাদা প'ড় গেল
ধীরে চল ধীরে চল শিরমণি গেইয়া—
—ইত্যাদি।

পৌষসংক্রান্তিতে ঝাড়গ্রাম অঞ্চলের টুসু উৎসবও খুব বিখ্যাত। কয়েক-দিন আগে থেকেই উৎসবটি আরম্ভ হয়। সংক্রান্তির দিন মেয়েপুরুষ সকলে মিলে মকর স্নান করে। টুসুর গানগুলি মেয়েপুরুষ সমবেতভাবে, অথবা আলাদাও গাওয়া হয়। সারারাত ধরে সকলে গান করে। গানের একটি নমুনা দিচ্ছি :

টুসুর কাছে আলো জ্বলে
দেখায় লো কালো কালো।
বিষ্ণুপুরে টুসু আমার
খুঁজে গো ঝাড়ের আলো॥
মেদিনীপুরে দেখে আইলাম
সোনার টুসু যায় চলে।
হায়রে হাতে নাইরে পয়সা
লিতম টুসু দর করে॥

ওরে ওরে ও চৌকিদার,
কোন কুলিতে হাঁক দিলি।
আমার পাড়ায় টুসু চুরি,
কোন্‌খানেতে ঘুমিয়েছিলি ॥
—ইত্যাদি ॥

টুসু উৎসবের আধিপত্য একটা বিশেষ অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ দেখা যায়। মানভূম থেকে আরম্ভ করে, তার সংলগ্ন বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর অঞ্চলেই টুসু উৎসবের সমারোহ বেশি। এই আঞ্চলিক সীমাবদ্ধতা থেকে এই উৎসবের উৎস-কেন্দ্রের হদিশ পাওয়া যেতে পারে।

এই রকম আরও নানারকমের উৎসব-পার্বণের অনুষ্ঠান দেখা যায় ঝাড়গ্রাম অঞ্চলে। উৎসবের গানগুলি যারা রচনা করে তারা শহরের সৌখিন কবি নয়। অধিকাংশই সাধারণ গ্রামের কৃষক। মুখে মুখে সুর যোজনা করে গান রচিত হয়, উৎসবে-পার্বণে গাওয়া হয়, তারপর উৎসবান্তে হয়ত গানটিও লুপ্ত হয়ে যায়। আবার নতুন গান রচিত হয় নতুন বছরের উৎসবের সময়। প্রধানত উৎসবের আনন্দের জন্য গানগুলি রচিত হলেও, কৃষক কবিদের রচিত এইসব গানের মধ্যে তাদের নিজেদের জীবনের দুঃখকষ্ট অভাব-অভিযোগ ও বেদনার কথা অনেক সময় যেন অজ্ঞাতসারেই মূর্ত হয়ে ওঠে। উৎসবের আনন্দের নৃত্যগীতানুষ্ঠানের মধ্যে গানের কথাগুলি যেন বেদনায় হীরকখণ্ডের মতন ঝল্‌সিয়ে ওঠে এবং শ্রোতার কানের ভিতর দিয়ে মর্মে পৌছায়। যেমন ভাওয়াইয়া গান—

ও ভাই মোর ভাওয়ালিয়া রে—
চতুর্দিকে জলে সুরজ বাতি
তোমার কেনে বল আঁধার রাতি হে,
হায় হায়, পরাণ বোঝা কতদিন বইবেন ভাই
ও ভাই মোর ভাওয়ালিয়া রে—
ওরে বালুতিতি পঙ্খী কাঁদে হে
নিজের আহার খুঁজিবারে রে—
ওরে একবেলা তোমার অনু (অন্ন) জোটে হে
পিন্দনো তোমার কাপড় কোণ্ঠে রে

হায় হায়, খালি পরিতেন লেংটি সব সার
ভাই মোর, ভাওয়ালিয়া রে॥

সাধারণত বিজয়াদশমীর দিন কাঠিনৃত্যের সঙ্গে এই রকম সব গান গাওয়া হয়। উৎসবের আনন্দস্রোতের মধ্যেও অন্তঃসলিলার মতন সাধারণ দরিদ্র কৃষকদের জীবনের বেদনার প্রবাহ বইতে থাকে। উৎসব ম্লান করা তার উদ্দেশ্য নয়, মনে হয় যেন সাধারণ মানুষের মনের বেদনা এইভাবে উৎসর্গ করেই উৎসব সার্থক করা হয়।

ইন্দ্রধ্বজের উৎসব হল ঝাড়গ্রামের আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য উৎসব। এখন ম্লান হয়ে এসেছে। ধ্বজ-উৎসব বহুকালের প্রাচীন উৎসব। মানভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর অঞ্চলে প্রধানত এই উৎসবের প্রাবল্য দেখা যায়। অবশ্য বাংলাদেশের মধ্যে। বাংলার বাইরেও অনেক রাজারা এই উৎসব করতেন বা করেন। কলাইকুণ্ডার রাজারা এক সময় এই উৎসব মহাসমারোহে করতেন। নাড়াজোলের রাজারাও করতেন। ঝাড়গ্রামের রাজাদেরও এটি প্রধান উৎসব। বিষ্ণুপুরের রাজাদের ইঁদ-উৎসবের বর্ণনা বিষ্ণুপুর-প্রসঙ্গে আগে করেছি। মানভূমের পঞ্চকোটের রাজারাও এই উৎসব করতেন। ময়দানে ৪০।৫০ হাত দীর্ঘ একটি শালগাছ প্রোথিত করে তার মাথায় ইন্দ্রছত্র নামে একটি বাঁশের ছাতা নতুন কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। তাতে খই, দই বর্ষণ করা হয়। প্রজারা (প্রধানত এ অঞ্চলের সাঁওতালরা) নাগরা-মাদল বাজিয়ে নাচগান করে। রাজার উৎসবে আনন্দ করে প্রজারা। বিষ্ণুপুরে পঞ্চকোটে যেমন, ঝাড়গ্রামেও তেমনি। ঝাড়গ্রামের অনেক জায়গায় ইঁদকুড়ির ময়দানে প্রোথিত শালগাছ দেখেছি। বোঝা যায়, ইন্দ্রধ্বজের উৎসব বেশ ব্যাপকভাবেই এই অঞ্চলে হয়। একসময় ঝাড়গ্রামের রাজারা সকল সমাগত প্রজাকে এই উৎসবের দিন খাবার ইত্যাদি দিয়ে আপ্যায়নও করতেন। এখন রাজার যুগ চলে গেছে, সুতরাং রাজার উৎসবের সমারোহও আর নেই। প্রথা অনুযায়ী উৎসব হয়, এই পর্যন্ত। কিন্তু উৎসবের তাৎপর্য কি?

পৌরাণিক কাহিনী হল—অসুরদের সঙ্গে রণে পরাজিত হয়ে দেবরাজ ইন্দ্র ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন। বিষ্ণু প্রীত হয়ে ইন্দ্রকে মাল্যছত্র-ঘণ্টাদিযুক্ত, শরৎসূর্যপ্রতিম, দেদীপ্যমান এক দিব্য ধ্বজ প্রদান করেন। ইন্দ্র সেই ধ্বজ নিয়ে অসুরযুদ্ধে জয়লাভ করেন। অনন্তর ইন্দ্র সেই বেণুময় ধ্বজ

চেদীপতিকে দান করেন। চেদীপতি যথাবিধানে ধ্বজ পূজা করায় প্রীত হয়ে দেবরাজ আদেশ করেন—"যে রাজা এই রকম ধ্বজপূজা করবে, তার ধনবল শস্য বৃদ্ধি হবে এবং সর্বকার্যে সে সিদ্ধিলাভ করবে।" বৈদিক যুগ থেকেই এই পূজার প্রচলন হয়েছে বলে মনে হয়। আর্যরা যখন যুদ্ধে অনার্যদের পরাজিত করেছেন, রাজা হয়েছেন, তখন এইভাবে তাঁরা বিজয়োৎসব পালনের রীতি প্রচলিত করেছেন। যুদ্ধে যে অনার্যদের সহজে তাঁরা সর্বত্র পরাজিত করতে পারেননি তার আভাস সুস্পষ্টভাবে পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যেই রয়েছে। অনার্যরা জঙ্গলে বাস করত অনেকে এবং জঙ্গলের বড় বড় গাছও পুজো করত। সেই অনার্য বৃক্ষোৎসবকেই রাজকীয় অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে কি আর্যরা এই ধ্বজ-উৎসবে পরিণত বা রূপান্তরিত করেছেন? ইন্দ্র দেবতাদের রাজা এবং ছত্র হল রাজকীয় প্রতীকচিহ্ন। শালবৃক্ষকে তাই ঐভাবে সাজিয়ে ইন্দ্রধ্বজ তৈরি করা হয় এবং রাজকীয় প্রতীকসহ তা রাজ-উৎসবে পরিণত হয়। উৎসবের নামও তাই ইন্দ্রধ্বজের উৎসব। মানভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর অঞ্চলে এই উৎসবের প্রাধান্যের প্রধান কারণ, এ-অঞ্চলের ইতিহাসও অনেকটা তাই। অরণ্যময় আদিবাসীপ্রধান এই অঞ্চলে রাজ-সিংহাসন দখল করার কাহিনী অথবা রাজা হওয়ার কাহিনীর মধ্যে পৌরাণিক দেবাসুরের কাহিনীর ছবিটি স্পষ্ট ভেসে ওঠে। স্থানীয় 'অসুর' বা আদিবাসীদের পরাজিত করে বিভিন্ন রাজবংশ যখন এই অঞ্চলে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছেন, অথবা কোন জাতির বিশেষ কোন গোত্র বা শাখা রাজত্ব কায়েম করেছে, তখন বিজয়োৎসবরূপে এই ইন্দ্রধ্বজের .উৎসবের প্রচলন হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম সীমান্তের এই ইন্দ্রধ্বজ উৎসবের মধ্যে প্রাচীন ইতিহাসের এক অবলুপ্ত সংঘাত-পর্বের এই পরিচয় পাওয়া যায়।

চিল্‌কিগড়

শালবন আর সাঁওতাল পল্লীর ভিতর দিয়ে ঝাড়গ্রাম থেকে মাইল ছয় সাত পশ্চিমে গেলে জামবনি পৌঁছানো যায়। জামবনির রাজবংশের গড়ের নামই হল চিল্‌কিগড়। সামনেই দলুং নদী (বা ডুলং) পার হয়ে যেতে হয়। এই দলুং নদীর উপত্যকার অনেকটা অংশ জুড়ে জামবনির রাজাদের রাজ্য বিস্তৃত। পাহাড়ী নদীর মতন সুন্দর আঁকাবাঁকা গতিতে রাজবাড়ির পুবদিক কতকটা গড়ের মতন বেষ্টন করে দলুং নদী বয়ে গেছে। দলুং নদীর পশ্চিমে রাজবাড়ি, পুবে নদীর উপর গভীর জঙ্গলের মধ্যে কনকদুর্গার মন্দির। জঙ্গল চারিদিকে বললেও ভুল হয় না। জঙ্গল হাসিল করে দলুং নদী বেষ্টিত এই স্থানে যে একদিন চিল্‌কিগড় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তা আজও জামবনির প্রাকৃতিক পরিপার্শ্ব দেখলে পরিষ্কার বোঝা যায়।

শালবনের ভিতর দিয়ে গ্রাম্য মেঠো পথ ছেড়ে চিল্‌কিগড়ের সামনে পৌঁছলে মনে হয় যেন বনেরই কোন রাজা নির্জন এই চিল্‌কিগড় থেকে চারিদিকের জঙ্গল মহলে তাঁর রাজদণ্ড পরিচালনা করেন। কিন্তু জামবনির রাজারা কি এই বনাঞ্চলেরই স্থানীয় রাজা? অর্থাৎ এখানকার আদি বন-বাসীদের কোন সর্দার রাজা? রাজারা তা বলেন না। তাঁদের রাজবংশলতার মধ্যেও সেকথা কোনখানে লেখাজোখা নেই। রাজারা বলেন (এদিককার অন্যান্য আরও অনেক রাজার মতন) যে, তাঁরা বিদেশ থেকে এদেশে এসে-ছিলেন এবং রাজ্যলোভে নয়, পুণ্যলোভে; কিংবদন্তীর সত্যই কেরামতি আছে। এইটুকু বোঝা যায়, কোন এক ব্যক্তির একটি মস্তিস্ক থেকেই এই কিংবদন্তীর কথিকাটি রচিত হয়েছিল। শ্রীক্ষেত্রে পুণ্যার্থে আসা এবং অতঃপর পুণ্য কামনা পরিত্যাগ করে রাজ্যলোভে রাজা হয়ে বসা। দুটি কিংবদন্তীর বিচিত্র প্রতিপত্তি দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গে। একটি শিবের উৎপত্তি সম্বন্ধে, দ্বিতীয়টি রাজবংশের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে। গোপের গাইগরুর দুধ উবে যাওয়ার সঙ্গে শিবের আবিষ্কার ও প্রতিষ্ঠা একটি, আর একটি শ্রীক্ষেত্রে পুণ্য করতে এসে ঘটনাচক্রে রাজতখ্‌তে বসা। কোন্ কুশলী কথাশিল্পী, আরও অনেক লোককথার মতন, এমন সুন্দর কিংবদন্তী রচনা করেছিলেন, তা আজ আর

জানবার কোন উপায় নাই। না থাকলেও, এই জাতীয় কিংবদন্তীর যে কোন একটা ঐতিহাসিক মূল কোথাও আছে বলে মনে হয় এবং শিব থেকে রাজা পর্যন্ত সকলেই যখন একই ধরনের কিংবদন্তীর সাহায্যে আত্ম-প্রতিষ্ঠার সুযোগ পেয়েছেন, তখন মনে হয় তাঁদের প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে এমন কোন বাস্তব ইতিহাস আছে যা ঢেকে রাখার জন্য কিংবদন্তীরূপ খোলসের আশ্রয় নিতে হয়েছে।

যাই হোক্, চিল্‌কিগড় বা জামবনির রাজারা হলেন ধলভূমের রাজবংশেরই একটি শাখা। সিংভূম জেলার পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বাংশ এবং মেদিনীপুর জেলার পশ্চিমাংশ নিয়ে ধলভূম পরগণা। ধলভূমে নাকি ধল রাজারা রাজত্ব করতেন আগে এবং শোনা যায়, তাঁরা নাকি রজক ছিলেন বলে 'ধবল' উপাধি পেয়েছিলেন। এও লোককল্পনা ছাড়া কিছু নয়। সেই কল্পিত ধবল রাজাদের পরাজিত করে বর্তমান ধলভূম রাজবংশের আদিপুরুষ তাঁর রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি ধল রাজাদের পরাজিত করেছিলেন বলে 'ধবলদেব' উপাধি পান। এঁরা প্রায় সাতাশ-আটাশ পুরুষ ধরে রাজত্ব করছেন, রাজবংশের কুলপঞ্জীতে দেখা যায়। অর্থাৎ প্রায় ৭০০ বৎসর এঁদের রাজত্বের ইতিহাস। তাই যদি হয়, তাহলে হিন্দু সেনরাজাদের আমলে এই ধলভূমের রাজারা রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন বলতে হয়। কিন্তু রাজকুলপঞ্জী ছাড়া তার অন্য কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। ধলভূমরাজের অধস্তন বিংশপুরুষ রাজা জগন্নাথ ধবলদেব জামবনির তদানীন্তন রাজা গোপীনাথ সিংহের কন্যাকে বিবাহ করেন। গোপীনাথ অপুত্রক বলে তাঁর দৌহিত্র (জগন্নাথ ধবলদেবের পুত্র) কমলাকান্ত জামবনির রাজ্য লাভ করেন। এই কমলাকান্তের বংশধররাই জামবনির রাজবংশ। কিন্তু ধলভূমের ধলরাই বা কারা এবং জামবনির সিংহরাই বা কারা তার কোন ইঙ্গিত পর্যন্ত নেই কোথাও। আমাদের মনে হয়, জঙ্গলমহলের বিভিন্ন অঞ্চলে স্থানীয় আদিবাসীদের সর্দার রাজারাই রাজত্ব করতেন। পরে তাঁদের মধ্যে হয়ত কেউ কেউ বহিরাগতদের দ্বারা উৎখাত হয়েছেন এবং কেউ কেউ তথাকথিত ক্ষত্রিয়ত্বের মর্যাদালোভে 'সিংহ' ইত্যাদি উপাধি ধারণা করে, নতুন কুলপঞ্জী রচনা করিয়ে গোত্রান্তরিত হয়েছেন। মর্যাদামোহে এরকম গোত্রান্তরের ইতিহাস বাংলার সমাজের সমস্ত স্তরেই দেখা যায়, রাজকীয় স্তরে দেখা যাওয়া খুবই স্বাভাবিক।

জামবনির রাজা কমলাকান্তের পুত্র মানগোবিন্দ। মানগোবিন্দের দুই পুত্র হরিহর ও মধুসূদন। হরিহরের দুই পুত্র পূর্ণচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্র। এই ঈশ্বরচন্দ্রের নাবালক অবস্থায়, ১৮৬২ সাল থেকে ১৮৮১ সাল পর্যন্ত, জামবনির জমিদারী কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের হাতে যায়। তার আগে ইংরেজ আমলের গোড়া থেকেই জঙ্গলমহলের অন্যান্য সামন্ত রাজাদের মতন, জামবনির রাজারাও, নিজেদের স্বাধীন সত্তা বজায় রাখার জন্য স্থানীয় বিদ্রোহাদিতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য করেছিলেন। খুব সংক্ষিপ্ত হলেও এবং তার শেষ পরিণতি করুণ হলেও, এই সব সামন্ত রাজাদের এই ইতিহাসটুকুই গৌরবের। ১৭৬০ সালে মীরকাশিম নবাব-নাজিমের সিংহাসনে বসে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে যখন পূর্ববঙ্গের চট্টগ্রামসহ পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান ও মেদিনীপুর জেলা দান করেন, তার কিছুদিন পর থেকেই পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম-সীমান্তের সারা জঙ্গলমহল জুড়ে বিদ্রোহের বহ্নি ধূমায়িত হতে থাকে। সেই ধূমায়িত বহ্নি বনাগ্নির মতন জনবিদ্রোহে প্রজ্জলিত হয়ে ওঠে, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে। প্রধানত স্থানীয় আদিবাসীদের গণবিদ্রোহ বলে ইংরেজরা এর নাম দেন 'চুয়াড় বিদ্রোহ'। জংলী ও বন্য যারা, রূঢ়স্বভাব যারা, তাদের 'ভদ্রসমাজের' ভাষায় 'চোয়াড়' বা চুয়াড় বলা হয়। এই চুয়াড় বিদ্রোহই ইংরেজের বিরুদ্ধে প্রথম গণবিদ্রোহ এবং বাংলার পশ্চিমসীমান্তই সেই বিদ্রোহের ক্ষেত্র। স্বদেশপ্রেম বা জাতীয়তা যাই বলা হোক না কেন তাকে পরবর্তীকালে, তার জন্মভূমি বাংলাদেশের জঙ্গলমহল। বর্তমান যুগের জাতীয়তার জন্মভূমির মধ্যে মেদিনীপুরও অন্যতম, কারণ জঙ্গমহলের অনেকটা অংশ মেদিনীপুরের অন্তর্ভুক্ত।

জঙ্গলমহলের অন্যান্য স্থানীয় রাজাদের মতন ঝাড়গ্রাম ও জামবনির রাজারাও প্রথমে ইংরেজদের বশ্যতা স্বীকার করতে চাননি। দীর্ঘকালের স্বাধীনতার ঐতিহ্য বিসর্জন দিয়ে ইংরেজের বশীভূত হওয়া তাঁরা বাঞ্ছনীয় মনে করেননি। কিন্তু ফার্গুসন সাহেবের সিপাহীরা রাজদুর্গ দখল করে (১৭৬৭ সালে) যখন রাজার দ্বারস্থ হলেন তখন তাঁরা রাজস্ব দেওয়ার শর্ত মেনে নিয়ে বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হলেন। ঝাড়গ্রাম রাজের মতন জামবনির চিল্‌কিগড়ের দুর্গও যখন ইংরেজদের অধিকারে এল, তখন জামবনির রাজারাও শর্ত মেনে নিলেন। এইভাবে একে একে জঙ্গলের 'বদমেজাজি রাজাদের'

(ইংরেজদের ভাষায়) দমন করে ইংরেজরা আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে লাগলেন। কিছুদিন পরেই 'চুয়াড় বিদ্রোহ' ব্যাপকরূপে দেখা দিল এবং সেই বিদ্রোহে স্থানীয় সামন্ত রাজারা অনেকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উৎসাহ দিতে লাগলেন। ঝাড়গ্রাম ও জামবনির রাজারাও বিদ্রোহীদের নানাভাবে উৎসাহ দিয়েছিলেন বলে শোনা যায়।[১]

এই হল জামবনির রাজাদের রাজত্বের ইতিহাস। তাঁদের রাজ্য প্রতিষ্ঠার যে কাহিনী আগে বলেছি, তার সঙ্গে তাঁদের আচরিত ধর্মানুষ্ঠানের কোন সামঞ্জস্য আছে বলে মনে হয় না। বহিরাগত ক্ষত্রিয় রাজবংশ যদি তাঁরা হন, হতে পারেন। তা নিয়ে, অথবা রাজবংশের কুলপঞ্জীর সত্যতা নিয়ে বিতর্কের কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু তাঁদের আচরিত ধর্মানুষ্ঠানাদির মধ্যে পরিপার্শ্বের বন্য ধর্মানুষ্ঠানের প্রভাব অত্যন্ত পরিস্ফুট দেখা যায়। জামবনির রাজাদের যে কনকদুর্গা দেবী, তিনিই চিল্‌কিগড়ের প্রধান দেবী। গভীর জঙ্গলের মধ্যে পাহাড়ী দলুং নদীর পাড়ের উপর কনকদুর্গার দেবালয় প্রতিষ্ঠিত। পুরাতন পঞ্চরত্ন মন্দিরের পাশে নতুন নাট-মন্দিরসহ মন্দির নির্মিত হয়েছে এবং নতুন মন্দিরের মধ্যে প্রাচীন স্থাপত্যরীতির কোন চিহ্ন নেই, রুচিরও পরিচয় নেই। অর্থব্যয়ের পরিচয় আছে, শিল্প-রুচির পরিচয় নেই। কনকদুর্গা মহাসমারোহে পূজিত হন এবং বলিদানও হয় সাড়ম্বরে। যে রকম থম্‌থমে বন্য পরিবেশে কনকদুর্গা প্রতিষ্ঠিত, তাতে মনে হয় এককালে হয়ত দেবীর সামনে বন্দী শত্রুর মুণ্ডচ্ছেদন করা হত, নরবলি দিয়ে। জঙ্গলমহলের রাজা জংলী রীতিতে দণ্ড দিতেন। আর একথাও মনে হয় যে, কনকদুর্গার কনকত্বটাই আসল পরিচয় নয়। আসলে এই জঙ্গলমহলের কোন বনদেবী হয়েছেন বনদুর্গা এবং পরে জামবনির রাজাদের রাজকীয় পোষকতায় কনকমণ্ডিত হয়ে তিনি কনকদুর্গা নাম ধারণ করেছেন। আজও দলুং নদীর তীরে কনকদুর্গা যেখানে বিরাজ করেন, সেখানকার পরিবেশে যেন হারানো অতীতের আরণ্যক হিংস্রতার গন্ধ বাতাসে ভেসে আসে, গা ছম্‌ছম্‌ করে।

কনকদুর্গা ছাড়া চিল্‌কিগড়ে বিখ্যাত রঙ্কিণী দেবীও আছেন। জামবনিতে তিনি খুব বিখ্যাত না হলেও, রাজবাড়ির সীমানার মধ্যে তাঁর অধিষ্ঠান

১ W. K. Firminger : Midnapur District. Records, Vol II, 1763-67 ; J. C. Price : The Chuar Rebellion of 1799

বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। রাজবংশের কুলদেবতার মতনই তিনি পূজিত হন অথচ কনকদুর্গার কনকের সমারোহের তলায় তাঁর প্রতিপত্তি যেন চাপা পড়ে রয়েছে। ধলভূম রাজবংশের সঙ্গে রঙ্কিণী দেবীর সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। কিংবদন্তী এই, রঙ্কিণী দেবী আগে ছিলেন খড়্গপুরের কাছে। সেখানে পীর লোহানীর সঙ্গে তাঁর লড়াই হয়। লড়াইয়ের কারণ হল নরবলি নিয়ে বিবাদ। গ্রামের লোককে পালাক্রমে রঙ্কিণী দেবীকে একটি করে মানুষ যোগাতে হত নরবলির জন্য। একবার এক বিধবার পালা পড়ে। বিধবার একটি মাত্র পুত্রসন্তান। তার দুঃখে সে যখন কাতর হয়ে কাঁদছে, তখন পীর লোহানী তার জন্য ওকালতি করতে যান রঙ্কিণী দেবীর কাছে। পীরের সঙ্গে দেবীর বিবাদ হয় এবং লড়াই হয়। দেবী খড়্গপুর ছেড়ে ধলভূমের রাজাদের কাছে জঙ্গলভূমিতে চলে যান। ধলভূমের রাজারা তাঁকে প্রতিষ্ঠা করে নরবলির ব্যবস্থা করেন। কিংবদন্তীর মধ্যে পীরের মহানুভবতা কৌশলে প্রচার করা হলেও, রঙ্কিণী দেবীর আনুষ্ঠানিক বৈশিষ্ট্যটি লক্ষণীয়। রঙ্কিণীও যে জঙ্গলের বনদেবী তাতে কোন সন্দেহ নেই। নরবলি হত তাঁর সামনে এবং মাত্র এক শতাব্দী আগেও যে হয়েছে বর্ধমান অঞ্চলে, তার প্রমাণ আছে অনেক।

ধলভূমে রঙ্কিণী দেবী প্রতিষ্ঠিত এবং সেখানে মহাসমারোহে এখনও তাঁর পূজা হয়। জামবনির রঙ্কিণী দেবী কতকটা কনকদুর্গার কনকজ্যোতির দীপ্তিতে ম্লান হয়ে আছেন। কোন দেবালয়ে তিনি প্রতিষ্ঠিত নন। কয়েকটি শাল গাছের ছোট্ট একটি ঝোপের মধ্যে তাঁর আস্তানা। সাঁওতাল, মুণ্ডা প্রভৃতি আদিবাসীদের 'জাহেরবঙ্গার' মতন। এক কথায়, জামবনির রাজাদের রঙ্কিণী দেবীর স্থানটিকে সাঁওতালদের 'জাহেরবঙ্গার' স্থান বা জাহের (ঝোপ) বলা যেতে পারে স্বচ্ছন্দে। শুধু জাহের নয়। রঙ্কিণী দেবীর মূর্তিও কিছু নেই। মাটির হাতি-ঘোড়া ইত্যাদি সিঁদুর-লেপা রয়েছে এবং তাই হল রঙ্কিণী দেবী। এরকম অনেক দেবতা এখানকার সাঁওতালদের মধ্যে দেখা যায়, ঠিক এই রকম জাহেরে বিরাজ করছে। বহিরাগত ক্ষত্রিয় জামবনিরাজ এইভাবে রাজবাড়ির সীমানার মধ্যে একপাশে শাল গাছের জাহেরে মাটির হাতিঘোড়া দিয়ে রঙ্কিণী দেবীর পূজা করেন কেন? কুলপঞ্জীতে সে কথা লেখা নেই, এবং তার জন্যই অনুসন্ধানীর কৌতূহল জাগায় বেশি।

ঝাটিবনি-শিল্‌দা

জঙ্গলমহলের বিখ্যাত চুয়াড় বিদ্রোহের অন্যতম প্রধান ঘাঁটি ছিল শিল্‌দা। পরগণা শিল্‌দার পূর্বেকার নাম ছিল ঝাটিবনি। এ-অঞ্চল যে একসময় স্থানীয় আদিবাসীদের সম্পূর্ণ আয়ত্তে ছিল, আজও তা বোঝা যায়। ঝাড়গ্রাম থেকে বেরিয়ে সোজা উত্তরপশ্চিমে দহিজুড়ী আন্ধারিয়া বিনপুরের ভিতর দিয়ে শিল্‌দা যাবার পথ। মধ্যে মধ্যে বিস্তৃত শালবন, আর লোধা ও সাঁওতালদের বসতি। এই পথেই আমরা গিয়েছিলাম। শিল্‌দা ছাড়িয়ে আরও উত্তর-পশ্চিমে বেলপাহাড়ী ও তামাজুড়ী। তামাজুড়ীতে প্রাগৈতিহাসিক যুগের তামার হাতিয়ার পাওয়া গেছে, সেকথা আগে বলেছি। পার্বত্য পরিপার্শ্বের মধ্যে তামাজুড়ী। শিল্‌দা থেকেই মানভূম-মেদিনীপুর সীমান্তের তরঙ্গায়িত রেখা পরিষ্কার দেখা যায়। তামাজুড়ীর পরেই মানভূম। যাবার পথে দক্ষিণে বাঁকুড়া, বামে সিংভূম।

শিল্‌দা পরগণায় কাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত ছিল আগে এবং পরে কারা রাজত্ব করেছিলেন, তাই নিয়ে অনেক কাহিনী শোনা যায়। তার ভিতর থেকে ঐতিহাসিক সত্যের আভাস পাওয়া যায় মাত্র, কিন্তু কোন্‌টা সঠিক ঐতিহাসিক সত্য তা বলা যায় না। ১৮৮৭ সালে শিল্‌দার তদানীন্তন জমিদার রাজা মানগোবিন্দ মল্লরায় সদর বোর্ডের প্রশ্নের উত্তরে জেলার কলেক্টর সাহেবের কাছে যে পত্র লিখেছিলেন, তাই থেকে শিল্‌দার রাজত্বের ইতিহাস অনেকটা জানা যায়। পত্রে বলা হয় যে, বাংলা ৯৩১ সনে, ইংরেজী ১৫২৪ খৃস্টাব্দে মানগোবিন্দের প্রপিতামহ মেদিনীমল্লরায় সসৈন্যে দক্ষিণ দেশ থেকে (কোন্ দক্ষিণ?) এসে ঝাটিবনি বা শিল্‌দা অঞ্চলের তাৎকালিক রাজা বিজয়সিংহকে পরাজিত করে রাজ্য দখল করেন। কিন্তু কোন্ দক্ষিণ দেশ থেকে তাঁরা এসে-ছিলেন 'মল্ল' উপাধি নিয়ে, সে প্রশ্নের কোন সদুত্তর পাওয়া যায় না। স্থানীয় যে বিজয়সিংহ রাজাকে মল্লদের পূর্বপুরুষ জয় করেছিলেন, তিনিই বা কে এবং কোন্ বংশজাত, তাও জানবার কোন উপায় নেই। কিংবদন্তী হল, এদেশে নাকি ডোমজাতির রাজবংশই আগে রাজত্ব করতেন বিজয়সিংহের কোন পূর্বপুরুষ সেই ডোমরাজাদের পরাজিত করে এই অঞ্চলের রাজা হন। সে যাই

হোক, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দশসালা বন্দোবস্তের সময় দেখা যায়, রাজা মানগোবিন্দ মল্লরায় শিল্‌দার জমিদার ছিলেন। ১৮০৬ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। রাজার সাত রানী ছিলেন। মৃত্যুর পর অন্যতমা রানী কিশোরমণি রাজ্য-পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। এই রানী কিশোরমণি সম্বন্ধে অনেক গল্প শোনা যায় এই অঞ্চলে। দেখা যায়, রাজার চেয়ে আমাদের এই বাংলাদেশে রানীদের ক্ষেত্রে লোক-কল্পনা অনেক বেশি উদার হয়ে ওঠে। দান-ধ্যান দয়া প্রজা-বাৎসল্যের তো কথাই নেই, বীরত্বের দিক থেকেও দেখা যায়, রাজাদের তুলনায় রানীরা অনেক বেশি কীর্তিমতী। শিল্‌দার রানী কিশোরমণির ক্ষেত্রেও তার কোন ব্যতিক্রম হয়নি। কিশোরমণি দত্তক নিয়েছিলেন শ্রীনাথ পাত্রকে। ১৮৪৮ সালে রানীর মৃত্যুর পর শ্রীনাথই জমিদারীর মালিক হন। তারপর মানগোবিন্দ মল্লের দৌহিত্রদের সঙ্গে সম্পত্তির অধিকার নিয়ে মোকদ্দমা হয় এবং দৌহিত্র মুকুন্দনারায়ণ দেও শিল্‌দার জমিদারী পান। ক্রমে জমিদারী দেনার দায়ে লাটে উঠতে থাকে এবং অবশেষে নানা হাত ঘুরে 'মেদিনীপুর জমিদারী কোম্পানী'র অধীনে যায়।

শিল্‌দা রাজবংশের গড়বাড়ি ও মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ আজও রয়েছে। অনেকটা এলাকা জুড়ে ঘেরা রাজবাড়ি। তার চৌহদ্দির মধ্যেই একাধিক দেবালয় প্রতিষ্ঠিত। একটি দেবালয়ের গায়ে লিপি আছে—১৭৪২ শকাব্দ লেখা। অর্থাৎ ১৮২০ খৃষ্টাব্দে মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত। তখন রানী কিশোরমণির রাজত্বকাল (১৮২০—১৮৪৮ খৃঃ)। কিশোরমণিই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁরই রাজত্বকালে আরও দেবালয় এবং 'শিল্‌দার বাঁধ' নামে প্রসিদ্ধ জলাশয়টিও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বোঝা যায়।

শিল্‌দার রাজারা যে শৈব-শাক্তধর্মী ছিলেন তা এ অঞ্চলের ভৈরব-প্রাধান্য দেখে অনুমান করা যায়। পাথরের বড় বড় যে-সব ষণ্ডমূর্তি গ্রামের মধ্যে এখনও দেখা যায়, সেগুলি প্রতিষ্ঠিত শিবেরই অনুচর ছিল একসময়। দেবালয়ের সামনে বিরাজ করত। এখন দেবালয় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে এবং ষণ্ডও প্রভুহীন অনাথ অবস্থায় কালাতিপাত করছে। রাজবংশের আচরিত ধর্ম ও কীর্তিকথা স্থানীয় গ্রাম্য বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মজুমদার তাঁর 'ভৈরব-রঙ্কিণী মাহাত্ম্য' নামে পুস্তিকায় এইভাবে বর্ণনা করেছেন:

শিব ভৈরবের মাটি শিল্‌দা পরগণা।
গ্রামে গ্রামে শিবলিঙ্গ এখানে অর্চনা॥
শৈব রাজা ছিল হেথা প্রাচীন যুগেতে।
তাঁরই কীর্তি এসকল বিশ্বাস মনেতে॥…
জননী কিশোরমণি ছিলা রাজমাতা।
এ-সামন্তভূমে তাঁর আছে কীর্তিগাথা॥
দেশ রক্ষণে কত শক্তি ছিল তাঁর।
যুদ্ধে কেটেছেন মাথা পাঁচশ ভুঞার॥
এখনও সে কাটা মুণ্ড 'ইঁদকুড়ি' ভূমে।
অস্ত্রসহ কবরস্থ আছে শিল্‌দা গ্রামে॥ —ইত্যাদি

শিল্‌দার ভৈরব হলেন এ অঞ্চলের সবচেয়ে বিখ্যাত দেবতা। ভৈরব সম্বন্ধে কিংবদন্তীর অন্ত নেই। লোককল্পনা যে কিভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে দেবদেবীর মাহাত্ম্য রচনা করে, শিল্‌দার ভৈরবের মাহাত্ম্যকথা তার একটি দৃষ্টান্ত। শিল্‌দার প্রাকৃতিক পরিবেশ সত্যই মনোহর। সামনে মানভূম, পাশে সিংভূম। দেখলেই বোঝা যায়, সংলগ্ন সিংভূম অঞ্চলের সঙ্গে তার সাদৃশ্য খুব বেশি। কেবল প্রাকৃতিক সাদৃশ্য নয়, সাংস্কৃতিক সাদৃশ্যও। প্রাকৃতিক সম্পর্কের মতন সিংভূমের সঙ্গে শিল্‌দার ঘনিষ্ঠ সাংস্কৃতিক সম্পর্কও আছে। সেই সাংস্কৃতিক ঘনিষ্ঠতার সাক্ষী হল 'ভৈরব-রঙ্কিণী'র কাহিনী। কাহিনীর মধ্যে যতটা পরিমাণ লোককল্পনা থাকুক না কেন (সব কাহিনী ও কিংবদন্তীতেই তা থাকে), তার একটা সাংস্কৃতিক ভিত্তি যে আছে, তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। কাহিনীটি এই :

ভৈরব যেখানে আছেন, সেখানে ভৈরবীও থাকবেন। শিল্‌দার প্রতাপশালী ভৈরবের ভৈরবী কোথায় ? শিল্‌দায় নয়। ভৈরব থাকেন শিল্‌দায়, আর ভৈরবী থাকেন ধলভূমগড়ে। ভৈরবীর নাম রঙ্কিণী। ধলভূমগড়ের রঙ্কিণী দেবীর কথা জামবনি চিল্‌কিগড়ের রঙ্কিণী দেবী প্রসঙ্গে বলেছি। এই রঙ্কিণী দেবীই হলেন শিল্‌দার ভৈরবের ভৈরবী। রঙ্কিণী দেবীর বেদীতে যে বেঁদা পর্ব হয়, সেই পর্ব সাঙ্গ হয় ওড়গঙ্গা গ্রামে (শিল্‌দায়) ভৈরবের সামনে 'পাতা বেঁদা' নামে। দুর্গাপূজার দশমীর দিনে এই উৎসব হয়। জিতাষ্টমী জাগরণের নবমী তিথিতে আকালে কল্পারম্ভ হয়। একপক্ষকাল ধরে দশভূজা দেবীর

পূজা হয়ে বিজয়াদশমীর দিন শেষ হয় পূজা। ঐদিন নাকি ভৈরবী রঙ্কিণী দেবী তাঁর স্থান ধলভূমগড়-ঘাটশীলা থেকে ভৈরবভূমি শিল্‌দায় গমন করেন এবং সেখানে ভৈরব-ভৈরবীর মিলন হয়। ভৈরব এই সময় শিল্‌দার উপর দিয়ে আনাগোনা করেন, গুরু গুরু ধ্বনি হতে থাকে, পরগণার জলমাটি সব কেঁপে ওঠে। এই অঞ্চলের এই নৈসর্গিক বৈশিষ্ট্য লোককল্পনায় অপ্রাকৃতিক রূপ ধারণ করে। সকলে মনে করে, ভৈরব ও ভৈরবী পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হতে আসছেন শিল্‌দায়।

শ্রীভৈরব সাড়া দেন গুড় গুড় রব।
পরগণার ভূমিজল কেঁপে ওঠে সব॥
সাঁতভূমে বিরাজিত দেব শ্রীভৈরব।
নাশিতে কলির পাপ উৎপীড়ন সব॥
(ভৈরব-রঙ্কিণী মাহাত্ম্য)

এই কাহিনীর তাৎপর্য কি? প্রথম তাৎপর্য হল, ধলভূম সিংভূম আর শিল্‌দা পরগণা এককালে সবদিক দিয়েই অভিন্নসত্তা ছিল। ভৈরব-রঙ্কিণী কথায় এ বিষয়েও ইঙ্গিত করা হয়েছে:

ভৈরব ভৈরবী স্থানে দেখ একই পর্ব।
লুপ্ত হয় ক্রমে ক্রমে দেব কীর্তি সর্ব॥
একই সাম্রাজ্যভুক্তা ছিলা ঘাটশীলা।
শিল্‌দা সাঁতভূম কালে পৃথক হইলা॥
ঘাটশীলা শিলান্তরে উৎপত্তি শিল্‌দার।
সাঁতভূম শ্রীকৈলাসে বসতি বাবার॥

এই সাঁতভূম কিসের নাম? সাঁতভূমই হল সঁন্ত বা সাঁওন্তভূম, সাঁওতালদের আদিবাসস্থান। সাঁওতালদের বিশ্বাস তাদের এই আদিবাসস্থান সাঁওন্তভূম বা সাঁতভূম থেকেই তাদের জাতি হিসাবে 'সাঁওতাল' নামকরণ হয়েছে। সাঁওতালদের আদিমকালের ইতিহাস জানবার আজ আর কোন উপায় নেই। তাদের নিজস্ব পুরাণকথায় স্থান থেকে স্থানান্তরে ভ্রমণের ও বসতি স্থাপনের যে কাহিনী আছে, তাতে এইটুকু বোঝা যায় যে, তারা অনেক দেশ (উত্তর ভারতের) ঘুরে ঘুরে ক্রমে এইদিকের পাহাড়-পর্বত-ঘেরা জঙ্গলের দিকে এসে বসতি স্থাপন করেছে। সাঁওতালী পুরাণকথায়

যে সব নাম পাওয়া যায়, তার সঠিক ভৌগোলিক অবস্থান পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করেননি কেউ। এদিকে বা পূর্বভারতে এসে তারা যেখানে বসতি স্থাপন করে, তার নাম সাঁওন্তভূমি (Saont)। এই সাঁওন্তভূমির অধিবাসী বলে তাদের নাম হয়েছে সাঁওতাল। অনেকে অনুমান করেন, শিল্‌দা পরগণাই সেই সাঁওন্তভূমির বর্তমান নাম। এখানকার স্থানীয় লোক শিল্‌দা অঞ্চলকে আজও যখন চল্‌তি কথায় সাঁতভূমি বলেন, তখন শিল্‌দা আর সাঁওন্তভূমি যে এক ও অভিন্ন, তাতে সন্দেহের বিশেষ কারণ থাকে না। সাঁওন্তভূমি থেকে সাঁতভূমি (শিল্‌দার অন্য নাম)। আগে শিল্‌দা ধলভূমগড় ঘাটশীলা অঞ্চলে যে একই জাতির এবং তাদেরই জাতীয় সংস্কৃতির প্রতিপত্তি ছিল, এখনও শিল্‌দার ভৈরব ও ধলভূমের রঙ্কিণীর যোগসূত্র থেকে তার পরিষ্কার আভাস পাওয়া যায়। সমস্ত ঐতিহাসিক প্রমাণের মধ্যে জনসংস্কৃতিগত প্রমাণই হল আঞ্চলিক অভিন্নতার সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। ধলভূমগড় ও শিল্‌দা পরগণা যে একই সাঁতভূমির অন্তর্ভুক্ত ছিল, আজও ভৈরব ও রঙ্কিণী দেবী তার সাক্ষী রয়েছেন। এ-সাক্ষ্যের গুরুত্ব অনেক বেশি। দুই দেব-দেবীই আসলে জঙ্গল ও জঙ্গলবাসীদের দেবতা। তার পর্যাপ্ত প্রমাণ রয়েছে কেবল শিল্‌দায় নয়, সারা ঝাড়গ্রাম অঞ্চলে। শিল্‌দার ভৈরব এখন ভগ্ন পাথরের মন্দিরের (মন্দিরটি পাথরের দেউল ছিল, পরিষ্কার বোঝা যায় ধ্বংসাবশেষ দেখে) উপর প্রতিষ্ঠিত। অজস্র পোড়ামাটির হাতিঘোড়া তার চারিদিকে ছড়ানো ও স্তূপীকৃত। ধর্মঠাকুরের কামিন্যামূর্তির মতন প্রেতিনী মূর্তিও (পোড়ামাটির) ভৈরবস্থানে বসানো আছে দেখা যায়। ঠিক এই একই রকমের ভৈরব, খেঁদারানী, ভৈরবী ইত্যাদির পূজাস্থান শিল্‌দার পথে বহু সাঁওতাল ও লোধাপল্লীতে দেখা যায়। চিল্‌কিগড়ের রঙ্কিণী দেবীর স্থানেরও এই একই দৃশ্য। বেশ বোঝা যায়, এসব অরণ্যের ও অরণ্যবাসীদের পূজ্য দেবদেবী। ক্রমে স্থানীয় সামন্তরাজাদের পোষকতায় এক-একজন এক-একটি অঞ্চলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ও দেবীরূপে গণ্য হয়েছেন এবং খ্যাতিও অর্জন করেছেন। কিন্তু সাংস্কৃতিক যোগসূত্রের ইতিহাসটুকু একেবারে লুপ্ত হয়ে না গিয়ে কল্পনাস্ফীত কিংবদন্তীর মধ্যে কঙ্কালাকারে রয়েছে। ভৈরব-রঙ্কিণীর কাহিনী তারই নিদর্শন। দেবস্থানের পরিবেশ ও নানাবিধ উপকরণের মধ্যে এ অঞ্চলের জনসংস্কৃতির সঙ্গে তার যোগাযোগ কোথায়, তার প্রমাণও রয়েছে স্পষ্ট।

গন্‌গনির মাঠ

মেদিনীপুরের অনেক অলিখিত উপন্যাসের নায়ক গন্‌গনির মাঠ। কিংবদন্তীর তো অন্ত নেই। সবগুলি সঙ্কলিত হলে তাই দিয়ে এক রোমাঞ্চকর ইতিবৃত্ত রচনা করা যায়। মাঠের আবার ইতিবৃত্ত কি? মাঠের তো সবই মাঠ, তার মধ্যে পাঠোপযোগী কাহিনী কি থাকতে পারে কল্পনা করা যায় না। গন্‌গনির মাঠের এরকম অনেক কাহিনী আছে যা সত্যই কল্পনাতীত। অথচ তার সবটাই কল্পনা নয়। বৃটিশ যুগের অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রথম পর্বের এক ব্যাপক গণবিদ্রোহের অবিস্মরণীয় স্মৃতিবিজড়িত এই গন্‌গনির মাঠ। 'গন্‌গনির ডাঙা'ও বলে। মাঠই বটে! অনেক মাঠ অনেকে দেখেছেন, কিন্তু গন্‌গনির মাঠের এমন একটি বিশিষ্ট সৌন্দর্য আছে, যা আমি অন্তত আমার মাতৃভাষার মাধ্যমেও বোঝাতে অক্ষম। সে সৌন্দর্য আমার মতন অ্যামেচার ফটোগ্রাফারের পক্ষে ক্যামেরায় বন্দী করে আনাও সম্ভব হয়নি। উত্তর মেদিনীপুরের অনেক লোককথা, লোকগাথা ও লোক-কল্পনার প্রধান নায়ক এই ঐতিহাসিক গন্‌গনির মাঠ। এরকম আরও অনেক মাঠ ও ডাঙা আছে মেদিনীপুরে, কিন্তু গন্‌গনি তার মধ্যে প্রধান।

বগড়ী পরগণার মধ্যে শিলাবতী নদীর দক্ষিণে গড়বেতার সংলগ্ন ডাঙাই হল গন্‌গনির মাঠ। কচি কচি সবুজ দূর্বাঘাস বিছানো নরম মোলায়েম মাঠ নয়। রুক্ষ গৈরিক মূর্তি তার প্রথম বিশেষত্ব। এই অঞ্চলের জঙ্গলশূন্য মাঠের বিশেষত্বই তাই। সারা পশ্চিমবাংলার উত্তরসীমান্ত জুড়ে এই বিশেষত্ব দেখা যায়। সুতরাং গন্‌গনির ডাঙার এ বিশেষত্বের মধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই। গন্‌গনির রুক্ষ মূর্তির মধ্যেও একটা স্বাতন্ত্র্য আছে, যা সচরাচর দেখা যায় না। মেহনতী মানুষের পেশীবহুল বলিষ্ঠ দেহের মতন গন্‌গনির মূর্তি। সেরকম দেহের অনাবৃত মূর্তি যাঁরা দেখেছেন তাঁরা গন্‌গনির ডাঙার মূর্তিও সহজে কল্পনা করতে পারবেন। একদা গভীর শালবনে ঢাকা ছিল গন্‌গনির মাঠ। যেমন এদিককার আরও অনেক মাঠ আগে ছিল, ঠিক তেমনি। শালবন নির্মূল করে মাঠ তৈরি করা হয়েছে জঙ্গল হাসিল করে লোকবসতি স্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু সব শাল-পিয়ালের বন নির্মূল হয়ে যায়নি। বনের পর

বন, সারি সারি বনশ্রেণী আজও পশ্চিমবাংলার এই অঞ্চলের অন্যতম প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য। বর্ষার অবিরাম বর্ষণধারা সেই বনের ভিতর দিয়ে প্রচণ্ড বেগে যখন গন্‌গনির ডাঙার উপর দিয়ে বয়ে যায় তখন গন্‌গনির কঙ্করকঠিন বুকও চিরে যায় তাতে। বহুকাল ধরে এই জলপ্রবাহের আঘাতে গভীর পাহাড়ী গর্জের মতন খাড়াই সব খাত তৈরি হয়েছে গন্‌গনির বুকে। পাহাড়ী গর্জের ধারে দাঁড়িয়ে নিচে তাকালে যেমন শিহরণ হয়, গন্‌গনির মাঠে এই সব সুগভীর সরু সরু খাতের ধারে দাঁড়ালেও তেমনি অনুভূতি হয়। পাহাড়ী ঝর্নার মতন নীচে জলস্রোত দেখা যায়। অবশ্য প্রচণ্ড গ্রীষ্মের সময় নয়। তখন সব শুকিয়ে খট্‌খটে হয়ে যায়। খাতগুলি দেখলে মনে হয় যেন এগুলি গন্‌গনির বুকের শিরা-উপশিরা। বলিষ্ঠ মেহনতী মানুষ যেন উদয়াস্ত খাটুনির পর গা ছড়িয়ে দিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে। গন্‌গনির মাঠ দেখে আমার অন্তত তাই মনে হয়েছে। কিন্তু গন্‌গনির ডাঙা নাম হল কেন? উত্তর মেদিনীপুরে চৈত্র-বৈশাখের গ্রীষ্মের সময় দারুণ দ্বিপ্রহরে এরকম মাঠে আগুন জ্বলে। মাঠের দিকে তাকানো যায় না। আমরা শীতান্তে গন্‌গনির রূপ দেখেছি, ভয় হয় দেখলে। মনে হয় যেন গন্‌গনে আগুনের হল্‌কা বেরুচ্ছে মাঠ দিয়ে। সকলেরই তাই মনে হয়। তাই গন্‌গনির মাঠ বা ডাঙা এর নাম এবং যোগ্য নাম যে তাতে সন্দেহ নেই।

গন্‌গনির মাঠের ঐতিহাসিক স্মৃতিও ঐ আগুনের মতন গন্‌গনে। যে গণবিদ্রোহের কাহিনীর সঙ্গে গন্‌গনির ডাঙার নাম জড়িত, পশ্চিমবাংলার ইতিহাসে, অন্তত বৃটিশ আমলে, সেরকম ব্যাপক বিদ্রোহ আর কখনও হয়েছে কি না সন্দেহ। বগড়ীর লায়েক হাঙ্গামা, লায়েক বিদ্রোহ, চুয়াড় বিদ্রোহ, পাইক বিদ্রোহ ইত্যাদি অনেক নাম তার! নামকরণ করেছেন ইংরেজ ঐতিহাসিকরা, সুতরাং চুয়াড়, লায়েক, পাইক কিছুই বাদ যায়নি। আসলে পাইক বা লায়েক বিদ্রোহ। আরও আসল কথা বলতে গেলে বলা দরকার —ব্যাপক গণবিদ্রোহ। ইংরেজরা সহজে তা স্বীকার করতে চাননি। তাই স্থানীয় আদিবাসীদের তাঁরা 'অসভ্য চুয়াড়' নাম দিয়ে, এই বিদ্রোহের নাম দিয়েছেন 'চুয়াড় বিদ্রোহ'। এই চুয়াড় বিদ্রোহের অন্যতম প্রধান ঘাঁটি ছিল উত্তর মেদিনীপুরের এই গন্‌গনির মাঠ।

বকদ্বীপ বা বকডিহি থেকে বগড়ী নাম হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন।

বিদ্যানিধি মহাশয়ের মতে, বকডিহি—বগ্‌ডি—থেকে 'বাগ্‌দী' কথার উৎপত্তি হয়েছে। বাগদীদের নামকরণ হয়েছে এই অঞ্চল থেকে। পূর্বে নাকি এ অঞ্চলে জঙ্গলের সঙ্গে জলা ছিল অনেক। বাংলার বাগ্‌দীদের আদি-বাস এখানে। এ সম্বন্ধে অবশ্য কোন সঠিক মন্তব্য করা কঠিন। তবে উল্লেখযোগ্য হল, গন্‌গনির অনতিদূরে তেঁতুলিয়া নামে একটি স্থান আছে। তেঁতুলিয়া বাগ্‌দীদের একটি গোত্রবিশেষ। তেঁতুলিয়া গোত্রের বাগ্‌দীদের খ্যাতি ও মর্যাদা খুব। গন্‌গনির মাঠের চারিদিকে যেসব স্থানের নাম আছে তার অধিকাংশই বন-অরণ্যের সঙ্গে জড়িত। যেমন অর্জুনবনি, বনকাটা, ঝাড়বনি. সিমুলিয়া ইত্যাদি। এ ছাড়া গড়বেতার গড় এবং সংগ্রামচকের সংগ্রামও গন্‌গনির অতীত স্মৃতিবিজড়িত। আজও গন্‌গনির মাঠ গভীর শালবনে পরিবেষ্টিত। পথের ধারে ধারে আশেপাশে সব শালবন। বনের গভীরতা কালে কালে অনেকটা নষ্ট হয়ে গেলেও, অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত এসব অঞ্চলে গভীর বন-জঙ্গল ছিল যে তাতে সন্দেহ নেই। এই জঙ্গলে একদা জঙ্গলবাসীরাই রাজত্ব করত। আদিবাসী যারা তাদেরই প্রাধান্য ও কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ণ ছিল। আমলাগুড়া গ্রামনিবাসী মতিলাল বিশ্বাস তাঁর 'বকদ্বীপ' গ্রন্থিকায় এ সম্বন্ধে যা লিখেছেন তা অনেকটা সত্য বলা চলে। তিনি লিখেছেন: "রাজা গজপতি সিংহের পূর্বে বকদ্বীপে কেহ রাজা ছিলেন না। আদিম জাতিগণ সমবেত হইয়া তাহাদের মধ্যে একজনকে মনোনীত করিয়া 'মণ্ডল' আখ্যা প্রদানকরত তাঁহার আদেশানুযায়ী সকলে পরিচালিত হইত। উক্ত মণ্ডলের স্বাধীনভাবে কোন কার্য সম্পাদন করিবার ক্ষমতা ছিল না। তিনি বর্তমান পঞ্চাইতের ন্যায় জনসাধারণকে সমবেত করিয়া তাঁহাদের পরামর্শ অনুযায়ী সকল কার্য সম্পাদন করিতেন। যাহা হউক, তিনি স্বীয় ক্ষমতাবলে ও বুদ্ধিকৌশলে তদানীন্তন আদিবাসীদিগকে বশীভূত করিয়া স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণপূর্বক সমগ্র বকদ্বীপ শাসন করিতে লাগিলেন· রাজা গজপতি সিংহ ডিহি বগড়ীতে কয়েক বৎসর অবস্থান করিয়া বকদ্বীপের পূর্বতন রাজধানী গড়বেতার আদিম জাতিদিগের প্রাচীন দুর্গ সংস্কার করাইয়া নূতন রাজধানী স্থাপন করিলেন" (বকদ্বীপ: ১৩২১ সন, পৃঃ ৪—৭)। প্রচলিত জনশ্রুতি সম্বল করে বিশ্বাস মহাশয় এই ইতিহাস রচনা করেছেন। কোন প্রমাণ নেই এই ইতিহাসের। কিন্তু জনশ্রুতির এখানে কিছু মূল্য

আছে। ইতিহাস কি ছিল না ছিল তার আভাস পাওয়া যায় এই জনশ্রুতি থেকে।

জনশ্রুতি হল, গজপতি সিংহই বগড়ীর রাজবংশের আদি প্রতিষ্ঠাতা। সেই জগন্নাথধামে তীর্থযাত্রা করতে এসে রাজ্য প্রতিষ্ঠার কাহিনী গজপতির সঙ্গেও জড়িত। প্রায় সাত-শ বছর আগেকার কথা। মুসলমান অভিযানের প্রথম পর্ব গজপতি সিংহের যুগ। গজপতি তাঁর রাজ্য দুইভাগে ভাগ করে দিয়ে যান। ধনপতি সিংহ গড়বেতায় রাজধানী স্থাপন করেন এবং গণপতি সিংহ গোয়ালতোড়ে। ধনপতির পুত্র হামীর সিংহ, হামীরের পুত্র রঘুনাথ সিংহ। রঘুনাথ জঙ্গলমহলের অনেক স্থান বাহুবলে দখল করেন এবং দক্ষিণে ময়না পর্যন্ত অভিযান করেন। তিনি দুটি মন্দির তৈরি করেন, তার মধ্যে একটি হল গোয়ালতোড়ের সনকা মায়ের মন্দির (লখীন্দরের জননী সনকার নামে) আর একটি চন্দ্রকোণার লালজীর মন্দির। রঘুনাথের পুত্র চিত্র সিংহের আমলে বিষ্ণুপুরের মল্লরাজারা বগড়ী পরগণা জয় করেন এবং কয়েক বছর প্রতিনিধি মারফৎ রাজ্য চালান। পরে চৌহান সিংহ নামে কোন রাজপুত রাজা বগড়ী অধিকার করে নিজেই বিষ্ণুপুরের অধীনে রাজ্যশাসন করতে আরম্ভ করেন। গড়বেতার সর্বমঙ্গলার মন্দিরের পাশে চৌহান সিংহ বিরাট গড়বেষ্টিত দুর্গ তৈরি করেন। চৌহানের পরবর্তী রাজারা স্বেচ্ছাচারী ও দুর্বল রাজা ছিলেন। তেজচন্দ্র সিংহের আমলে বিষ্ণুপুরের রাজারা আবার গড়বেতা আক্রমণ করেন এবং বিষ্ণুপুর-বংশের দুর্জনসিংহ রাজা হন। দুর্জনসিংহের পর খৈড়ামল্ল রাজা হন। এই সময় ময়ূরভঞ্জ থেকে শামসের বাহাদুর সসৈন্যে বগড়ী অভিযান করে তাঁকে হত্যা করে রাজ্য দখল করেন। মঙ্গলাপোতায় শামসের রাজবাড়ি নির্মাণ করে বাস করতে থাকেন। এখনও সেখানে তাঁর বংশধররা বাস করেন। শামসেরের পুত্র বৈষ্ণবচন্দ্র সিংহ। বৈষ্ণবচন্দ্রের পুত্র যাদবচন্দ্র সিংহ, বগড়ীর শেষ স্বাধীন রাজা। তাঁর রাজত্বকাল বিষ্ণুপুরের রাজাদের পতনের সময়। তখন বর্ধমানের রাজা ধীরে ধীরে এ অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে যখন উত্তর-মেদিনীপুরে ব্যাপকভাবে চুয়াড় বিদ্রোহ হয় তখন বগড়ীর রাজারাও তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ঘাটশীলার রাজা, মেদিনীপুরের কর্ণগড়ের রানী শিরোমণি, বগড়ীর রাজা, সকলেই প্রথমে বিদ্রোহীদের সঙ্গে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন।

তার প্রধান কারণ, এ অঞ্চলে এঁরা সকলেই প্রায় স্বাধীন সামন্তরাজার মতন জীবনযাপন করছিলেন এবং রাজ্য চালাচ্ছিলেন। কেউ তাঁদের সেই স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেনি। ইংরেজরাই প্রথমে হস্তক্ষেপ করতে উদ্যত হন এবং তাঁদের অধীন পাইক লায়েক ঘাটোয়াল প্রভৃতিদের পুরুষানুক্রমিক পাইকান, ঘাটোয়ালী প্রভৃতি বৃত্তিভোগ থেকে বঞ্চিত করেন। পাইক বিদ্রোহ বা লায়েক বিদ্রোহের অন্যতম কারণ তাই, একমাত্র কারণ অবশ্য নয়। জঙ্গলমহলের অধিবাসীরা ধীরে ধীরে তাদের জঙ্গলের সম্পদ আহরণের স্বাধীন অধিকার থেকেও বঞ্চিত হয়েছিল ও হচ্ছিল। অর্থনৈতিক জীবনযাত্রা চারিদিক থেকে যখন বিপর্যস্ত, সেই সময় ইংরেজ শাসকরা পুরুষানুক্রমিক বৃত্তিভোগের অধিকার থেকেও এ অঞ্চলের লোকদের বঞ্চিত করতে অগ্রসর হলেন। জঙ্গলমহলের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত আগুন জ্বলে উঠল। এ-রকম ব্যাপক গণবিদ্রোহ বাংলাদেশে আর হয়েছে কিনা সন্দেহ। সাঁওতাল বিদ্রোহ তারই শেষপর্ব ছাড়া কিছু নয়।

গন্‌গনির মাঠ ছিল বিদ্রোহী লায়েক নেতাদের ও যোদ্ধাদের অন্যতম প্রধান ঘাঁটি। বিষ্ণুপুর থেকে মেদিনীপুর যাবার পথের উপর গন্‌গনির মাঠ। বগড়ীর রাজাদের প্রধান সেনাপতি অচলসিংহ এ অঞ্চলের লায়েক বিদ্রোহের প্রধান সেনানায়ক তখন। গোবর্ধন দিক্‌পতির মতন বিখ্যাত বাগ্‌দী সর্দাররা তাঁর প্রধান সহায়। চারিদিকে গভীর শালবন, পাশে শিলাবতী নদী। গেরিলা-যুদ্ধের আদর্শ ক্ষেত্র বলা চলে। দীর্ঘকাল ধরে লায়েকরা এই গন্‌গনির শিবির থেকে বিদ্রোহ চালিয়ে যায় এবং ইংরেজদের বিরুদ্ধে নানা কৌশলে লড়াই করে। তাই নিয়ে কত সব রোমাঞ্চকর কাহিনী যে এ অঞ্চলে এখনও প্রচলিত আছে, তার ঠিক নেই। এইরকম সব কাহিনী নিয়ে চন্দ্রকোণার এক লেখক প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে 'শালফুল' নামে একটি ছোট উপন্যাস রচনা করেন। আরও কত কিংবদন্তী লোকের মুখে মুখে শোনা যায় আজও। পথের ধারের প্রাচীন বৃক্ষের দিকে আঙুল দেখিয়ে আজও স্থানীয় লোকেরা বলে, বিদ্রোহী লায়েকদের এই রকম গাছে-গাছে ইংরেজরা লট্‌কে দিয়েছিল। একজন নয়, এ-রকম শত শত, বীর বিদ্রোহীর স্মৃতি বুকে করে গন্‌গনির ডাঙা আজও যেন প্রতিশোধের ক্রোধাগ্নিতে গন্‌গন করছে।

গড়বেতা

গন্‌গনির মাঠের কাহিনী প্রসঙ্গে গড়বেতার কথা বলেছি। প্রাচীন ঐতিহাসিক স্মৃতিসমৃদ্ধ স্থান গড়বেতা। বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরের সীমান্তে গড়বেতা অতীতের বগড়ী পরগণার অন্তর্ভুক্ত। মেদিনীপুরের উত্তরসীমান্ত আর বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরের দক্ষিণসীমান্ত গড়বেতায় এসে মিলিত হয়েছে। ইতিহাসেরও বহু উত্থানপতন হয়েছে গড়বেতার বুকে। অনেক ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক ধারার সংঘাত ও মিলনভূমি গড়বেতা। দক্ষিণে ময়ূরভঞ্জ উড়িষ্যা থেকে মেদিনীপুরের পথে, পশ্চিমে সিংভূম মানভূম থেকে ঝাড়গ্রাম ও বাঁকুড়ার পথে, উত্তরে বিষ্ণুপুর থেকে ও পুবে জাহানাবাদ (আরামবাগ) থেকে, বিভিন্ন সময়ে নানারকমের সংস্কৃতিধারা গড়বেতায় এসে মিলিত হয়েছে। সমস্ত ধারার কিছু কিছু পরিচয় এখনও পাওয়া যায়। কীর্তিস্তম্ভও সামান্য কিছু অতীতের সাক্ষীস্বরূপ বিরাজ করছে দেখা যায়। বোঝা যায়, গড়বেতা ও বগড়ীর শালবনে ক্রমান্বয়ে ইতিহাসের অনেক পর্বের আবির্ভাব হয়েছে এবং পর্ব থেকে পর্বান্তরের অনেক চিহ্ন আজও লুকিয়ে আছে তার মধ্যে। সে-সব চিহ্ন পুনরুদ্ধারের কোন আশু সম্ভবনা নেই।

এককালে বগড়ী পরগণার রাজাদের রাজধানী ছিল গড়বেতায়। এখন আর গড়বেতা দেখলে তা মনে হয় না। কখন স্বাধীন সামন্তরাজাদের মতন, কখন বিষ্ণুপুরের প্রবলপরাক্রান্ত মল্লরাজাদের অধীন সামন্তদের মতন, বগড়ীর রাজারা রাজ্যশাসন করতেন। ইতিহাস ও সংস্কৃতির দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় প্রত্যক্ষভাবে বিষ্ণুপুরের প্রভাবই বেশি গড়বেতা অঞ্চলে। গড়বেতার লোকালয়ে প্রবেশ করলেই প্রথমেই নজরে পড়ে পথের দু'পাশের ঘরবাড়িগুলি। উঁচু দেয়ালের উপর বাঁকানো চারচালা ঘর, মনে হয় বিষ্ণুপুরের পথ দিয়ে চলেছি। ঘরবাড়িতে বিষ্ণুপুরের প্রভাব যেমন স্পষ্ট দেখা যায়, একেবারে গড়বেতা থেকে চন্দ্রকোণা পর্যন্ত দেবালয়ে ঠিক সেরকম দেখা যায় না। উত্তর (বিষ্ণুপুর) ও দক্ষিণ (উড়িষ্যা) দুই দিক থেকেই দেবালয়-স্থাপত্যের তরঙ্গ এসে গড়বেতায় মিলিত হয়েছে দেখা যায়। বাংলার নিজস্ব বঙ্কিম চৌচালা ও আটচালা মন্দিরের সঙ্গে উড়িষ্যার জগমোহন-সংলগ্ন রেখ-দেউলও আছে।

বোঝা যায়, উড়িষ্যার রাজা ও বিষ্ণুপুরের রাজা উভয়েরই কর্তৃত্বাধীনে এ-অঞ্চল একসময় ছিল এবং তারই নিদর্শন রয়েছে দেবালয়ের স্থাপত্যের মধ্যে। বগড়ী ও গড়বেতার ইতিহাসেও তাই দেখা যায়। সেকথা পরে বলছি।

গড়বেতার ঐতিহাসিক কীর্তির মধ্যে অনেক নিদর্শনই আজ অবলুপ্ত। আজ থেকে প্রায় ষাট বছর আগে চন্দ্রকোণার একজন অধুনাবিস্মৃত লেখক প্রবোধচন্দ্র সরকার 'শালফুল' নামে একখানি বই লিখেছিলেন। 'শালফুল' প্রধানত রোমান্টিক কাহিনীপ্রবণ উপন্যাস হলেও বগড়ীর ঐতিহাসিক লায়েক হাঙ্গামা তার পটভূমিকা। ১৩২১ সনে প্রকাশিত মতিলাল বিশ্বাসের 'বকদ্বীপ' নামে আর একখানি বইয়ের কথা আগে বলেছি। 'বকদ্বীপ'ও বগড়ীর প্রাচীন ইতিহাস, কিংবদন্তী ও কাহিনী-প্রধান। লায়েকবিদ্রোহকে তার মধ্যে শয়তান ও বর্বরদের বিদ্রোহ বলে চিত্রিত করা হয়েছে। লেখক ইংরেজ কর্তাদের মনোরঞ্জনের জন্য স্থানীয় ইতিহাস যতদূর বিকৃত করা সম্ভব করেছেন। চন্দ্রকোণার প্রবোধচন্দ্র সরকার 'শালফুল' গ্রন্থে তা করেননি। প্রবোধচন্দ্র দেশপ্রেমিকের অনুভূতি ও দৃষ্টি দিয়ে বগড়ীর লায়েক হাঙ্গামার ইতিহাস থেকে উপাদান সংগ্রহ করে শালফুল উপন্যাস রচনা করেছেন। তার ত্রুটিবিচ্যুতি যথেষ্ট আছে। কিন্তু সেটাই বড় কথা নয়। বড় কথা হল ১৯০৫ সালের স্বদেশী আন্দোলনের অনেক আগে শালফুল লেখা এবং কোন শহুরে লোকের লেখা নয়। ষাট বছর আগে রচিত শালফুলের তাই ঐতিহাসিক মূল্য আছে। বইখানি এখন খুবই দুষ্প্রাপ্য। গড়বেতা ও চন্দ্রকোণা অঞ্চলে অনেক অনুসন্ধান করে জরাজীর্ণ দু একটি কপি জোড়াতালি দিয়ে সম্পূর্ণ বইখানা উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। সরকারবংশের বসতবাড়ির ধ্বংসাবশেষ চন্দ্রকোণায় আছে এখনও, কিন্তু বংশধররা কেউ থাকেন না। লেখক যখন শালফুল রচনা করেন তখন তাঁর বয়স ত্রিশ-চল্লিশ বছর আন্দাজ ধরে নিলে, প্রায় এক শতাব্দী আগেকার স্মৃতিকথা শালফুলে পাওয়া যায়। 'গড়বেতা' সম্বন্ধে শালফুলের গ্রন্থকার যে বর্ণনা দিয়েছেন, প্রায় এক শতাব্দী পূর্বেকার একজন প্রত্যক্ষদর্শী স্থানীয় অধিবাসীর বিবরণ হিসাবে তার বিশেষ মূল্য আছে। এইজন্য সেই বিবরণটি আমি এখানে উদ্ধৃত করছি:

"শিলাবতী নদীর পূর্ব উপকূলে গড়বেতার পরিখাবেষ্টিত দুর্গপ্রাকারের

ভগ্নাবশেষ দেখিলে, দুর্গের পূর্বতন বিরাট গঠনচ্ছটা এবং গড়বেতা রাজগণের মহৈশ্বর্যঘটা অদ্যাপি মানব হৃদয়ে স্বতঃই জাগিয়া উঠে। দুর্গের চারিদিকে যথায় চারিটি সুবৃহৎ সিংহদ্বার শোভা পাইত, তাহাদের নাম, উত্তরে লালদরোজা, পূর্বে রাউতাদরোজা, পশ্চিমে হনুমানদরোজা এবং দক্ষিণে পেশাদরোজা, আজও লোকমুখে শুনিতে পাওয়া যায়। এক্ষণে সে সকল তোরণের চিহ্নমাত্র দুই এক স্থলে পড়িয়া রহিয়াছে। গড়ের দক্ষিণপ্রান্তে যে গগনভেদী প্রাসাদশিখরে বসিয়া বগড়ির মহাপ্রতাপশালী রাজন্যবর্গ বিশাল বনরাজির নীলাভ শোভা পরিদর্শন করিতেন আজ তাহা চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া বনগুল্মলতাসমাবৃত প্রস্তরস্তূপে পরিণত হইয়াছে। আর যে সকল বজ্রনিনাদী সুবৃহৎ কামান দুর্গপ্রাকারোপরি সজ্জিত থাকিয়া শত্রুহৃদয়ে ভীতি বিক্ষেপ করিত, তাহা ইংরেজ সুদূর অজ্ঞাত প্রদেশে অপসারিত করিয়াছেন। গড়বেতার পূর্ব সমৃদ্ধির চিহ্ন কিছুই নাই। আছে এখনও সেই সর্বমঙ্গলাদেবীর মন্দির, আর কয়েকটি সুবৃহৎ পুষ্করিণী। গড়ের উত্তরপ্রান্তে মহাশক্তি সর্বমঙ্গলাদেবীর প্রস্তররচিত সুন্দর সুবৃহৎ মন্দির এবং কয়েকটি দীর্ঘিকা. কালের সর্বসংহারক শক্তির প্রতিকূল আজও দণ্ডায়মান থাকিয়া গড়বেতার প্রাচীন নৃপতিবৃন্দের শৌর্য এবং মহৈশ্বর্য কাহিনী ক্ষীণস্বরে পরিকীর্তন করিতেছে" —(শালফুল, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ)।

বগড়ী পরগণা মল্লভূমের (বিষ্ণুপুর) রাজারা একাধিকবার নানাকারণে দখল করেন এবং স্থানীয় রাজারাও তাঁদের অধীনতা স্বীকার করে রাজ্য চালান। বগড়ীর রাজা ছত্র সিংহের পুত্র তিলকচন্দ্র এবং তিলকচন্দ্রের পুত্র তেজচন্দ্র সিংহ। তেজচন্দ্রের আমলে বিষ্ণুপুরের রাজারা গডবেতা দখল করেন এবং মল্লবংশের দুর্জন সিংহ রাজা হন। গড়বেতার দেবালয়ের মধ্যে বিষ্ণুপুরের বঙ্কিম আটচালা ধরনের রাধামাধব মন্দিরে তার প্রমাণ রয়েছে আজও। বাংলা রীতির এই মন্দিরের গায়ে যে লিপি আছে তাতে লেখা আছে :

শ্রীশ্রীকৃষ্ণঃ শ্রীরাধিকাব্রজপুরন্দরয়োম পদাব্জে মল্লস্থ পক্ষনবশেবধি সংখ্যকাব্দে
শ্রীমল্লভূরমণ দুর্জনসিংহ দেবঃ সৌধনেবেদয়দিদম্ স্পৃহয়াদরেন ৯৯২ মল্লাব্দ।

বিষ্ণুপুরের দুর্জনসিংহের পর খয়রামল্ল বগড়ীর রাজা হন। খয়রামল্লের রাজত্বকালে ময়ূরভঞ্জ থেকে সসৈন্যে শামশের বাহাদুর বগড়ী অভিযান করেন। গড়বেতা ও গোয়ালতোড় ছাড়াও, এই সময় থেকে মঙ্গলাপোতায় বগড়ী রাজবংশের বসতবাড়ি স্থাপিত হয়।

আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে দেখা যায়, বগড়ী পরগণা সরকার জলেশ্বরের অন্তর্ভুক্ত। উড়িষ্যার রাজারা এই সময় (ষোড়শ শতাব্দীর শেষে) বগড়ী পর্যন্ত অধিকার বিস্তৃত করেছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীর শেষদিকের কথা। তা না হলে বগড়ী পরগণা সরকার জলেশ্বরের অন্তর্ভুক্ত হত না। এ ছাড়া অন্য প্রমাণও আছে। গড়বেতা থানার মধ্যে, চন্দ্রকোণা-রোড-স্টেশনের প্রায় ছয় মাইল দক্ষিণ-পূর্বে 'উড়িয়াশাহি' নামে একটি গ্রাম আছে। ওড়িয়া ভাষায় 'শাহি' কথার অর্থ পল্লী, পাড়া বা গ্রাম। ওড়িয়াদের বসতি এখানে গড়ে উঠেছিল বলে এর নাম উড়িয়াশাহি। বগড়ী পর্যন্ত উড়িষ্যার রাজাদের এককালীন প্রভুত্ব বিস্তারের উজ্জ্বল নিদর্শন এই গ্রামটি। এই সময় উড়িষ্যার দেবালয়ের স্থাপত্যের অনুকরণে বগড়ী অঞ্চলে নির্মিত দেবালয়সমূহের মধ্যে প্রধান হল গড়বেতার সর্বমঙ্গলা মন্দির।

সর্বমঙ্গলা মন্দির সম্বন্ধে গড়বেতা অঞ্চলে অনেক কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। 'শালফুলের' গ্রন্থকার এরকম দুএকটি কিংবদন্তীর কথা উল্লেখ করেছেন। প্রধানত সর্বমঙ্গলা মন্দিরের উত্তর দিকের দ্বার কেন্দ্র করেই কিংবদন্তীগুলি রচিত হয়েছে। যেমন, উজ্জয়িনীতে মহারাজ বিক্রমাদিত্য যখন রাজা ছিলেন তখন একজন যোগীপুরুষ বগড়ীর বনপ্রদেশ ঘুরতে ঘুরতে আসেন। গভীর অরণ্য মধ্যে তিনি মন্ত্রবলে সর্বমঙ্গলাদেবীর মন্দির নির্মাণ করেন। তারপর মহারাজা বিক্রমাদিত্য লোকমুখে গড়বেতার সর্বমঙ্গলাদেবীর মহাশক্তির মাহাত্ম্য-কথা শুনে নিজে গড়বেতায় আসেন এবং শবসাধনা করেন। মহারাজের শব-সাধনায় খুশি হয়ে দেবী তাঁকে অলৌকিক শক্তি প্রদর্শনের ক্ষমতা দেন এবং তালবেতালকে তাঁর আজ্ঞাধীন অনুচর করেন। মহারাজা শক্তি পরীক্ষার জন্য তালবেতালকে আদেশ করেন, দেবীর মন্দির উত্তরমুখী করতে। তার ফলেই মন্দির উত্তরমুখী হয় এবং তালবেতালের নাম থেকেই 'বেতা' ও 'গড়বেতা' নাম হয়।

মহারাজা বিক্রমাদিত্যকে নিয়ে অনেক কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, তার মধ্যে এও একটি। কোন কোন জনশ্রুতির মূল থাকলেও, এ জনশ্রুতির কোন মূলই কোথাও খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। যোগীপুরুষ একজন কেন, একাধিক বগড়ীর বনময় অঞ্চলে সাধনোদ্দেশ্যে আসতে পারেন। কিন্তু বিক্রমাদিত্য গড়বেতায় আসেননি। মন্ত্রবলে মন্দিরও তৈরি হয়নি, অথবা তালবেতাল

তাকে চ্যাংদোলা করে তুলে উত্তরদ্বারী করে দেয়নি। সর্বমঙ্গলার মন্দিরটি আগাগোড়া উড়িষ্যার রেখ-দেউলের রীতি অনুযায়ী তৈরি। ষোড়শ শতাব্দীর শেষে বা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মন্দিরটি তৈরি হয়েছিল মনে হয়। বগড়ী পর্যন্ত উড়িষ্যার রাজারা যখন অধিকার বিস্তার করেছিলেন এবং যখন সরকার জলেশ্বরের অধীন ছিল বগড়ী, তখনকার ওড়িয়া স্থাপত্যকীর্তি হল সর্বমঙ্গলা মন্দির। মন্দির নির্মাণের কাজে যেসব ওড়িয়া শিল্পী ও কারিগর সেই সময় উড়িষ্যা থেকে উত্তর-মেদিনীপুরে এসেছিলেন, তাঁরাই একস্থানে বসতি স্থাপন করে বসবাস করতেন উড়িয়াশাহীর মতন গ্রামে। বিদেশীদের কলোনির মতন উড়িয়াশাহীও ওড়িয়াদের কলোনী ছাড়া কিছু নয়।

সর্বমঙ্গলার মন্দিরে প্রায় ত্রিশ হাত আন্দাজ সুড়ঙ্গের মতন পথের ভিতর দিয়ে গিয়ে দেবীমূর্তির সামনে উপস্থিত হতে হয়। পূজারীর নির্দেশ ভিন্ন সেখানে যাওয়া সম্ভব নয়। দিনের বেলা, ভর-দুপুরে আমরা দেখেছি, কৃষ্ণপক্ষের রাত্রির মতন মন্দিরের গর্ভগৃহটি অন্ধকার। পাশাপাশি গেলেও কাউকে চেনা যায় না। কামরূপের কামাখ্যা মন্দিরের কথা এ-প্রসঙ্গে মনে পড়ে। দেবীমূর্তির বামদিকে একটি সযত্নে রক্ষিত পাথরের আসন, পঞ্চমুণ্ডির আসন বলে কথিত। গর্ভগৃহে প্রবেশপথের সামনে দুপাশে দুটি পাথরের মূর্তি আছে, একটি দেবীমূর্তি, আর একটি দণ্ডায়মান পুরুষমূর্তি, ভৈরব বলে কথিত। এই মূর্তি দুটি গড়বেতা অঞ্চলেই কোন সময় পাওয়া গিয়েছিল, তুলে নিয়ে এসে মন্দিরে রাখা হয়েছে। দেবীমূর্তিটি কোন বৌদ্ধদেবীর মূর্তি বলে মনে হয়, বেশ বড় মূর্তি। সর্বমঙ্গলার মূর্তি ভয়ঙ্কর মূর্তি। মুখটি ভাল করে নিরীক্ষণ করলে (বিশেষ করে দাঁতের পাটি) ভয়াবহতা প্রকট হয়ে ওঠে। একসময় এখানে নরবলিও হত শোনা যায়। মূর্তি দেখে এবং নরবলি ইত্যাদির কাহিনী শুনে অনুমান করা যায়, এককালে এ অঞ্চলের ভয়ঙ্কর সব বনদেবীর মতন (রঙ্কিণী, চম্‌কিনী ইত্যাদি) এখানেও কোন বিখ্যাত বনদেবী ছিলেন। বনবাসীদের পূজ্য দেবী ছিলেন তিনি এবং ডাকাতি, দাঙ্গাহাঙ্গামা, যুদ্ধবিগ্রহের সময়, নরবলিও তাঁর সামনে হত। রাজপোষকতায় ক্রমে বনদেবী গড়বেতার সর্বাধিক প্রতিপত্তিশালী দেবী হয়েছেন, এবং বন থেকে মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। এরকম কোন অতীতের ইতিহাস সর্বমঙ্গলাদেবীর থাকা আশ্চর্য নয়।

গড়বেতার রায়কোটা দুর্গের চারিদিকে চারিটি দেবতা আছেন, প্রহরীর মতন। গোরাখাঁ পীর, ওলাইচণ্ডী, বাঘ রায়, বারভূঞা। মুসলমান ও হিন্দু দেবদেবী মিলে রাজদুর্গ পাহারা দিচ্ছেন, এরকম দৃষ্টান্ত এ অঞ্চলে বিরল। ধর্মরাজ ঠাকুর আছেন, জেলেদের ঠাকুর, এখন ব্রাহ্মণরা পৌরোহিত্য করেন। বাঘ রায় নামটিও এই বনময় অঞ্চলের বিশেষত্ব, কারণ বাঘের উপদ্রব এক সময় খুব বেশি ছিল। বাঘেরও পুজো করত বনবাসীরা। পরে বাঘরায় ধর্মঠাকুরের নাম হয়েছে। বাঘের পুজো করত যারা, তারাই ধর্মরাজের নাম দিয়েছে বাঘ রায়।

গড়বেতার দুর্গের ভগ্নস্তূপের চারকোণে চার দেবদেবী আজও আছেন, হিন্দু ও মুসলমান দেবদেবী। কি তাঁরা পাহারা দিচ্ছেন, তাঁরাই জানেন, কারণ দুর্গও নেই, রাজাও নেই। কোন ইংরেজ-দেবতা নেই। গন্‌গনির মাঠে ইংরেজদের স্মৃতি আছে, লায়েকবিদ্রোহ দমনের স্মৃতি। বিদ্রোহী বীর শহীদদের কথা মনে করে গড়বেতার 'লায়েক' উপাধি একসময় সম্মানসূচক উপাধি বলে গণ্য হত। ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরাও লায়েক উপাধি ব্যবহার করতেন। শুনলে রোমাঞ্চ হয়। অথচ যে ইতিহাস আমরা মুদ্রিত গ্রন্থে পড়ি, তার কোথাও তা লেখাজোখা নেই ইংরেজ শাসকরা গড়বেতা দুর্গের হিন্দু-মুসলমান দেবতা-প্রহরীদের সাক্ষীগোপালে পরিণত করেছেন। অতীতের সাক্ষী তাঁরা, বর্তমানে তাঁদের কোন কর্তব্য বা দায়িত্ব নেই।

চন্দ্রকোণা

উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর মেদিনীপুর থেকে পূর্ব মেদিনীপুরের দিকে যাত্রা করলে প্রথমে ঘাটাল মহকুমা অতিক্রম করতে হয়। ঘাটালের দক্ষিণে তমলুক মহকুমা। ঘাটাল ও তমলুক নিয়ে মেদিনীপুরের পূর্ব সীমান্ত। ঝাড়গ্রাম থেকে যাত্রা করে, মেদিনীপুরের উত্তর সীমান্ত পরিক্রমা করে, আমরা পূর্ব-সীমান্তে পদক্ষেপ করেছি। মেদিনীপুরের এই উত্তর-পূর্ব সীমান্তের ঠিক সঙ্গমস্থলে চন্দ্রকোণা। অতি প্রাচীন সুসমৃদ্ধ জনপদ চন্দ্রকোণা আজ ধ্বংসস্তূপে পরিণত বললেও ভুল হয় না। সমৃদ্ধির অনেক কারণও আজ অপসারিত। অন্যদিক থেকে চন্দ্রকোণার আজও একটি গুরুত্ব আছে। মেদিনীপুরের আঞ্চলিক ইতিহাসে তো বটেই, পশ্চিমবাংলার ইতিহাসেও। সেটি সাংস্কৃতিক গুরুত্ব। পশ্চিম ও পূর্ব থেকে দুটি স্বতন্ত্র সংস্কৃতিধারার বিচিত্র মিলন ও বিচ্ছেদ হয়েছে চন্দ্রকোণায। উৎকলের রাজারা একাধিকবার মেদিনীপুর পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় আধিপত্য বিস্তার করেছেন এবং তার ফলে সাংস্কৃতিক লেনদেনও হয়েছে। মেদিনীপুরে তার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নিদর্শন রয়েছে দেবালয়-স্থাপত্যে। একমাত্র ঘাটাল মহকুমা এই প্রভাব থেকে অনেকটা মুক্ত। চন্দ্রকোণা এই প্রভাবাঞ্চলের শেষ সীমানা মনে হয়।

বাংলাদেশের অধিকাংশ প্রাচীন জনপদের ধারাবাহিক ইতিহাস পুনরুদ্ধার করা খুব কঠিন। বিচিত্র সব কিংবদন্তীর অন্তরালে এমনভাবে আসল ইতিহাস আত্মগোপন করে থাকে যে সহজে তার লুপ্ত ধারাটি খুঁজে পাওয়া যায় না। চন্দ্রকোণার লুপ্ত ইতিহাস সম্বন্ধেও তাই বলা যায়। ইতিহাস যখন ছোটবড়, রাজবংশের প্রতাপ ও ঐশ্বর্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিল, তখন কিংবদন্তী-গুলিও "এক যে ছিল রাজার" কাহিনী কেন্দ্র করে রচিত ও প্রচলিত হওয়া স্বাভাবিক। চন্দ্রকোণার অতীত ইতিহাস সম্বন্ধেও এরকম অনেক রাজা ও রাজবংশের কীর্তিকথা লোকমুখে শোনা যায়। যেমন, মহাভারতের মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেনের সমসাময়িক চন্দ্রকেতু নামে কোন রাজা চন্দ্রকোণায় রাজত্ব করতেন। চন্দ্রকোণা নাম তাঁর নাম থেকেই হয়েছে। ইন্দ্রকেতু নামে রাজ-পুত রাজা চন্দ্রকোণায় ছিলেন। নরেন্দ্রকেতু ছিলেন। চৌহানবংশীয় বীরভানু

সিংহ চন্দ্রকোণার রাজা ছিলেন। হরিভানু নামে আর এক রাজা ছিলেন। তারপর রাজা মিত্রসেন। এরকম অনেক রাজার কাহিনী চন্দ্রকোণা প্রসঙ্গে শোনা যায়। শুনতে ভাল লাগে, রূপকথার মতন রোমাঞ্চকর। অনেক গড়, অনেক পুষ্করিণী, অনেক মন্দির, তাঁদের গৌরবময় স্মৃতির সঙ্গে জড়িত। শুধু রাজাদের নয়, রানীদের নিয়েও অনেক গল্প আছে। যেমন, চন্দ্রকোণার রাজা নরেন্দ্রকেতুর পুত্র চন্দ্রকেতু দীর্ঘকাল রাজত্ব করবার পর চন্দ্রকোণার শ্রীবৃদ্ধিতে ঈর্ষান্বিত হয়ে বগড়ীর রাজা রঘুনাথ সিংহ চন্দ্রকোণা আক্রমণ করেন। বৃদ্ধ চন্দ্রকেতু যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের মতন প্রাণ বিসর্জন দেন। সেই দুঃখে রাজ-মহিষীরাও জহরব্রত করে প্রাণোৎসর্গ করেন। যেস্থানে তাঁরা এই কঠিন ব্রত উদ্‌যাপন করে জীবনদান করেন সেই স্থানেই এখন 'জহর পুষ্করিণী' আছে। এরকম অনেক কাহিনী চন্দ্রকোণার পথে-ঘাটে শোনা যায়। তার অবশ্য একটা যুক্তি আছে। চন্দ্রকোণা প্রাচীন জনপদ। মধ্যযুগের আরও অনেক জনপদের মতন, এখানেও স্থানীয় ভূস্বামীরা ও সামন্তরা রাজকীয় প্রতাপে রাজত্ব করতেন। তাঁদের অনেকেরই ইতিহাস লেখাজোখা নেই। যা আছে, তা ঐ প্রাচীন গড়বাড়ি ও জীর্ণ দেবালয়ের ধ্বংসাবশেষ। তা অনেক আছে চন্দ্রকোণায়। তার সামনে দাঁড়ালেই কল্পনাপ্রবণ মন স্বভাবতঃই কিংবদন্তীর জন্য আকুল হয়ে ওঠে। নিরেট পাথুরে প্রমাণের পক্ষপাতী ঐতিহাসিকদের লৌহচিত্তেও রোমাঞ্চের সঞ্চার হয়। সুললিত সহজবোধ্য গদ্য লিখতেও অক্ষম যাঁরা, তাঁরাও কাব্য-রচনার জন্য উন্মুখ হয়ে ওঠেন। সাধারণ লোক তো হবেই। সাধারণ মানুষের মন নিরেট ঐতিহাসিকদের মতন 'সলিড' নয়। কিংবদন্তীর পক্ষে এইটুকুই যুক্তি। চন্দ্রকোণার কিংবদন্তীর যুক্তিও তাই।

কিংবদন্তীর আড়াল থেকে ইতিহাসের যে ক্ষীণ কাঠামোটি চোখের সামনে ভেসে ওঠে তা মোটামুটি বিশ্বাসযোগ্য বলা যায়। সেটি পাণ্ডব ভীমসেনের সমসাময়িক কোন রাজার কাহিনী নয়। মনে হয়, বগ্‌ড়ীর মতন চন্দ্রকোণাও বিষ্ণুপুরের মল্লরাজাদের অধিকারভুক্ত ছিল। পঞ্চদশ কি ষোড়শ খৃস্টাব্দের কোন সময় বগড়ী চন্দ্রকোণা প্রভৃতি অঞ্চলে বিদেশী বা দেশী সামন্তরা আধিপত্য বিস্তার করেন। সেকালে স্থানীয় সামন্তদের এরকম আঞ্চলিক আধিপত্য ও স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার ব্যাপার ইতিহাসের নৈমিত্তিক ঘটনা ছিল। বগড়ীর গজপতি সিংহের সমসাময়িক ইন্দ্রকেতু নামে কোন রাজা সেই সময় চন্দ্রকোণার সামন্ত

হন। ইন্দ্রকেতুর পরে নরেন্দ্রকেতুর কথা শোনা যায়। নরেন্দ্রকেতুর পুত্র চন্দ্রকেতুর সময় বগড়ীর রাজারা চন্দ্রকোণা দখল করেন। ষোড়শ খৃষ্টাব্দের শেষে বা সপ্তদশের প্রথমে চৌহান বংশীয় বীরভানু নামে কোন রাজা চন্দ্রকোণায় রাজত্ব করেন। এই সময় চৌহানবংশীয় চৌহানসিংহ বগড়ী রাজ্য দখল করেন। বীরভানুর পর হরিভানু বা হরিনারায়ণ চন্দ্রকোণার রাজা হন। হরিভানুর পত্নী লক্ষ্মণাবতী বিষ্ণুপুর রাজবংশের হোলমল্লের কন্যা এবং নারায়ণমল্লের ভগিনী। এই লক্ষ্মণাবতী রাজা মিত্রসেনের মাতা।

এখনও কিংবদন্তী ও কল্পনার মেঘলোক ছেড়ে আমরা বাস্তব ইতিহাসের মর্ত্যলোকে অবতরণ করতে পারিনি। চন্দ্রকোণার স্থানীয় সামন্তদের ইতিহাস কিছুটা পুনরুদ্ধার করা সম্প্রতি সম্ভব হয়েছে। নবাবিষ্কৃত 'বাহারিস্তান-ই-ঘায়েবী' নামক ফার্সী বিবরণটির ইংরেজী অনুবাদ গ্রন্থাকারে টীকা টিপ্পনিসহ আসাম গভর্নমেণ্টের পুরাতত্ত্ব বিভাগ থেকে প্রকাশিত হয়েছে। মোগলযুগে, জাহাঙ্গীর বাদশাহের রাজত্বকালের গোড়ার দিকে (সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে) বাংলাদেশের জমিদারদের বিরুদ্ধে মোগল অভিযানের কাহিনী 'বাহারিস্তানে' সবিস্তারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এই বিবরণের ঐতিহাসিক মূল্য অবিসংবাদিত। 'বাহারিস্তানের' মধ্যে মেদিনীপুরের অন্যান্য জমিদারদের সঙ্গে চন্দ্রকোণা, বরদা প্রভৃতি অঞ্চলের জমিদারদের নাম পাওয়া যায়। তাতে দেখা যায়, সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বাংলার জমিদারদের বিরুদ্ধে মোগল অভিযানের সময়, চন্দ্রকোণার ভূস্বামী বলে চন্দ্রভান ও বীরভান নামে দু'জন জমিদারের নাম উল্লেখ রয়েছে। চন্দ্রভান সম্পর্কে বলা হয়েছে :

......One of the Shiqdars (revenue agents) of Ihtimam Khan......who was the Shiqdar of Jahanabad, brought Chandrabhan and other Zamindars of Chandrakuna, Barda and Jhakra to the presence of Mirza Nathan· The Mirza despatched his elder brother Mirza Muhammad Murad appointing him as the Fawjdar of that region along with seven hundred horsemen, seventeen hundred infantry consisting of expert musketeers and archers, ten war-elephants and other epuipments of war. The

whole of these territories (Chandrakuna etc.) were assigned as Jagirs to Chandrabhan and other Zamindars... The Zamindar of Barda named Dalpat, who was a minor and was a near relation of Chandrabhan, was kept in his (Nathan's) service......But as Fate decreed......Chandrabhan as well as other Zamindars proved disloyal and did not join the expedition. It became incumbent upon Muhammad Murad to punish these people first of all. (Baharistan-i-Ghaybi : Vol 1, P. 130)

জাহানাবাদের শিকদার ইতিমাম খাঁ চন্দ্রকোণা, বরদা ও ঝাকরার (ঝাড়গ্রাম ?) জমিদারদের মিরজা নাথনের কাছে তলপ করে আনেন। মিরজা তাঁর অগ্রজ মুরাদকে ফৌজদার করে বহু সৈন্যসামন্তসহ পাঠান। চন্দ্রকোণা, বরদা প্রভৃতি অঞ্চল জায়গীর হিসাবে চন্দ্রভান ও অন্যান্য ভূস্বামীরা ভোগ করতেন। বরদার জমিদার দলপৎ তখন নাবালক ছিলেন এবং তিনি চন্দ্রভানের একজন নিকট আত্মীয়। এই সব ভূস্বামীদের মোগলদের পক্ষে যুদ্ধাভিযানে যোগ দেওয়ার কথা ছিল, কিন্তু চন্দ্রভান বা অন্যান্য জমিদাররা তা দেননি। তার জন্য মুরাদ তাঁদের দণ্ড দিতে বাধ্য হন। এসব কথা 'বাহারিস্তানে' আছে। পরিষ্কার বোঝা যায়, জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে, সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে, চন্দ্রভান নামে কোন জায়গীরদার চন্দ্রকোণার অধিপতি ছিলেন। এও জানা যায় যে, তাঁরই বংশের কোন নিকট আত্মীয় বরদার জায়গীরদার ছিলেন। উভয়েই মোগলদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে দণ্ডিত হয়েছিলেন। চন্দ্রভান ছাড়া বীরভান নামে আর একজন ভূস্বামীর উল্লেখ আছে 'বাহারিস্তানে' (পৃঃ ৩২৮)। সেখানে বলা হয়েছে :

......if he learnt that Bahadur Khan Hijliwal and Birbhan, Zamindar of Chandrakuna were unwilling to present themselves (at the governor's court), they should be brought by force by any means he thought best. (Baharistan, Vol 1, 328).

'ভান' উপাধিসহ দু'জন জমিদারের নাম 'বাহারিস্তানের' মধ্যে পাওয়া

যায়। মনে হয়, ভান উপাধিধারী বা ভানবংশীয় জমিদাররা একসময় চন্দ্রকোণায় প্রভুত্ব করতেন। সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে চন্দ্রভানের নাম পাওয়া যায়, কিন্তু কয় পুরুষ ধরে তাঁরা জায়গীর ভোগ করছিলেন, তা জানা যায় না। ভানদের আগে পাঠান আমলে বা হিন্দু আমলে কারা আধিপত্য করতেন, তাও জানবার উপায় নেই। চন্দ্রকেতু নামে চন্দ্রকোণার যে রাজা কল্পনা ও কিংবদন্তীর অস্পষ্ট মেঘলোকে বিরাজ করছেন, তাঁর বাস্তব ইতিহাস জানবার উপায় নেই। চন্দ্রকোণায় প্রবাদ আছে যে, ভানবংশের বীরভান চন্দ্রকেতু-বংশের শেষ রাজাকে গদিচ্যুত করে চন্দ্রকোণার রাজা হন। আমরা দেখেছি, চন্দ্রভানের পরবর্তী জমিদার বলে 'বাহারিস্তানে' বীরভানের নাম করা হয়েছে। চন্দ্রভানকে গদিচ্যুত করে বীরভানের পক্ষে চন্দ্রকোণা দখল করাও আদৌ আশ্চর্য নয়। হয়ত তিনি তাই করেছিলেন এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে চন্দ্রভান লোকপ্রবাদে চন্দ্রকেতু হয়েছেন। কিন্তু ভানবংশ ঠিক আছে, বীরভানও ঠিক আছে। বীরভানের পুত্র হরিনারায়ণ বা হরিভান। সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিক যদি চন্দ্রভানের শেষ রাজত্বকাল ধরা যায়, তাহলে হরিভানের রাজত্বকাল প্রায় সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি হয়। চন্দ্রকোণার বিখ্যাত লালজীর মন্দিরে যে সুদীর্ঘ শিলালিপিটি আছে, তার পাঠোদ্ধার করলেও এই ইতিহাসের আশ্চর্য সমর্থন পাওয়া যায় এবং ঐতিহাসিক কালও মিলে যায়। শিলালিপিটি উদ্ধৃত করে দিচ্ছি।[১] শিলালিপিটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব খুব বেশি বলে তার পাঠোদ্ধার শুদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। বাসুদেবপুরের (ঘাটাল) পণ্ডিত শ্রীপঞ্চানন রায় কাব্যতীর্থ মহাশয় (আমার ভ্রমণসঙ্গী ছিলেন) এই শিলালিপির পাঠোদ্ধারে আমাকে সাহায্য করেছেন। লিপিটি এই :

শুভমস্তু শকাব্দাঃ ১৫৭৭

শাকেঽশ্বি মুনিবানেন্দৌ বৈশাখে শুক্লপক্ষকে
তৃতিয়ায়াং ভৃগুদিনে আরম্ভোঽস্য বভূবহ
শ্রীহরিনারায়ণ নৃপস্য পত্নী শ্রীলক্ষ্মণাবতী
শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োঃ প্রীত্যে নবরত্নমিদং দদৌ
রাধাকৃষ্ণ পদারবিন্দ রসিকা শ্রীবীরভানোর্বধূ

১ যোগেশচন্দ্র বসুর 'মেদিনীপুরের ইতিহাস' গ্রন্থে শিলালিপির যে পাঠ দেওয়া হয়েছে, ৩২৫ পৃষ্ঠার পাদটীকায়, তা নির্ভুল নয়।

পত্নী শ্রীহরিনারায়ণস্য নৃপতেঃ প্রখ্যাতকীর্ত্তেঃ ক্ষিতৌ
মাতা শ্রীযুত মিত্রসেন পতেঃ শ্রীহোলরায়াত্মজা
শ্রীনারায়ণ মল্লভূপভগিনী রম্যং দদৌ মন্দিরম্
গিরিধারি পদাম্ভোজে নবরত্নমিদং শুভং
নির্মায় বহুযত্নেন সমর্পিতবতী মুদ্রা
পৌরাণিক শ্রীমোহন চক্রবর্ত্তী শ্রীগোকুল দাস

হরিনারায়ণের পত্নী, বীরভানের পুত্রবধূ, মিত্রসেনের মাতা হোলরায়ের কন্যা এবং মল্লভূপ শ্রীনারায়ণের ভগিনী এই নবরত্ন মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। 'শাকেঽশ্বি মুনিবানেন্দৌ' এই পংক্তির অর্থ ১৫৭১ শকাব্দে মন্দির নির্মাণ আরম্ভ হয়। অর্থাৎ ১৫৭১ এবং ১৫৭৭ শকাব্দে যথাক্রমে এ মন্দিরের আরম্ভ ও নির্মাণকার্য সমাপ্ত হয়। ১৫৭১ শকাব্দ = ১৬৪৯ খৃস্টাব্দ এবং ১৫৭৭ শকাব্দ = ১৬৫৫ খৃস্টাব্দ। হরিভান বা হরিনারায়ণের রাজত্বকাল—চন্দ্রভান-বীরভান-হরিভান—এই পরম্পরা ধরে বিচার করলে, 'বাহারিস্তানের' উল্লিখিত সময়ের সঙ্গে মিলে যায়। চন্দ্রকোণার এই ইতিহাসটুকুই প্রামাণিক এবং নির্ভরযোগ্য।

সপ্তদশ শতাব্দীতে যখন ভানবংশের রাজারা (সেকালের শক্তিশালী জায়গীরদার-জমিদাররা সকলেই প্রায় 'রাজা' খিতাব পেতেন) চন্দ্রকোণায় রাজত্ব করতেন, তখন চন্দ্রকোণার স্বর্ণযুগ। আমার ধারণা, 'বাহারিস্তানে' যে চন্দ্রভান রাজার নাম আছে, তাঁর নামেই চন্দ্রকোণা নাম হয়েছে। 'বাহান্ন বাজার তিপ্পান্ন গলি' নিয়ে যে চন্দ্রকোণা, কথায় বলে, তার পত্তন সেই সময় হয়েছিল। তাঁতশিল্প, চিনি, বাসনকোসন, ঘি ইত্যাদি চন্দ্রকোণার বিখ্যাত ব্যবসায়ের দ্রব্য বলে গণ্য ছিল। চন্দ্রকোণার সেই অতীতের সমৃদ্ধি এখন আর নেই, তার স্মৃতিচিহ্নও নেই। পথে পথে বড় বড় অট্টালিকা ও বসতবাড়ি এবং অগণিত দেবালয়ের ধ্বংসাবশেষ চন্দ্রকোণার অতীত সমৃদ্ধির সাক্ষী।

দেবদেউলের সংখ্যা চন্দ্রকোণায় আজও যা আছে, দেখলে অবাক হতে হয়। একসময় যে কত ছিল এবং কেবল সন্ধ্যারতির ঘণ্টা বাজলে চন্দ্রকোণার 'বাহান্ন-বাজার তিপ্পান্ন গলি' যে কিভাবে সরগরম হয়ে উঠত, তা যে কেউ চন্দ্রকোণায় পদার্পণ করলেই কল্পনা করতে পারবেন। ঘুরতে ঘুরতে মনে হয়, পাড়ার যেন শেষ নেই, অলিগলির যেন অন্ত নেই। এমন কোন পাড়া বা

গলি নেই চন্দ্রকোণায়, যেখানে কয়েকটি জীর্ণ দেবালয় নেই। সবই প্রায় পরিত্যক্ত ও জীর্ণ। মনে হয়, একসময় প্রত্যেক বর্ধিষ্ণু পরিবারের প্রতিষ্ঠিত দেবালয় ছিল চন্দ্রকোণায়। পরিত্যক্ত ভদ্রাসন-গৃহের সংলগ্ন দেবালয় অনেক আছে। ঘরবাড়ি ছেড়ে মানুষ চলে গেছে, দেবালয় ছেড়ে দেবতারাও চলে গেছেন। চন্দ্রকোণার তন্তুবায় বণিকদের পাড়াটি দেখলে যে কেউ স্তম্ভিত হয়ে যাবেন। কলকাতার যে-কোন প্রাসাদবহুল এলাকার মতন একটি পাড়া, কিন্তু প্রতিটি অট্টালিকা জীর্ণ ও পরিত্যক্ত, ঠিক ভূতের বাড়ির মতন। একটি গ্রামের মধ্যে এরকম বিস্তৃত ধ্বংসস্তূপ সচরাচর দেখা যায় না।

পশ্চিম, দক্ষিণ ও উত্তর মেদিনীপুরের দেবালয় স্থাপত্যে উড়িষ্যার প্রভাব খুব বেশি দেখা যায়। মেদিনীপুর পর্যন্ত উৎকলের রাজারা অভিযান করে একাধিকবার দখল করেছেন এবং তখন তাঁরা যেসব দেবালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন তা নিজেদের দেশীয় রীতি অনুযায়ী। মনে হয়, উৎকলের শাসকদের সঙ্গে সেখানকার শিল্পীরাও বাংলাদেশে এসেছিলেন এবং বাঙালী শিল্পীদের সঙ্গে আদানপ্রদানও হয়েছিল। বাঙালী শিল্পীরা নিজেদের দেবালয়-স্থাপত্যের স্বাতন্ত্র্য যে বর্জন করেননি শেষ পর্যন্ত, বাংলার বঙ্কিম চৌচালা ও আটচালা লোকালয়ের মতন দেবালয়গুলি তার প্রমাণ। উড়িষ্যার রেখ-দেউল নিয়ে পরীক্ষা করে বাঙালী শিল্পীরা শেষ পর্যন্ত পঞ্চরত্ন, নবরত্ন মন্দিরের রত্ন বা অলঙ্কাররূপে ব্যবহার করেছেন। মন্দিরের মৌলিক গড়ন বঙ্কিমাকার বাংলার কুটিরের মতন রেখেছেন। উড়িষ্যার দেবালয়-স্থাপত্যের একটানা প্রভাব পূর্বাভিমুখে প্রথমে যেন চন্দ্রকোণায় এসে রুদ্ধ হয়েছে মনে হয়। ঠিক এইখান থেকেই আরম্ভ হয়েছে বলা চলে, বিষ্ণুপুর-কেন্দ্রিক বাংলার নিজস্ব দেবালয়-স্থাপত্যের প্রভাব। বিষ্ণুপুর ঘাটাল, হুগলী মিলে বাংলার নিজস্ব স্থাপত্য-রীতির যে দুর্ভেদ্য ব্যূহ রচিত হয়েছে, তার মধ্যে উড়িষ্যার স্থাপত্যরীতি প্রবেশাধিকার পায়নি বলে মনে হয়। চন্দ্রকোণাই যেন তার সীমানা। উড়িষ্যার রীতি দেবালয়-স্থাপত্যে সামান্য প্রতিফলিত হলেও পশ্চিমবাংলার নিজস্ব রীতির প্রভাব এখানে অনেক বেশি। পঞ্চরত্ন মন্দিরের ছড়াছড়ি পথে। চাঁদনিরীতির মন্দিরও যথেষ্ট। লালজীর মন্দিরটি বৃহৎ বাংলা মন্দির, আটচালা। চারচালা ও পঞ্চরত্ন মন্দিরও প্রাঙ্গণের মধ্যে আছে। এমনকি একটি পাথরের জোড়বাংলা মন্দিরও আছে চন্দ্রকোণায়, যা নির্মাণকৌশলে

ইঁটের মন্দিরকেও হার মানায়। বোঝা যায়, বিষ্ণুপুরের স্থাপত্যরীতির প্রভাব চন্দ্রকোণার সীমান্তে উড়িষ্যার রীতিকে প্রতিহত করেছে। চন্দ্রকোণার পর থেকে ঘাটাল, হুগলী পর্যন্ত বাংলা স্থাপত্যরীতির একচ্ছত্র প্রতিপত্তি দেখা যায়, যেমন লোকালয়ে, তেমনি দেবালয়ে।

চন্দ্রকোণায় সব সম্প্রদায়েরই দেবদেবী আছেন, থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু তার মধ্যে ধর্মঠাকুর ও কামিন্যার প্রতিপত্তিই উল্লেখযোগ্য। পশ্চিমবঙ্গে ধর্ম-ঠাকুরের প্রভাব-এলাকা প্রসঙ্গে চন্দ্রকোণার বিশেষ গুরুত্ব আছে বলে মনে হয়। চন্দ্রকোণার পশ্চিমে মেদিনীপুরের বিস্তৃত অঞ্চলকে ধর্মঠাকুর বর্জিত অঞ্চল বললে ভুল হয় না। আমি যতদূর জানি ও খবর পেয়েছি, গোটা ঝাড়গ্রাম মহকুমায় ধর্মঠাকুর কোথাও নেই। দক্ষিণে কাঁথি মহকুমায়, দু'একটি ধর্ম-ঠাকুরের কথা লোকমুখে শুনেছি, তেমন বিশ্বাসযোগ্য নয়। ধর্মনিরঞ্জনপন্থী কোন সম্প্রদায় বা পরিবার ঐ স্থানে গিয়ে বসবাস করার জন্যও হয়ত ধর্মপূজা করতে পারেন। তমলুক মহকুমায় এখনও পর্যন্ত যতটুকু খবর পেয়েছি তাতে ময়না ছাড়া আর কোথাও ধর্মঠাকুরের বিশেষ পূজার্চনা হয় না। উত্তর মেদিনী-পুরের গড়বেতা-চন্দ্রকোণা থেকে ধর্মঠাকুরের প্রতিপত্তি আরম্ভ হয়েছে বলা চলে। গড়বেতা-চন্দ্রকোণা থেকে আরম্ভ করে পুবে হুগলীর আরামবাগ মহকুমা, দক্ষিণ-পুবের ঘাটাল মহকুমা, উত্তরে বিষ্ণুপুর মহকুমা এবং তার সংলগ্ন দামোদরের দক্ষিণ তীরবর্তী দক্ষিণ বর্ধমানের রায়না-গোতান অঞ্চল—এই হল পশ্চিমবঙ্গের ধর্মঠাকুর-পূজার সর্বাধিক প্রতিপত্তিকেন্দ্র। উড়িষ্যার যাজপুর (কেউ কেউ বলেন) যদি ধর্মপূজার আদি কেন্দ্র হয়, তাহলে মেদিনীপুরের যেসব অঞ্চলে উড়িষ্যার অন্যান্য প্রভাব যথেষ্ট রয়েছে দেখা যায় (যেমন দেবালয়-স্থাপত্যে), সেখান থেকে ধর্মঠাকুরের প্রভাব একেবারে লুপ্ত হয়ে গেল কি করে, এ প্রশ্ন স্বভাবতঃই মনে জাগে। ব্যবহার্য শিল্পকলা অনেক সময় দেখা যায়, উৎপত্তিকেন্দ্র থেকে অন্যত্র স্থানান্তরিত হয়ে প্রাধান্য পায় নানাকারণে। কিন্তু লোকাচরিত ধর্ম সাধারণত সেইভাবে স্থানান্তরিত বা কেন্দ্রান্তরিত হয় না। তাই মনে হয়, ধর্মনিরঞ্জনপন্থীদের আদিকেন্দ্রের সন্ধান যদি বৈজ্ঞানিক উপায়ে করতে হয়, তাহলে পূর্বোক্ত সর্বাধিক প্রতিপত্তিকেন্দ্রেই করতে হবে বা করা উচিত। এই কেন্দ্রের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত হল গড়বেতা ও চন্দ্রকোণা।

চন্দ্রকোণার পুরাতন ধর্মমন্দিরগুলি দেখলে বোঝা যায়, কিরকম ধর্মঠাকুরের

প্রতিপত্তি ছিল এখানে একসময়। গোবিন্দপুর, নরহরিপুর, জয়ন্তীপুর প্রভৃতি পাড়ায় এখন একত্র ক'টি মন্দিরের মধ্যে দলবদ্ধভাবে ধর্মঠাকুর বিরাজ করেন। অর্থাৎ বিভিন্ন পাড়া থেকে উদ্বাস্তু ধর্মঠাকুররা ক্রমে আশ্রয়-অভাবে একই মন্দিরের মধ্যে এসে বাস করছেন। তাঁদের সেবায়েত ও পূজারীরা অনেকেই হয় নির্বংশ হয়েছেন, অথবা কর্মোপলক্ষে দেশত্যাগী হয়েছেন। গোবিন্দপুর পাড়ায় শীতলনারায়ণ, স্বরূপনারায়ণ, রাজবল্লভ রায়, বাঁকুড়া রায় একত্রে একই মন্দিরে বিরাজ করেন এবং তাঁদের সঙ্গে জয়দুর্গা, কালীবুড়ী, রায়বুড়ী প্রভৃতি ধর্মকামিন্যাগণও থাকেন। জয়ন্তীপুর পাড়াতেও বহু ধর্মঠাকুর একত্রে বিরাজ করেন দেখা যায়। চন্দ্রকোণার তিপ্পান্ন গলির অন্তত তিপ্পান্নটি ধর্মঠাকুর আজও কয়েকটি মন্দিরের ভিতর থেকে বোধ হয় খুঁজে বার করা যায়। নরহরিপুর পাড়ায় কলকলি দেবী আছেন, ধর্মঠাকুরের কামিন্যা তিনি; প্রাচীন পঞ্চরত্ন দেবালয়ে ধর্মঠাকুরসহ বিরাজ করেন। মন্দিরের গায়ে লিপিও আছে :

প্রতিষ্ঠিতমিদং শাকে পক্ষাঙ্কবসুচন্দ্রমে
রাধাক্ষয়তৃতীয়ায়াম্ দিঙ্মানেকুজবাসরে
(১২৯০ সাল, ১০ই বৈশাখ)

এর বামদিকে আর একটি ভগ্নলিপি আছে :

কলকলি পদং ধ্যাত্বা তস্যা
গৃহমিদম্······তাম্বুলি

প্রায় ৭০।৭২ বছর আগে কোন তাম্বুলিবণিক মন্দিরটি কলকলি ধর্মকামিন্যার উদ্দেশে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মন্দিরের মধ্যে বিরাট কূর্মমূর্তি ধর্মঠাকুর আছেন। চন্দ্রকোণায় যত ধর্মঠাকুর দেখেছি, সবই কূর্মমূর্তি এবং এত জীবন্ত মূর্তি যে মনে হয় পাথরের নয়, রক্তমাংসের। কেবল চন্দ্রকোণায় নয়, পূর্বে ধর্মঠাকুরের যে প্রতিপত্তিকেন্দ্রের কথা বলেছি তার সর্বত্রই যে সব ধর্মঠাকুরের মূর্তি দেখেছি (কমপক্ষে হাজার হবে) তার অধিকাংশই কূর্মমূর্তি। চন্দ্রকোণা, জাড়া, রামজীবনপুর, ঘাটাল, গোঘাট প্রভৃতি অঞ্চলে এত সুন্দর নিখুঁত সব বড় বড় কূর্মমূর্তি আছে, যা ভাস্কর্যের নিদর্শন হিসাবেও উল্লেখযোগ্য। কেউ কেউ বলেন, ধর্মঠাকুরের কূর্মমূর্তিটা প্রধান নয়, একখণ্ড প্রস্তরমূর্তিই আসল। নৃবিজ্ঞানের বিভিন্ন জার্নালে এই ধরনের ঢালাই মন্তব্য-সংবলিত গবেষকদের উক্তি দেখা যায়। লোকধর্ম সম্বন্ধে গবেষণা লোকালয় থেকে দূরে আরাম-

কেদারায় বসে করলে যা হয়, ধর্মঠাকুর সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত অধিকাংশ গবেষণাই তাই হয়েছে। কিছুই প্রতিপন্ন হয়নি এবং অনুসন্ধানও হয়নি কিছুই। পশ্চিমবঙ্গে ধর্মঠাকুরের কূর্মমূর্তিটাই প্রধান ও আসল, বাকি সব মূর্তি গৌণ ও বিকল্প মূর্তি, একথা আজ যথেষ্ট জোর দিয়েই বলা যায়। একথাও ঠিক যে, বিষ্ণুর কূর্মাবতারের সঙ্গে এ-কূর্মের কোন সম্পর্ক নেই, ছিল না কোনকালে। ধর্মের কামিন্যাদের জয়দুর্গা, কলকলি, কালীবুড়ী, রায়বুড়ী, রায়বাঘিনী ইত্যাদি নামও লক্ষণীয়। বন্য লোকধর্মের ধারা যে ধর্মপূজার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে মিশে গেছে, তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। বৌদ্ধধর্মের প্রভাবও যে এর মধ্যে কিছুটা পড়েছে, তা অস্বীকার করা যায় না। অবিকল স্তূপের মতন ছোট ছোট পাথরের স্তূপ এ-অঞ্চলের অনেক ধর্মমন্দিরে দেখেছি। ভাস্করের খোদাই করা, হাতেগড়া পাথরের স্তূপ, স্বাভাবিক স্তূপাকৃতি প্রস্তরখণ্ড নয়। ধ্যানী বুদ্ধমূর্তির মতন ছোট ছোট (দু'তিন ইঞ্চি) পাথরের মূর্তিও অনেক ধর্মমন্দিরে দেখা যায়। এগুলির অর্থ আছে নিশ্চয়, অন্তত একদা ছিল। শৈবধর্মীরাও পরে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছেন, অনেক ক্ষেত্রে ধর্মঠাকুরকে আত্মসাৎও করে ফেলেছেন। ধর্মঠাকুরের নামটি রয়েছে, হয়ে গেছেন শিব। এমনকি ধর্মঠাকুর কোথাও কোথাও বৈষ্ণবও হয়ে গেছেন এবং নামের সঙ্গে 'নারায়ণ' যুক্ত হয়ে গেছে।

ধর্মঠাকুর ছাড়া, চন্দ্রকোণায় আর একটি উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক স্মৃতিচিহ্ন আজও আছে। কোন স্থাপত্যের বা ভাস্কর্যের নিদর্শন নয়, কীর্তিস্তম্ভও নয়। মানবজাতির একটি শাখা। শরাক নামে তন্তুবায় বণিকদের একটি শাখাজাতি চন্দ্রকোণায় বাস করেন। এক সময় তাঁরা চন্দ্রকোণার অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী সম্প্রদায় ছিলেন। কাপড়ের ব্যাবসা করে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করেছেন। চন্দ্রকোণায় শরাক তন্তুবায়দের যে পল্লীতে বাস ছিল, আজ তা সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত বলা চলে। বিরাট বিরাট শূন্য জীর্ণ অট্টালিকা আজও শরাকদের অতীত ঐশ্বর্যের ঐতিহাসিক সাক্ষীরূপে চন্দ্রকোণায় রয়েছে। দেখলে অবাক হতে হয়। চন্দ্রকোণায় শরাকদের ঐশ্বর্য সম্বন্ধে কিংবদন্তীও অনেক আছে। শরাক জাতির প্রসিদ্ধ ধনিক ব্যবসায়ী গুরুদাস করদত্ত পুত্রের বিবাহের সময় লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করেছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের কথা। কলকাতার মল্লিকদের বা ছাতুবাবু-লাটুবাবুদের তুলনায় বিলাসিতা তিনি কম করেননি।

বর্ষাকালে (শ্রাবণে) পুত্রের বিবাহ দিয়েছিলেন বলে, চন্দ্রকোণা থেকে ক্ষীরপাই পর্যন্ত (ক্ষীরপাইয়ে কন্যাপক্ষের বাস ছিল) প্রায় আট মাইল পথ উপরে চালা বেঁধে ঢেকে দিয়েছিলেন এবং তার দু'পাশে ঝাড়লণ্ঠন ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন। বর্ষার সময় বৃষ্টি হলেও বরের শোভাযাত্রার যাতে কোন অসুবিধা না হয়, তার জন্য এই ব্যবস্থা করা হয়েছিল। হাতিঘোড়াসহ শোভাযাত্রা এই পথ ধরেই গিয়েছিল। এ-কাহিনীর মধ্যে অবিশ্বাস্য কিছু নেই। চন্দ্রকোণা-ক্ষীরপাই অঞ্চলের তন্তুবায়রা অনেকেই লক্ষপতি ছিলেন। আজও তাঁদের বসতবাড়ির ধ্বংসাবশেষ দেখলে যে কেউ প্রাচীন কোন ঐতিহাসিক নগরের ধ্বংসাবশেষ বলে মনে করবেন।

চন্দ্রকোণার শরাক তন্তুবায়দের 'ঐতিহাসিক স্মৃতিচিহ্ন' বলেছি, কারণ আচারে-বিচারে তাঁরা সম্পূর্ণ হিন্দু হলেও, আজও তাঁরা বুদ্ধোপাসনা করেন। মাছ-মাংস খান না, এমনকি মাছ স্পর্শ পর্যন্ত করেন না। কুলদেবতা বুদ্ধের পূজা করে অন্যের পূজা করেন। চন্দ্রকোণার অযোধ্যাগড়ের বর্ধনবংশও (সুবর্ণবণিক) পূর্বে যে বৌদ্ধ ছিলেন, তাঁদের বংশ-পরিচয় থেকে জানা যায়। মার্কণ্ডেয় বর্ধন নামে তাঁদের পূর্বপুরুষ চৌহান রাজাদের আমলে তমলুকের অন্তর্গত বাবিচোর বা বালিঘোড় নামে কোন স্থান থেকে এসে চন্দ্রকোণায় বসবাস করেন এবং পরে খানাকুল-কৃষ্ণনগরের শ্রীপাদ অভিরাম গোস্বামীর শ্রীপাটে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা নেন। এঁদের বাড়িতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের হাতে-লেখা পুঁথির শেষে বর্ধনদের বংশপরিচয় প্রসঙ্গে এই কথা লেখা ছিল:

শ্রীল গোপীনাথ পদে জানাইল নতি
শ্রীঅভিরাম সন্তানে দীক্ষা করাইলা তথি।
বৌদ্ধধর্ম ত্যেগি চন্দ্রকোণা বাস কৈল
শ্রীচাঁদ ঠাকুরে তিহো পৌরহিত্য দিল॥

'শরাক' নামটিরও বিশেষ তাৎপর্য আছে মনে হয়। তন্তুবায়দের মধ্যে কেন এঁদের শরাক বলা হয়, তাও ভাববার বিষয়। আমার মনে হয়, 'শ্রাবক' কথা থেকে 'শরাক' হয়েছে চল্‌তি ভাষায়। শ্রাবক বলা হয় বুদ্ধোপাসকদের। তন্তুবায় বণিকদের মধ্যে এঁরা বৌদ্ধধর্মী হয়েছিলেন বলেই এঁদের 'শরাক' নামটি আজও রয়ে গিয়েছে এবং এঁরা একটি শাখাজাতিতে পরিণত হয়েছেন।

ক্ষীরপাই

অনেক কারণে মেদিনীপুরের ঘাটাল মহকুমার ক্ষীরপাই গ্রামটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। বহুদূর অতীতের ইতিহাস কি ক্ষীরপাই-এর, তা অবশ্য আজ আর জানা যায় না। এইটুকু বোঝা যায় মুসলমান আমলে চন্দ্রকোণার মতন ক্ষীরপাই-এরও প্রসিদ্ধি ছিল, প্রধানত বাণিজ্যিক কারণে। বৃটিশ আমলের গোড়া থেকেই ক্ষীরপাই বিদেশী বণিকদের লুব্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ইংরেজ, ডাচ, ফরাসী—সকলের। সন্ন্যাসী বিদ্রোহীরা ক্ষীরপাই পর্যন্ত অভিযান করেছিল, নথিপত্রে তার প্রমাণ আছে। লায়েক বিদ্রোহের তরঙ্গ যে ক্ষীরপাই পর্যন্ত পৌঁছায়নি, তা মনে হয় না। অবশেষে, ক্ষীরপাই-এর কথা আরও একটি প্রসঙ্গে বিশেষভাবে মনে হয়। কিশোর বয়সে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বীরসিংহ গ্রাম থেকে এই ক্ষীরপাই গ্রামের ভট্টাচার্য বাড়িতে বিবাহ করতে এসেছিলেন। এই ক্ষীরপাই গ্রামে বিদ্যাসাগর যে মডেল স্কুলটি স্থাপন করেছিলেন, তা এখনও আছে এবং অনেক বড় হয়েছে।

এই ধরনের সব টুকরো স্মৃতি মনের মধ্যে জড়ো করে নিয়ে চন্দ্রকোণা থেকে ক্ষীরপাই গ্রামে আমরা এলাম। চন্দ্রকোণা-ক্ষীরপাই গ্রামের ভিতর দিয়ে মোটরবাস চলে, একেবারে ঘাটাল পর্যন্ত। চন্দ্রকোণা থেকে ক্ষীরপাই মাইল সাত-আট দূর। ক্ষীরপাই গ্রামের বাইরের চেহারায় আজ আর তেমন জাঁকজমক নেই। কেমন যেন বিষণ্ণ পরিবেশ এইসব গ্রামকে আচ্ছন্ন করে থাকে দেখেছি। গ্রামে পা দিলেই তা বেশ অনুভব করা যায়।

আজ থেকে প্রায় দু'শ বছর আগে মেদিনীপুর জেলা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর করতলগত হয়। ১৭৬০ সালে মীরজাফরকে সিংহাসনচ্যুত করে কোম্পানী যখন মীরকাশিমকে নকল নবাব তৈরি করেন, তখন মীরকাশিম চুক্তি করে বাংলাদেশের তিনটি জেলা—মেদিনীপুর, বর্ধমান ও চট্টগ্রাম—ইংরেজদের উপঢৌকনস্বরূপ হস্তান্তরিত করেন। এই তিনটি জেলা থেকেই তখন সারা বাংলার মোট রাজস্বের তিনভাগের একভাগ আদায় হত। বর্তমান মেদিনীপুর জেলার সম্পূর্ণ অংশ অবশ্য ইংরেজদের করতলগত হয়নি। পটাশপুর পরগণা তখন মারাঠাদের দখলে ছিল এবং উড়িষ্যা পর্যন্ত তখনও মারাঠাদের কর্তৃত্ব

প্রতিষ্ঠিত। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে স্বতন্ত্রভাবে হুগলী জেলা গঠিত হবার পর ক্ষীরপাই দীর্ঘকাল পযন্ত হুগলীর অন্তর্গত ছিল। ১৮৪৫ সালে ক্ষীরপাই হুগলী জেলার মহকুমা-শহরে পরিণত হয়। ১৮৭২ সালে ক্ষীরপাই মেদিনীপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

পলাশীর যুদ্ধের তিন বছর পরে মেদিনীপুর জেলার কর্তৃত্ব লাভ করে ইংরেজরা নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তৎপর হলেন। রাজনৈতিক কর্তৃত্বের উদ্দেশ্য তখন তাঁদের মনের মধ্যে প্রধান হয়ে উঠলেও, বাণিজ্যিক মুনাফার স্বার্থই ছিল সর্বপ্রধান। সুতরাং প্রথমেই তাঁরা সেই উদ্দেশ্যে মেদিনীপুর টাউনে একজন রেসিডেন্টের অধীনে একটি বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করলেন। যেসব স্থান প্রধানত তাঁতশিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল, সেই স্থানগুলির প্রতিই তাঁদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হল প্রথমে। তাঁতশিল্পে চন্দ্রকোণার প্রসিদ্ধির কথা আগে বলেছি। ক্ষীরপাই সেই কারণে প্রসিদ্ধ ছিল। এখনও ক্ষীরপাই-এর অন্যতম প্রতিপত্তিশালী ও বিত্তশালী সম্প্রদায় তন্তুবায়রা। কাপড়ের ব্যবসায়ে চন্দ্রকোণা-ক্ষীরপাই-ঘাটাল-দাসপুর অঞ্চলের খ্যাতির কথা আজও ব্যবসায়ী-মহলে সুবিদিত। দেশীয় শিল্পের যারা খোঁজ রাখেন, তাঁরাই জানেন যে, ক্ষীরপাই ঘাটাল দাসপুরের তাঁতের কাপড় নয় শুধু, সিল্ক ও সিল্কের কাপড়ও বিখ্যাত। এখনও এই অঞ্চলের সিল্ক 'বিষ্ণুপুর-সিল্ক' বলে বাজারে চলে। বিদেশী মুনাফালোভী বণিকেরা যে এই অঞ্চলের প্রতি শ্যেনদৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন তাতে আর আশ্চর্য কি! কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন যে, বিদেশী বণিকদের দাদন-ব্যবস্থার ফলে বাংলার তাঁতশিল্পের দ্রুত উন্নতি হয়েছিল এই সময়। বিদেশীরা একদিকে যেমন মূলধন যুগিয়েছিলেন, তেমনি বিচ্ছিন্ন 'আন-ইকনমিক' কুটিরশিল্পকে সঙ্ঘবদ্ধ ও সুবিন্যস্ত করে তার উৎপাদনশক্তি অনেক বাড়িয়েছিলেন। তার জন্যই দেশীয় তাঁতশিল্পের দ্রুত উন্নতি হয়েছিল। কথাটা আংশিক সত্য হলেও, সম্পূর্ণ সত্য নয়। আমাদের দেশের অর্থনৈতিক ইতিহাস, প্রকৃত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে আজও লেখা হয়নি, লেখবার চেষ্টাও করেননি কেউ। প্রধানত তাঁতশিল্প বাসনশিল্প ইত্যাদি অবলম্বন করে আমাদের দেশে ক্রমে প্রত্যক্ষ উৎপাদন থেকে বিচ্ছিন্ন একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন বণিকশ্রেণীর বিকাশ হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ তন্তুবায়, গন্ধবণিক, তাম্বুলিবণিক প্রভৃতিদের কথা বলা যেতে পারে। এঁদের মধ্যে একদল

ক্রমে প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত না থেকেও, স্বাধীনভাবে ব্যাবস করে প্রচুর মূলধন সঞ্চয় করেছিলেন। বাঙালী তন্তুবায়দের ক্ষেত্রে কথাটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য মনে হয়। যে মূলধন তাঁরা সঞ্চয় করতেন ত শুধু বিলাসিতায় ও ধর্মকর্মে ব্যয় করতেন না, তার অনেকটা অংশ তাঁর উৎপাদনে 'ইন্‌ভেস্ট' করতেন। অর্থাৎ দাদন দেওয়ার প্রথা ইংরেজ, ফরাসী পর্তুগীজ বা ডাচ বণিকরা আমাদের দেশে প্রথম চালু করেননি। দাদন আমাদের দেশের বণিকরাও দিতেন। কুটিরশিল্পকে সঙ্ঘবদ্ধ করে তাঁরাও 'ফ্যাক্টরী-পদ্ধতি'তে (প্রাথমিক) উৎপাদন বাড়িয়েছিলেন বাণিজ্যের জন্য তন্তুবায়দের সম্বন্ধে একথা বিশেষভাবে বলা যায়। বাংলার শেঠ-বসাকদের সত্যকার ইতিহাস যদি কখনও লেখা হয় ভবিষ্যতে (যাঁরা আসলে কলকাত শহরের আদি প্রতিষ্ঠাতা এবং বড়বাজারের প্রথম ব্যবসায়ী), তাহলে বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাসের এই গুরুত্বপূর্ণ স্তরের (মধ্যযুগীয় কুটিরশিল্পের স্তর থেকে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-স্তরে পৌছানোর মধ্যবর্তী প্রিমিটিভ ফ্যাক্টরী পদ্ধতিতে উৎপাদনের পর্বের) রহস্য হয়ত উদ্‌ঘাটিত হতে পারে।

সে যাই হোক, ক্ষীরপাই-এ ইংরেজদের কুঠি ছিল এবং দাদন দিয়ে তাঁরা কাপড় তৈরিও করাতেন। এদেশী ব্যবসায়ীরা দাদন নিতেন এবং নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ কাপড় সরবরাহ করতেন। এইভাবে তাঁতশিল্পের সাময়িক শ্রীবৃদ্ধি হয়েছিল এবং বেকার তন্তুবায়রা হয়ত কাজও পেয়েছিলেন সত্যি। কিন্তু ক্ষতি হয়েছিল তার চেয়ে অনেক বেশি। স্বাধীন ব্যবসায়ী তন্তুবায়শ্রেণীর যে ঐতিহাসিক বিকাশ হচ্ছিল, যাঁরা নিজেরা ঘরে ঘরে দাদন দিয়ে ঐ কাজ করাতেন এবং দেশের স্বাভাবিক স্বাধীন অবস্থা থাকলে, অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পেলে, যাঁরা হয়ত পরবর্তীকালে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির প্রবর্তন করতে পারতেন—তাঁদের অবনতির পথ সুগম হয়েছিল। স্বাধীন বাঙালী ব্যবসায়ীরা বৃটিশ আমলে ক্রমে দালালে পরিণত হয়ে, প্রচুর অর্থ উপার্জন করা সত্ত্বেও, স্বতন্ত্র বণিকশ্রেণী হিসাবে লুপ্ত হয়ে গেছেন। ক্ষীরপাই, চন্দ্রকোণা, ঘাটাল, দাসপুরের তন্তুবায়শিল্পী ও ব্যবসায়ীরা উভয়েই এইভাবে উচ্ছন্নে গেছেন। বণিকদের স্বাধীন বিকাশকে এইভাবে প্রতিরোধ করে, ইংরেজরা ক্রমে কলের তৈরি কাপড়চোপড় প্রচুর পরিমাণে আমদানি করে, বণিক ও শিল্পী উভয় শ্রেণীকেই নির্মূল করেছেন।

ক্ষীরপাই-এ শুধু ইংরেজের কুঠি ছিল যে তা নয়। ইংরেজদের কুঠি থেকে ডাচ বণিকরা এজেন্ট মারফৎ নিয়মিত মাল কেনাকাটা করতেন। ফরাসীরাও অনেক আগে থেকে, প্রায় ১৭৬৩ সাল থেকে ক্ষীরপাই-এ কুঠি স্থাপন করে কাপড় ও সিল্কের ব্যাবসা করেছেন। ১৭৮৪ সালে ক্ষীরপাই-এর কুঠির ইংরেজ রেসিডেন্ট এ-সম্বন্ধে তাঁর রিপোর্টে বলেন:

> Since the peace of 1763 the French had a factory in the Town of Keerpoy, where their Resident lives .... In 1771, they began to collect their outstanding balances, and in 1773 they removed their effects, and left the Aurung (Bengal Past & Present, Vol. III, No. 2.).

প্রায় দু'শ বছর আগেই দেখা যায়, ক্ষীরপাই গ্রামে ইংরেজ, ডাচ, ফরাসী বণিকরা গিয়েছিলেন বাণিজ্যের জন্য। কুঠি স্থাপন করে তাঁরা ব্যাবসা করতেন এবং বসবাসও করতেন। তাঁদের সান্নিধ্যে গ্রামের লোক তখন যে খুব লাভবান হয়েছিলেন, তা মনে হয় না। কারণ হেস্টিংস ও কর্ণওয়ালিসের আমলের ইংরেজরা আমাদের দেশের চেয়ে উন্নত সংস্কৃতিবান ছিলেন না কোনদিক থেকেই। শিক্ষাদীক্ষারও বিশেষ বালাই ছিল না তাঁদের। নিজেদের দেশের মধ্যযুগীয় সংস্কৃতির যা কিছু কুৎসিত উচ্ছিষ্ট তাই তাঁরা আমাদের দেশে বহন করে এনেছিলেন। এদেশেও তখন সর্বাঙ্গীণ সামাজিক অবনতির যুগ। সুতরাং মিলনটা তখন সমানে-সমানে হয়েছিল। তাঁরা 'ডুয়েল' লড়েছেন, আমরা মল্লের লড়াই দেখেছি। তাঁরা মুর্গীর লড়াইয়ে আনন্দ উপভোগ করেছেন, আমরা বুলবুলির লড়াই উপভোগ করেছি। আমাদের কাছ থেকে তাঁরা হুঁকোয় তামাক খেতে শিখেছেন, তাঁদের কাছ থেকে আমরা 'রেস' খেলতে শিখেছি।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে, সংস্কৃতিক্ষেত্রে, ইংরেজদের সঙ্গে আমাদের সমানে-সমানে কোলাকুলি হয়েছে। তার বেশি কিছু হয়নি বিশেষ। কলকাতায় বা হুগলী-চুঁচুড়ায় যা হয়েছে, ক্ষীরপাই-এও তার ব্যতিক্রম হয়নি। ক্ষীরপাই-এর কাছে একটি গ্রামে এই সব বিদেশী বণিকদের কয়েকটি প্রাচীন জীর্ণ সমাধি-স্তম্ভ আছে। গ্রামের লোক সেখানে প্রদীপ দেয়, প্রীতি বা শ্রদ্ধার জন্য নয়, সংস্কারের জন্য।

ঘাটাল অঞ্চল ধর্মঠাকুরের প্রতিপত্তিকেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত, একথা চন্দ্রকোণা প্রসঙ্গে বলেছি। ক্ষীরপাই-এ শিববাজারে স্বরূপনারায়ণ নামে ধর্মঠাকুর আছেন। আগে তন্তুবায় পূজারী ছিলেন, এখন ব্রাহ্মণে পূজা করেন। বৈশাখী পূর্ণিমায় উৎসব হয়। বেশ বড় কূর্মমূর্তি ধর্মঠাকুরের। 'কুণেবুড়ী' নামে এক দেবী আছেন, তিনি যাবতীয় চর্মরোগের বিশেষজ্ঞ দেবতা। পয়লা বৈশাখ ক্ষীরপাই-এ তাঁর বিরাট 'যাত' হয়—'ভগবতীর যাত' বলে প্রসিদ্ধ। সামনে যে পুকুর আছে তাতে স্নান করলে চর্মরোগ সেরে যায়। ধর্মঠাকুর ও কুণেবুড়ী দু'জনেই খুব প্রাচীন দেবদেবী। ইংরেজ ফরাসী ডাচদের বাণিজ্যের আমলেও তাঁরা গ্রাম্যদেবতারূপে বিরাজ করতেন। ধর্মঠাকুরের নিশ্চয় তখন গাজন হত এবং বিত্তবান তন্তুবায়রা অর্থব্যয় করে তার পোষকতা করতেন। ইংরেজ ও ফরাসী কুঠিয়ালরা ক্ষীরপাই-এর সেই গাজনোৎসব এদেশী লোকের মতনই উপভোগ করতেন। চর্মরোগ থেকে মুক্তি পাবার জন্য অষ্টাদশ শতাব্দীর ফিরিঙ্গী-বণিকদের পক্ষে ক্ষীরপাই-এর কুণেবুড়ীর পুকুরে স্নান করাও বিচিত্র নয়।

ক্ষীরপাই গ্রামে বিখ্যাত ধর্মকামিন্যা রায়বাঘিনী আছেন। এই রায়বাঘিনীই বারাগ্রামের বিখ্যাত রায়বাঘিনী। প্রসিদ্ধ জাড়া গ্রামের কাছে বারাগ্রাম। ক্ষীরপাই-এর ভট্টাচার্য-পল্লীনিবাসী ৺প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য তাঁর মাতুলালয় বারাগ্রাম থেকে রায়বাঘিনীকে এইখানে নিয়ে এসে পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে প্রতিষ্ঠা করেন। জাড়া-বারা প্রভৃতি গ্রামে ধর্মঠাকুরের প্রচণ্ড প্রতিপত্তি। যজ্ঞেশ্বর কবিয়ালের ভাষায়—

> জাড়া গোলক বৃন্দাবন!
> জাড়ার পরম ব্রহ্ম বাবুগণ
> যেমন গোলক হতে গোকুলেতে অবতীর্ণ গোবর্ধন!

এ হল সেই জাড়া। জাড়াগ্রামের ধর্মঠাকুর কালুরায়কে অন্নদামঙ্গলের কবি এইভাবে বন্দনা করেছেন:

> জাড়া গ্রামে বন্দিলাম ঠাকুর কালু রায়
> যাহার কৃপায় কবি রামদাস গায়।

জাড়ার পাশে বারাগ্রামেও কালুরায় নামে ধর্মঠাকুর আছেন। সকলেরই কূর্মমূর্তি। এই গ্রামেরই বিখ্যাত ধর্মকামিন্যা হলেন রায়বাঘিনী! তাঁর ধ্যানের মধ্যেই তাঁর মূর্তিটি প্রকট হয়ে উঠেছে:

ওঁ নীলজীমূতসঙ্কাশাং সর্বসৌন্দর্যসুপ্রভাং
পূর্ণেন্দু সূর্যনয়নাং মৌলিচন্দ্রবিভূষিতাম্
সুচারুবদনাং দেবীং সদামদনবিহ্বলাম্
সর্বকামেশ্বরীং দেবীং কামিন্যাং প্রণমাম্যহং।

ক্ষীরপাই-এ বাংলার নিজস্ব রীতির মন্দিরই প্রধান। যে কয়েকটি প্রাচীন মন্দির আছে, তার অধিকাংশই স্থানীয় সমৃদ্ধ বণিকদের দ্বারা উনিশ শতকের প্রথমদিকে ও মাঝামাঝিতে প্রতিষ্ঠিত। লিপিযুক্ত সবচেয়ে প্রাচীন মন্দিরটির গায়ে চমৎকার পোড়ামাটির কারুকায এখনও আছে। লিপিটি এই :

শ্রীশ্রী৺রাধা শ্রীশ্রী৺কৃষ্ণদামোদর
শীতলামাতা চরণ তব চরণ ভরসা গো
শকাব্দা ১৭৩৯, সন ১২২৪ সাল
তারিখ ১০ বৈশাখ শ্রীমদনমোহন দত্ত

ক্ষীরপাই-এর রাস্তার মোড়ের মাথায় একটি শিব-মন্দির আছে, লিপিযুক্ত। তার গায়ে লেখা আছে :

শ্রীখড়কেশ্বর শিবঠাকুর
শকাব্দা ১৭৮৩।৫।২১
সন ১২৬৮ সাল শ্রীগঙ্গাধর দত্ত

এ ছাড়া একটি খুব বড় পাথরের একচূড়া বাংলা মন্দির আছে। পাথরের খণ্ডগুলিতে মূর্তি ও নক্সা খোদাই করা ছিল বোঝা যায়। মন্দিরটি পথের ধারে পরিত্যক্ত অবস্থায় আছে, আগাছায় ও জঙ্গলে আচ্ছাদিত। ক্ষীরপাই-এর অতীত সমৃদ্ধি খুব বেশিদিনের কথা নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যখন ক্ষীরপাই-এ বিবাহ করতে আসেন, তখন চন্দ্রকোণার গুরুদাস করদত্তের পুত্রের মতন শোভাযাত্রা সহকারে আসেননি। দরিদ্র ব্রাহ্মণ সন্তান দরিদ্রের মতন পাল্কিতে করেই এসেছিলেন। কিন্তু ক্ষীরপাই তখন রীতিমত সমৃদ্ধ গ্রাম ছিল। বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবেও তার খ্যাতি তখনও ম্লান হয়নি। তাই ক্ষীরপাই-এ বিদ্যাসাগরমশায় মডেল স্কুলও স্থাপন করেছিলেন। ১৮৭২ সালেও ক্ষীরপাই-এর লোকসংখ্যা ছিল আট হাজারের বেশি। এখন তার প্রায় অর্ধেক লোক ক্ষীরপাই-এর বাসিন্দা (১৯৫১ সালের গণনায় ৪২৪৬)।

ঘাটালকেন্দ্রের ধর্মরাজ উৎসব

মেদিনীপুরের ঘাটাল অঞ্চলের অন্যতম প্রধান উৎসব হল ধর্মঠাকুরের উৎসব। ঘাটাল ও তার সংলগ্ন অঞ্চলে—যেমন বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর মহকুমায়, হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমায়, বর্ধমান জেলায় দামোদরের দক্ষিণ অঞ্চলে, হাওড়া জেলায় এবং ভাগীরথী পার হয়ে পূর্বতীরের দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় ও কলকাতায়—ধর্মরাজ উৎসবের প্রাধান্য সব চেয়ে বেশি দেখা যায়। কেবল প্রাধান্য নয়, এই অঞ্চলের ধর্মপূজার সমারোহ ও বৈচিত্র্যও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পশ্চিমে মেদিনীপুরের ঘাটাল কেন্দ্রই মনে হয় যেন ধর্মপূজার সীমানা। শিলাই নদী দিয়ে মোটামুটিভাবে পশ্চিমের এই সীমারেখা টানা যেতে পারে। দক্ষিণে চেতুয়া পরগণা সংলগ্ন হাওড়া জেলার ভিতর দিয়ে এই উৎসবের ধারা ভাগীরথীর পূর্বতীরে অধুনালুপ্ত আদিগঙ্গার তীর ধরে কলকাতা শহর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। পূর্বতীরে আধুনিক কলকাতা শহর এককালে ধর্মঠাকুরের উৎসবের প্রধান কেন্দ্র ছিল। ঘাটাল ও আরামবাগ অঞ্চলের ধর্মনিরঞ্জনপন্থীরা কলকাতা শহরে এই উৎসবের অন্যতম প্রবর্তক ছিলেন। সে-ইতিহাস জেলিয়াপাড়া ও ধর্মতলার প্রাচীন ইতিবৃত্ত প্রসঙ্গে পরে আলোচনা করব।

ধর্মপূজা সম্বন্ধে কোন গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক বা ঐতিহাসিক আলোচনা এখানে করব না। পশ্চিমবঙ্গের এই প্রধান উৎসবটি কেন্দ্র করে পণ্ডিতেরা অনেক তর্কযুদ্ধের অবতারণা করেছেন। নানা মুনির নানামতের মতন, পরস্পর-বিরোধী মতামতের বন্যায় সাধারণ লোক দিশাহারা হয়ে গেছেন। সুতরাং দ্বন্দ্ব নিরসনের পথ ছেড়ে, কেবল পর্যবেক্ষণলব্ধ তথ্যের বিবরণ দেওয়াই ভাল।

ধর্মপূজা সম্বন্ধে অনেক অনুসন্ধান হলেও, অজ্ঞাত আজও অনেক কিছু আছে। তার প্রধান কারণ, প্রকৃত অনুসন্ধান হয়নি। তাই বলে 'অজ্ঞেয়' এমন কিছু নেই যার জন্য ধর্মপূজার গোত্রবিচার করা যায় না। হঠাৎ পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ কূর্মমূর্তি গড়ে ধর্মঠাকুরের ব্যাপক উৎসব করতে আরম্ভ করেননি। ধর্মঠাকুরের যে সব পাথরের মূর্তি আছে, তার ভাস্কর্যের বৈশিষ্ট্যের ইতিহাসই কয়েক শতাব্দীর। অথচ ভাস্কর্যকলার দিক থেকে ধর্ম-ঠাকুরের কূর্মমূর্তির আজও কোন বিচার করা হয়নি। কেন হয়নি, বোঝা যায়

না। দু'একজন গবেষক আছেন, যাঁরা ধর্মঠাকুরের কোন মূর্তি আছে বলেই মনে করেন না, কূর্মমূর্তি তো নয়ই। যেমন শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য বলেন :

Dharma Thakur or Dharmaraj Thakur has no anthropomorphic form ; he is not therefore worshipped in any image. (The Tribes and Castes of West Bengal : Census 1951. Edited by A. Mitra, I. C. S.,—'Dharma worship in West Bengal' by Asutosh Bhattacharyya).

আমার ধারণা, ধর্মঠাকুরের মূর্তি সম্বন্ধে এরকম উক্তি করা যেতে পারে না। ধর্মঠাকুর যাঁরা স্বচক্ষে দেখেছেন, বিশেষ করে প্রকৃত ধর্মপূজাকেন্দ্রে ঘুরে ঘুরে, তাঁরা কখন ভুলেও এরকম মন্তব্য করতে পারেন না। ঘাটাল, বিষ্ণুপুর, আরামবাগ মহকুমায় প্রায় প্রত্যেক গ্রামে, হাওড়া জেলায়, অন্তত সহস্রাধিক কূর্মমূর্তি ধর্মঠাকুর এখনও আছে। কলকাতা শহরের মধ্যে ও আশেপাশে একাধিক কূর্মমূর্তি ধর্মরাজ আছেন, এমন কি কলকাতার প্রাণকেন্দ্র বিখ্যাত ধর্মতলা অঞ্চলে পর্যন্ত। ধর্মের কূর্মমূর্তিই আসল, বাকি সব আসল মূর্তির অভাবে বিকল্প প্রতীকমূর্তি মাত্র। শিবের পূজা পাথরের নুড়িতেও হয়, কিন্তু তার মানে এ নয় যে, শিবের কোন মূর্তি নেই। ধর্মের পূজাও পাথরখণ্ডে হয়, ঘটে হয়, কিন্তু ধর্মের কূর্মমূর্তিই আসল অকৃত্রিম মূর্তি।

যা বলছিলাম। ভাস্কর্যের দিক থেকে এই সব কূর্মমূর্তির বয়স বিচার করার প্রয়োজন আছে, কারণ এদিক থেকেও আমরা ধর্মপূজার প্রাচীনত্বের আভাস পেতে পারি। ঘাটাল অঞ্চলে চন্দ্রকোণা, রামজীবনপুর, জাড়া, ক্ষীরপাই, বীরসিংহ, খড়ার, চন্দননগর, রাধানগর প্রভৃতি গ্রামে এত বিচিত্র রকমের সব কূর্মমূর্তি আছে, যা দেখলে আশ্চর্য হতে হয়। ঠিক এই ধরনের কূর্মমূর্তির বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্য বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর মহকুমায়, হুগলীর আরামবাগ মহকুমায়, বর্ধমানের দক্ষিণ-পশ্চিমে ও হাওড়া জেলার আমতা থানায় দেখা যায়। সবটাই প্রায় সংলগ্ন অঞ্চল। আকার ও প্রকারভেদে এইভাবে মোটামুটি মূর্তিগুলিকে ভাগ করা যেতে পারে :

১। পাথরের কূর্মমূর্তি, তার উপর আসনে পদচিহ্ন। এক ফুট থেকে ষোল ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা এবং ৬ ইঞ্চি থেকে ৯ ইঞ্চি চওড়া বড় বড় মূর্তি থেকে আরম্ভ করে খুব ছোট ছোট, তিন ইঞ্চি—দেড় ইঞ্চি, নিখুঁত মূর্তিও আছে।

২। পাথরের চতুষ্কোণ পাদপীঠ, তার উপর কূর্মমূর্তি, পিঠে পাদুকাচিহ্ন। পাদপীঠের গভীরতা ৬ ইঞ্চি পর্যন্ত দেখা যায়, ওজন আধ মণ পঁচিশ সের প্রায়। পাদপীঠের গায়ে খাঁজ-কাটা এবং তার গায়ে খোদাই-এর কাজ করা। সম্পূর্ণ পাদপীঠটা নিরেট বা সলিড পাথরের।

৩। চারপায়াযুক্ত চৌকির মতন পাথরের আসনের উপর স্তূপাকার পাথরপৃষ্ঠে কূর্মমূর্তি, পাদুকাচিহ্নসহ। চৌকির আকার চার ইঞ্চি-বাই-দু'ইঞ্চি থেকে প্রায় এক ফুট-বাই-ছ' ইঞ্চি পর্যন্ত দেখা যায়। চৌকির গায়ে খোদাই-এর কাজ করা।

প্রত্যেকটি মূর্তি ভাস্কর্যের নিদর্শন হিসাবে উল্লেখযোগ্য। মূর্তিতত্ত্ববিদ্‌রা উপেক্ষা করলেও, ভাস্কর্যের দিক থেকে ধর্মঠাকুরের কূর্মমূর্তির এই বৈচিত্র্য বিচার করা ইতিহাসের দিক থেকে খুবই প্রয়োজন। মূর্তিগুলির প্রকার-বৈচিত্র্য লক্ষ করলে দেখা যায়, সাধারণ কূর্মমূর্তি থেকে ক্রমে নানারকমের ও গড়নের মূর্তি শিল্পীরা রূপায়িত করেছেন পাথরে। কেবল কূর্মের আকারেরই অনেক বৈচিত্র্য দেখা যায়। তারপর পাদপীঠ ও আসনের বৈচিত্র্য। পাদপীঠও দেখা যায়, সলিড পাথরের ব্লক থেকে ক্রমে খোদিত কারুকাজ-করা পাদপীঠে পরিণত হয়েছে। সমস্ত ঘাটাল, আরামবাগ, বিষ্ণুপুর অঞ্চল ঘুরে না দেখা সম্ভব হলেও, যদি কেউ কেবল বিদ্যাসাগরের জন্মস্থান বীরসিংহ থেকে ঘাটালের পথে গ্রামগুলি দেখতে দেখতে আসেন, তাহলেই ধর্মঠাকুরের কূর্মমূর্তির বৈচিত্র্য দেখে স্তম্ভিত হয়ে যাবেন। তার সঙ্গে আরামবাগের গোঘাট থানাটুকু এবং ঘাটালের উত্তরে রামজীবনপুর ও জাড়া অঞ্চলটুকু ঘুরলেই যথেষ্ট। এদেশী ভাস্করদের হাতে ধর্মঠাকুরের কূর্মমূর্তির এই বিচিত্র রূপায়ণ দু'এক শতাব্দীতে সম্ভব হয়েছে বলে মনে হয় না। কখনই তা হতে পারে না। তা ছাড়া হিন্দুযুগের অবসানের পর, মুসলমান আমলে খুব বেশিদিন পর্যন্ত যে এই সব মূর্তি ভাস্কররা তৈরি করেছেন, তাও মনে হয় না। মনে হয়, দ্বাদশ থেকে চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যেই অধিকাংশ মূর্তি গঠিত হয়েছে। অনুমানের পক্ষে অন্য যুক্তিও আছে। কেবল তেলসিঁদুরের স্পর্শে এক একটি মূর্তি যে পরিমাণ ক্ষয়ে ক্ষয়ে মসৃণ হয়ে গিয়েছে দেখা যায়, তাতেও তাদের বিশেষ অর্বাচীন বলে মনে হয় না। এইভাবে কেবল মূর্তিভাস্কর্যের দিক থেকে বিচার করলেও ধর্মঠাকুরের পূজা-উৎসবের ঐতিহাসিক প্রাচীনত্বের অনেকটা আভাস পাওয়া যায়।

ঘাটাল অঞ্চলে (বিষ্ণুপুর, আরামবাগেও) ধর্মপূজার আর একটি উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব দেখা যায়। বাংলাদেশের তন্ত্রযানী বৌদ্ধধর্মের প্রভাব যে ধর্মপূজায় বিশেষভাবে পড়েছে, তা অস্বীকার করা যায় না। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা এখানে সম্ভব নয়। আদিম কৌমসমাজের পূজার্চনার অনেক উপকরণও ধর্মপূজার সঙ্গে মিলেছে। সমাজের ভিত্তিস্তরের সাধারণ লোকসমাজে তাই ধর্মপূজার প্রচলন সবচেয়ে বেশি। ধর্মপূজার কুলগোত্রহীন সাম্যের আবেদনও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ক্রমে ধর্মঠাকুর শিবের সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছেন দেখা যায় এবং এখনও হতে চলেছেন। ধর্মরাজ-শিবমিলনের দিকে ঝোঁক এখনও প্রবল। প্রধানত ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের মধ্যস্থতায় পশ্চিমবঙ্গে ধর্মঠাকুরের এই শৈব রূপান্তর সম্ভব হয়েছে ও হচ্ছে। ধর্মের গাজন আর শিবের গাজনের সাদৃশ্য তাই এত গভীর। ধর্মপূজা আর শিবপূজার সময় ভক্তাদের বা সন্ন্যাসীদের কুলগোত্রহীন গণতান্ত্রিক মিলনোৎসবেরও তাই এত মিল। শিবের যেমন শক্তি থাকেন, ধর্মেরও তেমনি শক্তি কল্পনা করা হয়েছে। ঘাটাল অঞ্চলে দেখা যায়, যেখানে ধর্ম আছেন, সেখানেই তাঁর শক্তি আছেন। ধর্মের এই শক্তির নানারকমের নাম। 'কালীবুড়ী' নামটাই খুব বেশি। এটাও লক্ষণীয়। এছাড়া, রাঙবাঘিনী, গেড়িবুড়ী, কলকলি ইত্যাদি নামেও শক্তি আছেন। সাধারণত তাঁদের ধর্মের কামিন্যা বলা হয়। ঘাটাল অঞ্চলে শাক্তধর্মের সঙ্গে ধর্মনিরঞ্জনপন্থীদের এই মিলনের ঝোঁকটি অত্যন্ত প্রবল দেখা যায়। অধ্যাপক ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এটি লক্ষ করে ঠিকই বলেছেন যে—

> ......there is a tendency in Midnapur to equate Dharma to Siva by making him husband of a Sakti. (Dharma Worship : J. A. S. B., Vol. VIII, 1942).

এই ঝোঁক বীরভূমের বাইরে সর্বত্রই খুব প্রবল দেখা যায়, বিশেষ করে বিষ্ণুপুর, ঘাটাল ও আরামবাগ অঞ্চলে। তার মধ্যে মনে হয় যেন, ঘাটাল কেন্দ্রে ও গোঘাট থানায়, ধর্মের চেয়ে কামিন্যাদের প্রতিপত্তি বেশি।

চেতুয়া-বরদা

মেদিনীপুরের উত্তর-পূর্বে ঘাটাল মহকুমায় দু'টি প্রাচীন পরগণার নাম চেতুয়া ও বরদা। প্রধানত চেতুয়া ও বরদা পরগণার জমিদার শোভা সিংহের বিদ্রোহের জন্যই এই দু'টি পরগণা ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হয়ে রয়েছে। শোভা সিংহের বিদ্রোহ নিয়ে অনেক রোমান্টিক কাহিনী ও কিংবদন্তী রচিত হয়েছে। বাস্তব ইতিহাসের সঙ্গে তার বিশেষ কোন সম্পর্ক নেই। কেউ কেউ দেশ-প্রেমের আদর্শের মধ্যে শোভা সিংহের বিদ্রোহের প্রেরণা খুঁজে বেড়ান। কিন্তু শোভা সিংহের আমলে, দেশপ্রেম বা জাতীয়তাবোধ বলতে আমরা আজকাল যা বুঝি, তার কোন অস্তিত্ব ছিল না। শোভা সিংহ ও তাঁর পূর্বপুরুষরা, কোথা থেকে কিভাবে এসে ঘাটালের চেতুয়া-বরদা পরগণার জমিদারী দখল করেছিলেন, তারও কোন নির্ভরযোগ্য ইতিহাস নেই। এই বংশের যা কিছু কীর্তিচিহ্ন, তাও অধিকাংশ লুপ্ত হয়ে গেছে। রাজনগরের শূন্য ভিটেয় বা বরদায়, কোথাও তার নিদর্শন কিছু নেই। নাম আছে, নমুনা নেই। কেবল বরদার বিখ্যাত বিশালাক্ষী দেবী আছেন, প্রায় আড়াইশ' বছরের স্মৃতি নিয়ে।

মোগলযুগে চেতুয়া ও বরদা ছিল সরকার মদারণের অন্তর্ভুক্ত। সরকার মদারণ তখন ছিল বীরভূমের নগর বা রাজনগর থেকে রানীগঞ্জ, জাহানাবাদ, পশ্চিম হুগলী, হাওড়া থেকে অর্ধবৃত্তাকারে মেদিনীপুরের চেতুয়া-বরদা, হাওড়াব মণ্ডলঘাট ও হিজলীর মহিষাদল পর্যন্ত বিস্তৃত। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত জুড়ে ছিল সরকার মদারণ। ষোড়শ শতাব্দীর শেষের কথা। ষোলটি মহল নিয়ে ছিল সরকার মদারণ এবং তার মোট রাজস্ব ছিল ২৩৫০৮৫৲ টাকা। জাফর খাঁ বা মুর্শিদকুলী খাঁ সরকার মদারণের এই ভৌগোলিক গঠনটি ভেঙ্গে-চুরে নতুন করে গড়েন।

জাহাঙ্গীরের আমলে, মোগল সৈন্যের বাংলা অভিযানের সময়, চেতুয়া-বরদার জমিদার হিসাবে মিরজা নাথনের স্মৃতিকথা 'বাহারিস্তান' গ্রন্থে যাঁর নাম পাওয়া যায়, তিনি শোভা সিংহের বংশের কেউ বলে মনে হয় না। চেতো বা চেতুয়ার নাম পাওয়া যায় না, চন্দ্রকোণার সঙ্গে বরদার নাম পাওয়া যায়।

'বাহারিস্তানে' পরিষ্কার লেখা আছে—"এদিকের সমস্ত অঞ্চল (চন্দ্রকোণা ইত্যাদি) চন্দ্রভান ও অন্যান্য জমিদারদের জায়গীর দেওয়া হয়েছিল। বরদার যিনি জমিদার ছিলেন, তাঁর নাম দলপৎ। চন্দ্রকোণার রাজা চন্দ্রভানের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তা ছিল এবং তিনি নাবালক ছিলেন।" (বাহারিস্তান—ইংরেজী অনুবাদ : প্রথম খণ্ড, পৃ ১৩৯)। দলপৎ যদি 'সিংহ' উপাধিধারী শোভা সিংহের কোন পূর্বপুরুষ কেউ না হন, তাহলে সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়া পর্যন্ত অন্তত যে শোভা সিংহের বংশের কেউ এ-অঞ্চলের জমিদার জায়গীরদার ছিলেন না, তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। তাই মনে হয়, খুব বেশি হলে দু'তিন পুরুষের বেশি শোভা সিংহের বংশ চেতুয়া-বরদার জমিদার ছিলেন না। মোগল-পাঠান সংঘষের সময় বাংলার পশ্চিমসীমান্তের আভ্যন্তরিক গোলযোগের সুযোগ নিয়ে শোভা সিংহের পূর্বপুরুষরা কেউ এ-অঞ্চলের জমিদারী দখল করতে পারেন। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের দিকে কোন সময়। শোভা সিংহ এই জমিদারবংশের দ্বিতীয় বা তৃতীয় পুরুষের জমিদার ছিলেন। চেতুয়া ও বরদা পরগণায় তাঁর একচ্ছত্র প্রতিপত্তি ছিল। এ-অঞ্চলের অনেক বিখ্যাত স্থান তাঁর কর্তৃত্বের কাল থেকে চেতুয়া নামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়েছে, দাসপুর থানার অনেকটা অঞ্চল চেতুয়া পরগণার অন্তর্ভুক্ত ছিল, তাই দাসপুর, বাসুদেবপুর প্রভৃতি স্থান আজও চেতুয়া-দাসপুর ও চেতুয়া-বাসুদেবপুর নামে পরিচিত।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে মোগলযুগের অবসানের লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে দেখা দিল চারিদিকে। মোগল সম্রাট পনের বছর ধরে নিজে ব্যক্তিগতভাবে দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধে জড়িত থেকেও, দিল্লীতে বিজয়ী বীরের মতন ফিরে আসতে পারলেন না। যুদ্ধের দৌলতে রাজকোষ প্রায় শূন্য হয়ে গেল। মারাঠাদের কাছে মোগল সৈন্যদের বিপর্যয়ের কাহিনী দেশময় প্রচার হয়ে গেল। মোগল শাসনের অন্তিমকাল আসন্ন ভেবে দেশে দেশে সুবিধাবাদী সামন্তরা বিদ্রোহী হয়ে ক্ষমতার লোভে, রাজ্যের লোভে মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। ইব্রাহিম খাঁ তখন বাংলার নবাব। বৃদ্ধ ইব্রাহিম খাঁ ফারসী সাহিত্যে মশগুল হয়ে থাকতেন। শাসক হিসাবে তিনি অপদার্থ শাসক ছিলেন বললেও ভুল হয় না। ইংরেজ ব্যবসায়ীরা তাঁকে "চমৎকার, ভালমানুষ নবাব" বলে প্রশংসা করতেন, নিজেদের স্বার্থের খাতিরে। মুসলমান ঐতিহাসিকরা তাঁর সুবিচার প্রসঙ্গে

বলতেন যে, ইব্রাহিম খাঁর আমলে একটি ক্ষুদ্র পিপীলিকা পর্যন্ত নিপীড়িত হয়নি। বিপর্যয়কালে এরকম একজন মেরুদণ্ডহীন শাসক যখন বাংলার সিংহাসনে বসে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে দিন কাটাচ্ছেন, তখন দেশের মধ্যে দীর্ঘ শান্তির পর প্রথম অশান্তির আগুন জলে উঠল। বিদ্রোহ দেখা দিল বাংলায়। এই সময়, প্রায় ১৬৯৫ সালের মাঝামাঝি থেকে, চেতুয়া-বরদার জমিদার শোভা সিংহ বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। কোন মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে শোভা সিংহ বিদ্রোহ করেননি। ঐতিহাসিক সুবর্ণসুযোগ উপস্থিত দেখে, রাজ্যলোভে ও কর্তৃত্ব বিস্তারের বাসনায়, তিনি বিদ্রোহ করেছিলেন। বর্ধমানের রাজা কৃষ্ণ-রামের উপর তখন বর্ধমান অঞ্চলের রাজস্ব আদায়ের ভার ছিল। তিনি শোভা সিংহের বিদ্রোহ প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন এবং নিজে নিহত হলেন, ১৬৯৬ সালের প্রথম দিকে। তাঁর স্ত্রী ও কন্যাকে শোভা সিংহ গ্রেপ্তার করলেন এবং বর্ধমান টাউন দখল করে রাজার সম্পত্তিও সব অধিকার করলেন। বর্ধমান দখল করার পর শোভা সিংহের প্রভাব আরও বেড়ে গেল, তাঁর সেনা-দলের কলেবর বাড়ল এবং 'রাজা' বলে তিনি নিজের পরিচয় দিলেন। রাজা শোভা সিংহ অতঃপর পার্শ্ববর্তী অঞ্চল পূর্ণোদ্যমে লুটতরাজ করতে লাগলেন। উড়িষ্যার আফগান-প্রধান রহিম খাঁ তাঁর সঙ্গে বিদ্রোহে হাত মেলালেন যখন, তখন উভয়ের সমবেত শক্তি দুর্বর্ষ হয়ে উঠলো।

কৃষ্ণরামের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র জগৎ রায় ঢাকায় গিয়ে বিদ্রোহের কথা নবাবের কাছে নিবেদন করলেন। ইব্রাহিম খাঁ তেমন আমল দিলেন না। তিনি ভাবলেন, বিদ্রোহীরা লুট করে ক্লান্ত হয়ে নিজে থেকেই ক্ষান্ত হবে। কিন্তু তা হল না। পশ্চিমবঙ্গের ফৌজদার নুরুল্লা খাঁকে হুকুম দেওয়া হল, শোভা সিংহের বিদ্রোহ দমন করতে। নুরুল্লা খাঁ তখন নিজের ব্যাবসা নিয়ে ব্যস্ত। হুগলীর দুর্গে তিনি ভয়ে লুকিয়ে রইলেন এবং শোভা সিংহের সৈন্যরা দুর্গ ঘেরাও করল। ১৬৯৬ সালের ২২শে জুলাই ফৌজদার রাতের অন্ধকারে সসৈন্যে দুর্গ ত্যাগ করে পালিয়ে গেলেন। শোভা সিংহ দুর্গ দখল করে ফেললেন। চুঁচুড়ায় তখন ডাচরা প্রতিষ্ঠিত। ফৌজদার ও স্থানীয় পলাতক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের অনুরোধে ডাচরা প্রায় তিনশ' সৈন্য পাঠাল এবং নদী থেকে জাহাজে করে কামান দাগতে লাগল বিদ্রোহীদের লক্ষ করে। বিদ্রোহী সৈন্যরা হুগলী ছেড়ে পলায়ন করল। কিন্তু তাহলেও গঙ্গার পশ্চিমতীরে তাদের

আধিপত্য ও দৌরাত্ম্য কিছুমাত্র কমল না। এইভাবে শোভা সিংহ বিশাল এক রাজ্যের রাজা হয়ে বসলেন। গঙ্গাতীরে প্রায় ১৮০ মাইল পর্যন্ত রাজ্যের দৈর্ঘ্য এবং হুগলী তার কেন্দ্রস্থল। হুগলী থেকে বহিষ্কৃত হয়ে (ডাচদের দ্বারা) শোভা সিংহ বর্ধমানে ফিরে এলেন, পিছনে রহিম খাঁর অধীনে সৈন্যদের রেখে। বর্ধমানের রাজা কৃষ্ণরামের কন্যার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তিনি যখন সম্মানহানির জন্য উদ্যত হয়েছিলেন, শোনা যায়, বর্ধমানের রাজকন্যা তখন ছুরিকাঘাতে তাঁকে হত্যা করেছিলেন। শোভা সিংহের বিদ্রোহের লীলা এইভাবে সাঙ্গ হয়েছিল। রহিম খাঁ তারপর কিছুদিন যুদ্ধ চালিয়ে অবশেষে পরাজিত ও নিহত হন। শোভা সিংহের মৃত্যুর পর তাঁর ভাই হিম্মত সিংহ রাজ্য লাভ করেন। কিন্তু হিম্মৎ সিংহ অত্যন্ত অত্যাচারী জমিদার ছিলেন। এই হিম্মৎ সিংহের অত্যাচারেই 'শিবায়ন' রচয়িতা কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য নিজের জন্মভূমি বরদা পরগণার যদুপুর গ্রাম পরিত্যাগ করে এসে কর্ণগড়ের রাজার আশ্রয় নিয়েছিলেন। কবি রামেশ্বর লিখেছেন ঃ

পূর্ববাস যদুপুরে, হেম্মৎ সিংহ ভাঙ্গে যারে,
রাজারাম সিংহ কৈল প্রীত।
স্থাপিয়া কৌশিকী তটে, বরিয়া পুরাণ পাঠে,
রচাইল মধুর সঙ্গীত।

শোভা সিংহের বিদ্রোহ প্রসঙ্গে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক ঘটনা হল, কলকাতায় চন্দননগরে ও চুঁচুড়ায়, ইংরেজ ফরাসী ও ডাচদের প্রথম দুর্গ নির্মাণ। এই বিদ্রোহ উপলক্ষ্য করেই কলকাতার ইংরেজ, চন্দননগরের ফরাসী ও চুঁচুড়ার ডাচ বণিকরা ঢাকায় নবাব ইব্রাহিম খাঁর কাছে আত্মরক্ষার্থে দুর্গ নির্মাণের অনুমতির জন্য আবেদন করেন। ভাল মানুষ অপদার্থ বৃদ্ধ ইব্রাহিম খাঁ বিদেশীদের শঠতা বুঝতে না পেরে অনুমতি দেন। তার ফলেই কলকাতা শহরে প্রথম ফোর্ট উইলিয়াম (কাস্টমস হাউস, ডাকঘর এলাকায়) এবং চন্দননগরের ও চুঁচুড়ার দুর্গ তৈরি হয়। এই দুর্গ হল বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের প্রথম পাকাপোক্ত বনিয়াদ। জব চার্নকের মাটির ও খড়ের ঘরের বাণিজ্য-কুঠির বদলে ইঁটের দেওয়াল ও প্রাচীরবেষ্টিত দুর্গ তৈরি হয় প্রথম কলকাতায়। কলকাতা শহরের ভিতপত্তন হয়। ১৬৯৮ সালের জুলাই মাসে ইংরেজরা আজিমউশ্বানের কাছ থেকে ১৬,০০০৲ টাকা সেলামি দিয়ে সুতানুটি কলিকাতা

ও গোবিন্দপুর এই তিনটি গ্রাম স্থানীয় জমিদারদের (বড়িশার সাবর্ণ চৌধুরীরা) কাছে বন্দোবস্ত করে নেওয়ার অনুমতিপত্র পান।

বরদা গ্রামে বিখ্যাত বিশালাক্ষী দেবী আছেন, রাজা শোভা সিংহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলে কথিত। টিনের চাল দেওয়া মাটির ঘরের মন্দিরে দেবী বিরাজ করেন। ঘাটাল টাউনের পথে বরদা গ্রামে বিশালাক্ষীর মন্দির পথের ধারেই দেখা যায়। দেবী পঞ্চমুণ্ডির আসনের উপর স্থাপিত। তন্ত্রোক্ত মতেই দেবীর মূর্তি কল্পিত হলেও, তার মধ্যে বৈশিষ্ট্য আছে। পূজাপদ্ধতিও তন্ত্রোক্ত বিধানানুসারে হয়। অনেক স্থানে বিশালাক্ষীর দ্বিভুজা মূর্তি দেখেছি, এই ধ্যানের সঙ্গে মিলে যায়ঃ

ধ্যায়েদ্দেবীং বিশালাক্ষীং তপ্তজাম্বুনদং প্রভাম্
দ্বিভুজামম্বিকাং চণ্ডীং খড়্গখেটক ধারিণীম্।

বরদার বিশালাক্ষী মূর্তি ঠিক এই ধ্যানসঙ্গত নয়। চতুর্ভুজা মূর্তি এবং ত্রিনেত্র। নাগদন্ত ও নিম্নওষ্ঠ ঊর্ধ্বদন্ত দ্বারা দংশিত। ধ্যানেরও বৈশিষ্ট্য আছে। পূজারী যে ধ্যানে পূজা করেন সেই ধ্যানটি এইঃ

…রক্তাং পীনপয়োধরাং ত্রিনয়নাং খণ্ডেন্দুজুটালোকাং
শ্বেতপ্রেতকৃতাসনাং নরশিরঃ কঙ্কালমালাধরাং
বামেঽসৃক্ পরিপূর্ণ খর্পরভুজাং সচ্ছুরিকাং দক্ষিণে
ভক্তানাং বরদায়িনীং ভগবতী বন্দ্যে বিশালাক্ষীকাং।

এক সময় বরদা গ্রামে শোভা সিংহের রাজধানী ছিল যখন, তখন বিশালাক্ষী দেবী তাঁর অধিষ্ঠাত্রী দেবী ছিলেন। শোভা সিংহ শক্তিপূজারী ছিলেন। রাজধানীর কোন চিহ্ন (ইট পাথরের) কোথাও না থাকলেও, বিশাল উচ্চভূমি-পরিবেষ্টিত পরিখা আছে এখনও। শোনা যায়, এই পরিখা-বেষ্টিত গড়বাড়ি ছিল শোভা সিংহের। পরিখা ও উচ্চভূমির রূপ দেখে অবশ্য অবিশ্বাস্য মনে হয় না। এই স্থানটিকে এখনও সকলে 'রাজার গড়' বলেন। ভিতরগড়ের মধ্যে নাকি বড় বড় দীঘি ছিল, চংদার দীঘি, রণসাগর, সিংসাগর ইত্যাদি, এখন ভরাট হয়ে গেছে।

ঘাটালের এ-অঞ্চলে ধর্মঠাকুর ও কামিন্যার প্রভাব খুব বেশি। সেকথা আগে বলেছি। ধর্মের কামিন্যাদের আধিপত্যটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়। কলকলি দেবী, রায়বাঘিনী, জঙ্গালি, কালীবুড়ী ইত্যাদি কামিন্যাদের নাম।

২৯

৩০

৩১

৩২
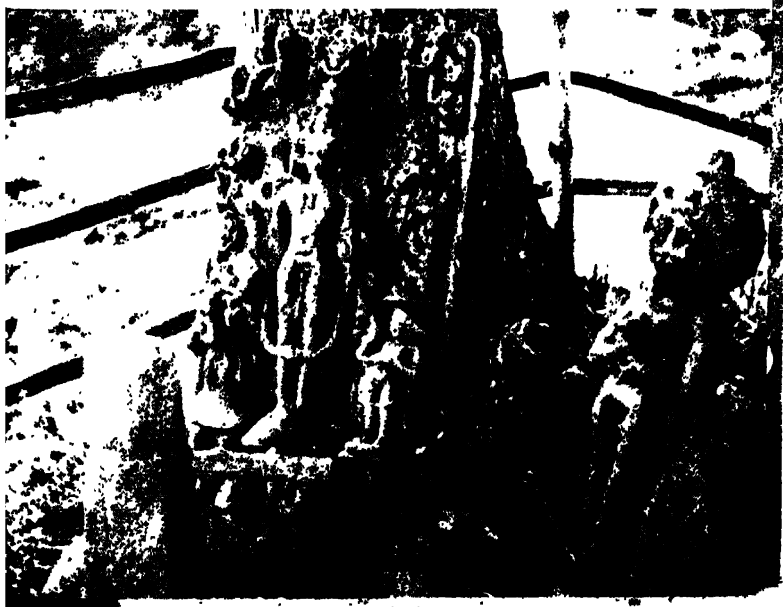
শাক্ত দেবীদের সঙ্গে তাঁদের বিশেষ পার্থক্য নেই কোথাও। আশপাশের বনাঞ্চলের নায়েক ও সাঁওতালদের পূজিত অনেক বনদেবীর সঙ্গেও তাঁদের বিচিত্র সাদৃশ্য আছে দেখা যায়। তান্ত্রিক দেবী ও বনদেবীদের মধ্যে এক অভিনব আদানপ্রদান হয়েছে এখানে মনে হয় এবং ধর্মের কামিন্যারা তারই মধ্যে ক্রমে শাক্তদেবীর মতন স্বতন্ত্র মূর্তি ধারণ করেছেন। মানবসমাজে মানুষের উপর মানুষের প্রভাবের কথা আমরা জানি, কিন্তু এক দেবতার উপর অন্য দেবতার প্রভাব যে কত ব্যাপক ও গভীর হতে পারে, তা বোধ হয় আমরা কল্পনা করতে পারি না।

চেতুয়া-বাসুদেবপুর

শোভা সিংহের পূর্বপুরুষ কেউ কোন ঐতিহাসিক সুযোগে চেতুয়া ও বরদা পরগণার জমিদারী দখল করেছিলেন, সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে। তার আগে বরদা পরগণার অনেকটা অঞ্চল পর্যন্ত চন্দ্রকোণার ভান রাজবংশের আধিপত্য বিস্তৃত ছিল মনে হয়। শোভা সিংহের আধিপত্যের কালে তাঁর সহোদর হেমন্ত সিংহও চেতুয়া পরগণার কোন কোন অঞ্চলের জমিদারী ভোগ করছিলেন। হেমন্ত সিংহ স্বেচ্ছাচারী জমিদার ছিলেন বলে, জ্যেষ্ঠ শোভা সিংহের রোমান্টিক মৃত্যুর পর, বেশিদিন তিনি বিদ্রোহের নেতৃত্ব বা জমিদারীর কর্তৃত্ব, কোনটাই করবার সুযোগ পাননি। চেতুয়া-দাসপুর ও ও চেতুয়া-বাসুদেবপুর অঞ্চলে হেমন্ত সিংহেরই যে প্রধান কর্তৃত্ব ছিল, তা এই সব অঞ্চল থেকে পাওয়া প্রাচীন দলিলপত্রাদি থেকে অনুমান করা যায়। স্থানীয় শিল্প, বিদ্যাসমাজ ইত্যাদির দিক থেকে চন্দ্রকোণা ও ক্ষীরপাই-এর মতন, দাসপুর, বাসুদেবপুর প্রভৃতি স্থানও এক সময় যথেষ্ট প্রসিদ্ধ ছিল।

দাসপুর-বাসুদেবপুর প্রভৃতি অঞ্চলের বিস্তৃত ঘরবাড়ির ও দেবালয়ের ধ্বংসাবশেষ দেখলেই বোঝা যায় অতীতের সমৃদ্ধির কথা। রেশমশিল্পের অন্যতম ঘাঁটি ছিল এই অঞ্চল। তা ছাড়া, তাঁতশিল্পের খ্যাতি তো ছিলই, এখনও আছে। দাসপুর থানার অধিকাংশ অঞ্চল চেতুয়া পরগণার অন্তর্গত ছিল। তাই এখানকার একাধিক প্রসিদ্ধ গ্রাম চেতুয়া নামের সঙ্গে জড়িত। আগে বলেছি, শোভা সিংহের সহোদর হেমন্ত সিংহ প্রধানত এই অঞ্চলে কর্তৃত্ব করতেন। অন্তত দলিলপত্রাদি থেকে তাই মনে হয়। স্থানীয় ইতিহাস থেকে যা জানা যায়, তাতে দেখা যায়, উত্তর-রাঢ়ীয় এক কায়স্থ দত্তবংশ (রায় উপাধি) এই বাসুদেবপুর ও চেতুয়া পরগণার ছয় আনা অংশের ভূস্বামী ছিলেন। এই দত্তবংশের মুরলীধর দত্ত (রায়) নামে কোন পূর্বপুরুষ মুর্শিদাবাদ অঞ্চল থেকে এখানে উঠে আসেন। তাঁর পুত্র দামোদর রায়ের কাছ থেকে হেমন্ত সিংহ জমিদারী কেড়ে নেন। তখন বোধ হয় সিংহ সহোদরদের দোর্দণ্ডপ্রতাপ সুপ্রতিষ্ঠিত, অথবা প্রতিষ্ঠার পথে। হেমন্ত সিংহ স্থানীয় জমিদার রায়দের জমিদারী কেড়ে নিয়ে ১০০ বিঘা জমি রাধাবল্লভাদি

গৃহদেবতার পূজার জন্য নিষ্কর দান করেছিলেন। রায় পরিবারে এই দানপত্রের দলিলটি আছে, দেবনাগরী অক্ষরে হেমন্ত সিংহের নাম স্বাক্ষরিত। দানপত্রটি এই :

স্বস্তী সকল মঙ্গলালায় শ্রীদামোদর রায়চৌধুরি সমুদার চরিতেষু সনন্দ লিখনং কার্য্যঞ্চ আগে চেতুয়া পরগণার ক্রীঃ ছয় আনি তোমার জমিদারী ছিল তাহা আমি লইলাম অতএব তোমার শ্রীশ্রীজীউর সেবার কারণ তোমার বেড়াবাটী ও মহাত্রাণ গড়বন্দী যে আছে তাহা লেত্তায় ১০০/ এক সত্ত বিঘা বাষুদেবপুর ওগয়রহতে দেবত্তর দিলাম তাহার জায়····· এক সত্ত বিঘা জমী দেবত্তর······দখল করিয়া পুত্রপৌত্রাদিক্রমে তোমার শ্রীশ্রী৺সেবা করহ এতদর্থে সনন্দ লিখিয়া দিলাম ইতি সন ১১১৬ সাল তারিখ ২৩ বৈশাখ—শ্রীরামসহী রাজা হীমংত সিংহ (দেবনাগরী)।

এই অঞ্চলের জমিদারী পরে বর্ধমানের মহারাজারা পান। বর্ধমানের রাজা এই সনন্দ মঞ্জুর করেন রায়বংশের বংশধর গুলাব রায়কে, ১১৭২ সনের ১৩ই ফাল্গুনের সনদে ১০৯ বিঘা এক কাঠা জমি দেওয়া হয়। রায়দের বসতবাড়ির ও রাধাবল্লভাদির মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ বাসুদেবপুব গ্রামে এখনও আছে। সব প্রায় দুর্ভেদ্য জঙ্গলে ঢেকে গেছে।

বাসুদেবপুরের ভট্টাচার্য বংশও প্রাচীন বংশ। ১১৭৩ সনের জলদানের একটি আদায় ফর্দে দিবাকর ভট্টাচার্যের নাম পাওয়া যায়। তাই থেকে এই বংশের প্রাচীনতা কিছুটা অনুমান করা যেতে পারে। জলদান সাধারণত গুরুবংশ পান। তাই থেকে এঁরা অনুমান করেন যে, ভট্টাচার্যবংশই শোভা সিংহের গুরুবংশ ছিলেন। এই বংশের সঙ্গে পেঁড়োর ভুরশুট রাজবংশের শাখার সম্পর্কও স্থাপিত হয়। ভট্টাচার্যদের পূর্বপুরুষ ধরণীধর ভট্টাচার্য। ধরণীধরের কন্যা দয়াময়ীর সঙ্গে ভুরশুট রায়বংশের রাজচন্দ্র রায়ের বিবাহ হয়। বসন্তপুরের পুঁথিতে দেখা যায়, পেঁড়োর বংশের এই ধারা নির্দেশ করা হয়েছে :

রায়গুণাকর কবি ভারতচন্দ্রের বৃদ্ধপ্রপিতামহ গোপীরমণ রায়— তাঁর জ্যেষ্ঠ-পুত্র ভূপতি রায় থেকে ভারতচন্দ্র— এবং পঞ্চম পুত্র নবোত্তম রায়— তস্য পুত্র রামসন্তোষ রায়— তস্য পুত্র রাধাবল্লভ— তস্য পুত্র রামকৃষ্ণ— তস্য পুত্রদ্বয় রাজচন্দ্র ও বেচারাম। বসন্তপুরের পুঁথি এইখানেই শেষ হয়েছে। রাজচন্দ্রের

সঙ্গে দয়াময়ীয় বিবাহ হয়। রাজচন্দ্রের পুত্র রামভক্ত রায়, ঈশান ও উদয়চন্দ্র ন্যায়ভূষণ। উদয়চন্দ্র ন্যায়ভূষণের প্রপৌত্র শ্রীপঞ্চানন রায় কাব্যতীর্থ জ্যোতির্বিনোদ এখন বাসুদেবপুরেই বাস করেন।

উদয়চন্দ্র ন্যায়ভূষণ এ-অঞ্চলের একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর সময় বাসুদেবপুর অঞ্চলে চার-পাঁচটি টোল ছিল শোনা যায়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের সময় ন্যায়ভূষণ জীবিত ছিলেন। কেবল কলকাতা শহরে নয়, গ্রামাঞ্চলে নানাস্থানে বিদ্যাসাগরের সামাজিক আন্দোলনের ঢেউ পৌঁছেছিল, বিশেষ করে তাঁর বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের। যেসব স্থানে ছোটবড় বিদ্যাসমাজ গড়ে উঠেছিল এবং পণ্ডিতদের বসবাস ছিল, টোলচতুষ্পাঠী ছিল, সেখানে বিধবা-বিবাহ আন্দোলন তুমুল বিতণ্ডা বিক্ষোভের সৃষ্টি করেছিল। তাঁর নিজের দেশ ঘাটাল অঞ্চলে যে এই বিক্ষোভ বিশেষভাবে দেখা দিয়েছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়। উদয়চন্দ্র ন্যায়ভূষণের হস্তলিখিত দু'খানি পত্র আছে, বিদ্যাসাগর মহাশয়কে লেখা, বিধবাবিবাহ প্রথা প্রচলনের বিরুদ্ধে। বিদ্যাসাগর এই পত্রের কোন উত্তর দিয়েছিলেন কিনা জানি না। বোধ হয় দেননি। কারণ এরকম কত পত্র, কত প্রতিবাদ, অভিযোগ যে তিনি তখনকার পণ্ডিতদের কাছ থেকে পেয়েছিলেন, তার কোন হিসাব নেই। সকলকে ব্যক্তিগতভাবে লিখিত পত্রে উত্তর দেওয়া নিশ্চয় তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। সাধারণভাবে সকলকে তিনি তাঁর লিখিত গ্রন্থেই উত্তর দিয়েছিলেন।

চেতুয়া-বাসুদেবপুর অঞ্চলে বিদ্যাসাগর মহাশয় একটি মডেল স্কুলও স্থাপন করেছিলেন, প্রায় একশ' বছর আগে। ক্ষীরপাই প্রভৃতি গ্রামের মতন বাসুদেবপুর-দাসপুব অঞ্চলেরও তখন বাইরের একটা শ্রী ছিল। নানারকম গ্রাম্যশিল্পের বাণিজ্যের জন্য লক্ষ্মী তখন গ্রামে বাস করতেন। বেশ বোঝা যায়, এই ধরনের বর্ধিষ্ণু বসতিবহুল গ্রামেই বিদ্যাসাগর মহাশয় মডেল স্কুল স্থাপন করেছিলেন। আশার কথা, স্কুলগুলি অধিকাংশই এখনও আছে এবং বিদ্যাসাগরের প্রতিষ্ঠিত বলে শিক্ষকরা অফুরন্ত প্রেরণা ও উৎসাহ নিয়ে সেই সব স্কুলের যথেষ্ট উন্নতি করেছেন। ক্ষীরপাই-এর মতন বাসুদেবপুব স্কুলেরও ক্রমোন্নতি হয়েছে।

বাসুদেবপুরের স্থানীয় গ্রাম্য দেব-দেবী ও উৎসব-পার্বণের মধ্যে যে ধারার প্রাধান্য দেখা যায়, তা তান্ত্রিক ধারা। বরদার বিশালাক্ষী প্রসঙ্গে বলেছি যে,

দেবী পঞ্চমুণ্ডির আসনের উপর স্থাপিত এবং তন্ত্রোক্ত বিধানানুসারে তাঁর পূজা হয়। শোনা যায়, বিশালাক্ষী দেবী শোভা সিংহের প্রতিষ্ঠিত। কিংবদন্তী তাই। শোভা সিংহের গুরুবংশ বলে কথিত ভট্টাচার্যবংশও, দেখা যায়, তান্ত্রিকের বংশ। এঁদের ত্রিপুরাসুন্দরী নামে তান্ত্রিক যন্ত্র আছে, কুলদেবতা বলে পূজা করেন। জ্যৈষ্ঠমাসে সাবিত্রী-চতুর্দশীর পরদিন শ্মশানকালী পূজা হয় বাসুদেবপুর গ্রামে। দিনের বেলা পূজা হয়। সকল সম্প্রদায়ের লোক নির্বিচারে এই গ্রাম্য সাধারণ উৎসবে যোগদান করেন এবং অনেকে উৎসব উপলক্ষ্যে কারণবারি পান করতে কুণ্ঠিত হন না। বাসুদেবপুরে একটি দেড়শ' বছরের প্রাচীন কালীমন্দির আছে, পঞ্চরত্ন মন্দির। মন্দিরের গাত্রসংলগ্ন যে লিপি আছে, তাতে লেখা আছে :

দহনযমনগগ্নৌ সম্মিতে শাকবর্ষে
রুচিরনিলয়মেতৎ শ্রীল দামোদরায়
কুলকুমুদকলেশঃ শ্রীল মুক্তাদ্যরামো
বস্তুল পরমভক্তো দত্তভূর্মোদমাপ—(?)

ভট্টাচার্যবংশে কালীযন্ত্র ও ৺ত্রিপুরেশ্বরীর অষ্টধাতুময়ী মূর্তি এবং বিদ্যা বাগীশবংশে ভুবনেশ্বরীযন্ত্র আছে। এসব তন্ত্রের প্রাধান্যই ইঙ্গিত করে।

এছাড়া গ্রামদেবতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ধর্মঠাকুর, শীতলা, মনসা ও পঞ্চানন। জয়চণ্ডী দেবী আছেন, অষ্টভুজা মূর্তি। শীতলা দেবীর অত্যধিক প্রাধান্য দেখা যায় কাঁথি, তমলুক ও ঘাটাল অঞ্চলে। বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই শীতলাপূজার বিশেষ প্রচলন আছে। কলেরা, বসন্তের মহামারীর সময় তাঁর বিশেষ পূজার সমারোহ দেখা যায়। কাঁথি তমলুক ও ঘাটাল অঞ্চলে শীতলাই অন্যতম প্রধান গ্রামদেবতা বলে মনে হয়। শীতলার বারোয়ারী পূজাই গ্রামের প্রধান উৎসব এবং সবচেয়ে বেশি সমারোহের সঙ্গে সেই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। তাছাড়া, অনেক বর্ধিষ্ণু গৃহস্থ পরিবারে শীতলাদেবী গৃহদেবতা-রূপেও প্রতিষ্ঠিত আছেন। ধর্মঠাকুরের সঙ্গে ঘাটাল অঞ্চলে যে দেবী অবশ্য-সহচররূপে বিরাজ করেন, তিনি শীতলাদেবী। মনে হয়, শীতলার এই অত্যধিক প্রাধান্যের বিশেষ কারণ আছে। শীতলানন্দ নামও আছে অনেকের, এমনকি শিবের নাম পর্যন্ত ঘাটাল অঞ্চলে কোথাও কোথাও (যেমন বিদ্যাসাগরের জন্মস্থান বীরসিংহ গ্রামে) শীতলানন্দ হয়ে গিয়েছে দেখা যায়।

বাসুদেবপুরে পঞ্চানন ঠাকুরও আছেন। একই দেবালয়ের মধ্যে পঞ্চানন, শীতলা ও মনসা স্থাপিত। পঞ্চাননের ধ্যান এই :

পঞ্চাননং মহাদেবং রক্তবর্ণং দিগম্বরং
পদ্মাসনস্থং দ্বিভুজং নানালঙ্কারভূষিতম্
প্রলম্ব বাহুস্থবলং পট্টযজ্ঞোপবীতকং
শিরে পিঙ্গ জটাভারং শিশুগ্রীবারিমর্দনং
বামহস্তে শিশু ধরং দক্ষ হস্তে ত্রিশূলকং
গোমৃগবাহনম্ চৈব বেষ্টিতং মণিমণ্ডলং
কণ্ঠে রুদ্রাক্ষমালা চ শোভিতং রক্তলোচনং
উত্র তেজোময়ং রুদ্রং ব্রহ্মীষ্টং চ তপস্বীনং
ধ্যায়েৎ পঞ্চাননং দেবং ভক্তানুগ্রহকারকম্।

পঞ্চানন ঠাকুরের ভৌগোলিক প্রাধান্যক্ষেত্র প্রধানত হাওড়া ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার মধ্যে সীমাবদ্ধ দেখা যায়। এই প্রাধান্যকেন্দ্র থেকে পঞ্চানন আশে-পাশে কিছুদূর পর্যন্ত প্রভাব বিস্তার করেছেন। কিন্তু হাওড়ায় ও দক্ষিণ চব্বিশ-পরগণায় যেমন গ্রামে গ্রামে পঞ্চানন ঠাকুর, প্রায় প্রতি গ্রামের প্রধান অধিষ্ঠাত্রী দেবতা পঞ্চানন ঠাকুর, এরকম আর অন্য কোথাও নেই। হাওড়ার উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত থেকে মেদিনীপুরের চেতুয়া পরগণায় পর্যন্ত পঞ্চানন ঠাকুর যে কিছুটা প্রভাব বিস্তার করেছেন, বাসুদেবপুরের পঞ্চানন তার প্রমাণ। কিন্তু হঠাৎ হাওড়া ও দক্ষিণ চব্বিশ-পরগণায় (কলকাতা শহরসহ, কারণ প্রাচীন কলকাতায় পঞ্চাননতলা নামে একাধিক স্থান ছিল) পঞ্চাননের এরকম দোর্দণ্ড আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হল কেন, এবং কি কারণে, সে সম্বন্ধে কেউ কোন অনুসন্ধান বা চিন্তা করেননি। বাঙালী সংস্কৃতির ইতিহাস অনুরাগীদের কাছে বাংলার গ্রামদেবতারা চিরকাল অনাদৃত ও উপেক্ষিত হয়ে আছেন। যতদিন না বাংলার এই গ্রামদেবতাদের উৎপত্তি, প্রভাব ও প্রসারের ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত রচিত হবে ততদিন বাঙালীর সাংস্কৃতিক ইতিহাসের একটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় অলিখিত থাকবে।

কেশিয়াড়ী

মেদিনীপুরের উত্তর ও উত্তর-পূর্বাংশ ঘাটাল অঞ্চল থেকে এইবার আমরা দক্ষিণ দিকে যাত্রা করব। দক্ষিণে নারায়ণগড়, কেশিয়াড়ী, দাঁতন প্রভৃতি প্রসিদ্ধ স্থান। প্রত্যেকটির স্বতন্ত্র বিবরণ এখানে দেওয়া সম্ভব না হলেও, দু'একটি নির্বাচিত স্থান প্রসঙ্গে এই অঞ্চলের ঐতিহাসিক ধারা ও সাংস্কৃতিক বিশেষত্ব আমরা বর্ণনা করব। দক্ষিণের এই অঞ্চল থেকে ক্রমে আমরা আরও দক্ষিণে কাঁথি মহকুমার ভিতর দিয়ে দক্ষিণ-পূর্বে তমলুক মহকুমার দিকে অগ্রসর হব। এইভাবে মেদিনীপুর জেলার কেন্দ্রস্থল মেদিনীপুর শহর কেন্দ্র করে চারিদিক ঘুরলে দেখা যায় যে, মেদিনীপুরের উত্তরাংশের সঙ্গে দক্ষিণাঞ্চলের এবং পূর্বের সঙ্গে পশ্চিমাঞ্চলের সংস্কৃতিগত পার্থক্য আছে। এই পার্থক্য অবশ্য ঐতিহাসিক কারণেই ঘটেছে। কিন্তু তা ঘটলেও, মেদিনীপুরের তথা পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে এই পার্থক্য বিশেষ স্মরণীয়। দক্ষিণ মেদিনীপুর উড়িষ্যার বালেশ্বর-সংলগ্ন। হিন্দুযুগের শেষ থেকে মুসলমানযুগের শেষ পর্যন্ত এই দুই অঞ্চলে ওড়িয়া ও বাঙালী সংস্কৃতির মধ্যে অনেক আদান প্রদান হয়েছে।

কণ্টাই রোড ও বেলদা স্টেশন থেকে কটক ট্রাঙ্ক রোডের পশ্চিম দিকে যে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা গেছে, তাকে কেশিয়াড়ী রোড বলে। এই রাস্তা বরাবর পশ্চিম-দক্ষিণ দিকে গিয়ে কেশিয়াড়ী গ্রামের উত্তরে পড়েছে। কণ্টাই রোড দিয়ে এই পথে কেশিয়াড়ী যাওয়া যায়। খড়্গপুর স্টেশন থেকেও মোটরবাসে কেশিয়াড়ী যাওয়া চলে। আমরা কণ্টাই রোডের পথ দিয়েই কেশিয়াড়ী গিয়েছিলাম। স্টেশন থেকে কুকাই গ্রাম পর্যন্ত প্রায় আট মাইল পথ আমাদের হেঁটে যেতে হয়েছিল। কুকাই থেকে বিখ্যাত কুরুমবেড়া দুর্গ ও অন্যান্য ঐতিহাসিক দ্রষ্টব্যস্থান কাছে বলে আমরা এই গ্রামেই ছিলাম। গ্রামটিতে আদিবাসী লোধাদেরই বাস বেশি। কুকাই থেকে কেশিয়াড়ী মাইল দুই তিন পথ।

কেশিয়াড়ী, দাঁতন ও নারায়ণগড়, তিনটিই দক্ষিণ মেদিনীপুরের বিশেষ প্রসিদ্ধ স্থান। তিনটি স্থানেরই ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য আছে। থাকাই

স্বাভাবিক। কারণ তিনটি স্থানের পারস্পরিক দূরত্ব খুব বেশি নয়, মানচিত্রে একটি ত্রিভুজের তিনটি কেন্দ্র বলে মনে হয়। ষোল মাইল থেকে বারো মাইল আন্দাজ প্রত্যেকটি বাহুর দূরত্ব।

প্রায় দ্বাদশ ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত বাংলার এই দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তে ক্রমাগত একটার পর একটা রাজনৈতিক ঝড় বয়ে গেছে বললেও ভুল হয় না। মধ্যে মধ্যে তদানীন্তন রাজাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও পরাক্রমের জন্য কিছুকাল ধরে শান্তি স্থাপিত হয়েছে, কিন্তু তা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। আবার এক সাময়িক রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে পড়ে সমস্ত শৃঙ্খলা ও শান্তি নষ্ট হয়ে গিয়েছে। আনুমানিক পাঁচশ' বছর ধরে ক্রমাগত ঐতিহাসিক উত্থান-পতনের আঘাত পেয়ে পেয়ে, মেদিনীপুরের দক্ষিণাঞ্চলের এই অংশে কোন সুপরিকল্পিত সংস্কৃতিসৌধ, ভিত্তি থেকে চূড়া পর্যন্ত, সুশৃঙ্খল ধারায় গড়ে ওঠার অবকাশ পায়নি। এমন কি বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতিধারাও, মনে হয় যেন, এই স্থানটিতে অব্যাহত ধারায় বিকাশলাভ করতে পারেনি। দক্ষিণ ভারতীয়, ওড়িয়া, পাঠান, মোগল, মারাঠা প্রভৃতি বিভিন্ন সংস্কৃতিধারার সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে বাঙালী সংস্কৃতি কতকটা পরদেশী হয়ে গিয়েছে এখানে। তার মধ্যে উড়িষ্যার গঙ্গবংশীয় ও পরবর্তী রাজারা এই অঞ্চলে দীর্ঘকাল ধরে প্রায় একচ্ছত্র প্রভুত্ব করেছেন এবং শুধু মেদিনীপুরে নয়, হুগলীর মন্দারণ, ত্রিবেণী, সপ্তগ্রাম পর্যন্ত তাঁরা সেই প্রভুত্ব বিস্তার করেছেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যাঁদের অখণ্ড প্রতিপত্তি ছিল, সংস্কৃতিক্ষেত্রেও যে তাঁরা নিরঙ্কুশ প্রভুত্ব কায়েম করবেন, তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। উড়িষ্যার সাংস্কৃতিক প্রভাব এই অঞ্চলে তাই খুব বেশি দেখা যায়।

হিন্দু-মুসলমান যুগের সন্ধিক্ষণে দেখা যায়, উড়িষ্যার গঙ্গবংশীয় রাজারা বিরাট এক শক্তিশালী সাম্রাজ্য গঠনের জন্য উদ্‌যোগী হয়েছেন। দক্ষিণ মেদিনীপুরের অনেকটা অংশ, এদিকে মন্দারণ পর্যন্ত, রাজ্যবিস্তৃত করে তাঁরা প্রবল পরাক্রমে রাজত্ব করতে আরম্ভ করেছেন। এদিকে মুসলমান অভিযানও আরম্ভ হয়েছে। নদীয়াবিজয়ের পর মুসলমানরা প্রথমেই পশ্চিমবঙ্গ বা রাঢ়দেশ জয় করেননি। রাঢ়দেশ জয় করতে দীর্ঘকাল ধরে তাঁদের সংগ্রাম করতে হয়েছিল। এই সময় মুসলমান অভিযান প্রতিরোধ করে দাঁড়িয়েছিলেন প্রধানত উড়িষ্যার স্বাধীন রাজারা। পশ্চিমবাংলার কতকটা

অঞ্চল তখন তাঁদেরই দখলে, প্রায় দামোদর পর্যন্ত তখন তাঁদের রাজ্যের সীমানা। পদে পদে উড়িষ্যার রাজারা পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান অভিযান প্রতিহত করার চেষ্টা করেছেন। রাঢ়দেশে লক্ষ্ণৌর পর্যন্ত (বীরভূমের নগর বা রাজনগর) মুসলমানদের অধিকার সীমান্ত প্রতিষ্ঠিত হলেও ত্রয়োদশ শতাব্দীর গোড়াতে গঙ্গরাজা তৃতীয় অনঙ্গভীমের (১২১১-১২৩৮ খৃস্টাব্দ) দূরদর্শী বীরমন্ত্রী ও সেনাপতি বিষ্ণু রাঢ়দেশে অভিযান করে লক্ষ্ণৌর দখল করেন। সুলতান গিয়াসউদ্দীন খিলজী লক্ষ্ণৌর পুনরুদ্ধার করেন। তুঘরল তুঘানের অভিযানের সময়েও তৃতীয় অনঙ্গভীমদেবের পুত্র রাজা নরসিংহদেব (১২৩৮ খৃঃ) প্রবলভাবে প্রতিরোধ করেন। পশ্চিমবঙ্গে তখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দু সামন্ত নৃপতিদের অভাব ছিল না। সপ্তগ্রাম নদীয়া প্রভৃতি অঞ্চলে তাঁরা ছড়িয়ে ছিলেন। উড়িষ্যার গঙ্গরাজাদের প্রতিরোধ-সংগ্রামের প্রতি তাঁদের যথেষ্ট সহানুভূতিও ছিল :

> Saptagram (Satgaon) was still unsubdued and the district of Nadia was strewn with semi-independent Hindu Rajas. These were little likely to offer any opposition to the northward expansion of the mighty Hindu power of Orissa which was their only safeguard against the rapacity of the Turks. (History of Bengal, Vol. II. P. 48.)

ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণের এই সুযোগেও কতকটা উড়িষ্যার রাজাদের পক্ষে পশ্চিমবঙ্গে আধিপত্য বিস্তার করা সহজ হয়েছিল। ত্রয়োদশ থেকে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত এই সংগ্রাম চলতে থাকে এবং তার ফলে দেশের মধ্যে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। প্রধানত দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলা ও দক্ষিণ মেদিনীপুরের উপর দিয়েই যে বিপর্যয়ের ঝড় বেশির ভাগ বয়ে যায়, তাতেও কোন সন্দেহ নেই। দেশের এই আভ্যন্তরিক বিশৃঙ্খলার আভাস আমরা চৈতন্যচরিত-সাহিত্যে পাই। তারপর আরম্ভ হয় মোগলদের অভিযান। দায়ূদ খান মোগলদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন ১৫৭৪ সালে। পশ্চাদ্ধাবিত হয়ে দায়ূদ খান সপ্তগ্রাম থেকে দিনকেশাড়ী (কেশিয়াড়ী) পলায়ন করেন এবং সেখানে সৈন্যসামন্ত সংগ্রহ করে মোগল অভিযান প্রতিরোধ করার জন্য প্রস্তুত হন। তোডরমল্লও

নতুন সৈন্যসামন্ত সমাবেশ করে লড়াই-এর জন্য প্রস্তুত হন। বর্তমান কেশিয়াড়ীর দক্ষিণে, দাঁতনের উত্তরে মোগলমারী নামক স্থানে মোগল-পাঠানে যুদ্ধ হয়। বাংলায় ও উড়িষ্যায় আধিপত্য বিস্তার করা নিয়ে, মোগলদের সঙ্গে পাঠানদের সবচেয়ে বড় প্রথম ঐতিহাসিক সংগ্রাম হয় এইখানে। ১৫৭৫ সালের মার্চ মাসে। এই মোগল-পাঠান যুদ্ধের জন্যই এই স্থানটির নাম মোগলমারী, এইকথা অনেকে বলেন :

> The battle is still commemorated by the name of a village near the Orissa Grand] k Road, two miles north of Danton village, viz. 'almari, i. e., the Mughals' slaughter, and it is ... nown as the battle of Mughalmari. (W. B. Ce ... Mindnapur District—Handbook : Introduction.)

সাধারণত সকলে এই কথাই বলেন যে, মোগলমারী ... .পত্তি হয়েছে, মোগলদের যেখানে মারা হয়েছে, এই অর্থ থেকে। কিন্তু একথার ভাষাগত এই অর্থ মনে হয় ভুল। মৌলবী আবদুল ওয়ালী মন্তব্য করেছেন যে, ইতিহাস ও ভাষাতত্ত্ব, দুদিক থেকেই একথার অর্থ তা হয় না। মোগলরা এখানে পাঠানদের মেরেছিল, পাঠানরা মোগলদের মারেনি। আর কথাটা 'মারী' নয় 'মাড়ী'। মাড়ী কথার অর্থ পথ বা রাস্তা। 'মোগলমাড়ী' কথার অর্থ মোগলদের পথ। এই পথের উপরে মোগল-পাঠানের যুদ্ধ হয়েছিল বলে নাম মোগলমাড়ী (মোগলমারী নয়)। এছাড়া অন্যভাবে একথার অর্থ করা সবদিক দিয়েই ভুল। নারায়ণগড়ের রাজার উপাধি ছিল মাড়ী-সুলতান বা পথের সম্রাট। বাদশাহী পথের রাজা। মোগলমাড়ী কথার অর্থও তাই :

> To interpret the word differently would be historically, geographically and philogically incorrect. (Maulavi Abdul Wali : Notes on Archæological Remains in Bengal : Journal, Asiatic Society, Vol. 20, No. 7.)

পাঠান ও মোগলরা ছাড়াও মারাঠাদের কর্তৃত্ব এ-অঞ্চলে কিছুকাল প্রতিষ্ঠিত ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি নবাব আলিবর্দী খাঁ মারাঠাদের

সঙ্গে চুক্তি করে উড়িষ্যাসহ মেদিনীপুরের দক্ষিণাঞ্চলের অনেকটা অংশ তাদের ছেড়ে দিয়েছিলেন। মারাঠাদের শাসন ও উপদ্রবের চিহ্ন এবং কিংবদন্তীও এ-অঞ্চলে তাই যথেষ্ট দেখা যায়।

ইতিহাসের এই উত্থান-পতনের অনেক নিদর্শন আজও কেশিয়াড়ী ও তার পাশাপাশি অঞ্চলে দেখা যায়। উড়িষ্যার রাজাদের প্রভুত্বের নিদর্শন এখানকার মন্দিরে ও তার গায়ের শিলালিপিতে উৎকীর্ণ রয়েছে। বড় বড় জলাশয় ও পুষ্করিণীও আছে অনেক। পাত্রমা, নায়কা, বিদ্যাধর প্রভৃতি পুষ্করিণীর নাম থেকেও উড়িষ্যার কীর্তির আভাস পাওয়া যায়। কুকাই গ্রামের অনতিদূরে কুরুমবেড়া নামে যে প্রাচীন দুর্গের বিরাট নিদর্শন দেখা যায়, তার গায়ের শিলা-লিপি থেকে জানা যায় যে, উড়িষ্যার রাজা কপিলেশ্বরদেব এই সেনানিবাস তৈরি করেছিলেন পঞ্চদশ শতাব্দীর তৃতীয়-চতুর্থ দশকে। পাঠান রাজত্বকালে এই সেনানিবাস থেকে কতবার যে উড়িষ্যার রাজারা প্রতিরোধ-অভিযান করেছেন তার ঠিক নেই। সেনানিবাস যে কতবার দুই পক্ষের মধ্যে হাতবদল হয়েছে তাও বলা যায না। মোগল অভিযানের সময়েও এই কুরুমবেড়া সেনানিবাস বিদ্রোহী পাঠানদের এবং মোগলদের হস্তগত হয়েছে। মারাঠা অভিযানের সময়, মারাঠারাও নিশ্চয় উড়িষ্যা-বাংলার পথের উপর তৈরি এই সুন্দর সেনানিবাসটির সদ্ব্যবহার করতে ভুলে যায়নি। সত্যিই ঐতিহাসিক দুর্গ এই কুরুমবেড়ার দুর্গ। কুরুমবেড়া ছাড়াও পাঠান-মোগল আমলের ঐতিহাসিক নিদর্শন কেশিয়াড়ী অঞ্চলে অনেক আছে। পাশাপাশি স্থান ও গ্রামের নাম রয়েছে মোগলপাড়া, ঔরঙ্গাবাদ, কাশিমপুর, হাসিমপুর, রেজ্জাকপুর ইত্যাদি। প্রাচীন ভগ্ন মসজিদেরও অভাব নেই। কিন্তু এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হল কুরুমবেড়ার দুর্গ।

কুরুমবেড়া দুর্গের বাইরের পাথরের প্রাচীর বহুদূর থেকেই দেখা যায়। প্রায় দশ ফুট উঁচু দেয়াল এবং প্রস্থও ফুট তিনের কম নয়। ভিতরে প্রায় আটফুট চওড়া খিলানযুক্ত প্রকোষ্ঠসারি, চারিদিক বেষ্টিত। আগাগোড়া ঝামা পাথরের তৈরি। প্রাচীরের মধ্যে প্রশস্ত সমতল চত্বর। তার পূর্বাংশে একটি দেবমন্দিরের ভগ্নাবশেষ এবং পশ্চিমাংশে তিনটি বড় গম্বুজসহ একটি মসজিদ এখনও দেখা যায়। একই চত্বরের মধ্যে একদিকে মন্দিরের ভগ্নাবশেষ এবং আর একদিকে মসজিদ, এরকম দৃশ্য বাংলাদেশের মধ্যে বড় একটা দেখা যায় না।

কেশিয়াড়ীতে কুরুমবেড়া দুর্গের মধ্যে দেখা যায়, কারণ এ-দুর্গ পাঠান-মোগল যুগের সবচেয়ে ঐতিহাসিক দুর্গ বললেও ভুল হয় না। বাংলা ও উড়িষ্যার সীমান্ত অঞ্চলে বাদশাহী সড়কের পাশে অবস্থিত এই দুর্গের ভৌগোলিক ও সামরিক গুরুত্ব এত বেশি যে, উড়িষ্যার হিন্দু রাজারা থেকে আরম্ভ করে পাঠান মোগল ও মারাঠারা সকলেই এই দুর্গের সদ্ব্যবহার করেছেন এবং এখানে অবস্থানও করেছেন। মন্দিরটির ভগ্নাবশেষ দেখে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, উড়িষ্যার রেখ-দেউলের গড়নে মন্দিরটি তৈরি হয়েছিল। রাজা কপিলেশ্বরদেব পঞ্চদশ শতাব্দীতে এই মন্দির তৈরি করে বোধ হয় এখানেই শিব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মসজিদের গায়ে যে শিলালিপি উৎকীর্ণ রয়েছে তাতে দেখা যায় যে, সম্রাট ঔরঙ্গজীবের আমলে মহম্মদ তাহীর এই মসজিদ নির্মাণ করেন এবং আন্দাজ ১৬৯১ খৃস্টাব্দে কুরুমবেড়া দুর্গ মোগলদের সেনানিবাসে পরিণত হয়। দুর্গ-প্রাঙ্গণে মন্দির ভেঙে সেইজন্য মস্‌জিদ তৈরি করা হয়। লক্ষণীয় হল, মন্দিরের ভিত্তিকোণ ও ভগ্নস্তূপ এখনও অপসারিত হয়নি।

কুরুমবেড়া দুর্গের নিদর্শন ছাড়াও কেশিয়াড়ী অঞ্চলে মন্দির ও মস্‌জিদ আরও অনেক আছে। মন্দিরগুলি সবই যে উড়িষ্যার রাজাদের আমলে তাঁদের দ্বারা বা তাঁদের স্থানীয় অমাত্যদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, তাতে সন্দেহ নেই।

দেবদেউলের দিক থেকে মেদিনীপুরের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য হল দেবালয়-স্থাপত্যের। যে কোন অসাবধানীর চোখেও এ-বৈশিষ্ট্য ধরা পড়বে। বৈশিষ্ট্যটি এই : বিষ্ণুপুর ও আরামবাগ-সংলগ্ন ঘাটাল অঞ্চলে ছাড়া মেদিনীপুর জেলার অন্যান্য সমস্ত অঞ্চলে উড়িষ্যার দেবালয়-স্থাপত্যের প্রভাব অত্যধিক। ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর সদরের উত্তর-দক্ষিণ, কাঁথি ও তমলুক মহকুমায় এই প্রভাব এত বেশি যে, বাংলার নিজস্ব দোচালা, চৌচালা বা আটচালা গড়নের মন্দির প্রায় দেখাই যায় না বলা চলে। বিষ্ণুপুরের প্রভুত্ব-সীমানার মধ্যে, গড়বেতা চন্দ্রকোণা পর্যন্ত বাংলা দেবালয়-স্থাপত্যের অস্তিত্ব দেখা যায়। তার বাইরে বিশেষ দেখা যায় না বললেই চলে। শিলাই ও রূপনারায়ণের কোল থেকে ক্রমে পশ্চিমে যত কাঁসাই ও সুবর্ণরেখার দিকে অগ্রসর হওয়া যায়, ততই দেখা যায় যে, মন্দিরের গড়ন বদলাচ্ছে এবং বাংলা মন্দির ছেড়ে আমরা উড়িষ্যার রেখ-দেউল-প্রধান অঞ্চলে প্রবেশ করছি। সুদীর্ঘ ছয় সাত শতাব্দীব্যাপী

উড়িষ্যার গঙ্গবংশীয় ও তৎপরবর্তী রাজাদের একচ্ছত্র রাষ্ট্রীয় প্রভুত্বের নিদর্শন এই দেবালয়-স্থাপত্য।

একসময় উড়িষ্যার দোর্দণ্ডপ্রতাপ রাজারা দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার অনেকটা অঞ্চল অধিকার করে তাঁদের রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব কায়েম করেছিলেন। বাংলার রাষ্ট্রীয় সীমানাকে সঙ্কুচিত করে তাঁরা প্রায় দামোদরের তীর পর্যন্ত তাকে ঠেলে এনেছিলেন। পাঠান-মোগল আমলের রাষ্ট্রবিপর্যয়ের সময় উড়িষ্যার এই স্বাধীন রাজারাই ছিলেন সবচেয়ে শক্তিশালী রাজা এবং পশ্চিমবাংলার ছোট ছোট সামন্ত রাজারা, ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই, তাঁদের মুখাপেক্ষী হতে কিছুটা বাধ্য হয়েছিলেন। এরকম রাষ্ট্রীয় আধিপত্য যাঁরা কয়েক শতাব্দী ধরে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তাঁদের সাংস্কৃতিক প্রভাবের কিছু কিছু নিদর্শন যে থাকবে তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। মেদিনীপুরের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে সেই নিদর্শনই দেখা যায়। সেকালের রাজা-মহারাজারা, নবাব-বাদশাহরা সাংস্কৃতিক সুকৃতি বলতে প্রধানত বুঝতেন, দেবালয় প্রতিষ্ঠা বা মসজিদ নির্মাণ। ধর্মই ছিল মধ্যযুগীয় সমাজের সংস্কৃতির প্রাণস্বরূপ। ধর্মকর্মের মধ্য দিয়েই তাই রাজাবাদশাহরা, তাঁদের সামন্ত ও জমিদার-জায়গীরদাররা, তাঁদের সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকর্মের ইচ্ছা প্রকাশ করতেন। এই প্রকাশের সবচেয়ে বড় নিদর্শন হল দেবালয়, মসজিদ, গির্জা ইত্যাদি। ক্ষমতাশালী ব্যক্তির পক্ষে দেবদেউল প্রতিষ্ঠার চেয়ে মহত্তর কাজ আর কিছু ছিল না, রাজাদের তো নয়ই। দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গে উড়িষ্যার রাজারা এবং তাঁদের অধীন সামন্তরা তাই দেবালয়-প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং স্বভাবতঃই সেগুলি তাঁরা বাঙালী শিল্পী দিয়ে করাননি, নিজেদের দেশের ওড়িয়া শিল্পীদের দিয়ে তৈরি করিয়েছেন। ওড়িয়া শিল্পীদের সংস্রবে বাঙালী শিল্পীরাও লাভবান হয়েছেন। উড়িষ্যার রাজাদের প্রভুত্বকালে ওড়িয়া ও বাঙালী শিল্পীদের এই ভাব-বিনিময় একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বাঙালী শিল্পীরা জগমোহন বাদ দিয়ে দেউল গড়েছিলেন এবং তার কয়েকটি ঐতিহাসিক নিদর্শনও পশ্চিমবঙ্গে আছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেউলের একটি ক্ষুদ্র প্রতিকৃতিকে তাঁরা 'রত্নে' পরিণত করে তাই দিয়ে বাংলার একরত্ন, পঞ্চরত্ন ও নবরত্ন মন্দির গড়েছেন। বাংলার আসল দেবালয়ের গড়নটিকে মনুষ্যালয়ের গড়ন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দূরে ঠেলে দেননি। সারা ভারতবর্ষের মধ্যে কেবল বাংলাদেশেই দেবতার ঘর আর সাধারণ মানুষের ঘরের গড়নের মধ্যে কোন

পার্থক্য নেই। বাংলাদেশে দেবতারা কখন রাজা-বাদশাহের মতন স্বতন্ত্র 'প্রাসাদের' দূর অভ্যন্তরে অদৃশ্য গর্ভগৃহের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হননি। বাংলার সাধারণ মানুষের একান্ত আপনার জনের মতন সাধারণ বাংলা দোচালা, চারচালা, আটচালা ঘরেই তারা বাস করেছেন।

বাঙালীর চোখ যে দেবালয় দেখতে অভ্যস্ত তা বাংলার বাইরে কোথাও নেই। মেদিনীপুরের দক্ষিণে গেলে প্রধানত দেবালয় দেখলে হঠাৎ মনে হয় যেন বাইরে চলে এসেছি। কেশিয়াড়ী বা তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বাংলা রীতির মন্দির দেখা যায় না। কেশিয়াড়ীর সবচেয়ে বিখ্যাত দেবী হলেন সর্বমঙ্গলা দেবী এবং তাঁর মন্দিরটিই এ-অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য মন্দির। সর্বমঙ্গলার মন্দিরের গড়নের মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। মন্দিরটি পুরো রেখ-মন্দির নয়, আবার বাংলা মন্দিরও নয়। এক বিচিত্র গড়ন মন্দিরের। কেশিয়াড়ীর জগন্নাথের মন্দিরটি রেখ-মন্দির, কিন্তু সর্বমঙ্গলার মন্দির তা নয়। থাকে-থাকে সাজানো টায়ারের মতন চাল, তার উপরে বেকি আমলক ও খপুরি। পাদ-জঙ্ঘাগণ্ডী-বেকি-খর্পর-সংযুক্ত ওড়িয়া দেউল নয়।

কেশিয়াড়ীর মঙ্গলামাঁড়ো পল্লীর মাঝখানে সর্বমঙ্গলা মন্দির প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরটি পূর্ব-পশ্চিমে প্রাচীর দেওয়া এবং তিনটি অংশে বিভক্ত। সামনে প্রশস্ত প্রাঙ্গণ। তার পশ্চিমে সিংহদ্বার। পুবদিকে দোলমণ্ডপ, নহবতখানা ইত্যাদি। সামনের সিঁড়ি দিয়ে বারদুয়ারী নামে বারটি খিলানযুক্ত নাটমন্দিরে প্রবেশ করতে হয়। সিঁড়ির দুই পাশে দুটি পাথরের বড় বড় সিংহের মূর্তি। বারদুয়ারী নাটমন্দিরের মাঝখানে একটি ঘণ্টা টাঙানো, প্রকাণ্ড ঘণ্টা। যাত্রীরা মন্দিরে যাতায়াতের সময় ঘণ্টা বাজিয়ে যান। বারদুয়ারী নাটমণ্ডপ থেকে পশ্চিমমুখে অগ্রসর হয়ে পূর্বদ্বারী দ্বিতীয় অংশ জগমোহনে প্রবেশ করতে হয়। এই জগমোহনে সর্বমঙ্গলা দেবীর বাহ্যপূজার অনুষ্ঠানাদি অর্থাৎ দুর্গোৎসব, কালীপূজা, নিত্যপূজা, হোম ইত্যাদি সম্পন্ন হয়। জগমোহনের উত্তর ও দক্ষিণ দিকের দেয়ালে আলো আসার জন্য ছোট ছোট গবাক্ষ আছে। জগমোহন পার হয়ে পূর্বদ্বারী সর্বমঙ্গলা মন্দিরে প্রবেশ করতে হয়। মন্দিরের অভ্যন্তর প্রশস্ত, কিন্তু মাঝখানে দেবীর চতুষ্কোণাকার উঁচু মঞ্চ অনেকটা স্থান অধিকার করে থাকার জন্য চারিদিকে দু'তিন ফুট মাত্র জায়গা আছে। নাটমন্দির, জগমোহন ও আসল মন্দির তিনটি একই ধরনের চারচালা

গৃহের মতন তৈরি, কেবল চালাগুলি থাকবিশিষ্ট টায়ারের মতন এবং শিখরে বেকি আমলক ইত্যাদি আছে। প্রাচীন একশ্রেণীর বাংলা মন্দিরের গড়ন চারচালা টায়ারের মতন ছিল। তাতে মনে হয়, এখানে উড়িষ্যার শিল্পীরা কোন প্রাচীন বাংলা মন্দিরকে উড়িষ্যার ঢঙে গড়তে গিয়ে, বাংলা ও ওড়িয়া রীতির মধ্যে যেন একটা সমন্বয় করার চেষ্টা করেছেন। শিখরে বেকি আমলক খপুরি ইত্যাদি বসিয়ে নাটমন্দিরের সঙ্গে একটি জগমোহন তৈরি করে, তাঁরা যেন উড়িষ্যার একটি ছাপ দিয়ে দিয়েছেন প্রাচীন বাংলা দেবালয়ে। সর্বমঙ্গলা মন্দিরের অনতিদূরে যে কাশীশ্বর শিবমন্দির আছে, সেটিও এই ধরনের একটি জোড়াতালির বিচিত্র নিদর্শন। অথচ কেশিয়াড়ীর মধ্যেই যে বিরাট জগন্নাথের মন্দির আছে, সেটি খাঁটি উড়িষ্যার রেখ-দেউল। এমন কি কুরুমবেড়া দুর্গের মধ্যে উড়িষ্যার রাজা যে দেবালয়ে শিব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তার ভগ্ন নিদর্শন-গুলি দেখে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, সেটি একটি পাথরে রেখ-দেউল ছিল। সুতরাং কেশিয়াড়ীতে উড়িষ্যার রাজাদের আধিপত্যকালে বেশ কয়েকটি রেখ-দেউল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বোঝা যায়। কিন্তু সর্বমঙ্গলা দেবীর এবং ভৈরব কাশীশ্বর শিবের মন্দির পরিপূর্ণ রেখ-দেউল তো নয়ই, চারচালা বাংলা টায়ারাকারের মন্দির ও উড়িষ্যার কয়েকটি বিশেষত্বের এক বিচিত্র সমন্বয়। তার কারণ কি? মনে হয়, উড়িষ্যার রাজাদের প্রতিপত্তির আগে থেকেই এখানে শিব ও সর্বমঙ্গলা দেবী প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং তাঁদের দেবালয়ও ছিল। বঙ্কিমচালাবিশিষ্ট চারচালা বা আটচালা দেবালয় হয়ত ছিল না। তার বদলে, প্রাচীন টায়ারযুক্ত চারচালা বাংলা মন্দির ছিল। উড়িষ্যার শিল্পীরা সেটিকে ওড়িয়ান্তরিত করেছেন—উপরে বেকি আমলক খপুরি দিয়ে এবং নাটমন্দির ও মন্দিরের মধ্যে জগমোহন তৈরি করে।

বারদুয়ারী নাটমন্দিরের সামনের দেয়ালে একটি ওড়িয়া শিলালিপি আছে। শিলালিপির অক্ষরগুলি তত স্পষ্ট নয়। না হলেও, যেটুকু পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে, তাতে দেখা যায় যে, ১৫৩২ শকাব্দে অর্থাৎ ১৬১০ খৃষ্টাব্দে লিপিটি উৎকীর্ণ। রাজা মানসিংহ জনৈক শাহ সুলতানকে কেশিয়াড়ীর রাজস্ব-কেন্দ্রে নিযুক্ত করেছিলেন। সুলতান সাহেবের অধীন সুন্দর দাস নামে প্রধান কর্মচারী এবং অর্জুন মহাপাত্র নামে দেওয়ানের তত্ত্বাবধানে বনমালী দাস নামে স্থানীয় কোন মিস্ত্রী এই মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। নাটমন্দির ছাড়া, জগমোহনের

প্রবেশদ্বারের পাশের দেওয়ালে পাথরে উৎকীর্ণ আর একটি ওড়িয়া শিলালিপি আছে। এই লিপি থেকে জানা যায় যে, দেবীমন্দির ও জগমোহন ১৫২৬ শকাব্দে বা ১৬০৪ খৃষ্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল। এ ছাড়া আরও একটি শিলালিপি আছে, সিংহাসনের পাশে। উৎকল অক্ষরে তাতে খোদাই করা আছে :

'শ্রীমানসিংহ মহারাজ শুভরাজ্যে নিজ কুলে কুমুদানন্দ শ্রীল শ্রীরঘুনাথ শর্মা ভূমিপ স্থত শ্রীচক্রধর শর্মা প্রকাশিলে সর্বমঙ্গলা প্রতিমা স্থিতি। শকাব্দ ১৫২৬ কামিলা রতুপাত্র।'

এই শিলালিপি থেকে জানা যায়, কেশিয়াড়ী অঞ্চলে রঘুনাথ ভূঞা নামে কোন জমিদার ছিলেন। ১৫২৬ শকাব্দে অর্থাৎ ১৬০৪ খৃষ্টাব্দে, মহারাজা মানসিংহের রাজ্যে, তাঁর পুত্র চক্রধর ভূঞা সর্বমঙ্গলার এই দেবীমন্দির ও জগমোহন প্রতিষ্ঠা করেন।

সর্বমঙ্গলা দেবীর সামনে বৃত্তাকার তাম্রফলকে আঁকা অষ্টদল পদ্মের মধ্যে ভুবনেশ্বরী যন্ত্র। পূজারীরা যথানিয়মে এর অভিষেক ও পুরশ্চরণাদি করে থাকেন। দেবীমন্দিরের সংলগ্ন দক্ষিণদিকে প্রাচীরবেষ্টিত একটি স্থান আছে। সেখানে পশুবলি হয়। বলির পশুকে মন্দিরের পিছনে নিয়ে গিয়ে, দেবীকুণ্ডে স্নান করিয়ে, পিছনের ঐ স্থানে উৎসর্গ করা হয়। সামনের কোন যূপকাষ্ঠে বলি দেওয়া হয় না। পশুবলির এই প্রথা এবং তার সঙ্গে তন্ত্রসম্মত যন্ত্রপূজার বিধান ইত্যাদি দেখে মনে হয় যেন বৌদ্ধতান্ত্রিকদের দেবস্থানকে পরে হিন্দু-তান্ত্রিকরা দখল করেছেন।

জগমোহনের মধ্যে দু'তিনটি পাথরের দেবমূর্তি আছে। মূর্তিগুলি মন্দিরের কিনা সঠিক বলা যায় না, তবে কেশিয়াড়ীর নিশ্চয়। এখন সর্বমঙ্গলা মন্দিরের জগমোহনের মধ্যেই আছে। একটি গণেশের মূর্তি, একটি দেবমূর্তি, আর একটি দেবীমূর্তি। গণেশের মূর্তিটি ছোট হলেও স্থন্দর মূর্তি। দেবমূর্তিটি দ্বিভুজ, একহাতে কমণ্ডলু, অন্যহাতে বোধ হয় ত্রিশূল। মহাকাল ভৈরবের মূর্তি বলা হয়। দেবীমূর্তিটি চতুর্ভুজা, অস্থরনাশিনী মূর্তি। কোন তন্ত্রোক্ত দেবীমূর্তি। বোঝা যায়, কেশিয়াড়ী অঞ্চলে শৈব ও তান্ত্রিক উভয়েরই খুব প্রাধান্য ছিল।

শোনা যায়, কেশিয়াড়ী ছত্রিশটি গ্রামের সমষ্টি এবং পূর্বে তিনটি করে গ্রাম নিয়ে তার বারোটি ভাগ ছিল। প্রত্যেকটি ভাগের মধ্যস্থলে শিবমন্দিরে

শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই বারোটি মন্দিরকে 'বারো মাঁড়ো' বলা হত। একসময় বিশেষ সমারোহের সঙ্গে এই বারো মাঁড়োতে গাজন উৎসব হত। প্রত্যেক দেবালয়ের স্বতন্ত্র প্রতীকসহ ধ্বজা থাকত, কারও সিংহ, কারও ব্যাঘ্র, কারও ভল্লুক, কারও কুমীর ইত্যাদি। সেই সব ধ্বজা উড়িয়ে প্রত্যেক মন্দির থেকে ভক্ত্যারা শোভাযাত্রা করে বেরুত। যেদিন মেলা বসত, অর্থাৎ গাজনের শেষদিনে মিলন হত যখন, তখন কেশিয়াড়ীর বিভিন্ন রাস্তা দিয়ে সন্ন্যাসীরা বিচিত্র সব শোভাযাত্রা, নৃত্য-বাদ্য, ক্রীড়া-কৌতুক করতে করতে মিলন-প্রাঙ্গণে এসে উপস্থিত হত।

শৈব ও তান্ত্রিক উভয় ধর্মেরই যে প্রাধান্য ছিল কেশিয়াড়ী অঞ্চলে তাতে কোন সন্দেহ নেই। ধর্মাচরণের এই সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য যে উড়িষ্যার রাজাদের দান, তা বলা যায় না। কারণ উড়িষ্যার গঙ্গবংশীয় রাজাদের বাংলাদেশ পর্যন্ত সাম্রাজ্যবিস্তারের অনেক আগে, বাংলার স্বাধীন রাজারা উৎকল, গঞ্জাম পর্যন্ত দক্ষিণে রাজ্যবিস্তার করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে শশাঙ্ক অন্যতম। শশাঙ্ক শৈব রাজা ছিলেন এবং দণ্ডভুক্তি (বর্তমান দাঁতন) ছাড়িয়ে আরও দক্ষিণে উড়িষ্যার গঞ্জাম পর্যন্ত তিনি রাজ্যসহ সংস্কৃতিরও বিস্তার করেছিলেন। সুতরাং উড়িষ্যার রাজাদের প্রভাব বিস্তারের অনেক আগেই কেশিয়াড়ীতে বাংলার শৈব ও শাক্ত ধর্মের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে মনে হয়।

কাঁথি-খেজুরী

মেদিনীপুরের সুদূর দক্ষিণে আমাদের যাত্রা শুরু হল। বেল্‌দা স্টেশন থেকে প্রায় ছত্রিশ মাইল বাঁধানো পথ কাঁথি পর্যন্ত। মোটরবাস চলে। আশপাশে অনেক গ্রাম ফেলে যেতে হয়, তার মধ্যে বর্ধিষ্ণু গ্রামেরও অভাব নেই। গ্রামগুলির গৃহবিন্যাসের খানিকটা স্বাতন্ত্র্য আছে। পশ্চিমবঙ্গে সাধারণত যে ধরনের গৃহবিন্যাস দেখতে আমরা অভ্যস্ত, ঠিক সেরকমের নয়। পথের দু'ধারে মধ্যে মধ্যে হাট, বাজার, গ্রাম, এক একটা গঞ্জের মতন। যাবার পথে বাঁদিকে পটাশপুর ফেলে যেতে হয়, অমর্শি-কসবা ও পটাশপুর দুইই। অগ্রপত্তন বা এগরার উপর দিয়েই বাস যায়। বেল্‌দা থেকে কাঁথির ঠিক মধ্যপথে এগরা। কাঁথির ভৌগোলিক অবস্থানের চেতনার জন্যই বোধ হয়, যাত্রাপথে কেবলই মনে হচ্ছিল, ক্রমে যেন তলিয়ে যাচ্ছি। বাইরের নিসর্গও যেন বদলে যাচ্ছে। সমুদ্রসৈকতের দিকে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। যেতে যেতে আচম্‌কা মনে হয়, একদা (এবং সে সুদূর অতীতের 'একদা') সমুদ্রের ফেনিল তরঙ্গের গর্জন শোনা যেত এখানে। পশ্চাদপসরণকালে সমুদ্র ফেলে গেছে তার পায়ের চিহ্ন অফুরন্ত বালুস্তূপে আর বালিয়াড়িতে।

'কস্‌বা' নামের আধিক্য খুব বেশি এদিকে। গ্রামের নাম কস্‌বা দিয়ে অনেক আছে। 'কসবা' মুসলমানী কথা, গণ্ডগ্রাম বা ছোট টাউনকে বলে। মুসলমান রাজত্বকালের এরকম আরও অনেক স্মৃতি এ-অঞ্চলে দেখা যায়। বাংলার শিশুরা যে বর্গীদের নাম শুনে ভয়ে ঘুমিয়ে পড়ে সেই মারাঠা বর্গীরা দীর্ঘকাল পটাশপুর অঞ্চলের শাসনকর্তা ছিলেন। ১৭৬০ সালে মেদিনীপুর জেলা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে আসে। তারপর থেকে ১৮০৩ সাল পর্যন্ত মারাঠারা পটাশপুর অঞ্চল থেকে তাদের লুণ্ঠনক্রিয়া চালাতে থাকে এবং তাতে কোম্পানীর সাহেবদের নবাবপ্রদত্ত জমিদারী ইচ্ছামতন লুণ্ঠন করবার অসুবিধা হয়। প্রায় অর্ধশতাব্দীব্যাপী মারাঠাদের উপদ্রব সহ্য করতে হয় কোম্পানীর সাহেবদের। ১৮০৩ সালে উড়িষ্যাসহ পটাশপুর অঞ্চল ইংরেজদের দখলে আসে। পটাশপুরের অধিকাংশ অঞ্চল তখন রেণুকা দেবীচৌধুরানী নামে এক রানীর অধীনে ছিল।

পটাশপুরের কাছে কসবা-ই-অমর্শি (অমর্শি-পটাশপুর বলে) নামে একটি গ্রাম আছে। একসময়, মুসলমান শাসনকালে এ-অঞ্চল বেশ সমৃদ্ধিশালী ছিল বলে মনে হয়। অমর্শিতে চিশ্‌তী সম্প্রদায়ভুক্ত মখদুম সাহেবের আস্তানা আছে। মখদুম সাহেব সম্বন্ধে একটি প্রচলিত কিংবদন্তী শোনা যায়। অমর সিংহ নামে স্থানীয় এক রাজা ছিলেন (জমিদার)। তিনি খুব মুসলমানবিদ্বেষী ছিলেন। শোনা যায়, সকালে উঠে তিনি কোন মুসলমানের মুখ দর্শন করতেন না। দাম্ভিক ও উদ্ধতও ছিলেন খুব। সাধারণ প্রজাদের তিনি মানুষ বলেই মনে করতেন না। রাজবাড়ির সিংহদ্বারের সামনে তিনি তাঁর জুতো ঝুলিয়ে রাখতেন। উদ্দেশ্য হল, দর্শনপ্রার্থী প্রজারা প্রথমে জুতো দর্শন করবে এবং জুতো প্রণাম করে ভিতরে যাবে। মখদুম সাহেব দেশ ভ্রমণ করতে করতে বাংলাদেশের এই অঞ্চলে আসেন সপ্তদশ শতাব্দীর শেষদিকে। এসে তিনি একদিন রাজার সঙ্গে দেখা করতে যান। যথারীতি তাঁকেও জুতো প্রণাম করতে বলা হয়, তিনি রাজী হন না। দ্বাররক্ষীরা ভয় দেখালে, তিনি তাঁদের হত্যা করেন। পরে রাজা সৈন্যদের হুকুম দেন, মখদুম সাহেবের শির আনতে। সৈন্যরা তাদের রাজাসহ নিহত হয়। চারিদিকে মখদুম সাহেবের এই অলৌকিক বীরত্বের কথা রটে যায়। প্রজারা ধন্য ধন্য করে। অত্যাচারী রাজার কবল থেকে তারা মুক্তি পায়। মখদুম সাহেবের শিষ্য হয় অনেকে। এ অঞ্চলে মুসলমানধর্মে দীক্ষিতের সংখ্যাও বাড়ে। চাক্‌লা হিজলীর শাসক মসনদ আলি শাহ তাঁর সুখ্যাতির কথা শুনে, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন। হজরৎ মসনদ্ আলি পরে মখদুম সাহেবের সমাধি, মসজিদ্, হুজ্‌রা ইত্যাদি নির্মাণ করে দেন। আস্তানার অবস্থা এখন সঙ্গীণ। মসজিদের গায়ে ফার্সী ভাষায় একটি লিপি আছে। তার অর্থ হল—এখানে ঈশ্বরের কাছে ভক্তিভরে প্রার্থনা করো; মখদুম শিহাবুদ্দিন আউলিয়ার জন্য এই মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছিল, তিনি ইসলামের বিশ্বাসী সেবক ছিলেন। ১০৭২ হিজ্‌রা বা ১৬৬০-৬১ সালে মসজিদ তৈরি হয়।[১] চাক্‌লা হিজলীর মসনদ-ই-আলি তাজ খাঁর শাসনকালের সঙ্গে (ষোড়শ শতাব্দী) মখদুম সাহেবের বাংলায় আগমনের কালের মিল হয়

১ Notes on Archaeological Remains in Bengal: By Maulavi Abdul Wali: Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. 20, 1924.

না। সুতরাং উভয়ের দেখাসাক্ষাৎ ঐতিহাসিক ঘটনা নয়, কিংবদন্তী। মনে হয়, মোগলযুগে আরও অনেক মুসলমান ফকির ও গাজী সাহেবের মতন মখদুম সাহেব এই অঞ্চলে ধর্মপ্রচারের জন্য এসেছিলেন। ধর্মপ্রচারের কাজে স্থানীয় হিন্দু রাজা বা জমিদারদের বাধাবিপত্তি তাঁকেও সহ্য করতে হয়েছিল। এই ঘটনা নিয়েই পরে কিংবদন্তী রচিত হয়েছে।

এগরার উপর দিয়েই কাঁথি যেতে হয়। এগরার হাটনগর শিবমন্দিরের গড়ন এ-অঞ্চলের অন্যান্য দেবালয়ের মতন, অর্থাৎ দেউলের মতন। জনশ্রুতি হল, উড়িষ্যার রাজা মুকুন্দদেবের আমলে মন্দিরটি তৈরি হয়। শিবের উৎপত্তি সম্বন্ধে সবচেয়ে জনপ্রিয় যে কিংবদন্তীটি পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সর্বত্র প্রচলিত আছে, এখানেও তার প্রচলন রয়েছে। সেই রাখালের গরু চরানো, জঙ্গলে গরুর অন্তর্ধান, তার দুগ্ধক্ষরণের কাহিনী।

বালেশ্বর পিপ্‌লি ও হিজলী বঙ্গোপসাগরের পশ্চিম উপকূলের তিনটি বিখ্যাত বন্দর। এই বন্দরগুলির বাণিজ্যপথের মধ্যেই কাঁথি। ভিতরে হলেও, কাঁথির প্রাধান্য বাড়ে এই জন্য। অষ্টাদশ শতাব্দীতে কাঁথিতে একটি নিমক এজেন্সী প্রতিষ্ঠিত হয়। এখন যেখানে মহকুমা কাছারী আছে সেখানেই নিমক এজেন্সীর আপিস ছিল। ইংরেজ বণিকদের প্রাচীন কাগজপত্রে কাঁথিব নাম 'কেণ্ডোয়া' (Kendoa) বলে উল্লেখ আছে। ভ্যালেন্টিনের স্মৃতিকথায় দেখা যায়, কেণ্ডুয়া (Kendua) বা কাঁথিতে ডাচ বণিকদের চাল ও অন্যান্য দ্রব্যাদির ব্যবসায়ের জন্য একটি স্টেশন ছিল। বিদেশীদের এই রপ্তানি-বাণিজ্যের ক্রমে যখন অবনতি হয়, তখন নিমকের ব্যাবসা বাড়তে থাকে এবং কাঁথি হয় হিজ্‌লী ডিভিসনের নিমক এজেন্সীর কেন্দ্রীয় আপিস।

বঙ্গোপসাগর থেকে বারো মাইল দূরে কাঁথির অবস্থান থেকেই বোঝা যায়, খুব প্রাচীন কোন ঐতিহাসিক নিদর্শন কাঁথিতে পাওয়া সম্ভব নয়। অধিকাংশ নিদর্শনই তার লুপ্ত হয়ে যাবার কথা, বন্যায়, ঝড়ঝঞ্ঝায় ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে। কাঁথি মহকুমা আপিসের সামনে একটি যে বড় প্রস্তরমূর্তি আছে, সেটি বাহিরী গ্রাম থেকে এনে রাখা হয়েছে। মূর্তিটি প্রায় পাঁচ ফুট উঁচু, হাত দু'টি ভাঙা। কাঁথি টাউন থেকে বাহিরী গ্রাম প্রায় ছয় সাত মাইল দূরে। মাইল তিনেক বাসে গিয়ে, বাকি তিন চার মাইল হেঁটে যেতে হয়। আমরা তাই গিয়েছিলাম। গ্রামটি দেখে মনে হয়, এ-অঞ্চলের মধ্যে বাহিরী বেশ প্রাচীন গ্রাম। শোনা

যায়, এখানে পুকুর ইত্যাদি খোঁড়ার সময় মাটির নিচে থেকে কূপের গাঁথুনি পাওয়া যায়। এছাড়া, পুরানো ইটের গাঁথুনি মাটির উপরে ও তলায় মধ্যে মধ্যে দেখা যায়। বোঝা যায়, গ্রামে লোকবসতির ইতিহাস বেশ প্রাচীন। গ্রামের মধ্যে বেশ পুরাতন দেবালয়ও আছে। অনেকটা উঁচু জায়গার উপর পরিত্যক্ত অবস্থায় দু'টি দেউল আছে দেখেছি। দেউলের গায়ে লিপি আছে। তার মধ্যে অন্তত একটি লিপি আমরা দেখেছি, ওড়িয়া ভাষায় লেখা। স্বর্গত যোগেশচন্দ্র বসু তাঁর 'মেদিনীপুরের ইতিহাস' গ্রন্থে বাহিরীর মন্দিরের তিনখানি লিপির কথা বলেছেন। তার মধ্যে একখানি লিপি থেকে জানা যায় যে, কাশীদাসের কুলে পদ্মনাভ দাসের পুত্র বিভীষণ দাস নামে এক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনিই বাহিরীর এই মন্দির নির্মাণ করে তাতে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন :

কাশীদাসকুলে বিভীষণ ইতি শ্রীপদ্মনাভাত্মজঃ।
শ্রীমান ধর-ভূদচিকরদশৌ প্রাসাদমুচ্চৈরিয়ম্॥
গোপাল প্রতিমাংচ সদ্ভিঃ প্রতিষ্ঠাং দ্বিজৌ।
রামং চেহ সুভদ্রয়াসহ জগন্নাথং ব্যবসীদপি॥

'রসিকমঙ্গল' গ্রন্থে বলভদ্র দাসের খুল্লতাত বিভীষণ মহাপাত্র নামে এক ব্যক্তির নাম পাওয়া যায়। বলভদ্র দাস ছিলেন হিজ্‌লী মণ্ডলের অধিকারী। রসিকমঙ্গলে তাঁর পরিচয় দেওয়া হয়েছে এইভাবে—

হেনকালে হিজ্‌লী মণ্ডল অধিকারী।
সদাশিব ভ্রাতা বলভদ্র নামধারী॥
বিভীষণ মহাপাত্র খুল্লতাত তার।
রাজপরিচ্ছদে তথা থাকে সর্বকাল॥
রাজ্য অধিকারী আর বহু ধনবান।
হিজ্‌লী মণ্ডলে নাহি হেন ভাগ্যবান॥

বাহিরীর মন্দির-নির্মাতা লিপি-উক্ত বিভীষণ দাস, রসিকমঙ্গল গ্রন্থের এই বিভীষণ মহাপাত্র বলে যোগেশবাবু অনুমান করেছেন। যোগেশবাবুর অনুমান সত্য বলে মনে হয়। উল্লেখযোগ্য হল, বাহিরীর এই প্রাচীন দেউল দু'টি যেস্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেই স্থানটি শ্মশানক্ষেত্র। মন্দির এখন পরিত্যক্ত, কোন পূজার্চনা হয় না। কোন মূর্তিও নেই মন্দিরের

মধ্যে। গ্রাম্য দেবদেবীর মধ্যে লঙ্কেশ্বরী নামে এক দেবী আছেন। লঙ্কেশ্বরী নাম কেন?

বাহিরী গ্রাম পরিদর্শন করে প্রায় আট মাইল পথ উজান হেঁটে আমরা মুকুন্দপুরে পৌছলাম। মুকুন্দপুর থেকে আমরা রসুলপুরের বাসে সন্ধ্যার সময় রসুলপুর নদীর তীরে এসে উপস্থিত হলাম।

রসুলপুর নদীর একপাশে কস্‌বা-হিজ্‌লী গ্রাম, অন্যপাশে কাঁথি থানার অন্তর্গত দৌলতপুর ও দরিয়াপুর। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যিক জীবনের রোমান্টিক স্মৃতিমণ্ডিত প্রত্যেকটি স্থান। রসুলপুর নদীর সামনে দাঁড়িয়ে চারিদিকে চেয়ে সেই কথা মনে পড়েছিল:

দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী
তমালতালীবনরাজিনীলা
আভাতিবেলালবণাম্বুরাশে-
র্দ্ধারানিবদ্ধেব কলঙ্করেখা।

কিন্তু পায়ের অবস্থা আর মনের অবস্থা তখন এক নয়। মনের সঙ্গে তাল রেখে পা আর চলতে পারছে না। শেষ পর্যন্ত তাই রসুলপুর নদী পার হতে হল নৌকায়। কাণ্ডারী নদী পার করে দিল বটে, কিন্তু মাঠ পার করে দেবে এমন কাণ্ডারী কোথায়? আবার সেই মাঠ! এত মাঠ যে বাংলাদেশে আছে তা কে জানত? গ্রাম্য সঙ্গীদের মুখে শুনলাম, আমাদের গন্তব্য গ্রাম মাইল দুই পথ। প্রায় দেড়ঘণ্টা হেঁটে সেই গ্রাম্য হিসাবের "মাত্র দু' মাইল পথ" শেষ হল। শীলাবেড়িয়া গ্রামে পৌছলাম।

পরদিন সকালে উঠে খেজুরী অভিমুখে যাত্রা করলাম, জন্‌কা গ্রামের ভিতর দিয়ে। গ্রামে এক বিচিত্র দেবী দেখলাম, নীলকুমারী। নীলকুমারী, ধিতকুমারী, ষাটকুমারী, তিন সহোদরা দেবীর সিঁদুরলিপ্ত পাষাণমূর্তি। দুধ, পায়স, ক্ষীর ভোগ দেওয়া হয়, কটাক্ষ দুর্গার ধ্যানে পূজা হয়।

হিজ্‌লী

কলকাতা শহরের দক্ষিণে হুগলী নদীর প্রবাহকে মোটামুটি চারটি স্তরে ভাগ করা যায়। ফোর্ট উইলিয়াম থেকে উলুবেড়িয়া পর্যন্ত প্রায় কুড়ি মাইল নদীর প্রবাহ দক্ষিণ-পশ্চিমাভিমুখী। উলুবেড়িয়া থেকে তার পরবর্তী কুড়ি মাইল নদী দক্ষিণমুখী। এইখানেই 'হুগলী পয়েণ্ট'। হুগলী পয়েণ্ট থেকে অর্ধবৃত্তাকারে প্রায় পঁচিশ মাইলব্যাপী নদীপ্রবাহের মধ্যে ডায়মণ্ডহারবার। তারপর সাগরসঙ্গমে ভাগীরথীর যাত্রা শুরু হয়েছে বলা চলে। যাত্রাপথে বামপাশে পড়ে সাগরদ্বীপ। ফোর্ট উইলিয়ম ও উলুবেড়িয়া থেকে দক্ষিণে যাত্রাপথে ডানদিক থেকে একাধিক নদীর ধারা এসে মিলিত হয়েছে ভাগীরথীর বুকে। তার মধ্যে দামোদর, রূপনারায়ণ, হলদী ও রসুলপুর নদীপ্রধান। সর্বপ্রধান হল রূপনারায়ণ এবং ভাগীরথী ও রূপনারায়ণের সঙ্গমস্থলকেই বলে 'হুগলী পয়েণ্ট'। এখানেই নদীর বাঁক সবচেয়ে ভয়াবহ। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে সমস্ত বিদেশী নাবিকরা এই কুখ্যাত বাঁকটিকে শঙ্কিতচিত্তে স্মরণ করে আসছেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে শোনা যেত, হুগলী নদী এইখান থেকেই শুরু হয়েছে এবং এখানকার ঘূর্ণিস্রোত ও অন্তঃপ্রবাহ ছিল অত্যন্ত বিপজ্জনক। আরও দক্ষিণে রসুলপুর নদী এসে মিশেছে হুগলী নদীর সঙ্গে, সাগরদ্বীপের ঠিক উল্টোদিকে। সাগরদ্বীপের এই মুখোমুখি স্থানটি কস্‌বা-হিজলী। এর প্রায় সাত-আট মাইল উজানপথে হল খেজুরী বন্দর ও নগর।

বালির পথ আর বালির বাঁধ ঠেলে অবশেষে আমরা খেজুরী বন্দরে পৌঁছলাম। বন্দরই বলা উচিত, কারণ খেজুরীর ঐতিহাসিক পরিচয় বন্দর ও বন্দর-নগর। এখন তার কোন পরিচয়ই নেই, স্মৃতিটুকু ছাড়া। দৃশ্যটি অপূর্ব। সমুদ্রতীর দেখেছি, তার সৌন্দর্য স্বতন্ত্র। খেজুরী থেকে সমুদ্রের সুমহান অস্তিত্বকে অনুভব করা যায়, সামনে দেখা যায় না। কোথাও কোন তরঙ্গগর্জন নেই, জলরাশির আদি অকৃত্রিম হুঙ্কার নেই, অথচ জল ছাড়া কিছু নেই চারিদিকে। দু' একখানা নৌকা দেখা যায় শুধু। মানুষের প্রাচীনতম জলযান যেন আপন খেয়ালে নির্লিপ্তের মতন ভেসে চলেছে।

খেজুরীতে দাঁড়িয়ে অতীতের কথা ভাবলে মনে হয় হঠাৎ যেন সমুদ্রগর্ভে

অবস্থান করছি। তাই করবার কথা অবশ্য। চার পাঁচ শ' বছর আগে হলেই তাই করতে হত। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে খেজুরী সমুদ্রগর্ভেই ছিল বলে মনে হয়। তার আগে তো ছিলই। তাম্রলিপ্ত বা তমলুকের কাছে ছিল যখন সমুদ্র, তখন খেজুরী ছিল সমুদ্রের অতল গর্ভে নিশ্চয়। তার অনেক পরে দ্বীপের মতন সমুদ্রগর্ভ থেকে খেজুরীর অভ্যুত্থান হয়েছে। মনে হয়, ষোড়শ শতাব্দীর আগে ভৌগোলিক দেহের গড়ন আরম্ভ হয়নি। খেজুরীর জলরাশির কিনারায় দাঁড়িয়ে, বহুদূরের অস্পষ্ট সমুদ্ররেখার দিকে তাকিয়ে মনে হয়, কত দূরে, কতদিন ধরে, সমুদ্র পিছিয়ে গেছে। কেবল খেজুরীর নয়, বাংলাদেশের ব-দ্বীপের গড়নটির অতীত ইতিহাসও মনে পড়ে এখানে দাঁড়িয়ে। নদীমাতৃকা বাংলাদেশের কিভাবে অভ্যুত্থান হয়েছে ধীরে-ধীরে সমুদ্রগর্ভ থেকে, খেজুরীতে দাঁড়ালে তা অনেকটা অনুমান করা যায়।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রাচীন মানচিত্রে দেখা যায় (যেমন ডি, ব্যারোজের) খেজুরী ও হিজলীর অবস্থানপ্রদেশে একটি দ্বীপের অভ্যুত্থান হচ্ছে। বোঝা যায়, সমুদ্রগর্ভের চড়া থেকে খেজুরী-হিজলীর গাত্রোত্থানকাল প্রায় এই সময়। সপ্তদশ শতাব্দীর মানচিত্রে দেখা যায় (যেমন ভ্যালেন্টিনের, বাউরীর প্রভৃতির), দু'টি স্বতন্ত্র দ্বীপাকারে নির্দিষ্ট হয়েছে। খেজুরী ও হিজলীর মাঝখানে ছিল কাউখালি নদী। কাউখালি বাতিঘরটি ছিল মধ্যপথে। এখন কাউখালি নদী বোধ হয় খালরূপে বিরাজ করছে। নাম কুঞ্জপুর খাল। একসময় সমস্ত অঞ্চলটি প্রায় জলে ডুবে থাকত। থাকাই স্বাভাবিক। আগাগোড়া টানা উঁচু বাঁধ দিয়ে, লবণাক্ত জলের গতিরোধ করে, এখন জমি বাসযোগ্য ও আবাদ-যোগ্য করা হয়েছে। লক্ষণীয় হল, খেজুরীর উপকূল অঞ্চল পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়-প্রধান এবং উত্তর অঞ্চল মাহিষ্যপ্রধান। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণাও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়-প্রধান, মধ্যবর্তী দ্বীপগুলিও তাই। খেজুরীর সঙ্গে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ও সাগরদ্বীপের ঐতিহাসিক সম্পর্ক আছে, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কও আছে। বেশ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক।

একসময় কুঞ্জপুর খাল খুব গভীর ছিল, হিজলী ও খেজুরীর মধ্যবর্তী সীমানা ছিল এই খাল। এই স্থানের গুরুত্বও ছিল খুব। নবাবী আমলে অন্যতম প্রধান নিমকমহল ছিল এই অঞ্চল। নিচু জলা-জায়গায়, জলের অভাব ছিল না এবং জল লোণা জল। লবণ তৈরির সুবিধা ছিল সবদিক থেকে।

বুনো শূয়োর, মহিষ, হরিণ, বাঘ প্রভৃতি জীবজন্তুরও অভাব ছিল না। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রাই এখানকার, বিশেষ করে উপকূল অঞ্চলের, আদিবাসিন্দা ছিলেন বলে মনে হয়। কলকাতা শহরের প্রতিষ্ঠাতা জব চার্নক সাহেব হুগলী থেকে বিতাড়িত হয়ে, সুতানুটিতে এসেছিলেন এবং সুতানুটি থেকে খেজুরী ও হিজলীতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সেখানে তাঁকে যুদ্ধও করতে হয়েছিল। তখন খেজুরী ও হিজলীর অবস্থা ছিল অন্যরকম। জলাজঙ্গল ও বন্যজন্তুতে ভরা ছিল এসব অঞ্চল। খেজুরী ও হিজলী, উভয় স্থান সম্বন্ধে উইলসন সাহেব লিখেছেন :

Both places were considered 'exceeding pleasant and fruitful, having great store of wild hogs, deer, wild buffaloes, and tigers'. It was an amusing and interesting trip in those days to take a boat at the town of Khejiri and row all round the two islands into the Rusulpur river, and so back to the Hugli, noting the busy scenes which meet you on your way. (Wilson : Early Annals .... Vol. 1, P. 105 : Hedges' Diary : Vol. 1, 68, 172, 175).

সুতানুটি, গোবিন্দপুর, কলিকাতা গ্রামের পরবর্তী ইতিহাসের রোমান্টিক আলোয় খেজুরী ও হিজলীর ইতিহাস অনেকটা ম্লান হয়ে গেছে। কিন্তু এক-সময়, আজ থেকে আড়াইশ তিনশ বছর আগে, 'জন কোম্পানীর' প্রথম ভাগ্য নিয়ে জুয়াখেলার সময়, এই স্থান দু'টির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ভূমিকা ছিল। খেজুরী ও হিজলী কোন স্থান দেখেই আজ তা বুঝবার উপায় নেই। ঐতিহাসিক নিদর্শনের প্রায়লুপ্ত সামান্য কয়েকটি ধ্বংসচিহ্ন আছে মাত্র, যা দেখে অতীতের ইতিহাস কল্পনা করা ছাড়া উপায় নেই। সমুদ্রপথে বালেশ্বর থেকে খেজুরী পর্যন্ত ইংরেজ নাবিকদের যাতায়াত করতে হত তখন। 'ফ্যাক্টরী রেকর্ডে', হেজেস্‌ ও স্ট্রেনশ্যাম মাস্টারদের দিনপঞ্জীতে, খেজুররী এই পথের অনেক চমকপ্রদ সব বিবরণ পাওয়া যায়। কত বিদেশী নাবিক, কতরকমে বিপন্ন হয়ে, বালেশ্বরের পথে খেজুরীতে আশ্রয় নিয়েছেন তখন। হুগলী থেকে বালেশ্বর যাবার পথে। একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি :

Mr. Byam arrived there (Balasore) the 13th Currt. by way of Kendoa the winds being so strong and contrary that the sloop was forced in from the braces to Kedgaree and thence Mr. Byam went to Kendoa and from thence to Ballasore. (26th April, 1679, Factory Records, Hugli, No. 2).

বাংলাদেশ থেকে সমুদ্রপথে যাত্রার মুখেই ছিল খেজুরী, বিশেষ করে হুগলী ও কলকাতা থেকে। কলকাতা শহরের গোড়াপত্তনের সঙ্গে সঙ্গে, জব চার্নকের আমল থেকেই তাই খেজুরী একটি প্রধান বন্দর ও স্টেশন হয়ে ওঠে। একটি 'এজেন্টস হাউস' ও 'পোর্ট অফিস' খেজুরীতে প্রতিষ্ঠিত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যেই খেজুরী একটি টাউনের মতন গড়ে ওঠে। সাহেবদের বস-বাসের জন্য ঘরবাড়িও তৈরি হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে খেজুরীর বাইরের রূপ কতটা বদলে যায়, তার খানিকটা আভাস পাওয়া যায়, 'ক্যালকাটা গেজেট' পত্রিকার নিলামের এই বিজ্ঞপ্তিটি থেকে :

For sale by Auction on the 29th May 1792, a large upper-roomed house and premises situate at Kedgeree containing a hall, four bed-rooms and an open verandah standing on eight bighas of ground more or less.

আট বিঘা জমির উপর এই রকম বারান্দা, হলঘর, উপরের ঘরসহ প্রকাণ্ড বাড়ি তখন খেজুরীতে একাধিক তৈরি হয়েছিল। এখনও দু' একটি পুরানো বাড়ি খেজুরীতে আছে, কিন্তু ১৭৯২ সালে যে বাড়ি নিলাম হয়েছিল, সেরকম একটিও বাড়ির কোন চিহ্ন নেই। বিদেশী বণিক ও নাবিকদের প্রধান বিশ্রাম ও আড্ডার স্থান ছিল খেজুরী। ঘরবাড়ি, বন্দর, আপিস, এজেন্টের হাউস, ডাক-আপিস ইত্যাদি তো ছিলই, তার সঙ্গে সেকালের ট্যাভার্ণ ও হোটেল ছিল। বিদেশীদের এমন কোন বাণিজ্যকেন্দ্র, বসবাসকেন্দ্র ও বন্দর ছিল না, যেখানে ট্যাভার্ণ, কফি-হাউস বা হোটেল ছিল না। কলকাতা শহরে ছিল, শ্রীরামপুরে ছিল, হুগলীতে ছিল, খেজুরীতে ছিল। বিখ্যাত সব ট্যাভার্ণ। কলকাতার কসাইতলা ও এসপ্লানেড অঞ্চল ট্যাভার্ণ ও কফি-হাউসের নাচগান-পানে যেমন সরগরম হয়ে থাকত, খেজুরীর বন্দরনগরও তাই থাকত। সেই

সব ট্যাভার্ণ তো নেই-ই, খেজুরীতে এখন পথের ধারে একটি চায়ের স্টল পর্যন্ত নেই। চায়ের তৃষ্ণার সময় আমাদের তাই বিশেষভাবে খেজুরীর সেই সব ট্যাভার্ণের কথা মনে পড়ছিল।

মগ-ফিরিঙ্গী (আরাকানী ও পর্তুগীজ) জলদস্যুবিধ্বস্ত, বন্যজন্তু-উপক্রুত খেজুরী অঞ্চল মানুষের বাসোপযোগী হয়ে ওঠে কোম্পানীর আমল থেকে। কলকাতায় যখন বন্দর হয়নি, খেজুরীতে তখন বন্দর হয়েছে। বড় বড় মাল-বোঝাই জাহাজ যখন কলকাতার গঙ্গার ঘাটে আসত না, তখন খেজুরীর উপকূলে তারা নোঙর বেঁধে অবস্থান করত। মালপত্র বোঝাই করা ও খালাস করা হত খেজুরীতে। তারপর খেজুরী থেকে স্লুপে করে মালপত্র যাতায়াত করত কলকাতায়। শহর কলকাতার বাল্যজীবনে তাই বন্দর খেজুরীর গুরুত্ব ছিল খুব বেশি। সেখানে টাউন গড়ে ওঠা স্বাভাবিক। কেবল বন্দর বা পোতাশ্রয় বলে নয়, বীরকুল, খেজুরী, হিজলী, কাঁথি—এসব অঞ্চল ছিল তখন স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের প্রধান স্থান। দার্জিলিং, পুরী, গোপালপুর তখনও সাহেবদের স্বাস্থ্যনিবাসকেন্দ্রে পরিণত হয়নি। বীরকুল, খেজুরী, হিজলী অঞ্চলেই তাঁরা স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য যেতেন তখন। অনেকে গিয়ে আর ফিরতেন না, খেজুরীতেই দেহ রাখতেন। এরকম কত বিদেশী বণিক, নাবিক, কর্মচারী ও স্বাস্থ্যান্বেষী যে খেজুরীতে সমাধিস্থ হয়ে রয়েছেন তার ঠিক নেই।

কলকাতা শহর এখন সাবালক হয়েছে। কোম্পানীর আমলের খেজুরী বন্দর ও টাউন আজ তাই তার প্রাধান্য হারিয়ে ফেলে, প্রায় পুনর্মূষিকরূপ ধারণ করেছে। কিন্তু একবার যেখানে লোকালয় গড়ে ওঠে, নিদারুণ অপ্রত্যাশিত ঐতিহাসিক বা প্রাকৃতিক বিপর্যয় না হলে, তা কখন নিশ্চিহ্ন হযে যায় না। খেজুরীও তাই লুপ্ত হয়ে যায়নি। খেজুরীকে যাঁরা প্রধানত মনুষ্যবাসোপযোগী করে তুলেছেন, সেই পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও মাহিষ্যদের বংশধররা আজও অক্লান্ত পরিশ্রম করে খেজুরীর উন্নতিসাধন করছেন। অদূর ভবিষ্যতে খেজুরী তার সাময়িক হৃতশ্রী আবার ফিরে পাবে। বন্দর ও স্বাস্থ্যনিবাস দুই-ই হবার যোগ্যতা আজও আছে খেজুরীর। কোম্পানীর আমলের অবসান হলেও, ভবিষ্যতে মানুষের আমলে আবার একদিন খেজুরী তাই হবে।

কোম্পানীর আমলের খেজুরীর আজ আর কোন চিহ্ন নেই। দু' একটি ভাঙা বাড়িঘরের চিহ্ন আছে শুধু, আর আছে গোরস্থানটি। খেজুরীর এই

সাহেবদের গোরস্থানটিতে ঘুরলে অনেক অতীতের কথা মনে হয়, বিশেষ করে সমাধিস্তম্ভের খোদিত লিপিগুলি পাঠ করলে। কোন পোতে অবস্থানকালে বা যাত্রাকালে, কে কত বছর বয়সে মারা গেছে, কে স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের আশায় এসে ইহলোক ত্যাগ করেছে, এই রকম অনেক কথা জানা যায়। তার মধ্যে প্রেমিকার উদ্দেশে প্রেমিকের খেদোক্তিও আছে এবং কাব্যের ছন্দোবদ্ধ ভাষায়। তার মধ্যে একটি এখানে উদ্ধৃত করছি। দিনাজপুরের তদানীন্তন জজ ও ম্যাজিস্ট্রেটের স্ত্রী এমেলিয়া, অসুস্থ হয়ে স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য এখানে এসে ২৮ বছর ২ মাস বয়সে, ১৮২২ সালের ২৬শে জুলাই মারা যান। দুঃখ করে তাঁর স্বামী লিখেছেন স্মৃতিস্তম্ভের গায়ে :

The sanguine hope of a husband who adored her
That the dread calamity
Would be averted by the effect of the sea-air
Proved vain immediately on the return of the ship
Owing to the loss of her rudder after an escape from
danger
When sorrow weeps over Virtue's Sacred Dust
Our tears become us and our grief is just.
Such are the tears he shed who grateful pays
This last sad Tribute of his Love and Praise.

খেজুরীর অতীত জীবনের হৈ-হল্লা, হাসিকান্নার দিনগুলি, কোম্পানীর আমলের বিচিত্র সব স্মৃতিকথা, এই গোরস্থানটিতে কিছু-কিছু খোদাই করা আছে। আর আছে ঝাউবনের শন্‌শন্‌ শব্দ, মনে হয় যেন গোরস্থানেব সাহেবরা অতীতের মগের মুল্লুকের লুণ্ঠনের সেই সোনার দিনগুলির কথা ভেবে, সমাধির ভিতর থেকে গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলছেন।

একসময় ভাগীরথী দিয়ে বঙ্গোপসাগরের পথে সমুদ্রযাত্রাকালে এবং যাত্রাশেষে ভাগীরথীর মোহানায় প্রবেশকালে, দূর থেকে নাবিক, বণিক ও অন্যান্য যাত্রীরা, হিজলীর তাজ খাঁ মস্‌নদ-ই আলার মসজিদটি দেখতে পেতেন।

পর্তুগীজ, ইংরেজ, ডাচ, ফরাসী সকল জাতের বিদেশী বণিকরা দূর থেকে বাতিঘরের মতন (যখন বাতিঘর হয়নি) তাজ খাঁর মসজিদ দেখে কূলের কিনারা পেতেন। মগ-পর্তুগীজ বোম্বেটেদের চোখেও এই মসজিদ দূর থেকে ভেসে উঠত প্রথম। আজও নদী ও সাগরপথের এদেশী মাঝিমাল্লারা যাতায়াতের পথে দূর থেকে হিজলীর এই আস্তানার দিকে চেয়ে মছলন্দী পীরের উদ্দেশে ভক্তিভরে প্রণাম জানিয়ে যায়, হিন্দু-মুসলমান সকলে। এখনও এই প্রাচীন মসজিদটি হিজলীতে আছে, আর জঙ্গলে আবৃত কিছু বাড়িঘরের ভগ্নস্তূপ—হিজলীর অতীতের ঐতিহাসিক জীবনের একমাত্র স্মৃতিস্তম্ভ।

সেকালের পাঠান সেনাপতিরা যুদ্ধে নিহত হলে পীর-গাজীরূপে পূজা পেতেন। মুসলমান ফকির দরবেশ সাধুরা তো পেতেনই। এইসব পীরস্থানের দৈব মাহাত্ম্য ক্রমে সর্বসাধারণের মধ্যে স্বীকৃত হত। মুসলমান যুগের দুটি প্রধান সংগ্রামক্ষেত্রে—পশ্চিমবঙ্গে ও উত্তরবঙ্গে—এইরকম পীরস্থানের খুবই প্রাদুর্ভাব হয়েছিল দেখা যায়। ধর্মমঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল প্রভৃতি কাব্যের দিগবন্দনায় পশ্চিমবঙ্গের অনেক প্রাচীন পীর ও পীরস্থানের উল্লেখ পাওয়া যায়। হিজলীর বিখ্যাত মছলন্দী পীরের কথাও এই সব বর্ণনার মধ্যে আছে। হিন্দু কবিরা সকলেই প্রায় হিন্দু দেবদেবীদের মতন সসম্ভ্রমে মুসলমান পীরদের বন্দনা করতেন। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে কবি সীতারাম দাস (নিবাস সুখসাযের, মাতুলালয় ইন্দাস) পীরের যে বন্দনা দিয়েছেন, তার কতকাংশ এখানে উদ্ধৃত করছি:

বন্দো পীর ইসমালি গড মান্দারনে।
বাঘ মহিষ কাননে বাস পালে পাল,
মান্দারণ-গৌড়েতে যাহার জাঙ্গাল।...
ত্রিপিনির পীর বন্দো দফর খাঁ গাজি,
হুগলির হিঙ্গা বন্দো দিল হয়্যা রাজি।...
হিজলির বন্দিব তাজ খাঁ মছন্দলি।
পেকাম্বর মোকাম করিল যার হেটে,
ফর্জন্দ পয়দা নৈল কেউটালের পেটে।
নাম তার তাজ খাঁ থুইল পেকাম্বর,
অধিকার দিল তারে দরিয়া ডফর।

জমি হেতু দরিয়াকে হুকুম করিল,
দশ যোজন দরিয়া হুকুমে পাছু হৈল। —ইত্যাদি

হিজলীর মছলন্দী পীর যুদ্ধে নিহত কোন বীর সৈনিক নন। ভ্রাম্যমাণ ধর্মপ্রচারক কোন ফকির দরবেশ সাধুও নন তিনি। তাঁর ঐতিহাসিক নাম, তাজ খাঁ মসনদ-ই-আলা, এবং একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি তিনি। হিজলী অঞ্চলে তিনি রাজত্ব করতেন। ধর্মপ্রাণ ও উদার রাজা (জমিদার) ছিলেন বলে আজ তিনি পীররূপে সকলের পূজা পান। তাজ খাঁর ইতিহাস যাঁরা আলোচনা করেছেন (বিদেশী ও এদেশী লেখকরা), তাঁরা সকলেই প্রায় একাধিক পরস্পরবিরোধী কিংবদন্তীর উপর নির্ভর করে, অনেক ভুলভ্রান্তির চোরাবালিতে অসাবধানে পদার্পণ করেছেন। এবিষয়ে নির্ভরযোগ্য ইতিহাস খেজুরীনিবাসী মহেন্দ্রনাথ করণের 'হিজলীর মসনদ-ই-আলা' গ্রন্থখানি। সম্প্রতি আচার্য যদুনাথ সরকার সযত্নে সংশোধন ও সংযোজন করে, এই গ্রন্থের একটি নূতন সংস্করণের পাণ্ডুলিপি (অপ্রকাশিত) তৈরি করেছেন। মহেন্দ্রনাথের পুত্র স্বর্গত কৌস্তভকান্তি করণের সৌজন্যে পাণ্ডুলিপিখানি আমার দেখবার সুযোগ হয়েছিল। হিজলী অঞ্চলের ইতিহাস ও মসনদ-ই-আলার ইতিহাস প্রধানত এই পাণ্ডুলিপি থেকেই আমি সংকলন করেছি।

হিজলীর মসজিদের খাদেমদের (সেবক) গৃহে একখানি প্রাচীন ফার্সী হাতে-লেখা পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে। তাতে মসনদ-ই-আলা বংশের বিবরণ লেখা আছে। লেখকের নাম মুন্‌শী শেখ বিসমিল্লা সাহিব, সাং সঁরো, জেলা বালেশ্বর। ১৭৮৪ খৃস্টাব্দে লিখিত। লিপিকরের নাম পহ্‌লুয়ান আলী, সাং কস্‌বা, পরগণা অমর্শি। বিসমিল্লা সাহিব আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে লিখেছেন যে, তাঁর এক ভাই চাকলা হিজলীর দেওয়ান-ই-আদালতে মুন্‌শীর কাজে নিযুক্ত ছিলেন যখন, তখন তিনি তাঁর ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হিজলীতে আসেন। মসনদ-ই-আলার আস্তানায় জিয়ারৎ করার জন্য তিনি আসেন। স্থানীয় লোকদের তিনি মসনদ-ই-আলার বিবরণ জিজ্ঞাসা করেন, কিন্তু কেউ কিছু বলতে পারেন না। তখন একদিন কাঁথিনিবাসী মুন্‌শী নাসির-উল্লাহ ও দরিয়াপুরনিবাসী শেখ মুহম্মদ দায়েম তাঁকে মসনদ-ই-আলার একখানি ইতিহাসের বই এনে দেন। এই বই থেকে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংকলন করে এবং প্রবীণ ব্যক্তিদের মুখের কথা শুনে, তিনি এই ফার্সী ইতিহাস লেখেন।

বিসমিল্লা সাহিবের এই ইতিহাসের মধ্যে অতিরঞ্জিত উপাখ্যান খুব বেশি থাকলেও, এর ঐতিহাসিক মূল্য অস্বীকার করা যায় না। এই ফার্সী পাণ্ডু-লিপির সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই :

বাংলাদেশে হুসেন শাহের রাজত্বকালে উড়িষ্যার সীমান্তে সমুদ্রের তীরে চণ্ডীভেটি মৌজায় মনসুর ভূঞা নামে একজন ক্ষমতাশালী মুসলমান জমিদার বাস করতেন। তাঁর দুইপুত্র ছিল—জমাল ও রহমৎ। জমাল ছিলেন বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন এবং রহমৎ কুস্তী, শিকার ইত্যাদি নিয়ে সময় কাটাতেন। লোকের কুপরামর্শে রহমতের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে জমাল তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেন। জমালপত্নী এই চক্রান্তের কথা রহমতের কাছে প্রকাশ করে দেন। রহমৎ গুমগড় পরগণায় সমুদ্রতীরের অরণ্যসঙ্কুল ধীবরপল্লীতে উপস্থিত হন। সেখানে বাঘসিংহাদি হিংস্র বন্যজন্তু বিনাশ করে, তিনি সেই ধীবর-পল্লীতে বাস করতে থাকেন এবং পাঁচশত ধীবরকে লাঠিয়াল করে গড়ে তোলেন। ধীবরদের সাহায্যেই অরণ্যের কতকাংশ বাসোপযোগী ও আবাদ-যোগ্য করে ঘরবাড়ি তৈরি করেন। এই সময় চাঁদ খাঁ নামে এক বণিকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। বাণিজ্যযাত্রাপথে চাঁদ খাঁর সঙ্গীরা পানীয়জল সংগ্রহের জন্য হিজলীতে অবতরণ করেন। চাঁদ খাঁর কাছ থেকে কিছু ধনলাভ করে তিনি হিজলীর অরণ্য হাসিল করে জনপদ স্থাপন করেন এবং একটি দুর্গও নির্মাণ করেন আত্মরক্ষার জন্য। ভীমসেন মহাপাত্র তাঁর কর্মচারী নিযুক্ত হন। ক্রমে শক্তি ও লোকবল সঞ্চয় করে তিনি ভোগরাই, পটাশপুরের কতকাংশ, অমর্শি, ভূঞ্যামুঠা, সুজামুঠা, জলামুঠা প্রভৃতি অঞ্চল দখল করেন। এই স্থানে প্রচুর হিজল গাছ ছিল বলে, তিনি স্থানটির নামকরণ করেন হিজলী। ভীমসেন মহাপাত্র, দ্বারকাদাস ও দিবাকর পাণ্ডা—এই কর্মচারিদের পরামর্শে রহমৎ বাদশাহের কাছ থেকে জমিদারীর সনদ গ্রহণ করতে উদ্যোগী হলেন। বাকর খাঁ তখন উড়িষ্যার সুবাদার। রহমৎ তাঁর সঙ্গে দেখা করে সনদ পান এবং ইখ্‌তিয়ার খাঁ উপাধি গ্রহণ করেন। ইখ্‌তিয়ার খাঁর পুত্র দাউদ খাঁ পরে হিজলীর অধিপতি হন। দাউদ খাঁর বহু পুত্রসন্তানের মধ্যে তাজ খাঁ মসনদ-ই-আলা একজন। অন্যান্য পুত্রেদের মধ্যে রসুল খাঁ, দরিয়া খাঁ প্রমুখের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ফার্সী পাণ্ডুলিপির এই বিবরণের মধ্যে কিছু ঐতিহাসিক ভুলভ্রান্তি আছে।

পাণ্ডুলিপিতে বলা হয়েছে, ইখতিয়ার খাঁর (রহমৎ খাঁ) পিতা মনস্থর ভূঞা হুসেন শাহের সমসাময়িক ছিলেন। হুসেন শাহ ১৪৯৩ থেকে ১৫১৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। বাকর খাঁ ১৬২৮ খৃষ্টাব্দে শাহজাহান কর্তৃক উড়িষ্যার সুবাদার নিযুক্ত হয়ে কটকে যান। মনস্থর ভূঞার পুত্র রহমৎ তাঁর কাছ থেকে সনদ নিয়ে ইখ্‌তিয়ার খাঁ উপাধি গ্রহণ করেন। ফার্সী পাণ্ডুলিপির মতানুযায়ী পিতা-পুত্রের কালের ব্যবধান প্রায় ১২৫ বছর হয়ে যায়। তা হয় না, অসম্ভব। আমাদের মনে হয়, কোন মোগল সুবাদারের শাসনকালে মনস্থর ভূঞা চণ্ডীভেটিতে বসবাস করতেন। মনস্থরের পুত্র রহমৎ খাঁ, রহমতের পুত্র দাউদ খাঁ, দাউদের পুত্র তাজ খাঁ মসনদ-ই-আলা, তাজ খাঁর পুত্র বাহাদুর খাঁ। তাজ খাঁ ঠিক কোন্ সময়ে তাহলে হিজলীর অধিপতি ছিলেন ?

হিজলী অঞ্চলে দীর্ঘকাল থেকে প্রচলিত যে 'মসন্দলীর গীত' প্রচলিত আছে, তাতে অমিতবিক্রম সিকন্দরের ভাই তাজ খাঁ-ই মসনদ-ই-আলারূপে বর্ণিত হয়েছেন। পর্তুগীজ মিশনারী সিবাস্টিয়ান ম্যানরিক ১৬২৮ খৃস্টাব্দেব জুন মাসে, বাকর খাঁর কাছ থেকে ইখতিয়ার খাঁর (রহমৎ) সনদলাভের ঠিক পাঁচ মাস পরে, সামুদ্রিক দুর্ঘটনায় বাধ্য হয়ে হিজলীর তীরভূমিতে উপস্থিত হন। এই সময় হিজলীর অধিপতি ছিলেন মসনদ-ই-আলা, কারণ ম্যানরিক বারংবার তাঁর নাম উল্লেখ করেছেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে, বাকর খাঁর সুবাদারপদে নিয়োগের সময় থেকে ম্যানরিকের হিজলী অবতরণের সময়ের মধ্যে—অর্থাৎ পাঁচ মাসের মধ্যে ইখতিয়ার খাঁ ও তাঁর পুত্র দাউদ খাঁর রাজত্ব-কাল শেষ হয়ে যায় এবং তাজ খাঁ হিজলীর অধিপতি হন। ১৬৪৯ খৃস্টাব্দে তিনি পুত্র বাহাদুর খাঁকে রাজ্যভার অর্পণ করেন। গৃহচক্রান্তে ও রাজস্বের দায়ে বাহাদুর ১৬৫১ খৃস্টাব্দে বন্দী হলে, তাজ খাঁর জামাতা জৈন খাঁ হিজলীর অধিপতি হন। ১৬৬০ খৃস্টাব্দে বাহাদুর খাঁ আবার হিজলীর রাজত্ব ফিরে পান।

তাহলে, ১৬২৮ থেকে ১৬৪৯ সাল পর্যন্ত তাজ খাঁ মসনদ-ই-আলার রাজত্ব-কাল বলা যায়। পুত্র বাহাদুর খাঁর বন্দীজীবনে ও আত্মীয়স্বজন কর্মচারিদের রাজ্যলোভে ও চক্রান্তে তাজ খাঁ শেষ জীবনে খুবই মনোকষ্ট পান। কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয় (১৬৫১-৫২ সালে)। 'মসনদ-ই-আলা' উপাধি পাঠান

আমলের উপাধি, কথার অর্থ হল "যার আসন উচ্চ।" মোগলযুগে তাজ খাঁর নামের সঙ্গে এই উপাধি তাঁর গুণগ্রাহীরা ব্যবহার করেছেন। তাঁর ধর্মপ্রাণতা ও উদারতার কথা আজও হিজলী অঞ্চলের সর্বসাধারণের মুখে মুখে শোনা যায়। ভিক্ষুক ফকিরেরা আজও তাজ খাঁর গীত গেয়ে ভিক্ষা করে বেড়ায়। এই গীত মসন্দলীর গীত বলে পরিচিত। এই গীতের হরিসাউ ও তার কন্যা রূপবতীর (সত্যবতী) উপাখ্যানটি উল্লেখযোগ্য। গীতের সূচনা এই :

বন্দি বাবা মসন্দলী না করিও বাম।
কদমেতে লিখে রাখ অভাগার নাম॥
আমি জানি তোমারে, আমারে জানে কে।
মরিয়া না মরে তোমার নাম জপে যে॥
পহেলা বারাম্ দিল বাহিরী মোকাম।
তারপরে বারাম্ দিল হিজলী মোকাম॥
চৌদিকেতে লোণাপানি মধ্যেতে হিজলী।
তাহাতে বাদশাহী করে বাবা মসন্দলী॥
লগ্ন বাজার বসিয়াছে হিজলী শহরে।
বহুৎ বেচাকেনা হবে সেই সে বাজারে॥ ইত্যাদি।

তাজ খাঁ মসনদ-ই-আলার মসজিদের গায়ে আরবী ও ফার্সী অক্ষরে একটি লিপি আছে। তাতে মসজিদ সমাপ্তির অব্দ ১০৫৮ বলে লেখা আছে। অর্থাৎ হিজরী ১০৫৮ হল ১৬৪৮-৪৯ খৃস্টাব্দ। শ্রীচৈতন্যের অন্যতম প্রধান ভক্ত শ্যামানন্দের প্রধান শিষ্য রসিকানন্দ ১৫১২ শকাব্দে জন্মগ্রহণ করেন :

হেনকালে রসিকের পৃথ্বী আগমন
শকাব্দ পনরশবার আছয়ে প্রমাণ॥
—রসিকমঙ্গল

রসিকমঙ্গল গ্রন্থে রসিকানন্দের অনুসঙ্গী হিজলীর বৈকুণ্ঠদাস সম্বন্ধে বলা হয়েছে :

হিজলি মণ্ডলে বৈকুণ্ঠ মহাশয়।
রসিকেন্দ্র চূড়ামণি যাহার হৃদয়॥
শত শত সাধু সেবা করে নিরন্তর।
আপনা বিকাগত্যা সাধু সেবে দৃঢ়তর॥

তাজ খাঁ মসনদ-ই-আলা এই বৈকুণ্ঠ দাসের ধর্মনিষ্ঠায় প্রীত হয়ে তাঁর আরাধ্য বিগ্রহ গোকুলচন্দ্র রায় ঠাকুরের সেবার জন্য কয়েকখানি গ্রাম দেবোত্তর দান করেন। শোনা যায়, পটাশপুরের বিখ্যাত পীর মখদুম শাহের কাছে দীক্ষা নিয়ে মসনদ-ই-আলা ফকিরী ধর্ম গ্রহণ করেন। হিজলীর মসজিদ স্থাপন করে তাজ খাঁ তার সেবাকার্যের জন্য খাদেম বা পরিচারক, শিরণি তৈরির জন্য গুড়িয়া (গুড়ের মিষ্টান্ন তৈরি করত বলে গুড়িয়া বলা হত), দুধ যোগানোর জন্য গোয়ালা, প্রহর ঘোষণার জন্য ঘড়িয়াল, ধামসা (দুন্দুভি) বাজাবার জন্য বাদ্যকর প্রভৃতিকে প্রয়োজনীয় জমি লাখেরাজ দান করেছিলেন। এঁদের অনেকেই বংশানুক্রমে এখনও সেই লাখেরাজ ভোগ করছেন।

হিজলীর তাজ খাঁ মসনদ-ই-আলার জীবনাবসানের পর, ১৬৫১ সালে ইংরেজ বণিকরা বাংলাদেশের প্রথম বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করেন হুগলীতে। তার আগে বালেশ্বর থেকেই বাংলার সঙ্গে বাণিজ্যের লেনদেন চলত। ১৬৮২ সালের আগস্ট মাসে উইলিয়ম হেজেস্ কোম্পানীর প্রথম গভর্নর ও এজেণ্ট হয়ে হুগলীতে এসে দেখেন, নবাব সায়েস্তা খাঁর কর্মচারীরা বাণিজ্যে নানাভাবে বাধা দিতে আরম্ভ করেছেন। ১৬৮৬ সালের ২৮শে অক্টোবর ইংরেজ কুঠির তিনজন সৈন্য হুগলীর বাজারে আক্রান্ত ও প্রহৃত হয়। মোগল ফৌজদার আব্দুল গণি কুঠি আক্রমণ করেন এবং কাঁচা ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেন। জব চার্নক তখন হুগলীর কুঠির কর্মচারী। চার্নক সসৈন্যে ভাগীরথীর পূর্ব তীরে সুতানুটিতে পালিয়ে আসেন। সেখান থেকে গার্ডেনরীচের দুর্গ অধিকার করে, অপর তীরে হিজলী দ্বীপ আক্রমণ করে দখল করেন। ১৬৮৭ সালের মে মাসের মাঝামাঝি সায়েস্তা খাঁর সেনাপতি সমাদ ১২,০০০ সৈন্য নিয়ে হিজলী থেকে ইংরেজ বিতাড়নের জন্য অভিযান করেন। প্রচণ্ড যুদ্ধ হয় হিজলীতে। ১৬৮৭ সালের মে-জুন মাসে। ১১ই জুন ইংরেজরা হিজলী ছেড়ে চলে যান। সায়েস্তা খাঁ তাঁদের উলুবেড়িয়াতে অবস্থানের অনুমতি দেন। জব চার্নক আবার দ্বিতীয়বার সুতানুটিতে এসে উপস্থিত হন (১৬৮৭, সেপ্টেম্বর)। পরে আবার গণ্ডগোল হওয়ায়, চার্নক ১৬৮৮ সালের নভেম্বর মাসে, সুতানুটি ছেড়ে চলে যান। তৃতীয়বার জব চার্নক সুতানুটিতে আসেন, ১৬৯০ সালের ২৪শে আগষ্ট। এইদিনই কলকতা শহরের ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠার দিন।

মহিষাদল

মেদিনীপুর জেলায় 'রাজা' উপাধিধারী স্থানীয় ভূস্বামীর সংখ্যা অনেক। একদা আঞ্চলিক প্রভাব-প্রতিপত্তি এঁদের এত বেশি ছিল যে, এঁরা দেশের শাসন-কর্তার নামমাত্র অধীনতা স্বীকার করে, ছোট ছোট ক্ষুদে রাজার মতন প্রায় স্বাধীনভাবে নিজেদের জমিদারীতে রাজত্ব করতেন। পাইক লাঠিয়াল ইত্যাদি নিয়ে এই সব রাজা জমিদার নিজেদের সেনাবাহিনীও পোষণ করতেন। জমিদারীর মধ্যে প্রজাদের বিক্ষোভ দমন করা এবং সঙ্কটকালে দেশের প্রধান দণ্ডমুণ্ডের কর্তার পাশে দাঁড়িয়ে সাহায্য করাই ছিল এই সব জমিদারদের পোষ্য সেনাদলের প্রধান কাজ। এছাড়া, নিজেদের সীমাবদ্ধ এলাকায় রাজকীয় ঠাট বজায় রাখার জন্যও সেনাদলের প্রয়োজন হত। সামন্তযুগের ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্যই ছিল তাই। সারা দেশটা ছিল কতকটা ছোট ছোট বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতন রাজ্যে বিভক্ত। একটি খণ্ডরাজ্যের সঙ্গে অন্য রাজ্যের যোগাযোগ করাও ছিল কষ্টকর। কেন্দ্রীয় শাসনকর্তার শাসনদণ্ড এই সব খণ্ডরাজ্য পর্যন্ত পৌঁছত না। সুতরাং স্থানীয় জমিদারদের পক্ষে কতকটা মগের মুল্লুকের বাচ্চা-ই-সাকোর মতন বাস করা সম্ভব হত। আজ অবশ্য সে যুগ চলে গেছে। এখন রাজকাহিনী তাই রূপকথার মতন শোনায়।

মহিষাদলের সাধারণ মানুষের ইতিহাস, লোকসমাজের ইতিহাস এবং মহিষাদল রাজবংশের ইতিহাস এক নয়। সমগ্র ইতিহাসেব একাংশ মাত্র। তবু ইতিহাসের একটি পৃষ্ঠাও যখন ইতিহাস, তখন সেই ইতিহাস জানা দরকার। ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর, নারায়ণগড়, নাড়াজোল, ময়না, তমলুক, বগড়ী, চন্দ্রকোণা, ঘাটাল প্রভৃতি অঞ্চলে বড় বড় জমিদার-রাজা আছেন। এই সব বড় জমিদার রাজাদের মধ্যে মহিষাদলের রাজারা অন্যতম। প্রায় ৩২৩ বর্গমাইল জুড়ে মহিষাদল রাজ্যের বিস্তৃতি এবং অধিকাংশ জমিদারীই তমলুক মহকুমার অন্তর্ভুক্ত। অন্যান্য আরও অনেক রাজবংশের মতন মহিষাদল রাজবংশের গোড়ার ইতিহাস অন্ধকারে আচ্ছন্ন। তার কারণ, গোড়ার ইতিহাস, কোন রাজবংশেরই খুব উল্লেখযোগ্য নয়। ইতিহাসের অন্ধকারাচ্ছন্ন কাল কেন্দ্র করেই সাধারণত জনশ্রুতি পাখাবিস্তার করে। বংশানুক্রমিক

ধারাবাহিক ইতিহাসের যাঁদের প্রয়োজন বেশি (যেমন রাজারাজড়াদের), তাঁরা পরে যোগ্য ব্যক্তিদের দিয়ে বংশচরিত রচনা করিয়ে নেন। মুশকিল হয়, আদিপুরুষ কিভাবে রাজ্য পেলেন, তাই নিয়ে। সেখানে সুন্দর কল্পনার সাহায্যে মনোরম কিংবদন্তী রচনা করে, ইতিহাসের তথ্যশূন্য স্থান ভরাট করা হয়। তাই দেখা যায়, বাংলাদেশের অধিকাংশ রাজবংশের আদি পুরুষদের রাজ্যলাভের প্রায় একই কাহিনী সর্বত্র প্রচলিত। অনাদিলিঙ্গ শিবের উৎপত্তির কাহিনীর মতন, রাজবংশের আবির্ভাবের ও উৎপত্তির কাহিনীও সর্বত্র এক-রকম প্রায়। ইতিহাসের যুগসন্ধিক্ষণে, সাধারণত পাঠান-মোগল যুগে, বাংলার বাইরে থেকে অনেকে যোদ্ধা ও ব্যবসায়ীর বেশে ভাগ্যান্বেষণে এসেছিলেন এদেশে। তারপর ভাগ্যচক্রে তাঁরাই কেউ কেউ জমিদারী ও রাজ্য খিলাৎ পেয়ে বাংলার বড় বড ভূস্বামীরাজা হয়ে বসেছেন। বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে নয় শুধু, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসেও এই সব বহিরাগত রাজবংশ একটি বিচিত্র অধ্যায় জুড়ে রয়েছে। অনেকে দেখা যায়, জমিদারীর পরিচালনায় এদেশী বাঙালী দেওয়ান, ম্যানেজার ও আমলাবর্গের সাহায্য নিয়েছেন, কিন্তু সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নিজেদের দেশগত ও কুলগত স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখতে কুণ্ঠিত হননি। সামাজিক মিলনমিশ্রণের দিক থেকেও তাঁরা ব্যবধান রক্ষা করাই বাঞ্ছনীয় মনে করেছেন। বিবাহের ব্যাপারে, পোষ্যপুত্র গ্রহণের ব্যাপারে, সামাজিক লেনদেনের ব্যাপারে, তাঁরা বাঙালী সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন থেকেই নিজেদের আভিজাত্য রক্ষা করেছেন। বাংলার মধ্যযুগীয় সমাজের এও একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

শোনা যায়, উত্তরপ্রদেশের সামবেদীয় ব্রাহ্মণবংশের জনৈক জনার্দন উপাধ্যায় মহিষাদল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি কোন সময়, পাঠান-মোগল সংঘর্ষের সন্ধিক্ষণে, তিনি নাকি ব্যাবসাবাণিজ্যের জন্য এদেশে এসেছিলেন। বর্ধমান রাজবংশের আদিপুরুষও তাই এসেছিলেন বলে কথিত আছে। কেউ কেউ বলেন, জনার্দন মোগল সেনাদলের একজন কর্মচারীরূপে বাংলাদেশে এসেছিলেন। যেভাবেই আসুন, স্থানীয় ভূস্বামীদের উৎখাত করে তিনি মহিষাদল রাজ্যের জমিদারী পেয়েছিলেন, কাহিনীতে এ ঘটনারও উল্লেখ আছে। ঠিক বর্ধমান রাজবংশের কাহিনীর মতন। অন্যান্য আরও অনেক রাজবংশের আদি কাহিনীও তাই। স্থানীয় জমিদার ছিলেন

তখন জনৈক কল্যাণ রায়চৌধুরী। সেই একই সনাতন কৌশলে জনার্দন উপাধ্যায় তাঁর জমিদারীটি গ্রাস করে ফেলেন। কল্যাণ রায় বকেয়া খাজনার দায়ে জনার্দনের শরণাপন্ন হয়ে, শেষে তাঁকে জমিদারী সমর্পণ করতে বাধ্য হন, যেমন আরও অনেকে হয়েছেন। এছাড়া, কথিত কল্যাণ রায় সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু জানা যায় না, জানবার উপায়ও নেই। গল্প ও কাহিনী আছে শুধু। শোনা যায়, বীরনারায়ণ রায় (মতান্তরে বড়িয়া রায়) ছিলেন রায়বংশের আদিপুরুষ। কল্যাণ রায় হলেন তাঁর অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ। কল্যাণ রায় নাকি একটি খাল কেটে কংসাবতী (কাঁসাই) নদীর সঙ্গে হল্‌দীনদীর যোগাযোগ করে দিয়েছিলেন, তাই তার নাম হয়েছে রায়খালী। এই বংশের হৃদয়রাম ও উদয়রাম নামে আরও দু'জন রাজার নাম লোকমুখে শোনা যায়। এই দুই রাজার একজনের নামে একটি 'পুকুর', আর একজনের নামে একটি 'গড' আছে—'হৃদয়রামের পুকুর' ও 'উদয়রামের গড়'। এছাড়া, নিদর্শন বলে আর কিছু নেই এবং রাজার রাজকীয় অস্তিত্ব বোঝার মতন প্রমাণও নেই।

মোগল আমলে জনার্দন উপাধ্যায় মহিষাদলের জমিদারী পান। কি উপায়ে পান, তা বর্তমানে তিমিরাবৃত। রাজবাড়ির অস্ত্রাগারে দুটি মূল্যবান নিদর্শন আছে। বৈরাম খাঁর নামাঙ্কিত একটি সুন্দর তরবারি এবং সোনালি চিত্রসমন্বিত কবি ফিরদৌসীর 'শাহ্‌নামা' গ্রন্থের কপি। মোগলযুগের চিত্রকলার এই মূল্যবান নিদর্শনটি এবং তরবারিখানি, শোনা যায়, জনার্দন উপাধ্যায় মোগল বাদ্‌শাহের কাছ থেকে উপহারস্বরূপ পেয়েছিলেন। রাজবাড়ির মধ্যে দ্রষ্টব্য জিনিসপত্রের মধ্যে এই দু'টিই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য।

জনার্দনের মৃত্যুর পর তাঁর এক পুত্র দুর্যোধন বা দুর্জন উপাধ্যায় কয়েক বছর রাজত্ব করেন। দুর্যোধনের পর রামশরণ উপাধ্যায়, রাজারাম উপাধ্যায়, শুকলাল উপাধ্যায়, আনন্দলাল উপাধ্যায় ও তাঁর সহধর্মিণী রানী জানকী রাজত্ব করেন। ১৭৭০ খৃস্টাব্দে, আনন্দলালের মৃত্যুর পর, রানী জানকী রাজ্যভার গ্রহণ করেন। তমলুকের একজন বৃদ্ধ চড়ক-গাজনের সন্ন্যাসীর তর্জাগানে মহিষাদল রাজবংশের এই কাহিনীর উল্লেখ আছে।[১]

---

১ গানটি, মেদিনীপুরের ইতিহাস-অনুরাগী শ্রীরাসবিহারী রায় তাঁর অধুনালুপ্ত 'মেদিনীবাণী' পত্রিকায় (ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৪৬) 'মহিষাদল রাজবংশ' প্রবন্ধে উদ্ধৃত করেছেন।

তর্জাগানটির মধ্যে জনার্দন থেকে রানী জানকী দেবী পর্যন্ত নাম উল্লেখ করা হয়েছে :

আগু হাটে রাজা কল্যাণ পাছু জনার্দন।
দুই রাজাতে চলে যায় বৈকুণ্ঠ ভবন॥
দেশে পড়ে কান্নাকাটি দয়াল রাজার গুণে।
সস্তাদরে ধান বিকালো নাহি ধরে গুণে॥...
রাম আইল দেশে রে ভাই পড়ে গেল শাড়া।
ঘুরে প্রজা রামশরণকে রাজ্যে দেখে খাড়া॥
রামের মত প্রজা পালে রাজা রাজারাম।
সুখের হাসি প্রজার মুখে ফুটে অবিরাম॥
পঁয়তাল্লিশের ধাক্কা খেয়ে মুখে নাইক বাক্।
এদিকে শুকলাল চলে পেয়ে যমের ডাক॥
দুরাদৃষ্ট প্রজার কষ্ট কেবা আর দেখে।
আন্দিলাল তো পরবিষয়ের পাছে চোক রাখে॥
মারহাট্টায় কাট্যা কুট্যা লুট্যা পুট্যা খায়।
মায়ের মত রাণী জানকী বাঁচায় সেই দায়॥
ধর্মে মতি রাণী জানকী আন্দিলালের জায়া।
দেউল কীর্তি রাখি শেষে ছাড়িলেক কায়া॥
সাহেব শুবা এলো দেশে জাত নাইক থাকে।
গাঁয়ে এলে ভাতের হাঁড়ি হাড়িপাড়ায় রাখে॥
সত্য গেল কলি এলো হারামের হল দেশ।
মহিষাদলে গোপাল সভ্য পালা হল শেষ॥

তর্জাওয়ালা ইতিহাসের নির্ভুল ভাষণ দেবে, এমন আজগুবি ধারণা করা অর্থহীন। কবিয়াল বা তর্জাগায়করা সকলেই প্রায় পেট্রন রাজামহারাজাদের পোষ্য ছিলেন এবং কবিগানে ও তর্জাগানে দেবদেবীর মাহাত্ম্যের চেয়েও রাজাদের মাহাত্ম্যকীর্তন করতেন বেশি। 'রামের মত প্রজা পালে রাজা রাজারাম'—একথা শ্রীরামচন্দ্রের কালেই সত্য ছিল কিনা বলা যায় না যখন, তখন মহিষাদলে রাজারামের কথা না তোলাই ভাল। জানকী দেবী অবশ্য প্রজাপ্রিয় রানী ছিলেন। ধর্মকর্মে তাঁর নিষ্ঠা ছিল যথেষ্ট এবং

দেবদেউল তিনি প্রতিষ্ঠাও করেছেন অনেক। ধর্মপ্রাণ রানী হলেও, রাজকার্য পরিচালনায় তাঁর মতন দক্ষতা বোধ হয়, রাজবংশের আর কেউ দেখাতে পারেননি। যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী বিদেশী সৈন্যদের দিয়ে তিনি নিজের দেশীয় সেনাদলকে ভালভাবে সামরিক বিদ্যা শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করেন। তাঁর স্বামী আনন্দলাল উপাধ্যায়, মনে হয়, বর্গীর হাঙ্গামার সময় একদল পর্তুগীজ গোলন্দাজ সৈনিক নিযুক্ত করেন, রাজ্যরক্ষার জন্য। জমিদারীর মধ্যে তাদের বসবাসের উপযোগী নিষ্কর সম্পত্তি ও গ্রাম দান করেন। এখনও সেই গ্রামে তাদের বংশধররা বসবাস করছেন।

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়াতে, ১৮০৪ সালে, রানী জানকীর মৃত্যুর পর, রাজ্যে নানাদিক থেকে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। প্রধানত উত্তরাধিকার নিয়েই বিশৃঙ্খলা ধূমায়িত হয়ে ওঠে পোষ্যপুত্রের দাবি নিয়ে, রাজ্যের অধিকার নিয়ে বিবাদ ও মামলা-মোকদ্দমায় বহুদিন চলে যায় রানী জানকীর মৃত্যুর পর গুরুপ্রসাদ গর্গ, ভবানীপ্রসাদ ও কালীপ্রসাদ গর্গ কিছুদিন রাজত্ব করেন। গুরুপ্রসাদের মৃত্যুর পরে রানী মন্থরা দেবী তাঁর পুত্র জগন্নাথ গর্গকে রাজ্যের ন্যায্য উত্তরাধিকারীরূপে দাঁড় করান। মতিলাল পাঁড়ে এই দাবির বিরুদ্ধে পোষ্যপুত্রের অধিকার নিয়ে মোকদ্দমা করেন। মামলা প্রিভি কাউন্সিল পর্যন্ত চলে এবং অবশেষে জগন্নাথ গর্গের মৃত্যুর পর (১৮২২ সালে) তাঁর সহধর্মিণী ইন্দ্রাণী দেবী রাজ্যভার গ্রহণ করেন। পরে তাঁর পুত্র রামনাথ গর্গ সাবালক হয়ে রাজা হন। রামনাথের সহধর্মিণী রানী বিমলা দেবী পতির সঙ্গে সহমরণ বরণ করেছিলেন। হাওড়ায় রামকৃষ্ণপুর ঘাটে এই ঘটনা ঘটেছিল। তখন বেন্টিঙ্ক সহমরণ ও সতীদাহ আইনত নিষিদ্ধ করেছেন। অবৈধ বলে ঘোষিত হওয়া সত্ত্বেও যে এদেশে সতীদাহ ও সহমরণ আরও কিছুদিন ধরে প্রচলিত ছিল, তার প্রমাণ এরকম আরও পাওয়া যায়। একটা প্রশ্ন এই প্রসঙ্গে মনে জাগে। বাংলাদেশে সহমরণ ও সতীদাহ প্রথার যে ঢেউ এসেছিল, তা কি বাইরে থেকে আমদানি হয়েছিল, না, এদেশের সামাজিক রীতি হিসাবে স্বাভাবিকভাবে তার বিকাশ হয়েছিল, ভাববার কথা। উত্তরভারতের সামাজিক প্রথা ক্রমে বাংলার সমাজে গৃহীত ও অনুকৃত হয়েছিল কিনা, বলা যায় না।

রামনাথ ও বিমলা দেবীর পর মহিষাদলে আরও অনেকে রাজত্ব করেছেন।

তাঁদের কাহিনীর এমন কিছু বৈচিত্র্য নেই, যা ইতিহাসের উপাদান হিসাবে সবিস্তারে বর্ণনার যোগ্য। মহিষাদল রাজবাড়িতে বসে ভবানীতলার গল্প শুনছিলাম। রাজা ভবানীপ্রসাদ গর্গ, শোনা যায়, ভবানী দেবীর আরাধনা করতেন এবং যেখানে বসে করতেন, সেই স্থানটিকে ভবানীতলা বলে। ভবানীতলায় আগে নরবলি হত বলে কথিত আছে। রাজারা অনেকে প্রজাদের দণ্ড দিতেন "ভবানীতলা মে লে যাও" বলে। 'ভবানীতলা মে লে যাও' কথা বলার অর্থ, নরবলি দেবার জন্য নিয়ে যাও। প্রাণদণ্ড এইভাবে দেওয়া হত। মা ভবানীর কাছে প্রজার মুণ্ড উৎসর্গ করে দোর্দণ্ডপ্রতাপ রাজারা প্রজাদের শাস্তি দিতেন। ইংরেজ আমলে নাকি সাহেবরাও এই প্রথা অনুকরণ করেছেন কিছুদিন। কোম্পানীর আমলের সাহেবরা এদেশী লোকদের যখন প্রাণদণ্ড দিতেন, তখন এরকম ভবানীতলায় নিয়ে গিয়ে নরবলি দিতেন। মহিষাদলের ভবানীতলায় এরকম অনেক প্রজার মুণ্ড আজও মাটি খুঁড়ে পাওয়া যায় শুনেছি। মধ্যযুগের সমাজের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ঐতিহাসিক নিদর্শন এই মুণ্ডগুলি।

মহিষাদল নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানামুনির নানামত আছে। কেউ বলেন, গেঁওখালি মহিষাদল প্রভৃতি অঞ্চল আগে যখন দ্বীপের মতন ছিল, তখন তার আকার ছিল কতকটা মহিষের মতন। মহিষ-সদৃশ দ্বীপ বলে নাম হয়েছে মহিষাদল। কেউ বলেন, সমুদ্রতীরবর্তী এই দ্বীপের জঙ্গলে পূর্বে বন্য মহিষের বাস ছিল। দলে দলে তারা বনেজঙ্গলে বিচরণ করে বেড়াত। মহিষের সেই অতীতের স্মৃতি মহিষাদল নামের মধ্যে বিরাজ করছে। কেউ বলেন, এ অঞ্চলে মাহিষ্যজাতির আদি ও প্রধান বসতি বলে, স্থানের নাম হয়েছে মহিষাদল। এরকম আরও অনেক বিবরণ উল্লেখ করা যায়। মাহিষ্যজাতির সঙ্গে মহিষাদল নামের সম্পর্ক থাকা অসম্ভব নয়। মেদিনীপুর ও দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে মাহিষ্যদের ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক দানের কথা মনে করলে দু'চারটি স্থানের নাম তাঁদের নামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকা আদৌ অস্বাভাবিক বলে মনে হয় না। সমুদ্রতীরবর্তী ধীবরদের দানও মেদিনীপুরের-তথা বাংলার সংস্কৃতিতে সামান্য নয়। নদীমাতৃক বাংলার লোকায়ত সংস্কৃতির

আদিভিত্তি ধীবররাই প্রধানত গড়ে তুলেছিলেন, একথাও ভুলে যাওয়া উচিত নয়।

প্রাচীন তাম্রলিপ্ত রাজ্য বহুদূর পর্যন্ত যে বিস্তৃত ছিল, একথা প্রত্যেক ঐতিহাসিকই স্বীকার করেন। আসল নগরটি খুব বড় ছিল না হয়ত এবং ঠিক তার ভৌগোলিক অবস্থানটি আজ নির্ণয় করাও রীতিমত কঠিন। সাময়িক খেয়াল বা সখের বশবর্তী হয়ে দু'চারটে কোদালের কোপ দিয়ে কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন কোন স্থান থেকে পাওয়া গেলেই বলা যায় না যে প্রাচীন তাম্রলিপ্তের কেন্দ্রটি পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন মেদিনীপুরের একটা বিরাট অঞ্চল জুড়ে পাওয়া গেছে এবং এখনও পুষ্করিণী খননকালে পাওয়া যায়। কিন্তু প্রাচীন তাম্রলিপ্ত বন্দর ও নগর ঠিক কোথায় ছিল, তা অনুমান করতে হলেও তার জন্য আজ অনেক খোঁড়াখুঁড়ি, অনেক শ্রমসাপেক্ষ অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। তাম্রলিপ্তের অবস্থানের কথা বাদ দিয়েও একথা বলা যায় যে, তার সাংস্কৃতিক বিকিরণকেন্দ্র বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মহিষাদল গেঁওখালি পর্যন্ত তো ছিলই, আরও দক্ষিণে চব্বিশ-পরগণার আদিগঙ্গার তীর পর্যন্ত ছিল। এই সব অঞ্চল থেকে তার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নিদর্শনও কিছু কিছু পাওয়া যায়। মাটি খুঁড়লে হয়ত আরও অনেক বেশি নিদর্শন (বৌদ্ধ ও জৈন সংস্কৃতির) পাওয়া যেতে পারে।

তমলুকের দক্ষিণাংশের নাম একসময় মালঝিটা ছিল। প্রাচীন ঐতিহাসিক দলিলপত্রে মালঝিটার নাম পাওয়া যায়। মনে হয় হলদী নদীর ধার থেকে কাঁথি পর্যন্ত প্রাচীন মালঝিটা পরগণার বিস্তৃতি ছিল। হিজলী নন্দীগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চল মালঝিটার মধ্যে পড়ে। গড় মালঝিটায় বড়াম চণ্ডী ও রুক্মিণী দেবী আছেন। রুক্মিণী দেবী সম্বন্ধে অনেক কাহিনী ও কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। অপ্রকাশিত প্রাচীন একটি তালপত্রের পুঁথি থেকে মহিষাদল রাজ-বংশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এই কাহিনীটি উদ্ধার করা হয়েছে। কাহিনীটি এই : লোকের বিশ্বাস, অপুত্রকরা রুক্মিণী দেবীর বরে পুত্রলাভ করেন। সেইজন্য তাঁর কাছে পুত্রলাভের বাসনা চরিতার্থ করার জন্য অনেক লোকের সমাগম হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে শুকলাল উপাধ্যায় মহিষাদলের রাজা ছিলেন। দীর্ঘকাল তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। এই অবস্থায় খুব মনোকষ্টে তিনি দিন কাটাতেন। একদিন এই সময় তিনি রুক্মিণী দেবীর স্বপ্নাদেশ

পান যে, তাঁর বাসনা শীঘ্রই পূর্ণ হবে। সস্ত্রীক তিনি রঙ্কিণী দেবীর কাছে মালঝিটাতে এসে অঙ্গীকার করে যান যে, যদি তাঁর পুত্রসন্তান হয়, তাহলে তিনি দেবীর পূজার বিশেষ ব্যবস্থা করে দেবেন। যথাকালে তাঁর যে পুত্র হল, তাঁর নাম আনন্দলাল উপাধ্যায়। রাজা শুকলাল রঙ্কিণী দেবীর শারদীয়া বৃত্তি ৩৯৲ টাকা এবং বড়াম চণ্ডী দেবীর বৃত্তি ২২৴০ বংশানুক্রমিক দেবসেবার জন্য দান করেন। দেবীর সেবাইতরা এই বৃত্তি বংশানুক্রমে ভোগ করছেন।

বড়াম চণ্ডী ও রঙ্কিণী রেবীর এই কাহিনীর অবশ্য কোন গুরুত্ব নেই। এরকম পুত্রসন্তানের কামনা চরিতার্থের কাহিনী বাংলার বহু দেবদেবীর মাহাত্ম্যকথার মধ্যে পাওয়া যায়। রঙ্কিণী দেবীর কোন দৈবশক্তির বিশেষত্বও এর মধ্যে প্রকাশ পায় না। বড়াম চণ্ডী যে একেবারে বিশুদ্ধ বনদেবী এবং আদিবাসীদের দেবী, তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। আদিবাসী-সমাজ ও উপরের হিন্দুসমাজ—উভয় সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন জাতি-উপজাতির মধ্যে (যেমন পশ্চিমবঙ্গের বাউরীদের মধ্যে) বড়াম চণ্ডীর পূজার অত্যধিক প্রচলন আছে দেখা যায়।

পশ্চিমবঙ্গের লৌকিক দেবদেবীর মধ্যে রঙ্কিণী দেবীর বিশেষ একটা গুরুত্ব-পূর্ণ স্থান আছে বলে মনে হয়। উনবিংশ শতাব্দীতে পর্যন্ত প্রাচীন সংবাদপত্রের বিবরণে দেখা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে রঙ্কিণী দেবীর পূজায় নরবলি হত। ভয়াবহ তান্ত্রিক দেবী বলে রঙ্কিণী দেবীর প্রসিদ্ধির কথা আজও লোকমুখে শোনা যায়। মেদিনীপুর ও বর্ধমান অঞ্চলে আমরা বিশেষভাবে শুনেছি। রঙ্কিণী দেবীর প্রতাপ উড়িষ্যা অঞ্চলেও আছে। মালঝিটা পরগণায় রঙ্কিণী দেবীর পূজার প্রচলন কৌতূহল উদ্রেক করে। প্রশ্ন ওঠে, রঙ্কিণী দেবীর সত্যকার পরিচয় কি? তাঁর কোন ইতিবৃত্ত রচনা করা যায় কি না?

মহিষাদলের রাজারা উত্তরপ্রদেশবাসী। তাঁরা বাঙালী নন। উত্তর-প্রদেশের সঙ্গে ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক যোগসূত্র তাঁদের এখনও ছিন্ন হয়নি। মনে হয় মাহিষ্যরা ও অন্যান্য স্থানীয় অধিবাসীরা পূর্বে মেদিনীপুরের এই সব অঞ্চলে কর্তৃত্ব করতেন। সামন্তযুগের প্রকৃত অধিপতি ছিলেন তাঁরাই। তারপর ঐতিহাসিক ঘটনাচক্রে বিদেশী ক্ষত্রিয় যোদ্ধা ও ব্যবসায়ীরা যখন ভাগ্যান্বেষণে এসে, ছলে-বলে-কৌশলে এদেশের

অন্যতম ভূস্বামী হন, তখন অন্যান্য ভূস্বামীদের মতন দানধ্যান খয়রাৎ, পণ্ডিত পুরোহিতদের পোষকতা, দেবদেবীর বৃত্তিদান, দেবালয় নির্মাণ ইত্যাদি সুকর্ম তাঁদেরও করতে হয়েছে। ভূস্বামিত্বের মর্যাদারক্ষার জন্য, এসব কাজ করেননি, এমন কোন ভূস্বামী কেউ ছিলেন না এদেশে। প্রথমত মর্যাদারক্ষার জন্য তাঁরা করতেন। দ্বিতীয়ত পুণ্যার্জনের লোভেও করতেন। দেবালয় নির্মাণ করলে, দেবদেবীর জন্য বৃত্তিদান করলে, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত দু'চারজন পোষণ করলে, জীবনের সমস্ত পাপ ও গ্লানির বোঝা থেকে মুক্ত হয়ে, পুণ্যের হেডকোয়ার্টার স্বর্গধামে যাত্রার পথ সুগম করা যায়, এরকম ধারণা সেকালে সর্বশ্রেণীর লোকের মধ্যে বদ্ধমূল ছিল, ভূস্বামীদের মধ্যে আরও প্রবলভাবে ছিল। মহিষাদলের রাজাদের পক্ষেও ধর্মপ্রাণতা ও বদান্যতার পরিচয় দেওয়া তাই অস্বাভাবিক নয়।

মহিষাদল পরগণার রামবাগ গ্রামে রামজীউর মন্দির আছে। ১৭১০ শকাব্দে রানী জানকী যে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন, শিলালিপি থেকে তা জানা যায়:

শুভমস্তু সকাব্দা ১৭১০ সতরস দশ।

... ...

ভূমিপানন্দলালস্য পত্নী শ্রীজানকীমুদা
দদৌ শ্রীরামচন্দ্রায় মন্দিরঞ্চেদমুত্তমং।

রামচন্দ্রের পূজা উত্তরপ্রদেশে প্রচলিত, বাংলাদেশে নয়। রামায়ণ বাংলা-দেশে জনপ্রিয়, রামায়ণের কাহিনী নিয়ে বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ ও পরিপুষ্ট, কিন্তু রামলক্ষ্মণ সীতা বা তাঁদের প্রধান অনুচর হনুমানজী, কেউই বাংলার লোকদেবতারূপে পূজিত নন। রামলক্ষ্মণ সীতা হনুমানজীরা সব বিহার উত্তর-প্রদেশের লোকদেবতা। রামজীউর মন্দিরে এঁরা সকলেই প্রতিষ্ঠিত আছেন। এঁদের সঙ্গে জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রাও আছেন, উড়িষ্যার স্মৃতিরূপে, আর আছেন শালগ্রাম শিলা। রামজীউর পূজার ও দেবসেবার আয়োজনও বিপুল। রামজীউর রথও খুব বিখ্যাত রথ। পূজার ও সেবার কোন ত্রুটিবিচ্যুতি হলে দেবতারা ক্রুদ্ধ হয়ে স্বপ্নে ভয় দেখান। হনুমানজী প্রহার পর্যন্ত করেন। প্রহারের একটি কাহিনী এই—দেবসেবার ত্রুটির জন্য একদিন হনুমানজী তাঁর ব্রাহ্মণ পূজারীকে উত্তম-মধ্যম প্রহার করেন। প্রহার রাত্রিকালে ঘুমন্ত

অবস্থায় করা হয়। প্রহারের দাগ কেটে বসে যায় পূজারীর সর্বাঙ্গে। পরদিন পূজারী ষোড়শোপচারে পূজা ও ভোগের ব্যবস্থা করে হনুমানজীকে শান্ত ও সন্তুষ্ট করে রেহাই পান।

উল্লেখযোগ্য হল, রামজীউর মন্দিরের প্রাঙ্গণের মধ্যে পঞ্চানন্দ ও শিবের দুটি মন্দিরও আছে। উত্তরপ্রদেশ ও উড়িষ্যার দেবদেবীর মধ্যে কোনরকমে বাংলার দুজন লোকপ্রিয় গ্রামদেবতা নিজেদের আস্তানা করে নিয়েছেন বলে মনে হয়। শিবের মন্দির তেমন বিস্ময়ের বস্তু নয়। পঞ্চানন্দের মন্দির নিশ্চয় বিস্ময়কর। পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র পঞ্চানন্দের সমান আধিপত্য নেই, যেমন শিবের আছে। পঞ্চানন্দের আধিপত্যের একটি সীমাবদ্ধ অঞ্চল আছে পশ্চিমবঙ্গে। হুগলী-হাওড়া, দক্ষিণ বর্ধমান থেকে আরম্ভ করে, ভাগীরথীর পূর্বতীরে চব্বিশ-পরগণা জেলার দক্ষিণাংশ পর্যন্ত সেই আধিপত্য বিস্তৃত। হুগলী-হাওড়ায় ও দক্ষিণ চব্বিশ-পরগণায় অত্যধিক আধিপত্য। মেদিনীপুরের কাঁথি ও তমলুক মহকুমার দক্ষিণের নদীতীরবর্তী অঞ্চলে পঞ্চানন্দের প্রভাব কিছুটা বিস্তৃত হওয়া সম্ভব মনে করে আমরা অনেক অনুসন্ধান করেছিলাম। দু'এক স্থানে ছাড়া পঞ্চানন্দের নামেরও কোন উল্লেখ শুনিনি কোথাও। রামবাগে রামজীউর প্রাঙ্গণে শিবসহ পঞ্চানন্দকে দেখে মনে হয়, দক্ষিণ চব্বিশ-পরগণার পঞ্চানন্দ-পূজার প্রবল তরঙ্গ ওপারেও কিছুটা ছিটকে গিয়েছিল।

রামজীউর মন্দিরের পূর্বে রানী জানকী ১৭০০ শকে গোপালজীউর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। মহাসমারোহে গোপালজীউর পূজা ও সেবা হত, প্রধানত রাজপরিবারের পোষকতায়। এ অঞ্চলে বাসুলী দেবী নামে বিখ্যাত দেবীও আছেন, বাসুলীচক নামে একটি স্থানও আছে দেবীর নামে। বাসুলী দেবী সম্বন্ধে যে কাহিনী প্রচলিত আছে তা এই—দেবী নিজেকে ব্রাহ্মণকন্যা বলে পরিচয় দিয়ে কোন ধীবরগৃহে অবস্থান করেন এবং তাঁকে পিতা বলে সম্বোধন করেন। দেবীর অবস্থানের পর ধীবরের অবস্থাও দিন দিন পরিবর্তন হতে থাকে। দেশাধিপতি এই সংবাদ পেয়ে রূপবতী ষোড়শী ব্রাহ্মণকন্যাকে রাজপুরীতে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেন। দূতরা যখন ধীবরগৃহে উপস্থিত হয়ে এই ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তখন দেবী ব্রাহ্মণকন্যার রূপ ছেড়ে পাথরখণ্ডের রূপ ধারণ করেন। রাজদূতরা প্রস্থান করলে সমস্ত ঘটনা রাজাকে

জানানো হল। এদিকে ধীবরও পাথরখণ্ডটি সমুদ্রজলে নিক্ষেপ করল। অনন্তর জনৈক ব্রাহ্মণ সমুদ্রগর্ভে দেবীর আবির্ভাব স্বপ্নে দেখলেন এবং সেখান থেকে তাঁকে উদ্ধার করা হল। দেবীর নাম হল বাস্থলী দেবী।

চণ্ডীদাস-সমস্যা প্রসঙ্গে তো বটেই, অন্যান্য দিক থেকেও, বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে বাস্থলী দেবীর বিশেষ গুরুত্ব আছে। বাঁকুড়ার ছাত্‌না অঞ্চলে বাস্থলী-পূজার প্রচলন আছে। দক্ষিণ বাঁকুড়া থেকে এতদূর দক্ষিণে বাস্থলীচক ও বাস্থলী দেবীর অস্তিত্ব, এই দেবীর এককালীন পূজা-প্রচলন সম্বন্ধে প্রশ্ন জাগায় মনে। উল্লেখযোগ্য হল, ধীবরদের সঙ্গে বাস্থলী দেবীর সম্পর্ক। ব্রাহ্মণপূজারীর দখল কায়েম করার কৌশলটা খুবই সাধারণ কৌশল। সর্বত্র এই একই কৌশল নানাভাবে অবলম্বিত। মদ্য-মাংসে পূজিত লৌকিক দেবী বাস্থলী দেবী ক্রমে ব্রাহ্মণের কুক্ষিগত কিভাবে হলেন, তারই ইতিহাসটুকু কিংবদন্তীর রূপকের মধ্যে আছে। মেদিনীপুরের এই দক্ষিণাঞ্চলের আরও অনেক দেবদেবীর কাহিনী ধীবরদের নিয়ে রচিত। এই রচনা কেবল নিছক কল্পনা নয়, এর মূলে ঐতিহাসিক সত্যও একটু আছে। সেই সত্যটুকু হচ্ছে, বাংলাদেশের লোকায়ত সংস্কৃতির ভিত্তিরচনায় সমুদ্র ও নদীতীরবর্তী অঞ্চলের ধীবরদের দান অনস্বীকার্য।

মীরপুর

গেঁওখালি থেকে মাইল দুই দূরে একটি গ্রাম আছে, নাম মীরপুর। নানাজনে নানানামে গ্রামটির পরিচয় দেন। কেউ বলেন, 'ফিরিঙ্গী পল্লী' বা 'ফিরিঙ্গী পাড়া'। 'গেঁওখালির ফিরিঙ্গী' বলেও পল্লীবাসীরা পরিচিত। শুকলাল-পুরের ফিরিঙ্গী, বেঙ্কুণ্ডুর ফিরিঙ্গীও কাউকে কাউকে বলতে শুনেছি। মীরপুর গ্রাম ঘুরে আমরা মহিষাদল গিয়েছিলাম। মীরপুরের আকর্ষণ ফিরিঙ্গী নয়, ফিরিঙ্গীদের ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য। ফিরিঙ্গী কথাটা সাধারণ পল্লীবাসীরা কত সহজে ব্যবহার করতে পারেন, তার দৃষ্টান্ত ফিরিঙ্গী কমল বসু। ফিরিঙ্গীদের সঙ্গে ব্যাবসা করতেন বলে তিনিও ফিরিঙ্গী কমল বসু হয়ে গেলেন। কলকাতা শহরে চিৎপুর রোডে এই ফিরিঙ্গী কমল বসুর গৃহে কত ঐতিহাসিক ঘটনাই না ঘটেছে। মীরপুরবাসীরা এই অর্থে ফিরিঙ্গী নন। কবিয়াল অ্যাণ্টনি ফিরিঙ্গীর ভাষায়, 'জাত-ফিরিঙ্গী জবরজঙ্গী'ও তাঁরা নন। বাংলার অন্যান্য পল্লীবাসীদের মতন বেশ শিষ্ট ও মার্জিত এবং মনেপ্রাণে বাঙালী। এদিকে খৃস্টধর্মী এবং পর্তুগীজ গোলন্দাজদের বাঙালী বংশধর। পশ্চিমবঙ্গে এরকম পল্লী আর কোথাও দেখিনি।

কলকাতার গঙ্গার-ঘাট থেকে আমরা স্টীমারে যাত্রা করেছিলাম গেঁওখালির পথে। যেতে সময় লাগে অনেক, তবে একপথে যাওয়া যায়। তা না হলে, ট্রেনে পাঁশকুড়া, পাঁশকুড়া থেকে তমলুক বাসে, তমলুক থেকে মহিষাদল বাসে, মহিষাদল থেকে নৌকায় গেঁওখালি, সেখান থেকে হেঁটে মীরপুর গ্রাম। এই পথেই আমরা গেঁওখালি মীরপুর ঘুরে, মহিষাদল তমলুক পাঁশকুড়া দিয়ে কলকাতা ফিরে এসেছিলাম।

মহিষাদলের রাজারা পর্তুগীজ গোলন্দাজদের নিয়ে এসেছিলেন মীরপুরে বর্গীর হাঙ্গামার সময়। অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীতে। তার অনেক আগে থেকে বাংলার ভুইঞারা পর্তুগীজদের আশ্রয় দিয়েছেন এবং এদেশে ষোড়শ শতাব্দী থেকে পর্তুগীজরা নিয়মিত আনাগোনা আরম্ভ করেছেন। শ্রীপুরের সামন্ত কেদার রায়ের অধীনে পর্তুগীজ সেনাপতি কার্ভালোর যুদ্ধবিগ্রহের কাহিনীর কথা ইতিহাসের ছাত্ররা জানেন। সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার কথা।

বাংলার ভুইঞারা পর্তুগীজদের সেনাপতির দায়িত্বপূর্ণ কাজে পর্যন্ত নিযুক্ত করতে দ্বিধাবোধ করেননি। তার কারণ, পর্তুগীজদের প্রতি তাঁদের বিশ্বাস যে গভীর ছিল তা নয়, যুদ্ধবিগ্রহে, বিশেষ করে নৌযুদ্ধে তাদের দক্ষতার কথা তাঁরা জানতেন এবং অনেক সময় সেটা নিজেদের সেনাবাহিনীর শিক্ষার জন্য, অথবা কোন স্বার্থসিদ্ধির জন্য, কাজে লাগাবার চেষ্টা করতেন। বাংলার এই প্রবল প্রতাপশালী ভূস্বামীদের আশ্রয়ে ও পোষকতায় বাকলায় (বাখরগঞ্জ), চাণ্ডিকানে (যশোহর), শ্রীপুরে (ঢাকা), ভুলুয়ায় (নোয়াখালী), পর্তুগীজদের ছোট ছোট বসতি ও উপনিবেশ ষোড়শ শতাব্দীর শেষদিক থেকে গড়ে উঠতে থাকে। তখন পূর্ববঙ্গের চট্টগ্রামই ছিল পর্তুগীজদের প্রধান বন্দর। ষোড়শ শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকেই দেখা যায়, পশ্চিমবঙ্গের সপ্তগ্রাম বন্দরে পর্তুগীজরা তাদের বাণিজ্যকুঠি, কাস্টমহাউস ইত্যাদি নির্মাণ করেছে। সপ্তগ্রামের পর হুগলী বন্দর গড়ে ওঠে এবং আকবর বাদশাহের ফর্মান পেয়ে পর্তুগীজরা সপ্তগ্রাম থেকে হুগলীতে তাদের কুঠি তুলে নিয়ে যায়। সম্রাট শাজাহান হুগলী থেকে পর্তুগীজদের উৎখাত করেন। তার পরেও পর্তুগীজরা বিচ্ছিন্ন সম্প্রদায়ের মতন এদেশে অনেকদিন ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতেও বাংলার দু'চারজন প্রভাবপ্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি পর্তুগীজদের নানাকাজে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছেন। মহিষাদলের রাজারা বর্গীর হাঙ্গামার সময় পর্তুগীজ গোলন্দাজদের নিয়ে এসে, নিষ্কর জমি দিয়ে মীরপুর গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। রাজা রাজবল্লভ, কলকাতার গবর্নর ড্রেকের ভাষায় যিনি—"the subtlest politician in the whole province" ছিলেন, তিনিও বাখরগঞ্জ জেলার শিবপুরে একটি পর্তুগীজ উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন।

বাংলা ভাষায় কয়েকটি শব্দ ছাড়া, বাংলার সংস্কৃতিতে পর্তুগীজদের বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থায়ী কোন দান আছে বলে মনে হয় না। ভারতবর্ষে প্রথম মুদ্রণযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা (গোয়াতে) তাদের দ্বারাই হয়েছিল, বাংলা ভাষায় রোমান হরফে প্রথম মুদ্রিত বই তাদের কীর্তি, এসব কথা ঠিক। কিন্তু তারা না করলেও, অন্য কেউ একাজ করত এবং মুদ্রণযন্ত্রের প্রতিষ্ঠাও হত ভারতবর্ষে ও বাংলাদেশে। কেবল এই টেকনিক্যাল কাজটুকুই সংস্কৃতিক্ষেত্রের স্থায়ী দান বলে কোন মতেই গ্রহণীয় হতে পারে না। পর্তুগীজদের কথা আমাদের

মনে থাকবে কয়েকটি বাংলা শব্দের জন্য। যেমন—ছবি, বালতি, পেরেক, সাবান, তোয়ালিয়া, আলপিন, জানালা, কেদারা ইত্যাদি। এ ছাড়া বাকি যা মনে থাকবে, তা হল পর্তুগীজ বোম্বেটেদের নিষ্ঠুরতার কথা, দাস-ব্যবসায়ের বর্বরতার কথা, লুণ্ঠন ও দস্যুবৃত্তির কথা। ষোড়শ, সপ্তদশ বা অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত কোন ইয়োরোপীয়ের সাদা চামড়ার অভিমান বা উন্নত সভ্যতার আভিজাত্য বলে কোন বোধ বিশেষ ছিল না। পর্তুগীজদের একেবারেই ছিল না। এদেশের সমাজের সঙ্গে তারা তাই স্বচ্ছন্দে মেলামেশা করেছে, এদেশের নারীদের বিবাহ করে ঘরসংসার করেছে। আজ তাদেরই বংশধর বাংলার কয়েকটি বিচ্ছিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে। তারা খৃস্টধর্মী, এই তাদের আজ প্রধান পরিচয়। পর্তুগীজদের বংশধর বলে কোন স্বতন্ত্র চেতনা তাদের নেই, থাকতেও পারে না। তবু একটি ব্যাপার, মীরপুর গ্রামে যাবার পথে এবং গ্রামে গিয়েও লক্ষ করেছি। কেমন একটা অজানা ভয় যেন গ্রামবাসীদের মনের কোণে কোথায় লুকিয়ে আছে—অহিন্দুদের বিরুদ্ধে কোন রাজনৈতিক বা সামাজিক আন্দোলন এদেশে কোনদিন হতে পারে কিনা এবং হলে তাঁরা কখনো বিপন্ন হবেন কিনা! আমরা যে গ্রামে গিয়েছিলাম, কোন বিশেষ অভিসন্ধি না নিয়ে, একথা প্রথমে যেন তাঁরা বিশ্বাস করতে চাননি। যে কোন কারণেই হোক, একটা অসহায়ের মতন মনোভাব তাঁদের মধ্যে লক্ষ করেছি। ভয়ের মূল যদি অহিন্দু-বিদ্বেষের কল্পনা হয়, তাহলে সেটা নিতান্তই ভিত্তিহীন বলে তাঁরা আজ অন্তত বর্জন করতে পারেন। তাঁদের আরও ভয়ের কারণ হল, তাঁরা অনেকেই মনে করেন যে, ইংরেজরা চলে যাবার পর, তাঁদের রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনের কথা, অর্থাৎ চাকরি-বাকরি বা জীবিকার্জনের পন্থাদির কথা, হয়ত জাতীয় সরকার তেমনভাবে চিন্তা করবেন না। এ ধারণা অবশ্য তাঁদের মনে বদ্ধমূল হয়ে নেই। তবু কোথায় একটা সন্দেহ যেন তাঁদের আছে। কিন্তু এও ভুল ধারণা। খৃস্টধর্মীরা কোনদিনই আমাদের দেশে যোগ্য সম্মান ও মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হননি। কেন হবেন? ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাসই হল বিভিন্ন ধর্মের সহবাস ও সমন্বয়ের ইতিহাস। বাংলা দেশেও খৃস্টধর্মীরা কোনদিন কোন বিদ্বেষের সম্মুখীন হয়েছেন বলে মনে হয় না। সাময়িকভাবে পরিবার ও সমাজের দিক থেকে কেউ কেউ হয়েছেন। কিন্তু সেটা একটা বিশেষ সামাজিক আন্দোলনের তরঙ্গের মুখে। বাঙালীর

মনে তা কখনও স্থায়ী বিদ্বেষের দাগ কাটতে পারেনি। রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত খৃস্টান হয়েছিলেন। কিন্তু জানি না, এমন কোন বাঙালী কেউ আছেন কি না যিনি তাঁদের খৃস্টধর্মের কথাটাই মনে করেন, বাঙালী ও বাংলার গৌরব বলে মনে করেন না! মীরপুরের পল্লী-বাসীদের কোন দ্বিধা ভয় বা সন্দেহের কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে বলে মনে হয় না। যে ধর্মই তাঁরা আচরণ করুন, বাংলাদেশে তাঁরা বাঙালী বলেই গণ্য হবেন এবং সব বাঙালীর মতন সমান মর্যাদা পাবেন সর্বক্ষেত্রে।

মেদিনীপুরের অন্যান্য গ্রামের মতনই মীরপুর সাধারণ গ্রাম। গ্রাম দেখলেই মনে হয়, কৃষকদের সাধারণ গ্রাম, কোন ধনী জমিদার বা বণিকের গ্রাম নয়। সাধারণ মাটির দেয়াল, খড় ও টালির চালের ছোট ছোট ঘর। মোটামুটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। দুটি ঘর গ্রামের মধ্যে সর্বাগ্রে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। শুনলাম, ঘর দুটি গ্রামের দুটি চার্চ বা গির্জা। দুটি ঘরই সাধারণ ঘর, একটির টিনের চালা, আর একটির টালির চালা। গ্রামের দুই সম্প্রদায়ের খৃস্টানদের জন্য দুটি গির্জা। একটি রোম্যান ক্যাথলিকদের, আর একটি প্রটেস্ট্যাণ্টদের।

গ্রামের ইতিহাস এই—রাজা আনন্দলাল উপাধ্যায় অথবা তাঁর পত্নী রানী জানকী দেবী পর্তুগীজ গোলন্দাজদের এনে এখানে বসতি স্থাপনের জন্য নিষ্কর ভূমি দান করেছিলেন। কোথা থেকে এই পর্তুগীজদের এখানে আনা হয়েছিল, সে কথা আজ মীরপুরবাসীরা কেউ জানেন না। কেউ কেউ বলেন, গোয়া থেকে আনা হয়েছিল। তা নাও হতে পারে। গোয়ানীজ সংস্কৃতির কোন চিহ্ন নেই কোথাও মীরপুরে। গির্জা ও খৃস্টান ধর্মাচরণের মধ্যেও যা আছে, তার সবটাই খাঁটি বাঙালী সংস্কৃতি এবং হিন্দু সংস্কৃতি। এমন কি, চেহারাতেও কোন বিদেশী পূর্বপুরুষের কোন ছাপ নেই কোথাও। দু-একজনের চেহারার মধ্যে হঠাৎ এই বায়োলজিকাল প্রমাণটি স্পষ্টভাবে পাওয়া যায়। সাদা ধবধবে রঙ, চুল কটা, শরীরের লোম কটা, চোখের তারা নীল—এরকম দু'তিনজনকে দেখেছি। বাকি সকলেই খাঁটি দেশের লোক, কোন বিদেশীত্বের চিহ্ন নেই কোথাও। থাকার কথাও নয়। কারণ মীরপুরের খৃস্টানদের সকলেরই যে পর্তুগীজ পূর্বপুরুষ ছিল, এমন কোন কথা নেই। পর্তুগীজরা গ্রামবাসীদের

খৃস্টধর্মে দীক্ষা দিয়েছিল। অনেক পরিবারের মধ্যে কোন পর্তুগীজ মিশ্রণ কোনদিনই সম্ভব হয়নি। তাঁরা বাঙালী খৃস্টান।

মীরপুর গ্রামটি দুটি মৌজায় বিভক্ত, বেতকুণ্ডু ও শুকলালপুর। প্রায় ৪০।৪৫টি খৃস্টান পরিবার এখানে বাস করেন। লোকসংখ্যা ২৫০ থেকে ৩০০র মধ্যে। হাওড়া, চব্বিশ পরগণা প্রভৃতি জেলায় এঁদের স্বজন ও সমাজের বাস আছে। সামাজিক আদান-প্রদান এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এঁদের আচার-ব্যবহার সংস্কার বিশ্বাস ইত্যাদির মধ্যে অনেক কৌতূহলোদ্দীপক বিষয় লক্ষ করা যায়।

মেদিনীপুরের আদিবাসী

আদিবাসীদের অনেক শাখা-প্রশাখা জাতি-উপজাতি মেদিনীপুর জেলার অধিবাসী। তাদের মধ্যে সাঁওতালরাই প্রধান। সাঁওতালদের পরে নাম করতে হয় লোধা, কোড়া, মহালীদের। ভূমিজদের সংখ্যাও যথেষ্ট। মুণ্ডাদের সংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার। লোধাদের সংখ্যা এখন প্রায় আট হাজার, আগে আরও বেশি ছিল, ক্রমেই কমে আসছে। অধিকাংশই সেই বৈদিক ঋষিদের বর্ণিত 'নিষাদ' ও 'শবর'দের বংশধর, অথবা 'দস্যুদের' বংশধর। কিরাতদের (ইণ্ডো-মোঙ্গলয়েড) কোন বংশধর পশ্চিমবঙ্গে নেই। 'নিষাদ' ও 'দস্যু'দের এইসব বিচ্ছিন্ন ও বিপর্যস্ত বংশধররা আজ দারিদ্র্যের চাপে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে বসেছে। প্রতিবেশী বিভিন্ন হিন্দুজাতির সঙ্গে দীর্ঘকাল ধরে পাশাপাশি বসবাস করে, এরা প্রায় সিকি-হিন্দু বা আধা-হিন্দু হয়ে গেছে আজ। সংস্কৃতি-বিজ্ঞানীর কাছে এরা তাই কৌতূহলের বস্তু। বিভিন্ন সংস্কৃতিধারার বা সাংস্কৃতিক উপাদানের মিলন-মিশ্রণ অনুশীলনে উৎসাহীদের পক্ষে মেদিনীপুর প্রশস্ত ক্ষেত্র।

ঝাড়গ্রাম ও কেশিয়াড়ী অঞ্চলে একাধিক গ্রামে আমরা ভ্রমণ করেছি। ঝাড়গ্রামের উত্তর থেকে দক্ষিণে, পূর্ব থেকে পশ্চিমে প্রায় প্রত্যেক উল্লেখযোগ্য গ্রামে গেছি। অনেক গ্রামে লোধা, কোড়া, মহালী, সাঁওতাল, ভূমিজ প্রভৃতি জাতির বাস আছে। শুধু লোধা বা কোড়া, মহালীদের বাস আছে, এরকম গ্রাম খুব অল্পই দেখা যায়। দাঁতন, নারায়ণগড় ও জামবনি থানায় কেবল লোধাদেরই গ্রাম এক-আধটি দেখা যায়। কিন্তু সংখ্যায় কম। লোধা, কোড়া বা মহালীরা মনে হয় সাঁওতালদেরই বিচ্ছিন্ন সব শাখা। অন্তত চেহারা দেখে তাই মনে হয়। কেবল চেহারা দেখে সূক্ষ্ম জাতবিচারের দিন চলে যাচ্ছে অবশ্য। 'বিশুদ্ধ' নৃবিজ্ঞানীরাও এবিষয়ে আজকাল ভিন্নমত পোষণ করছেন দেখা যায়। ভাল খেতে না পেলে এবং যৌনজীবনের কোন-রকম নৈতিক বাঁধ সমাজে না থাকলে, জাত-নিগ্রোও দু-একপুরুষের মধ্যে চোখের সামনে আর্মানয়েড বনে যেতে পারে। অনেকে বলেন (বিশুদ্ধ একাডেমিক নৃবিজ্ঞানীদের মধ্যে) যে আধুনিক সভ্যতার মাহাত্ম্যগুণে ক্রমেই নাকি আমাদের 'ডি-ক্যালসিনেশন্' হচ্ছে, অর্থাৎ ক্যাল্সিয়াম ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে এবং তার ফলে

হাড়গোড়ের গড়ন দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে। চওড়া হাড় বা চওড়া চোয়াল দু'এক পুরুষের মধ্যেই যদি শুকিয়ে চাম্‌সি হয়ে যায়, তাহলে মাপজোকের যন্ত্রপাতি নিয়ে জাত বিচার করে জাত বলা কি সহজ মনে করেন? ছিয়াত্তরের বা উনপঞ্চাশের মন্বন্তরের মতন কয়েকটা মন্বন্তর এলে, অথবা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ককাসয়েড ও নিগ্রয়েড সৈন্যদের দুর্নীতিপরায়ণতার জোয়ার দু-চারটে এলে, জাতিবিচারের 'ক্যালিপারী' মানদণ্ড কোথায় ভেসে যায় তার ঠিক নেই। এরকম কত মন্বন্তর, কত যুদ্ধবিগ্রহ, কত দুর্নীতির জোয়ার আমাদের এই মেদিনীপুরের হতভাগ্য ও অসহায় লোধা, কোড়া, মহালী বা সাঁওতালদের উপর দিয়ে যে বয়ে গেছে তার ঠিক নেই। সুতরাং চেহারার গড়ন বা আদল তাদের কিছুটা বদলানো খুব স্বাভাবিক। তথাকথিত 'উচ্চজাতির' চেহারাও এসব কারণে কম বদলায়নি। ক্যালিপারের মাপজোকে লোধা, কোড়া বা মহালীরা যে জাতিভুক্তই হোক না কেন, মনে হয় তারা নিষাদ জাতীয়। ভারতের প্রাচীন আদিবাসী নিষাদ ও শবরদের আধুনিক বংশধর তারা। নিকট সম্পর্ক মনে হয় তাদের সাঁওতালদের সঙ্গেই বেশি।

মহালীদের গোত্রগুলি যেমন, ঠিক সাঁওতালদের গোত্রের মতন। বাস্কে, সরেন, টুডু, হাঁসদা ইত্যাদি। বিভিন্ন গোত্রের বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য নিষিদ্ধ। বাঁশের ঝুড়ি বা বাস্কেট তৈরি করে জীবিকা অর্জন করাই হল মহালীদের প্রধান পেশা। এছাড়া দিনমজুরী তো আছেই। মহালীসমাজের মোড়লকে বলা হয় 'মাঝি'। যোগাযোগ রক্ষার জন্য আছে 'যোগমাঝি', পূজা-পরবের জন্য 'নায়কে'। জাহের এদের গ্রাম্য দেবতা, ঘরে বোঙ্গা-পূজাও হয়। মৃতের অস্থি দামোদরে ভাসানোর রীতিও আছে। এসব হল সাঁওতালী সংস্কৃতির উপাদান। সাদৃশ্য অস্বীকার করা যায় না। সুতরাং সামান্য বৈশিষ্ট্য থাকলেও মহালীরা যে সাঁওতালদেরই একটি বিচ্ছিন্ন শাখা, তাতে সন্দেহের বিশেষ কারণ নেই। উন্নত পেশা বা জীবিকা যারা গ্রহণ করল না (যেমন চাষবাস ইত্যাদি) এবং কোন কারণে পঞ্চায়েতের বিচারে একঘরে হয়ে গেল, এরকম কোন শাখা হয়ত পরবর্তীকালে বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করছে। মহালীদের দেখে তাই মনে হয়, মূল সাঁওতালী পরিবার থেকে তারা বিচ্ছিন্ন।

কোড়ারাও এইরকম একটি বিচ্ছিন্ন শাখা বলে মনে হয়। হয়ত মহালীদের আরও অনেক আগে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। আজও এরা ভালরকম চাষবাস

করতে জানে না। খড়কুটো দিয়ে গোলাকার গৃহ তৈরি করে। এই ধরনের গোলাকার গৃহ মানুষের আদিমতম গৃহের নিদর্শনের মধ্যে অন্যতম। মানুষ যখন প্রথম ঘর বাঁধতে শেখে তখন থেকে এর উৎপত্তি। আন্দামানের আদিবাসীদের মধ্যে এবং হায়দরাবাদের চেনচুরদের মধ্যে এই ধরনের গোলাকার ঘর বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কোন্ আদিযুগে এই গোলাকার গৃহের গড়নটি এদেশে প্রচলিত হয়েছিল তা আজ আর সঠিক বলবার উপায় নেই। কোড়ারা অনেকটা হিন্দুভাবাপন্ন হয়ে গেলেও আজও যে তাদের অনেকে এই ধরনের ঘর তৈরী করে, এইটাই উল্লেখযোগ্য। কোড়ারা যে কুদ্রা পূজা করে তাও সাঁওতালদের অন্যতম দেবতা। সাংস্কৃতিক সাদৃশ্য সাঁওতালদের সঙ্গে এখনও যথেষ্ট আছে। 'কোড়া' কথার অর্থ হল—যারা মাটি কাটে। মহালীদের মতন, এও মনে হয় এক অনুন্নত পেশাগত বিচ্ছিন্ন উপজাতি। মূল সাঁওতালী সমাজ থেকে ক্রমে পৃথক হয়ে গিয়েছে।

লোধাদের ইংরেজরা 'জন্ম-দাগী' বা 'স্বভাবদুর্বৃত্ত' (criminal tribe) বলে চিহ্নিত করে গেছেন এবং আজও তারা সেইভাবে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে। দুর্বৃত্তের রাজচিহ্ন ললাটে এঁকে অভিশপ্ত ও উপেক্ষিত জীবন যাপন করে আজ তারা প্রায় নিশ্চিহ্ন হতে বসেছে। সভ্যসমাজের এই বিচারে পাগলেরও হাসি পাবে। যত নগণ্যই হোক, মানবসমাজের যে কোন একটা অংশকে যখন বর্তমান যুগের তথাকথিত 'সভ্যসমাজ' স্বভাবদুর্বৃত্ত বলে চিহ্নিত করেন তখন যে কারও মনে প্রশ্ন জাগে, দুর্বৃত্তের সংখ্যা 'সভ্যসমাজে' কি কম? মাথা গুণলে অনুন্নত সমাজের তুলনায় অনেক বেশি হবে। তাহলে অসহায় একটা উপজাতিকে এইভাবে চিহ্নিত করার কারণ কি? কারণ রাজনৈতিক, এবং এক সময় ইংরেজদের সেই কারণ যথেষ্ট ছিল। জঙ্গলমহলের ইতিবৃত্ত (ইংরেজ আমলের) যাঁরা জানেন, তাঁরা নিশ্চয় ভুলে যাননি যে এই জঙ্গলমহলেই ইংরেজদের উপদ্রবে ও অত্যাচারের তাণ্ডবে এক সময় বিদ্রোহের আগুন জলে উঠেছিল। সেদিন ইংরেজের বিরুদ্ধে প্রথম যারা এদেশে বিদ্রোহ করেছিল তারা এই জঙ্গলমহলের নানা জাতি-উপজাতি। বংশানুক্রমিক অধিকার থেকে জঙ্গলমহলের বাসিন্দাদের ইংরেজরা যখন উৎখাত করেন, তাদের জমি-জমা জীবিকা-পেশা সব কেড়ে নেন, তখন সারা জঙ্গলমহলে আগুন জলে ওঠে। সেই বিদ্রোহ দাবাতে জঙ্গলের অসহায় ধনুর্বাণধারীদের

লক্ষ করে সেদিন 'বীরপুরুষ' ইংরেজদের অনেক কামান দাগতে হয়েছিল, অনেকদিন ধরে। পুরুষানুক্রমিক পেশা ও জীবিকা থেকে উৎখাত যারা হল নির্মমভাবে, তারা কি করবে? কোথায় যাবে? কোন ভদ্র বৃত্তি গ্রহণ করে জীবনধারণের সুযোগ তাদের কোন ভদ্র শাসকই দেননি। অতএব দুর্বৃত্ত ও ডাকাত হওয়া ছাড়া তাদের আর গত্যন্তর ছিল না। এই দুর্বৃত্ত ও ডাকাত শুধু লোধারাই হয়নি। আরও অনেক জাতি-উপজাতির লোক হয়েছিল। হুগলী, মেদিনীপুর ও নদীয়া এক সময় 'ডাকাতের দলে' ছেয়ে গিয়েছিল। সেইসব ডাকাতের দলের কথা, বা বাংলার ডাকাতের সর্দারদের কথা রবিনহুডের মতন কেউ লিখে যাননি। শুধু 'ডাকাত' বললেই তাদের সম্বন্ধে সব কথা বলা হয় না, সমাজবিচ্ছিন্ন বিদ্রোহী (uprooted rebels) তারা। লোধাদেরও তাই বলতে হয়, যদি একান্ত 'দুর্বৃত্ত' আখ্যাতেই বিশেষিত করতে হয় তাদের।

লোধাদের মধ্যে দুর্বৃত্ত থাকতে পারে, সব জাতির মধ্যেই আছে। তাই বলে 'স্বভাবদুর্বৃত্ত' কোন জাতিই নয়, লোধারাও নয়। দুর্বৃত্তিপ্রবণ সমাজের বিকৃত মনোবিজ্ঞানের বিচার কখনই বৈজ্ঞানিক নয়। লোধারা নিজেদের বিখ্যাত আদিমজাতি শবরদের বংশধর বলে মনে করে এবং তার জন্য গর্ববোধ করে। যখনই কোন লোধার সঙ্গে কথা বলেছি তখনই তাদের গর্বিত হয়ে বলতে শুনেছি—'আমরা শবর। এসব জঙ্গল আমাদের ছিল, কেড়ে নিয়েছে আমাদের কাছ থেকে।' সত্যই তো তাই! জঙ্গলে নিশ্চয় ভদ্রলোকরা বাস করতেন না। নিষাদ শবররাই বাস করত। বনে-জঙ্গলে শিকার করা, ফল-মূল সংগ্রহ করাই ছিল তাদের পেশা। লোধাদেরও সেই পেশা ছিল, তাই তাদের 'লোধা' বা শিকারী (সংস্কৃত 'লুব্ধক' কথা থেকে 'লোধা' বা শিকারী) বলা হয়। বনের ফল-মূল-মধু সংগ্রহ করা, শিকার করা, মাছ ধরা, আজও এদের প্রধান কাজ। বহড়া হরীতকী ইন্দ্রযব প্রভৃতি জঙ্গল থেকে সংগ্রহ করে বিক্রী করত এরা। এসব থেকে ওষুধ হয়, চিকিৎসা করা যায়। লোধারা তাই কবিরাজীও করত নিজেদের মধ্যে। করাই স্বাভাবিক। সাঁওতালদের বিরাট একটি আয়ুর্বেদশাস্ত্র রেভারেণ্ড বডিং (Rev. Bodding : Santal Medicine) দীর্ঘকাল ধরে গবেষণা করে সঙ্কলন করে গেছেন। লোধারাও এই রকম গাছপালার শিকড় দিয়ে অনেক দাওয়াই তৈরি করতে

পারে। সাপের চামড়া, কচ্ছপ ইত্যাদি বিক্রী করাও এদের ব্যাবসা। সাপ ধরতে লোধারা ওস্তাদ। লোধাদের মধ্যে প্রচলিত উপাধিগুলিও বিশেষ লক্ষণীয়। যেমন—নায়েক, মল্লিক, দিগর, সর্দার, ভোক্তা, কোটাল, দণ্ডপাঠ, ভূঞা ইত্যাদি। এসব উপাধি সামাজিক বৃত্তি ও পদমর্যাদাগত। স্থানীয় সামন্তদের দেওয়া উপাধি। যারা নায়েক ছিল, যারা দিগর ছিল, যারা সর্দার ছিল, যারা দণ্ডপাঠ ছিল, তারা দুর্বৃত্ত হল কি করে, বিশেষ করে 'স্বভাবদুর্বৃত্ত'? স্বভাবদুর্বৃত্ত যারা তারা কোন সমাজ-ব্যবস্থাতেই এই ধরনের দায়িত্বপূর্ণ পদ পেতে পারে না। লোধারা যে জাতিগতভাবে দুর্বৃত্ত ছিল না কোনদিন তা তাদের এই সব উপাধির ভিতর থেকেই আজও বোঝা যায়।

লোধাদের গোত্র আছে, সমাজ আছে, সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান ক্রিয়াকর্মও আছে। সমাজের মোড়লকে বলা হয় 'মুখিয়া'। 'মুখ্য' কথা থেকে মুখিয়া হয়েছে। এদের নিজেদের কথা নয়, ধার করা কথা। যে সংবাদবাহক বা ডাকাডাকির কাজ করে, তাকে বলে 'ডাকুয়া'। 'দেহেরী' ও তার সহকারী 'টলিয়া' আছে পূজার্চনার জন্য। 'গুণ্‌ণী' বা 'গুণিন্‌' আছে ঝাড়ফুঁক করার জন্য। শবরের বংশধর বলে পরিচয় দেয় যারা, তাদের মধ্যে শবরীবিদ্যার (witchcraft) প্রচলন তো থাকবেই। লোধাদের গোত্র আছে, টোটেমও আছে। সগোত্রে বিবাহ হয় না। বাঘ, শালমাছ, ফড়িং ইত্যাদি টোটেমের মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম অঞ্চল, সিংভূম, মানভূম ও বাঁকুড়া জেলার অনেকটা অংশ নিয়ে মনে হয় যেন স্বতন্ত্র একটি সংস্কৃতি-কেন্দ্র গড়ে উঠেছে পশ্চিমবঙ্গে। প্রাগার্য সংস্কৃতির উপাদানেব সঙ্গে বৌদ্ধ, জৈন ও হিন্দু সংস্কৃতির মিলন-মিশ্রণে এক বিচিত্র সাংস্কৃতিক পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে এই অঞ্চলে। যে কোন অনুসন্ধানী এই সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণের নিদর্শন দেখলে চমৎকৃত হবেন। এই বিশিষ্ট সংস্কৃতি-কেন্দ্রের (Culture-zone) বিস্তৃতিও কম নয়। সিংভূমের সীমান্ত থেকে বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর মহকুমার প্রান্ত ছাড়িয়ে হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমা পর্যন্ত এই কেন্দ্রের সীমানা টানা যায়। আদিবাসী-প্রধান এই অঞ্চলে প্রায় সর্বত্র পূজা-পার্বণ, আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতির যে বিচিত্র

সাদৃশ্য দেখা যায়, তা পশ্চিমবঙ্গের অন্যত্র দুর্লভ। এখানকার লোকসংস্কৃতির সমস্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে তার ঐক্যটাই ফুটে ওঠে বেশি।

সাঁওতাল, লোধা, মহালী, কোড়া, ভূমিজ, বাউড়ী, বাগদী প্রধানত এই সব জাতির পূজা-পার্বণ, আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদির মধ্যে অদ্ভুত সাদৃশ্য দেখা যায়। সামান্য পার্থক্য কোথাও কোথাও লক্ষিত হলেও, সেই পার্থক্যটা খুব বড় নয়, সাদৃশ্যটাই বড় কথা। বোঝা যায় যে, পার্থক্যটা পরবর্তী অর্জিত বিশেষত্ব, অন্যের কাছ থেকে গ্রহণ করা। সেই ভৈরব ও ভৈরবীর পূজা, বড়ম্ পূজা চণ্ডী পূজা, কুদ্রা পূজা, শীতলা ও মনসার পূজা, বিচিত্র সব নামে বনদেবীর পূজা এবং পূজা উপলক্ষ্যে একই রকমের সব আচার-অনুষ্ঠান। যেমন, দেবস্থানে সেই সব পোড়ামাটির হাতি-ঘোড়ার সমাবেশ, নানাকারের, নানাগড়নের। বিষ্ণুপুরের পাঁচমুড়োর ফাঁপা হাতি-ঘোড়ার প্রচলন অনেকটা এলাকা জুড়ে, হুগলীর আরামবাগ ও মেদিনীপুরের ঘাটাল পর্যন্ত। গড়বেতা অঞ্চলে তো বিষ্ণুপুরের প্রভাব খুব বেশি। ঝাড়গ্রাম অঞ্চলে মাটির হাতি-ঘোড়ার আর এক ধরনের গড়ন ও রূপ দেখলাম। ঠিক পাঁচমুড়োর মতন নয়। কতকটা নিরেট হাতি-ঘোড়ার মতন দেখতে। আয়তন বিপুল হলেও গড়ন বেশ বলিষ্ঠ ও ঋজু। নরমভাব একেবারে নেই, 'স্টিফ্' বা কাঠিন্যভাব বেশি। সারা ঝাড়গ্রাম অঞ্চলে প্রধানত এই ধরনের হাতি-ঘোড়ারই প্রচলন বেশি। উৎসবের টানে ও প্রভাবে পাঁচমুড়োর হাতি-ঘোড়ার বা মনসার বারির যেমন বাণিজ্যিক প্রসার সম্ভব হয়েছে, ঝাড়গ্রাম অঞ্চলে তেমন হয়নি। স্থানীয় কুম্ভকাররা স্থানীয় বাসিন্দাদের চাহিদা অনুযায়ী হাতি-ঘোড়া ইত্যাদি তৈরি করে এবং এক স্থান থেকে অন্য স্থানে তাই গড়নের তারতম্যও হয়। এই হাতি-ঘোড়াই হল এ-অঞ্চলের দেবস্থানের সবচেয়ে বড় নিদর্শন। দুপাশের গভীর শালবনের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ দেখা যায় কোন গাছতলায় এই হাতি-ঘোড়ার সমাবেশ। বোঝা যায় দেবস্থান, বলে দিতে হয় না। জিজ্ঞাসা করলে জানা যায়, হয় বড়ম্ না হয় কুদ্রা, না হয় ভৈরব ভৈরবী, না হয় খেদারাণী কি রঙ্কিনী দেবী, অথবা চণ্ডী। দেবদেবী যেই হন না কেন, মাটির হাতি-ঘোড়াই তাঁর প্রধান পরিচয়।

কোথা থেকে এই হাতি-ঘোড়ার এরকম বিচিত্র আমদানি হল এবং কি কারণে হল তার কোন উত্তর এখন আর জিজ্ঞাসা করলে পাওয়া

যায় না। শুধু শোনা যায়, মানত করলে দিতে হয়। কিন্তু মানত তো আরও অনেক জিনিস করা যায়! তবে এই মাটির হাতি-ঘোড়া কেন? কৌতূহল জাগে আরও বেশি যখন দেখা যায় এই হাতি-ঘোড়ার মধ্যে হাতি ধীরে ধীরে দু'একটি বিশেষ দেবস্থানে অন্তর্ধান করে গেল এবং কেবল ঘোড়া রইল নিঃসঙ্গ। যেমন পীর ও ধর্মঠাকুরের কাছে। পশ্চিম-বঙ্গের প্রত্যেক পীরস্থানে মাটির ঘোড়া স্তূপাকার হয়ে জমে আছে দেখা যায়, কিন্তু হাতি নেই। ধর্মঠাকুরের কাছেও তাই দেখা যায়। বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুরের ঘাটাল অঞ্চল, হুগলী, হাওড়া প্রভৃতি অঞ্চলে প্রত্যেক ধর্মঠাকুরের স্থানে দেখা যায়, মাটির ঘোড়া স্তূপীকৃত হয়ে জমে আছে। কিন্তু হাতি নেই কোথাও। তা ছাড়া, পীরস্থানে ও ধর্মস্থানে ঘোড়ার আকারের সামান্য ইতরবিশেষ থাকলেও, সাধারণত ছোট ছোট ঘোড়াই বেশি দেখা যায়। তাই বা কেন? এ প্রশ্নের উত্তর জানা প্রয়োজন, অন্তত উত্তর অনুসন্ধান করা উচিত। হাতি ঘোড়া থেকে ক্রমে দুটি দেবস্থানে ঘোড়ার প্রাধান্য কেন বাড়ল, প্রশ্ন জাগতে পারে মনে। একটা উত্তর এই প্রসঙ্গে মনে আসে, যা নিয়ে চিন্তা করা যেতে পারে। পীরস্থান ও ধর্মস্থান অনেক পরে গড়ে উঠেছে। তার আগে পশ্চিমবঙ্গের এই সীমান্ত জুড়ে যখন বিস্তৃত অরণ্য পশ্চিম থেকে পূর্ব প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, তখন সেই অরণ্যের বাসিন্দারা নানারকমের বনদেবতার পূজার্চনা করত। বাঘ, হাতি, ভাল্লুক প্রভৃতি বন্য জন্তুদের বনদেবতার অনুচর বা বাহন মনে করত তারা। এখনও লোধাদের গ্রামদেবতা বড়াম্ (বা গরাম্) বাঘ বা হাতির পিঠে চড়ে সর্বত্র ঘুরে বেড়ান বলে তারা কল্পনা করে। বড়াম্ প্রীত না হলে, বা ক্ষেপে গেলে গ্রামে বাঘের দৌরাত্ম্য বাড়ে, এও তাদের বিশ্বাস। তাই বড়াম্‌কে তারা পূজার্চনা করে। মুর্গী পায়রা বলিদান দিয়ে সন্তুষ্ট করতে হয়। তেমনি কুদ্রা ও চণ্ডীকেও করতে হয়। লোধাদের মধ্যে চণ্ডীপূজার যথেষ্ট প্রচলন আছে। সাধারণত দেখা যায়, চণ্ডীদেবী ঝোপে-ঝাড়ে বনে-জঙ্গলেই থাকেন। স্থানীয় প্রতিপত্তি বৃদ্ধির জন্যে চণ্ডীর মন্দিরও তৈরি হয়েছে কয়েক স্থানে, কিন্তু চণ্ডী এখনও প্রধানত বনদেবী। লোধাগ্রামে যে দেবস্থান (ঝাড়ো বা থান) দেখা যায়, তা প্রধানত শীতলাদেবীর। শীতলার প্রাধান্য কাঁথি, নন্দীগ্রাম, তমলুক, ঘাটাল অঞ্চলে বেশি, অত্যধিক বললেও ভুল হয় না। শীতলার উৎসবই এ সব

অঞ্চলের প্রধান গ্রাম্য উৎসব। পরিপার্শ্বের এই প্রচণ্ড শীতলার প্রতিপত্তি হয়ত লোধাদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করেছে। না করাই অস্বাভাবিক। কিন্তু চণ্ডী, বড়াম্ বা গরাম্, ভৈরব-ভৈরবী, এই সবই হল লোধাদের আসল দেবতা, তাই কিছুটা বন্য পরিবেশের এখনও প্রয়োজন হয় তাদের স্থাননির্বাচনে। শালগাছ, তালগাছ বা ঝোপঝাড়ের তলায় চণ্ডীদেবী বিরাজ করেন। কোন মূর্তি নেই তাঁর। ঐ বড় বড় মাটির হাতি-ঘোড়া তাঁর স্থান নির্দেশ করে। বেশ বোঝা যায়, বনের হাতি বাঘ ভাল্লুক প্রভৃতি জন্তু-জানোয়ার, যারা একদিন অরণ্যবাসীদের জীবনে ত্রাসের সঞ্চার করত, তারাই বনদেবতার পূজার স্থানে দেবতার সঙ্গে একত্রে পূজিত হত। ঝাড়গ্রাম ও জঙ্গলমহলের জঙ্গলে এই সব বন্য জন্তুর উপদ্রব এক সময় কম ছিল না। বন্য হাতি এখনও ময়ূরভঞ্জের জঙ্গল থেকে ঝাড়গ্রাম পর্যন্ত আসে, একশ বছর আগে বীরভূমের গ্রাম পর্যন্ত নেমে আসত দল বেঁধে। দেবস্থানে হাতি থাকা এবং বন্য হাতির পুজো একদা প্রচলিত থাকা তাই অসম্ভব নয়। বাঘ ভাল্লুক তৈরি করা আরও কঠিন বলে হয়ত ক্রমে মৃৎশিল্পীরা ছেড়ে দিয়েছেন। যা সহজে তৈরি করা যায়, তাই চালু রয়েছে। ঘোড়ার আমদানি হয়ত পরে হয়েছে, মনে হয় মুসলমান আমলে। যদিও মধ্যভারতের কোন কোন আদিবাসীরা আজও ঘোড়াপূজা করে। তাহলেও বন্য ঘোড়া এ অঞ্চলের জীব নয়। তাই মনে হয়, ঘোড়া পরবর্তীকালের আমদানি। মুসলমান আমল থেকেই হয়ত হাতির পাশে ঘোড়া এসে দাঁড়িয়েছে এবং বাঘের চেয়ে ঘোড়া তৈরি (পটুয়া পদ্ধাততে) সহজ বলে ক্রমে ঘোড়াই হাতির সঙ্গী হয়েছে। অন্তত এরকম একটা কিছু অনুমান করতে খুব বেশি আপত্তি থাকার কারণ নেই। পীর-স্থানে ও ধর্মঠাকুরের স্থানে, ঐতিহাসিককালের দিক থেকে মনে হয় প্রায় একই সময়ে, ঘোড়ার প্রচলন হয়েছে। আদিবাসীদের আরণ্যক পরিবেশ ও প্রাধান্য-কেন্দ্র থেকে দেবস্থান যত দূর সরে গেছে, অন্যান্য জাতির লোকের মধ্যে গৃহীত হয়েছে, তত আরণ্যক অনুষ্ঠানের অন্যতম নিদর্শন মাটির হাতির পুতুলও বর্জিত হয়েছে দেখা যায়। পীরস্থান ও ধর্মঠাকুরের স্থান বা পরিবেশ ঠিক বন্য পরিবেশ নয়। প্রধানত বনবাসীদের দেবস্থান বা পূজ্য দেবতা নয়। তাই হাতির মূর্তি কোথাও দেখা যায় না। ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাসে হাতির উত্তরাধিকারী যেমন ঘোড়া, তেমনি এ-অঞ্চলের দেবস্থানের ইতিহাসেও তাই।

ধর্মঠাকুরের পাশাপাশি যেখানে বড়াম্‌, চণ্ডী, ভৈরব ইত্যাদি একই গ্রামে বিরাজ করেন, সেখানেও দেখেছি বড়াম-চণ্ডী-ভৈরবের স্থানে ঘোড়ার সঙ্গে সব বড় বড় হাতি রয়েছে, কিন্তু ধর্মঠাকুরের স্থানে ভুলেও একটি হাতি দেয়নি কেউ। কদাচিৎ ছোট হাতি দু চারটে দেখেছি কোথাও ধর্মস্থানে এসে পড়েছে, কিন্তু সেটা ব্যতিক্রম। প্রচলন বা প্রথা হল ঘোড়া দেওয়া। যেমন পীরস্থানে, তেমনি ধর্মঠাকুরের স্থানে। দক্ষিণ-পশ্চিমে সিংভূম ঝাড়গ্রামের প্রান্ত থেকে ক্রমে উত্তরে বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুর, বর্ধমানের আসানসোল মহকুমা ও বীরভূমের দিকে এবং পুবে সদর মেদিনীপুর, ঘাটাল, জাহানাবাদ বা আরামবাগ, বর্ধমান ইত্যাদি অঞ্চলে অগ্রসর হলে দেখা যায় দক্ষিণ-পশ্চিমের দিকে ধর্মঠাকুর ক্রমে বিলীন হয়ে গিয়েছে এবং উত্তর ও পূর্বদিকে ক্রমে ধর্মনিরঞ্জনের প্রতিপত্তি বেড়েছে। একদিকে বড়াম্‌ চণ্ডী কুদ্রা বনদেবতা ইত্যাদির উৎসব, আর একদিকে ধর্মঠাকুরের উৎসব, এই দুয়ের সঙ্গম হয়েছে চারটি জেলার সঙ্গম-স্থলে। মেদিনীপুরের ঘাটাল মহকুমা, বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর মহকুমা, দক্ষিণ বর্ধমান ও হুগলীর আরামবাগ মহকুমা হল এই সঙ্গমস্থল। বাংলার সংস্কৃতির ইতিহাসে এই সঙ্গমস্থলের গুরুত্ব যে কত বেশি তা বলা যায় না।

মেদিনীপুরের আদিবাসীদের মধ্যে সাঁওতালদের বিভিন্ন পরবের নৃত্যগীত উৎসবের বৈচিত্র্যই সবচেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য। এখানে তার বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়। সাঁওতালী উৎসবের ধারাই লোধা, কোড়া, মহালী প্রভৃতি-দের মধ্যে কমবেশি প্রচলিত। এত দুঃখকষ্টের মধ্যে এদের উৎসবের প্রাণপ্রাচুর্য ও বৈচিত্র্য দেখে মনে হয়, এমন এক সময় ছিল যখন এদের জীবন-সংগ্রাম এরকম কঠিন হয়নি এবং সমাজের রঙ্গমঞ্চে শ্রেণীস্বার্থ-সচেতন সুচতুর শোষকরা এসে এদের জীবন এমন দুর্বিষহ করে তোলেনি। তখন তারা খেয়ে-দেয়ে নিশ্চিন্তে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করত। উৎসবের বৈচিত্র্য তখনকার সৃষ্টি। সাঁওতালী উৎসবের মধ্যে সবচেয়ে বড় উৎসব হলে কতরকমের নাচ আর গান হয় যে, তাদের সবিস্তার বর্ণনা অসম্ভব। সারা ঝাড়গ্রাম অঞ্চল উৎসবের নাচ-গানে মুখর হয়ে ওঠে। কেঁদরী (একতারা), বাঁশের বাঁশি, শিঙা (মহিষ ও শম্বরের শিঙের তৈয়ারী), ভাঁউটিয়া (হরিণের শিঙের), টামাক (লোহার খোল, কড়া চামড়ার ছাওয়া), তুমদা (মাটির খোল, ছাগলের চামড়ায় ছাওয়া) ইত্যাদি বাজিয়ে, লাঁগড়ে গুলুরারী, পাকদন, লাউড়িয়া ইত্যাদি নৃত্য করে তারা

উৎসব জমিয়ে তোলে। কয়েকটি নাচ ছাড়া, প্রায় সব নাচেই ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে নাচে। সারাদিন সারারাত ধরে নাচ-গান চলতে থাকে। লোধারা উৎসব-পার্বণের সময় চাঙল বা চেঙ্গাইল বাজায়। চাঙল হল একরকমের বিশাল খঞ্জনী বিশেষ। চাঙল বাজিয়ে নাচতে নাচতে উন্মত্ত অবস্থায় ভূতপ্রেতের ভর হয় নাচিয়ের উপর। মাথা দুলিয়ে চাঙল বাজাতে বাজাতে অজ্ঞান হয়ে যায় এবং গ্রাম ও ব্যক্তি সম্বন্ধে নানারকম ভবিষ্যদ্বাণী করতে থাকে। যে করে তাকে 'ব্যাকড়া' বলে। বারমেসে গানের মতন ধুয়া তুলে গান করা হয়। মহালীদের অনেক পরবের মধ্যে বাহা পরব উল্লেখযোগ্য। সাঁওতালদের সঙ্গে পরবের নাচ-গানের সাদৃশ্য দেখা যায়। মোটামুটি বলা যায়, মেদিনীপুরের আদিবাসীদের মধ্যে যত রকমের উৎসব-পার্বণ দেখা যায়, তার মধ্যে কিছু কিছু স্বাতন্ত্র্য থাকলেও, প্রধানত সবই প্রায় সাঁওতালী উৎসবের ছাঁচে ঢালা। সাদৃশ্যটা এত বেশি নজরে পড়ে যে, স্বাতন্ত্র্যটা তার সামনে নগণ্য রূপ ধারণ করে। বাংলার লোক-সংস্কৃতির বড় বুনিয়াদী তৈরি হয়েছে এই সব উৎসব-পার্বণ দিয়ে এবং তার মধ্যে সাঁওতালী উৎসবই প্রধান।
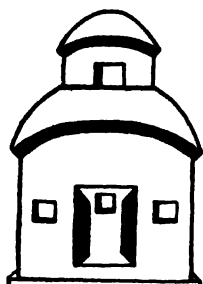
হুগলী হাওড়া

গুপ্তিপাড়া

হুগলী জেলার গঙ্গার পশ্চিমতীরবর্তী স্থানগুলির মধ্যে গুপ্তিপাড়া, সোমড়া, শ্রীপুর, বলাগড়, জীরাট প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ও প্রাচীন গ্রাম। প্রসিদ্ধির অন্যতম কারণ হল, রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যপ্রধান এই সব গ্রাম একসময় মধ্যযুগের বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতিক্ষেত্রে প্রবল আধিপত্য বিস্তার করেছিল। পরবর্তী-কালে বৃটিশযুগেও দেখা যায়, এই সব গ্রামের ব্রাহ্মণ বৈদ্যাদি বংশের সন্তানরা অনেকে সেই ধারা অব্যাহত রেখে অগ্রসর হয়েছেন। তারপর তাঁদের সমৃদ্ধির ইতিহাস অতীতের রোমান্টিক কাহিনীতে পর্যবসিত হয়েছে এবং অনেকের বংশধারা পর্যন্ত লুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু তা হলেও, বাংলার ইতিহাসের একটা বিরাট পর্বের উত্থান-পতনের ধারা গঙ্গার পশ্চিমতীরস্থ এই গ্রামগুলিতে দেখা যায়। সেই ধারার সঙ্গে গঙ্গার ভাঙাগড়ার সম্পর্ক এত প্রত্যক্ষ যে প্রাচীনতার ধারাবাহিক নিদর্শন খুব বেশি এই সব অঞ্চলে দেখা যায় না। প্রাচীনতাও খুব বেশি নয়। মনে হয়, গঙ্গার প্রাচীন খাতের উপরেই এই সব জনপদ গড়ে উঠেছে, জঙ্গল হাসিল করে। ক্রমে পশ্চিম থেকে পূর্বে গঙ্গার প্রবাহ পরিবর্তনের ফলেই তা সম্ভব হয়েছে। খুব বেশি হলে, পাঁচ-ছ শ বছর আগেকার কথা।

গুপ্তিপাড়ার উত্তরেই অম্বিকা-কালনা। ভাগীরথীর প্রবাহ কালনার পরেই হঠাৎ দেখা যায় পুবদিকে অনেকটা বাঁক ঘুরে, উপদ্বীপের মতন গুপ্তিপাড়াকে বেড় দিয়ে, পশ্চিমে বেঁকে সোমড়ার কোল দিয়ে, আবার পুবে, বলাগড় ও জীরাটের কোল থেকে দূরে সরে গেছে। গুপ্তিপাড়া থেকে

হুগলী ও হাওড়া জেলা
রেলপথ
রাস্তা-পাকা
কাঁচা
আরামবাগ
গোঘাট
পুড়শুড়া
খানাকুল
ঘাটাল
পাণ্ডুয়া
মহানাদ
সপ্তগ্রাম
হুগলী
চুঁচুড়া
ত্রিবেণী
সিঙ্গুর
শ্রীরামপুর
বারাকপুর
গড়ভবানীপুর
ছোটকলিকাতা ও রসপুর
জয়পুর
আমতা
হাওড়া
কলিকাতা
বাউড়িয়া
উলুবেড়িয়া
পাঁশকুড়া
তমলুক
ডায়মণ্ডহারবার
হুগলী নদী

খামারগাছির মধ্যে ভাগীরথীর এই দোদুল্যমান গতিধারা গত কয়েকশত বছরের অনেক ভাঙাগড়ার সাক্ষী দিচ্ছে। স্ট্যাভোরিনাসের মানচিত্রে দেখা যায় (আনুমানিক ১৪৭০ খৃস্টাব্দের) গুপ্তিপাড়া গঙ্গার পূর্বতীরে। মানচিত্রে যদি ভুল ইঙ্গিত না করা হয়ে থাকে (নির্ভুল যে হবেই এমন কোন কথা নেই), তাহলে বুঝতে হবে যে, দশ বছর আগেও নদীর গতি পরিবর্তনের ফলে গুপ্তিপাড়ার ভৌগোলিক অবস্থান্তর ঘটেছে। তার আগে আরও ঘটেছে মনে হয়।

ইতিহাসের কোন দলিল-দস্তাবেজে গুপ্তপল্লীর বা গুপ্তিপাড়ার সুপ্রাচীন অস্তিত্বের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। গুপ্তপল্লী নাম সম্বন্ধে মনে হয়, গুপ্ত বৃন্দাবনতুল্য স্থানের চেয়ে, বৈদ্যপ্রধান স্থান বলেই এই নাম হওয়া বেশি সম্ভবপর। আমার মনে হয়, ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যাচার্যদের গুপ্ত তন্ত্রসাধনার অন্যতম কেন্দ্র বলে 'গুপ্তপল্লী' নাম খ্যাত হয়েছে। বৈদ্য ও ব্রাহ্মণপ্রধান স্থান গুপ্তিপাড়া। কতদিন আগে এই ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যরা এসে গুপ্তিপাড়ায় বসতি স্থাপন করেছিলেন? গুপ্তিপাড়া যখন গঙ্গার গর্ভোত্থিত চর ও জঙ্গল ছিল তখনকার অধিবাসী নিশ্চয় তাঁরা ছিলেন না। মৎস্যজীবী ও মাঝিমাল্লা প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বাস ছিল হয়ত তখন। গোপদের বাস থাকাও সম্ভবপর। আজও গুপ্তিপাড়ার ভড়দের প্রধান পেশা নৌকা বওয়া ও গঙ্গায় মাছ ধরা। একসময় তাদের সংখ্যাও যথেষ্ট ছিল। গোপদেরও বাস আছে গুপ্তিপাড়ায়। অনেকে বলেন, গঙ্গার চরের আদিবাসিন্দা ছিলেন মুসলমানরা। স্থানীয় মুসলমানদেরও বিশ্বাস যে আগে তাঁরা এবং পরে বৈদ্য ও অন্যান্যরা গুপ্তিপাড়ায় এসেছেন। মৌজা ও পাড়ার মুসলমানী নামের মধ্যে তার আভাস পাওয়া যায়, যেমন মৌজা সুলতানপুর, মীরডাঙ্গা, ফতেপুর বা পাঠানপাড়া, মীরপাড়া, মীর খাঁর ডাঙা ইত্যাদি। এই সব মৌজা ও পাড়ার নাম থেকে এইটুকু বোঝা যায় যে, মুসলমান আধিপত্য গুপ্তিপাড়া অঞ্চলে অনেক আগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু উল্লেখযোগ্য হল, আয়মাদার বা জায়গীরদার কোন বনেদী মুসলমানবংশের ধারা গুপ্তিপাড়ায় পাওয়া যায় না। অধিকাংশ মুসলমানই ধর্মান্তরিত মুসলমান। সুতরাং মুসলমানরা আদিবাসিন্দা না হওয়াই সম্ভব। মৎস্যজীবী মাঝিমাল্লা ও গোপরাই গুপ্তিপাড়ার আদিবাসিন্দা বলে মনে হয়।

প্রাক্-হুসেনশাহী আমলেই যে গুপ্তিপাড়া পর্যন্ত মুসলমান আধিপত্য বিস্তৃত হয়েছিল, তার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রমাণ আছে। প্রত্যক্ষ প্রমাণ হল, পাড়ার নামগুলি এবং প্রাচীন সমাধি ও পীরস্থানগুলি। পরোক্ষ প্রমাণ হল, কালনার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। নাসিরুদ্দিন মামুদ শাহের আমলের (১৪৯০-৯১) শিলালিপি কালনার মসজিদে পাওয়া গেছে। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দিকে গঙ্গার পশ্চিমতীরে কালনা পর্যন্ত যখন মুসলমান অধিকার বিস্তৃত হয়েছিল, তখন গুপ্তিপাড়াও তার অন্তর্ভুক্ত ছিল বলে মনে হয়। তখনও 'গুপ্তপল্লী' বা 'গুপ্তিপাড়া' নামের খ্যাতি হয়নি। গুপ্তিপাড়ার ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যরা মনে হয়, ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধে, কররাণী বংশের রাজত্বকালে বা মোগলযুগের গোড়ার দিকে, গুপ্তপল্লীতে এসে বসবাস করতে আরম্ভ করেন। গুপ্তিপাড়ার বিখ্যাত চট্টশোভাকরবংশ বোধ হয় বৈদ্যদের কিছু আগে এসেছিলেন। খুব বেশি আগে পরে না হলেও, চট্টশোভাকরবংশ ও বৈদ্যবংশ কিছু আগে পরে এসে গুপ্তিপাড়ায় বসতি স্থাপন করেছেন। পুঁথিপত্র ও কুলজী থেকে চট্টশোভাকর বংশের যে ইতিহাস পাওয়া যায়, তাতে দেখা যায় যে, সিদ্ধেশ্বর হলেন এই বংশের গুপ্তিপাড়ার ধারার আদিপুরুষ। সিদ্ধেশ্বর থেকে বর্তমান অধস্তন ধারা হল পনের পর্যায়। অর্থাৎ প্রায় চারশ সাড়ে চারশ বছর আগে, ১৫০০ থেকে ১৫৫০ খৃস্টাব্দের মধ্যে, চট্টশোভাকরবংশের পূর্বপুরুষ সিদ্ধেশ্বর 'চান্দরিয়া' বা চাঁদরা গ্রাম থেকে এসে গুপ্তিপাড়ায় বসতি স্থাপন করেন।[১]

এই প্রমাণ থেকে মনে হয়, হুসেনশাহী বংশের আমলে (১৪৯৩-১৫৩৮ খৃঃ) কোন সময় চট্টশোভাকররা গুপ্তিপাড়ায় আসেন।

বৈদ্যদের গুপ্তিপাড়ায় বসতির প্রমাণ পাওয়া যায় ভরত মল্লিক রচিত বিখ্যাত বৈদ্যকুলজীগ্রন্থ "চন্দ্রপ্রভা" থেকে। ভূরিশ্রেষ্ঠির রাজা প্রতাপনারায়ণের অন্যতম সভাপণ্ডিত ভরত মল্লিক ("ভূরিশ্রেষ্ঠ মহীপাল সভাপণ্ডিত বিশ্রুতঃ"—

১ শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য: সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৪৯ বর্ষ, ২য় সংখ্যা: 'বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার ও চট্টশোভাকরবংশ' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

দীনেশবাবু বলেন: "সিদ্ধেশ্বর ১৪৫০-১৫০০ খৃস্টাব্দের পরবর্তী নহেন। আমার ধারণা, রাজা গণেশের পুত্র জালালুদ্দীন (মৃত্যু ১৪৩২ খৃঃ) হিন্দুদের উপর অত্যাচার করিলে অনেকে দেশত্যাগ করেন এবং অনেকে দেশমধ্যে সঙ্ঘবদ্ধ হন। সেই সময়েই গুপ্তিপাড়ার অভ্যুদয়। চন্দ্রপ্রভার গুপ্তিপাড়া "গুপ্ত"দের সমাজ নহে, বৈদ্য গুপ্তবংশ হইতে তাহার নামকরণ সন্দিগ্ধ। বৈদ্যদের আগমনও ১৫০০ খৃস্টাব্দের পরে নহে।"

চন্দ্রপ্রভা, পৃঃ ৩২) "চন্দ্রপ্রভা" রচনা করেন ১৫৯৭ শকাব্দে (১৬৭৫ খৃস্টাব্দে)। এই গ্রন্থে প্রত্যেক কুলক্রমাগত স্থানে সেন দাস গুপ্ত, দত্ত ও দেবাদি বৈদ্যদের প্রসঙ্গে ভরত মল্লিক বলেছেন : [১]

"পঞ্চকূটং গুপ্তপাড়া নাদোয়ালী বদীপুরম্"। (সেন)
"হাপানীয়া গুপ্তপাড়া বেজড়া ঘাটকেশ্বরঃ"। (দাস)
"ইছাপুরা গুপ্তিপাড়া চুপি খাগড়িয়া তথা"। (দত্তদেব)

এই সব বৈদ্য বংশের পূর্বপুরুষ তের পর্যায়ে এসে গুপ্তিপাড়ায় বসবাস করেন এবং 'চন্দ্রপ্রভা' রচনাকালে তাঁদের সতের পর্যায় ছিল। অর্থাৎ চন্দ্রপ্রভার রচনাকালের আরও একশ বছর আন্দাজ আগে, ১৫৫০ থেকে ১৫৭৫ খৃস্টাব্দের মধ্যে কোন সময় বৈদ্যরা গুপ্তিপাড়ায় আসেন। শোভাকরবংশের প্রায় সমসাময়িক, অথবা দুই তিন পুরুষ পরে তাঁরা আসেন।

মুসলমান আমলে গুপ্তিপাড়ার বৈদ্যদের নবাবদরবারে বেশ প্রতিপত্তি ছিল বোঝা যায়। তাঁরা অনেকেই রাজকর্মচারী ছিলেন এবং প্রচুর ধনসম্পত্তি ও জমিদারীর মালিকও ছিলেন। রায়, মজুমদার, সরকার প্রভৃতি উপাধি তার সাক্ষী। মুসলমান আমলের পরেও বৃটিশযুগে দেখা যায়, গুপ্তিপাড়ার বৈদ্য-বংশের সন্তানরা অনেকে এজেণ্ট ও মুৎসুদ্দীর কাজ করে রীতিমত প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। যেমন রাম সেনের ধারায় দেখা যায় দাতারাম সেন রেশমের ব্যাবসায় প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। তাঁর দুই পুত্র রাধানাথ ও কীর্তিচন্দ্র, শোনা যায়, কলকাতার রামদুলাল দে-সরকারের সঙ্গে একত্রে কাজ করতেন। পরে তিনি ফিগিস্ কোং, য়োরান্ কোং প্রভৃতি হৌসের (এই হৌসের মালিকবংশ ম্যাকিনান্ ম্যাকেঞ্জী, চার্টার্ড ব্যাঙ্কের স্থাপয়িতা) মুৎসুদ্দী ছিলেন। কীর্তিচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র রামধন সেন টার্ণার মরিসন কোম্পানীর 'লবণ ও চিনির' মুৎসুদ্দী ছিলেন। এই বংশ দীর্ঘকাল পর্যন্ত এই মুৎসুদ্দীগিরি করে কলকাতায় প্রচুর সম্পত্তি কেনেন এবং গ্রামের জমিদারীও বাড়ান। অন্যান্য বৈদ্য-বংশের মধ্যেও অনেক নানাভাবে প্রতিষ্ঠা পান। এইজন্য গুপ্তিপাড়ার বৈদ্যদের প্রতিপত্তির ধারা মুসলমান যুগ থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় অক্ষুণ্ণ রয়েছে দেখা যায়। অবশ্য অনেক ধারা ইদানীং ক্ষীণ ও নিষ্প্রভ হয়ে

১ চন্দ্রপ্রভা, কলিকাতা ১২৯৯ সন, পৃঃ ১২।

গেলেও, বৈদ্যদের বংশানুক্রমিক প্রতিপত্তির নিদর্শন গুপ্তিপাড়ায় আজও বিদ্যমান।

গুপ্তিপাড়ার সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের ইঙ্গিত একটি প্রাচীন ছড়ার মধ্যে পাওয়া যায়। ছড়াটি এই :

বাঁদর শোভাকর মদের ঘড়া
তিন নিয়ে গুপ্তিপাড়া।

একসময় গুপ্তিপাড়ায় গাছের ডালে ডালে অনেক বাঁদর দেখা যেত। সুতরাং ছড়াতে বাঁদর কথাটি এসে পড়েছে। সংস্কৃতি প্রসঙ্গে ওটি অবান্তর কথা। শোভাকর ও মদের ঘড়ার তাৎপর্য আছে। 'শোভাকর' অর্থে গুপ্তি-পাড়ার 'চট্টশোভাকরবংশ' এবং 'মদের ঘড়া' অর্থে বীরাচারী তান্ত্রিক সাধনার অনুষ্ঠান বোঝাচ্ছে। শোভাকরবংশের প্রসিদ্ধি শুধু পাণ্ডিত্যের জন্য নয়, বহু তান্ত্রিক সাধকের আবির্ভাবের জন্যও বিখ্যাত। এই বংশের বিখ্যাত পণ্ডিত মথুরেশ বিদ্যালঙ্কার ও বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার তাঁদের রচিত গ্রন্থাদিতে পূর্বপুরুষদের সাধনার কথা উল্লেখ করেছেন। মথুরেশ নিজে 'শ্যামকল্পলতিকা' রচনা করেন ১৫৯৪ শকাব্দে (১৬৭২ খৃঃ)। বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারও দেবীস্তোত্রং (শ্রীভারতী, ১ম বর্ষ, ১৯৮-২০৩), তারাস্তোত্রং (ঐ, ৪১৩-'১৬, ৪৬৩-'৬৮) প্রভৃতি রচনা করেন। তন্ত্রসাধনা প্রসঙ্গে শোভাকরবংশের অপর শাখার (পাঁচড়া ও শিমলা) মহাপণ্ডিত কৃষ্ণরাম ন্যায়বাগীশের নামোল্লেখ করা যায়। একসময় আসামরাজ স্বর্গদেব রুদ্রসিংহ (১৬৯৫-১৭১৪ খৃঃ) শাক্তধর্মে দীক্ষিত হওয়ার জন্য উপযুক্ত গুরুর সন্ধানে লোক পাঠিয়ে গঙ্গাতীর থেকে কৃষ্ণরামকে নিজের রাজ্যে নিয়ে যান।

শিমলা গ্রাম্যর গঙ্গাতীরে যার থান।
কৃষ্ণরাম ন্যায়ভট্টাচার্য গুণবান॥

(অসমর পদ্যবুরঞ্জী, পৃ ৫১-৫২)

এই শিমলা গ্রাম গুপ্তিপাড়ার অপর পারে ফুলিয়া ও মালিপোতার কাছে অবস্থিত। বীরাচারী তন্ত্রসাধনার প্রাবল্যের জন্য 'মদের ঘড়ার' কথা ছড়ায় আছে। সেইজন্য শৌণ্ডিক জাতির বাসও ছিল গুপ্তিপাড়ায়। এখনও দেশ-কালীমাতার মন্দিরের সামনে একটা জায়গা 'শুঁড়িবাগান' বলে পরিচিত।

শোভাকরদের ও অন্যান্য ব্রাহ্মণদের ঘরে আজও তন্ত্রোক্ত নানারকম 'যন্ত্র' রক্ষিত আছে। গুপ্তিপাড়ার অনেক বৈদ্য বংশও তান্ত্রিক। শ্যামাপূজার সময় এককালে প্রতি ঘরে ঘরে পূজা হত এবং বৃদ্ধরা বলেন যে, তখন এত ব্রাহ্মণ-বংশের বাস ছিল যে কালীপূজার রাতে পথ চললে আলোর দরকার হত না। সমস্ত গুপ্তিপাড়া গ্রাম আলোকিত হয়ে থাকত। দেশাধিষ্ঠাত্রী দেশকালীমাতার যেখানে মন্দির আছে গুপ্তিপাড়ায় শোনা যায় তান্ত্রিকদের সাধনাস্থান হিসাবে সেই স্থানটি খুব প্রাচীন। মন্দিরের অদূরে গঙ্গাতীরে যখন শ্মশান ছিল তখন হয়ত দেবী শ্মশানকালীরূপেই পূজিত হতেন। স্থানীয় প্রবাদ, দণ্ডীস্বামী রামানন্দ আশ্রমের সময় থেকেই নাকি সাধনপীঠ হিসাবে এর খ্যাতি। তিনি এই স্থানে পঞ্চমুণ্ডীর আসন করে সাধনা করেন। রামানন্দের সময় ১৬৭০ থেকে ১৬৯০ খৃস্টাব্দের মধ্যে ধরা যায় (?)। তিনি শোভাকর মথুরেশের সম-সাময়িক (?)। রামানন্দ ও মথুরেশের বিবাদের অনেক কাহিনী গুপ্তিপাড়ায় প্রচলিত আছে। বিবাদ সাধনপদ্ধতি নিয়ে। রামানন্দ দশনামী শৈব সম্প্রদায় ও শঙ্কর মঠভুক্ত সন্ন্যাসী, সুতরাং বেদাচারী ও শৈব। তিনি দেশকালীমাতার মন্দির-প্রাঙ্গণে ভৈরব রামেশ্বর শিবও প্রতিষ্ঠা করেন। আবার গুপ্তিপাড়া মঠের প্রধান দেবতা বৃন্দাবনচন্দ্র জীউ, সুতরাং তাঁকে বৈষ্ণবাচারীও বলা যায়। তাঁর সঙ্গে বীরাচারী শোভাকরবংশের মথুরেশের মতান্তর হওয়া স্বাভাবিক (অবশ্য যদি সত্যই রামানন্দ মথুরেশের সমসাময়িক হন)।

গুপ্তিপাড়ার বিখ্যাত মঠ বাংলাদেশের দশনামী শৈব সম্প্রদায়ের ইতিহাসের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। এখানে সে ইতিহাস বিস্তারিত আলোচনা করব না। তারকেশ্বরের ইতিহাস প্রসঙ্গে বাংলাদেশে এই দশনামী শৈবদের মঠ প্রতিষ্ঠার কথা সবিস্তারে বলব। জেলা কোর্ট (হুগলী), হাইকোর্ট ও প্রিভি-কাউন্সিলের মূল্যবান রেকর্ড থেকে (তারকেশ্বরের মামলাকালীন) এই ইতিহাস যেটুকু সংগ্রহ করা যায় তা থেকে জানা যায় যে গুপ্তিপাড়ার মঠ দশনামী শৈবদের মঠ এবং তারকেশ্বর মঠের অধীন। হুগলী জেলার জজ রায়-প্রসঙ্গে একথা উল্লেখ করেন :

......it is clear...that there is a Mandali (assembly) of Mohunts belonging to the defendant's sect at Hooghly and that the assembly consists of the Mohunts of Garh-

Bhowanipur, Chaipath, Bhotebagan, Nayanagar, Baidyabati, Santoshpur, Guptipara and Tarakeswar and that the Mohunt of Tarakeswar is the Raja (head) of the assembly. (Judgement of the Dist. Judge, Hooghly, in Suit No. 28 of 1922 dated the 6th Nov., 1929 : Record, Group II, Part I, Vol. V, P. 26).

দশনামী শৈবরা হুগলী ও হাওড়া জেলার নানাস্থানে, গড়ভবানীপুর, চৈপাঠ, ভোটবাগান, নয়ানগর, বৈদ্যবাটী, সন্তোষপুর, গুপ্তিপাড়া ও তারকেশ্বর মঠ স্থাপন করেছিলেন এবং সেই সব মঠের মোহান্তমণ্ডলীর রাজা ছিলেন তারকেশ্বরের মোহান্ত। সনদ ও অন্যান্য প্রামাণিক তথ্যাদির সাহায্যে তারকেশ্বর মঠের প্রতিষ্ঠার তারিখ আদালতে ১৭২৯ সাল বলে সাব্যস্ত হয় (Judgement of Calcutta High Court in F. A. No. 1 of 1930)। তাই যদি হয়, তাহলে তার আগে গুপ্তিপাড়া মঠের প্রতিষ্ঠা হয়েছে বলে মনে হয় না। হতে পারে না যে তা নয়, কারণ তারকেশ্বরের মোহান্তমণ্ডলীর রাজা ছিলেন, কিন্তু মঠের পূর্বাপর প্রতিষ্ঠার কথা রেকর্ডে কিছু নেই।[১]

একসময় গুপ্তিপাড়ার মঠে পটে আঁকা দশমহাবিদ্যার নিত্যপূজা হত। বিজয়রাম সেন তাঁর 'তীর্থমঙ্গল' কাব্যে (১৭৭০ খৃঃ) তার উল্লেখ করেছেন :

দশমহাবিদ্যা আর রামলক্ষ্মণ সীতা।
রামশঙ্কর রায় কৈলা অপূর্ব নির্মিতা॥
বৃন্দাবনচন্দ্র আছেন দেবের নির্মাণ।
তথাকারে মহাশয় করিলা প্রস্থান॥

এই পূজা বহুদিন আগে বন্ধ হয়েছে। বৃন্দাবনচন্দ্রজীউয়ের বর্তমান মন্দির আনুমানিক ১৮১০ খৃস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর শেওড়াফুলীর রাজা হরিশ্চন্দ্র রায়, সদানন্দ রায় দণ্ডীস্বামীর আমলে (১৮২২-২৯) রামচন্দ্রের মন্দির নির্মাণ করেন। রামচন্দ্রের মন্দিরের গায়ে অপূর্ব পোড়ামাটির কাজ আছে। বৃন্দাবনচন্দ্র, রামচন্দ্র ও কৃষ্ণচন্দ্রের তিনটি মন্দির এখন মঠের মধ্যে আছে।

---

১ তারকেশ্বর ও গুপ্তিপাড়ার মঠের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে মতভেদ আছে। এবিষয়ে পরবর্তী 'তারকেশ্বর' প্রবন্ধে আলোচনা করেছি।

প্রাচীন জোড়বাংলা মন্দিরটি ভগ্ন ও পরিত্যক্ত। তিনটি মন্দিরই বাংলা চালা-ঘরের ধরনের মন্দির।

গুপ্তিপাড়ার মঠ ছাড়া রঘুনাথ ঠাকুরও বহু প্রাচীন। বাংলাদেশে সাধারণত ধনুর্বাণ হাতে উপবিষ্ট রামের বিগ্রহ দেখা যায় না। গুপ্তিপাড়ার বিগ্রহটি খুব সুন্দর। একসময় গঙ্গাতীরে রঘুনাথের বড় মন্দির ছিল। ভূমিকম্পে মন্দির ভেঙে যায়। অধিকারীবংশ (বন্দ্যো) প্রতিষ্ঠাকাল থেকে সেবায়েত। এছাড়া বিখ্যাত বাগ্মী ও ধর্মপ্রচারক পরিব্রাজক কৃষ্ণানন্দ স্বামী গুপ্তিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মস্থানে এখন 'শ্রীকৃষ্ণানন্দ হরিমন্দির' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই মন্দিরে একটি সংস্কৃত বিদ্যাপীঠও স্থাপিত হয়েছে।

গুপ্তিপাড়ার উৎসবের মধ্যে রথযাত্রা উল্লেখযোগ্য। রথযাত্রা উপলক্ষ্যে 'ভাঁড়ার লুঠ' বলে একটি অনুষ্ঠান বহুকাল ধরে চলে আসছে। কোন শাস্ত্রোক্ত অনুষ্ঠান নয়, লোকানুষ্ঠান। পূর্ণযাত্রার আগের দিন অনেক রকমের আহার্য দেবতাকে নিবেদন করা হয়। নিবেদনান্তে পূজারী দরজা খুলে দেন এবং বাইরের সমবেত জনসাধারণ সেই প্রসাদ লুঠ করে। একে 'ভাঁড়ার লুঠ' বলে। উল্লেখযোগ্য হল, সাধারণত গোপরাই এই অনুষ্ঠানে বেশি যোগ দেয় এবং সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত তাদের শক্তিপরীক্ষা চলতে থাকে নানাভাবে। মনে হয়, গোপদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোন উৎসবের এককালীন আঞ্চলিক প্রতিপত্তির বর্তমান অবশেষ এই ভাঁড়ার লুঠ। পরবর্তীকালের রথযাত্রা তাকে গ্রাস করলেও আত্মসাৎ করতে পারেনি।

গুপ্তিপাড়ার পণ্ডিতসমাজ

সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়া থেকে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত গুপ্তিপাড়ার পণ্ডিতসমাজের বিদ্যাচর্চার ধারা প্রায় অব্যাহত ছিল। গঙ্গার পশ্চিম তীরবর্তী বাঁশবেড়িয়া ত্রিবেণী কোন্নগর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বিদ্যাসমাজের মতন গুপ্তিপাড়ারও প্রতিষ্ঠা হয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষ বা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে এবং তিনশ বছর ধরে শাস্ত্রচর্চা ও অধ্যাপনার ধারা এই সব বিদ্যাকেন্দ্রে অক্ষুণ্ণ থাকে। বৃটিশ আমলে ধীরে ধীরে পোষকতার অভাবে এই বিদ্যাসাধনার গৌরবময় ধারা লুপ্ত হয়ে যায়। নবদ্বীপের মতন হুগলী জেলার এই বিদ্যাসমাজগুলির ইতিহাস বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় অধ্যায় জুড়ে রয়েছে। যে-সব রাজা-মহারাজা ও জমিদাররা এই সব পণ্ডিত-সমাজের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, বৃটিশ আমলের 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের' প্রভাবে তাঁদের গোত্রান্তর হবার ফলে, প্রাচীন বিদ্যাসমাজের ক্ষেত্রে বিপর্যয় দেখা দেয়। মুন্সী মহারাজা নবকৃষ্ণের মতন দু-একজন তালুকদার কলকাতার মতন নতুন রাজধানীতে তার পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা করলেও, বাংলার ইংরেজাশ্রিত নয়া-মুৎসুদ্দী কালচার দ্রুত তার সমাধি রচনা করে।

গুপ্তিপাড়ার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের কথা বিজয়রাম সেন তাঁর 'তীর্থমঙ্গল' কাব্যে উল্লেখ করেছেন (১৭৭০ সালে):

গুপ্তিপাড়ার ব্রাহ্মণের কি কহিব নীত।
মহাতেজ ধরে তারা বিচারে পণ্ডিত ॥
মহাশয়ের আগমন সকলে শুনিয়া।
আশীর্বাদ করিলেন বেদ উচ্চারিয়া ॥

বিজয়রামের প্রায় একশ বছর পরে দীনবন্ধু মিত্র "সুরধুনী কাব্য" রচনা করেন। গঙ্গাতীরবর্তী বাংলার প্রসিদ্ধ বিদ্যাসমাজগুলির সুন্দর বর্ণনা আছে দীনবন্ধুর সুরধুনী কাব্যে। গুপ্তিপাড়া-প্রসঙ্গে দীনবন্ধু বলেছেন:

গুপ্তিপাড়া গণ্ডগ্রাম বিপরীত পারে,
কুলীন-বামন কত কে বলিতে পারে।...
গুপ্তিপাড়া-অহঙ্কার অমূল্য ভূষণ,

বিজ্ঞ বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার রতন ;
হেরে মেধা বলেছিল পিতা শিশুকালে
'বামুও পণ্ডিত হইবেন কালে কালে'।
ক্রমে ক্রমে বাণেশ্বর হইলে পণ্ডিত,
রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তায় সম্মান সহিত
সভাপণ্ডিতের পদে অভিষিক্ত করে,
বিজয়ী যথায় বিজ্ঞ বিচার সমরে।

ওয়ার্ড সাহেবও তাঁর হিন্দুধর্মের বিবরণ সম্বন্ধে ইংরেজী গ্রন্থের মধ্যে (১ম সংস্করণ, ১ম খণ্ড, ২০০ পৃষ্ঠা) গুপ্তিপাড়ার পণ্ডিতসমাজের কথা উল্লেখ করেছেন। গুপ্তিপাড়ার চিরঞ্জীববংশে, চৈতলচট্টবংশে, বান্দ্যবংশে, শোভাকর-বংশে, বৈদিকবংশে, অর্থাৎ প্রায় প্রত্যেক ব্রাহ্মণবংশে বহু বিখ্যাত পণ্ডিত জন্মেছিলেন। ন্যায়, স্মৃতি, দর্শন, বেদান্ত প্রভৃতি সর্ববিষয়ে তাঁরা দীর্ঘকাল ধরে বংশপরম্পরায় অধ্যাপনা করেছেন। এক শোভাকরবংশেই প্রায় শতাধিক বিখ্যাত পণ্ডিতের নাম পাওয়া যায়।

গুপ্তিপাড়ার পণ্ডিতদের বিষম সমস্যা পূরণ এবং মেয়েদের বাক্‌চাতুর্য সম্বন্ধে যেসব কাহিনী প্রচলিত আছে, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়। বিভিন্ন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতবংশের মেয়েরাও যে শাস্ত্র-চর্চার সরগরম পরিবেশে আবাল্য প্রতিপালিত হয়ে, সমস্যা পূরণ ও তর্কবিতর্কের কথা শুনে শুনে বাক্‌চতুর হয়ে উঠবেন, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। ভোলাময়রার মতন কবিয়ালরা পর্যন্ত গুপ্তিপাড়ার মেয়েদের প্রশংসা করে গেছেন এবং শান্তিপুরের মেয়েদের খোঁপার মতন গুপ্তিপাড়ার মেয়েদের "চোপারও" প্রসিদ্ধি বোধ হয় সেই কারণে। গুপ্তিপাড়ার মেয়েদের বাক্‌চাতুর্য সম্বন্ধে অনেক উপভোগ্য গল্প গ্রামবৃদ্ধদের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছি। একটি গল্প সংক্ষেপে বলছি এখানে। বৃন্দাবন মঠের (গুপ্তিপাড়ার) প্রতিষ্ঠাতা সত্যদেব সরস্বতী সন্ন্যাসীবেশে ঘুরতে ঘুরতে গুপ্তিপাড়ায় এসে গঙ্গাতীরে গাছতলায় একখানি ইঁট মাথায় দিয়ে শুয়ে বিশ্রাম করছিলেন। এমনসময় গুপ্তিপাড়ার দুই ব্রাহ্মণকন্যা গঙ্গায় জল আনতে যাচ্ছিলেন। একজন সন্ন্যাসীকে দেখে মন্তব্য করলেন—"ভদ্রলোক সন্ন্যাসী হয়েছেন, কিন্তু আরামবোধটুকু ঠিকই আছে, বালিশের অভাব ইঁট দিয়ে পূরণ করতে ছাড়েননি।" মন্তব্য শুনে সত্যদেব সরস্বতী কিছুক্ষণ পরে ইঁটখানি

মাথার তলা থেকে সরিয়ে ফেলেন। গঙ্গার ঘাট থেকে ফেরবার পথে তাই দেখে সেই মেয়েটি আবার মন্তব্য করেন সঙ্গিনীর কাছে—"ছাখরে ছাখ! শুধু আরামবোধ নয়, অভিমানটুকুও পুরো আছে এখনও। আমার কথা শুনে ইঁটখানা সরিয়ে ফেলেছেন।" শোনা যায়, সত্যদেব সরস্বতী এই কথা শুনে গ্রামের মেয়ের এই বিচিত্র বাক্‌চাতুর্যের জন্য খুশি হয়ে গুপ্তিপাড়া গ্রামেই অবস্থানের সঙ্কল্প করেন। এই রকম আরও অনেক কাহিনী আছে। এইসব কাহিনীর অন্তরালে আছে গুপ্তিপাড়ার প্রত্যেক ব্রাহ্মণ-পরিবারের বংশানুক্রমিক পাণ্ডিত্য ও বৈদগ্ধ্যের ইঙ্গিত। তর্কালঙ্কার, ন্যায়ালঙ্কার, বিদ্যালঙ্কার প্রভৃতির ছড়াছড়ি যেখানে প্রতি পরিবারে, সেখানকার মেয়েদের এই বাক্‌কুশলতার কাহিনী নিছক কিংবদন্তী নয়।

সপ্তদশ শতাব্দীতে বাংলার বাইরে উত্তরভারতের বারণসীতে এবং মধ্য-ভারতের গৌড়রাজ্যে (গোয়ালিয়রে) পর্যন্ত দু'জন বাঙালী পণ্ডিত, সত্তর বৎসর-কাল রাজসভা অলঙ্কৃত করে, বাংলার পাণ্ডিত্যের গৌরব ও ঐতিহ্য প্রচার করেছিলেন। আজ অনেকেই হয়ত আমরা তাঁদের নাম ভুলে গেছি। এই দুজন পণ্ডিতের নাম শতাবধান ভট্টাচার্য ও তাঁর পুত্র চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য। এঁরা গুপ্তিপাড়ানিবাসী ছিলেন। এই বংশ গুপ্তিপাড়ার চিরঞ্জীববংশ বলে খ্যাত। এই বংশের ইতিহাস বিশেষ জানা যায় না। যেটুকু ইতিহাস জানা গেছে তা শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য নানা পুঁথিপত্র ঘেঁটে এবং নবদ্বীপের সাধারণ পাঠাগার থেকে শতাবধান রচিত 'রামপ্রকাশ' নামক স্মৃতিগ্রন্থের একখানি প্রতিলিপি উদ্ধার করে (১৯৩৯ সালে) রচনা করেছেন। গ্রন্থের মধ্যে দেখা যায়, প্রতিলিপিকার প্রত্যেক প্রকরণের শেষে "কৃপারামানুনীত শ্রীশতাবধান ভট্টাচার্য বিরচিতঃ" পাঠ যোজনা করেছেন। ১৭০৪ সম্বৎ বা ১৬৪৭ খৃস্টাব্দ গ্রন্থরচনাকাল। 'ইন্দুরথী' নগরীতে গ্রন্থকার রচনা শেষ করেন। এই নগর গোয়ালিয়র রাজ্যের পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত। পুঁথিতে বাংলা অক্ষরে স্বত্বাধিকারীর নাম লেখা—'শ্রীআনন্দচন্দ্র ভট্টাচার্যস্য পুস্তকমিদং শাং গুপ্তপাড়া-মিরডাঙা"। গোয়ালিয়র থেকে গুপ্তিপাড়ায় এই পুঁথি আসার রহস্য কি? বিদেশ ঘুরে চিরঞ্জীব বা তাঁর পুত্রদের পিতৃভূমি গুপ্তিপাড়ায় প্রত্যাবর্তন।

চিরঞ্জীব তাঁর 'বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী' গ্রন্থে পিতা শতাবধানের অপূর্ব প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন—

বাল্যেঽধীত্য সমস্তশাস্ত্রমভিতঃ সিদ্ধান্তবাগীশতঃ
বাগীশপ্রতিমো বভূব বিজয়ী বাদেষু বিদ্যাবতাম্। (১।১০)

শতাবধান বাল্যকালেই সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশের ছাত্র। নবদ্বীপেই চিরঞ্জীবের জন্ম হয়। মনে হয়, ভবানন্দ বার্ধক্যে কাশী গমনকালে, আনুমানিক ১৬০০ খৃস্টাব্দে, দিগ্বিজয়ী শিষ্য শতাবধানকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন। কাশী থেকে পরে রাজা কৃপারাম তাঁকে সুদূর গৌড়রাজ্যে (গোয়ালিয়রে) নিয়ে যান। শতাবধান নিজে তাঁর 'রামপ্রকাশ' গ্রন্থের শেষে নিজের কৃতিত্বের কথা বলেছেন—

ভট্টাচার্য-শতাবধান-কৃতিনি ন্যায়াদিশাস্ত্রার্থবিদ্
বর্য্যে দ্বৈতমতে তদেকতরতো নির্ণায়কে ভূরিশঃ।

অর্থাৎ কৃতী গ্রন্থকার ন্যায়াদিশাস্ত্রজ্ঞদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন এবং মতভেদ স্থলে একতর,পক্ষে বহুবার মীমাংসা করেছেন। পিতা শতাবধান সম্বন্ধে চিরঞ্জীব-কৃত দুটি শ্লোক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

(এক)

অহং হরিহরঃ সিদ্ধেরবলম্বা সরস্বতী।
সাক্ষাৎ শতাবধানত্বম্ অবতীর্ণা সরস্বতী॥

(দুই)

পুংরূপাদরিণী সাক্ষাদবতীর্ণা সরস্বতী।
জিতঃ শতাবধানোঽতো বিষ্ণুনাপিন জিষ্ণুনা॥

শ্লোকোক্ত 'হরিহর' ও 'বিষ্ণু' শতাবধানের সমসাময়িক দুজন বিখ্যাত কবি। শতাবধানের কাছে বিচারে পরাস্ত হয়ে তাঁর বন্দনা করেছেন। আনুমানিক ১৬৫০ খৃস্টাব্দে কাশীতেই শতাবধানের মৃত্যু হয়। তাঁর পুত্র চিরঞ্জীব কাশীতে অধ্যাপনা করে সম্ভবত কিছুকাল গৌড়রাজ্যে পিতার স্থলে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। শতাবধান আর গুপ্তিপাড়ায় ফিরে আসেননি। চিরঞ্জীবও গুপ্তিপাড়ায় ফিরে এসেছিলেন কিনা সন্দেহ। চিরঞ্জীবের পুত্ররা মনে হয় গুপ্তিপাড়ায় ফিরে এসেছিলেন, সুদীর্ঘ সত্তর-আশী বৎসর কাশীতে ও মধ্যভারতে অধ্যাপনা ও সভাপণ্ডিতত্ব করাবার পর। চিরঞ্জীবের অধস্তন বংশে দীর্ঘকাল পাণ্ডিত্যের ধারা অক্ষুণ্ণ ছিল দেখা যায়। ১২০৯ সনে এই বংশে রাজারাম,

রঘুনন্দন ন্যায়পঞ্চানন ও রঘুবীর বিদ্যালঙ্কার জীবিত ছিলেন। ১৮৯৭-৯৮ সালে অশীতিপর বৃদ্ধ হেমচন্দ্র ভট্টাচার্যের নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যুর পর গুপ্তিপাড়ার এই ভারতবিখ্যাত মহাপণ্ডিতের বংশ একেবারে লোপ পায়।

গুপ্তিপাড়ার শোভাকরবংশের পণ্ডিতদের ইতিহাস নিয়ে একখানি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ স্বচ্ছন্দে রচনা করা যায়। গুপ্তিপাড়া সম্বন্ধে কথায় বলে—"গুপ্তপল্লীক-বির্বিষ্ণুঃ মথুরেশো মহাকবিঃ"। কবি বিষ্ণু ও মহাকবি মথুরেশ শোভাকরবংশের গৌরব। মথুরেশের প্রপৌত্র পর্যায়ের বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের খ্যাতি জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের মতনই ছিল। কবি বিষ্ণুর কোন রচনার হদিশও পাওয়া যায় না। লোকমুখে প্রচলিত তাঁর কয়েকটি শ্লোকের কথা শোনা যায়। শ্লোকগুলি সুন্দর। একটি শ্লোক আমরা এখানে উল্লেখ করছি :

গতেরর্ধং মতেরর্ধং রতেরর্ধার্ধকার্ধকম্
দ্বৈগুণ্যং কবিচন্দ্রস্য তনাশাজীবিতাশয়োঃ ॥

অর্থাৎ কবি বিষ্ণু বলছেন : বার্ধক্যে আমার গতিশক্তি ও বুদ্ধিশক্তি অর্ধাংশ লোপ পেয়েছে। কামপ্রবৃত্তির ষোড়শভাগের দুইভাগ মাত্র আছে (রতেরর্ধার্ধ-কার্ধকম্) কেবল ধনের আশা ও বাঁচার আশা দ্বিগুণ বেড়েছে।

মহাকবি মথুরেশ ১৫৯৪ শকাব্দে (বেদাঙ্কতিথিশাকেষু) তাঁর 'শ্যামাকল্প-লতিকা' রচনা করেন। একশটি শ্লোক এই গ্রন্থে আছে। ১৯০৪ সালে শ্রীপতি কবিরত্ন মহাশয় 'শ্যামাকল্পলতিকা'র সটীক সংস্করণ প্রকাশ করেন, কিন্তু তা বিক্রী করা হয়নি। মথুরেশ বিখ্যাত তান্ত্রিক সাধক ছিলেন। মহাকবি বিষ্ণু ও মথুরেশের পৌত্র (বা প্রপৌত্র) ছিলেন বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার। বাণেশ্বরের পিতা রামদেব তর্কবাগীশ বিখ্যাত নৈয়ায়িক ছিলেন এবং পিতার কাছে অধ্যয়ন করেই বাণেশ্বর ন্যায়শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য লাভ করেন। ত্রিবেণীর জগন্নাথের মতন গুপ্তিপাড়ার বাণেশ্বরও একাধারে নৈয়ায়িক, স্মার্তপণ্ডিত ও মহাকবি ছিলেন। 'চিত্রচম্পূ'ই সম্ভবত বাণেশ্বরের প্রথম রচনা। ১৭৪২ খৃস্টাব্দে বর্গীদের অভিযানে বর্ধমানাধিপতি চিত্রসেন সসৈন্যে বর্ধমান নগর পরিত্যাগ করে ত্রিবেণী ও গঙ্গাসাগরের মধ্যবর্তী অজ্ঞাত 'বিশালা' নগরীতে আশ্রয় নেন এবং সেখানে অবস্থানকালে একটি অপূর্ব স্বপ্ন দেখেন। এই স্বপ্নবৃত্তান্তই 'চিত্রচম্পূ'র বিষয়বস্তু। 'চিত্রচম্পূ' পাঠ করলে বোঝা যায় যে, বাণেশ্বরও মথুরেশের মতন উচ্চাঙ্গের সাধক ছিলেন। 'বিবাদার্ণবসেতু'র

অন্যতম রচয়িতারূপে বাণেশ্বরের নাম সুপরিচিত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে শোভাবাজারের মহারাজা নবকৃষ্ণের ও নদীয়ার কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় সমাদৃত পণ্ডিতদের মধ্যে বাণেশ্বর ছিলেন অন্যতম। বাণেশ্বর রচিত বহু শ্লোক পণ্ডিত ও লোকমুখে আজও প্রচারিত আছে। তার মধ্যে বিষম সমস্যা পূরণের শ্লোকগুলি খুবই উপভোগ্য। পৃষ্ঠপোষক রাজামহারাজাদের পরোক্ষ প্রশস্তি হলেও শ্লোকগুলির মধ্যে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য ও কবিত্বের যে পরিচয় আছে, তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। চন্দ্রমোহন তর্করত্ন সঙ্কলিত 'উদ্ভটচন্দ্রিকা,' পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর সঙ্কলিত 'উদ্ভট-সমুদ্র' প্রভৃতি গ্রন্থে এই ধরনের অনেক শ্লোক সংগৃহীত হয়েছে।

বাণেশ্বরের পাণ্ডিত্য দীর্ঘকাল তাঁর অধস্তন বংশধারায় অক্ষুণ্ণ ছিল। ১৭৮৮ খৃস্টাব্দে উত্তরাধিকারঘটিত বিবাদ মীমাংসাকালে নবদ্বীপরাজ পশ্চিমবঙ্গের যে তিনজন পণ্ডিতের ব্যবস্থা নিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে বাণেশ্বরের পুত্র হরিনারায়ণ সার্বভৌম অন্যতম। হরিনারায়ণের পুত্র চতুর্ভুজ ন্যায়রত্ন দীর্ঘকাল (১৮০৬ থেকে ১৮১৬ খৃস্টাব্দের মধ্যে) কলকাতার সদর দেওয়ানী আদালতে ব্যবস্থাপক ছিলেন। চতুর্ভুজের পুত্র কান্তিচন্দ্র সিদ্ধান্তশেখর এবং তৎপুত্র ক্ষেত্রপাল স্মৃতিরত্ন শোভাবাজারের রাজাদের পোষকতায় খ্যাতিলাভ করেন।

বৈদিক ব্রাহ্মণবংশের রামকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন গুপ্তিপাড়ায় আসেন সপ্তদশ শতাব্দীতে। এই বংশের রামগোপাল বিদ্যাবাগীশ অসাধারণ তান্ত্রিক পণ্ডিত ছিলেন। এত বড় আগমবিদ্ পণ্ডিত গুপ্তিপাড়ায় আর জন্মেছেন কি না সন্দেহ। ১১৮২ সনে একদিন তিনি গঙ্গায় অর্ধনিমগ্ন হয়ে সন্ধ্যা করছিলেন, এমন সময় সাতশৈকা পরগণার (বর্ধমান জেলার) প্রসিদ্ধ ভূস্বামী আকবর খাঁ নৌকায় যাচ্ছিলেন। ঘাটে তিনি নৌকা বাঁধতে চান এবং মাঝিরা ভূস্বামীর নৌকা বলা সত্ত্বেও রামগোপাল ইশারায় অন্য ঘাটে নৌকা লাগাতে বলেন। ব্রাহ্মণের তেজস্বিতায় মুগ্ধ হয়ে আকবর খাঁ পাশে নৌকা লাগিয়ে তাঁর সঙ্গে পরিচয় করেন এবং তাঁকে দশ বিঘা ব্রহ্মোত্তর জমি দান করতে চান। এই ব্রহ্মোত্তরের তায়দাদ পাওয়া গেছে। এই বংশের গঙ্গাধর বিদ্যারত্ন ১২২০ সনে জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনিই এই বংশের শেষ নৈয়ায়িক পণ্ডিত।

গুপ্তিপাড়ার এই পণ্ডিতসমাজ তখনকার ভূস্বামীদের পৃষ্ঠপোষকতাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। পণ্ডিতদের ব্রহ্মোত্তর দানের অনেক তায়দাদ গুপ্তিপাড়ায়

পাওয়া গেছে।[১] তায়দাদগুলিতে দেখা যায়, রায়পুরের রাজা বিশ্বেশ্বর রায়, পাটমহলের জমিদার দেবরায়রা, রায়পুরের পরবর্তী জমিদার বংশবাটির (বাঁশবেড়িয়া) রাজবংশ, বর্ধমানের ও নদীয়ার রাজবংশ, দক্ষিণ ২৪-পরগণার হাতিয়াঘর পরগণার এক বর্মণবংশ, কুমারহট্টের সাবর্ণ চৌধুরীবংশ প্রভৃতি ভূস্বামীরা গুপ্তিপাড়ার পণ্ডিতদের বিভিন্ন সময়ে ব্রহ্মোত্তর দান করেছেন। বেশ বোঝা যায়, এই সব ব্রহ্মোত্তর ও অন্যান্য দানের জোরেই গুপ্তিপাড়ার পণ্ডিতরা দীর্ঘকাল বংশপরম্পরায় টোলচতুষ্পাঠী স্থাপন করে অধ্যাপনা করেছেন এবং বাংলাদেশের নানাস্থান থেকে ছাত্ররা সেখানে গুরুগৃহে থেকে বিদ্যাশিক্ষা করেছেন। ১৩২২ সনের 'সম্মিলনী' পত্রিকায় শ্রীপতি কবিরত্ন মহাশয় গুপ্তিপাড়ার চতুষ্পাঠীর পরিবেশ বর্ণনা করেছেন এইভাবে : "এখানকার পল্লীতে নিষ্ঠাবান পণ্ডিতগণ চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া নানা শাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেন। বঙ্গের সুদূর পল্লী হইতে শত শত বিদ্যার্থীর এখানে শাস্ত্রাধ্যয়ন করিবার উদ্দেশ্যে সমাগম হইত। দীর্ঘ চতুষ্পাঠীর দুই পার্শ্বে মৃত্তিকার বেদী, সেই বেদীর উপরে প্রাচীন ব্রহ্মচর্যের অনুকরণে হীনবেশ কষ্টসহিষ্ণু বিলাসবিমুখ ছাত্রগণ শাস্ত্রাধ্যয়নে রত থাকিতেন। বেদীদ্বয়ের মধ্যস্থিত ভূমিভাগে স্তূপীকৃত পার্থিব শিবলিঙ্গ শিক্ষার্থীগণের নিষ্ঠার সাক্ষীস্বরূপ বর্তমান থাকিত। ছাত্রের সমাবেশবশত দরিদ্র অধ্যাপকের গৃহ নিত্যনূতন উৎসবের আকার ধারণ করিত। অধ্যাপকগৃহিণী স্বহস্তে রন্ধন করিয়া ছাত্রদিগকে পুত্রবৎ স্নেহে ভোজন করাইতেন, নিশীথকালে চতুষ্পাঠীর গবাক্ষমুখে পরিদৃষ্ট আলোকরেখা বিদ্যার্থী-গণের শাস্ত্রাভ্যাস শ্রমের নীরব সাক্ষ্য প্রদান করিত। অনধ্যায়ের দিন হাস্য ও পরিহাসের অবদান ঘটিত। কথোপকথন তর্কযুদ্ধে পরিণত হইত, শাস্ত্রালাপ বিতণ্ডার আকার ধারণ করিত।" কবিরত্ন একজন প্রত্যক্ষদর্শী এবং তাঁর গৃহে বহুকাল ধরে চতুষ্পাঠী ছিল। সুতরাং তাঁর এই বর্ণনার মূল্য আছে।

গুপ্তিপাড়ার পণ্ডিতসমাজের বিবরণপ্রসঙ্গে বারোয়ারীপূজার কথাও উল্লেখযোগ্য। মনে হয় গুপ্তিপাড়ার পণ্ডিতদের উদ্যোগেই বাংলাদেশের প্রথম বারোয়ারীপূজা (জগদ্ধাত্রী—বিন্ধ্যবাসিনী) অনুষ্ঠিত হয় গুপ্তিপাড়ায়, কারণ ১৮২০ সালের মে মাসের 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া' (শ্রীরামপুরের মাসিক) পত্রিকায় দেখা যায়, বারোয়ারী পূজাপ্রসঙ্গে বলা হয়েছে :

---

১ গুপ্তিপাড়ার শ্রীসুধাংশুকুমার সেনের প্রচেষ্টায় এই তায়দাদগুলি সংগৃহীত হয়েছে।

...a new species of Pooja which has been introduced into Bengal within the last thirty years, called Barowaree ......About thirty years ago, at Goopti-para, near Santi-poora, a town celebrated in Bengal for its numerous Colleges, a number of Brahmins formed an association for the celebration of a Pooja independently of the rules of the Shastras. They elected twelve men as a Committee from which circumstance it takes its name, and solicited subscriptions in all the surrounding villages.

এই বিবরণ থেকে বোঝা যায় যে, গুপ্তিপাড়ার ব্রাহ্মণ-বৈদ্যদের উদ্‌যোগেই প্রধানত অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে প্রথম বারোয়ারীপূজার অনুষ্ঠান হয়। বারোজন অর্থে সঠিক দ্বাদশজন নাও হতে পারে, সাধারণ অর্থে গ্রামের বারোজন মিলে অনুষ্ঠানের আয়োজনও করতে পারেন। 'ফ্রেণ্ড অফ্ ইণ্ডিয়া' পত্রিকার ইঙ্গিত অনুযায়ী প্রথম অনুষ্ঠানের কাল ১৭৯০ খৃস্টাব্দ আন্দাজ হয়। কিন্তু গুপ্তিপাড়ার মুখোপাধ্যায়দের গৃহ থেকে দ্বিতীয় বর্ষের একখানি পূজার ফর্দ পাওয়া গেছে, ১১৬৭ সনের। এই ফর্দের তারিখ অনুযায়ী প্রথম বর্ষের পূজা বাংলা ১১৬৬ সনে (ইং ১৭৫৯-৬০ সাল) অনুষ্ঠিত হয়েছিল দেখা যায়। অর্থাৎ 'ফ্রেণ্ড অফ্ ইণ্ডিয়া'র অনুমানের আরও ত্রিশ বছর আগে। পূজার চাঁদা সংগ্রহের জন্য এক-একটি দলে চার-পাঁচজন করে লোক বাংলার নানাস্থানে যাত্রা করতেন এবং জগদ্ধাত্রীপূজার কয়েকদিন আগে ফিরে আসতেন। বর্ধমান, মেদিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চলের সম্পন্ন গৃহস্থেরা বলেন যে, তাঁদের বাল্যকালে তাঁরা দেখেছেন, গুপ্তিপাড়ার ব্রাহ্মণরা বারোয়ারীর চাঁদা আদায় করতে আসতেন এবং তাঁদের রসিকতায় সকলকে মুগ্ধ করতেন। গুপ্তিপাড়ার পরে ধীরে ধীরে বারোয়ারীপূজার প্রথা শ্রীপুর-বলাগড়, উলা-বীরনগর, শান্তিপুর, চুঁচুড়া প্রভৃতি অঞ্চল থেকে কলকাতা মহানগরীতে প্রচলিত হয়। ঊনবিংশ-শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে কলকাতার নব্যবাবুদের উদ্‌যোগে বারোয়ারী-পূজার সমারোহের বর্ণনা 'হুতোমপেঁচার নক্‌শায়' পাওয়া যায়।

ত্রিবেণী

জাফর খাঁর আস্তানা ও মসজিদের এলাকার মধ্যে প্রবেশ করলে দেখা যায়, অজস্র পাথরের খণ্ড চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে, দেয়ালের গায়ে গাঁথা রয়েছে। তারই গায়ে লেখা আছে ত্রিবেণীর অতীত ইতিহাস অদৃশ্য অক্ষরে। গঙ্গার তীরে বিশাল একটি উঁচু স্তূপের উপর জাফর খাঁর আস্তানা ও মসজিদ প্রতিষ্ঠিত। রাস্তা থেকে সিঁড়ি ভেঙে ওঠার মতন উপরের স্তূপে উঠে তবে আস্তানা-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করতে হয়। গঙ্গার দৃশ্য চমৎকার দেখায় প্রাঙ্গণ থেকে। প্রাঙ্গণে প্রবেশ করেই ডানপাশে সমাধিস্তম্ভ বা আস্তানা এবং সামনে কয়েক গজ দূরে সাতগম্বুজ জাফর খাঁর মসজিদ।

আস্তানায় ঢুকেই স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয় তার গড়ন দেখে। আস্তানাটি দুইভাগে ভাগ করা, পূর্বভাগে জাফর খাঁ, তাঁর পুত্র ও পুত্রবধূ এবং পশ্চিমভাগে বড়খাঁ গাজী ও তাঁর পুত্ররা সমাধিস্থ। সমাধির উপরে কোন ছাদ নেই। জাফর খাঁর সমাধিগৃহের চারটি দ্বার, প্রত্যেক দ্বারেই হিন্দু ভাস্কর্যের পর্যাপ্ত নিদর্শন। দরজার দুই পাশে নিচের দিকে দেখা যায়, ছোট ছোট মন্দিরের মধ্যে দণ্ডায়মান দেবীমূর্তি এবং তার পাশে দুটি যক্ষমূর্তি খোদাই করা রয়েছে। আস্তানার বাইরের দেয়ালে বড় বড় পাথরের খণ্ডের উপরে সারি সারি বিষ্ণুমূর্তি প্যানেলের মতন, নবগ্রহ মূর্তি, ফুললতাপাতা ইত্যাদি খোদাই করা আছে। পাথরগুলি যেভাবে গাঁথা হয়েছে তাও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বোঝা যায়, একখণ্ড পাথরও জাফর খাঁর জন্য কোন পূর্ব-পরিকল্পনা অনুযায়ী বাইরে থেকে আনা হয়নি। পাথরগুলো কোন স্থাপত্যের নিয়মানু-যায়ীও সাজানো বা গাঁথা হয়নি। যেমন হাতের কাছে পাওয়া গেছে, ঠিক তেমনি তাড়াহুড়ো করে কোনরকমে সাজিয়ে গেঁথে দেওয়া হয়েছে। আস্তানা ও মসজিদ, উভয় গৃহের এই অবিন্যস্ত গাঁথুনি প্রথমেই নজরে পড়ে। আরও একটা বৈশিষ্ট্য দেখা যায়—দেবদেবীর মূর্তি-খোদাই-করা পাথরের প্যানেলগুলি প্রায় সবই উল্টিয়ে গাঁথা হয়েছে। বিষ্ণুমূর্তির শ্রেণী, নবগ্রহ ও অন্যান্য মূর্তি-খোদিত প্যানেল অধিকাংশই উল্টোনো। দেয়ালগুলি বেশ ভাল করে লক্ষ করলে দেখা যায়, বড় বড় দেবদেবীর মূর্তি পিছন ফিরিয়ে (অর্থাৎ উল্টিয়ে)

গেঁথে নেওয়া হয়েছে। এরকম একাধিক মূর্তির নিদর্শন আমরা দেয়ালের গায়ে লক্ষ করেছি, বিশেষ করে মসজিদের ভিতরের দেয়ালে, প্রার্থনাকক্ষের আশে-পাশে। অনেক মূর্তির পিছন দিকে লিপিও উৎকীর্ণ করা হয়েছে দেখা যায়। মসজিদের ভিতরের লিপিগুলি অধিকাংশই দেব-মূর্তির, অর্থাৎ স্টেলার পিছনে উৎকীর্ণ। স্টেলার আকার দেখে বোঝা যায়, দেবদেবীর মূর্তিগুলি বেশ বড় বড় মূর্তি ছিল, তিন চার ফুট পর্যন্ত লম্বা। দেয়ালের গা থেকে খুলে দেখলে আজও মূর্তিগুলি কিসের মূর্তি জানা যেতে পারে। যেসব ভাঙা ভদ্রপীঠের পিছনে লিপি উৎকীর্ণ করা হয়েছে, অথবা উল্টিয়ে যেগুলি গাঁথা হয়েছে, তা দেখতে পেলেও মূর্তি চেনা যেত। জাফর খাঁর সমাধিগৃহের দরজার দু পাশে যেসব ভাস্কর্যের নিদর্শন রয়েছে (যক্ষসহ মন্দিরমধ্যে দেবীমূর্তি), তাতে মনে হয়, আস্তানাটি হিন্দুমন্দির তো নিশ্চয়, সমাধিগৃহটি সেই মন্দিরের গর্ভগৃহ বা অন্তরাল। একেবারে মন্দিরের গর্ভগৃহকেই সোজাসুজি সমাধিকক্ষে পরিণত করা হয়েছে।

বড়খাঁ গাজীর সমাধির অভ্যন্তরে কয়েকটি প্রাচীন লিপির সন্ধান পাওয়া গেছে। প্রায় একশ বছর আগে মনি সাহেব ত্রিবেণী পরিদর্শন করতে গিয়ে এই লিপিগুলির সন্ধান পান। লিপি বঙ্গাক্ষরে খোদাই করা। মনি সাহেব তার পাঠোদ্ধার করেন।[১] পরে রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় এই পাঠ কিছু সংশোধন করে প্রকাশ করেন।[২] দুজনের পাঠই আমরা এখানে উদ্ধৃত করছি।

॥ মনি সাহেবের পাঠ ॥

১। শ্রীসীতানির্বাসঃ শ্রীরামাদ্বিষেকঃ
২। পভিষেক
৩। শ্রীরামেণ রাবণ বধ্যা
৪। শ্রীকৃষ্ণবাণাসুরয়োর্যুদ্ধঃ
৫। বৃদ্ধদ্যুম্ন দুঃশাসন। যাজ্ঞদ্যুম্ন

॥ রাখালদাসের সংশোধিত পাঠ ॥

১। শ্রীসীতানির্ব্বাসঃ —
২। অভিষেক

১ এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নাল ১৮৪৭ সাল, প্রথম ভাগ।
২ সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৫ বর্ষ।

৩। শ্রীরামেণ রাবণ বধঃ

৪। —যুদ্ধম্

৫। ধৃষ্টদ্যুম্ন দুঃশাসনয়োর্যুদ্ধম্

এছাড়া আরও দুটি লিপি রাখালদাসবাবু উদ্ধার করেছেন—

১। খরত্রিশিরসোর্ব্বধঃ —

২। বস্ত্রহরণঃ

এই সব টুক্‌রো টুক্‌রো লিপি থেকে বোঝা যায় যে, জাফর খাঁর আস্তানাটি পূর্বে একটি বিষ্ণুমন্দির ছিল। মন্দিরের গায়ে রামায়ণ ও মহাভারতের অসংখ্য চিত্রাবলী খোদাই করা ছিল। রাম-রাবণের যুদ্ধের দৃশ্য, বস্ত্র-হরণের দৃশ্য ইত্যাদি। সুতরাং মন্দিরটি যে সাধারণ বিষ্ণুমন্দির ছিল না, রীতিমত বড় কারুকার্যশোভিত বিষ্ণুমন্দির ছিল, তা সহজেই অনুমান করা যায়। আস্তানার বাইরে বিষ্ণুমূর্তি, নবগ্রহ ইত্যাদির প্যানেলগুলিও তার সাক্ষী। মন্দিরের গ্রাউণ্ডপ্ল্যান ও পাদপীঠ অক্ষুণ্ণ রেখেই তার উপর সমাধি-স্তম্ভ গড়া হয়েছে এবং মন্দিরের গর্ভগৃহকে করা হয়েছে সমাধিকক্ষ। কিন্তু এখানে শুধু একটি বিষ্ণুমন্দির ছিল বলে মনে হয় না। মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ, যা মসজিদে ও আস্তানায় রয়েছে, তাই থেকে মনে হয়, এখানে একাধিক মন্দির ছিল—বিষ্ণুমন্দির, সূর্যমন্দির, শিবমন্দির ইত্যাদি। তীর্থস্থান ত্রিবেণীর এই স্থানটিই ছিল আসল তীর্থক্ষেত্র এবং গঙ্গার তীরে বলে উঁচু টিলার মতন স্থানে দেবালয়গুলি গড়া হয়েছিল। উঁচু স্তূপের উপর গড়ার উদ্দেশ্য হল, প্রথমত গঙ্গার দৃশ্য যাতে মন্দির-প্রাঙ্গণ থেকে উপভোগ করা যায়, দ্বিতীয়ত গঙ্গার বন্যা হলেও যাতে দেবালয়গুলি মাথা তুলে থাকতে পারে। একাধিক মন্দির ছিল একথা এইজন্যই মনে হয় যে, একটি মন্দিরে এতগুলি দেবদেবীর মূর্তি এবং এত বিচিত্র দেয়াল-ভাস্কর্যের নিদর্শন সাধারণত থাকে না। তাই মনে হয়, ত্রিবেণীর প্রধান দেবালয়কেন্দ্র ছিল এই স্থানটি।

মনি সাহেব একশ বছর আগে ত্রিবেণী পরিদর্শন করে এই কথা বলেছিলেন এবং রাখালদাসও পরে তাঁর উক্তি সমর্থন করেছেন। মনি সাহেব লিখেছিলেন :

There are also near the northern and eastern entrances images of some of the Hindu gods, such as Narasin-

১৪

৬৮

৩৮
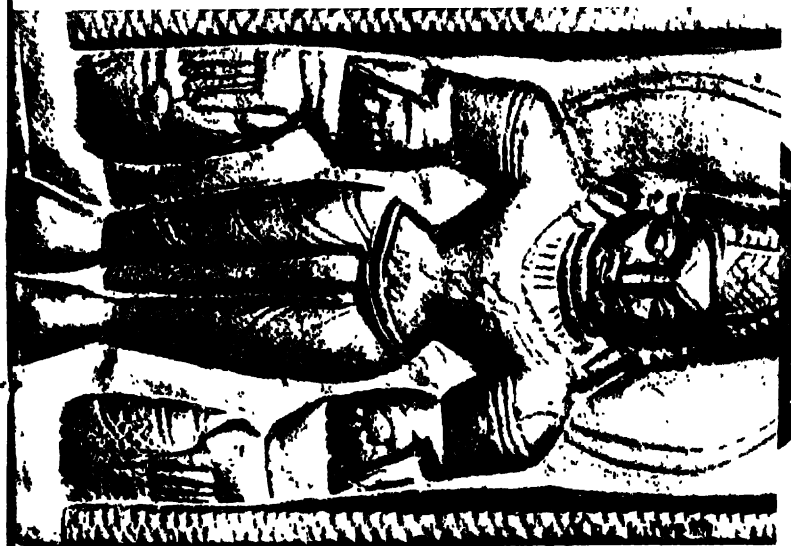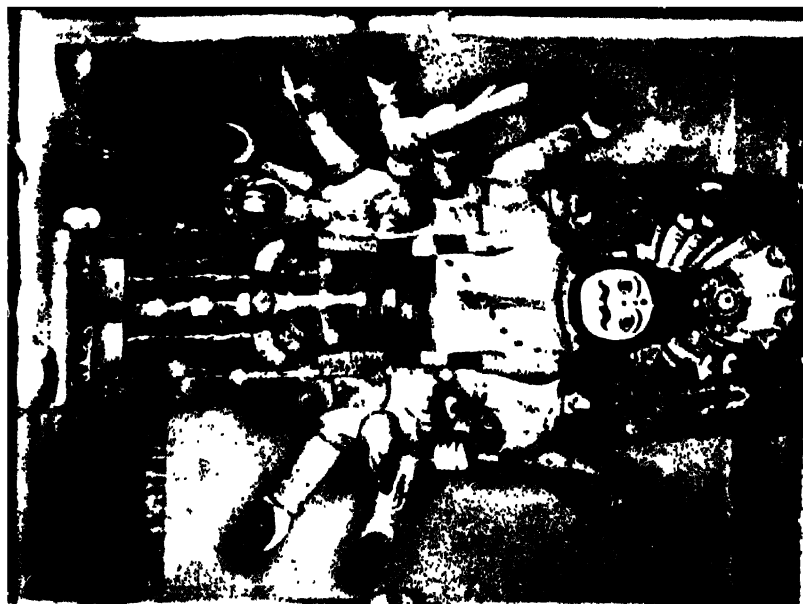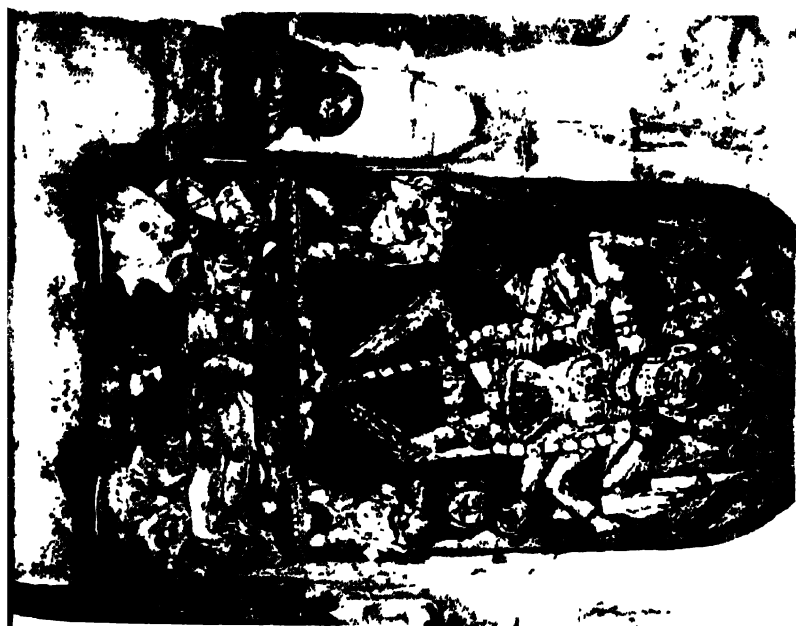
ghee, Varaha, Rama, Krishna, Lucshmi etc., most of them much defaced . it is clear that the building is not now in its original state, and that formerly it must have been Hindu temple. (J. A. S., May 1847)

নরসিংহ, বরাহ, রাম, কৃষ্ণ, লক্ষ্মী ইত্যাদি অবতার ও দেবদেবীর মূর্তি মনি সাহেব দেখেছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর মূর্তি বা দেবালয়ের ভাস্কর্যের নিদর্শন ছাড়াও ত্রিবেণীর মসজিদের স্তম্ভগাত্রে ভূমিস্পর্শ-মুদ্রাবিশিষ্ট বুদ্ধমূর্তি খোদিত রয়েছে দেখা যায়। মসজিদের মধ্যে দুটি করে স্তম্ভের সারি আছে, প্রত্যেক সারিতে ছয়টি করে স্তম্ভ। এই স্তম্ভের মধ্যে একটিতে বুদ্ধ-মূর্তি খোদিত আছে। অন্যান্য স্তম্ভের তুলনায় এই স্তম্ভটির বৈশিষ্ট্যও আছে দেখা যায়। চতুষ্কোণাকার স্তম্ভ, অন্যান্য স্তম্ভের মতন অষ্টকোণাকার বা ষষ্ঠ-কোণাকার নয়। বোঝা যায়, স্বতন্ত্র কোন দেবালয়ের স্তম্ভ। বুদ্ধমূর্তির এই নিদর্শন ছাড়াও জৈনমূর্তির নিদর্শনও এখানে পাওয়া গেছে। বড়খাঁ গাজীর সমাধির দক্ষিণদ্বারের পাশে আরবী ভাষায় লেখা একটি পাথরের খণ্ড আছে। তার অপর পার্শ্বে একটি মূর্তির চিহ্ন দেখা যায়। কেবল পাদদ্বয় ও পিছনের নাগের কুণ্ডলী ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। রাখালদাসবাবু এটিকে জৈন তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের মূর্তি বলে মনে করেছিলেন। বৌদ্ধ ও জৈনমূর্তির এই সব নিদর্শন দেখে মনে হয় না কি যে ত্রিবেণীতে ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর মন্দির ছাড়াও বৌদ্ধ ও জৈন দেবদেবীর মন্দিরও ছিল? বিষ্ণুমন্দির বা সূর্যমন্দির বা শিবমন্দিরে ভূমিস্পর্শমুদ্রায় উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্তি-খোদিত স্তম্ভ থাকতে পারে না, অথবা জৈন তীর্থঙ্করের কোন মূর্তি থাকাও সম্ভব নয়। তাহলে এই নিদর্শন-গুলি এখানে এল কোথা থেকে? বাইরে থেকে হঠাৎ দু-একটি বৌদ্ধস্তম্ভ বা জৈনমূর্তি যে মসজিদ বা আস্তানা গড়ার সময় বহন করে আনা হয়েছিল, তাও অনুমান করার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ নেই। স্বভাবতঃই তাই মনে হয়, ত্রিবেণী ছিল বাংলাদেশের বৌদ্ধ, জৈন ও হিন্দু, সকল সম্প্রদায়ের অন্যতম তীর্থস্থান। হিন্দু-দেবালয়ের মতন বৌদ্ধ ও জৈন মন্দিরও সেখানে ছিল।

ত্রিবেণীতে এইসব নিদর্শন ছাড়াও আরও কয়েকটি নিদর্শনের সন্ধান পেয়েছি যা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ত্রিবেণীতে কয়েকটি দেবদেবীর মূর্তি অটুট অবস্থায় পাওয়া গেছে—একটি গণেশমূর্তি, একটি ব্রহ্মামূর্তি, একটি হরগৌরী-

মূর্তি, একটি গঙ্গামূর্তি। মূর্তিগুলি এখন ত্রিবেণীর ঘাটের পাশে রয়েছে এবং নিয়মিত পূজিতও হচ্ছে। মূর্তিগুলির গড়ন দেখে মনে হয় সেন আমলের মূর্তি এবং দ্বাদশ শতাব্দীর বেশি প্রাচীন নয়। এ ছাড়া আরও একটি ক্ষুদ্র নিদর্শন জাফর খাঁর আস্তানার মধ্যে পাওয়া গেছে। রেখ-মন্দিরের একটি ছোট্ট মডেল। এটি অবশ্য রেখ-দেউলের মডেল নয়, কোন বড় রেখ-দেউলের গণ্ডীর অলঙ্কার। রেখ-দেউলের মিনিয়েচারই এই অলঙ্কার। কিন্তু এর গুরুত্ব আছে এইজন্য যে, এই অলঙ্কার কোন বাংলা-মন্দিরের গায়ে থাকা সম্ভব নয়। একমাত্র কোন রেখ-দেউলের গণ্ডীতেই এরকম অলঙ্কার থাকতে পারে, যেমন বাংলাদেশে বর্ধমান জেলায় বরাকরের দেউলে আছে। কিন্তু রেখ-দেউলের এই ভাঙা ক্ষুদ্র প্রতিকৃতিটি ত্রিবেণীর আস্তানায় উড়ে এল কোথা থেকে? ত্রিবেণীর এই আস্তানা ও মসজিদ-প্রাঙ্গণেই একটি পাথরের রেখ-দেউল ছিল বলে মনে হয়। ত্রিবেণী অঞ্চল ত্রয়োদশ শতাব্দীতে কিছুকাল উড়িষ্যারাজের অধীন ছিল। উড়িষ্যারাজ যিনি ত্রিবেণীর ঘাট তৈরি করেছিলেন, তিনিই হয়ত একটি রেখ-দেউলও তৈরি করে দিয়েছিলেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কোন সময়। তারপর ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে সিংহবিক্রম জাফর খাঁ গাজীর ধর্মযুদ্ধে অন্যান্য দেবালয়ের সঙ্গে এই রেখ-দেউলটিও ধ্বংস হয়ে যায়।

ত্রিবেণীর পাষাণের কথা থেকে ত্রিবেণীর মুসলমানপূর্ব যুগের ইতিহাসের ধারার এই আভাস পাওয়া যায়। ধারাটি মোটামুটি এইভাবে খসড়া করা যেতে পারে:

ক। বৌদ্ধ, জৈন ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বীদের একটি সম্মিলিত তীর্থক্ষেত্র ছিল ত্রিবেণী। স্থানীয় হিন্দু সামন্তরা হয়ত পালযুগ থেকেই এই অঞ্চলে দেবালয় ইত্যাদি নির্মাণ করেছিলেন। সেন আমলে তীর্থকেন্দ্ররূপে ত্রিবেণীর প্রাধান্য খুব বেড়েছিল মনে হয়। মনে হবার কারণ শুধু পাথুরে নিদর্শন নয়। লক্ষ্মণ-সেনের সভাকবি ধোয়ী বর্ণিত পবনদূত-কাব্যের বিজয়পুর রাজধানী ত্রিবেণীরই কাছাকাছি, গঙ্গার পুবে বা পশ্চিমে, কোথাও ছিল মনে হয় (পশ্চিমতীরের হালিশহর—বীজপুর 'বিজয়পুর' বলে মনে হয়)। বিশাল বিষ্ণুমন্দিরের প্রতিষ্ঠা ত্রিবেণীতে এই সময় হওয়াই সম্ভবপর। সেন আমলের শেষ দিকে ভূদেব নৃপতির পূর্বপুরুষরা হয়ত ত্রিবেণী অঞ্চলের সামন্তরাজা ছিলেন। অথবা বখ্‌তিয়ারের নদীয়া-অভিযানের পর স্থানীয় কোন সামন্ত এই অঞ্চল

দখল করে কর্তৃত্ব বিস্তার করেছিলেন। তিনি বা তাঁর বংশধর হয়ত ভূদেব।

খ। ত্রয়োদশ শতাব্দীর গোড়া থেকে পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান অভিযান হওয়া সত্ত্বেও, হুগলী জেলার ত্রিবেণী-সপ্তগ্রাম-পাণ্ডুয়া-মহানাদ অঞ্চল প্রায় এক শতাব্দী-কাল আক্রমণমুক্ত ছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি উড়িষ্যারাজের আধিপত্য যখন ত্রিবেণী পর্যন্ত বিস্তৃত হয় তখন তিনি ত্রিবেণীর ঘাট এবং উড়িষ্যার মন্দিরের অনুকরণে রেখ-দেউল ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করেন।

গ। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে জাফর খাঁ গাজী ও তাঁর পরবর্তী যোদ্ধারা ত্রিবেণী-সপ্তগ্রাম অভিযান করে দখল করেন। চতুর্দশ শতাব্দীর গোড়াতে ত্রিবেণী মুসলমান-অধিকৃত হয়। স্থানীয় দেবালয়, দেবদেবী ইত্যাদি যুদ্ধে ধ্বংস হয়ে যায়।

পরে আর ত্রিবেণীতে কোন হিন্দু দেবালয় গড়া হয়েছিল কি না জানা যায় না। আশ্চর্যের বিষয় হল, ত্রিবেণীর মধ্যে এখন আর উল্লেখযোগ্য কোন দেবালয় নেই। ত্রিবেণীর ঘাটের কাছে যে দেবালয়গুলি আছে তা খুবই সাধারণ ও অর্বাচীন। মনে হয়, ত্রিবেণী পরে জাফর খাঁ গাজীর সমাধি ও মসজিদ নিয়ে মুসলমানদের অন্যতম তীর্থকেন্দ্রে পরিণত হওয়াতে কোন হিন্দু-রাজা বা জমিদার বেশি অর্থ ব্যয় করে আর ভাল মন্দির সেখানে নির্মাণ করেন নি। তা না করলেও, ত্রিবেণী তার পরেও হিন্দুদের অন্যতম প্রধান তীর্থস্থান ছিল দীর্ঘকাল। মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, পরে হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক সম্পর্কও মধুর হয়েছিল এবং হিন্দুরা ঘরে ঘরে নানা দেবদেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে নিরাপদে পূজার্চনাও করতেন। হিন্দু-পণ্ডিতরাও ত্রিবেণীকে দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম সুপ্রসিদ্ধ বিদ্যাকেন্দ্রে পরিণত করেছিলেন।

ত্রিবেণীর জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন

কেবল বাংলার কেন, সারা ভারতের সারস্বত ইতিহাসে ত্রিবেণীর জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের পাণ্ডিত্য ও প্রতিভা প্রহেলিকা বলে মনে হয়। কত কাহিনী, কত কিংবদন্তী যে তাঁর পাণ্ডিত্য কেন্দ্র করে রচিত ও কল্পিত হয়েছে, তার ঠিক নেই। কিন্তু আজ ব্যাবসাদারি বিদ্যার বাহ্যাড়ম্বরের যুগে বাংলার একজন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের অনন্যসাধারণ কীর্তির কথা আমরা প্রায় ভুলে গেছি। আমরা অনেকেই জানি না যে, নবদ্বীপ যখন বাংলার অক্সফোর্ড বলে গণ্য হয়েছিল, তখন নবদ্বীপের অপ্রতিদ্বন্দ্বী পণ্ডিতসমাজের বিস্ময়কর প্রতিভাকে বাংলার একজন পণ্ডিত অন্তত নিষ্প্রভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তিনিই ত্রিবেণীর জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন।

ব্রাহ্মণদের সামাজিক ইতিহাসে দেখা যায়, একসময় 'ত্রিবেণী-সমাজ' বলে একটি স্বতন্ত্র সমাজের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গে। চারটি মেলে এই সমাজ বিভক্ত ছিল। উত্তর দক্ষিণ পূর্ব ও পশ্চিম মেল। ত্রিবেণী তেলাণ্ডু গুড়ুপ বৈঁচি দ্বারবাসিনী মহানাদ পোলবা হুগলী বৈদ্যবাটী বলাগড় ইত্যাদি দক্ষিণ মেলের অন্তর্গত ছিল। একসময় এই ত্রিবেণী-সমাজে বহু কৃতী জ্যোতির্বিদ পণ্ডিতের আবির্ভাব হয়েছিল এবং তাঁরাই বোধ হয় সমাজবন্ধন করেছিলেন (বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস : ব্রাহ্মণকাণ্ড, ৪র্থ অংশ, পৃঃ ১৩১-১৩২)। জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের জন্মের আগেই দক্ষিণরাঢ়ে ত্রিবেণী বিদ্যাচর্চার অন্যতম কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। তাঁর বংশেও এই বিদ্যাচর্চার ধারা আগে থেকেই বজায় ছিল দেখা যায়। জগন্নাথের আদিপুরুষ দীননাথ ঠাকুর যশোহর থেকে ত্রিবেণীতে আসেন। জগন্নাথের পিতা রুদ্রদেব তর্কবাগীশ ও জ্যাঠা ভবদেব ন্যায়ালঙ্কার উভয়েই বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। নানাগ্রন্থের টীকাকার রুদ্রদেব তর্কবাগীশের রচিত 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নাটকের টীকা (রৌদ্রী টীকা নামে পরিচিত) একসময় বাংলাদেশে বেশ প্রচলিত ছিল। ভবদেব ন্যায়ালঙ্কারও স্মৃতিচন্দ্রাদি নানাগ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন। তার মধ্যে তিনি ঊর্ধ্বতন তিন পুরুষের নাম-পরিচয় লিপিবদ্ধ করে গেছেন। প্রথমত গঙ্গাদাস বিদ্যাভূষণ ভট্টাচার্য ষড়দর্শন, শৈবাদিসিদ্ধান্ত, পুরাণ মহাভারত চতুর্বেদ প্রভৃতি শাস্ত্রে

পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর পুত্র শিবকৃষ্ণ ন্যায়পঞ্চানন ভট্টাচার্যও পিতার মত
পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর পুত্র হরিহর তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্যও সর্বদা তর্কশাস্ত্রে
আলোচনায় মগ্ন থাকতেন। হরিহরের কালনির্ণয় করা খুব কঠিন নয়। তাঁর
জ্যেষ্ঠভ্রাতা, অর্থাৎ জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের জ্যেষ্ঠ পিতামহ চন্দ্রশেখর বাচস্পতি
বাংলাদেশের একজন শ্রেষ্ঠ স্মার্তপণ্ডিত ছিলেন। ভবদেব ১৬৫১ শকে (১৭২৯
খৃস্টাব্দে) 'তীর্থসার' গ্রন্থ রচনা করেন। তখন তাঁর বয়স একশ ধরেও এবং
তাঁর জন্মকালে তাঁর পিতা হরিহরের বয়স পঞ্চাশ ধরেও, হরিহরের জন্মকাল
১৫৮০ খৃস্টাব্দের পূর্বে হয় না। হরিহরের একশত বছর আগে (জগন্নাথের
বংশে ৫০ বৎসর করে পুরুষ গণনা করলে ভুল হয় না) তাঁয় পিতামহ গঙ্গাদাস
বিদ্যাভূষণ ভট্টাচার্যের জন্মকাল ১৪৮০ খৃস্টাব্দ ধরা যায়। ত্রিবেণীতে জগন্নাথ
তর্কপঞ্চাননের জন্ম ১৬৯৪ বা ১৬৯৫ সালে। অর্থাৎ শোভা সিং যখন বিদ্রোহ
করেন এবং ইংরেজরা দুর্গ নির্মাণের অনুমতি পেয়ে যখন কলকাতা শহরের
আসল ভিত্তি স্থাপন করেন, তখন ত্রিবেণীতে জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন জন্মগ্রহণ
করেন। তার প্রায় দু'শ বছর আগে হুসেন শাহের রাজত্বকাল থেকে জগন্নাথ-
বংশের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ত্রিবেণীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মনে হয়।

'ত্রিবেণ্যাং রঘু-রাঘবৌ'। এই রঘু হলেন জগন্নাথের ন্যায়শাস্ত্রের গুরু
রঘুদেব বাচস্পতি। তখনকার দিনে তিনি একজন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ছিলেন।
ত্রিবেণীতে তাঁর টোল ছিল। জগন্নাথ তাঁর কাছে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করতেন।
পিতা রুদ্রদেবের কাছে পড়তেন ব্যাকরণ। জ্যাঠা ভবদেব ন্যায়ালঙ্কারের
টোল ছিল বাঁশবেড়িয়ায়। সেখানে জ্যাঠার কাছে তিনি স্মৃতিশাস্ত্র পড়তেন।
একদিন ভবদেব তাঁর পিতা হরিহরের জ্যেষ্ঠভ্রাতা চন্দ্রশেখর রচিত 'দ্বৈতনির্ণয়'
নামক স্মৃতিগ্রন্থ কোন ছাত্রকে পড়াচ্ছিলেন। 'দ্বৈতনির্ণয়' স্মৃতিশাস্ত্রের
কূটবিষয়ের মীমাংসাগ্রন্থ। তার অর্থ করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। বহু
চিন্তা করেও একস্থানে অর্থের নিষ্পত্তি করতে না পেরে ভবদেব তাঁর ছাত্রকে
বলেন: "এই স্থানটি জ্যাঠামশায় ভাল বুঝতে পারেননি।" জগন্নাথ কাছেই
বসেছিলেন। ঈষৎ হেসে তিনি বললেন: "মহাশয়ের জ্যাঠা ঠিকই বুঝেছিলেন,
আমার জ্যাঠা বুঝতে পারছেন না।" অর্থাৎ ভবদেবের জ্যাঠা চন্দ্রশেখর
ঠিকই বুঝেছিলেন, জগন্নাথের জ্যাঠা ভবদেব বুঝতে পারছেন না। হঠাৎ
শুনলে জগন্নাথের জ্যাঠামি বলে মনে হবে, কিন্তু তা নয়। ছাত্রজীবন থেকে তাঁর

প্রতিভা সম্পর্কে এরকম আরও অনেক গল্প শোনা যায়। রঘুদেবের কাছে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন আরম্ভ করার এক বৎসর পরে জগন্নাথ নবদ্বীপের রমাবল্লভ বিদ্যাবাগীশকে বিচারে পরাজিত ও সন্তুষ্ট করেন। রমাবল্লভ হলেন বিখ্যাত পণ্ডিত জগদীশ তর্কালঙ্কারের বৃদ্ধ প্রপৌত্র।

জগন্নাথের বয়স যখন চব্বিশ বছর তখন তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়। অত্যন্ত নিঃস্ব অবস্থায় তিনি ত্রিবেণীতে একটি টোল খুলে অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। মৃত্যুর একমাস আগে পর্যন্ত তিনি এই অধ্যাপনা থেকে বিরত হননি। অর্থাৎ প্রায় নব্বুই বৎসর (১৭১৮ সাল থেকে ১৮০৭ সাল পর্যন্ত) তিনি অবিরাম অধ্যাপনা করে যান। অধ্যাপনার ইতিহাসে এও এক আশ্চর্য কীর্তি। তাঁর অধ্যাপনার বিষয় ছিল—ন্যায় স্মৃতি পুরাণ তন্ত্র সাহিত্য অলঙ্কার আয়ুর্বেদ বেদ-বেদান্ত ইত্যাদি। তার মধ্যে ন্যায়ের ছাত্রই ছিল সবচেয়ে বেশি। বাংলাদেশের পরবর্তী পণ্ডিতদের মধ্যে জগন্নাথের ছাত্র যে কতজন ছিলেন, তা সহজেই অনুমান করা যায়। ত্রিবেণীতে জগন্নাথের টোল ছিল তখন বাংলার অন্যতম সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়। নদীয়া, বর্ধমান ও শোভাবাজার (কলকাতা) রাজ-বংশের পোষকতাও তিনি পেয়েছিলেন। শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণ তখন 'নবরত্ন' সভা স্থাপন করেছিলেন। রাজা কালীকৃষ্ণের সভাপণ্ডিত রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার তাঁর 'মাধবমালতী' গ্রন্থে নবকৃষ্ণের এই নবরত্ন সভার বর্ণনা করেছেন:

সাক্ষাৎ বরদাপুত্র নামে জগন্নাথ।
তর্কপঞ্চাননরূপে ভুবন বিখ্যাত॥
মহাকবি বাণেশ্বর নদের শঙ্কর।
বলরাম কামদেব আর গদাধর॥—ইত্যাদি

তাৎকালিক বাঙালী পণ্ডিতসমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করেছিলেন তর্ক-পঞ্চানন এবং স্মার্ত রঘুনন্দনের মতন তাঁর প্রামাণিকগৌরব ছিল। জগন্নাথের জনৈক ছাত্র রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার তাঁর স্বরচিত 'বার্তিকমালা' গ্রন্থে গুরুস্তুতি প্রসঙ্গে বলেছেন:

বিদ্যাবিত্তবয়ঃকুলাদিবিভবৈঃ খ্যাতোঽদ্বিতীয়ঃ স্বয়ং
শশ্বদ্গেয়গুণো গুণাকরনৃণামাসীৎ ত্রিবেণীপুরে।
শ্রেয়ঃশ্রেণিবিধানসাধন-জগন্নাথেন নাম্নাপি চ
শ্রীপঞ্চাননসোদরো দ্বিজবরো যস্তর্কপঞ্চাননঃ।

জগন্নাথ শুধু বিদ্যায় নয়, বিত্তের দিক থেকে, বয়সে ও কুলমর্যাদায় অদ্বিতীয় ছিলেন। শোনা যায়, পিতৃশ্রাদ্ধের পর তিনি একটি 'অমৃতি'মাত্র সম্বল করে সংসারযাত্রা আরম্ভ করেন এবং মৃত্যুকালে নগদ লক্ষাধিক টাকা এবং বহু সহস্র টাকার আয়ের সম্পত্তি রেখে যান। জগন্নাথ পণ্ডিতের জীবনে এও এক বিস্ময়কর কীর্তি।

এ-হেন পণ্ডিত গ্রন্থরচনায় খুব কমই কালক্ষেপ করেছেন। যৌবনে তিনি 'রামচরিত' নাটকাদি রচনা করেছিলেন, কিন্তু তার কোন অস্তিত্ব নেই। জীবনের সায়াহ্নে স্যার উইলিয়ম জোন্সের অনুরোধে জগন্নাথ হিন্দুর ব্যবহার-শাস্ত্র 'বিবাদভঙ্গার্ণব' রচনা করে অমর কীর্তি স্থাপন করে যান। বাদ্‌শাহ ঔরঙ্গজীবের আমলে সংকলিত আইনসার সংগ্রহ 'ফতওয়া-ই-আলমগীরীর' সাহায্যে মুসলমানদের দেওয়ানী-মামলার বিচার হত। কিন্তু হিন্দুদের এই ধরনের কোন লিখিত ব্যবহারশাস্ত্র ছিল না। বিচার-সঙ্কট উপস্থিত হলে সাধারণত আদালতে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের এনে তার মীমাংসা করা হত। হিন্দুদের প্রাচীন সংস্কৃতগ্রন্থাদি থেকে একখানি ব্যবস্থাপুস্তক সংকলন করার প্রয়োজন প্রথম অনুভব করেন ওয়ারেন হেস্টিংস। বাংলার এগারজন পণ্ডিতের উপর তিনি এই কাজের ভার দেন (১৭৭৩ সালের মে মাসে)। তাঁরা দুই বছরে গ্রন্থ রচনা শেষ করেন। সেই গ্রন্থ প্রথমে ফার্সীতে তর্জমা করা হয় এবং ফার্সী তর্জমা থেকে পরে হলহেড সাহেব ইংরেজীতে অনুবাদ করেন (১৭৭৫ সালে)। ১৭৭৬ সালে বিলেতে 'A Code of Gentoo Laws' নামে এই গ্রন্থ মুদ্রিত হয়।

দুবার ভাষান্তরিত হবার ফলে মূল সংস্কৃত থেকে অনুবাদ অনেক পৃথক হয়ে যায়। তাই পরে আর একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ রচনার দরকার হয় এবং এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা প্রাচ্যবিদ্যানুরাগী উইলিয়ম জোন্স এই কাজের ভার নেন। জোন্সের সুপারিশেই মাসিক তিনশত টাকা বেতনে এবং তাঁর সহকারীদের মাসিক একশত টাকা বেতনে, ত্রিবেণীর জগন্নাথ তর্ক-পঞ্চানন এই কাজের জন্য নিযুক্ত হন। আরও দু-একজন পণ্ডিত এই কাজের জন্য নিযুক্ত হয়েছিলেন বটে, কিন্তু জগন্নাথ একাই এই কাজ তিন বছরের মধ্যে শেষ করেছিলেন। হিন্দু ব্যবহারশাস্ত্র মতামতের ভেদাভেদে কণ্টকিত। কি পরিমাণ পাণ্ডিত্য ও প্রতিভা থাকলে এই মতামতকণ্টকিত শাস্ত্রের সামঞ্জস্য

রক্ষা করে 'বিবাদভঙ্গার্ণবের' মতন গ্রন্থ, জীবনসন্ধ্যায় মাত্র তিন বছরের মধ্যে সঙ্কলন করা যেতে পারে, তা আজ আমাদের পক্ষে কল্পনা করাও সম্ভব নয়। এই কাজের জন্য জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত ৩০০৲ টাকা করে মাসিক পেন্সন পেয়েছিলেন। এই গ্রন্থ কোলব্রুক সাহেব ইংরেজীতে অনুবাদ করেন—নাম 'Digest of Hindu Law on Contracts and Successions'—এবং ১৭৯৮ সালে কলকাতা থেকে এই অনূদিত গ্রন্থ মুদ্রিত হয়। মূলগ্রন্থের একখানি হস্তলিখিত পুঁথি শোভাবাজারের রাজা রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরীতে আছে। আজও তা ছাপা হয়নি।

জগন্নাথ সম্বন্ধে বহু গল্প প্রচলিত আছে এবং চরিতকাররা তা লিপিবদ্ধ করে গেছেন (উমাচরণ ভট্টাচার্য রচিত জীবনী, রজনী গুপ্তের চরিতকথা, কালীময় ঘটকের চরিতাষ্টক ইত্যাদি দ্রষ্টব্য), এখানে তার উদ্ধৃতির প্রয়োজন নেই। একটি কাহিনী এখানে উল্লেখ করছি।[১] জনৈক ডাকাতের সর্দার শ্যাম মল্লিক একদিন রীতিমত দক্ষিণা দিয়ে জগন্নাথের কাছে জানতে চাইলে—'লুটের মালে চোরডাকাতের কোন স্বত্ব আছে কি না?' জগন্নাথ শাস্ত্রাদির প্রমাণসহ লিখিত ব্যবস্থা দিয়েছিলেন এই মর্মে যে লুটের মালে চোর-ডাকাতের স্বত্ব আছে। যেদিন তিনি ব্যবস্থাপত্র দেন, সেইদিন রাত্রেই তাঁর নিজের বাড়িতে ডাকাতি হয়। এটা গল্পের মতন শোনালেও, গল্প নয়, মনে হয় সত্য ঘটনা। কারণ ১২০২ সনের একটি তায়দাদে দেখা যায় যে, জগন্নাথ ডাকাতির কথা উল্লেখ করেছেন—"আমাদিগের বাটীতে ডাকাতি হইবাতে এবং কোটা পড়িয়া কাজপত্রাদিও পুস্তক অনেক তছরূপ হইয়াছে।" ব্যবস্থাপত্রও যে মিথ্যা নয় তার প্রমাণ 'বিবাদভঙ্গার্ণব' গ্রন্থেই চোরের স্বত্ব স্বীকার করা হয়েছে এই বলে যে "চোরিতদ্রব্যে চৌরস্য স্বত্বং স্বীকুর্বন্তি।"

জগন্নাথের দীর্ঘজীবনের কথা যাঁরা জানেন, তাঁরা তাঁর পরিবারের বিস্তারের ব্যাপারও অনুমান করতে পারেন। এরকম দীর্ঘজীবী বংশও সচরাচর দেখা যায় না। ওয়ার্ড সাহেব জগন্নাথের মৃত্যুকালের বয়ঃক্রম তিন জায়গায় তিনরকম উল্লেখ করেছেন—১০৮, ১১২ এবং ১১৭ বছর। নাতির নাতি দেখতে পেলেই

১ কাহিনীটি শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁর 'বাঙালীর সারস্বত অবদান' গ্রন্থে (১ম ভাগ, পৃঃ ২৩২) 'বিবাদভঙ্গার্ণব' গ্রন্থের উদ্ধৃতিসহ উল্লেখ করেছেন।

স্বর্গে বাতি দেওয়া হয়। জগন্নাথের এরকম বহুবার স্বর্গে বাতি জ্বালাবার সৌভাগ্য হয়েছিল। ১২০৯ সনে (ইং ১৮০৩ খৃস্টাব্দে) তিনি তাঁর বিষয়-সম্পত্তির যে বিবরণ দেন তাতে দখলকার হিসাবে ত্রিশজনের নাম দেখা যায় —এক পুত্র দশ পৌত্র, পনের প্রপৌত্র, তিন বৃদ্ধপ্রপৌত্র এবং জগন্নাথ স্বয়ং। এঁদের স্ত্রী, কন্যাসন্তানসহ, টোলের ছাত্র ও ভৃত্যাদির নিয়ে দৈনিক প্রায় তিনশ ব্যক্তি তাঁর সংসারে আহার করত। বিবাহ অন্নপ্রাশনাদি অনুষ্ঠানে আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধের প্রয়োজন হত না, কারণ পূর্বপুরুষরা সামনেই সশরীরে উপস্থিত থাকতেন। বাংলার পারিবারিক ইতিহাসেও এ-দৃষ্টান্ত বিরল। ১৮০৭ খৃস্টাব্দে জগন্নাথের মৃত্যু হয় ত্রিবেণীতে। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ, অষ্টাদশ শতাব্দী সম্পূর্ণ এবং উনবিংশ শতাব্দীর গোড়া—এই তিন শতাব্দীর ত্রিবেণী-সঙ্গম জগন্নাথের জীবনে ঘটেছিল। ত্রিবেণীতে জন্ম তাঁর সত্যিই সার্থক হয়েছিল। মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তাঁর স্মৃতি ও চিন্তাশক্তি একটুও ম্লান হয়নি। ত্রিবেণীর ঘাটে তিনি যখন তীরস্থ, তখন তাঁর এক প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ছাত্র তাঁকে বলেন— "গুরুদেব! নানাশাস্ত্র পড়িয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন, ঈশ্বর কি বস্তু। কিন্তু এককথায় তো বুঝিয়ে দেননি, ঈশ্বর কি রকম?" অন্তর্জলী অবস্থায় ঈষৎ হেসে মনে মনে একটি শ্লোক রচনা করে তর্কপঞ্চানন বলেন—

নরাকারং বদন্ত্যেকে নিরাকারঞ্চ কেচন।
বয়ন্তু দীর্ঘসম্বন্ধাদ্ নীরাকারাম্ উপাস্মহে॥

অর্থাৎ একদল ঈশ্বরকে নরাকার বলেন, কেউ কেউ বলেন নিরাকার। কিন্তু আমরা দীর্ঘ সম্বন্ধের জন্য (দীর্ঘকাল গঙ্গাতীরে বাসের জন্য) নীরাকারাকে (নীর=জল) উপাসনা করি।

জাফর খাঁ গাজী

বাংলার এক যুগসন্ধিক্ষণের আলো-অন্ধকারে ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে পশ্চিমবঙ্গে এক বিচিত্র মুসলমান নায়কের আবির্ভাব হয়েছিল। তিনিই ত্রিবেণীর জাফর খাঁ গাজী। অনেক কিংবদন্তী ও কাহিনী তাঁর ব্যক্তিত্ব ও কৃতিত্বকে কেন্দ্র করে পল্লবিত হয়ে উঠেছে। তার সবটা ইতিহাস না হলেও, অনেকটাই ইতিহাস। দুজন হিন্দু নৃপতিও জাফর খাঁর জীবনের সঙ্গে নানাভাবে জড়িয়ে আছেন। একজন মান নৃপতি, আর একজন ভূদেব নৃপতি। দুজনের জীবনই আজও রহস্যাবৃত। অনুসন্ধানলব্ধ নতুন কোন তথ্যের আলোকে আজও তাঁদের জীবনের ইতিবৃত্ত উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। ত্রিবেণীতে জাফর খাঁর মসজিদ, মাদ্রাসা ও সমাধির জীর্ণ নিদর্শন আজও রয়েছে। একেবারে ত্রিবেণীর পথের ধারে, গঙ্গার তীরে। কিন্তু তার মধ্যে যে অতীতের কত বিস্ময়কর কীর্তি স্তূপীকৃত হয়ে রয়েছে স্তরে স্তরে, কত কারিগরির করুণ ইতিকথা, তার খোঁজ কেউ রাখে না। আচার্য যদুনাথ সরকার ত্রিবেণীর এই জাফর খাঁর কীর্তিস্তম্ভকে—"a museum of Muslim Epigraphy"—বলেছেন। তাঁর কথার সঙ্গে আরও একটু যোগ করে বলা যায়—"and of Hindu Sculpture"। জাফর খাঁর মসজিদ ও সমাধিস্তম্ভ সত্যই তাই মুস্লিম শিলালিপি এবং হিন্দু মন্দির ও মূর্তি-ভাস্কর্যের মিউজিয়াম।

জাফর খাঁ গাজীর জীবনকথা কেউ লিপিবদ্ধ করে যাননি। শিলালিপি যা পাওয়া গেছে তাতে জাফর খাঁর কীর্তির সামান্য উল্লেখ ছাড়া বিশেষ বৃত্তান্ত কিছু নেই। শান্তিপুরনিবাসী মহীউদ্দিন ওস্তাগরের 'পাঁড়ুয়ার কেচ্ছা-কাব্যের' মধ্যে ত্রিবেণীর জাফর খাঁর নামটুকু ছাড়া আর কিছু নেই—

জাফর খাঁ গাজী রহিল ত্রিবেণী স্থানে।
গঙ্গা যারে দেখা দিল ডাক শুনি কানে।

আজ থেকে প্রায় একশ বছর আগে, ১৮৪৭ সালে, মনিসাহেব, জাফর খাঁর মসজিদ পরিদর্শন করতে গিয়ে মসজিদের মুত্ওয়াল্লীদের বা খাদেমদের কাছে রক্ষিত জাফর খাঁর একটি কুরসীনামা (বংশলতা) উদ্ধার করেছিলেন। সেই কুরসীনামা অবলম্বন করে তিনি জাফর খাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনকথা এশিয়াটিক

সোসাইটির জার্নালে প্রকাশ করেন।[১] এই বৃত্তান্ত থেকে জানা যায় যে, চাক্‌লা মুকস্‌দাবাদ, পরগণা কোনওয়ারের অন্তর্ভুক্ত মুণ্ডগাঁ থেকে জাফর খাঁ গাজী তাঁর ভাগনে বা ভাইপো শাহ সুফীর (পাণ্ডুয়ার) সঙ্গে ত্রিবেণী-সপ্তগ্রাম অঞ্চলে আসেন ইসলামধর্ম প্রচারের জন্য। প্রথমে তিনি মান নৃপতিকে ধর্মান্তরিত করে দীক্ষা দেন এবং পরে মহানাদের কাছে ভূদেব নৃপতির সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হন। তাঁর মুণ্ডটি যুদ্ধক্ষেত্রে পড়ে থাকে এবং দেহটি ত্রিবেণীতে সমাধিস্থ করা হয়। উগ্‌ওয়া খাঁ বা উলুগ খাঁ নামে জাফর খাঁর এক পুত্র ছিলেন। তিনি সপ্তগ্রামের হিন্দু রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করে রাজবংশের সকলকে ধর্মান্তরিত করেন এবং রাজকন্যাকে বিবাহ করেন। কিছুদিন পরে উলুগ খাঁও মারা যান। তাঁকেও ত্রিবেণীতে সমাধিস্থ করা হয়। খাঁজাদার বংশধররা ত্রিবেণীতে আজও আছেন এবং ফিরোজ শাহের কাছ থেকে তাঁরা খাঁ উপাধি পান।

সুলতান শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহের (১৩০১—১৩২২ খৃঃ অঃ) তিনটি শিলালিপি পাওয়া গেছে, দুটি বিহারে, একটি বাংলাদেশে। বাংলাদেশের শিলালিপিটি পাওয়া গেছে ত্রিবেণীর জাফর খাঁর সমাধিস্তম্ভ থেকে, লিপির তারিখ ৭১৩ হিজ্‌রা বা ১৩১৪ সাল। এই শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, সাতগাঁর শাসনকর্তা সাহাবুদ্দিন জাফর খাঁ, খান্‌-ই-জাহান ত্রিবেণীতে একটি মাদ্রাসা তৈরি করেছিলেন। এই মাদ্রাসাকে বলা হত দার-উল্‌-খয়রাৎ। শিলালিপির অনুবাদ এই :[২]

যিনি প্রশংসার পাত্র তাঁহার প্রশংসা হউক। দানের কর্তা, মুকুট ও শীলমোহরের অধিকারী, পৃথিবীতে ঈশ্বরের ছায়াস্বরূপ, দাতা, সদাশয়, মহানুভব, সকল জাতির দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, পৃথিবী ও ধর্মের সূর্যস্বরূপ জগতের পালনকর্তা, ঈশ্বরের দয়ার বিশেষ পাত্র, সুলেমানের রাজ্যের উত্তরাধিকারী রাজা আবুল মুজঃফর ফিরোজ শাহ সুলতান, ঈশ্বর সর্বদা তাঁহার রাজ্য রক্ষা করুন। তাঁহার রাজত্বকালে দয়ার গৃহ নামক এই বিদ্যালয় মহানুভব খাঁ,

১ An Account of the Temple of Triveni near Hugli, By D. Money : J. A. S., May 1847.

২ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত অনুবাদ : সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৫ বর্ষ।

সম্মানিত দাতা, প্রশংসাযোগ্য দানবীর সদাশয়, ইসলামধর্মের ও মানবজাতির সাহায্যকারী, সত্য ও ধর্মের ধূমকেতুস্বরূপ, রাজা ও রাজ্যাধিকারিগণের সহায়স্বরূপ, সত্যবিশ্বাসিগণের অভিভাবকস্বরূপ খাঁ মহম্মদ জাফর খাঁ, ঈশ্বর তাঁহাকে শত্রুগণ কর্তৃক জয়ী করিলেন (অর্থাৎ শত্রুগণ পরাভূত হইয়া তাঁহার জয়ের কারণ হইল) ও তাঁহাকে তাঁহার আত্মীয়স্বজনের নিকট ফিরাইয়া আনিলেন......তাঁহার আদেশে নির্মিত হইল, হিজরা ৭১৩—

৭১৩ হিজরায় তৈরি এই 'দয়ার গৃহ' ছাড়াও ত্রিবেণীতে আর একটি মাদ্রাসা জাফর খা গাজী নির্মাণ করেছিলেন পনের বছর আগে, ৬১৮ হিজরাতে, বা ১২৯৯ সালে। এই শিলালিপির মর্মার্থ হল :

তুর্ক (তুরস্ক জাতীয়) সিংহবিক্রম জাফর খাঁ......বীরসমূহের পরে সর্বাপেক্ষা দয়ালু গৃহনির্মাতা......রাজদ্রোহী অবিশ্বাসীগণকে খড়্গ ও ভল্ল দ্বারা নিহত করিয়া প্রত্যেক......কোষ্ঠাগার হইতে দান করিলেন......ও সত্যধর্মের শিক্ষিত ব্যক্তিগণকে সম্মান করা এবং ঈশ্বরের পতাকা উন্নত করিবার জন্য নির্মিত হইল, ৬৯৮ হিঃ—।

তারিখ অনুসারে প্রথম শিলালিপির (৬৯৮ হিঃ) সিংহবিক্রম জাফর খাঁ এবং দ্বিতীয় শিলালিপির (৭১৩ হিঃ) খাঁ মহম্মদ জাফর খাঁ কি একই ব্যক্তি ? আজ পর্যন্ত সকলেই এই দুই শিলালিপিতে উল্লিখিত দুই জাফর খাঁকে একই ব্যক্তি, অর্থাৎ জাফর খাঁ গাজী বলে মনে করেছেন। মনিসাহেব (এশিয়াটিক সোসাইটি জার্নাল, ১৮৪৭), স্টেপলটন সাহেব (এশিয়াটিক সোসাইটি জার্নাল, ১৯২২), হুগলী গেজেটীয়ারে ওমালি সাহেব এবং হুগলী জেলার কাহিনী-রচয়িতারা সকলেই দুই জাফর খাঁকে অভিন্ন মনে করে ভুল করেছেন। কিন্তু এই দুই জাফর খাঁ একই ব্যক্তি নন। প্রথম জাফর খাঁই হলেন আমাদের আলোচ্য জাফর খাঁ গাজী এবং দ্বিতীয় জাফর খাঁ পরবর্তী একজন শাসনকর্তা, গাজী নন। শিলালিপি ভাল করে অনুধাবন করলে দুই জাফর খাঁর চারিত্রিক স্বাতন্ত্র্য পরিষ্কার বোঝা যায়। গাজী জাফর খাঁ হলেন 'সিংহবিক্রম' জাফর খাঁ, যিনি রাজদ্রোহী বিধর্মীদের "খড়্গ ও ভল্ল দ্বারা" নিধন করেছিলেন। দ্বিতীয় জাফর খাঁ হলেন "রাজা ও রাজ্যাধিকারীগণের সহায়স্বরূপ" খান্-ই-জাহান জাফর খাঁ। গাজী জাফর খাঁ কোথাও রাজা ও রাজ্যাধিকারীদের সহায়স্বরূপ বলে নিজের পরিচয় দেন নি। সুতরাং দুইজন জাফর খাঁ যে একই

ব্যক্তি নন তা পরিষ্কার বোঝা যায়। আচার্য যদুনাথ সরকার সর্বপ্রথম এই দুই জাফর খাঁর রহস্য ভেদ করে বলেছেন :[১]

This Zafar Khan, Khan-i-Jahan of the reign of Sultan Shamsuddin Firuz was an altogether different person from Zafar Khan, the warrior-saint, who had built a Madrasa in the same locality (Tribeni) fifteen years earlier in 698 A. H.

ত্রিবেণীতে দুটি মাদ্রাসা তৈরি হয়েছিল পনের বছরের মধ্যে। গাজী জাফর খাঁ-ই প্রথম ত্রিবেণী-সপ্তগ্রাম অঞ্চল জয় করেন এবং তাঁর সঙ্গেই মান ও ভূদেব নৃপতির যুদ্ধ হয়। কৈকাসের রাজত্বকালে এই ঘটনা ঘটে। এই যুদ্ধেই গাজী জাফর খাঁ নিহত হন। কুরসীনামায় যে উগ্‌ওয়া খাঁর কথা বলা হয়েছে (গাজীর পুত্র বলে) আচার্য যদুনাথ মনে করেন তিনি লক্ষীসরাই শিলালিপিতে উল্লিখিত জিয়াউদ্দিন উলুগ খাঁ। শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহ রাজ্য দখল করার পর, মনে হয়, জিয়াউদ্দিন মুঙ্গের থেকে উলুগ খাঁকে সপ্তগ্রামে পাঠিয়েছিলেন, গাজী জাফর খাঁর প্রারব্ধ কাজ শেষ করার জন্য। উলুগ খাঁ সাতগাঁর হিন্দু রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন এবং ত্রিবেণীতে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। তাঁর মৃত্যুর পর সুলতান ফিরোজ শাহ সাতগাঁর শাসনভার সাহাবুদ্দিন জাফর খাঁকে অর্পণ করেন (এই জাফর খাঁ কৈকাসের রাজত্বকালে দেবকোর্টের শাসনকর্তা ছিলেন)। এই খান্‌-ই-জাহান্‌ জাফর খাঁই ৭১৩ হিজরাতে ত্রিবেণীতে দ্বিতীয় মাদ্রাসা দর-উল্‌-খয়রাৎ নির্মাণ করেছিলেন। সেইজন্যই শিলালিপিতে তাঁকে "রাজা ও রাজ্যাধিকারীগণের সহায়স্বরূপ" বলা হয়েছে।

আমাদের আলোচ্য গাজী জাফর খাঁর কীর্তির কতকটা আভাস পাওয়া যায় ৬৯৮ হিজরার শিলালিপি থেকে। গাজী সাহেবকে 'সিংহবিক্রম' বলা হয়েছে এবং তিনি যে খড়্গ ও ভল্ল দিয়ে অবিশ্বাসীদের নিধন করেছিলেন, তাও লিপিতে উল্লেখ করা হয়েছে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে ত্রিবেণী-সপ্তগ্রাম অঞ্চলে স্থানীয় হিন্দু রাজা মান নৃপতি ও ভূদেব নৃপতির সৈন্যদলের সঙ্গে গাজী

১ History of Bengal, Dacca Univ., Vol. 2., P. 77.

জাফর খাঁ ও তাঁর অনুগামীদের প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়েছিল। মান নৃপতির ধর্মান্তরিত হওয়ার কাহিনী হয়ত মিথ্যা নাও হতে পারে। কিন্তু ভূদেব নৃপতি যে রীতিমত প্রতিরোধ করেছিলেন তা কুরসীনামা ও শিলালিপি থেকে বোঝা যায়। ভূদেব নৃপতি ঐতিহাসিক ব্যক্তি, কিন্তু কে তিনি, তাঁর অন্য পরিচয় কি জানা যায় না। মনে হয় তিনি সেন আমলের শেষ দিকে, লক্ষ্মণসেন নদীয়া ছেড়ে চলে যাবার পরে, এই দিককার বিস্তৃত অঞ্চল দখল করে স্বাধীন সামন্ত রাজার মতন রাজত্ব করেছিলেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে ও চতুর্দশ শতাব্দীর গোড়াতে ত্রিবেণী-সপ্তগ্রাম-পাণ্ডুয়া-মহানাদ অঞ্চলে যখন প্রথম মুসলমান অভিযান হয়, তখন গাজী সাহেবরাই তাতে অংশ গ্রহণ করেন। জাফর খাঁ গাজী তার মধ্যে আদি ও অন্যতম। ভূদেব নৃপতির সঙ্গে যুদ্ধে গাজী জাফর খাঁ যে সম্পূর্ণ জয়ী হতে পারেননি এবং যুদ্ধে যে তিনি নিহত হয়েছিলেন, তাও কুরসীনামা ও শিলালিপি থেকে বোঝা যায়। পরে উলুগ খাঁ সেই সংগ্রাম চালিয়েছিলেন এবং খান্-ই-জাহান জাফর খাঁও নিশ্চিন্ত হতে পারেন নি।

সুতরাং জাফর খাঁ গাজীর অভিযানের সময় ত্রিবেণী-সপ্তগ্রাম-পাণ্ডুয়া-মহানাদ অঞ্চলে যে হিন্দু সামন্ত রাজাদের প্রচণ্ড আধিপত্য ছিল, তা পরিষ্কার বোঝা যায়। সপ্তগ্রাম ও ত্রিবেণী তখন সবচেয়ে বর্ধিষ্ণু স্থান ছিল, বাণিজ্য-কেন্দ্ররূপে সপ্তগ্রাম এবং ধর্মতীর্থ ও বিদ্যাকেন্দ্র হিসাবে ত্রিবেণী। ত্রয়োদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এই অঞ্চলে কিছুদিন উড়িষ্যার রাজবংশও আধিপত্য বিস্তার করেছিনেন এবং স্থানীয় বাঙালী হিন্দু রাজারা তাতে বাধা দেন নি, কারণ মুসলমান অভিযান কাছেই আরম্ভ হয়েছিল তখন। উড়িষ্যারাজ মুকুন্দদেব শোনা যায় ত্রিবেণীতে তীর্থযাত্রীদের জন্য ঘাট ও মন্দির নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। মান নৃপতি এই উড়িষ্যারাজেরই কোন বংশধর ছিলেন কিনা বলা যায় না। ত্রিবেণীতে হিন্দু রাজাদের পোষকতায় তৈরি বহু দেবালয় ছিল, পশ্চিমবাংলার অন্যতম প্রধান তীর্থস্থান ত্রিবেণীতে দেবদেবী ও দেবালয়ের সংখ্যাও প্রচুর পরিমাণে থাকা স্বাভাবিক। এখন সেই দেবালয় ও দেবদেবীর বিশেষ কোন অস্তিত্ব নেই কোথাও। জাফর খাঁ গাজী ও তাঁর পরবর্তী যোদ্ধাদের যুদ্ধের সময় সেই সব দেবালয় ও দেবমূর্তি ধ্বংস হয়ে গেছে। তার বিস্তৃত নিদর্শন ত্রিবেণীর জাফর খাঁর মসজিদ ও সমাধিস্তম্ভের সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে।

জাফর খাঁর মসজিদের আর একটি গুরুত্ব আছে। বর্তমানে বাংলাদেশে মুসলমান আমলের যত মসজিদ আছে, তার মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন মসজিদ হল ত্রিবেণীর জাফর খাঁর মসজিদ। 'তবকৎ-ই-নাসিরী'তে বলা হয়েছে যে লক্ষ্মণাবতীতে মহম্মদ-ই-বখতিয়ার (৫৯৬-৬০২ হিজরা) এবং হুসানুদ্দিন ইওয়াজ (৬১২-৬২৪ হিজরা) মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। তার কোন চিহ্ন নেই কোথাও। বাংলাদেশে মসজিদ-নির্মাণ সম্বন্ধে সবচেয়ে পুরানো শিলালিপি, পাওয়া গেছে মালদহ জেলার গঙ্গারামপুর থেকে, তারিখ ৬৪৭ হিজরা বা ১২৪৮ সাল। এই মসজিদেরও কোন চিহ্ন নেই এখন। এর পরেই হল ৬৯৮ হিজরার ত্রিবেণীর মসজিদ। সুতরাং ত্রিবেণীর জাফর খাঁর মসজিদই বর্তমানে বাংলা দেশের সবচেয়ে প্রাচীন মসজিদ।[১]

জাফর খাঁর সমাধির পূর্বদ্বারে পাথরসংলগ্ন একটি লৌহখণ্ড আছে, স্থানীয় লোক বলে 'গাজীর কুড়ুল'। গাজীর কুড়ুল নড়েচড়ে, পড়ে না। সিংহবিক্রম জাফর খাঁ যে খড়্গ ও ভল্ল নিয়ে অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন, গাজীর কুড়ুল তারই স্মৃতি বহন করেছে। কিন্তু রূপান্তরিত স্মৃতি। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কাছে আজ জাফর খাঁ ও তাঁর বংশধররা দেবতার মতন পূজা পান। শোনা যায়, সিংহবিক্রম জাফর খাঁও নাকি গঙ্গাদেবীর মূর্তি দর্শন করে মুগ্ধ হয়ে গিয়ে কোরানের বদলে গঙ্গাস্তোত্র আবৃত্তি করেছিলেন। স্তোত্রটি এই :

> সুরধুনি মুনিকন্যে তারয়েঃ পুণ্যবন্তং
> সা তরতি নিজ পুণ্যৈস্তত্র কিন্তে মহত্বম্।
> যদি চ গতিবিহীনং তারয়েঃ পাপিনং মাম্
> তদপি তব মহত্বং তন্মহত্বম্ মহত্বম্।

কোরানের বদলে গঙ্গাস্তব। ধর্মযোদ্ধা গাজী এইভাবে অবিশ্বাসীদের গঙ্গাদেবীকে বরণ করে হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই বরেণ্য হয়েছেন। বাংলার মাটিতে এইভাবেই মানুষ একধর্মের সঙ্গে অন্যধর্মের সমন্বয় করে নিয়েছে। বাঙালীর ধর্ম ও সংস্কৃতির এইটাই প্রধান বিশেষত্ব।

১ Pre-Mughal Mosques of Bengal : By M. Chakravarty : J. A. S. B. Vol. VI., 1910.

সপ্তগ্রাম

বাংলার গাঙ্গেয় সভ্যতার উত্থান-পতন হয়েছে গঙ্গার ভাঙাগড়ার তালে তালে। গঙ্গা একসময় ত্রিবেণীর কাছে এসে তিনটি ধারায় ভাগ হয়ে যেত। সরস্বতীর ধারা দক্ষিণ-পশ্চিমে সাতগাঁয়ের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হত। যমুনার ধারা দক্ষিণ-পূর্বে বয়ে যেত এবং ভাগীরথীর ধারা দক্ষিণে হুগলী ও আদিগঙ্গার প্রবাহপথে, কলকাতা, কালীঘাট, গড়িয়া, বারুইপুর, মগরার পাশ দিয়ে গিয়ে সমুদ্রে পড়ত। সরস্বতীর ধারা একসময় তমলুকের কাছে কোন খাড়িতে গিয়ে পড়ত এবং শুধু দামোদর ও রূপনারায়ণ নয়, অন্যান্য অজস্র ছোট ছোট নদীর জলধারা মিশত তার সঙ্গে। তমলুকের মতন সাতগাঁয়েও বাণিজ্যতরীর চলাচলের পথে কোন বাধা ছিল না। চতুর্দশ থেকে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত একাধিক বিদেশী পর্যটক, যাঁরা বাংলাদেশে জলপথে সাতগাঁয়ের বন্দরে এসেছেন, তাঁরা সকলেই বলেছেন যে, সমুদ্রকূল থেকে সপ্তগ্রামের দূরত্ব খুব বেশি নয়। একথা বলার তাৎপর্য হল এই যে, সরস্বতীর দক্ষিণ-পশ্চিমমুখী ধারা দামোদর, রূপনারায়ণ প্রভৃতি নদনদীর প্রবাহের সঙ্গে মিলিত হয়ে, ভাগীরথীর দক্ষিণাভিমুখী সম্মিলিত ধারায় বয়ে গিয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়ত। বণিকদের বাণিজ্যতরী সহজেই সমুদ্র ছেড়ে নদীপথে সপ্তগ্রাম এসে পৌঁছত এবং মধ্যযুগের বিদেশী পর্যটকরা তাই প্রায় সকলেই এসে সপ্তগ্রামে নামতেন, যেমন প্রাচীন হিন্দুযুগের পর্যটকরা নামতেন তমলুক বন্দরে। তমলুক বন্দরের প্রাধান্য কমতে থাকে অষ্টম শতাব্দী থেকে এবং নদীমুখে চড়া পড়ার জন্য তার পর থেকে তমলুকের দ্রুত অবনতি হতে থাকে। তমলুকের অবনতির পর থেকেই মনে হয় বন্দর হিসাবে পশ্চিমবঙ্গে সপ্তগ্রামের প্রাধান্য বাড়তে থাকে, নবম-দশম শতাব্দী থেকে। অর্থাৎ হিন্দুযুগেই (পাল ও সেনরাজাদের আমলেই) সপ্তগ্রামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। বন্দর কেন্দ্র করে সপ্তগ্রামে লোকালয় ও বাণিজ্যনগর গড়ে উঠতে থাকে। তারপর মুসলমানযুগের প্রায় গোড়া থেকেই সপ্তগ্রাম মুসলমান শাসকদের অন্যতম শাসনকেন্দ্র হয়ে ওঠে এবং চতুর্দশ থেকে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত সপ্তগ্রামের স্বর্ণযুগ বললে ভুল হয় না। সপ্তদশ শতাব্দীতে হুগলী-

ব্যাণ্ডেল-চুঁচুড়া এবং অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে কলকাতা বাংলার প্রধান বাণিজ্যনগর ও সভ্যতাকেন্দ্র হয়ে ওঠে। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ও ঐতিহাসিক প্রমাণ যা পাওয়া যায় তা থেকে সপ্তগ্রামের ইতিহাস সম্বন্ধে এছাড়া অন্য কোন ছবি আঁকা যায় না।

সপ্তগ্রামের অতীত ইতিহাসের নিদর্শন আজ অধিকাংশই সরস্বতীর প্রাচীন গর্ভে বিলীন। বণিকের বাণিজ্যতরী চলাচলে সরগরম সপ্তগ্রাম নগর ও সরস্বতী নদী দুই-ই আজ প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে। সরস্বতী এখন ক্রমবিলীয়মান খালে পরিণত হয়েছে এবং ত্রিবেণী-সপ্তগ্রাম অঞ্চলে আজও তার শীর্ণকায় অস্তিত্ব দেখা যায়। একখানা নৌকাও আজ সরস্বতীর বুকে দাঁড় বেয়ে চলতে পারে না, শীত গ্রীষ্মকালে জলের রেখাটুকু পর্যন্ত অনেক জায়গায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। সুতরাং সপ্তগ্রামের স্বর্ণযুগের কাহিনী রচনা করা আজ সত্যই কঠিন। তবু আশপাশের নিদর্শন, ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক প্রমাণাদি থেকে সপ্তগ্রামের লুপ্ত ইতিহাস কিছুটা পুনরুদ্ধার করা সম্ভব।

ইতিহাস, সাহিত্য ও পর্যটকদের বিবরণ থেকে সপ্তগ্রামের যে উল্লেখ পাওয়া যায়, তার কালানুক্রমিক পরিচয় এই :

১। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ, অর্থাৎ ১২৯৮ সাল থেকে একাধিক আরবী-ফারসী শিলালিপি পাওয়া যায় সাতগাঁ অঞ্চলে।

২। ১৩২৮ সালে মহম্মদ-বিন-তুঘলকের রাজত্বকালে বাংলাদেশের তিনটি শাসনকেন্দ্রের মধ্যে সাতগাঁ একটি বলে জানা যায়। পশ্চিমবঙ্গের প্রধান শাসনকেন্দ্র ছিল সাতগাঁ, বাকি দুটি ছিল লক্ষ্মণাবতী ও সোনারগাঁ।

৩। ফকরুদ্দিনের রাজত্বকালে ইবন্‌বতুতা বাংলাদেশে বেড়াতে এসে সাতগাঁর বন্দরে অবতরণ করেন—১৩৪৫-৪৬ সালে।

৪। চৈতন্য-জীবনীসাহিত্য 'চৈতন্যভাগবত' গ্রন্থে সপ্তগ্রামের বর্ণনা পাওয়া যায়—১৫৩০-৪০ সালে।

৫। ১৫৩৭-৩৮ সাল থেকে সাতগাঁ সম্বন্ধে পর্তুগীজদের বিবরণ পাওয়া যায়।

৬। রালফ ফিচও সাতগাঁয়ের উল্লেখ করেন—১৫৮৩-৯১ সালে।

৭। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে সপ্তগ্রামের বর্ণনা আছে—১৫৭৪ থেকে ১৬০৪ সালের মধ্যের কথা।

তারপরেই সপ্তগ্রামের অবনতির যুগ।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষদিকে সপ্তগ্রাম-ত্রিবেণী অঞ্চল মুসলমান অধিকারে আসে বলে মনে হয়। তার আগে সপ্তগ্রাম হয়ত কোন হিন্দু সামন্তরাজার শাসনাধীন ছিল। এই প্রসঙ্গে সেনরাজাদের 'বিজয়পুর' রাজধানীর কথা মনে পড়ে। লক্ষ্মণসেনের সভাকবি ধোয়ী সেনরাজাদের রাজধানী 'বিজয়পুর' বলে উল্লেখ করেছেন। 'পবনদূত' নামে যে দূতকাব্য ধোয়ী রচনা করেছেন তাতে বিজয়পুরের যে ভৌগোলিক অবস্থানের নির্দেশ পাওয়া যায়, তা থেকে বোঝা যায় যে, বিজয়পুর ত্রিবেণীর কাছে গঙ্গার তীরে কোথাও অবস্থিত ছিল। ত্রিবেণীর পূর্বতীরে হালিশহরের কাছে 'বীজপুর' অঞ্চল মনে হয় এই বিজয়পুরের স্মৃতি বহন করছে। লক্ষ্মণসেনের সময় থেকে সেনরাজাদের তিন জায়গায় তিনটি রাজধানী থাকাও অসম্ভব নয়। একটি ছিল, পশ্চিমবঙ্গে গঙ্গাতীরে বীজপুর বা বিজয়পুরে, দ্বিতীয়টি ছিল পাল রাজধানী রামাবতীর কাছে লক্ষ্মণাবতীতে, তৃতীয়টি ছিল পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুরে। বিক্রমপুর থেকে বোধ হয় অরিরাজ দনুজমাধব (দেববংশের বিখ্যাত দশরথদেব) সোনারগাঁয়ে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন, ১২৮০ সালের কাছাকাছি কোন সময়। সেই সময় দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গেও হয়ত বীজপুর থেকে সাতগাঁয়ের প্রাধান্য বাড়তে থাকে। তখন সাতগাঁ কোন হিন্দু সামন্তরাজার অধীন ছিল বলে মনে হয়। পশ্চিমবঙ্গে তুখরাল খাঁ ও উড়িষ্যারাজ প্রথম নরসিংহদেবের অভিযানের সময়, ১২৫২-৭৩ সালেও দেখা যায়, সপ্তগ্রাম মুসলমান অধিকারভুক্ত ছিল না এবং স্বাধীন হিন্দুরাজা সেখানে রাজত্ব করতেন :

> Saptagram (Satgaon) was still unsubdued and the district of Nadia was strewn with semi-independent Hindu Rajas (Dacca History of...Bengal : Vol. 2., P. 43)

এই হিন্দুরাজা কে ছিলেন জানা যায় না, হয়ত ভূদেব নৃপতি বা তাঁর পূর্বপুরুষ কেউ ছিলেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ দিকে সপ্তগ্রাম অঞ্চল মুসলমানরা যুদ্ধ করে দখল করেন। এই যুদ্ধে গাজী সাহেবরা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। ত্রিবেণীর জাফর খাঁ গাজীর জিহাদের কাহিনী থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। জাফর খাঁর মাদ্রাসার শিলালিপিও তার প্রমাণ। ১৩২৮ সাল থেকে মহম্মদ-বিন-তুঘলকের রাজত্বকালে সাতগাঁ দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের প্রধান শাসনকেন্দ্র হয় এবং আজম-উল্-মুল্ক ইয়াইয়া

সাতগাঁর শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। তারপর ফকরুদ্দিনের রাজত্বকালে বিখ্যাত পর্যটক ইবন্‌বতুতা যখন বাংলাদেশে আসেন তখন তিনি এই সাতগাঁ বন্দরে নামেন। অনেকে বলেন, ইবন্‌বতুতা চাটিগাঁ বা চট্টগ্রাম বন্দরে এসে নেমেছিলেন। কিন্তু একথা ঠিক নয়। বতুতা সাতগাঁ বা সপ্তগ্রাম বন্দরে এসেই নেমেছিলেন। তাঁর বিবরণ থেকেই তা পরিষ্কার বোঝা যায়। সাতগাঁ তখন সমুদ্রকূল থেকে বেশি দূরে ছিল না। সমুদ্রগামী বড় বড় বাণিজ্যপোত তখন সাতগাঁ পর্যন্ত সহজেই যাতায়াত করত। সাতগাঁ ছিল তখন দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের সব চেয়ে বড় বন্দর ও বাণিজ্য-নগর। তমলুকের পর তখন সাতগাঁয়ের সমৃদ্ধির যুগ। বতুতা পরিষ্কার বলেছেন যে, গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থলে যেখানে হিন্দু তীর্থযাত্রীদের সমাবেশ হয়, সাতগাঁ তার কাছেই অবস্থিত। সুতরাং সাতগাঁ কখনও চাটিগাঁ বা চট্টগ্রাম হতে পারে না। আচার্য যদুনাথ সরকারও এই কথা বলেছেন : [১]

> That Ibn Batuta entered Bengal through the Port of Satgaon admits of no doubt. The traveller's own statements dissipate all misgivings on this point...he says that it lay near the confluence of Ganges and the Jamuna where the Hindus went on pilgrimage and was situated on the sea-coast......That the Ganges and the Jamuna united near Satgaon and not near Chittagong is borne out by Abul Fazl (Jarrett., Vol 2., P. 120-121). Again, Chittagong was situated inland, off the sea-coast and could not obviously be the base from which Fakhruddin sailed out in summer with his flotilla for an attack upon Lakhnawati as stated by Ibn Batuta. So, the contention of Sudkawan being Chatigaon holds little water.

সুতরাং বতুতার 'SudKawan' যে চাটিগাঁ নয়, সাতগাঁ, তাতে কোন সন্দেহ নেই। সাতগাঁ থেকেই সোজা জলপথে ইবন্‌বতুতা শ্রীহট্টের মুসলমান ফকির-সন্দর্শনে যাত্রা করেছিলেন। বতুতার বিবরণ পড়ে সাতগাঁ বন্দরের

১ History of Bengal, Dacca Univ., Vol. 2., P. 100, Footnote.

যে ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে, আজ কোথায় সে ছবি অন্তর্ধান করে গেছে প্রাকৃতিক পরিবর্তনের ফলে, ভাবলেও অবাক হতে হয়। একসময় সাতগাঁ বন্দর থেকে বিশাল নৌবহর নিয়ে ফকরুদ্দিন যুদ্ধযাত্রা করেছিলেন লক্ষ্মণাবতীর দিকে। সরস্বতী নদীর তখন কি বিশাল রূপ ছিল এবং সমুদ্রের সঙ্গে তার যোগাযোগ কত ঘনিষ্ঠ ছিল, আজকের ক্ষীণস্রোতা সরস্বতীর দিকে চেয়ে তা কল্পনাও করা যায় না।

সপ্তগ্রামের স্বর্ণযুগের সূচনা তখন থেকেই হয়েছে, চতুর্দশ শতাব্দী থেকেই। পশ্চিমবঙ্গের বণিকশ্রেণী ধীরে ধীরে সপ্তগ্রামে এসে বসবাসও করতে আরম্ভ করেছেন। সুবর্ণবণিক, গন্ধবণিক তাম্বুলি-বণিক, প্রভৃতি সকল শ্রেণীর বণিক। বণিকদের প্রধান বসতিকেন্দ্র হিসাবে সপ্তগ্রামের প্রাধান্য এত বেড়ে যায় যে, বণিকসমাজে সপ্তগ্রামবাসীদের একটা স্বতন্ত্র কুলমর্যাদা গড়ে ওঠে। তার নাম 'সপ্তগ্রামী'কুল। ইবন্‌বতুতার পরিভ্রমণের প্রায় দু-শ বছর পরে তাই বৃন্দাবন দাস যখন 'চৈতন্যভাবগত' গ্রন্থ রচনা করেন, নিত্যানন্দ যখন সপ্তগ্রামে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের জন্য যান, তখন সপ্তগ্রামের বণিক-সমাজের যে বর্ণনা তিনি দিয়েছেন তাতে আদৌ কোনরূপ অতিরঞ্জন আছে বলে আমাদের মনে হয় না।

কথোদিন থাকি নিত্যানন্দ খড়দহে।
সপ্তগ্রামে আইলেন সর্বগণ সহে॥···
উদ্ধারণ দত্ত ভাগ্যবন্তের মন্দিরে।
রহিলেন মহাপ্রভু ত্রিবেণীর তীরে॥
কায়মনোবাক্যে নিত্যানন্দের চরণ।
ভজিলেন অকৈতবে দত্ত উদ্ধারণ॥···
যতেক বণিককুল উদ্ধারণ হৈতে।
পবিত্র হইল দ্বিধা নাহিক ইহাতে॥
বণিক তারিতে নিত্যানন্দ অবতার।
বণিকেরে দিলা প্রেমভক্তি-অধিকার॥
সপ্তগ্রামে প্রতি বণিকের ঘরে ঘরে।
আপনে শ্রীনিত্যানন্দ কীর্তন বিহারে॥
বণিক সকল নিত্যানন্দের চরণ।
সর্বভাবে ভজিলেন লইয়া শরণ॥

বণিক সভের কৃষ্ণভজন দেখিতে।
মনে চমৎকার পায় সকল জগতে ॥
নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর মহিমা অপার।
বণিক অধম মূর্খ যে কৈল উদ্ধার ॥
সপ্তগ্রামে মহাপ্রভু নিত্যানন্দ রায়।
গণসহ সঙ্কীর্তন করেন লীলায় ॥
সপ্তগ্রামে যত হৈল কীর্তন বিহার।
শত বৎসরেও তাহা নারি বর্ণিবার ॥

(চৈতন্যভাগবত : অন্ত্য, ৫ম অ)

ইবন্‌বতুতার প্রায় দু-শ বছর পরে সপ্তগ্রামের ছবি এঁকেছেন বৃন্দাবন দাস। এর মধ্যে একটুও অতিরঞ্জন আছে বলে মনে হয় না। সপ্তগ্রামে উদ্ধারণ দত্তের শ্রীপাটটিতে গেলে চৈতন্যভাগবতকারের এই চিত্রের কথা মনে পড়ে। আর মনে পড়ে, সপ্তগ্রামের সেই বণিকসমাজের কথা।

বখ্‌তিয়ার খিলজির নদীয়া অভিযানের প্রায় এক শতাব্দী পরে সপ্তগ্রামের উল্লেখ পাওয়া যায় মুসলমান শিলালিপিতে। এই এক শতাব্দীও (ত্রয়োদশ শতাব্দী) যে সপ্তগ্রাম কোন হিন্দু সামন্তনৃপতির অধীন ছিল, তা বুঝতে কষ্ট হয় না। সপ্তগ্রামের প্রাধান্য তখনও কমেনি। বরং সপ্তগ্রামের স্বর্ণযুগ তখন। আফ্রিকান পর্যটক ইবন্‌বতুতা সপ্তগ্রামের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা থেকেই তার সমৃদ্ধির পরিষ্কার আভাস পাওয়া যায়। শুধু প্রধান বন্দর-নগর নয়, বাংলার স্থলতানের বাসস্থান ছিল তখন সপ্তগ্রামে। নাম দেখেই বোঝা যায়, সাতটি গ্রাম জুড়ে ছিল সেকালের সপ্তগ্রামের সীমানা। সপ্তঋষির সাধনার স্থান ত্রিবেণীসঙ্গমের নিকটবর্তী সপ্তগ্রাম যে হবে তাতে কোন বিস্ময়ের কারণ নেই। কিন্তু সপ্তগ্রাম নামের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। সাতটি গ্রাম নিয়েই ছিল সপ্তগ্রাম।[১]

১ N. L. Dey : The Geographical Dictionary of Ancient and Mediaeval India : 2nd Ed., P. 178-179.

Formerly Saptagrama implied seven villages—Bansberia, Kristapur Basudevapura, Nityanandapura, Sibpur, Sambachora and Baladghati.

এই সাতটি গ্রামের প্রায় সবগুলিরই অস্তিত্ব এখনও আছে, কিন্তু তা দেখে তাদের অতীতের সেই যৌথসত্তা ও সমৃদ্ধির কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। বাঁশবেড়ের মতন দু-একটি গ্রামের বর্তমান অবস্থা দেখে কেবল এই কথাই মনে হয় যে, বাংলার সভ্যতা কতখানি প্রকৃতিনির্ভর, অর্থাৎ নদীমুখাপেক্ষী। তমলুক, সপ্তগ্রাম, হুগলীর মতন কলকাতাও যে একদিন পরিত্যক্ত সভ্যতার কলরবশূন্য সমাধিক্ষেত্রে পরিণত হবে না, তা বলা যায় না। অবশ্য আজ আর বাণিজ্যের সম্পদ শুধু জলপথনির্ভর নয়, রেলপথ-মোটরপথ ও বিমানপথ-নির্ভরও বটে। সুতরাং বন্দর-নগর হিসাবে ভবিষ্যতে নগণ্য বলে গণ্য হলেও, তমলুকের বা সপ্তগ্রামের দুর্ভাগ্য হয়ত কোনদিন কলকাতার হবে না।

সপ্তগ্রামের কথা বলি। সপ্তগ্রামের বিস্ময়কর সমৃদ্ধির জন্যই গাজী জাফর খাঁ সিংহবিক্রমে স্থানীয় বিধর্মীদের বিরুদ্ধে লড়াই করে এই অঞ্চল দখল করেছিলেন। সপ্তগ্রামের সাংস্কৃতিক প্রাধান্য ছিল বলেই এই অঞ্চলে হিন্দু দেবদেবী ও দেবালয়ের উপাদান দিয়ে মসজিদ ও মাদ্রাসা তৈরির প্রয়োজন হয়েছিল। পাণ্ডুয়া ত্রিবেণীর মতন সপ্তগ্রামের মসজিদেও হিন্দু ভাস্কর্যের নিদর্শন যথেষ্ট দেখা যায়। ভাঙা দেবমূর্তির পিছনে আরবী লিপি উৎকীর্ণ করা হয়েছে। উৎকীর্ণ এই সব আরবী লিপি থেকে জানা যায় যে, মামুদ শাহের রাজত্বকালে হিজরী ৮৯২, বা ১৪৫৭ সালে তববিয়ৎ খাঁ একটি মসজিদ নির্মাণ করেন।

সপ্তগ্রামে এখন এই মসজিদের ভগ্নাবশেষ ছাড়া কিছু নেই। আর-একটি বড় মসজিদ, ৯২৬ হিজরীতে (১৫২৯ সাল) সৈয়দ জামাল-দিন্ হুসেন নির্মাণ করেন। তৃতীয় মসজিদ উলুগ মুর ৮৯২ হিজরীতে (১৪৮৭ সালে) তৈরি করেন। এ ছাড়া সৈয়দ ফকরুদ্দিনের, তাঁর স্ত্রীর ও খোজার সমাধিও আছে। মসজিদ নির্মাণের লিপিগত প্রমাণ থেকে বোঝা যায়, পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যে সপ্তগ্রাম শুধু মুসলমান শাসনকেন্দ্ররূপে নয়, মুসলমান ধর্ম ও সংস্কৃতিকেন্দ্ররূপেও অগ্রগণ্য হয়ে ওঠে। হিন্দু ধর্মসংস্কৃতির অন্যতম কেন্দ্রকে

মুসলমান ধর্মসংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্রে পরিণত করার কাজ শেষ হয়ে যায় পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যে।

আনুমানিক ১৪৮৬ সালে শ্রীচৈতন্যের জন্ম হয়। তার প্রায় দু-শ বছর আগে জাফর খাঁ সপ্তগ্রাম অঞ্চল জয় করেন। চতুর্দশ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্যের জন্মের একশতাব্দী আগেই, সপ্তগ্রাম পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম মুসলমান শাসনকেন্দ্র হয়ে ওঠে। শ্রীচৈতন্যের জন্মের প্রায় দেড়শ বছর আগে আফ্রিকান পর্যটক ইবনবতুতা সপ্তগ্রামে এসেছিলেন। সপ্তগ্রামের সমৃদ্ধির স্বর্ণযুগ ছিল তখন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে সংঘাত ও বিরোধের পর্বও যে শেষ হয়ে গিয়েছিল তাও অনুমান করা যায়। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোক তখন সুখ শান্তিতে বাংলার শ্রেষ্ঠ বাণিজ্য-নগরে বসবাস করছে। মুসলমান গাজী সাহেবদের ঐতিহাসিক ভূমিকার কথা ভুলে গিয়ে হিন্দু-মুসলমান সকলেই তখন গাজীর দরগায় প্রার্থনা ও পুজো করছেন। এই শান্তি ও শৃঙ্খলার জন্যই হিন্দু বণিকরা তখন পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থান থেকে উঠে এসে সপ্তগ্রামে বসবাস আরম্ভ করেছেন। উনবিংশ শতাব্দীর কলকাতার মতন পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর সপ্তগ্রাম বণিকসম্প্রদায়ের কাছে প্রধান আকর্ষণকেন্দ্র ছিল। পরে সুবর্ণবণিকসমাজে স্বতন্ত্র 'সপ্তগ্রামীয় সমাজের' উৎপত্তি থেকে সপ্তগ্রামের প্রাধান্য ও প্রতিষ্ঠার কথা পরিষ্কার বোঝা যায়। সুবর্ণবণিকদের কুলজীগ্রন্থে দেখা যায় যে, ১৫১৪ খৃস্টাব্দে কর্জনাসমাজ ভঙ্গ হয়।

চৌদ্দশত ছত্রিশ শকে ভাঙ্গিল কর্জনা।……
বিশেষ বণিক সব ছিল সুখবাসী
পরিবার সহিত হইল নানাদেশী ॥

১৫৩৭ সালে কর্জনা সমাজের অজরচন্দ্র খাঁ পরলোক গমন করলে তাঁর দুই ভাগনে পতিরাজ দে ও নীলাম্বর দত্ত ভাট পাঠিয়ে দূরদূরান্তের সুবর্ণবণিকদের শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ করেন। সমাজভঙ্গের আগে কর্জনায় ৭৯২ ঘর সুবর্ণবণিকের বাস ছিল। তার মধ্যে ৫০২ ঘর নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য কর্জনায় উপস্থিত হন, বাকি ২৯০ ঘর হন না। এই ২৯০ ঘর সুবর্ণবণিক 'সপ্তগ্রামীয়' বলে পরিচিত হন।[১] এই কাহিনীর ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে। বোঝা যায়, সপ্তগ্রামীয়

১ নিমাইচাঁদ শীল, সুবর্ণবণিক, পৃঃ ৬৫।

বণিকদের মধ্যে ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধির জন্য তখন আত্মাভিমান দেখা দেয় এবং সেই-জন্য তাঁরা স্বতন্ত্র কুলমর্যাদা দাবি করেন। কুলজীর কালের সঙ্গে ঐতিহাসিক কালও অনেকটা মিলে যায়, কারণ বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত' রচনার কালও ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ার দিক। সেই সময়েই দেখা যায়, কর্জনার (বর্ধমান) সমাজ ভেঙে গিয়ে সপ্তগ্রামীয় সমাজ স্বতন্ত্র মর্যাদায় গড়ে উঠছে। সুতরাং বৃন্দাবন দাসের সপ্তগ্রামের সুবর্ণবণিকসমাজ-বর্ণনা আদৌ কাল্পনিক নয়, ঐতিহাসিক। পরবর্তীকালে অনেক বিখ্যাত বণিকবংশ এই সপ্তগ্রাম থেকে হুগলী-চুঁচুড়া হয়ে কলকাতা শহরে আসেন। তার মধ্যে কলকাতার অন্যতম প্রধান সুবর্ণবণিকবংশ চোরবাগানের মল্লিকরা উল্লেখযোগ্য। চোরবাগানের মল্লিকদের আদিপুরুষ মধু শীলের অধস্তন ত্রয়োদশ পুরুষ যাদব শীল প্রথম 'মল্লিক' উপাধি পান। মধু শীলের বংশধররা সপ্তগ্রামে এসে বসতি স্থাপন করেন। সপ্তগ্রামের অবনতির পর তাঁদের বংশধররা হুগলী-চুঁচুড়াতে বাস করে কলকাতার গোবিন্দপুর অঞ্চলে এসে বসতি স্থাপন করেন। কলকাতায় প্রথম আসেন জয়রাম মল্লিক। গোবিন্দপুরে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ নির্মাণের সময় তাঁরা বর্তমান পাথুরিয়াঘাটা অঞ্চলে উঠে যান।[১] বাংলার বণিকসমাজের এই বসতির ইতিহাসের সঙ্গে বাংলার ইতিহাসের উত্থান-পতনের ধারা যে কত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, তা এই দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যায়।

ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে নিত্যানন্দ সপ্তগ্রামে বণিকের ঘরে ঘরে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেছিলেন। তার প্রায় দু-শ বছর আগে গাজী জাফর খাঁ সপ্তগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে ইসলামধর্ম প্রচার করেছিলেন। জাফর খাঁর আমলে যে সপ্তগ্রাম অঞ্চলে বিষ্ণুপূজা, সূর্যপূজা প্রভৃতির রীতিমত প্রচলন ছিল এবং একাধিক বিষ্ণুমন্দির সূর্যমন্দির ইত্যাদি ছিল, তা এখানকার মসজিদ ও মাদ্রাসার গাত্রসংলগ্ন দেবদেবীর মূর্তি ও দেবালয়ের ধ্বংসাবশেষ দেখেই বোঝা যায়। যে-সপ্তগ্রামে একদিন বিষ্ণুপূজার প্রচলন ছিল সেইখানেই নিত্যানন্দ চৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মের প্রচার করেছিলেন। একসময় জাফর খাঁর অনুচর যে-মুসলমানরা সপ্তগ্রামে ধর্মযুদ্ধে বিষ্ণুদ্রোহিতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তাঁরাও

১ A short sketch of Raja Rajendra Mallick Bahadur and His Family—P. 8.

নিত্যানন্দের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেননি। প্রসঙ্গত বৃন্দাবন দাস তারও ইঙ্গিত করেছেন—

অন্যের কি দায়, বিষ্ণুদ্রোহী যে যবন।
তাহারাও পাদপদ্মে লইল শরণ॥
যবনের নয়নে দেখিতে প্রেমধার।
ব্রাহ্মণেও আপনারে জন্মায়ে ধিক্কার॥

(অন্ত্য, ৫ম অ)

বৃন্দাবন দাসের উক্তি অবিশ্বাস্য বলে মনে হয় না। ইতিহাসের কি বিচিত্র গতি! জাফর খাঁর দু-শ বছর পরে শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দের যুগে সপ্তগ্রামের হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতির যে পরিচয় পাওয়া যায়, তা উল্লেখযোগ্য। শুধু তাই নয়, বিষ্ণুদ্রোহী যবনরা (জাফর খাঁর যুগের) যে নিত্যানন্দের বৈষ্ণবধর্ম প্রচারে অশ্রুপাত করছেন, বৃন্দাবন দাসের এই সামাজিক চিত্রও স্মরণীয়।

বিপ্রদাসের 'মনসাবিজয়' কাব্যে সপ্তগ্রামের যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাও মিথ্যা নয়। কারণ সেটা পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ বা ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ার কথা অর্থাৎ সপ্তগ্রামের স্বর্ণযুগের কথা। সপ্তগ্রাম-সমাজের চমৎকার বর্ণনা করেছেন বিপ্রদাস:[১]

বুহিত্র চাপায়্যা কূলে চাঁদো অধিকারী বলে
দেখিব কেমন সপ্তগ্রাম
তথা সপ্তঋষি স্থান সর্বদেব অধিষ্ঠান
সোক্ষ মোক্ষ রম্যস্তর ধাম।…
অভিনব সুরপুরী দেখি ঘর সারি সারি
প্রতি ঘরে কনকের বারা
নানা রত্ন অধিশাল জ্যোতির্ময় কাঁচা চাল
গজমুক্তা প্রলম্বিত ঝারা।
সবে দেবে ভক্তি অতি প্রতি ঘরে নাগমূর্তি
রত্নময় সকল প্রাসাদে…

১ এশিয়াটিক সোসাইটির 'বিবলিওথিকা ইণ্ডিকা' সিরীজে প্রকাশিত ডঃ সুকুমার সেন সম্পাদিত 'মনসাবিজয়', ৮ম পালা, পৃঃ ১৪২-'৪৩।

নিবসে যবন জত তাহা বা বলিব কত
মোঙ্গল পাঠান মোকাদীম
ছৈয়দ মোল্লা কাজি কেতাব কোরান বাজি
দুই ওক্ত করে তছলিম ॥

বৃন্দাবন দাস ও বিপ্রদাসের সপ্তগ্রাম বর্ণনা প্রায় সমসাময়িক। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ থেকে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত সপ্তগ্রামের সামাজিক চিত্র এর মধ্যে পাওয়া যায়। সপ্তগ্রাম তখন অভিনব সুরপুরী, সারি সারি ঘর এবং প্রতি ঘরে 'কনকের বারা'। তা ছাড়া প্রতি ঘরে নানা দেবদেবীর মূর্তি। প্রচুর সম্ভ্রান্ত মুসলমানেরও বাস সপ্তগ্রামে।

এর প্রায় এক শতাব্দী পরে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম (১৫৭৪ থেকে ১৬০৪ খৃস্টাব্দের মধ্যে) তাঁর 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে সপ্তগ্রামের যে বর্ণনা করেছেন তাতেও সপ্তগ্রামের অবনতির স্বীকৃতি পাওয়া যায় না।

এসব সফরে যত সদাগর বৈসে।
যত ডিঙ্গা লৈয়া তারা বাণিজ্যেতে আইসে ॥
সপ্তগ্রামের বণিক কোথাও না যায়
ঘরে বসে সুখ মোক্ষ নানা ধন পায় ॥

"সপ্তগ্রামের বণিক কোথাও না যায়", এই কথার মধ্যে কি বণিকদের ধনসঞ্চয়গত আত্মতৃপ্তির ইঙ্গিত আছে? আছে—কিন্তু শুধু আত্মতৃপ্তির নয়, সপ্তগ্রামের অবনতিরও। আসলে মুকুন্দরাম সপ্তগ্রামের অবনতির যুগের বর্ণনা দিয়েছেন। কিন্তু তখনও যেহেতু সপ্তগ্রামের সমৃদ্ধির স্মৃতি অত্যন্ত উজ্জ্বল তাই তিনি এই ধরনের ইঙ্গিত করেছেন এবং বলেছেন যে, সপ্তগ্রামের লোক "ঘরে বসে সুখ মোক্ষ নানা ধন পায়।" কবিকঙ্কণের প্রতিটি কথার মূল্য আছে। বন্দর হিসাবে সপ্তগ্রামের প্রাধান্য কমে গিয়ে যখন হুগলীর প্রাধান্য বাড়ছে, বাণিজ্যতরী যখন আর সপ্তগ্রামে যাতায়াত করছে না তেমন, সপ্তগ্রামের অবনতির নিশ্চিত সূচনা হয়েছে যখন, তখন মুকুন্দরামের শ্রীমন্ত সদাগর সপ্তগ্রাম দর্শন করেন। এর প্রমাণ আমরা পর্তুগীজদের ইতিহাস ও বিবরণ থেকেও পাই।

ষোড়শ শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকেই দেখা যায় যে, পর্তুগীজ বণিকরা সাতগাঁর বন্দরে আনাগোনা আরম্ভ করেছে। অর্থাৎ চৈতন্যভাগবতকার

বৃন্দাবন দাসের সময় থেকেই সপ্তগ্রামে পর্তুগীজরা হানা দিচ্ছে। নিত্যানন্দ যখন সপ্তগ্রামে ধর্মপ্রচারের জন্য গিয়েছিলেন তখন সেখানে দু-চারজন পর্তুগীজ বণিককে দেখাও তাঁর পক্ষে আশ্চর্য নয়। ১৫৩৭-৩৮ সালেই দেখা যায় যে, পর্তুগীজ বণিকরা সপ্তগ্রামে বাণিজ্যকুঠি ও কাস্টম হৌস নির্মাণ করেছে এবং ১৫৬৫-৬৭ সালের মধ্যেই তারা ত্রিশ পঁয়ত্রিশটা জাহাজভর্তি কাপড়-চোপড়, চিনি, চাল ইত্যাদি সাতগাঁ থেকে চালান দিচ্ছে। ১৫৬৫-৬৭ সালে সীজার ফ্রেডারিক সপ্তগ্রামে আসেন। তখনও যে সপ্তগ্রামের অবনতির সূচনা হয়নি তা তাঁর বিবরণ থেকে বোঝা যায়:[১]

> The citie of Satagan is a reasonable fairie citie for a citie of the Moores, abounding with all things, and was governed by the King of Patane, and now is subject tó the great Mogol. I was in this kingdom foure moneths.

ফ্রেডারিকের আগমনের প্রায় বছর ত্রিশ পরে রালফ ফিচ্ যখন সাতগাঁয়ে আসেন (১৫৮৩-৯১ সালে) তখন সপ্তগ্রাম সম্বন্ধে তিনি সামান্য উল্লেখ করেছেন এই বলে—"a fairie citie for a citie of the Moores, and very plentiful of things."—। কিন্তু হুগলী তখন সপ্তগ্রামের বদলে পর্তুগীজদের 'porto Piqueno' বা ক্ষুদ্র বন্দর হয়ে উঠেছে। ষোড়শ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকেই যে সপ্তগ্রামের অবনতি আরম্ভ হয়েছে তা ফ্রেডারিকের এই ভৌগোলিক বিবরণ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়:

> A good Tides rowing before you come Satgan, you shall have a place which is called Buttor, and from thence upwards the Ships doe not goe, because that upwards the River is very shallow, and little water.

বেতোড়ের পর নদীর জল কমে যাওয়ায় বড় বড় নৌকা সাতগাঁ পর্যন্ত চলাচল করতে পারত না। ১৫৬৩ সালের কথা। রালফ ফিচ্ তার অনেক পরে এসেছিলেন সপ্তগ্রামে এবং তিনি আমাদের কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের সমসাময়িক বলা চলে। সুতরাং কবিকঙ্কণের কথায় সপ্তগ্রামের সমৃদ্ধির বদলে অবনতিই সূচিত হচ্ছে এবং তাঁর উক্তির তাৎপর্য আছে।

১ C. Frederick's Travels : Everymans Ed., Vol. 3., P 236—37.

কৃষ্ণরামের 'ষষ্ঠীমঙ্গল' কাব্যে ষষ্ঠীদেবী নানা দেশ ঘুরে নিজের পূজা ও প্রতিষ্ঠা দেখতে দেখতে সপ্তগ্রামে এসে পৌছলেন এবং দেখলেন—

সপ্তগ্রাম ধরণীতে নাহি তার তুল
চালে চালে বৈসে লোক ভাগীরথী কূল॥
নিরবধি যজ্ঞদান পুণ্যবান লোক···

ষষ্ঠীমঙ্গলের রচনাকাল ১৬৭৯-৮০ সাল। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ। সপ্তগ্রামের সমৃদ্ধি তখন অস্তমিত। সপ্তগ্রামের নাগরিক রূপ হয়ত তখনও একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি; তবু কৃষ্ণরামের ষষ্ঠীদেবী যা দেখেছিলেন তা সরস্বতীকূলের সপ্তগ্রাম নয়, ভাগীরথীকূলের ত্রিবেণী। বর্ণনা থেকেই বোঝা যায়। পরে প্রায় ১৭৭০ সালে, অর্থাৎ কৃষ্ণরামের ষষ্ঠীমঙ্গলের প্রায় এক-শ বছর পরে বিজয়রাম যখন 'তীর্থমঙ্গল' রচনা করেন, তখন সপ্তগ্রামের সব ঐশ্বর্য লুপ্ত হয়ে গেছে বোঝা যায়, কারণ বিজয়রাম হুগলীর নাম করলেও সপ্তগ্রামের নাম করেননি। আরও প্রায় একশতাব্দী পরে দীনবন্ধু মিত্র যখন তাঁর 'সুরধুনী কাব্য' রচনা করেন, তখনও সপ্তগ্রামের নামোল্লেখ করার তিনি প্রয়োজনবোধ করেননি। এইভাবে সপ্তগ্রামের উত্থান-পতনের ইতিহাসের ধারানুসন্ধান করা যায় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসেও। বৃন্দাবন দাস ও বিপ্রদাসের উজ্জ্বল বর্ণনার পর মুকুন্দরাম, ফ্রেডারিক ও ফিচের সন্দেহজনক ইঙ্গিত সপ্তগ্রাম প্রসঙ্গে বিশেষ লক্ষণীয়। কৃষ্ণরামের ত্রিবেণীকে সপ্তগ্রাম বলে ভুল করার মধ্যে সপ্তগ্রাম নামের করুণ স্মৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। তারপর বিজয়রাম ও দীনবন্ধুর চেতনা থেকেও দেখা যায় সপ্তগ্রাম অবলুপ্ত। এই হল সপ্তগ্রামের কাহিনী।

পাণ্ডুয়া

বাংলাদেশে দুটি বিখ্যাত পাণ্ডুয়া আছে, একটি মালদহ জেলায়, আর একটি হুগলী জেলায়। এই দুটি পাণ্ডুয়া যথাক্রমে বড় পেঁড়ো ও ছোট পেঁড়ো বলে পরিচিত। পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানযুগের ঐতিহাসিক নিদর্শন হুগলী জেলার পাণ্ডুয়া ত্রিবেণী সপ্তগ্রামে প্রচুর আছে। সব মিলিয়ে যেন হুগলী জেলার এই অঞ্চলে একটি মুসলমানযুগের মিউজিয়ম তৈরি হয়ে রয়েছে। শুধু মুসলমানযুগের নয়, হিন্দুযুগেরও। ত্রিবেণীর জাফর খাঁর মসজিদ এবং ছোট পাণ্ডুয়ার 'বাইশ দরওয়াজা' শাহ সুফির মসজিদ বিস্ময়কর প্রত্নতাত্ত্বিক কীর্তিস্তম্ভ। প্রতিটি স্তম্ভে, শিলাখণ্ডে ও ইটের গায়ে হুগলী জেলার এই অঞ্চলের অতীত ইতিহাস খোদাই করা আছে।

ট্রেনে যেতে বা গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের উপর দিয়ে যেতে দূর থেকে পাণ্ডুয়ার মিনার দেখা যায়। প্রায় ১২৭ ফুট উঁচু মিনার, পাঁচতলবিশিষ্ট, গোলাকার এবং উপরদিকের ব্যাস ক্রমেই ছোট হয়ে গেছে। স্থানীয় কিংবদন্তী হল, শাহ সুফিউদ্দিন এই অঞ্চলের (পাণ্ডুয়া ও মহানাদ) হিন্দু সামন্তরাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করে, হিন্দুদের জয়স্তম্ভের অনুকরণে এই মিনার তৈরি করেছিলেন। পাণ্ডুয়ায় শাহ সুফির আস্তানাও আছে। এ-অঞ্চলে কি করে মুসলমান আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হল তাই নিয়ে শান্তিপুরনিবাসী মহীউদ্দিন ওস্তাগর একটি কেচ্ছাকাব্য রচনা করেছেন। কাব্যের অবলম্বন হল শাহ সুফিউদ্দিন সম্পর্কিত কিংবদন্তী। এই কিংবদন্তীর উপর মোটা রঙের পোঁচ দিয়ে কবি মহীউদ্দিনের 'পাণ্ডুয়ার কেচ্ছা' রচিত। কেচ্ছার গোড়াতে কবি লিখছেন—

বড় পেঁড়ো ছোট পেঁড়ো তিরবেণী আর
পীরের খাতেরে আল্লা করেছেন তৈয়ার।...
আল্লার পেয়ারা পীর শাসুফী সোলতান
পাঁড়োয়া মকান মাঝে করেন মকান।
এ খাতেরে পাঁড়োয়া যে জাহের আলমে
শিরনি খতম হয় শাহ-সুফী নামে।—

এয়ছা ভাতে কত লোক করে কহা শুনা
নাহি জানে কোনরূপ নেহাৎ ঠিকানা।
আমি বান্দা গোনাগার পাঁড়োয়াতে যাইয়া
দেখিনু মহুরা ঘর নেহাৎ করিয়া।
বাদশাহী মকান হেন হয় অনুমান
দেল জুড়াইয়া যায় দেখিয়া মকান।…

এই ধরনের প্রস্তাবনার পর পাণ্ডুয়ার কাহিনী শুরু হয়েছে। পাণ্ডুয়া নগরে পাণ্ডু নামে এক রাজা ছিলেন। যেমন ভাগ্যবান, তেমনি পুণ্যবান রাজা। রাজপ্রাসাদের অন্দরমহলে এক কুণ্ড ছিল যার জলে তেত্রিশকোটি দেবতা অধিষ্ঠিত ছিলেন। সেই কুণ্ডের জলে মরা মানুষ চুবিয়ে নিলে জ্যান্ত হয়ে উঠত—

এয়ছা কেরামত ছিল সে পানীর শুনি
মোর্দা দিলে জিন্দা হইত কুদরতে রব্বানি।

পাণ্ডু রাজার আমলে পাণ্ডুয়ায় হিন্দুরা বসবাস করত। হিন্দুদের মধ্যে মাত্র পাঁচ ঘর মুসলমানের বাস ছিল। বাঘের কাছে যেমন বকরি বাস করে, সেই রকম হিন্দুদের কাছে এই পাঁচঘর মুসলমান খুব ভয়ে ভয়ে বাস করত—

কাফেরের কাছেতে মোমিন মোছলমান
বাঘের নিকট রইত বকরির সমান।
এছলামের কারবার করিতে নারিত
করিলে পাণ্ডব-রাজা সাজা দেলাইত।

এই অবস্থায় পাণ্ডু রাজার মুসলমান প্রজাদের দিন কাটত পাণ্ডুয়ায়। এমন সময় একদিন এক মুসলমান প্রজা পুত্রের জন্মোৎসব উপলক্ষে গো-বধ করল। হিন্দুরা জানতে পেরে ছেলেটিকে হত্যা করল। রাজার কাছে নালিশ করা হল, কিন্তু পাণ্ডু রাজা নালিশ গ্রাহ্য করলেন না। তখন পুত্রের মৃতদেহ নিয়ে পিতা গেল দিল্লীর বাদশাহের কাছে। উদ্দেশ্য হল—

আনিব সঙ্গেতে করি পাণ্ডব-সহরে
লড়িয়া পাণ্ডবরাজে দিব ছারে-খারে।

দিল্লীর সিংহাসনে তখন ফিরোজ শাহ আসীন। অভিযোগ শুনে তিনি তাঁর ভাইপো শাহ সুফীকে পাণ্ডুয়ায় পাঠালেন ফৌজ দিয়ে। শাহ

স্থফী এসে যুদ্ধ করলেন। জীয়তকুণ্ডের দৈবশক্তির প্রভাবে পাণ্ডুরাজার সৈন্যক্ষয় হয় না, শাহ্ স্থফীও আর পেরে ওঠেন না। হতাশ হয়ে তিনি দিল্লী ফিরে যাব-যাব করছেন, এমন সময় পাণ্ডুরাজার এক হিন্দু গোপালক, নাম নগর ঘোষ, শাহ্ স্থফীর কাছে এসে জীয়তকুণ্ডের কথা প্রকাশ করে দিলেন। নগর ইসলামধর্মে দীক্ষা নিয়ে যোগীবেশে রাজার অন্তঃপুরে প্রবেশ করে জীয়তকুণ্ডে গোমাংস ফেলে তার মাহাত্ম্য নষ্ট করে দিল। হিন্দুরাজা নিরুপায় হয়ে সপরিবারে ত্রিবেণীর গঙ্গায় ডুব দিলেন। পাণ্ডুয়া মুসলমান ফৌজের দখলে এল। শাহ্ স্থফীউদ্দিন বিরাট এক মসজিদ নির্মাণ করে পাণ্ডুয়াতেই বসবাস করতে লাগলেন। ওস্তাগর রচিত পাঁড়ুয়ার কেচ্ছা এইখানেই শেষ হয়ে গেল।

পাণ্ডুয়ার কিংবদন্তীর বা পাঁড়ুয়ার কেচ্ছার এই পাণ্ডুরাজা ও শাহ্ স্থফী-উদ্দিন ঐতিহাসিক ব্যক্তি কি না বলা যায় না। ব্লকম্যান সাহেব বলে গেছেন[১]—

> I have not met with Safiuddin's name in any Indian history, or in the numerous biographies of Muhammadan Saints.

পাণ্ডুরাজার কথাও কোন ইতিহাসে কোথাও পাওয়া যায় না। হাওড়া-হুগলী জেলার সীমান্তে প্রাচীন ভূরিশ্রেষ্ঠী বা ভুরশুটে পাণ্ডু নামে একজন রাজা ছিলেন। প্রসিদ্ধ দার্শনিক কন্দলীকার শ্রীধরাচার্যের পৃষ্ঠপোষক এই পাণ্ডুরাজা ছিলেন কায়স্থ রাজা পাণ্ডু দাস। কিন্তু পাণ্ডুয়ার পাণ্ডুরাজার সঙ্গে স্থান ও কালের দিক দিয়ে ভুরশুটের এই কায়স্থ রাজা পাণ্ডু দাসের কোন সম্পর্ক আছে বলে মনে হয় না। তবে সপ্তগ্রাম, পাণ্ডুয়া প্রভৃতি অঞ্চলে মুসলমান বিজয়ের পূর্বে যে একাধিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দু রাজা ছিলেন, তা আগে বলেছি। মুসলমান গাজীরা এই সব অঞ্চলে ধর্মপ্রচার করতে এসেছিলেন এবং ধর্মযুদ্ধে নিহতও হয়েছিলেন। ত্রিবেণী সপ্তগ্রামে তার ঐতিহাসিক প্রমাণ রয়েছে শিলালিপিতে। বখতিয়ার খিলজির অভিযানের এক শতাব্দীর মধ্যেই হুগলী জেলার বা দক্ষিণ রাঢ়ের এই অঞ্চলে মুসলমান অধিকার আরম্ভ হয়। কেবল রাজ্য জয় করা বা

১ Proc. Asiatic Soc. Bengal, 1870.

সিংহাসন দখল করা নয়। এইসময় থেকে (অর্থাৎ ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ থেকে চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত) ইসলামের সামাজিক প্রতিষ্ঠার অভিযান চলতে থাকে বাংলাদেশে। বলবনবংশের সুলতানদের রাজত্বকালে (১২৮৬—১৩২৮ খৃঃ) ইসলামের এই আত্মপ্রতিষ্ঠার অভিযান আরম্ভ হয়।[১]

...the rulers of the House of Balban in Bengal, finding no scope for warlike enterprises westward, concentrated their energy and resources in subduing the small Hindu principalities which till then were holding their own against Muslim domination.... To these were added the Ghazis and Awliyas of Islam, who from this time onward were to play an increasingly important role in the history of this country.

স্টেপল্‌টন সাহেব মনে করেন যে, দিল্লীর সুলতানরা এই সময় গাজীসাহেব ও আউলিয়াদের পাঠিয়ে ভিতর থেকে বাংলাদেশ জয় করার চেষ্টা করেন। এটা তাঁদের রাষ্ট্রনীতির অন্যতম কৌশল ছিল। তাঁর মতে, বাংলায় যে সব গাজী পীর ও আউলিয়ারা এসেছিলেন তাঁরা দিল্লীর সুলতানদের 'পঞ্চম বাহিনী'।[২] আচার্য যদুনাথ এই মত সমর্থন করেন না। তিনি বলেন:[৩]

We have no reason to hold that these 'warriors in the path of Allah' were so degenerate as to act as the Fifth Columnists of the Muslim state against the other.

ধর্ম ও নীতির দিক থেকে এঁদের আন্তরিকতায় সন্দেহ করার কোন কারণ নেই। সাধারণত তাঁরা নিজেদের দলবল নিয়ে ছোট ছোট হিন্দু রাজাদের এলাকার মধ্যে প্রবেশ করে কোন-না-কোন অজুহাতে 'সত্যাগ্রহ' করতেন। তারপর সেই সত্যাগ্রহী মুসলমান সাধুদের উপর যে কোন অন্যায় আচরণের সুযোগ নিয়ে মুসলমান শাসকদের সেনাদল সেই রাজ্যে প্রবেশ করত বিধর্মীদের সায়েস্তা করার জন্য। পাণ্ডুয়া ত্রিবেণী প্রভৃতি অঞ্চলের রোমাঞ্চকর কাহিনীর

১ History of Bengal, Dacca Univ., Vol 2. P. 68-70

২ এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নাল, ১৯২২, ১৮ খণ্ড।

৩ History of Bengal, Dacca Univ., Vol. 2, P. 76.

মধ্যে যদি কোন সত্যকার ইতিহাস বলে কিছু থাকে, তা হলে এই ধরনের কোন ইতিহাস থাকাই সম্ভবপর।[১]

If the popular Muslim tradition regarding the destruction of Gaur Govinda of Sylhet, and the Pandu Rajah of Hughly-Pandu contains any historical truth, it must, however, be admitted these saints surrounded by a horde of less scrupulous followers used to enter the territory of the Hindu Rajahs as 'Squatters' on some pretext or other. Then they would bring down the regular army of the Muslim State upon these infidel kings to punish them for infringing the rights of Musalmans!"

পাঁড়ুয়ার কেচ্ছার মধ্যে যে কাহিনীর অবতারণা করা হয়েছে তার মূলে এই ধরনের কোন ঐতিহাসিক ঘটনা আছে বলে মনে হয়। ত্রিবেণীর জাফর খাঁর ইতিহাসও তাই। শিলালিপি থেকে জানা যায়, জাফর খাঁ এসেছিলেন ত্রিবেণী অঞ্চলে ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে। তার কিছুদিন পরে মনে হয় শাহ সুফীউদ্দিন এসেছিলেন পাণ্ডুয়া অঞ্চলে চতুর্দশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে। গাজী সাহেবদের প্রধান লক্ষ্য ছিল, বৌদ্ধ ও হিন্দু বিহার ও মন্দিরগুলিকে মসজিদে পরিণত করে ইসলামধর্মের পাকাপোক্ত বনিয়াদ তৈরি করা। দেশের মধ্যে তীর্থস্থান বা ধর্মের আস্তানা না স্থাপন করলে জনসাধারণের মধ্যে ধর্মের প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব নয়। সাধারণের মনে ধর্মের প্রভাব বিস্তার করতে না পারলে কেবল তলোয়ারের জোরে বাংলাদেশে অন্তত ইসলামের সামাজিক প্রতিষ্ঠা যে সম্ভব হবে না, একথা গাজী সাহেবরা মর্মে মর্মে বুঝেছিলেন। হিন্দু মঠমন্দির ও দেবালয়ের ধ্বংসস্তূপের উপর মসজিদ ও সমাধি তৈরি করেছিলেন এবং হিন্দুদের দেবদেবীর মতন গাজী-পীরের মাহাত্ম্যকাহিনী প্রচারেও উৎসাহী হয়েছিলেন। হুগলী জেলার পাণ্ডুয়া-মহানাদ-ত্রিবেণী অঞ্চলে মুসলমান গাজী-পীরদের এই গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ভূমিকার বিস্ময়কর সব নিদর্শন রয়েছে।

১ History of Bengal, Dacca Univ., Vol 2, P, 69.

মহানাদ

বাংলার নাথধর্ম ও নাথসংস্কৃতির অন্যতম মহাকেন্দ্র মহানাদ। পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে বড় কেন্দ্র বললেও ভুল হয় না। হুগলী জেলার পাণ্ডুয়া ও পোল্‌বা থানার মধ্যে মহানাদ গ্রাম এখন গভীর জঙ্গলে ঢেকে গেছে। একসময় এই গ্রাম, পূর্বে ভাগীরথীমুখী দামোদর-শাখার তীরে, সুসমৃদ্ধ গ্রাম ছিল। বাংলার তথা পূর্বভারতের অন্যতম সাংস্কৃতিক দান যে নাথধর্ম, তার বৃহত্তম কেন্দ্র মহানাদে ছিল বলে মনে হয়। ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে নাথযোগীদের এত বড় সাধনকেন্দ্র আর কোথাও ছিল কিনা সন্দেহ। বাংলার শৈব ও তান্ত্রিকদের অন্যতম প্রধান সাধনকেন্দ্র মহানাদের নামকরণও হয়েছে নাথযোগীদের নাদতত্ত্ব বা নাদসাধনা থেকে।

মহানাদ সম্বন্ধে কিংবদন্তী আছে যে, মহাশঙ্খনাদ থেকে মহানাদ নাম হয়েছে। এখনও নাকি মধ্যে মধ্যে গভীর রাত্রে মহানাদের কোন দেউল থেকে শঙ্খ মৃদঙ্গ ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনি হতে থাকে। বহু দূর থেকেও লোকে তা শুনতে পায়। এই কিংবদন্তী আপাতবিচারে অর্থহীন মনে হলেও, একেবারে অর্থহীন নয়। নাথযোগীদের নাদসাধনার সুপ্রাচীন ধারার ঐতিহ্য কিংবদন্তীর এই শঙ্খ মৃদঙ্গধ্বনির মধ্যে সুন্দরভাবে প্রতিধ্বনিত হয়েছে। নাথযোগীরা বলেন, চিত্তকে মন্ত্রের সাহায্যে নাদরূপ ব্রহ্মশক্তিতে লীন করাই তাঁদের সাধনার উদ্দেশ্য। নাদে জগৎ প্রতিষ্ঠিত। নাদরূপ মহাশক্তি জগৎরূপে প্রকাশিত। নাদের জ্ঞান না হলে জগতের জ্ঞান হয় না। নাদ আয়ত্ত হলে জগতও সাধকের আয়ত্তে আসে। নাথযোগীরা তাই মন্ত্রসাধনের উপর জোর দিয়েছেন। যোগী যিনি তিনি যথাবিধি ধ্বনি ও নাদ অবলম্বনে নিজের অভিব্যক্তি কামনা করেন। নাদের সঙ্গে মনকে যুক্ত করাই সাধকের কাজ। 'হঠযোগপ্রদীপিকা,' 'যোগতারাবলী' প্রভৃতি গ্রন্থে তাই নাদানুসন্ধানের বৃত্তান্ত বর্ণনা করা হয়েছে। নাদসাধনার প্রথম-অবস্থায় প্রাণবায়ু যখন ব্রহ্মরন্ধ্রে যায় তখন সাগর-গর্জন, মেঘধ্বনি, ভেরীধ্বনি শোনা যায়। মধ্য-অবস্থায় প্রাণবায়ু যখন ব্রহ্মরন্ধ্রে প্রবেশ করে তখন শঙ্খ-ঘণ্টাদির শব্দের মতন ক্ষীণ শব্দ শোনা যায়। অন্ত-অবস্থায় প্রাণবায়ু ব্রহ্মরন্ধ্রে সুস্থির হলে ছোট ঘণ্টা, বাঁশি, বীণা,

ভ্রমরগুঞ্জনের মতন আরও ক্ষীণতর নাদ শোনা যায়। তারপর মন সমাধি লাভ করে।

নাদসাধনার এই অবস্থান্তরের কথা ভাবলে মনে হয় যেন সাধক ক্রমেই বাইরের জগতের কোলাহল ও গণ্ডগোল থেকে দূরে বহুদূরে চলে যাচ্ছেন। প্রথমে তিনি যে সাগরগর্জন, মেঘগর্জন, ভেরীনিনাদ শুনছিলেন তা ক্রমে মাদল শঙ্খ ঘণ্টার ক্ষীণতর শব্দে পরিণত হয়ে ধীরে ধীরে বাঁশি বীণা ও ভ্রমর-গুঞ্জনের সূক্ষ্মতম শব্দে লীন হয়ে যায়। এই নাদসাধনা নাথযোগীদের কাছে যে কত গুরুত্বপূর্ণ তা গোরক্ষনাথের এই বাণী থেকে বোঝা যায়:

শ্রীআদিনাথেন সপাদকোটি লয়প্রকারাঃ কথিতা জয়ন্তি।
নাদানুসন্ধানকমেকমেব মন্যামহে মুখ্যতমং লয়ানাম্॥

"শ্রীআদিনাথ মহাদেব সপাদকোটিপ্রকার চিত্তবৃত্তি নিরোধের উপায় বলেছেন। সব রকম উপায়ই বর্তমান রয়েছে। কিন্তু আমরা কেবল নাদানুসন্ধানকেই লয়সাধনের মুখ্যতম উপায় বলে জানি।"

শব্দ হমারা খরতর খাড়া রহনি হমারী সাচী।
দেখৈ লিখী না কাগদ মাড়ী সো পত্রী হম বাচী।
মন বাধুগা পবন স্যু পবন বাধুগা মন স্যু।
তচ বোলৈগা কোবত স্যু।

"নাথদের উচ্চারিত শব্দ খাড়ার ন্যায়, রহনিও তার অনুরূপ। তাঁরা পরমাত্মা প্রেরিত সেই পত্র পড়েছেন যা লেখাও হয়নি, কাগজেও নেই। যখন মন ও পবন একত্রে বাঁধা পড়বে তখন অনাহত নাদের উচ্চারণ হবে।"

শব্দ কহাঁ সে আয়া কহো শব্দ কা বিচার।
নহী তো মালা তিলক ধরো উতার।

প্রথমে শব্দের বিচার করা কর্তব্য, তা না হলে তিলকমালা ধারণ করা বৃথা। নাদতত্ত্ব ও নাদানুসন্ধানের এই ইতিহাসের সঙ্গে মহানাদের কিংবদন্তীটির বিচার করলে এক বিচিত্র সামঞ্জস্য রয়েছে দেখা যায়। নাদানুসন্ধানের প্রথম মধ্য ও অন্ত অবস্থার নানারকমের শব্দ ও ধ্বনির সঙ্গে মহানাদের দেউলের ধ্বনির আশ্চর্য মিল আছে। নাথযোগীদের নাদসাধনার ঐতিহ্যই অনুরঞ্জিত হয়ে উঠেছে 'মহানাদ' নামের কিংবদন্তীর মধ্যে। এছাড়া 'মহানাদ' নামের আর কোন ব্যাখ্যা করা যায় না।

নাথযোগীদের নাদসাধনার সঙ্গে 'মহানাদ' নামের প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে জেনে মহানাদে গিয়ে আমি দুটি বিষয় বিশেষভাবে অনুসন্ধান করি। প্রথম বিষয় হল, মহানাদে নাথযোগীরা এখনও আছেন কি না, অতীতে ছিলেন কি না এবং মহানাদের শৈবমঠের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক কি ছিল? দ্বিতীয় বিষয় হল, মহানাদে শিব ও শক্তিপূজার একদা প্রাধান্যের ধারার কোন পরিচয় আজও পাওয়া যায় কিনা? মহানাদে এই দুটি বিষয়ের অনুসন্ধান করাই আমার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। স্থানীয় ব্যক্তিদের সহযোগিতায় এই দুটি বিষয় সম্বন্ধে যতটুকু তথ্য আমি সংগ্রহ করতে পেরেছি তাতে পরিষ্কার প্রমাণ হয় যে, একসময় মহানাদ হুগলী জেলার—তথা দক্ষিণরাঢ়ের মধ্যে নাথধর্মের ও নাথযোগীদের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ছিল। নাথধর্মের দিক থেকে বিচার করলে মহানাদের ঐতিহাসিক প্রাচীনত্ব নিঃসন্দেহে পালযুগের নবম-দশম শতাব্দী পর্যন্ত টানা যায়।

জটেশ্বরনাথের মন্দিরের দক্ষিণে নগরপাড়ায় একসময় প্রায় দেড়শ ঘর যোগীর বাস ছিল। স্থানীয় অধিবাসীরা বলেন, এক শতাব্দী আগেও যথেষ্ট যোগীর বাস ছিল নগরপাড়ায়। বর্তমানে মাত্র একটি যোগী পরিবারের বাস আছে সেখানে। যোগীদের আত্মীয়স্বজন আরামবাগ মহকুমার প্রতাপনগরে থাকেন। মহানাদের ঈশানকোণে মাইল তিনেক দূরে, প্রাচীন মহানাদ মৌজার অন্তর্ভুক্ত 'যোগীডাঙা' বলে একটি গ্রাম আছে। গ্রামটি এখন মুসলমানপ্রধান গ্রাম। পাণ্ডুয়ার কাহিনী থেকে জানা যায়, মুসলমান অভিযানের আগে পাণ্ডুয়া অঞ্চলের একজন হিন্দু রাজা ছিলেন, তাঁর রাজধানী ছিল মহানাদে। মুসলমান অভিযানের পর পাণ্ডুয়া ও মহানাদ অঞ্চলে গাজীদের ধর্মযুদ্ধ সম্বন্ধেও অনেক গল্প শোনা যায়। এই সব গল্পের অন্তরালে যে ইতিহাস লুকিয়ে আছে, তা হল হিন্দুদের ধর্মান্তরের ইতিহাস। বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের হিন্দুদের এই সময় ধর্মান্তরিত করা হয়। তখন হিন্দু ব্রাহ্মণ্যধর্মের এমন ভয়াবহ প্রতিক্রিয়াশীল রূপ প্রকট হয়ে উঠেছিল সমাজে যে, হিন্দুদের মধ্যে বৃহত্তর অংশ (ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য ছাড়া) তার প্রতি আদৌ শ্রদ্ধাবান ছিলেন না। ব্রাহ্মণ্যধর্মের গোঁড়ামি হিন্দুদের বিরাট অংশকে সমাজে অপাংক্তেয় করে রেখেছিল। মুসলমানযুগের ব্যাপক ধর্মান্তরের মধ্যে তারই স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল। ইসলামধর্মের মধ্যে যে উদার গণতান্ত্রিক আবেদন আছে,

ব্রাহ্মণ্যধর্মের অনুদারতার যুগে আমাদের দেশের হিন্দু জনসাধারণ তাতে সাড়া দিতে বিশেষ দ্বিধাবোধ করেননি। এই সব কারণে যে সব বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের হিন্দুরা মুসলমানযুগে ইসলামধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে নাথযোগীরাও ছিলেন। দক্ষিণরাঢ়ে হুগলী জেলায় পাণ্ডুয়া-মহানাদ অঞ্চলে তখন নাথযোগীদের বেশ বসবাস ছিল। বিশেষ করে, নাথধর্মের প্রধান সাধনকেন্দ্র মহানাদ কেন্দ্র করে তাঁদের বসতি যে গড়ে উঠেছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাঁদের মধ্যে একাংশকে পাণ্ডুয়া-হুগলী অঞ্চলের বিজয়ী মুসলমানরা ধর্মান্তরিত করেছিলেন। ত্রয়োদশ চতুর্দশ শতাব্দীর কথা। তারই স্মৃতি বহন করছে মহানাদ মৌজার অন্তর্গত যোগীডাঙা। জটেশ্বরনাথ মঠের প্রাচীন ভূমিদানপত্রেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়। নবাব জাফর খাঁর মোহরাঙ্কিত দানপত্রে উল্লেখ আছে—

> সেখ আলি দতমন্দ ওরফ ভোলানাথ আর ২ জুগীসমেত মোছলমানিতে ভুক্ত হইল—

জটেশ্বরনাথের বর্তমান সেবায়েত রমেন্দ্রকৃষ্ণ দানপত্রগুলি আমাকে যত্ন করে দেখিয়েছিলেন। দানপত্র যাঁরা দিয়েছেন, পূর্বাপর তাঁদের কথা এইভাবে উল্লেখ করা আছে—

> দিল্লির বাদসা—পূর্বে কোন বাদসা দিয়াছিল তাহার নাম জানি না—
> 'জাঙ্গিরশা গাজিবাদসা—
> জমিদার রাজাধিমহারাজ ৺চন্দ্রকেতু—
> তাহার পর বেন্ধা রাজা অনেক পুরুষ গত হইল—
> তাহার পর রাজাধিমহারাজ ৺কীর্তিচন্দ্র তাহার পর রাজাধিমহারাজ ৺চিত্রসেন তাহার পর রাজাধিমহারাজ ৺তিলকচন্দ্র তাহার পর রাজাধিমহারাজ শ্রীযুক্ত তেজচন্দ্র

জমিদার রাজাধিমহারাজ চন্দ্রকেতু কে জানা যায় না। তাঁর আগে দিল্লীর বাদ্শাহরা কে কে দানপত্র দিয়েছিলেন তাও জানা যায় না। অষ্টাদশ শতাব্দীর বর্ধমানের মহারাজাদের এই দানপত্র থেকে এইটুকু শুধু বোঝা যায় যে, তারও অনেক আগে থেকে মহানাদের শৈবমঠের দেবোত্তর ভূমির দানপত্র দেওয়া হয়েছে—প্রায় পঞ্চদশ ষোড়শ শতাব্দী থেকে। কারণ, "বেন্ধা রাজারা অনেক পুরুষ গত হইল" বলা আছে। তার আগে চন্দ্রকেতু জমিদার রাজার উল্লেখ

আছে। তার আগে দিল্লীর বাদশাহদের কথা আছে। খুব সংযত হিসাবেও পঞ্চদশ ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত জটেশ্বরনাথ মঠের ধারাবাহিক দানপত্রের জের টানা যায়।

মুসলমানযুগের আগে হিন্দু রাজাদের দানপত্রের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না, পাওয়া সহজে সম্ভব নয়। যদি কোন তাম্রপট্টলিপিতে তার অস্তিত্ব থাকে তাহলে মহানাদের মাটির তলায় বা ধ্বংসস্তূপের মধ্যে তা সমাধিস্থ হয়ে রয়েছে। বাংলাদেশের আরও অনেক প্রাচীন ঐতিহাসিক স্থানের মতন মহানাদও ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিভাগের কাছে উপেক্ষিত স্থান। সুতরাং কবে গ্রামের কৃষক বা মজুরের খোন্তাকোদালের আঘাতে মহানাদের ভূগর্ভস্থ ঐতিহাসিক নজির দৃষ্টিগোচর হবে চব্বিশ-পরগণার 'বেড়াচাঁপার' মতন, তার ঠিক নেই। তাহলেও যেটুকু প্রমাণ পাওয়া যায় তাতে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, পশ্চিম-বঙ্গের দক্ষিণরাঢ়ে নাথধর্মের বিরাট সাধনকেন্দ্ররূপে মহানাদ একসময় প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিল। হয়ত বাংলাদেশের এই অঞ্চলের নাথপন্থীদের প্রধান মঠই ছিল মহানাদে এবং তার অধীনে আরও অন্যান্য মঠ হাওড়া হুগলী মেদিনীপুর ও চব্বিশ-পরগণা জেলায় গড়ে উঠেছিল।

নাথপন্থীদের প্রধান সাধনকেন্দ্র মহানাদ শৈব ও শাক্ত সাধনারও প্রধান কেন্দ্র ছিল। নাথসিদ্ধেরা শিবের সঙ্গে শক্তিকে অভিন্ন বলে মনে করেন। শিবকে পেতে হলে শক্তির সাধনা প্রয়োজন, তাই নাথসাধনমার্গে কুণ্ডলিনীর সাধন প্রচলিত। শিবের শক্তি মানবদেহে কুণ্ডলিনী রূপে অবস্থান করে। ওঁকার সাধনাতেই কুণ্ডলিনী জাগ্রত হয়। তার জন্য হঠযোগের ক্রিয়াসাধন প্রচলিত। মহানাদে এই শিব ও শক্তি-সাধনার বিস্ময়কর পরিচয় পাওয়া যায়। বিশাল গৌরীপট্ট (সাড়ে ছয় হাতের বেশি লম্বা এবং আড়াই হাতের বেশি চওড়া) বটুক ভৈরব, ভৈরব, কালভৈরব, শিবলিঙ্গ, কালী, হরপার্বতী ইত্যাদির ছড়াছড়ি মহানাদে। নাথযোগীদের মহাতীর্থস্থান যে মহানাদ তা এই সব দেবদেবী, প্রাচীন মূর্তির ভগ্নাবশেষ ইত্যাদি দেখলেই বোঝা যায়।

মহানাদে শিবরাত্রির সময় বিরাট মেলা হত। এখনও হয়, কিন্তু সেই অতীতের আড়ম্বর আর নেই। তার প্রধান কারণ দুটি। প্রথমত, মহানাদের

সমৃদ্ধ রূপ আজ আর নেই, যাতায়াতের পথও সুগম নয়। দ্বিতীয়ত, কাছাকাছি অন্যান্য শৈবতীর্থের (যেমন তারকেশ্বর) প্রাধান্য এখন বেড়েছে। মহানাদের এই মেলাকে বলা হয় 'মানাদের জাত'। 'ধর্মের জাতের' কথা মনে পড়ে। জটেশ্বরনাথের সামনের স্থানকে জাত-তলা বলে। জটেশ্বরনাথের মোহান্তরা চেলা-পরম্পরায় যোগীরাজ নামে খ্যাত ছিলেন। বর্তমান সেবায়েতের কাছে শুনেছি, মঠের কাছে আগে যে সব যোগী জাতির বাস ছিল, তাঁরা অধিকাংশই মঠের কাজকর্মে নিযুক্ত থাকতেন এবং তার জন্য নিষ্কর জমি পেতেন। মহানাদের মঠের অধীন আরও দুটি শাখামঠ ছিল। একটি কলকাতার উত্তরে দমদমের গোরখবাসলির বা গোরক্ষনাথের মঠ, আর একটি মেদিনীপুরের শ্যামসুন্দরপুর-পাটনা গ্রামের সিদ্ধনাথ শিব। প্রাচীন মহানাদের জীর্ণ ভয়াবহ কঙ্কাল ছাড়া এখন আর কিছু নেই। তবু তারই মধ্যে শিব ও শক্তি নানারূপে আজও যেভাবে প্রকট রয়েছেন তাতে মহানাদ যে নাথযোগীদের মহাতীর্থ ছিল তা পরিষ্কার বোঝা যায়।

জটেশ্বরনাথ মন্দিরের প্রাঙ্গণের একদিকে একটি উঁচু বেদীর উপর লৌহদণ্ড প্রোথিত আছে। ইনি 'মহাকাল' বা 'কালভৈরব' বলে পূজিত হন। তাঁর পাশে নিমগাছতলায় আছেন 'বটুক ভৈরব'। এঁরও পূজা হয়। বটুক ভৈরবের পাশে পাথরের বিশাল ভগ্ন মকরমূর্তির সঙ্গে আছেন 'একপাদ ভৈরব'। একপাদ ভৈরবের মূর্তি পাথরের প্রাচীন মূর্তি; মন্দিরের উত্তরে বশিষ্ঠ গঙ্গা বলে কথিত বিশাল পুষ্করিণী থেকে মূর্তিটি পাওয়া গেছে শোনা যায়। সামনে আছে চতুষ্কোণ পাদপীঠের পর কোণাকার শিবলিঙ্গ মূর্তি। একটি বিষ্ণুমূর্তিও এখানে পড়ে আছে। নিমগাছের কাছেই বিশাল একটি বটগাছের তলা কালীতলা বলে পরিচিত। কালীতলায় কালীর কোন মূর্তি নেই। সিঁদুরলেপা দুটি 'নরমুণ্ড' আছে। আশেপাশে পাথরের মূর্তির টুকরো ও ভাঙা ইট ছড়িয়ে আছে প্রচুর। বটতলায় কোন গাঁথুনি ছিল বলে মনে হয়। কি ছিল বলা যায় না, ইটের বেদীও হতে পারে, দেবালয়ও হতে পারে। এরই মধ্যে একদিকে একটি পাথরের ভাঙা গৌরীপট্ট আছে, প্রায় দশ ফুট লম্বা এবং পৌনে চার ফুট চওড়া। এত বড় গৌরীপট্ট শাস্ত্রীয় বিধানসম্মত কত বড় শিবলিঙ্গের সঙ্গে যোজিত হতে পারে, ভাবলেও অবাক হতে হয়। এ ছাড়া জটেশ্বর মন্দিরের পাশেই 'হরপার্বতী' আছেন এবং

চারিদিকে আছে যোগীরাজ মোহান্তদের জীর্ণ জঙ্গলাকীর্ণ সমাধিস্তম্ভ। মধ্যে পুনর্গঠিত বিশাল জটেশ্বরনাথের মন্দির, চতুর্দিকের প্রদক্ষিণ-পথসহ বিরাজ করছে। এই হল মহানাদের জটেশ্বরনাথের পরিপার্শ্ব।

হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায়েরই পূজ্য দেবতা হলেন 'মহাকাল'। বৌদ্ধ সাধনমালার একটি ধ্যানে মহাকালকে 'পঞ্চবুদ্ধকিরীটিনম্' বলা হয়েছে। একাধিক মহাকালের ধ্যান আছে সাধনমালায়। দ্বিভুজ চতুর্ভুজ অষ্টভুজ একমুখ থেকে ষোড়শভুজ অষ্টমুখ পর্যন্ত তাঁর মূর্তি হতে পারে। 'দংষ্ট্রাভীম-ভয়ানকম্' মূর্তি তাঁর, কর্ত্রী ও কপাল হাতে, গলায় মুণ্ডমালা। তান্ত্রিক মারণপদ্ধতিতে তাঁর পূজা হয় এবং তিনি শত্রুকে মর্দন করেন। সাধারণত গুরুবিদ্বেষী ও ত্রিরত্নবিদ্বেষী পতিত বৌদ্ধদের মনে তিনি বিভীষিকার সঞ্চার করতেন।[১]

Mahakala is a ferocious God who is generally worshipped in the Tantric rite of Marana for the the destruction of enemies. Mahakala was also regarded as a terrible spirit and was calculated to have inspired awe in the minds of those Buddhists who were not reverential to their Gurus, and did not care much for three Jewels ; Mahakala is supposed to eat those culprits raw.

সাধনমালার অনুমোদিত মূর্তিতে না হলেও, মহানাদে এই মহাকাল লৌহদণ্ডে বিরাজ করছেন এবং নিত্য পূজিত হচ্ছেন জটেশ্বরনাথের সামনে।

মহাকালের পর ভৈরব। একাধিক ভৈরব—একপাদ ভৈরব, বটুক ভৈরব ইত্যাদি। 'শিবপুরাণে' ভৈরবকে শঙ্করের পূর্ণরূপ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। মায়ায় আচ্ছন্ন যাঁরা তাঁরা শিবের এই ভৈরবরূপের পূজা করতে পারেন না। ভৈরবের মূর্তি ভীষণ, হাতে তাঁর খট্বাঙ্গ, পাশ, শূল, ডমরু, কপাল ও সর্প। তিনি শত্রুবিমর্দক এবং ভক্তের পাপভক্ষক। বটুক ভৈরব, একপাদ ভৈরব প্রভৃতি একাধিক রূপ আছে ভৈরবের। 'বিষ্ণুধর্মোত্তর' ও 'রূপমণ্ডনে' ভৈরবের

১ Dr. Benoytosh Bhattacharya : The Indian Buddhist Iconography. P. 122.

এই সব রূপের বর্ণনা আছে।[১] মহানাদে দেখা যায়, ভৈরব একাধিক রূপে বিরাজ করছেন। শিব তো আছেনই, তাঁর সঙ্গে পূর্ণরূপ ভৈরবও আছেন। কালভৈরব, বটুক ভৈরব, একপাদ ভৈরব। শিব ও বিভিন্ন ভৈরবের মধ্যে হরপার্বতী আছেন। কালীতলায় কালী আছেন ঘটে ও নরমুণ্ডে। সব মিলিয়ে শৈব ও তান্ত্রিক সাধনার এমন একটা জমাট পরিবেশ আজও জটেশ্বরনাথের মন্দিরের চারিদিকে রয়েছে, যা দেখলে তার প্রাচীন ঐতিহ্যকে অস্বীকার করবার উপায় থাকে না। এর মধ্যে ধর্মঠাকুর ও পঞ্চানন্দ আছেন, আশেপাশে বিশেষ প্রতিপত্তি রয়েছে তাঁদের আজও। অর্থাৎ ধর্মঠাকুর ও পঞ্চানন্দের এটা একটা প্রভাবকেন্দ্র। অনেকটা এলাকা জুড়ে, মহানাদ দ্বারবাসিনী কেন্দ্র করে বড় বড় বিখ্যাত পঞ্চানন্দ ও ধর্মঠাকুর আছেন।

এই সব উপাদান থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, মহানাদ একসময় নাথধর্মের অন্যতম কেন্দ্র ছিল এবং রাঢ় অঞ্চলে এত বড় কেন্দ্র আর কোথাও ছিল কিনা সন্দেহ। ধর্মমঙ্গল-শূন্যপুরাণের ধর্মঠাকুর আর নাথধর্মের নিরঞ্জন-আদিনাথ অভিন্ন। পশ্চিমবঙ্গে এই নাথযোগী ও ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে অদ্ভুত মিলন-মিশ্রণ হয়েছে। আমার ধারণা, ধর্মঠাকুর ক্রমে যখন শিবে পরিণত হয়েছেন, তখন তারই সন্ধিক্ষণে ভৈরবের ভয়াবহতা নিয়ে পঞ্চানন্দের পূজার প্রচলন হয়েছে। এই পঞ্চানন্দ-পূজার প্রধান প্রচলনকেন্দ্র মোটামুটি দক্ষিণরাঢ়, দক্ষিণ-চব্বিশপরগণার প্রাচীন আদিগঙ্গার তীর পর্যন্ত। এখান থেকে কিছুটা বিকীর্ণ হয়ে আশেপাশে যে পঞ্চানন্দের পূজাপ্রথা প্রচলিত হয়নি, তা নয়। হয়েছে, কিন্তু পঞ্চানন্দের উৎপত্তি-কেন্দ্র মনে হয় দক্ষিণরাঢ়। পঞ্চানন্দের পূজার অন্যতম প্রবর্তক নাথযোগীরাই। দক্ষিণ-চব্বিশপরগণায় একাধিক গ্রামে দেখেছি, নাথযোগীদের গৃহে পঞ্চানন্দ প্রতিষ্ঠিত এবং দু-এক স্থানে তিনি আজও ধর্মরাজ নামে পঞ্চানন্দের মূর্তিতে পূজিত হন। ধর্মঠাকুর থেকে শিব পর্যন্ত ক্রমবিকাশের স্তরে পঞ্চানন্দই 'মিসিং লিঙ্ক' মনে হয়।

এইবার নাথযোগীদের সম্বন্ধে আরও দু-চার কথা বলে এবং মহানাদের সম্ভবপর প্রাচীনতা সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করে, মহানাদ-প্রসঙ্গ শেষ করব। নাথযোগীদের আচার-অনুষ্ঠান এবং পোশাক-পরিচ্ছদের (মাথায়

১ Rao : Hindu Iconography, Vol. 2, Part 1, P. 176-180.

জটা, কানে কুণ্ডল শঙ্খ বা কড়ি, গলায় শিঙা বা নাদ, হাতে রুদ্রাক্ষ, খন্তা ত্রিশূল, পরনে কৌপীন বা মেখলি ইত্যাদি) বিচার করলে ভোট-মোঙ্গল জাতির ধ্যানধারণা আচার ও পরিচ্ছদাদির সঙ্গে সাদৃশ্যের কথা বিশেষভাবে মনে হয়। উত্তরবঙ্গে যোগীজাতির সাংস্কৃতিক প্রাধান্যের কথাও এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে। অতীতে ভোট-মোঙ্গল জাতির সংস্কৃতিধারা যে বিশেষভাবে বাংলার নাথধর্মের সঙ্গে মিশেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। পশ্চিমবঙ্গ বা রাঢ়ের সঙ্গে কামরূপের যোগাযোগের ইতিহাসও প্রাচীন। শশাঙ্ক-ভাস্করবর্মণ-হর্ষবর্ধনের সময় থেকেই এই যোগাযোগ প্রত্যক্ষভাবে হয়েছে। শশাঙ্ক শৈব ছিলেন। ভাস্করবর্মণ এসে কামরূপের তান্ত্রিকধারা তার সঙ্গে মিশিয়ে দিলেন। এর সঙ্গে হর্ষবর্ধন ও পরবর্তী পালযুগের বৌদ্ধধারা মিশে একটা বিচিত্র আলোড়ন হল। লোকায়ত ধর্মঠাকুরের ধারার সঙ্গে এসব মিলেমিশে গেল। এই সব উপকরণের মিশ্রণে পূর্বভারতে তথা বাংলাদেশেই প্রধানত নাথধর্মের বিকাশ হল। এই বিকাশের সঠিক কাল নির্ধারণ করা কঠিন। তান্ত্রিক শৈবধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে ধর্মঠাকুরের মিশ্রণে নাথধর্মের বিকাশ হয়েছে। কোন্ সময় হয়েছে বলা মুশকিল। মনে হয়, নবম দশম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যেই এই মিলন-মিশ্রণের পর্ব শেষ হয়ে গেছে।

প্রথম থেকেই নাথধর্মের কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গে গড়ে ওঠা যথেষ্ট সম্ভবপর। শৈবধর্মের প্রসার গুপ্তযুগ থেকেই পশ্চিমবঙ্গে হয়েছে। শশাঙ্কের সময় যে বিশেষভাবে হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। তান্ত্রিক আচার-অনুষ্ঠান ভাস্করবর্মণের অভিযানকালে বিশেষ প্রেরণা পেলেও, তার আগে থেকেও প্রচলিত হওয়া অসম্ভব নয়। এই প্রসঙ্গে একথাও মনে রাখা দরকার যে, বাংলার বাইরে গিয়ে যে সব শৈবাচার্য প্রতিষ্ঠালাভ করেছিলেন, খৃস্টীয় নবম-দশম শতক থেকে দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে, তাঁদের মধ্যে দক্ষিণরাঢ়ের শৈবযোগী উমাপতি দেব ও বিশ্বেশ্বর শম্ভু অন্যতম। গৌড়দেশের অবিঘ্নাকর নবম শতকের মাঝামাঝি পশ্চিমভারতে গিয়েছিলেন এবং সেখানে একটি বিরাট মঠ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।[১] দক্ষিণরাঢ়ে শৈব সম্প্রদায়ের ঐতিহ্য বেশ প্রাচীন না হলে, সেখানকার শৈবযোগীরা বাইরে গিয়ে এরকম প্রতিষ্ঠা

১ History of Bengal, Dacca Univ., Vol. 1, P. 683-686.

অর্জন করতে পারতেন না। রাঢ় অঞ্চলে তাই, অন্তত দক্ষিণরাঢ়ে, শৈবমঠের প্রতিষ্ঠা নবম দশম শতাব্দী থেকে হয়েছে বলে মনে হয়। দক্ষিণরাঢ়ান্তর্গত মহানাদের শৈবমঠের প্রতিষ্ঠা তখন থেকে হওয়াও আশ্চর্য নয়। মহানাদের অন্যান্য প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে তাই মনে হয়। মহানাদের শৈব মঠ গোড়া থেকেই যে নাথযোগীদের অধীন ছিল, হয়ত তা নাও হতে পারে। পরে এই শৈবমঠটিকে তাঁরা নিজেদের সম্প্রদায়ের মঠে পরিণত করেছিলেন, এমন হওয়াও বিচিত্র নয়।

মহানাদের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে এই কথাই মনে হয়। প্রথমত, মহানাদে যে একাধিক পাথরের শিবলিঙ্গ পাওয়া গেছে তার গড়ন বেশ প্রাচীন। গুপ্তযুগের শিবলিঙ্গের সঙ্গে তার আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে। মহানাদের কাছে সুদর্শন গ্রামে মাটি খুঁড়ে প্রচুর পাথরের দেবদেবীর মূর্তি, মনসামূর্তি এবং কিছু কিছু মাটির পাত্রাদিও আছে। মূর্তিগুলি অধিকাংশই ভগ্ন। দেখে মনে হয়, পালযুগের শেষের ও সেনযুগের মূর্তি অর্থাৎ একাদশ দ্বাদশ শতাব্দীর। উল্লেখযোগ্য হল, পাথরের শিবলিঙ্গ। মহানাদের শিবলিঙ্গের সঙ্গে গুপ্তযুগের শিবলিঙ্গের সাদৃশ্যের কথা বলেছি।[১] এই ধরনের শিবলিঙ্গ একাধিক পাওয়া গেছে মহানাদে। এই সব নিদর্শন থেকে মহানাদের শৈবধর্মের প্রাধান্যই সূচিত হয়। গুপ্তযুগ থেকে বা শশাঙ্কের আমল থেকে দক্ষিণরাঢ়ের মহানাদ অঞ্চলে শৈবতান্ত্রিক ধর্মের প্রসার হওয়া অসম্ভব নয়। এই শৈবতান্ত্রিক ধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধতান্ত্রিক ও ধর্ম সম্প্রদায়ের মিলন-মিশ্রণের ফলে মহানাদের এই অঞ্চলে নাথধর্মের বিকাশ হয়েছে এবং নাথযোগীদের নাদসাধনার অন্যতম কেন্দ্র বলে নাম হয়েছে মহানাদ।

পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট নাথযোগীরা অনেকে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা করেন এবং 'নাথ কবিরাজ' পদবীও ব্যবহার করেন।[২] আয়ুর্বেদের সঙ্গে নাথযোগীদের এই সম্পর্কের মূল কোথায়? এর মূল হল, নাথযোগীদের তন্ত্র ও যোগসাধনায়। হিন্দু রসায়নের ইতিহাসে তন্ত্রের দান অসামান্য। ভারতীয় আলকিমির উদ্ভব ও বিকাশ তান্ত্রিক সাধনার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তন্ত্রের গৌরবময়

১ R. D. Banerji : The Age of the Imperial Guptas, Plate XVII দ্রষ্টব্য।

২ শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত 'গোর্খ-বিজয়' গ্রন্থের ভূমিকা।

যুগেই 'রসার্ণব' 'রসহৃদয়', 'রসরত্নাকর', 'রসসার' ইত্যাদি গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এ-সম্বন্ধে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁর বিখ্যাত 'History of Hindu Chemistry' গ্রন্থে (দুই খণ্ড) সুন্দরভাবে আলোচনা করেছেন। যোগ ও তন্ত্রের অন্যতম সাধক নাথযোগীরা একসময় ভারতীয় আয়ুর্বেদশাস্ত্র ও রসায়নবিদ্যাকেও যথেষ্ট সমৃদ্ধ করেছেন। যোগীদের পারদ ও গন্ধক ব্যবহার সম্বন্ধে মার্কোপোলো তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। মার্কোপোলো লিখেছেন: "যোগীরা আসলে অব্রাহ্মণ, কিন্তু তাঁরা নিজেদের নীতি অনুসারে মূর্তিপূজা করেন। তাঁরা অত্যন্ত দীর্ঘায়ু, প্রত্যেকেই প্রায় দেড়শত থেকে দুইশত বৎসর পর্যন্ত বাঁচেন। একরকম উত্তেজক পানীয় তাঁরা ব্যবহার করেন। খানিকটা গন্ধক ও পারদ একত্র মিশিয়ে প্রতিমাসে দু'বার তাঁরা সেবন করেন।" মার্কোপোলো-বর্ণিত যোগীদের এই পারদ ও গন্ধক ব্যবহার প্রসঙ্গে 'রসহৃদয়' নামক প্রাচীন তন্ত্রগ্রন্থে পারদ ও অভ্রের সঙ্গে হরগৌরীর তুলনার কথা মনে পড়ে। হর ও পারদ এবং গৌরী ও অভ্র একার্থবোধক। পার্বতীকে হর বলছেন: "অভ্র তোমার বীজ এবং পারদ আমার বীজ। এই দুইটির সংমিশ্রণে যে পদার্থের উদ্ভব তা মৃত্যু ও দারিদ্র্যকে নাশ করতে পারে।" যোগীদের সঙ্গে রসায়নবিদ্যার সম্পর্ক যে কত ঘনিষ্ঠ তা এই সব উদাহরণ থেকে বোঝা যায়। তাই আয়ুর্বেদ ও রসায়নের চর্চা উত্তরাধিকার-সূত্রে নাথযোগীরা পেয়েছেন এবং পশ্চিমবঙ্গের নাথযোগীরা অনেকেই তাই আজও 'নাথ কবিরাজ' পদবী ব্যবহার করেন।

দ্বারবাসিনী

মহানাদ থেকে দ্বারবাসিনী বেশি দূর নয়। মেঠো পথ ধরে গ্রামের ভিতর দিয়ে আমরা মাইল চারেক পথ হেঁটে গিয়েছিলাম। এ-অঞ্চলের জঙ্গল ও পথের নির্জনতা ভয়াবহ, লোকালয়গুলো যেন নেহাতই লোকলজ্জার ভয়ে গড়ে উঠেছে মনে হয়। পথ চলতে স্থানীয় লোকের মুখে যখন বাঘের গল্প শোনা যায়, তখন বনাকীর্ণ জনশূন্য পথ আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে। পদে পদে উপলব্ধি করতে হয়, যেন গঞ্জ পত্তন নগর শহর ইত্যাদি সভ্যতার সমস্ত স্পন্দনকেন্দ্র পিছনে ফেলে কোথায় কোন্ রবিনসন ক্রুসোর দ্বীপে চলে যাচ্ছি। দ্বারবাসিনী গ্রামে পা দিয়েই শুনলাম সেই 'এক যে ছিল রাজার' কাহিনী। একদা এক রাজা বাস করতেন এখানে, তাঁর নাম দ্বারপাল। সুখের বিষয়, তিনি কোন ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভব রাজা নন, বাংলার সদ্‌গোপবংশের একজন সামন্তরাজা। সেই সদ্‌গোপ রাজা দ্বারপালের নাম থেকে গ্রামের নাম হয়েছে দ্বারবাসিনী। স্থানীয় কিংবদন্তী হল, দ্বারবাসিনীর মাটির তলায় পাঁজরে পাঁজরে প্রচুর ধনরত্ন লুকানো রয়েছে। রূপকথার কোন রাজকুমার এসে তার সন্ধান পাবে না কোনদিন। কোন ব্রাহ্মণও কোনদিন স্বপ্নে তার হদিশ পাবেন না। একমাত্র যদি কোন সদ্‌গোপ এসে কোনদিন দ্বারবাসিনী গ্রামে বাস করেন, তাহলে তিনি সেই গুপ্তধনের সন্ধান পেতে পারেন। সদ্‌গোপ রাজার এইসব কিংবদন্তী ছাড়া, কেউ কেউ বলেন, দ্বারবাসিনী নামে গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ছিলেন। তাঁর নাম থেকেই গ্রামের নাম হয়েছে দ্বারবাসিনী।

কিংবদন্তীর মধ্যে সত্যের কোন সুদূর ইঙ্গিতও কিছু পাওয়া যায় কি না দেখা যাক। পরে দ্বারবাসিনীর ধ্বংসাবশেষ ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনাদি সম্বন্ধে আলোচনা করব। প্রথমেই বলি, স্থানীয় সদ্‌গোপ সামন্তরাজার কিংবদন্তী একেবারে ভিত্তিহীন বলে মনে হয় না। বর্ধমান জেলার গোপভূম (পশ্চিম বর্ধমান) থেকে হুগলী-মেদিনীপুর পর্যন্ত অনেক জায়গায় এই সদ্‌গোপবংশীয় সামন্তরাজাদের কথা শোনা যায়। পশ্চিম-বর্ধমানের অমরারগড়, ভালকী, দিগ্‌নগর, কাঁকসা, ত্রিষষ্ঠীগড়-ঢেকুর অঞ্চল জুড়ে একসময় সদ্‌গোপ সামন্ত রাজবংশের প্রতিষ্ঠা ছিল মনে হয়। তার ঐতিহাসিক নজীরও পাওয়া যায়

যথেষ্ট। পরে পশ্চিম-বর্ধমানের গোপভূম অঞ্চল থেকে সদ্‌গোপ রাজবংশের বিভিন্ন বংশধররা পূবে মেদিনীপুর থেকে হুগলী পর্যন্ত নানাস্থানে ছোট ছোট রাজ্য (অর্থাৎ জমিদারী) প্রতিষ্ঠা করেন। মেদিনীপুরের নারায়ণগড় ও কর্ণগড়ের সদ্‌গোপ রাজবংশের কুলজীগ্রন্থ থেকে এই ইতিহাসেরই আভাস পাওয়া যায়। অতএব হুগলী জেলার দ্বারবাসিনী গ্রামে কোন সদ্‌গোপ রাজবংশের প্রতিষ্ঠা অসম্ভব নয়। কিংবদন্তীর মধ্যে ঐতিহাসিক সত্য গোপন থাকতে পারে। ঠিক কোন্ সময় এই সদ্‌গোপ রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয় দ্বারবাসিনীতে তা বলা যায় না। কারণ বর্তমানে এই রাজবংশের কোন অস্তিত্ব নেই। মেদিনীপুরের নারায়ণগড় রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে, কর্ণগড় রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয় ষোড়শ শতাব্দীতে। এই সময়ের মধ্যে দ্বারবাসিনীর সদ্‌গোপ রাজবংশেরও প্রতিষ্ঠা হয় বলে অনুমান করা যেতে পারে।

সদ্‌গোপদের মধ্যে দুটি প্রধান 'কুল' আছে—পশ্চিমকুল ও পূর্বকুল। পূর্ব-কুলের সদ্‌গোপবংশের মধ্যে অনেকেরই আদিবাস হুগলী জেলায়। যেমন দিগনগর ও বিঘিটির শূরবংশ, ক্যাঁকশিয়ালী ও ধনিজপুরের নিয়োগীবংশ—

সহর সিলিমাবাজ তাহাতে সজ্জন রাজ
নিবসে নিয়োগী গোপীনাথ।
তাঁহার তালুকে বসি দামুন্যাতে বাস চাষি
নিবাস পুরুষ ছয়সাত॥

কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গলোক্ত সজ্জন রাজ গোপীনাথ নিয়োগী এই নিয়োগী বংশোদ্ভব বলে শোনা যায়। বাঘনান ও মেল্‌কীর বিশ্বাসবংশ, পোল্‌বার পালবংশ ইত্যাদি। কিংবদন্তী হল, পোল্‌বার পালবংশের আদিপুরুষ নারায়ণ পাল ও তাঁর অনুজ জনার্দন পাল (বা জটিল পাল) প্রায় চারশ সাড়ে-চারশ বছর আগে হুগলী জেলার এই অঞ্চলে এসে বসতি স্থাপন করেন। তখন এই অঞ্চল দিয়ে দামোদরের শাখাপ্রশাখা ভাগীরথী অভিমুখে প্রবাহিত হত। বন্যায় পোল্‌বা মহানাদ দ্বারবাসিনী প্রভৃতি অঞ্চল প্রায় ভেসে যেত। তাই পোল্‌বার সদ্‌গোপ পালবংশের আদিপুরুষরা বেছে বেছে যতটা সম্ভব উঁচু জায়গায় বসতি স্থাপন করেছিলেন। প্রথমে তাঁদের গ্রামের নাম ছিল জনার্দনপুর (জনার্দন পালের নামে)। পরে পালবংশের

বৃদ্ধির সময় তাঁরা যেখানে বসতি গড়ে তোলেন তার নাম হয় 'পালবাস'। এই পালদের বাসস্থান বা পালবাস নামই পরে বিকৃত হয়ে 'পোল্‌বা' হয়েছে মনে হয়। দ্বারবাসিনীর দ্বারপাল নামে সদ্‌গোপ রাজা এই পোল্‌বার পালবংশেরই কোন প্রতিপত্তিশালী জমিদার হওয়া অসম্ভব নয়। দ্বারপালের প্রতিষ্ঠা মোগল আমলেই হয়েছিল বলে মনে হয়।

মোগল আমলে পাণ্ডুয়া মহানাদ দ্বারবাসিনী প্রভৃতি অঞ্চলে মুসলমানদের আধিপত্যও গ্রাম্যসমাজে বেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। দ্বারবাসিনীর প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মোগলভিটে বলে একটি স্থান। স্থানটি বিরাট একটি উঁচু ঢিবির মতন, আগাছায় ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ। প্রাচীন ঘরবাড়ির ইঁটের গাথুনির ভাঙাচোরা নিদর্শন চারিদিকে ছড়ানো। কিছুদিন আগেও নাকি একটি সিংদরজা ছিল এখানে। বর্তমানে তার কোন অস্তিত্ব নেই। মনে হয়, মোগল আমলে এখানে স্থানীয় কোন জায়গীরদার বা রাজকর্মচারীর বাসস্থান ছিল। মোগল আমলের আরও অনেক নিদর্শন দ্বারবাসিনী অঞ্চলে আছে। তার মধ্যে পীরের আস্তানা দেখলাম দু-একটি, এখন প্রায় পরিত্যক্ত। মুসলমানপ্রধান গ্রামও আছে ইউনিয়নের মধ্যে, যেমন কল্যাণপুর।

এ-পর্যন্ত দ্বারবাসিনী সম্বন্ধে যা আলোচনা করলাম, তার ইতিহাস পঞ্চদশ ষোড়শ শতাব্দীর বেশি প্রাচীন নয়। কিন্তু দ্বারবাসিনী থেকে এমন কতকগুলি দেবদেবীর প্রাচীন পাথরের মূর্তি পাওয়া গেছে, যা দেখে মনে হয় যে, মহানাদ দ্বারবাসিনী প্রভৃতি অঞ্চল অনেককাল ধরে একই প্রাচীন সভ্যতার স্তরভুক্ত ছিল। এই সভ্যতার ইতিহাস হিন্দু আমলের পালযুগ পর্যন্ত বিস্তৃত মনে হয়। মহানাদ দ্বারবাসিনী প্রভৃতি গ্রাম একসময় দামোদরের প্রধান ভাগীরথীমুখী শাখাপ্রবাহের তীরবর্তী সমৃদ্ধ গ্রাম ছিল। বিশেষজ্ঞরা বলেন, দামোদরের প্রাচীন প্রবাহ ত্রিবেণীর উত্তরে নয়াসরাই-এ গিয়ে যখন ভাগীরথীর সঙ্গে মিলিত হত তখন দ্বারবাসিনী মহানাদের উত্তর দিয়ে মগরা ঘুরে উত্তর-পূর্বদিকে তার গতি ছিল। দ্বারবাসিনীর কাছে কন্তুল ও কেদারমতী নদী দামোদরের এই প্রাচীন প্রবাহেরই শীর্ণ স্মৃতি বহন করছে। এই নদীর তীরবর্তী সভ্যতার সমৃদ্ধ কেন্দ্রের মধ্যে দ্বারবাসিনী অন্যতম প্রাচীন কেন্দ্র এবং মহানাদের সমসাময়িক বলে আমার মনে হয়।

দ্বারবাসিনীর প্রাচীন দেবদেবীর মূর্তিগুলি স্থানীয় জমিদারের কাছারী-বাড়ি 'রাজেন্দ্রভবনে' সংগ্রহ করা আছে। উদ্দেশ্য ছিল, মিউজিয়ম করা। দেব-দেবীর মূর্তির মধ্যে ভাঙা বিষ্ণু ও সূর্যমূর্তি আছে। মূর্তির টুকরো দেখে মনে হয়, মূর্তি ছিল অনেক। ভাঙা মূর্তির ভগ্নাবশেষ রাজেন্দ্রভবনের বাইরে গ্রামের মধ্যে আরও অনেক জায়গায় পড়ে আছে দেখেছি। পালযুগের শেষের ও সেনযুগের মূর্তি, একাদশ দ্বাদশ শতাব্দীর। শোনা যায়, দ্বারবাসিনী থেকে বুদ্ধমূর্তিও নাকি পাওয়া গিয়েছিল। আর যেসব মূর্তি দ্বারবাসিনীতে পাওয়া গেছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল একটি বারাহী মূর্তি। মূর্তিটি বিষ্ণুর বরাহ অবতারমূর্তি বলে সকলের ধারণা ছিল, কিন্তু তা নয়। তা যদি হয়ও, তাহলে এ-মূর্তি বেশ প্রাচীন বলেই মনে হয়। কারণ, বিষ্ণুর বিভিন্ন অবতারমূর্তির পূজার সবচেয়ে বেশি প্রচলন হয়েছিল গুপ্তযুগে। পরে অবতারপূজার প্রাধান্য কমে গিয়ে বিষ্ণুর নানারূপের পূজা প্রবর্তিত হয়। কিন্তু মূর্তিটি বরাহ-অবতারের মূর্তি নয়। খুব ভাল করে মূর্তিটি লক্ষ করে দেখেছি, পুরুষমূর্তি নয়, স্ত্রীমূর্তি। সুতরাং কোন দেবতা বা তাঁর অবতারের মূর্তি যে নয়, তাতে কোন সন্দেহ নেই। স্ত্রীমূর্তি যখন তখন বরাহমুখী দেবী বারাহী ছাড়া এ-মূর্তি আর অন্য কারও মূর্তি নয়।

বৌদ্ধ সাধনমালায় ও বজ্রবরাহীতন্ত্রে, দেবী বজ্রবরাহীর ধ্যান, মূর্তি ও পূজাপদ্ধতির বর্ণনা আছে। বজ্রবরাহীকে একটি ধ্যানে "শ্রীহেরুকদেবস্যাগ্রমহিষী", অর্থাৎ শ্রীহেরুকের অগ্রমহিষী বলে বর্ণনা করা হয়েছে। আবার তাঁকে বৌদ্ধ মারীচীর সঙ্গিনীদের মধ্যে অন্যতমাও বলা হয়েছে। নাম দেওয়া হয়েছে 'বুদ্ধডাকিনী' ও 'বজ্রবৈরচনী'।[১] সাধারণত তিনি হয় দ্বিভুজা, না হয় চতুর্ভুজা। দ্বারবাসিনীর মূর্তিটি চতুর্ভুজা। কিন্তু সাধনমালার ধ্যানের মূর্তির সঙ্গে এই মূর্তির মিল নেই। সুতরাং বুদ্ধ-ডাকিনীরূপে এই মূর্তির পূজা বৌদ্ধতান্ত্রিকরা করতেন বলে মনে হয় না। কিন্তু বৌদ্ধতন্ত্রের সঙ্গে শৈবতন্ত্রের মিলনমিশ্রণে যে সপ্তমাতৃকাপূজার প্রচলন হয় তার মধ্যে চামুণ্ডা, বারাহী প্রভৃতি অন্যতম। এই সপ্তমাতৃকা হলেন—ব্রাহ্মণী মহেশ্বরী কৌমারী বৈষ্ণবী বারাহী চামুণ্ডা ও ইন্দ্রাণী। 'বরাহপুরাণে' যোগেশ্বরীর নামও যোগ করা হয়েছে। বারাহীর

১ B. Bhattacharya : Indian Buddhist Iconography, P. 103-105.

মুখশ্রী বরাহের মতন, দু হাত বা চার হাতে হল, শক্তি, মুষল, দণ্ড, খড়্গ, পাশ ইত্যাদি থাকে। পায়ে নূপুরের বেড়ও থাকতে পারে। 'বিষ্ণুধর্মোত্তরের' মতে বারাহীর পেটটি বেশ বড় হতেও পারে।[২] দ্বারবাসিনীর বারাহীর মূর্তির সঙ্গে এই মূর্তির অনেকটা মিল আছে। মূর্তিটি তাই সপ্তমাতৃকার অন্যতম মাতৃকা-মূর্তি বলে মনে হয়। দ্বারবাসিনীর শৈবতান্ত্রিকরা এই মূর্তির পূজা করতেন এবং বুদ্ধডাকিনী বারাহীর পূজা থেকে এই পূজার প্রচলন হয়েছিল। সুতরাং বৌদ্ধতন্ত্রের সঙ্গে শৈবতন্ত্রের যোগাযোগের প্রমাণ মহানাদ ও দ্বারবাসিনী উভয় অঞ্চলেই পাওয়া যায়। মনে হয়, মহানাদ দ্বারবাসিনী প্রভৃতি অঞ্চল জুড়ে ছিল শৈবতন্ত্রের বিস্তৃত প্রাধান্য-কেন্দ্র। সদ্‌গোপ, যোগী প্রভৃতি জাতির লোকরাই শৈবতান্ত্রিক উপাসক ছিলেন। পালযুগেই এই অঞ্চলে শৈবতন্ত্রের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মনে হয়।

দ্বারবাসিনীর পালপাড়ায় এখনও যোগীর বাস আছে। এখন তাঁরা চাষবাস করে জীবনধারণ করেন। ধর্মঠাকুর আছে একাধিক; ব্যগ্রক্ষত্রিয় পাড়ায় ও ব্রাহ্মণপাড়ায়। ব্রাহ্মণপাড়ায় ধর্মঠাকুর ডোমপণ্ডিত পূজা করেন। আগে নাকি এখানে ডোমপাড়া ছিল। এ ছাড়া দ্বারবাসিনীর অন্যতম উৎসব হল নাগপঞ্চমীর দিন বিষহরির বা মনসার পূজা। নারকেলডাঙার (বর্ধমান) জগতগৌরী ও দ্বারবাসিনীর মনসা একসময় এ-অঞ্চলের সবচেয়ে বিখ্যাত দেবী ছিলেন। পূজার আগে ছাগমহিষাদি প্রচুর বলি হত, ঝাঁপান উৎসব হত। এই সব উৎসব-অনুষ্ঠান, শিবশক্তি ও সপ্তমাতৃকার পূজা ইত্যাদি থেকে বোঝা যায়, বৌদ্ধতন্ত্র, শৈবতন্ত্র, ধর্মপূজা ও নাথধর্মের পারস্পরিক আদান-প্রদানের ভিতর দিয়ে হুগলী জেলার এই অঞ্চলে পাল ও সেনযুগে ক্রমে শৈবতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল।

২। Rao : Hindu Iconography : Vol. 1, Part 2, P. 379-389.

সোমড়া

গঙ্গার পশ্চিম তীরে শোভে নানা গ্রাম,
সোমড়া শবিড়া বৈদ্য নিকরের ধাম—

'সুরধুনী কাব্যে' দীনবন্ধু মিত্র এইভাবে সোমড়ার বর্ণনা করে গেছেন। গুপ্তিপাড়ার মতন সোমড়াও বৈদ্যপ্রধান স্থান এবং সোমড়ার ইতিবৃত্তও গুপ্তিপাড়ার সঙ্গে অনেক দিক থেকে জড়িত। সোমড়া গ্রামটি কতকালের প্রাচীন তা বলা যায় না, তবে গঙ্গাতীরবর্তী আরও অনেক গ্রামের মতন সোমড়ারও উত্থান-পতন হয়েছে গঙ্গার ভাঙাগড়ার সঙ্গে সঙ্গে। মনে হয়, দু-তিনশ বছরের বেশি প্রাচীন গ্রাম নয় সোমড়া। দেওয়ান রামশঙ্কর রায় ও রায়রায়ান রামচন্দ্র সেন উভয়েই বৈদ্যকুলোদ্ভব এবং উপাধি দেখেই বোঝা যায় যে, উভয়েই অন্তগামী নবাবী আমলের কৃতী পুরুষ।

অনেকদিন আগেকার কথা। জনৈক পক্ষীরাজ কবি গুপ্তিপাড়া যাচ্ছিলেন নদীপথে। নৌকাপথে যাওয়া ছাড়া তখন উপায় ছিল না। নদীতীর থেকে গুপ্তিপাড়া অনেক দূর বলে তিনি মন্তব্য করেছিলেন বিরক্ত হয়ে, "গুপ্তিপাড়া কি বেয়াড়া, গঙ্গাছাড়া ঠিক দুটি ক্রোশ"। গুপ্তিপাড়ার ভৌগোলিক অবস্থানের কাব্যিক বর্ণনা। গুপ্তিপাড়ার পরেই দক্ষিণে সোমড়া গ্রাম। গঙ্গা পুব থেকে আবার পশ্চিমে বাঁক ঘুরে সোমড়ার কোল দিয়ে বয়ে গেছে। সোমড়ার সৌভাগ্য বলতে হবে। কিন্তু গ্রামবাসীরা সৌভাগ্যকে দুর্ভাগ্য মনে করে গঙ্গার গর্ভস্থ হবার ভয়ে সমারোহে গঙ্গাপূজা আরম্ভ করেছিলেন। সোমড়ায় এইজন্য গঙ্গাপূজার বেশ প্রচলন দেখা যায়। শুধু সোমড়ায় নয়, গঙ্গাতীরবর্তী গ্রামে সাধারণত গঙ্গাপূজার প্রাধান্য বেশি। গঙ্গাপূজা হয় গঙ্গাতীরে, বাড়িতে নয়। বাড়ির কাছে যাঁরা পূজা করেন তাঁরা গঙ্গার দিকে মুখ করে পূজামণ্ডপ তৈরি করেন। সোমড়ার শীলেরাও তাই করেন। গঙ্গার মূর্তি গড়ে পূজা হয়।

সোমড়া গ্রাম প্রধানত গুপ্তিপাড়ার বৃন্দাবনচন্দ্রের মঠের দেবোত্তর সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত। শোনা যায়, রাজা বিশ্বেশ্বর রায় (গুপ্তিপাড়ার) এই দেবোত্তর দান করেন। কোন দানপত্র দেখিনি, তবে সোমড়া গ্রামে গুপ্তিপাড়ার মঠের

বিশাল কাছারী-বাড়ির জীর্ণ ভগ্নাবশেষ এখনও দেখা যায়। একসময় মঠের মোহান্তরা নিয়মিত সোমড়ায় এসে এই কাছারী-বাড়িতে অবস্থান করে দোর্দণ্ডপ্রতাপে জমিদারী তদারক করতেন।

দেওয়ান রামশঙ্কর রায় বা দেওয়ান (রায়রায়ান) রামচন্দ্র সেন যখন সোমড়ায় এসে বাস করেন তখন গুপ্তিপাড়া ও অন্যান্য স্থানে শৈবমঠ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের কথা। রামচন্দ্র সেন সোমড়া গ্রামে আসেন ১১৪৯ সনে। এই সেনবংশজ শ্রীবিপিনমোহন সেন তাঁর 'চাঁদরাণী' গ্রন্থে এই তারিখটি উল্লেখ করেছেন এবং এই প্রসঙ্গে বলেছেন :[১]

> "রামচন্দ্র সেন ১১৪৯ সালে বলরাম রায়ের বাটিতে আসিয়া উপনীত হয়েন এবং তথায় পরিখা পরিবেষ্টিত হর্ম্য নির্মাণ করিবার জন্য উদ্যোগী হইলেন। উপযুক্ত আবাস-বাটী নির্মাণজন্য ব্যস্ত হইলে, জানিতে পারিলেন যে, এই স্থান গুপ্তপল্লীস্থ শ্রীশ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের জমিদারীর অন্তর্গত। ইহা শুনিয়া তিনি ঠাকুরের সেবায়েত দণ্ডী গোস্বামীর নিকট আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন।"

রামচন্দ্রের সোমড়ায় আসার কারণ সম্বন্ধে অনেক কাহিনীর অবতারণা করা হয়েছে 'চাঁদরাণীতে',' কিন্তু তার কতটা উপাখ্যান আর কতটা ইতিহাস, বলা কঠিন। রামচন্দ্র সেনের সঙ্গে নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের বিবাদের যেসব কাহিনী তিনি বর্ণনা করেছেন তাও প্রামাণিক কিনা বলা যায় না। তবে রামচন্দ্র সেন যে নবাব দরবারের বেশ প্রতিপত্তিশালী কর্মচারী ছিলেন, তা বোঝা যায়। রামচন্দ্র সেনের প্রাসাদতুল্য বাসভবনের ফটকের গায়ে একটি মর্মরফলকে লেখা আছে :

Here Lived
Rai Raian Raja Ram Chand
(Dewan Bengal Behar and Orissa)
—ইত্যাদি

রামচন্দ্রের জীবনেতিহাস এর বেশি কিছু জানা যায় না। মঠের কাছ থেকে জায়গা নিয়ে রামচন্দ্র যে বিরাট গড়বেষ্টিত বাড়ি তৈরি করেন, তার

[১] শ্রীবিপিনমোহন সেন : চাঁদরাণী, ১৩৩ পৃষ্ঠা।

ভগ্নাবশেষ আজও সোমড়া গ্রামে আছে। শোনা যায়, দুর্গোৎসবের জন্য তিনি মুর্শিদাবাদের জগৎ শেঠের চণ্ডীমণ্ডপের অনুকরণে কাঠের মণ্ডপ তৈরি করেছিলেন সোমড়ায়। এখন তার কোন চিহ্ন নেই। তার বদলে ইটের তৈরি একটি দুর্গামণ্ডপ আছে। রামচন্দ্র সেনের বংশধররা আজও সেই মণ্ডপে প্রতি বছরে দুর্গাপূজা করেন। সেনবাড়ির দুর্গাপ্রতিমার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল, দুর্গার দশভুজা মূর্তির তিনখানি হাত মাত্র সামনে প্রকট থাকে, বাকি হাত ক'খানি পিছনে অদৃশ্য থাকে। ত্রিভুজা সিংহবাহিনী দুর্গার একখানি চমৎকার পটচিত্র সেনবাড়িতে আছে। অন্তত দেড়শ-দুশ বছরের প্রাচীন পট বলে মনে হয়। এই পটের অনুকরণে দুর্গাপ্রতিমা গড়া হয়।

সোমড়া গ্রামে রায় রামশঙ্করের গড়খাদ ও আবাসবাড়ির ভগ্নাবশেষ আজও দেখা যায়। বাড়ির মধ্যে তাঁর প্রতিষ্ঠিত একাধিক মন্দিরের জীর্ণ চিহ্ন এখনও আছে। একটি মন্দির গভীর জঙ্গলে সমাচ্ছন্ন, আর একটি পঞ্চরত্ন মন্দির এখনও মন্দির বলে চেনা যায়, বর্তমানে পরিত্যক্ত একটি ভগ্ন নবরত্ন মন্দিরে জগদ্ধাত্রী মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরের গায়ে যে শ্লোক খোদিত আছে তা এই:

বাজি-দ্বিপ-ধরাধার সুতাশেষসুতাননৈঃ
ভুবা পরিমিতে শাকে মন্দিরাং শঙ্করোঽকরোৎ।

১৬৭৭ শকাব্দে বা ১৭৫৫ সালে এই নবরত্ন মন্দিরটি তৈরি হয়। মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত জগদ্ধাত্রীর নিত্যপূজা হয় এখনও।

সোমড়ার বন্দ্যোপাধ্যায়রা প্রাচীন ব্রাহ্মণবংশের মধ্যে অন্যতম। তাঁদের পূর্বপুরুষ গঙ্গার পূর্বতীরস্থ শান্তিপুরের কাছে কোন গ্রাম থেকে পশ্চিমতীরে সোমড়ায় এসেছিলেন। এঁদের গৃহে জগদ্ধাত্রীদেবীর নিত্যপূজা হয় এবং জগদ্ধাত্রীর পিতলমূর্তি রামশঙ্কর রায় প্রতিষ্ঠিত জগদ্ধাত্রীর অনুকরণে গঠিত। কথাপ্রসঙ্গে এঁদের কুলদেবতার কথা প্রশ্ন করতে এঁরা বললেন যে, 'তারা' এঁদের কুলদেবতা। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণরা প্রধানত তান্ত্রিক। হুগলী জেলার গঙ্গাতীরবর্তী প্রায় সব গ্রামেই দেখেছি, এঁরা সিংহবাহিনী, জগদ্ধাত্রী, কালী ইত্যাদির উপাসক। শাক্তদেবীই অধিকাংশের গৃহদেবতা ও কুলদেবতা। তারার উপাসক। অনেক রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্ধান

পেয়েছি। সোমড়ার বন্দ্যোপাধ্যায়রা আমাকে তারার ধ্যানটি জানিয়েছেন। ধ্যানটি হল এই:

প্রত্যালীঢ়পদাং ঘোরাং মুণ্ডমালা-বিভূষিতাং
খর্বাং লম্বোদরীং ভীমাং ব্যাঘ্রচর্মাবৃতাং কটৌ।
নবযৌবনসম্পন্নাং পঞ্চমুদ্রা-বিভূষিতাং
চতুর্ভুজাং লোলজিহ্বাং মহাভীমাং বরপ্রদাং।
খড়্গকর্ত্রী-সমাযুক্ত-সব্যেতর-ভুজদ্বয়াং
কপালোৎপলসংযুক্ত-সব্যপাণি-যুগান্বিতাং।
পিঙ্গোগ্রৈকজটাং ধ্যায়েন্মৌলাবক্ষোভ্য ভূষিতাং
বালার্ক-মণ্ডলাকার-লোচনত্রয়ভূষিতাং।...
বিশ্বব্যাপক-তোয়ান্তঃ-শ্বেতপদ্মো পরিস্থিতাং
অক্ষোভ্য দেবীমূর্ধণ্য স্ত্রীমূর্তি নাগরূপধৃক।

তারার এই ধ্যানটি অবিকল 'তন্ত্রসার' থেকে গৃহীত। ধ্যানটি বজ্রযানী বৌদ্ধ দেবী একজটার ধ্যান। বৌদ্ধ 'সাধনমালায়' উল্লিখিত একজটার ধ্যানের সঙ্গে এই ধ্যানের আশ্চর্য মিল দেখা যায়। 'সাধনমালার' ধ্যানটি এই:

কৃষ্ণাবর্ণাঃ মতাঃ সর্বাঃ ব্যাঘ্রচর্মাবৃতাঃ কটৌ।
একবক্ত্রাঃ ত্রিনেত্রাশ্চ পিঙ্গোর্ধ্বকেশমূর্ধজাঃ॥
খর্বা লম্বোদরা রৌদ্রাঃ প্রত্যালীঢ়পদস্থিতাঃ।
সরোষকরালবক্ত্রা মুণ্ডমালাপ্রলম্বিতাঃ॥
কুণপস্থা মহাভীমা মৌলাবক্ষোভ্য-ভূষিতাঃ।
নবযৌবনসম্পন্নাঃ ঘোরাট্টহাসভাস্বরাঃ॥

—ইত্যাদি

দুটি ধ্যান মিলিয়ে দেখলে পরিষ্কার বোঝা যায়, বজ্রযানী বৌদ্ধ দেবী একজটা হিন্দুতান্ত্রিক তারায় পরিণত হয়েছেন। সোমড়ার বন্দ্যোপাধ্যায়রা এই তারামূর্তি তৈরি করে পূজা করেন। এই বৌদ্ধ একজটা বা তারাই তাঁদের কুলদেবতা। বহুকাল ধরে তাঁদের বংশে এই পূজা প্রচলিত আছে। এর ভিতর থেকে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের সংস্কৃতিধারার যে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশে বৌদ্ধতন্ত্রের বেশ প্রাধান্য ছিল দীর্ঘকাল। বহু বৌদ্ধতান্ত্রিক

দেবদেবী হিন্দুতন্ত্রের মধ্যে গৃহীত হয়েছেন। বৌদ্ধ ও হিন্দুতন্ত্রের এই লেনদেন ও সমন্বয়ের সময়, মনে হয়, রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ভূমিকা ছিল। বিশেষ করে রাঢ়ীয় 'কুলীন' ব্রাহ্মণদের। রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণদের পূর্বপুরুষরা অনেকে তন্ত্রযানী বৌদ্ধধর্মী ছিলেন। 'কুল' বা 'কুলীন' কথার উৎপত্তি জাতিবাচক না কুলগত সাধনার্থক। বজ্রযানী বৌদ্ধ সাধনায় 'কুল' কথার তাৎপর্য আছে। প্রাচীন বৌদ্ধমতে পঞ্চস্কন্ধ হচ্ছে সংসারের বীজস্বরূপ। এই পঞ্চস্কন্ধাত্মক শক্তিই হচ্ছে 'কুল' এবং সেই কুলকে অতিক্রম করে অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয় বলেই সাধক তাকে অবলম্বন করে অগ্রসর হন। বৌদ্ধতন্ত্রে এই পঞ্চকুলের নাম বজ্র পদ্ম কর্ম তথাগত ও রত্ন। এই পঞ্চকুল পরিণতি লাভ করে পঞ্চবুদ্ধ-শক্তিতে পর্যবসিত হয়। এই পঞ্চবুদ্ধের নাম বৈরোচন, অক্ষোভ্য, রত্নসম্ভব, অমিতাভ ও ও অমোঘসিদ্ধি। যিনি সামর্থ্য অনুযায়ী দীক্ষা পেয়ে সাধনা করেন এবং এই 'কুল' লাভ করেন, তাঁকেই 'কুলীন' বলে। বজ্রযানে কুলীন ছাড়া কেউ পরমার্থ লাভ করতে পারেন না। বাংলাদেশের রাঢ়ীয় 'কুলীন' ব্রাহ্মণেরা এই ধর্মাচরণগত অর্থেও 'কুলীন' আখ্যা পেয়েছিলেন মনে হয়।

শ্রীপুর ও বলাগড়

শ্রীপুরের ইতিহাস 'মিত্রমুস্তৌফী' বংশের সঙ্গে প্রধানত জড়িত। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার কথা। নবাবী আমল ভাঙছে এবং বৃটিশ আমলের গোড়াপত্তন হচ্ছে তখন। 'মিত্রমুস্তৌফী' পদবী দেখেই বোঝা যায়, মিত্রটি জাতিগত এবং মুস্তৌফীটি নবাবী আমলের পেশাগত উপাধি। প্রাচীন সরকারী নথিপত্রে এই মিত্রমুস্তৌফীদের পেশাগত বিবরণ পাওয়া যায়:

The family of the Mustofis is of considerable antiquity as Mohorers of the Imperial Canongoe office at Murshidabad of which Bangoe Odikarry was the principal officer and had charge of the Seals of State during the Moghul Government. (Letter d. 5-8-1813, from the Collector of Nadia to the Secy., Board of Revenue).

উইলসনের অভিধানে 'মুস্তৌফী' পদবীর ব্যাখ্যা করা হয়েছে এইভাবে:

Mustofi, Examiner and Auditor of Accounts; the principal officer of the department in which under the Mahommedan Government the accounts of ex-Collectors or farmers of the Revenue were examined. (Wilson's Glossary : P. 571)

মিত্রমুস্তৌফীদের মতন দত্তমুস্তৌফী ও অন্যান্য মুস্তৌফীরাও আছেন। মিত্রমুস্তৌফীদের প্রধান বাসস্থান গঙ্গার পূর্বতীরে বিখ্যাত উলাগ্রামে (বীরনগর, নদীয়া)। রামেশ্বর মিত্রমুস্তৌফী এই বংশের (উলার) প্রতিষ্ঠাতা। রামেশ্বর নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর শাসনকালে সুবে বাংলার রাজস্ববিভাগের মুস্তৌফীপদে বা নায়েব কানুনগোর পদে উন্নীত হন। মুর্শিদকুলির আমলে বঙ্গাধিকারী, নায়েব-কানুনগো বা মুস্তৌফীদের যে কিরকম ক্ষমতা এবং সামাজিক প্রতিপত্তি ছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়। বাংলার রাজস্ব-বিভাগে নবাব-দেওয়ান মুর্শিদকুলি খাঁ বিপ্লবের সৃষ্টি করেছিলেন বলা চলে। বৃটিশ আমলের চিরস্থায়ী

বন্দোবস্তের আগে এত বড় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আর ঘটেনি। সেই সময় যে ভাগ্যবানেরা নায়েব-কানুনগো বা মুস্তৌফীর পদে বহাল ছিলেন, তাঁরা যে কি প্রচণ্ড প্রতাপে সমাজে কর্তৃত্ব করেছেন তা বলা যায় না। বিশেষ করে তখনকার সমাজে। সমাজের তখন সমষ্টিগত চেতনা বিশেষ ছিল না। কূপ-মণ্ডুক গ্রাম্যসমাজের অটল গহ্বরে মানুষের চেতনা তখন নিদ্রিত ছিল। এমন কি সামাজিক ও পারিবারিক দাসত্বপ্রথাও তখন পূর্ণমাত্রায় বজায় ছিল সমাজে। সামান্য ঋণের দায়ে মানুষ তখন সারাজীবনের জন্য 'আত্মবিক্রয়পত্র' লিখে দিতে বাধ্য হত। উলার মিত্রমুস্তৌফী বংশের প্রতিষ্ঠাতা রামেশ্বর মিত্রমুস্তৌফীর কাছে এরকম আত্মবিক্রয়পত্রের দলিল পাওয়া গেছে। বাংলার আরও অনেক জমিদারবংশের দলিলদস্তাবেজের স্তূপের মধ্যে এরকম 'মনুষ্য-বিক্রয়পত্র' ও 'আত্মবিক্রয়পত্রের' অনেক দলিল আছে। ১১০১ বাংলা সনের (২৬০ বছর আগেকার) একখানি প্রাচীন দলিলে দেখা যায় যে, সনাতন দত্ত নামে জনৈক দরিদ্র ব্যক্তি ও তার পত্নী বিবা দাসী রামেশ্বর মিত্রমুস্তৌফীর কাছে 'অন্নোপহতি' ও 'কর্জোপহতি' মাত্র ৯৲ টাকা মূল্যে যাবজ্জীবনের জন্য আত্মবিক্রয় করেছিল। আত্মবিক্রয়পত্রটি এই :

"মহামহিম শ্রীযুক্ত রামেশ্বর মিত্র মহাশয় বরাবরেষু লিখিতং শ্রীসনাতন দত্ত ওলদ গোপীবল্লভ দত্ত সাকিন মৌজে বানিয়াজঙ্গ মামূলে পরগণে ময়মনসিংহ সরকার বাজুহায় কস্য আত্মবিক্রয়পত্র মিদং কার্যঞ্চ আগে আমি আর আমার স্ত্রি শ্রীমতি বিবানাম্নি দাসী এই দুইজন কহত সালিতে অন্নোপহতী ও কর্জোপহতি ক্রমে নগদ পন ৯ নয় রূপেয়া পাইয়া তোমার স্থানে স্বেচ্ছাপূর্বক আত্মবিক্রয় হইলাম—ইতি তাং ১১ কার্তিক সন ১১০১ বাঙ্গলা মোতাবেক ১৫ সহর রবিনৌয়ন সন ৩৯ জলুষ…"

এ-হেন সমাজে মিত্রমুস্তৌফীরা যে প্রথমত মুস্তৌফী হিসাবে, দ্বিতীয়ত স্থানীয় জমিদার হিসাবে অসাধারণ প্রভুত্ব বিস্তার করবেন, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। এই রামেশ্বরের জ্যেষ্ঠপুত্র রঘুনন্দন ১৬৩০ শকাব্দে (১৭০৮) সালে গঙ্গার পূর্বতীরের উলাগ্রাম থেকে উঠে এসে পশ্চিমতীরে হুগলী জেলার আটিশেওড়া গ্রামে বসতি স্থাপন করেন এবং গ্রামের নতুন নামকরণ করেন শ্রীপুর। রামেশ্বরের অপর পুত্র অনন্তরাম শ্রীপুরের কিছু দূরে সুখড়িয়া গ্রামে গিয়ে বাস করেন। উলার মিত্রমুস্তৌফীবংশ এইভাবে হুগলী জেলার শ্রীপুর ও

সুখড়িয়ায় এসে বসবাস করতে আরম্ভ করেন। এই সব অঞ্চল তখন প্রধানত বাঁশবেড়িয়ার রাজাদের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। বাঁশবেড়িয়ার রাজা রঘুদেব আটিশেওড়া গ্রামে রঘুনন্দন মিত্রমুস্তৌফীকে ৭৫ বিঘা মহাত্তরাণ ভূমি দান করেন। সেখানে রঘুনন্দন উলার বসতবাড়ির পারিপাট্য বজায় রেখে তার অনুকরণে গড়বেষ্টিত বাড়ি, দীঘি, পুষ্করিণী, চণ্ডীমণ্ডপ ইত্যাদি নির্মাণ করেন। উক্ত মহাত্তরাণ ছাড়া তিনি বর্তমান হুগলী কালেক্টরির তৌজি নং ১২ শ্রীপুর ও তেতুলিয়া মৌজা ও পরগণা হাতিকান্দার অধীন নং ১৩ পাঁচপাড়া মৌজা বাঁশবেড়িয়ার রাজার কাছ থেকে কিনে নেন। নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ১১৩৭ সনের ১৬ই ভাদ্রের একখানি দানপত্রে রঘুনন্দনকে গঙ্গার পূর্বকূলে পলাশী বেলগাঁ কলিকাতা ও হাবেলিশহর পরগণায় বাগিচা করবার জন্য ৩০ বিঘা নিষ্কর জঙ্গলভূমি দান করেছিলেন।

শ্রীপুরে মিত্রমুস্তৌফীদের প্রতিষ্ঠিত অনেক দেবালয় আছে। কয়েকটি দেবালয় জীর্ণ হয়ে গেছে। এর মধ্যে প্রাচীন কারুকলা ও কারিগরির নিদর্শন-রূপে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল মুস্তৌফীদের 'দোচালা চণ্ডীমণ্ডপটি'। খড়ের চালের বদলে এখন টিনের চাল দেওয়াতে মণ্ডপের স্বাভাবিক সৌন্দর্য অনেক নষ্ট হয়ে গেছে, কিন্তু কাঠের কারুকার্যগুলি এখনও রয়েছে। বাংলাদেশের প্রাচীন তক্ষণশিল্পের নিদর্শন হিসাবে এই ধরনের চণ্ডীমণ্ডপ অত্যন্ত বিরল। হুগলী জেলায় এরকম দুটি চণ্ডীমণ্ডপ দেখেছি, একটি আটপুরের মিত্রদের বাড়ির মণ্ডপ, আর একটি শ্রীপুরের মুস্তৌফীদের। বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি, পৌরাণিক চিত্র কাঠের স্তম্ভের গায়ে, কড়িকাঠে ও ফ্রেমের উপর খোদাই করা। উইপোকায় অনেকটা গ্রাস করলেও এখনও শ্রীপুরের চণ্ডীমণ্ডপের কারুকার্যের অবশেষ যা আছে তা দেখলে স্তম্ভিত হতে হয়। চালের নিচে আজও স্থানে স্থানে নানারঙের সরু বাঁশের শলার চিক অতি সূক্ষ্ম বেতের সুতো দিয়ে বাঁধা আছে দেখা যায়। স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের কীর্তি কিছু কিছু সরকারী চেষ্টায় রক্ষিত হলেও, বাংলাদেশের তক্ষণশিল্পের অপূর্ব নিদর্শন হিসাবে এই ধরনের দু-একটি চণ্ডীমণ্ডপ অন্তত এখনও সযত্নে রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা কেউ অনুভব করেননি। বাঙালী সূত্রধরদের এই অবিস্মরণীয় কীর্তির কথা একদিন শুধু বইয়েই পড়তে হবে, চোখে দেখা সম্ভব হবে না।

শ্রীপুরের সংলগ্ন হুগলী জেলার বলাগড় গ্রাম—রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণদের বসতির জন্য বিখ্যাত। বলাগড় গ্রামের পত্তন ও নাম সম্বন্ধে প্রবাদ এই যে, বলরাম ঠাকুর এখানে গড়বাড়ি তৈরি করে বসতি স্থাপন করেছিলেন।[১]

"প্রবাদ আছে, কেশরকুণী রাজা রাঘব বলরাম ঠাকুরের জ্যেষ্ঠভ্রাতা রুদ্রঠাকুরকে বলপূর্বক নিজ পিতৃব্য গোবিন্দ রায়ের কন্যার সহিত বিবাহ দেন পশ্চাৎ বলরাম ঠাকুর গঙ্গাধর ঠাকুর রতিকান্ত ঠাকুর মধুসূদন তর্কলঙ্কার প্রভৃতিকে আক্রমণ করেন। ঠাকুরগণ কুলরক্ষার্থ রাজার দৌরাত্ম্যে ফুলে (ফুলিয়া) পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গার পশ্চিমতীরে আসিয়া গঙ্গাধর ঠাকুর খামারগাছি, রতি ঠাকুর পাঁচগড়া, বলরাম ঠাকুর বলাগড়, মধুসূদন তর্কালঙ্কার কেলেগড় ইত্যাদি গ্রামে বাস করেন। কেহ কেহ বলেন, বলাগড় গ্রামের নাম আভটিসেওড়া বিল বলরাম ঠাকুর বাস করার দরুণ ঐ নাম লোপ হইয়া বলাগড় নাম হয়।"

বাংলার সামাজিক ইতিহাসের এও এক উল্লেখযোগ্য পর্ব। কুলীন ব্রাহ্মণরা কন্যাদানের আতঙ্কে ভিটেবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে বেড়াতেন। পালানো অস্বাভাবিক নয়। অন্তর্জলি অবস্থায় বৃদ্ধকেও কুলীনপাত্র বলে কন্যাদান করা হত তখন। তার একটি চিত্র 'কুলসারসংগ্রহ' থেকে তুলে দিচ্ছি :

রাজা বলে এই কন্যা বিয়া কর রমা (রমাকান্ত)
রমা সে কন্যারে বলে পুন ২ মা মা ॥
রাজা বলে এই বিয়ার এই মন্ত্র হয়।
বিবাহটি বুঝি লও কুলীন সভায় ॥
কোথা গেল সেই রাজা কোথা গেল রমা।
ঘোষণা রহিল মন্ত্র বিয়ার মন্ত্র মা মা ॥
শত সঙ্খ্য ঢাক বাজে সভাটা বেড়িয়া।
কোথা মন্ত্র কোথা তন্ত্র কোথাকার বিয়া ॥
ক্ষণপরে রমাকান্ত করে অন্তর্জলি।
গঙ্গালাভ হল তার প্রস্তুত সকলি ॥

১ রোহিণীকান্ত মুখোপাধ্যায় : কুলসারসংগ্রহ, ৬৩ পৃষ্ঠার পাদটীকা।

সপুত্রাদি জ্ঞাতিগণে চিতা সাজাইয়া।
সংকার করিল তারে বেদমন্ত্র দিয়া ॥

রাজা-মহারাজারা জবরদস্তি করে কুলীনপাত্রে কন্যাদান করতেন এবং কুলে দোষাক্ষেপ করতেও দ্বিধা করতেন না। কুলরক্ষার্থে অনেক কুলীন ব্রাহ্মণ রাজার এলাকা ছেড়ে পলায়ন করতে বাধ্য হতেন। এইরকম কোন অবস্থায় ঘটনাচক্রে বলরাম ঠাকুর, গঙ্গাধর ঠাকুর, রতি ঠাকুর ও মধুসূদন তর্কালঙ্কার ফুলিয়া গ্রাম ছেড়ে গঙ্গার পশ্চিমতীরে এসে যথাক্রমে বলাগড়ে, খামারগাছিতে, পাঁচগড়ায় ও কেলেগড়ে বসবাস করেন। গঙ্গার পশ্চিমতীরে হুগলী জেলার বলাগড়ের পরে কেলেগড় (কালীগড়) ও জীরাট গ্রাম। আগাগোড়া এই গ্রামগুলি তাই রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণদের বসতির জন্য প্রসিদ্ধ।

বলাগড়ে এই রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণদের আজও প্রাধান্য বজায় আছে। অনেক প্রাচীন বংশের পরিত্যক্ত ঘরবাড়ি ও ভিটাও দেখা যায়। জীর্ণ অট্টালিকা ও দেবালয়ও আছে অনেক। জীরাটের গোস্বামীদের একটি শাখা বলরামগড়ের গোস্বামীরাও প্রাচীন বাসিন্দাদের মধ্যে অন্যতম।

রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণরা যে প্রধানত ঘোর শাক্ত ছিলেন একথা আগে বলেছি। যেখানে রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণদের একদা বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল, সেখানে যে তান্ত্রিক ধর্ম ও আচার-অনুষ্ঠানের প্রভাব খুব বেশি থাকাই সম্ভব তার প্রমাণ বলাগড়, কেলেগড়, জীরাটের সর্বত্র রয়েছে আজও। মধ্যে গঙ্গাবংশীয় গোস্বামীরা বৈষ্ণবধর্মের বীজ ছড়িয়েছিলেন, গঙ্গার পশ্চিমতীরে জীরাটে ও বলাগড়ে। কিন্তু তাতে শাক্তধর্মের প্রাবল্য কমেনি বিশেষ।

জীরাট ও পাটুলি

সংস্কৃত দ্রাবিড় বা অষ্ট্রিক, কোন ভাষা থেকেই 'জীরাট' নামের উৎপত্তি হয়েছে বলে মনে হয় না। 'জীরাট' মুসলমানী নাম। কথাটা 'জিরায়ৎ', অর্থ হল আবাদী জমি বা ফসলক্ষেত। 'জিরায়ৎ' এবং 'জিরাং' থেকে 'জীরাট' নামটি প্রচলিত হয়েছে। নাম শুনেই বোঝা যায়, খুব বেশি প্রাচীন গ্রাম নয় জীরাট। গঙ্গাতীরবর্তী বনজঙ্গল হাসিল করে মুসলমান আমলের গোড়ার দিকে (পাঠানযুগে) গ্রামের পত্তন হয়েছে। এই জঙ্গল থেকে জনপদে পরিণতির ইতিহাস চার পাঁচশত বছরের ইতিহাস। পুবে ও পশ্চিমে গঙ্গার দোদুল্যমান গতি-পরিবর্তনের ফলে জীরাটের ভাঙাগড়া হয়েছে একাধিকবার। এখন গঙ্গা জীরাট থেকে দূরে পূর্বাভিমুখী।

জীরাটের যা কিছু ঐতিহাসিক কাহিনী তা কয়েকটি প্রাচীন পরিবারকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। তার মধ্যে জীরাটের চক্রবর্তী (কাঞ্জিলাল) পরিবার, গঙ্গাবংশীয় গোস্বামীপরিবার, মুখোপাধ্যায়পরিবার (স্বনামধন্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পূর্বপুরুষরা), নাগপরিবার প্রভৃতি অন্যতম। পারিবারিক পরিচয় থেকেই বোঝা যায়, রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের শাক্ত সাধনার ধারার সঙ্গে গঙ্গাবংশীয় গোস্বামীদের বৈষ্ণব সাধনার ধারার সংঘাত ও সমন্বয় হয়েছে জীরাট গ্রামে এবং আজও এই দুই প্রাচীন সংস্কৃতিধারার স্রোত অক্ষুণ্ণ রয়েছে সেখানে।

কেলেগড় বা কালীগড় গ্রামের নাম বলাগড় প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছি। এইস্থানে সিদ্ধেশ্বরী কালী প্রতিষ্ঠিত। কালীর গড় বলে নাম কালীগড়-কেলেগড়। শোনা যায়, গঙ্গাতীরের জঙ্গলে হুগলীর বিখ্যাত কোন ডাকাতের দল এই কালী প্রতিষ্ঠা করেছিল। অধিকারীবংশের পূর্বপুরুষরা কালীর পূজারী ছিলেন। বর্তমানে তাঁদেরই দৌহিত্রবংশের চট্টোপাধ্যায়েরা পূজারী সেবায়েত। দেবীস্থানের সামনে একটি শিবমন্দিরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে, 'মহাকাল ভৈরব' বলে কথিত। স্থানটিকে উপপীঠও বলা হয় এবং নাম 'বলয়োপপীঠ'। 'পীঠমালা'য় পীঠ ও উপপীঠের মধ্যে এর নাম পাওয়া যায়

না। মনে হয়, পরে এই মহাকাল ভৈরব ও সিদ্ধেশ্বরীর স্থান উপপীঠ বলে জনপ্রিয় হয়েছে।

চক্রবর্তীবংশের পূর্বপুরুষ যিনি জীরাট গ্রামে এসে প্রথম বসতি স্থাপন করেন, তাঁর নাম পণ্ডিত অভয়রাম সার্বভৌম। গঙ্গাবংশীয় গোস্বামীদের পূর্বপুরুষ রামকানাই গোস্বামী জীরাটে আসেন অভয়রামের সঙ্গে একসঙ্গে এবং একই সময়ে। উভয়েরই আদি নিবাস যশোহর জেলায় শোনা যায়। অভয়রামের পিতা পণ্ডিত রামেশ্বর বিদ্যারত্ন ত্রিবেণীর একটি চতুষ্পাঠিতে অধ্যাপনা করতেন। অভয়রাম পিতার সঙ্গে ছেলেবেলা থেকেই টোলে পড়তে যেতেন। ত্রিবেণীতে অধ্যাপনাকালে রামেশ্বর জীরাটের পাশে পাঁচপাড়া গ্রামে কিছুদিন অবস্থান করেন। সেই সময় জীরাটের সঙ্গে তাঁদের পরিচয়। অভয়রাম ন্যায়শাস্ত্র ও ব্যবহারশাস্ত্রে বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন। রামকানাই গোস্বামীসহ অভয়রাম যখন জীরাটে বসবাসের জন্য আসেন তখন উভয়েরই বয়স প্রায় সত্তর বছর। আনুমানিক তিনশ বছর আগেকার, অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝির কথা। চক্রবর্তীরা ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি অভয়রামের কাল নির্ণয় করতে চান। কিন্তু অভয়রাম থেকে ফকিরচাঁদ চক্রবর্তী হলেন অধস্তন চতুর্থ পুরুষ। ফকিরচাঁদ ১৮৫০ খৃস্টাব্দে প্রায় নব্বই বছর বয়সে মারা যান, সুতরাং তাঁর কাল আনুমানিক ১৭৬০ থেকে ১৮৫০ সাল পর্যন্ত ধরা যায়। তার আগে ৩০ বছর করে পুরুষ গণনা করলেও অভয়রামের (অভয়রাম-শ্রীকৃষ্ণ-বিষ্ণুরাম-রামচরণ-ফকিরচাঁদ) কাল ১৬৩০-৪০ এর আগে হয় না। যাই হোক, অভয়রাম ও রামকানাই দুই অভিন্নহৃদয় বন্ধু জীরাটে এসে কালীগড়ের সিদ্ধেশ্বরী কালীর পূজারী কাশীনাথ অধিকারী দুই কন্যাকে দুজন বিবাহ করে বৃদ্ধ বয়সে সংসার পেতে বসলেন। নিত্যানন্দ-প্রভুর কন্যা গঙ্গাদেবীর বংশধর রামকানাই গোস্বামী গোঁড়া বৈষ্ণব এবং রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত অভয়রাম সার্বভৌম ঘোর তান্ত্রিক। দুই বৃদ্ধ ভাইরা-ভাই দুই ভিন্নমুখী সাধনাধারার প্রবর্তন করলেন জীরাট গ্রামে। অভয়রাম নিজের বসতবাটিতে মৃণ্ময়ী কালী এবং রামকানাই গোস্বামী তাঁর বসতবাড়িতে 'রাধা-গোপীনাথ' বিগ্রহ স্থাপন করলেন। জীরাটের বুড়ো শিব, মহাকাল ভৈরব ও সিদ্ধেশ্বরী কালীর পরে এই মৃণ্ময়ী কালী ও রাধা-গোপীনাথজীউ জীরাটের প্রাচীন বিগ্রহাদির মধ্যে অন্যতম। মৃণ্ময়ীদেবীর

ইঁটের মন্দির ও মণ্ডপ অভয়রামের পুত্র শ্রীকৃষ্ণ ও পৌত্র মুকুন্দরাম নির্মাণ করেন। গোপীনাথজীউয়ের মন্দির ও মণ্ডপ রামকানাই গোস্বামীর অন্যতম প্রধান শিষ্য সুবর্ণবণিক সম্প্রদায়ের ধনিক ভক্ত মাধব দত্ত নির্মাণ করে দেন এবং তাঁর সেবার জন্য প্রচুর সম্পত্তি দান করেন। অভয়রাম বীরাচারী তান্ত্রিক ছিলেন এবং পঞ্চমুণ্ডের আসনে শক্তিসাধনা করতেন। তাঁর পুত্র শ্রীকৃষ্ণ বাদ্‌শাহের কাছ থেকে 'চক্রবর্তী' উপাধি পান। অভয়রামের পৌত্র মুকুন্দরাম পরে 'পাষাণময়ী কালী' প্রতিষ্ঠা করেন।

সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই দেখা যায়, চক্রবর্তী পরিবারের বংশধররা হুগলী অঞ্চলের পর্তুগীজ ডাচ ও ইংরেজ বণিকদের ব্যাবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছেন। হুগলীর এই অঞ্চলের প্রায় সমস্ত গ্রামের বর্ধিষ্ণু পরিবারের এটা একটা অন্যতম বিশেষত্ব দেখা যায়। অভয়রামের পৌত্র মুকুন্দরাম হুগলীর ইংরেজ কুঠিয়াল ও ইন্টারলোপারদের সঙ্গে বাণিজ্যিক লেনদেন করতেন এবং দালালি বা কমিশন এজেন্টের কাজ করে তিনি যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করেন। অভয়রামের পৌত্র বিষ্ণুরাম সার্বভৌমের শাখায় ফকিরচাঁদ চক্রবর্তী ও মথুরামোহন চক্রবর্তী এই কাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। ফকিরচাঁদ ছিলেন বিখ্যাত হ্য-সুজা কোম্পানীর বেনিয়ান। হ্য-সুজা কোম্পানীর কাচের পুঁতি, ঝাড়-লণ্ঠন ইত্যাদির বড় ব্যাবসা ছিল। ফকিরচাঁদ এই কোম্পানীর বেনিয়ান হয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করেন এবং তদানীন্তন কলকাতার বাঙালী ধনিকসমাজেও বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেন। ইঞ্জিনীয়ার সিমস্‌ সাহেবের কলকাতা সার্ভে রিপোর্টে (Report on the Survey of Calcutta : By F. W. Simms, 1851) উত্তর কলকাতার (গরাণহাটার কাছে) 'ফকির চক্রবর্তী লেনের' উল্লেখ আছে। ১৮৫০ সালে সার্ভে করা হয় এবং ১৮৫১ সালে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। ফকিরচাঁদ ১৮৫০ সালে মারা যান। মনে হয় তাঁর জীবদ্দশাতেই কলকাতায় তাঁর নামে রাস্তা হয়েছিল। কলকাতায় বাড়ি ছাড়াও, জীরাট গ্রামে এইসময় ফকিরচাঁদ বিরাট প্রাসাদতুল্য বাসভবন নির্মাণ করেন এবং দুর্গোৎসবের জন্য চণ্ডীমণ্ডপাদি তৈরি করেন। সেই মণ্ডপের ভগ্নাবশেষ আজও আছে এবং সেখানে প্রায় দেড়শ বছর ধরে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। চক্রবর্তীদের পুষ্করিণীর বাঁধাঘাটের পাশে ফকিরচাঁদ প্রতিষ্ঠিত দুটি শিবমন্দির আছে। মন্দিরের গায়ে

লেখা আছে—"বিপ্র ফকির চন্দ্রেন কৃতং শ্রীশিবমন্দিরম্। শকাব্দ ১৭৬৩, ১২৪৮ সাল।" ফকিরচাঁদের পুত্র প্যারীমোহনও পরে উক্ত হু-সুজা কোম্পানীর মুৎসুদ্দীগিরি করেন। 'বেঙ্গল ডাইরেক্টরী এ্যাণ্ড অ্যানুয়াল রেজিস্টারে' সেকালের বাঙালী বেনিয়ান ও মুৎসুদ্দীদের নামের তালিকা পাওয়া যায় এবং কোন্ কোন্ কোম্পানীর সঙ্গে তাঁরা বাণিজ্যে লিপ্ত ছিলেন তারও বিবরণ জানা যায়। ১৮৫৮ সালের রেজিস্টারে দেখা যায় যে 'টমাস হু-সুজা অ্যাণ্ড কোম্পানী'র বেনিয়ান হিসাব মথুরামোহন চক্রবর্তীর নাম আছে (পৃষ্ঠা ২৩-২৪)। মথুরামোহন ফকিরচাঁদের দ্বিতীয় পুত্র। মনে হয়, পিতার মৃত্যুর পরে তিনিই হু-সুজা কোম্পানীর প্রধান বেনিয়ানের পদে বহাল হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে চক্রবর্তীবংশের বিভিন্ন শাখায় অনেকে বড় বড় সরকারী চাকুরী করে বিত্তশালী হন। বিদেশী বণিকদের মধ্যবর্তিতার ধারা অবাধ স্বাধীন বাণিজ্যের পথে পরিচালিত না হয়ে ক্রমে নিরাপদ চাকুরীজীবনে পর্যবসিত হয়। বাঙালী মধ্যবিত্তসমাজের ঐতিহাসিক বিধিলিপির খণ্ডন জীরাটের চক্রবর্তীরাও করতে পারেননি।

স্বনামধন্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পৈতৃক বাস জীরাট গ্রামে। এই বংশের আদিবাস হুগলী জেলার দিগসুই গ্রামে। মুখোপাধ্যায়বংশের পূর্বপুরুষ বলরাম ন্যায়ালঙ্কার এই গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। তাঁর তিন পুত্র হরেকৃষ্ণ, রামজয় ও রামচন্দ্র। রামজয় জীরাটের গোস্বামীবংশের কন্যা বিবাহ করেন এবং তাঁর পুত্র বিশ্বনাথ পিতার মৃত্যুর পর জীরাটের মাতুলালয়ে মায়ের সঙ্গে চলে আসেন। তারপর জীরাটেই গোস্বামীদের দৌহিত্র-সন্তান বিশ্বনাথ স্থায়ীভাবে বসবাস করতে আরম্ভ করেন। বিশ্বনাথ হলেন স্যার আশুতোষের পিতামহ। বিশ্বনাথের চারপুত্র—দুর্গাপ্রসাদ (১৮৩২), হরিপ্রসাদ, গঙ্গাপ্রসাদ (১৮৩৬) ও রাধিকাপ্রসাদ। দুর্গাপ্রসাদ ও আশুতোষের পিতা গঙ্গাপ্রসাদ বলাগড় হাইস্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। স্যার আশুতোষের জীবন কলকাতা শহরে কাটলেও তিনি বাল্যকালে একাধিকবার জীরাটে গেছেন ও বাস করেছেন। কন্যা কমলার 'বিধবাবিবাহের' সময় জীরাটের কুলীন ব্রাহ্মণরা তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা না করায় তিনি পরবর্তীকালে জীরাটের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করেন। স্যার আশুতোষের পৈতৃক বসতবাড়ি দীর্ঘকাল পরিত্যক্ত অবস্থায় জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে পড়ে ছিল জীরাটে। সম্প্রতি সেটি উদ্ধার

করে সংস্কার করা হয়েছে এবং সেখানে 'আশুতোষ স্মৃতিমন্দির' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনের পিতৃভূমিও জীরাট গ্রামে। ১৮৫৫ সালে দেবেন্দ্রনাথের জন্ম হয়। বলাগড় হাইস্কুল থেকে দেবেন্দ্রনাথও প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে বিহার ও যুক্তপ্রদেশের নানা স্থানে ওকালতি করেন। শেষ জীবনে দেবেন্দ্রনাথ অন্ধ হয়ে যান। 'অশোকগুচ্ছ' 'পারিজাত-গুচ্ছ', প্রভৃতি এঁর কাব্যগ্রন্থ বিশেষ পরিচিত। সাহিত্যসেবী শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়েরও বাস জীরাট গ্রামে।

জীরাটের গ্রাম্য উৎসবের মধ্যে চৈত্র মাসে বুড়োশিবের গাজন এবং পয়লা বৈশাখের সঙ ও অভিনয়সহ শোভাযাত্রা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত উৎসবটি এখন লোপ পেয়ে গেছে। গ্রামের প্রাচীনদের মুখে এই নববর্ষ উৎসবের যে বর্ণনা শুনেছি তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য বলে মনে হয়। পয়লা বৈশাখ বিকালে গ্রামের ডোম, দুলে প্রভৃতি সম্প্রদায়ের যুবকরা খড়িমাটি, ভূষোকালি, সিঁদুর, গেরিমাটি ইত্যাদি রং গায়ে লেপে, বিচিত্র বেশভূষায় সঙ সেজে গ্রাম প্রদক্ষিণ করত। শোভাযাত্রা করে গ্রাম প্রদক্ষিণকালে সামাজিক প্রহসনের অভিনয় করত তারা। বাংলার যাত্রাগানের এইটাই হল সবচেয়ে প্রাচীন রূপ এবং 'যাত্রা' কথার উৎপত্তিও এই অভিনয়সহ শোভাযাত্রা ও প্রদক্ষিণ থেকে হয়েছে। কালীগড় বা কেলেগড়ের নীলমণি কলু এই শোভা-যাত্রার সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য অভিনেতা। নীলমণি 'দৈবজ্ঞ-আচার্যের' বেশে গ্রামবাসীকে নতুন বছরের পঞ্জিকার ফলাফল শোনানোর নাম করে বিচিত্র সব ছড়াগান ও বক্তৃতা শোনাত।* বিগত বছরের গ্রাম্য ও পারিবারিক কীর্তি-কাহিনী অবলম্বন করে সরস বিদ্রূপাত্মক ছড়া ও গান রচনা করা হত এবং ভবিষ্যতের ইঙ্গিতও থাকত তার মধ্যে। গ্রামের সকল শ্রেণীর লোক, বিশেষ করে অন্যায়কারী ও অপরাধীরা, দৈবজ্ঞ-আচার্যবেশী নীলমণিকে ভয় করত, কারণ বছরের প্রথম দিনে নতুন পঞ্জিকার সংবাদ জ্ঞাপনের সময় নীলমণি যে কারও মুখ চেয়ে কথা বলত না, একথা সকলেরই জানা ছিল। অভিনয়কলার মাধ্যমে গ্রাম্যসমাজের সমালোচনার এই প্রাচীন প্রথা নীলমণির মৃত্যুর পর জীরাট থেকে একরকম লুপ্ত হয়ে গেছে।

জীরাট স্টেশনের পশ্চিমদিকে মাইলখানেক দূরে পাটুলি গ্রাম। এ অঞ্চলের মধ্যে পাটুলি সবচেয়ে প্রাচীন গ্রাম। বর্ধমান জেলায় আর একটি গ্রাম আছে পাটুলি নামে। এ-নামের কারণ কি? সেকালের সংস্কৃতিকেন্দ্র পাটলিপুত্রের নামের অনুকরণে এইরকম নামকরণ করা হয়েছে কি না ভাববার বিষয়। হুগলী জেলার এই পাটুলি গ্রামের মঠবাড়িটি প্রাচীন। মঠবাড়ি নাম থেকে মনে হয় এই বংশের পূর্বপুরুষ শৈবসাধক (বা বৌদ্ধতান্ত্রিক) ছিলেন। সাধনার স্থানে 'মঠ' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল বলে এই পরিবারের বাড়ি আজও মঠবাড়ি বলে পরিচিত। মঠবাড়িতে যে দুর্গাপূজা হয় তাতে দুর্গামূর্তির দুটি হাত মাত্র বাইরে প্রকট থাকে, বাকি আটটি হাত পিছনে লুকানো থাকে। তা ছাড়া দুর্গার দক্ষিণে কার্তিক ও বামে গণেশ থাকে। সন্ধিপূজা হয় না। যে-রাতে অষ্টমী সেই রাতে অর্ধরাত্রি পূজা হয়। পূজায় পাঁঠাবলি হয় এবং বলির পরে তৎক্ষণাৎ পাঁঠাটি ছাড়িয়ে তাকে টুকরো-টুকরো করে কেটে মাসকলাই দই-দুর্বা মিশিয়ে চতুঃষষ্টি যোগিনীদের উৎসর্গ করা হয়। শোনা যায়, ঘোর তান্ত্রিক আচারে একদা পূজা হত এবং পূজায় নরবলিও দেওয়া হত। এখন পিটুলির নরপুত্তলিকা বলি দেওয়া হয়। মঠবাড়ির দেবী 'মঠের মা' বলে পরিচিত।

হুগলী জেলার এ-অঞ্চলে গঙ্গার পশ্চিমতীরবর্তী কোন গ্রামে ধর্মঠাকুরের কোন অস্তিত্ব কোথাও দেখা যায় না। পাটুলি গ্রামের পাশে মুণ্ডখোলা নামে একটি গ্রাম আছে। এই গ্রামে ধর্মঠাকুরের একটি প্রাচীন স্থান আছে। দেবোত্তর সম্পত্তিও আছে ধর্মঠাকুরের নামে। ধর্মঠাকুরের সেবায়েত দুলেরা। তাদের উপাধি বোধক। 'বোধক' উপাধির উৎপত্তি ও তাৎপর্য বিশেষভাবে প্রণিধেয়। 'বৌদ্ধ' কথা 'বোধক' হয়েছে কি? ধর্মঠাকুরের চৈত্রগাজন হয়, কিন্তু বিশেষ উৎসব হয় মাঘ মাসের শুক্লা-দ্বিতীয়া থেকে শ্রীপঞ্চমী পর্যন্ত। এই ধর্মপূজায় যে মেলা হয় তা এই অঞ্চলের সবচেয়ে বড় মেলা এবং 'ধর্মের জাত' বলে পরিচিত। বহু দূরের গ্রাম থেকে সকল শ্রেণীর লোক ধর্মের জাতে যোগদান করতে আসে।

বাঁশবেড়িয়া

বাংলার প্রাচীন জমিদারবংশের মধ্যে বাঁশবেড়িয়ার রাজামহাশয়রা অন্যতম। এঁরা উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ (দত্ত)। আকবর বাদশাহের আমল থেকে। রায়, মজুমদার, রাজামহাশয় ইত্যাদি উপাধি ভোগ করে এসেছেন। শোনা যায়, হিন্দুযুগের সেন-আমল থেকে এঁদের প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত। এই বংশের দ্বারকানাথ বর্ধমান জেলার পাটুলি গ্রামে এসে বসবাস করেন, আনুমানিক ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি। দ্বারকানাথের পৌত্র সহস্রাক্ষ এবং সহস্রাক্ষের পৌত্র রাঘব দত্ত। দিল্লীর বাদশাহের কাছ থেকে রাঘব দত্ত 'মজুমদার' উপাধি লাভ করেন এবং প্রচুর নিষ্কর সম্পত্তিসহ একুশটি পরগণার জমিদারী পান। এই সব পরগণার অধিকাংশই সরকার-সপ্তগ্রামের অন্তর্গত ছিল বলে কাছাকাছি কোন অঞ্চল থেকে জমিদারী তদারক করার প্রয়োজনবোধে রাঘব দত্ত বাঁশবেড়িয়ায় বসবাস করার সিদ্ধান্ত করেন। বর্ধমানের পাটুলির সঙ্গে তখনও তিনি যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন করেননি, পূজা উৎসবাদির সময় নিয়মিত পাটুলিতে যেতেন। রাঘবের দুই পুত্র, রামেশ্বর ও বাসুদেব। তাঁদের সময় পৈতৃক জমিদারী ভাগ হয়ে যায়। অগ্রজ রামেশ্বর পাটুলি ত্যাগ করে বাঁশবেড়িয়ায় এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে আরম্ভ করেন। সম্রাট ঔরঙ্গজীবের কাছ থেকে ১৬৭৩ খৃস্টাব্দে তিনি বসবাসের জন্য বাঁশবেড়িয়ায় ৪০১ বিঘা জমি এবং পঞ্চপার্চা খিলাতসহ 'রাজা মহাশয়' উপাধি পান। রামেশ্বরই বাঁশবেড়েতে গড়বেষ্টিত বাড়ি তৈরি করেন। গড়ের পরিধি প্রায় এক মাইল। এখনও গড়ের সুস্পষ্ট চিহ্ন বাঁশবেড়িয়ার রাজবাড়ির চারিদিকে দেখা যায়। বহু ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ প্রভৃতি পরিবারকে রামেশ্বর বাঁশবেড়িয়ায় বসতি স্থাপনের জন্য আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসেন। গঙ্গাতীরবর্তী এই গ্রামে যে এককালে বাঁশঝাড়ের প্রাচুর্য ছিল তা নাম থেকেই বোঝা যায়। সারবন্দী বাঁশঝাড়ের বেড় শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধে দুর্ভেদ্য ব্যূহের কাজ করত। কেবল গড়বেষ্টিত নয়, এইরকম ঘন বাঁশঝাড়ের বেড়-বেষ্টিত রাজবাড়ি ছিল বলেই বর্গীর হাঙ্গামার সময় বাঁশবেড়িয়ার রাজারা আত্মরক্ষা করতে এবং মারাঠাদের পরাজিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। রামেশ্বরের পুত্র

রঘুদেব শোনা যায় মারাঠাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করে তাঁদের বিতাড়িত করেছিলেন।

বাঁশবেড়িয়ার রাজবংশ যদিও প্রধানত শাক্ত ছিলেন, তাহলেও কোন ধর্মাচরণের প্রতিই তাঁদের কোন সঙ্কীর্ণ বিরোধী মনোভাব ছিল না। রাজা রামেশ্বর নিজে বাঁশবেড়িয়ার বিখ্যাত 'বাসুদেব মন্দির' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। প্রাচীন বাংলা অক্ষরে মন্দিরের গায়ে একটি শ্লোক খোদাই করা আছে—

মহী-ব্যোমাঙ্গ-শীতাংশুগণিতে শক-বৎসরে
শ্রীরামেশ্বর-দত্তেন নির্মমে বিষ্ণুমন্দিরং ॥ ১৬০১

১৬৭৯ খৃস্টাব্দে বাসুদেব-মন্দিরটি তৈরি হয়। মন্দিরের গায়ে ইটের উপর পৌরাণিক দেবদেবীর ও কাহিনীর অপূর্ব কারুকার্য আছে। প্রায় ২৭৫ বছর আগে তৈরি দেবালয়ে এরকম পোড়ামাটির কারুকার্যের নিদর্শন বাংলাদেশে খুবই বিরল। ১৭৮৮ খৃস্টাব্দে রাজা নৃসিংহদেব স্বয়ম্ভবা মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরের গায়ে খোদিত শ্লোকটি হল :

আশাচলেন্দু সম্পূর্ণে শাকে শ্রীমৎ স্বয়ম্ভবা।
রেজে তৎশ্রীগৃহঞ্চ শ্রীনৃসিংহদেব-দত্ততঃ ॥

এ ছাড়া বাঁশবেড়িয়ার আর একটি বিখ্যাত মন্দির হল 'হংসেশ্বরী মন্দির'। নৃসিংহদেব যখন নাবালক ও অভিভাবকহীন ছিলেন, তখন বাঁশবেড়িয়ার বিস্তৃত জমিদারীর অনেকটা অংশ বর্ধমান ও নদীয়ার রাজারা দখল করে নেন। নৃসিংহদেব তাঁর নিজের 'স্মৃতিকথায়' লিখে গেছেন :

"সন ১১৪৭ সালের মাহ আশ্বিনে আমার পিতা গোবিন্দ দেবরায়ের কাল হয়, সেকালে আমি গর্ভস্থ ছিলাম, বর্ধমানের জমিদারের পেস্কার মাণিকচন্দ্র নবাব আলিবর্দি খাঁর নিকট আমার পিতার অপুত্রক কাল হইয়াছে খেলাপ জাহির করিয়া আমার পুস্ত পুস্তামের জর খরিদা সনন্দী জমিদারি আপন মালিকে জমিদারি সামিল করিয়া লয়। সন ১১৪৮ সালে মাহ বৈশাখে খামখা দখল করে ও হলদা পরগণা কিশমতের মালগুজারি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সামিল ছিল। তিনিও ঐ সন কিশমত মজকুর আপন পুত্র শ্রীশম্ভুচন্দ্র রায়ের তালুকের সামিল করিয়া দখল করেন। মৌজে কুলিহাণ্ডা মজকুরি তালুক হুগলী চাকলার সামিল ছিল। পীর খাঁ ফৌজদার বর্ধমানের জমিদারকে দখল দিলেন না, অতএব তালুক মজকুর আমার দখলে

আছে। সুবে বাঙ্গালায় কোন জমিদার ও তালুকদারের পুত্র এমন বেআইনসাজী ও বেদায়ত হয় নাই।"

এই সময় নৃসিংহদেব কিছুকালের জন্য কাশীবাসী হন। ধর্ম ও বিদ্যার প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল। কাশীতে বিখ্যাত শৈব ও তান্ত্রিক সাধুদের সংস্পর্শে এসে তিনি তান্ত্রিকমতে যোগসাধনাদি করতে আরম্ভ করেন। ভূকৈলাসের জয়নারায়ণ ঘোষালও এই সময় কাশীতে ছিলেন। তাঁর সঙ্গে একত্রে মিলে তিনি এই সময় 'কাশীখণ্ডের' বাংলা অনুবাদ করতে প্রবৃত্ত হন। তার পরিচয় দানপ্রসঙ্গে তিনি বলেছেন:

মনে করি কাশীখণ্ড ভাষা করি লিখি।
ইহার সহায় হয় কাহারে না দেখি॥
মিত্র শত চৌদ্দ শকে পৌষমাস যবে।
আমার মানস মত যোগ হইল তবে॥
শূদ্রমণি কুলে জন্ম পাটুলিনিবাসী।
শ্রীযুত নৃসিংহদেব রায়গত কাশী॥
তাঁর সহ জগন্নাথ মুখুয্যা আইলা।
প্রথম ফাল্গুনে গ্রন্থ আরম্ভ করিলা॥

প্রায় আট বছর পরে কাশী থেকে ফিরে ১৭৯৯ সালে নৃসিংহদেব বাঁশবেড়িয়ায় হংসেশ্বরী মন্দিরের ভিত্ পত্তন করেন। মন্দিরের গড়নের পরিকল্পনাটি তাঁর নিজস্ব। কুলকুণ্ডলিনী শক্তির প্রকাশরূপে হংসেশ্বরী মন্দির গঠিত। দেহরূপ মন্দিরে যেমন ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না, বজ্রাক্ষ ও চিত্রিনী নামে পাঁচটি নাড়ী আছে, বাঁশবেড়িয়ার হংসেশ্বরী মন্দিরেও ঠিক সেই ধাঁচে সব সিঁড়ি আছে এবং মন্দিরের মধ্যে কুণ্ডলিনী শক্তিরূপে দেবী হংসেশ্বরী বিরাজমান। তান্ত্রিক যোগসাধনার প্রত্যক্ষ স্থাপত্যরূপ হল হংসেশ্বরী মন্দির। জানি না, সারা বাংলাদেশে এই মন্দিরের বিশিষ্ট গঠন ও সাধন-তাৎপর্যের অনুরূপ আর দ্বিতীয় কোন মন্দির আছে কি না। বোধ হয় নেই।

হংসেশ্বরী মন্দিরের দ্বিতীয় তলা গাঁথা হলে ১৮০২ খৃস্টাব্দে নৃসিংহদেবের মৃত্যু হয়। তাঁর পত্নী রানী শঙ্করী (যাঁর নামে কলকাতায় ভবানীপুরে রানী শঙ্করী লেন প্রতিষ্ঠিত) বার বছর ধরে মন্দির নির্মাণের কাজ শেষ করেন। ১৮১৪ সালে হংসেশ্বরী মন্দির নির্মাণ শেষ হয় এবং তাতে মোট প্রায় পাঁচ লক্ষ

টাকা ব্যয় হয়। মন্দিরের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে বিখ্যাত পণ্ডিত ও অধ্যাপকদের নিমন্ত্রণ করে আনা হয় এবং তাঁদের প্রচুর অর্থও দান করা হয়। মন্দিরের গায়ে এই শ্লোকটি খোদাই করা আছে—

শাকাব্দে রস-বহ্নি-মৈত্রগণিতে শ্রীমন্দিরং মন্দিরং
মোক্ষদ্বার-চতুর্দশেশ্বর-সমং হংসেশ্বরী-রাজিতং
ভূপালেন নৃসিংহদেবকৃতিনারব্ধং তদাজ্ঞানুগা
তৎপত্নী গুরুপাদপদ্মনিরতা শ্রীশঙ্করী নির্মমে॥

শকাব্দা ১৭৩৬।

বাঁশবেড়িয়ার হংসেশ্বরী দেবী ও মন্দির সম্বন্ধে আরও একটু বক্তব্য আছে। হংসেশ্বরী মন্দিরে নিচ থেকে উপরতলা পর্যন্ত একাধিক শিব প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরের গর্ভগৃহে কুণ্ডলিনী শক্তিরূপী হংসেশ্বরী। 'হংস' কি? "অহমিতি বীজম্। স ইতি শক্তিঃ। সোঽহমিতি কীলকম্" (হংসোপনিষৎ)। 'হং' বীজস্বরূপ, 'সঃ' শক্তিস্বরূপ এবং 'সোহং' কীলক বা উপায়। এই মন্ত্র দ্বারাই হৃদয়ের অষ্টদল পদ্মের মধ্যে হংসাত্মাকে দেখা যায়। বাঁশবেড়িয়ার হংসেশ্বরী ঠিক এই ভাবেরই প্রতিমূর্তি। নাথধর্ম ও তন্ত্রের প্রভাব এর মধ্যে সুস্পষ্ট। হুগলী জেলার এই অঞ্চলে মহানাদ, ত্রিবেণী ও বাঁশবেড়িয়ার হংসেশ্বরী নামগুলির সাংস্কৃতিক তাৎপর্যের মধ্যে ঐক্য আছে। 'মহানাদ' নাদতত্ত্ব ও নাদসাধনার ইঙ্গিত করছে। 'হংসেশ্বরী'ও কুণ্ডলিনী শক্তির রূপ। হংসেশ্বরী মন্দির তারই সাধনপ্রণালীর স্থাপত্যরূপ। আর 'ত্রিবেণী' তো যোগসাধনার প্রধান সহায় তিনটি নাড়ী—ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না—

ইড়া বামস্থানে পিঙ্গলা দক্ষিণে
মধ্যে নাড়ী সুষুম্না॥
বামে ভাগীরথী মধ্যে সরস্বতী
দক্ষিণে যমুনা বয়।
মূলাধারে গিয়ে একত্র হইয়ে
ত্রিবেণী তাহারে কয়॥

(সাধকরঞ্জন)

তান্ত্রিক ও নাথযোগীদের একটা উল্লেখযোগ্য প্রভাবকেন্দ্র মহানাদ-ত্রিবেণী-বাঁশবেড়িয়া অঞ্চলে একসময় গড়ে উঠেছিল মনে হয়।

রাজা রামেশ্বরের আমল থেকে, প্রায় দু-শ আড়াই-শ বছর ধরে, এই বংশের অকৃপণ পোষকতায় বাঁশবেড়িয়ায় একটি বিখ্যাত বিদ্যাসমাজ গড়ে ওঠে। কোন্নগর ও বালী অঞ্চলেও এরকম বিখ্যাত বিদ্যাসমাজ গড়ে উঠেছিল। কাশী থেকে পণ্ডিত রামশরণ তর্কবাগীশকে নিয়ে এসে রামেশ্বর আপন সভাপণ্ডিত পদে নিযুক্ত করেন। বাঁশবেড়িয়ার প্রায় ৪০-৪৫টি টোল-চতুষ্পাঠী স্থাপন করে, কাশী, মিথিলা প্রভৃতি স্থান থেকেও বিখ্যাত পণ্ডিত ও অধ্যাপকদের এনে তিনি ছাত্রদের বিভিন্ন শাস্ত্র অধ্যয়নের ব্যবস্থা করেন। নবদ্বীপের বাইরে গঙ্গার উভয় তীরবর্তী কুমারহট্ট (হালিশহর) ও বংশবাটীর পাণ্ডিত্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতা এককালে বেশ স্মরণীয় ঘটনা ছিল। বাঁশবেড়িয়ায় যেসব বিদ্বদ্-গোষ্ঠী এসে এই প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন, তাঁদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় হলেন তিনটি নৈয়ায়িক ভট্টাচার্যবংশ। রাজবল্লভের সভায় তিনজন পণ্ডিত—রামভদ্র সিদ্ধান্ত, রামচন্দ্র বাচস্পতি ও আত্মারাম ন্যায়ালঙ্কার—নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। তিনজনেই 'বাঁশবাড়িয়া নিবাসিনঃ।' রামভদ্রই তখন বাঁশবেড়ের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন। আনুমানিক ১১৯৫ সনের বাঁশবেড়িয়ার ব্রাহ্মণবিদায়ের একটি কৌতুকজনক ফর্দ শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য উদ্ধার করেছেন।[১] তাতে মোট ১৪৪ জনের মধ্যে ২৬ জন ভট্টাচার্য বা চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক এবং ২৪ জন উপাধিধারী ছিলেন। বিদায়ের পরিমাণ ২৲ টাকা থেকে ৵০ (দুই আনা)। একশ বছর আগেও বাঁশবেড়িয়ায় বহু চতুষ্পাঠী ছিল। ১৩১৬ সনে শ্রীনাথ তর্কালঙ্কারের মৃত্যুর পর বাঁশবেড়িয়ার এই বিদ্যাসমাজ একরকম লোপ পেয়ে যায়। এই বিদ্যাসমাজের উদ্দেশেই দীনবন্ধু মিত্র তাঁর 'সুরধুনী কাব্যে' লিখেছিলেন:

পরিপাটী বংশবাটী স্থান মনোহর
যেদিকে তাকাই দেখি সকলি সুন্দর।
বিদ্যাবিশারদ কত পণ্ডিতের বাস
সুগৌরবে শাস্ত্রালাপ করে বার মাস।
এই স্থলে জন্মেছিল শ্রীধর রতন
কথককুলের কেতু কাঞ্চনবরণ।
স্বভাবে রচিল কত গীত মধুময়
শুনিলে আনন্দে নাচে লোকের হৃদয়।

---

১ শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য 'বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান', প্রথম ভাগ, পৃ ৩০০-৩০১।

বাঁশবেড়িয়ার শ্রীধর বাংলাদেশের একজন বিখ্যাত কথক ছিলেন। সেই কথক-শিরোমণি শ্রীধরের কথকতা ও সঙ্গীতের কথাই দীনবন্ধু উল্লেখ করেছেন।

কেবল সংস্কৃত বিদ্যায় নয়, আধুনিক শিক্ষার দিক থেকেও বাঁশবেড়িয়া পশ্চাদ্‌পদ ছিল না। ১৮৭০ সালে কলকাতার শিমলা পল্লীতে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের গৃহ ভাড়া নিয়ে 'তত্ত্ববোধিনী সভা' ও 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা' প্রতিষ্ঠিত হয়। পাঠশালায় ইংরেজী শিক্ষা দেওয়ার সিদ্ধান্ত হলে সভার কর্তৃপক্ষ কলকাতায় যথেষ্ট ইংরেজী বিদ্যালয় আছে মনে করে ১৮৪৩ সালের ৩০শে এপ্রিল বাঁশবেড়িয়া গ্রামে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত করেন। পাঠশালার প্রতিষ্ঠাদিবসে বাঁশবেড়িয়ায় সভাপতিত্ব করেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। অক্ষয়কুমার দত্ত ও আরও অনেকে সভায় উপস্থিত ছিলেন।[১] কয়েক-বছর স্কুল চলার পর অর্থাভাবে স্কুল বন্ধ হয়ে যায়। তখন পাদ্রী আলেকজাণ্ডার ডাফ্ 'ফ্রি চার্চ মিশনের' পক্ষে ঐ একই স্থানে একটি মিশনারী স্কুল স্থাপন করেন।[২] তাঁরা লেখেন:

> The Chundrika informs us that the School of the Tattwabodhini Sabha...having been closed at Bansberiya, the Free Church Mission is about immediately to open a seminary there for instruction in English and Bengalee.

এর মাসখানেক পরে ৪ঠা মে তারিখে উক্ত পত্রিকায় জনৈক পত্রলেখক জানান যে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার স্থানে মিশনারী স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। স্কুলটি প্রায় পঁচিশ বছর চলে। পরে ছাত্রদের খৃস্টধর্ম গ্রহণের তাড়নায় স্কুলটি উঠে যায় এবং স্কুলবাড়ি বিক্রি হয়ে যায়। খৃস্টধর্মের প্রসারের কারণ হল, এই বাঁশবেড়িয়া গ্রামে সর্বপ্রথম বাঙালী পাদ্রীর অধীনে একটি খৃস্টান গির্জা স্থাপিত হয়। পাদ্রীর নাম তারাচাঁদ। শোনা যায়, ইংরেজী ফরাসী পর্তুগীজ ভাষায় নাকি পাদ্রী তারাচাঁদ অনর্গল কথা বলতে পারতেন।

এইভাবে বিদ্যা শিক্ষা ও ধর্মের ক্ষেত্রে, প্রাচীন ও নবীন যুগের এক বিচিত্র সংঘাত ও সমন্বয় হয়েছিল বাঁশবেড়িয়ায়।

১ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ভাদ্র ১৭৬৫ শক।

২ ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া, ৬ এপ্রিল ১৮৪৮।

বাহিরগড়

হাওড়া ময়দান থেকে চাঁপাডাঙার লাইট রেলপথে 'বাহিরগড়া' নামে একটি ছোট্ট স্টেশন আছে। 'গড়' কথাটি লোকের মুখে মুখে গড়িয়ে 'গড়া' হয়েছে। হুগলী জেলার অন্যতম প্রধান শৈবতীর্থ তারকেশ্বরের প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তির ইতিহাসের সঙ্গে বাহিরগড়ের এক রাজপুত ক্ষত্রিয়বংশের ইতিহাস অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে বলে তার কাহিনীটুকু উল্লেখযোগ্য। এই ক্ষত্রিয়বংশ পশ্চিমবঙ্গের 'সিংহরায়রা'। অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এঁরা বাংলাদেশে আসেন এবং ধীরে ধীরে নবাবী আমলের শেষে হুগলী জেলায় জমিদারী দখল করে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। রামনগর ও বাহিরগড়ই এঁদের আদি বসবাসকেন্দ্র। পরে বংশবিস্তার ও জমিদারীর বিস্তারের ফলে নানাস্থানে বিভিন্ন শাখায় এঁরা ছড়িয়ে পড়েন।

তারকেশ্বরের প্রাক্তন মোহান্ত শ্রীসতীশচন্দ্র গিরি মহারাজের 'অনুমত্যা' সভাপণ্ডিত 'শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থেন' বিরচিত একখানি বই আছে 'তারকেশ্বর-মাহাত্ম্য' নামে। এই বইয়ে সিংহরায়দের পূর্বপুরুষ কেশব হাজারী, বিষ্ণুদাস ও ভারামল্লের বাংলাদেশে আগমন ও প্রতিষ্ঠার ইতিহাস যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে তার সারমর্ম এই :

তারকেশ্বরের মাইল দুই পূর্বদক্ষিণ দিকে কানানদীর ধারে রামনগর গ্রাম। এই গ্রামে রাও ভারামল্ল নামে একজন রাজপুত রাজা রাজত্ব করতেন। তাঁর পিতা কেশব হাজারী বারাণসীর কাছে জৌনপুর জেলার কোন স্থানে বাস করতেন। তাঁর দুই পুত্র ও এক কন্যা। জ্যেষ্ঠপুত্র রাজা বিষ্ণুদাস, কনিষ্ঠ পুত্র রাজা ভারামল্ল। কন্যা ভানুমতী খুব সুন্দরী ছিলেন। অযোধ্যার নবাবের অত্যাচারে কেশব হাজারী বৃদ্ধাবস্থায় আপন পরিজনবর্গ ও হাজার রাজপুত (হাজারী মানে হাজার সেনার অধ্যক্ষ) সঙ্গে নিয়ে জৌনপুর ত্যাগ করে নানা দেশ ঘুরে হুগলী জেলার উক্ত রামনগর গ্রামে এসে উপস্থিত হন। স্থানীয় লোকজন অধিকাংশই নিরীহ ও নিরুপদ্রব ছিল। তাই দেখে বিষ্ণুদাস ও ভারামল্ল তাদের উপরে কর্তৃত্ব বিস্তারের প্রেরণা পান এবং অনেকটা জোরজবরদস্তি করে ভূমির রাজকর পর্যন্ত আদায় করতে আরম্ভ করেন।

কাছেই বালিগড়ি ও মহেনাবাগ পরগণার পরগণাদারেরা থাকতেন। মুর্শীদকুলি খাঁর আমলের ঘটনা। পরগণাদারেরা আগন্তুকদের উপদ্রবের কথা নবাবকে জানালেন। নবাব তাঁদের গ্রেফ্‌তার করে মুর্শিদাবাদ দরবারে নিয়ে আসতে হুকুম দিলেন। মুর্শিদাবাদে তাঁরা পৌঁছবার পর প্রথমে তাঁদের হাজতে বন্দী করা হল। পরে বিষ্ণুদাসের অলৌকিক শক্তি ও বিষ্ণুভক্তির নানারকম প্রমাণ পেয়ে নবাব সন্তুষ্ট হয়ে তাদের মুক্তি দেন। খুশী হয়ে নবাব বিষ্ণুদাসকে বালিগড়ি ও মহেনাবাগ পরগণার রাজস্ব-সংগ্রহের ভার অর্পণ করেন। বিষ্ণুদাস 'রাজা' উপাধি পান এবং ভারামল্ল 'রাও রাঁইয়া'। সেই থেকে বিষ্ণুদাস 'রাজা বিষ্ণুদাস' এবং ভারামল্ল 'রাও ভারামল্ল' নামে পরিচিত। ভারামল্ল রামনগরে এবং বিষ্ণুদাস বাহিরগড়ায় গড়বাড়ি তৈরি করে বসবাস করতে থাকেন।

এই কাহিনীর কতটা ঐতিহাসিক সত্য বলা কঠিন। তবে সবটাই যে ভিত্তিহীন কল্পনা নয়, তাতে কোন সন্দেহ নেই। বিষ্ণুদাসের অলৌকিক শক্তি দেখে মুর্শিদাবাদের নবাব মোহিত হয়েছিলেন কিনা, সেকথা আমাদের বিচার্য নয়। ইতিহাসে অলৌকিক ঘটনার স্থান নেই। তবে সিংহরায়দের সঙ্গে তারকেশ্বরের মোহান্ত সতীশ গিরির যে বিখ্যাত মামলা হয়েছিল, তাতে তারকেশ্বর ও সিংহরায়বংশ উভয়েরই ইতিহাস প্রসঙ্গে অনেক সাক্ষ্য-প্রমাণাদি গ্রহণ করা হয়েছিল। আদালতের রেকর্ড (হুগলী জেলা কোর্ট ও কলিকাতা হাইকোর্ট) থেকে সিংহরায় বংশের যে ইতিহাস পাওয়া যায় তার সঙ্গে উপর্যুক্ত কাহিনীর কিছুটা মিল আছে। চুঁচুড়াবাসী ধরণীধর সিংহরায় তাঁর জবানবন্দীতে বলেন: [১]

We are Chhatris. We originally came to Bengal from the West. Our ancestor who came to Bengal first, was Keshab Hazari. He had two sons—Rao Bhara Mulla and Raja Bisnu Das.... We are the direct descendants of Raja Bishnu Das. I am tenth in succession from him.

ধরণীধর যদি বিষ্ণুদাসের অধস্তন দশম পুরুষ হন, তাহলে বিষ্ণুদাসের সময় ১৯২৬ সালের ২৫০ বছর পূর্বে ১৬৭৬ সাল আন্দাজ হয়। ধরণীধর যে বংশ-

১ Hooghly District Court Record Nos. 134-160, 30th July 1926.

তালিকা আদালতে দাখিল করেন তার সত্যতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে তিনি উত্তর দেন :

From about 7-8 years of age my father made me learn our genealogy by rote. I did so till I was 12-14 years old. My brothers also learnt the genealogy, but I can't say if they did so in the same way. My father did not read from any book, but spoke from memory...I did not ask my father to write down the genealogy. I never wrote it myself...The litho copy filed was received by me from my uncle in the condition it is now. (Ibid).

একটি উল্লেখযোগ্য প্রথার পরিচয় পাওয়া যায় এই বিবৃতির মধ্যে। রাজপুত ক্ষত্রিয়বংশে বংশলতা আবৃত্তির প্রথা বহু প্রাচীনকাল থেকে বংশানুক্রমে প্রচলিত প্রথা। সাধারণত ভাটেরা এই কুরসীনামা আবৃত্তি করতেন। বাংলাদেশে আগন্তুক রাজপুতবংশের সঙ্গে ভাটেরাও আসেন, সিংহরায়দের পূর্বপুরুষদের সঙ্গেও এসেছিলেন। 'ভাট' উপাধিধারী এখনও যাঁদের বাংলা-দেশে দেখা যায়, তাঁরা বিভিন্ন রাজপুতবংশের সঙ্গেই হয়ত এসেছিলেন। তারকেশ্বরের দশনামী শৈবসম্প্রদায়ের মোহান্তদেরও বৃত্তিভোগী ভাট ছিল।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে ও অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে উত্তরভারত থেকে বিভিন্ন গোত্রের (clan) রাজপুতবংশ বাংলাদেশে আসেন। রাজনৈতিক ও সামাজিক নানাকারণে তাঁরা দেশত্যাগী হতে বাধ্য হন। মুসলমান নবাবদের বিরোধিতা তার মধ্যে একটি কারণ হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক কারণ মনে হয়—বাংলাদেশের তদনীন্তন আভ্যন্তরিক বিশৃঙ্খলা। বিদেশী ইংরেজ ডাচ পর্তুগীজ ফরাসীদের ক্রমবর্ধমান প্রতিপত্তি এবং নবাবী শাসনের শাসনশৃঙ্খলার ক্রমিক ভাঙনের ফলে দেশের মধ্যে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়, তাতে বাংলাদেশটা 'মগের মল্লুক' হয়ে ওঠে। সেই সময় মারাঠা, রাজপুত, এমন কি শৈব সন্ন্যাসীদের বিভিন্ন যুদ্ধবাজ সম্প্রদায় পর্যন্ত বাংলাদেশে অভিযান করেন। উল্লেখযোগ্য হল, দশনামী শৈব সন্ন্যাসীরাও সেই সময় আসেন এবং তারকেশ্বর মঠ ও তার অধীন অন্যান্য মঠের প্রতিষ্ঠাতারা তাঁদের মধ্যে অন্যতম। বর্গীদের অভিযান, সন্ন্যাসীদের অভিযান

('বিদ্রোহ' বলে কথিত), বিভিন্ন রাজপুতবংশের ও দশনামী শৈব সন্ন্যাসীদের আগমন—সবই ইতিহাসের এমন একটি পর্বে ঘটে, যাকে বাংলাদেশের চরম আভ্যন্তরিক বিশৃঙ্খলার পর্ব বলা যায়। মগের মুল্লুকের লোভনীয় আকর্ষণই হল এই সব অভিযান ও আগমনের প্রধান প্রেরণা।

সিংহরায়দের পূর্বপুরুষদের সঙ্গে পাণ্ডে, দুবে, ত্রিবেদী, চোবে বা চতুর্বেদী প্রভৃতি কান্যকুব্জের ব্রাহ্মণও আসেন পুরোহিত হয়ে। পরে বাঙালী ব্রাহ্মণদেরও পুরোহিতের কাজে নিযুক্ত করা হয়, কিন্তু তাঁরা উপ-পুরোহিত হয়ে থাকেন। অমরপুরের (বাহিরগড়ের দুই মাইল দূরে) আনন্দ সিংহরায় তাঁর জবানবন্দীতে এ সম্বন্ধে বলেন :[১]

> We have 8 families of priests in this district. Our priests are Pande, Dobe, Tewari, Pathak, etc. Bengali Brahmins do our daily and minor religious services. They are our Upa-purothits.

কনৌজ ব্রাহ্মণ-পুরোহিতদের সঙ্গে ভাটেরাও আসেন। ক্ষত্রিয়দের বীর্যশৌর্যগাথা ও কুরসীনামা আবৃত্তি করাই ভাটদের বংশগত পেশা। তাঁরা বৃত্তি ও নিষ্কর জমি ভোগ করতেন। সাধারণত ভাটরা দরিদ্র-শ্রেণীর। সিংহরায়দের জমিদারীর পতনের কালে পরে তাঁরা মুসলমানধর্মে দীক্ষা নিতে বাধ্য হন। একথা মাখলপুরের জমিদার মনোমোহন সিংহরায় তাঁর জবানবন্দীতে বলেন :[২]

> My ancestor came with Keshab Hazari....10-12 clans of the same caste came with Keshab Hazari. Gobordhan Singha, my ancestor, married Keshab Hazari's daughter. Our priests, Kanauj Brahmins, came with Keshab Hazari. Bhats also came with us ; they subsequently embraced Mahommedanism.

বিভিন্ন গোত্রের রাজপুত ক্ষত্রিয়বংশ যে প্রায় একই সময় বাংলাদেশে আসেন, তা এই জবানবন্দী থেকে বোঝা যায়। পরে বর্ধমান, হুগলী, হাওড়া

১ Hooghly Dt. Court Record Nos. 174-184, 4th August 1926.

২ Court Record Nos. 185-190, of 5th August 1926.

প্রভৃতি জেলার নানাস্থানে এই সিংহরায়রা প্রধানত জমিদারীসূত্রে বসবাস করতে আরম্ভ করেন। এঁদের মধ্যে বাহিরগড়ের বিষ্ণুদাসবংশের সিংহরায়েরা সামাজিক কাজকর্মে ও পঞ্চায়েতে বিশেষ মর্যাদা পান। সিংহরায়দের মধ্যে পঞ্চায়েতপ্রথা প্রচলিত আছে, তাতে বাহিরগড়ের সিংহরায়রাই সাধারণত সভাপতিত্ব করেন। সামাজিক অনুষ্ঠানে ও ভোজসভায় তাঁরাই কাঠের পিঁড়ায় উপবেশন করেন এবং ধাতুর পাত্রে আহার করেন। বাকি অন্যান্য শাখার বংশধররা কুশাসনে উপবেশন করে পাতায় ভোজন করেন। এই হল এঁদের সামাজিক প্রথা। হরিপাল পরগণার নয়নগরবাসী আশুতোষ সিংহের জবানবন্দীতে এই সামাজিক প্রথার উল্লেখ আছে :[১]

> The Bahirgory SinghRoys are the Chiefs of our caste.... They get separate seats in Panchayets with the priest to the right of the assembly. In Panchayet they proclaim the voice thereof. In ceremonial feasts they must sit in wooden seats and eat out of brass utensils, while others sit on straw or grass and eat out of leaves.

বাহিরগড়ের শ্রীরাধারমণ সিংহরায়ের কাছ থেকে ১২৭৯ সনের একটি পঞ্চায়েতের বিবরণপত্র (লিথো-কপি) আমি সংগ্রহ করেছি। এই পত্রের মধ্যে বিভিন্ন শাখার সিংহরায়দের প্রতিনিধিদের স্বাক্ষর আছে। বাহিরগড়ি বিষ্ণুদাসমেলের একটি কুরসীনামার লিথো-কপিও পাওয়া গেছে (১৩২০ সনের লিথোকপি)। কুরসীনামার উপরে লেখা আছে—

> "শ্রীশ্রীতারকেশ্বর মঠ প্রতিষ্ঠাতা ও আদিমোহান্ত রাও ভারামল্লের সহোদর আমাদের 'বাহিগড়ি রাজপুত পঞ্চায়েৎ' প্রতিষ্ঠাতা রাজা বিষণ সিংহ বা বিষ্ণুদাসের বংশকারিকা। সম্রাট আরঙ্গজেবের উৎপাত অত্যাচারকালে উক্ত মহাপুরুষদ্বয়ের (বিষ্ণুদাস ও ভারামল্ল) পিতা হাজারি কেশব সিংহ প্রমুখ স্বজাতি সৈন্য সামন্তগণ গুরু পুরোহিত ভট্ট (বা ভাট) সমেৎ বঙ্গবাসী হইয়াছিলেন।"

বংশলতা যে এঁদের কিরকম প্রিয় এবং কত গৌরবের বস্তু, তা বংশ-

১ Court Record Nos. 185-190, 5th August, 1926.

কারিকার শেষের কয়েক ছত্র উক্তি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়। বঙ্গাক্ষরে হিন্দীভাষায় বংশকারিকার শেষে লেখা আছে :

"অপনী জাতি ঔর অপনে বংশকে বিষয়, দেশ কা ইতিহাস হী উন্নতি কা মূল হৈ। হম্ কোন্ হৈ? হমারা বংশ কৈসা হৈ? হমারা বাড়ানে সংসার মেঁ কি সী কীর্তি ফৈলায়ী? ইন্ বাতোঁকে ন জাননোহ অপনে বংশগৌরব কী ঔর মর্যাদা কী প্রভুতাকা অঙ্কুর হৃদয়মে নহী উৎপন্ন হোতা হৈ। জিস্ মনুষ্য কো আত্মগৌরব ঔর আপনে কুলকী মর্যাদাকা জ্ঞান নহী হৈ বহ মনুষ্যহী নহী হৈ।" (অস্পষ্ট অক্ষর পড়ার দোষে উদ্ধৃতিতে সামান্য ত্রুটি থাকা সম্ভব)।

প্রায় বারো বিঘা জমিতে বাহিরগড়ের সিংহরায়দের গড়বেষ্টিত বাড়ি ছিল। এখন গড়টি প্রায় মজে গেছে, সামান্য একটু-আধটু খাতের চিহ্ন আছে গভীর জঙ্গলের মধ্যে। পুরানো বাড়ির বিশেষ কোন চিহ্ন নেই, কারণ তার ইট দিয়ে আলাদা সব সরিকদের বাড়ি তৈরি হয়েছে। প্রাচীন গৃহের অবশেষের মধ্যে পূজামণ্ডপের একটু অংশ আছে শুধু। সিংহরায়দের তৈরি দেবালয় যা ছিল তা সব নষ্ট হয়ে গেছে, দু-একটি গড়ের মধ্যে আছে, শিবমন্দির, কারুকাজ করা। এ ছাড়া বাহিরগড়ে বর্তমানে আর বিশেষ কিছুই দর্শনীয় নেই।

বাহিরগড় নামটি গ্রামের নাম নয়। গ্রাম বা মৌজার নাম কৃষ্ণনগর। পশ্চিমবাংলার তিনটি কৃষ্ণনগরের মধ্যে এটির নাম জাঙ্গীপাড়া-কৃষ্ণনগর। বাকি দুটি খানাকুল-কৃষ্ণনগর (হুগলী-আরামবাগ মহকুমা) ও গোয়াড়ী-কৃষ্ণনগর (নদীয়া)। সিংহরায়দের গড়বাড়ির বাইরের অবশিষ্ট গ্রামকে বাহিরগড় বলা হত। তাই থেকে গ্রামের নাম 'বাহিরগড়' হয়েছে। গড়ের বাইরে কয়েকটি প্রাচীন শিবমন্দির পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। তার মধ্যে 'দামোদর' নামে কথিত শিবমন্দিরটি অতি সুন্দর কারুকার্যখচিত। মন্দিরের গায়ে খোদাই করা আছে—"শুভমস্তু শকাব্দা ১৬৬৫"। এ ছাড়া বাহিরগড়ে 'আনন্দময়ী' দেবী আছেন, কৃষ্ণবর্ণ পাথরের কালীমূর্তি। শেওড়া-ফুলির 'নিস্তারিণীদেবীর' সমসাময়িককালে প্রতিষ্ঠিত। কালীমূর্তির সামনে চারটি ঘট আছে—পঞ্চানন্দ, কালী, শীতলা ও মনসার।

শৈব ও শাক্তধর্মের একটি কেন্দ্র ছিল বাহিরগড় বা জাঙ্গীপাড়া-কৃষ্ণনগর। শৈব ও শাক্ত যাত্রাগানেরও হয়ত প্রচলন ছিল তখন। কিন্তু এই বাহিরগড়েই

বাংলাদেশের কৃষ্ণযাত্রার অন্যতম প্রবর্তক ও সংস্কারক গোবিন্দ অধিকারীর জন্মস্থান। কৃষ্ণযাত্রা প্রসঙ্গে শিশুরাম অধিকারীর নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয়। তিনি রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের সমসাময়িক। শিশুরামের উত্তরাধিকার শ্রীদাম-সুবল বহন করে চলেন। তারপর পরমানন্দ দাস কৃষ্ণযাত্রায় তুক্কো-রীতির প্রবর্তন করেন (পয়ারে রচিত গান কীর্তনের ভঙ্গিতে শেষ করা)। পরমানন্দের পর কৃষ্ণযাত্রার ধারা বহন করে এগিয়ে যান গোবিন্দ অধিকারী (১৭৯৮—১৮৭০ সাল)। শুধু যাত্রার অধিকারী হিসাবে নয়, পালাগান রচনায় গোবিন্দের জুড়ি ছিল না তখন। তাঁর জনপ্রিয়তাও যে কি রকম ছিল তা তাঁর যাত্রাগানের দ্বারা অর্জিত ধনসম্পত্তির বহর দেখেই বোঝা যায়। বিশাল রাজপ্রাসাদের মতন তাঁর বাড়ি ছিল বাহিরগড়ে, আজও তার ভিত্‌ ও চৌহদ্দির চিহ্ন পাওয়া যায় বনের মধ্যে। তাঁর নিজের হাতি ছিল। বিরাট একটি বৈষ্ণব-বৈরাগীদের উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন গোবিন্দ অধিকারী, তাঁর বাড়ির পাশে। তাঁর কৃষ্ণযাত্রার দলের অভিনেতা সব। সেই উপনিবেশটি লুপ্ত হয়ে গেলেও, আজও বৈরাগীদের তুলসীমঞ্চ ও তুলসীগাছ পাশের বনের মধ্যে যথেষ্ট দেখা যায়। গোবিন্দ অধিকারীর পূজামণ্ডপটিতে এখন স্থানীয় অধিবাসীরা নাট্যমঞ্চ নির্মাণ করে একটি সুন্দর গ্রাম্য অভিনয়-সঙ্ঘ গড়ে তুলেছেন!

তারকেশ্বর

বাংলাদেশে, বিশেষ করে রাঢ়ে, দশনামী শৈব সম্প্রদায়ের প্রধান মঠ হল তারকেশ্বর। মঠ ও মন্দির। মঠ-প্রতিষ্ঠা বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য নয়। বাংলার শৈব সংস্কৃতিরও নয়। এ-বৈশিষ্ট্য উত্তরভারতীয় শৈবসম্প্রদায়ের, এবং প্রধানত দশনামী শৈবদের। মঠের প্রধান পরিচালক হলেন মোহান্ত। বাংলাদেশের ধর্মাচরণক্ষেত্রে এই মোহান্ত-কালচার বাইরে থেকে অবাঙালীরা আমদানি করেছেন। শুধু বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে নয়, সামাজিক ও নৈতিক জীবনেও এই মোহান্ত-কালচার অনেক উত্তাল তরঙ্গের সৃষ্টি করেছে। 'মোহ' যাঁদের 'অন্ত' হয়েছে, যদিও সেই সব সন্ন্যাসীই কেবল 'মোহান্ত'-পদবাচ্য, তাহলেও মঠ ও মোহান্তের ইতিহাস আমাদের দেশে এতরকমের মোহের অন্ধকারে আচ্ছন্ন, এবং ভারতের বিভিন্ন আদালতের অসংখ্য মামলার স্তূপীকৃত রেকর্ডে তার এমন সব প্রমাণ রয়েছে যা দেখলে স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয়। বাংলার মাটি ও বাঙালী জাতির গুণে মঠ ও মোহান্তের অন্তরালে তারকেশ্বর যে কেমন করে অবাধে বাংলার অন্যতম শৈবতীর্থে পরিণত হয়েছে, বাংলার লোকায়ত সংস্কৃতির ইতিহাসে সেটা একটা বিস্ময়কর ঘটনা।

তারকেশ্বর দশনামী শৈবসম্প্রদায়ের প্রধান মঠ। শৈবদের মধ্যে 'দশনামীরা' কারা? শঙ্করাচার্য (অষ্টম-নবম খৃস্টাব্দে) ভারতের নানাস্থানে ভ্রমণ করে, নানা মত খণ্ডন করে (প্রধানত বৌদ্ধ ও জৈন), বেদান্তশাস্ত্র ও তত্ত্বজ্ঞানের প্রচারের উদ্দেশ্যে চারস্থানে চারটি মঠ স্থাপন করেন। শৃঙ্গগিরিতে শৃঙ্গগিরি মঠ, দ্বারকায় সারদা মঠ, শ্রীক্ষেত্রে গোবর্ধন মঠ এবং বদরিকাশ্রমে জ্যোসী মঠ। শঙ্করাচার্যের শিষ্যরা তাঁর আদেশে নানা দেশ ভ্রমণ করে, স্থানীয় পণ্ডিতদের সঙ্গে বিচার করে, শিব বিষ্ণু প্রভৃতি আকার-দেবতার উপাসনা প্রচার করেন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে চারজন প্রধান—পদ্মপাদ, হস্তামলক, মণ্ডন ও তোটক। পদ্মপাদের দুই শিষ্য, তীর্থ ও আশ্রম; হস্তামলকের দুই শিষ্য, বন ও অরণ্য; মণ্ডনের তিন শিষ্য, গিরি, পর্বত ও সাগর; তোটকের তিন শিষ্য, সরস্বতী, ভারতী, ও পুরী। এই চারজন

মঠাচার্যের দশজন শিষ্য থেকে পরবর্তীকালে প্রচলিত দশনামী সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়েছে।[১] এই দশনামী সন্ন্যাসীদের দশটি নামের স্বতন্ত্র তাৎপর্য আছে। এখানে তার বিস্তারিত আলোচনা করার প্রয়োজন নেই। দশনামীরা শঙ্করাচার্যের কালে সম্প্রদায়বিভক্ত হননি। শঙ্করের উদার ভাব তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যরা ক্রমেই অনুদার সাম্প্রদায়িকতায় পরিণত করেন এবং মঠ ও মোহান্ত দেশময় গজিয়ে ওঠে। 'জ্ঞানপ্রদীপ' গ্রন্থের লেখক বলেছেন:[২]

> "শঙ্করাচার্যদেবের সে উদার সার্বভৌমভাব পরবর্তী সময়ে ক্রমে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। সন্ন্যাসীদিগের যতি, অবধূত, হংস ও পরমহংসাদি রূপজ্ঞান ও অবস্থার বিভেদ মাত্রই তখন ছিল, সাম্প্রদায়িক অভিমানমূলক মঠ ও নামের প্রাধান্যযুক্ত এই সঙ্কীর্ণভাব পূজ্যপাদ আচার্যদেব শঙ্করের সময়ে আদৌ পরিপুষ্ট হয় নাই…। কেবল জ্ঞান ও শিক্ষার অভাবেই সমাজ ও বর্ণের ন্যায় ক্রমে সন্ন্যাসাশ্রমও কলুষিত ও ঘৃণ্য হইয়া পড়িয়াছে।"

তারকেশ্বরে এই দশনামী শৈবরা মঠ প্রতিষ্ঠা করেন এবং তারকেশ্বরের মোহান্তরা দশনামী শৈব সন্ন্যাসী। তারকেশ্বরের প্রাক্তন মোহান্ত সতীশ গিরির মামলায় যে সব বিখ্যাত পণ্ডিতদের শাস্ত্রব্যাখ্যার জন্য আমন্ত্রণ করা হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে পণ্ডিত পরমানন্দ তীর্থস্বামী, মহামহোপাধ্যায় লক্ষ্মণ-শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, পণ্ডিত অনন্ত শাস্ত্রী, বিল্বপুষ্করিণীর পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য, কাশীর পণ্ডিত নারায়ণ শাস্ত্রী, ভাটপাড়ার শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ, শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্টাচার্য প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। সাক্ষ্যদানকালে আদালতে এঁরা শৈব ও তান্ত্রিক ধর্ম, মঠ ও মোহান্ত, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদের নীতি ও আচার ইত্যাদি সম্বন্ধে যে বিস্তৃত শাস্ত্রীয় বিবরণ দেন, তা অত্যন্ত মূল্যবান। এইসব বিখ্যাত পণ্ডিতদের শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যাদি বিচার-বিশ্লেষণ করে বিচারক এই মর্মে রায় দেন:[৩]

> Their learned discourses on the Hindu Shastras establish beyond doubt...that the Dashnami Sannyasis

১ অক্ষয়কুমার দত্ত: ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, ২য় ভাগ: শৈবসম্প্রদায়: পৃ ২০-৪০।

২ স্বামী সচ্চিদানন্দ সরস্বতী: জ্ঞানপ্রদীপ, ২য় ভাগ: পৃ ১০২।

৩ Judgement of Mr. K. C. Nag, Dist. Judge of Hooghly, in the Title Suit No. 28 of 1922, dated the 6th Nov. 1929.

are Vedic Sannyasis...and that the Mathadhari Sannyasis belonging to the school of Shankaracharjya are Vedic and not Tantric Sannyasis, that the Tarakeswar Math is governed by the Shankaracharjya School of thought, that the Mohunt of the Tarakeswar Muth...is a Mathadhari Dashnami Sannyasi.

এই দশনামী শৈবমঠ বাংলাদেশের নিজস্ব ধর্ম-প্রতিষ্ঠান নয়, অবাঙালীদের আরোপিত প্রতিষ্ঠান। তাহলে তারকেশ্বর এত বড় তীর্থস্থান হল কি করে? সম্পূর্ণ অন্য কারণে, তার সঙ্গে মঠ ও মোহান্তের ইতিহাসের অন্তত কোন সাংস্কৃতিক সম্পর্ক নেই। রাঢ়ে শৈবধর্মের প্রাধান্য বরাবরই ছিল। ধর্মপূজা ও শিবপূজা লোকায়ত শৈবধর্মে মিলিত হয়েছে। ধর্মের গাজন ও শিবের গাজন হয়েছে রাঢ়ের অন্যতম লৌকিক ধর্মানুষ্ঠান। অনাদিলিঙ্গ শিবের আবির্ভাবের সঙ্গে রাঢ়ের গোপদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের পরিচয়ও পাওয়া যায় শিবের কিংবদন্তীর বিচিত্র বিস্তার থেকে। তারকেশ্বরের শিবের আবির্ভাবও গোপজাতির সঙ্গে জড়িত। গোপসংশ্লিষ্ট অন্যান্য আচারেরও বিস্ময়কর প্রাধান্য দেখা যায় তারকেশ্বরের অনুষ্ঠানে। তারকেশ্বরের গাজনও বাংলাদেশের মধ্যে বোধ হয় সবচেয়ে বড় গাজন-উৎসব। সারা পশ্চিমবাংলার গাজন-উৎসবের মহাসঙ্গম হয় দক্ষিণরাঢ়ের তারকেশ্বরে। তারকেশ্বরের মঠ ও মোহান্তদের কাহিনীর সঙ্গে তারকেশ্বর শিবের আবির্ভাবের এই ইতিহাসের এবং শিবের গাজন-উৎসব ও অন্যান্য অনুষ্ঠানাদির কোন সম্পর্কই নেই। তারকেশ্বরের গোপের কাহিনী, গাজনোৎসব ও বিবিধ লৌকিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতিধারার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। এগুলি দশনামী শৈবদের দান নয় এবং তাঁদের মঠ ও মোহান্তদের আচারভুক্তও নয়। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতিরা এ-সম্পর্কে যে মন্তব্য করেন, তা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য: [১]

It is worthy of note that almost all the Dashnami Muths in Bengal were founded by Brahmins who came

১ Judgement of the Calcutta High Court in F. A. No. 1 of 1930, dated the 6th July 1934 and 24th August 1934. See also Mr. Golap Ch Sarkar's Hindu Law, 7th Edition, P. 870.

from the North West Provinces and not by Brahmins domiciled in Bengal, and the persons who are now connected with these Muths either as Mohunts or Chelas are fresh arrivals from the North West.

বাংলার বিদেশাগত এই দশনামী শৈব সন্ন্যাসীদের পরিচয়ের পর এখন অনুসন্ধানের বিষয় হল কোন্ সময় তাঁরা বাংলাদেশে এসেছিলেন? কেন এসেছিলেন? এবং তারকেশ্বরে মঠ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কবে?

দ্বিতীয় প্রশ্নের কোন উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। কেন বা কি কারণে দেশ থেকে দেশান্তরে একটি 'ধর্ম-সম্প্রদায়' যান, এককথায় তার উত্তর হল—ধর্মপ্রচারের মহান উদ্দেশ্য নিয়ে। কিন্তু ইতিহাসে দেখা যায়, প্রচারিত অনেক মহৎ উদ্দেশ্যের অন্তরালে অনেক প্রকারের স্বার্থ লুকিয়ে থাকে এবং সেগুলি সময় ও সুযোগ মতন আত্মপ্রকাশ করে। মঠধারী সন্ন্যাসী বা মোহান্তদের শাস্ত্রীয় বিধান অনুযায়ী কোন ভোগলালসাদি প্রবৃত্তি থাকা উচিত নয়। আগেই বলেছি, যাঁর সবরকমের সাংসারিক ও ঐহিক মোহ অন্ত হয়েছে তিনিই মোহান্ত (মোহ+অন্ত)। কিন্তু বাস্তব জীবনে মোহের 'অন্ত' হওয়া যে কত কঠিন তা অনেক মঠের অনেক মোহান্ত তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনে প্রমাণ করে গেছেন। সুতরাং, দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর পাঠকরা প্রথম ও তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরের পটভূমিকা থেকে অনুমান করবেন।

প্রথম প্রশ্ন হল কোন্ সময় বাংলাদেশের এই দশনামীরা এসে মঠ প্রতিষ্ঠা করেন? বাংলাদেশের বিভিন্ন মঠের ঐতিহাসিক দলিলাদি ও দেবোত্তর সম্পত্তির তায়দাদ থেকে যে প্রমাণ পাওয়া যায়, তাতে অষ্টাদশ শতাব্দীর আগে দশনামী শৈব সন্ন্যাসীরা বাংলাদেশে এসেছেন বলে মনে হয় না। যে-সময় এই দশনামী সন্ন্যাসীরা বাংলাদেশে আসেন, সে-সময় বাংলাদেশে একটা আভ্যন্তরিক রাষ্ট্রদুর্যোগ চলছিল। 'বাহিরগড়' প্রসঙ্গে একথার উল্লেখ করেছি। ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধে বাংলার আকাশে নবাবী আমলের সূর্য অস্ত গেল। রাষ্ট্রবিপ্লবের এই সুবর্ণসুযোগে বাংলাদেশ অভারতীয় বিদেশীদের কাছে নয়, আরাকানের মগ দস্যুদের কাছে নয়, অবাঙালী লুণ্ঠনকারীদের কাছেও মগের মুল্লুকে পরিণত হল। ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে এই সময় বাংলাদেশে নানা কারণে ও উদ্দেশ্যে যাঁরা আগমন ও অভিযান

করেন তাঁরা কেউ মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিলেন বলে ইতিহাসে কোন প্রমাণ নেই। এই অভিযানকারী ও আগন্তুকরা হলেন—

১। মারাঠা দস্যুরা বা বর্গীরা,

২। উত্তরভারতের দশনামী শৈব সন্ন্যাসী অভিযাত্রীরা, যাঁদের 'Sannyasi Faqir Raiders' বলা হয়,

৩। বিভিন্ন উত্তরভারতীয় রাজপুত গোত্র ও বংশ।

প্রায় একই সময়ে, কিছু আগে ও পরে, বাংলাদেশে দশনামী শৈব সন্ন্যাসীদের আগমন ও অভিযান, রাজপুত গোত্র ও বংশের আগমন এবং মারাঠাদের অভিযান আরম্ভ হয়। রেকর্ড ও তারিখ মিলিয়ে দেখলে হয়ত এর মধ্যেও একটা ক্রমায়াত ধারার বা Sequence-এর সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। যেমন তারকেশ্বর মঠ-প্রতিষ্ঠার ইতিহাস অনুসন্ধান করে, সমস্ত দলিল-দস্তাবেজ, সনদ ছাড় তায়দাদ ঘেঁটে দেখা গেছে যে, রাজা ভারামল্ল ও বিষ্ণুদাসের (রামনগর ও বাহিরগড়ের) সমসাময়িক হলেন তারকেশ্বর মঠের প্রতিষ্ঠাতা মায়াগিরি ধূম্রপান বা সমুদ্রনাথ গিরি। রাজা ভারামল্লের প্রদত্ত মঠের যে দানপত্র পাওয়া গেছে এবং মামলার সময় যা আদালতে দেখানো হয়েছিল, তার ৭৮৫ সন (বাংলা) তারিখটি যে জাল তারিখ, তা কোর্টে প্রমাণিত হয়। ৭৮৫ সনের বদলে ১৭৮৫ সম্বতই যে আসল তারিখ তাও প্রমাণ হয়। '১' অক্ষরটি তুলে দিয়ে দলিলে সম্বতকে সন করা হয়। ১৭৮৫ সম্বৎ বা ১৭২৯ সালে তারকেশ্বর মঠের প্রতিষ্ঠা হয়।[১]

১ শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের মতে তারকেশ্বরের কথা মঠ-প্রতিষ্ঠাতা মায়াগিরির পূর্বেও জনসাধারণ জানত। বিভিন্ন তায়দাদের সাক্ষ্য-প্রমাণের উপর নির্ভর করে তিনি বলেন—'ভারামল্লের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজা বিষ্ণুদাসই প্রথম বালিগড়ি পরগণার জমিদার ছিলেন, তাঁহার অধস্তন দশম পুরুষ ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন। তদনুসারে তিন পুরুষে এক শতাব্দী ধরিয়া রাজা বিষ্ণুদাসের অভ্যুদয়কাল খৃঃ ১৭শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে পড়ে।......বিষ্ণুদাসকে কিছুতেই ১৬৫০ খৃষ্টাব্দের পরে টানিয়া আনা যায় না।.. এখানে সাবধানে লক্ষ্য করা আবশ্যক, ৺তারকেশ্বরের প্রথম দেবোত্তর সম্পত্তি রাজা বিষ্ণুদাস প্রদত্ত নহে, তাঁহার ভ্রাতা ভারামল্ল প্রদত্ত।...অনুমান হয়, রাজা বিষ্ণুদাসের মৃত্যুর পর সন্ন্যাসিভক্ত ভারামল্ল কিছুকাল জমিদার ছিলেন এবং সেই সময়েই ৺তারকেশ্বর মায়াগিরিকে প্রদত্ত করিয়াছিলেন।"

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত কবিচন্দ্র রামকৃষ্ণ দাসের 'শিবায়ন' কাব্যে তারকেশ্বরের নাম আছে। এর অভ্যুদয়কাল সম্পর্কে দীনেশবাবু বলেন,—"ভুরশীটের রাজা নরনারায়ণ

দশনামী সন্ন্যাসীরা কেন হুগলী জেলায় মঠ প্রতিষ্ঠা করলেন এবং শুধু তারকেশ্বরে নয়, হুগলী হাওড়া জেলারই বিভিন্ন স্থানে—যেমন গুপ্তিপাড়ায়, ভোটবাগানে, নয়নগরে, বৈদ্যবাটীতে, সন্তোষপুরে—তা রীতিমত বিবেচ্য বিষয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশের ভাগ্যবিপর্যয় হুগলী জেলাতেই ঘটছিল—চুঁচুড়ায়, চন্দননগর, হুগলীতে। যে-সময় ঘটছিল, ঠিক সেই সময়েই উত্তর-ভারতের দশনামী সন্ন্যাসীরা নানা দেশ ঘুরতে ঘুরতে বাংলাদেশের হুগলী জেলাতে এসে পৌছলেন। একাধিক মঠ প্রতিষ্ঠা করলেন। উত্তরভারতের রাজপুত ক্ষত্রিয়বংশের ভারামল্ল ও বিষ্ণুদাসও এই সময় এসে রাজা ও জমিদার হলেন এই অঞ্চলের। দশনামীদের মঠ-প্রতিষ্ঠার কিছুদিন পরেই বর্গীদের দুর্ধর্ষ অভিযান আরম্ভ হল। তার কিছুদিন পরে, ১৭৫৭-এর পলাশীর যুদ্ধের পর, দশনামী সন্ন্যাসীদের দলে-দলে লুণ্ঠন অভিযান আরম্ভ হল বাংলাদেশে। ১৭৬৩ সালের রেকর্ডে তার প্রথম প্রমাণ পাওয়া যায়।[১]

দশনামী 'গিরি' সম্প্রদায়ের মোহান্তদের মঠ স্থাপনের পূর্বে তারকেশ্বরের কোন ধর্মকেন্দ্রিক ইতিহাস ছিল কিনা বলা যায় না। থাকা অস্বাভাবিক নয় এবং থাকলেও আজ তা প্রায় অবলুপ্ত। নানাদিক থেকে তার আভাস-ইঙ্গিত পাওয়া যায় শুধু। তারকেশ্বরের পাশেই 'লোকনাথ'। এ কোন্ লোকনাথ? মূলত নাথদের, না বৌদ্ধদের দেবতা? অথবা জৈনদের? বিশেষভাবে বিচার্য, কারণ নামটি শিবের সাধারণ নাম নয়, 'নাথ' সত্ত্বেও। তারকেশ্বরেও তাবকনাথ।

রায় কবির প্রপৌত্র বাসুদেব রায়কে মহত্রাণ ভূমি দান করিয়াছিলেন (হাওড়া কালেক্টরীর ৪৩০৫৮ নং তায়দাদ)। উক্ত বাসুদেব ১১৫৯ সালে জীবিত ছিলেন না। অপরদিকে রাজা নরনারায়ণের রাজত্বকাল ঠিক ১০৯২—১১১৮ সাল। সুতরাং বাসুদেবের প্রপিতামহ কবি রামকৃষ্ণের প্রথম অভ্যুদয়কাল ১৬২৫ খৃষ্টাব্দের পরে যাইবে না।...কবির বাসস্থান আমতার নিকটবর্তী রসপুর গ্রাম। তাঁহার পক্ষে তারকেশ্বরের প্রথম আবিষ্কারবার্তা সহজেই পরিজ্ঞাত হওয়া সম্ভব। কবির বর্ণনা হইতে বুঝা যায়, তখনও তারকেশ্বর 'পর্ব্বত-গহ্বরে' জনসাধারণের দুষ্প্রাপ্য স্থানে অবস্থিত ছিল। পরে ভারামল্ল মায়াগিরির সময়ে ঐ পর্ব্বত-গহ্বরই লোকপ্রসিদ্ধ মহাতীর্থে পরিণত হয়। সুতরাং মায়াগিরির পূর্ব্বেও তারকেশ্বরের অস্তিত্ব শিষ্টসমাজে অজ্ঞাত ছিল না।"—মাসিক বসুমতী, ভাদ্র ১৩৬২, পৃঃ ৮০০—৮০১।

১ The Sannyasi Rebellion in Bengal: By Brojendra Nath Banerjee in 'Dawn of New India'; Jamini Mohan Ghosh: The Sannyasi Fakir Raiders of Bengal.

সন্ন্যাসীদের ধ্বনির মধ্যে 'তারকনাথ'ই উচ্চারিত হয়। শিবের নামের সঙ্গে 'নাথ' যেন অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। নাথধর্মের বৈশিষ্ট্য এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয়। অদূরে নাথধর্মের মহাকেন্দ্র মহানাদের জটেশ্বরনাথ। এর মধ্যে তারকনাথের স্থিতি খুবই স্বাভাবিক বলে মনে হয়। এখনও হুগলী-হাওড়া জেলার নানা স্থানে, সারা পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে নানাবিধ প্রতিকূলতার মধ্যেও নাথধর্মের বিচিত্র সব অবশেষের অস্তিত্ব রয়েছে দেখা যায়।

মোহান্তপূর্ব তারকেশ্বরের ইতিহাসপ্রসঙ্গে গোপজাতীয় মুকুন্দ ঘোষের কিংবদন্তীটিও প্রণিধানযোগ্য। রাজা ভারামল্লের গোরক্ষক ছিল মুকুন্দ ঘোষ। গভীর অরণ্যে স্বয়ম্ভূ শিব মুকুন্দের কাছেই আবির্ভূত হন। মুকুন্দই সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করে তাঁর পূজা করবার আদেশ পান। ব্রাহ্মণপূজারী পরে নিযুক্ত হন। এসম্বন্ধে 'বৃহৎ তারকেশ্বর মাহাত্ম্য' গ্রন্থে লেখা আছে—মুকুন্দ ঘোষ তারকেশ্বর কর্তৃক অনুগৃহীত হইয়া তাঁহার পূজার্চনা করিতে থাকে; বোধ হয় তাহাতে একটু ত্রুটি বিবেচনায়, দেবাদিদেব একজন ব্রাহ্মণ সেবাইত রাখা উপযুক্ত মনে করিলেন।[১] দেবতা যার কাছে প্রথম দেখা দিলেন, সেই গোরক্ষক মুকুন্দকে অধিকারচ্যুত করে ব্রাহ্মণ পূজারী নিযুক্ত হলেন। তার জন্য কিংবদন্তীটিতে প্রয়োজনীয় কাহিনী চমৎকার যোজনা করা হল। হঠাৎ এই সময় হাওড়া জেলার সিংটি-শিবপুরের চতুর্ভুজ গাঙ্গুলী স্বপ্ন দেখে তারকেশ্বরের এবং রামনগরে গিয়ে ভারামল্লের কাছে পৌরোহিত্যের কাজ পেলেন।

ইংরেজীতে একটা কথা আছে—"Customs die hard"—এবং 'কাস্টাম' বা প্রথাই হল সংস্কৃতিবিজ্ঞানীর কাছে ফসিলের মতন। জীবাশ্মবিদ্‌রা যেমন জীবজগতের ক্রমবিকাশের ইতিহাস রচনা করেছেন, নানা জীবজন্তু ও তরুলতার ফসিল থেকে, সংস্কৃতিবিজ্ঞানীরাও তেমনি প্রচলিত প্রথার ফসিল থেকে সংস্কৃতির বিকাশের ধারা বিচার করেন। ভৈরবনাথ নামে মুকুন্দ ঘোষ পাথুরে সমাধিতে তারকেশ্বর মন্দিরের পূর্বদিকে আজও বিরাজ করছে। শুধু তাই নয়, গোপবালকরা একত্রে প্রস্তররূপে আজও মোহান্ত মহারাজের বাড়ির পশ্চিমাংশে বিরাজ করছে। মুকুন্দের স্বজাতি গোপদের আনুষ্ঠানিক ভূমিকার গুরুত্ব আজও অনেক প্রথার মধ্যে সূচিত হচ্ছে। তারকেশ্বর গাজনের পাঁচজন মূল সন্ন্যাসীর মধ্যে চারজন গোপ। তার মধ্যে তিনজন তারকেশ্বর এস্টেট

১ বৃহৎ তারকেশ্বর মাহাত্ম্য, ৩৮ পৃষ্ঠা।

কর্তৃক নিযুক্ত এবং একজন রামনগরের। এই প্রথা অকারণে এতদিন ধরে প্রচলিত নেই। মঠ, মোহান্ত বা ব্রাহ্মণ পূজারীরা ইচ্ছা করলে এ-প্রথার পরিবর্তন করতে পারতেন, কিন্তু তা তাঁরা করেননি। লোকায়ত ঐতিহ্যের কাছে তাঁরা বাধ্য হয়ে আত্মসমর্পণ করেছেন।

তারকেশ্বর মন্দিরের মধ্যে তারকনাথের বামপাশে বাসুদেব বিরাজিত। পটাঙ্কিতা দুর্গা, অন্নপূর্ণা ও কালিকাও পাশে আছেন। তাঁদের নিত্যপূজা হয়। এই সব শক্তিদেবীর পূজা কতটা বৈদিক সন্ন্যাসীদের আচারসম্মত, সেটা বিচার্য বিষয়। যদিও মোহান্ত সতীশ গিরি নিজেকে তান্ত্রিক বলে দাবি করেছিলেন, তাহলেও আদালতে তাঁর দাবি শাস্ত্রসম্মত বলে গ্রাহ্য হয়নি। বড় বড় পণ্ডিতেরা শাস্ত্রব্যাখ্যা করে মোহান্তদের তান্ত্রিক সাধকের দাবি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তাই নিয়ে রীতিমত বিতর্ক হয়েছিল। দশনামী সন্ন্যাসীরা মূলত বৈদিক সন্ন্যাসী। তান্ত্রিক আচার তাঁদের পালনীয় নয়। তবু দেখা যায়, তারকেশ্বর মন্দিরে চণ্ডীরূপা কালিকা পর্যন্ত নিত্য-পূজিতা হচ্ছেন। যেখানে শিব আছেন, সেখানে শক্তিও আছেন—এ-ব্যাখ্যা এখানে যথেষ্ট নয়। দশনামী মঠ হিসাবে তারকেশ্বরের সঙ্গে তার সম্পর্ক কতটা ঘনিষ্ঠ, তাই বিচার্য। এখানেও মনে হয়, রাঢ়ের লোকায়ত তান্ত্রিক আচারের প্রাধান্যকে এইভাবে স্বীকার করা হয়েছে। মোহান্তের পূর্বেও এই বৈশিষ্ট্য ও প্রাধান্য তারকেশ্বরে থাকা অসম্ভব নয়। তারকেশ্বরের মোহান্তপূর্ব যুগের ইতিহাসের ইঙ্গিত এর ভিতর থেকে পাওয়া যেতে পারে।

তারকেশ্বর ও তার পারিপার্শ্বিক প্রাচীন ইতিহাসের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত রয়েছে 'তারকেশ্বর-শিবতত্ত্ব' নামক গ্রন্থের মধ্যে। দশনামী সন্ন্যাসীরা কিভাবে নানা স্থানে মঠ-প্রতিষ্ঠা করেন, শিবতত্ত্বগ্রন্থের বিবরণ থেকে তা পরিষ্কার জানা যায়। প্রধানত হাওড়া হুগলী মেদিনীপুর ও দক্ষিণ-চব্বিশ পরগণা অঞ্চলেই দশনামীদের শৈব মঠ স্থাপিত হয়। উল্লেখযোগ্য হল, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে, যে সময় দশনামীরা এদেশে আসেন তখন, বাংলাদেশের এই অঞ্চলেই আভ্যন্তরিক বিশৃঙ্খলা চরমে পৌঁছেছিল।

যে সময় দশনামীরা এই সব মঠ প্রতিষ্ঠা করেন, সেই সময় বাংলাদেশের এইসব অঞ্চলে লোকধর্মের রূপ কি ছিল, তারও সুন্দর আভাস পাওয়া যায় এই গ্রন্থ থেকে যেমন—

তথায় সন্ন্যাসী যায় দেবতা রক্ষণে।
ধর্ম্মের প্রচার আর বিধর্ম্মী-দলনে॥
কোন স্থানে পঞ্চানন কোথায় স্বরূপ।
কোথায় ভৈরবী মূর্ত্তি দৃশ্য অপরূপ॥
কোথায় মনসা দেবী মন্দিরেতে একা
কালিকা মুরতি কোথা শীতলা সেবিকা।
কোথায় তলাই চণ্ডী মাখাল জলায়।
বৃক্ষতলে মহাপ্রভু স্থান দৃশ্য প্রায়॥···
বহুদেব বহুমঠ না হয় কথন।
নীচজাতি গৃহে দেখ ধর্ম্ম সনাতন॥
বৌদ্ধধর্ম্ম বৌদ্ধচর্চ্চা করিতে নির্ম্মূল।
এতাদৃশ অনুষ্ঠান করে সাধুকুল॥···
কোন স্থানে পঞ্চমুণ্ডী করিয়া স্থাপন।
শক্তি আরাধনা করে অভীষ্ট কারণ॥ ··
ক্ষেত্রপাল মহাকাল প্রভৃতি দেবতা।
যাহার যেরূপ ভক্তি সেরূপ গঠিতা॥
অদ্যাপি ভাণ্ডার চণ্ডী প্রস্তর আকৃতি।
বনমধ্যে ষষ্ঠীদেবী পূজে ভাগ্যবতী॥

পঞ্চানন মনসা ধর্মঠাকুর ক্ষেত্রপাল মহাকাল চণ্ডী ইত্যাদি দেবদেবীর প্রভাব রাঢ়ের (বিশেষ করে দক্ষিণরাঢ়ের) গ্রাম্যসমাজে যে কত বেশি তা এখনও গ্রাম পরিদর্শন করলে বুঝতে পারা যায়। দু-শ আড়াই-শ বছর আগে আরও বেশি ছিল। শিবতত্ত্বে তারই পরিচয় আছে। দশনামী বৈদিক সন্ন্যাসীরা পশ্চিমবাংলার এই লোকধর্ম ও লোকাচারেব উপর বিশেষ কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেননি। তাঁরা কেবল মঠ প্রতিষ্ঠা করেছেন। প্রচুর দেবোত্তর সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করেছেন এবং মোহান্তগিরি করেছেন। কিন্তু লোকাচারের প্রবল বন্যার মুখে তাঁরা কোন বাঁধ তুলতে পারেননি। তোলার চেষ্টাও করেননি। কারণ নিজেদের স্বার্থেই মঠকে লোকপ্রিয় করে তোলাই ছিল তাঁদের প্রধান লক্ষ্য। লোকাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়ালে তা করা যায় না। তাই শক্তিপূজা, গাজন-উৎসব ও অন্যান্য লোকাচার সবই অন্যান্য অনেক মঠরে

মতন, তারকেশ্বরেও বজায় রইল। কালক্রমে প্রতাপশালী মোহান্তদের পোষকতায় এই সব উৎসব ও আচারের মহাসঙ্গমতীর্থ হয়ে উঠল তারকেশ্বর।

বাংলাদেশে শিবঠাকুরের সবচেয়ে বড় জাঁকাল উৎসব হল চৈত্র সংক্রান্তির সন্ন্যাস ও গাজন-উৎসব। সুতরাং এই উৎসবের মহাসম্মিলন প্রধান তারকেশ্বর মঠে হওয়াই স্বাভাবিক এবং কালক্রমে হয়েছেও তাই। চৈত্রের প্রথম থেকে তারকেশ্বরের সন্ন্যাসগ্রহণ ও মেলা আরম্ভ হয়। এক-একটা দিক ও অঞ্চল থেকে একে-একে সকলে সন্ন্যাসাদি গ্রহণ করতে তারকেশ্বরে এসে জমা হয়। 'দক্ষিণের মেলায়' দক্ষিণের লোক, অর্থাৎ মেদিনীপুর, ডায়মণ্ডহারবার, উলুবেড়ে, আরামবাগ প্রভৃতি অঞ্চলের লোক, প্রধানত পায়ে হেঁটে তারকেশ্বর আসেন। 'পূর্বের মেলায়' চব্বিশপরগণা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, যশোহর, খুলনা অঞ্চলের লোকেরা আসেন। এই অঞ্চলের মুসলমানরাও অনেকে সন্ন্যাসী হতেন। ২৭শে ও ২৮শে চৈত্রের পর থেকে কলকাতা, হাওড়া, হুগলী, বর্ধমান অঞ্চলের লোকেরা আসেন। নীলের মেলা হয় বিরাট, নীলাবতীর বিয়ে হয় এবং শোভাযাত্রা হয় হাতিসহ। রামনগরের সন্ন্যাসীদের কাঁটা-ঝাঁপ ইত্যাদিও বিশেষ দর্শনীয় অনুষ্ঠান। মেলায় বিভিন্ন অঞ্চলের মেয়ে-পুরুষ ভক্তরা কাল্‌কেপাতারি নৃত্যও করে। এইভাবে চারিদিকের লোকানুষ্ঠানের মহামিলন হয় তারকেশ্বরে। কেন্দ্রীয় মঠের এই বৈশিষ্ট্য ক্রমে প্রথায় পরিণত হয় এবং প্রথার প্রভাব অনেক ক্ষেত্রে শাখা-মঠের নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমানাও ছাড়িয়ে যায়।

সিঙ্গুর

হুগলী জেলার প্রাচীন জনপদের মধ্যে সিঙ্গুর অন্যতম। 'সিংহপুর' নাম চলতি কথায় 'সিঙ্গুর' হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। এই সিংহপুরের প্রাচীন পুরাকাহিনী নিয়ে অনেক গবেষণা ও আলোচনা হয়েছে। সেই পুরা-কাহিনীর উৎস পর্যন্ত কেউ কেউ সিঙ্গুরের প্রাচীন ইতিহাসের সূত্রে টেনেছেন। প্রথমে সিঙ্গুরের সেই পুরাকাহিনীর কথা বলি। সিংহলের প্রাচীন পুরাণকথা 'মহাবংশ' গ্রন্থে বঙ্গনগর ও সিংহপুর নামে দুটি নগরের কথা আছে। এই নগর দুটির ভৌগোলিক অবস্থান সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা একমত নন। বঙ্গনগর নাম থেকে বোঝা যায়, বাংলাদেশের কোন নগর। কিন্তু কোথায় সেই নগর, সঠিক বলা যায় না। একই কাহিনীর অন্তর্গত সিংহপুর নগরও মনে হয় বাংলাদেশেরই কোন প্রাচীন নগর, কিন্তু তার ভৌগোলিক অবস্থানের কোন ইঙ্গিত কোথাও নেই। পণ্ডিতেরা কেউ কেউ মনে করেন যে, এই সিংহপুরই হল বর্তমান হুগলী জেলার সিঙ্গুর।[১]

> Nor do we know the site of Vanganagara referred to in the Ceylonese chronicles in connection with the story of Prince Vijay. In the same story figures a city styled Simhapura which is placed in Lala (probably Radha) and is taken to correspond with Singur in the Serampore sub-division of Hooghly. There is however, a theory which places the city in Kathiawar.

'মহাবংশের' কাহিনীটি এই: সীহবাহু বা সিংহবাহু নামে এক রাজা ছিলেন। মাতৃকুলের রাজ্য লাভ করেন তিনি বঙ্গরাজ্যে। এই রাজ্য নিজে না ভোগ করে তিনি তাঁর এক আত্মীয়কে দান করেন এবং নিজে লালদেশে

১ History of Bengal, Dacca Univ., Vol. 1, P. 30.

সিংহপুর ও সিঙ্গুরের আলোচনা অন্যত্রও করা হয়েছে। Asiatic Society Journal, 1910, দ্রষ্টব্য।

সীহপুর বা সিংহপুর নামে নতুন রাজ্য ও নগর গড়ে তোলেন। এই নতুন নগরটিকে কেউ কেউ কাথিয়াওয়াড়ের সীহর বলে মনে করেন এবং লালদেশ ও লাটদেশ এক বলে বিবেচনা করেন। কিন্তু কাথিয়াওয়াড়ের প্রাচীন নাম সৌরাষ্ট্র। এই নামেই প্রাচীন ইতিহাসে তার পরিচিতি, লাটদেশ নামে নয়। বঙ্গরাজ্যের সঙ্গে লালদেশের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখে মনে হয় যে সিংহলী কাহিনীর লালদেশ জৈনসূত্রগ্রন্থের লাড়দেশ এবং সংস্কৃতের রাঢ়দেশ। রাঢ়দেশে যদি সিংহপুর নগর হয়, তাহলে সিঙ্গুরের প্রাচীন নাম সিংহপুর হওয়া আদৌ আশ্চর্য নয়।

যা বলছিলাম। এই সিংহবাহুর জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম বিজয়। রাজপুত্র বিজয়ের প্রতি পিতা সিংহবাহু কোন কারণে অসন্তুষ্ট হন। বিজয় পিতৃরাজ্য থেকে নির্বাসিত হন। নির্বাসিত হয়ে তিনি তাঁর অনুচরবৃন্দসহ 'সোপার' (বোম্বাইয়ের উত্তরে) দেশে যাত্রা করেন। অনুচরদের দুর্ব্যবহারে সেখানকার লোকদের বিরাগভাজন হন এবং সোপার থেকে জাহাজে করে লঙ্কাদ্বীপে যাত্রা করেন। লঙ্কাদ্বীপে 'তাম্বপন্নি' অঞ্চলে তিনি অবতরণ করেন। 'মহাবংশে' উল্লেখ আছে, যে বছর গৌতমবুদ্ধ পরিনির্বাণ লাভ করেন (সিংহলী কাহিনী অনুসারে ৫৪৪ খৃস্টপূর্বাব্দে), সেই বছরেই বিজয় 'তাম্বপন্নি'তে অবতরণ করেন এবং লঙ্কাদ্বীপ দখল করেন যুদ্ধ করে। তাম্বপন্নি বা তাম্রপর্ণী হল সিংহলের প্রাচীন নাম। কথিত আছে, সিংহপুরের এই সিংহবংশের রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর লঙ্কাদ্বীপের নাম হয় সিংহল। এ কাহিনীর ঐতিহাসিক ভিত্তি কতখানি তা বলা যায় না। লোকমুখে যে কাহিনী প্রচলিত থাকে এবং প্রচারিত হতে থাকে যুগ যুগ ধরে, সেই কাহিনীই এক সময় পুরাণকথায় সঙ্কলিত হয় নিঃশব্দে। তাই মনে হয়, সিংহল ও বাংলাদেশের মধ্যে কোন এক সময় কোন সম্পর্ক স্থাপিত না হলে বা কোন যোগাযোগ না থাকলে (রাষ্ট্রিক, সাংস্কৃতিক বা বাণিজ্যিক), মহাবংশের এ কাহিনী রচিত হত না। প্রাচীন বাংলার সমুদ্রযাত্রা, যুদ্ধযাত্রা বা বাণিজ্যযাত্রার এইরকম কোন ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বন করে সিংহল ও বাংলাদেশের সম্পর্কের যে ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল একসময়, মহাবংশের পুরাণকাহিনীর উৎস সেই অধুনালুপ্ত ঐতিহ্য। তার সঙ্গে সিংহপুর তথা সিঙ্গুরের সম্পর্কও সুদূরপরাহত না হতে পারে। কারণ, প্রাচীন সরস্বতী নদীর তীরস্থ সিঙ্গুর একদা সমৃদ্ধ গ্রাম ও

বাণিজ্যকেন্দ্র বা বন্দর ছিল। সরস্বতীর উপর দিয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়ে লঙ্কাযাত্রা করাও তখন বাস্তব সত্য ছিল।[১]

সিঙ্গুরে কয়েকটি প্রাচীন দেবালয় আছে। তার মধ্যে পুরুষোত্তমপুরের বিশালাক্ষী দেবীর মন্দিরটি সবচেয়ে প্রাচীন। মন্দিরের গায়ে একটি ফলকে ১১৩৮ বঙ্গাব্দ মন্দির নির্মাণের সময় বলে উল্লেখ করা আছে। প্রায় ২২২ বছরের পুরাতন মন্দির। মন্দিরের বিশালাক্ষী দেবীর নিত্যপূজা হয়। এ ছাড়া মল্লিকপুরের কালীমন্দিরটিও উল্লেখযোগ্য। মল্লিকপুরের কালীমূর্তি বিরাট মূর্তি এবং ডাকাতে কালী বলে প্রসিদ্ধ। হুগলী জেলা অষ্টাদশ উনবিংশ শতাব্দীতে ডাকাতির জন্য বিখ্যাত হয়েছিল। এই সময়কার অনেক বিখ্যাত ডাকাতের সর্দারদের সম্বন্ধে অনেক রোমাঞ্চকর কাহিনী শোনা যায়, রবিনহুডের মতন। তাদের মধ্যে সিঙ্গুরের গগন সর্দার অন্যতম।

সিঙ্গুরে পলতাগড় অঞ্চলে একটি পাথরের প্রাচীন মনসামূর্তি আছে। রঘুনন্দনের 'তিথ্যাদিতত্ত্বম্'-এর টীকায় কাশীরাম বাচস্পতি মনসার একটি ধ্যান উদ্ধৃত করেছেন। দুঃখের বিষয় ধ্যানটি কোথা থেকে তিনি উদ্ধৃত করেছেন, তা উল্লেখ করেননি। ধ্যানটি অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয়কে সংগ্রহ করে দেন।

হেমাম্ভোজনিভাং লসদ্বিষধরালঙ্কার-সংশোভিতাম্
স্মেরাস্যাং পরিতো মহোরগগণৈঃ সংসেব্যমানাং সদা।
দেবীমাস্তিকমাতরং শিশুসুতাং আপীন-তুঙ্গস্তনীং
হস্তাম্ভোজযুগেন নাগযুগলং সংবিভ্রতীমাশ্রয়ে॥

আস্তিকমাতার কাছে আমি আশ্রয় ভিক্ষা করছি। তাঁর কোলে একটি শিশু আছে। তিনি স্বর্ণকান্তি পদ্মের মতন বিকশিত। সর্প তাঁর পার্শ্বচর। তুঙ্গপীনা তিনি। দু হাতে তাঁর সাপ। হাসিমাখা মুখ এবং সর্পালঙ্কারভূষিতা।

এই ধ্যানের সঙ্গে সিঙ্গুরের মনসামূর্তির মিল আছে। মূর্তিটি প্রায় ৬০।৭০ বছর আগে চাল্‌কেবাটির মোড়লপুকুর থেকে পাওয়া যায়। দেখে মনে হয়, একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর প্রাচীন মূর্তি।

---

১ সিংহপুর ও সিঙ্গুর সম্পর্কে যাঁরা কৌতূহলী, তাঁরা এই সব গ্রন্থ ও পত্রিকাদি দেখতে পারেন: History of Bengal, Dacca Univ.. Vol. 1, P. 30, 32. 39 ; Journal of Asiatic Society of Bengal, 1910 ; Cambridge History of India, Vol. 1, Ch. XXV ; Indian Historical Quarterly, 1926, Vol. 2 & 1933, Vol. 9.

নানারকমের লোকশিল্প ও শিল্পীদের জন্য সিঙ্গুরের একসময় প্রসিদ্ধি ছিল। সিঙ্গুরের চিত্রকররা চিত্রিত হাতপাখা (পাতার) তৈরি করতেন। পাখার গায়ে নানারকম চিত্র আঁকা থাকত এবং মুক্তা অভ্র দিয়ে কাজ করা হত তার উপর। খুব বড় বড় পাখা তৈরি হত। সেকালের মূল্যমানে এক-একটি পাখার দাম পনের-কুড়ি টাকা পর্যন্ত হত। এই চিত্রকররা এখন প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছেন। কারণ, এখন পাতার তৈরি হাতপাখার যুগ নেই। চিত্রিত কারুকার্যখচিত হাতপাখার পোষকতা করতেন যাঁরা, তাঁরা সেকালের ধনী লোক। এখন তাঁরা ইলেকট্রিক ফ্যান্ ব্যবহার করেন। সুতরাং পাখাশিল্প এখন লুপ্ত। চিত্রকরদের সঙ্গে পটুয়ারাও ছিলেন। জলাঘাটা মৌজায় বেশ বড় পটুয়াপাড়া ছিল। এখনও ঘর চারেক আছে। অধিকাংশই এখন দেবদেবীর মূর্তি গড়েন। এর সঙ্গে গ্রাম্য কবিয়াল ও কবির দলও ছিল। সাধারণত ধীবর চাষী প্রভৃতিদের মধ্যেই কবিয়াল ছিল বেশি। এখন আর নেই।

হুগলী জেলার অন্যান্য আরও অনেক বিদ্যাকেন্দ্রের মতন সিঙ্গুরও একটি বিদ্যাকেন্দ্র ছিল বলে মনে হয়। তার বিশেষ কোন ধারাবাহিক ইতিহাস এখন আর পাওয়া যায় না। একটি প্রাচীন পণ্ডিত-পরিবারের কাছ থেকে যেটুকু ইতিহাস সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে, তাতে তার সামান্য আভাস পাওয়া যায়। সিঙ্গুরের ঠাকুরদাস ন্যায়রত্ন একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর পিতার নাম বিশ্বনাথ সার্বভৌম। ঠাকুরদাসের পুত্র শশিভূষণ স্মৃতিতীর্থও এ অঞ্চলের নামকরা পণ্ডিত ছিলেন। ছাত্রদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন মৃত্যুঞ্জয়, নিবারণ স্মৃতিতীর্থ, বৈদ্যনাথ কাব্যব্যাকরণস্মৃতিতীর্থ। ১২০৪ সালে ঠাকুরদাসের জন্ম এবং ১৩০০ সালে মৃত্যু হয়। সিঙ্গুরে তাঁর একটি টোল ছিল। টোলে স্মৃতি ব্যাকরণাদি সব শাস্ত্রই পড়ান হত। ঠাকুরদাসের মৃত্যুর পর প্রধানত পোষকতার অভাবে, সিঙ্গুরের সংস্কৃত বিদ্যাচর্চার এই ধারা লোপ পেয়ে যায়।

ভুরশুট

প্রাচীন ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজ্যের বিলীয়মান ঐতিহাসিক স্মৃতি বহন করছে যেসব স্থান, তার মধ্যে অধুনা হাওড়া জেলার অন্তর্গত 'ডিহি ভুরশুট' গ্রাম অন্যতম। 'ডিহি ভুরশুট' ও 'পার ভুরশুট' নামে দুটি গ্রাম আছে। 'পার ভুরশুট' হয়ত উত্তরে ভুরশুট রাজ্যের প্রাচীনযুগের বা মধ্যযুগের সীমানার ইঙ্গিত করছে। ডিহি ভুরশুট প্রাচীন ভূরিশ্রেষ্ঠীর একটুকরো জীর্ণ নিদর্শন ছাড়া কিছু নয়। না হলেও, দামোদর পার হয়ে হুগলী জেলার সীমানা ছাড়িয়ে হাওড়া জেলার ডিহি ভুরশুট গ্রামে পা দিলেই সুদূর অতীতের ভূরিশ্রেষ্ঠী রাজ্যের অবলুপ্ত সত্তা অন্তত কল্পনা করা যায়। বাস্তব নিদর্শন বিশেষ কিছু নেই, গ্রামও খুব বড় নয়। তার চেয়ে অনেক বড় তার সুদীর্ঘ ঐতিহ্যের অদৃশ্য অনুভূতি। একেবারেই কিছু নেই যে তা নয়। শ্রেষ্ঠীদের দু-চারজন প্রতিনিধি আজও আছেন, আর আছেন রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ পরিবার কয়েকটি।

হাওড়া লাইট-রেলওয়ের আটপুর স্টেশনে নেমে মোটরে রাজবলহাট যাওয়া যায়। রাজবলহাট থেকে হেঁটে দামোদর পার হয়ে যেতে হয় ডিহি ভুরশুট গ্রামে। এই পথেই ভুরশুট যাওয়ার সুবিধা এবং আমরা এই পথ ধরেই গিয়েছিলাম। হুগলী জেলার রাজবলহাটও ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজ্যের অন্তর্গত এবং সেখানেও তার যৎকিঞ্চিৎ নিদর্শন বা স্মৃতি আজও আছে। সে-কথা পরে রাজবলহাট প্রসঙ্গে বলব। ভুরশুট যাওয়ার পথে আমরা কেবলই ভাবছিলাম, ভুরশুটে কি দেখব? গ্রামে ঢুকতে প্রথমেই বিশাল বটগাছতলায় ধর্মঠাকুরের মন্দির দেখলাম। ক্ষুদ্র ও প্রায়-নগণ্য ডিহি ভুরশুট গ্রামের মধ্যে মহানগরীর বিশাল অট্টালিকার মতন সগর্বে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে জনৈক ভুরশুট-নিবাসী শ্রেষ্ঠীর বসতবাড়ি। এ-রকম বাড়ি যে এই গ্রামেও দেখতে পাব, তা কল্পনা করিনি। প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার না হলেও *এটি* একটি আবিষ্কার। গ্রামে না গেলে বুঝতে পারা সম্ভব নয়।

রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের আদি বাসস্থান ও বিদ্যাস্থানের মধ্যে বোধ হয় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল দক্ষিণরাঢ়ের অন্তর্গত ভূরিশ্রেষ্ঠ বা ভুরশুট। প্রচুর শ্রেষ্ঠীর বাস ছিল বলে ভূরিশ্রেষ্ঠী বা ভুরশুট নাম হলেও, গ্রামে আধিপত্য ছিল

ভূরিকর্মা বা তপোবিত্থাসম্পন্ন ব্রাহ্মণদের। ভূরিকর্মা ব্রাহ্মণ ও বহু শ্রেষ্ঠীর বসবাস ছিল বলে ভূরিশ্রেষ্ঠী নাম হওয়া সম্ভবপর, কেবল শ্রেষ্ঠীর বাস ছিল বলে নয়। ভূরিষ্ঠাল, ভূরিশ্রেষ্ঠ, ভূরিছেণ্ট প্রভৃতি কুলোপাধি থেকে বোঝা যায়, একসময় ভুরশুটে ব্রাহ্মণবংশের প্রাধান্ত ছিল। পরবর্তীকালে এই গ্রামের নাম থেকে পরগণার সৃষ্টি হয় যখন (মুসলমান আমলে), তখন নানারকম নামান্তরও হয় তার। প্রাচীন দলিলপত্রে তার প্রমাণ পাওয়া যায়— যেমন ভুরস্থট, ভুরসিট্ট, ভূরিসৃষ্টি, ভূরিশ্রেষ্ঠী, ভূরিশিট (ভারতচন্দ্র) ইত্যাদি।

ভুরশুট গ্রামনিবাসী ছিলেন ভারতবিখ্যাত দার্শনিক কন্দলীকার 'শ্রীধরাচার্য। তিনি দশম শতাব্দীর লোক। শ্রীধরাচার্য তাঁর 'ন্যায়কন্দলী' গ্রন্থের শেষে আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে লিখেছেন :

আসীদ্দক্ষিণরাঢ়ায়াং দ্বিজানাং ভূরিকর্মণাং।
ভূরিসৃষ্টিরিতি গ্রামো ভূরিশ্রেষ্ঠিজনাশ্রয়ঃ ॥

শ্লোকটিতে উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক তথ্যের ইঙ্গিত রয়েছে। প্রথমত, দেখা যায় দক্ষিণরাঢ় তখন উত্তররাঢ় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। মনে হয়, পালরাজাদের অভ্যুদয়কালে এই সঙ্কুচিত দক্ষিণরাঢ়ের মধ্যেই শূরবংশের কোন রাজা রাজত্ব করছিলেন। দ্বিতীয়ত, ভুরশুটে বহু শ্রেষ্ঠীজন ও ভূরিকর্মা ব্রাহ্মণের বাস ছিল। ডিহি ভুরশুট আজ যে দামোদরের তীরে অবস্থিত তা কানা দামোদর হলেও, এককালে এই কানাই ছিল বিশাল নদী। তখন তমলুকের পথে স্বচ্ছন্দে সমুদ্রগামী পোত এই নদীপথেই চলত এবং তাতে বণিকরা বাণিজ্যসম্ভার বোঝাই করে দূর দেশান্তরে অনায়াসে বাণিজ্য-যাত্রা করতে পারতেন। বহু শ্রেষ্ঠীজন সেইজন্য ভূরিশ্রেষ্ঠীতে বসবাস করতেন। অনুমান করা যায়, সুসমৃদ্ধ বাণিজ্যনগরের মতন ছিল ভুরশুট। নদী যেমন মজে গেছে এবং গতি পরিবর্তন করেছে, তেমনি কালের যাত্রায় শ্রেষ্ঠীজনদেরও ভাগ্যবিপর্যয় হয়েছে অনেক এবং স্থানীয় রাজাদের পোষকতায় পুষ্ট রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের কুলগর্ব ও বিত্থাগর্ব দুই-ই ম্লান হয়ে গেছে। আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে শ্রীধর তাঁর পিতামহ বৃহস্পতির নামোল্লেখ করে বলেছেন :

অম্ভোরাশেরিবৈতস্মাৎ বভূব ক্ষিতিচন্দ্রমাঃ।
জগদানন্দকৃদ্‌বন্দ্যো বৃহস্পতিরিতি দ্বিজঃ ॥

সমুদ্র থেকে যেমন চন্দ্রের উৎপত্তি হয়েছিল, যেমনি এই ভূরিশ্রেষ্ঠি গ্রাম থেকে জগদানন্দকারী ভূমণ্ডলের চন্দ্রসদৃশ বন্দ্য-ব্রাহ্মণ বৃহস্পতি উদ্ভূত হয়েছিলেন। বৃহস্পতির পুত্র কীর্তিমান বলদেবই শ্রীধরের পিতা ছিলেন। শ্রীধরের কাল যদি দশম শতাব্দীর শেষদিক হয়, তাহলে বৃহস্পতির জন্মকাল নবম শতাব্দীর শেষদিক হওয়াই সম্ভবপর। এই বৃহস্পতির জন্মকালেই দেখা যায় ভূরিশ্রেষ্ঠ বহু রত্নের কেন্দ্র ও জনবহুল গণ্ডগ্রামে পরিণত হয়েছিল। বৃহস্পতির হঠাৎ অভ্যুদয় কোন তেপান্তরের মাঠে নিশ্চয় হয়নি এবং জনবহুল গণ্ডগ্রাম, বিশেষ করে শ্রেষ্ঠী ও পণ্ডিতবহুল গ্রাম, একদিনে গড়ে উঠেনি। অন্তত শতাধিক বছর গড়ে উঠতে লাগলেও, খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত ভূরিশ্রেষ্ঠীর প্রাচীন ইতিহাসের আভাস পাওয়া যায় শ্রীধরের উক্তি থেকে। পালরাজাদের অভ্যুদয়কাল থেকে, কিংবা তার আগে থেকেই ভূরিশ্রেষ্ঠীর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল বলে অনুমান করা যায়।

কে এই রাজ্যের রাজা ছিলেন বলা যায় না। শূরবংশের কোন রাজা হতে পারেন, অথবা অন্য কোন স্থানীয় সামন্তরাজা। পরবর্তীকালে একজন ধীবর রাজার খবর পাওয়া যায়। একাধিক সামন্তরাজার অধীনেও ভুরশুট রাজ্য থাকা বিচিত্র নয়। পাণ্ডুদাস নামে জনৈক কায়স্থরাজা শ্রীধরাচার্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কিন্তু কে এই পাণ্ডুদাস এবং সমগ্র ভূরশুট রাজ্যের অধীশ্বর তিনি ছিলেন কি না তা জানা যায় না। তারপর স্থানীয় কোন সামন্তরাজাকে পরাজিত করে চতুরানন মহানিউগী নামক জনৈক রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ ভুরশুট পরগণায় ব্রাহ্মণরাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। সম্ভবত হুসেন শাহের রাজত্বকালে এই ঘটনা ঘটে। ভুরশুট পরগণার প্রাচীন তায়দাদাদির প্রমাণ থেকে দেখা যায় যে, মোগল আমলে আকবর বাদশাহের রাজত্বকালে এই ব্রাহ্মণ রাজবংশের কৃষ্ণ রায় ছিলেন ভুরশুট পরগণার রাজা। 'গড়ভবানীপুর' প্রসঙ্গে ভুরশুটের এই ব্রাহ্মণ রাজবংশের ইতিবৃত্ত আলোচনাকালে এ-সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ দেব। ভুরশুটের ব্রাহ্মণরাজবংশ প্রায় দুশ বছর রাজত্ব করেন এবং বিভিন্ন শাখায় তাঁরা বিভক্ত হয়ে যান। তারপর বর্ধমানাধিপতি কীর্তিচন্দ্র এই রাজবংশকে বলপূর্বক উৎখাত করে ভুরশুট পরগণা দখল করেন। অনেকেই জানেন, ভুরশুটের ব্রাহ্মণরাজবংশের এই পারিবারিক বিপর্যয়ের মধ্যেই রাজ্য-ভ্রষ্ট এক বালকের কাব্যপ্রতিভা স্ফূর্ত হয়ে উঠেছিল, বাংলার এক ঐতিহাসিক

যুগসন্ধিক্ষণে। ব্রাহ্মণরাজবংশের সেই রাজ্যভ্রষ্ট বালকই হলেন অন্নদামঙ্গলের কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর।

রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের অন্যতম আদি বাসস্থান ও বিদ্যাস্থান ভুরশুটের সামাজিক আভিজাত্যবোধ অত্যন্ত বেশি হওয়াই স্বাভাবিক। এই আভিজাত্যবোধ একসময় দক্ষিণরাঢ়ের ভুরশুটের ব্রাহ্মণদের সবচেয়ে বেশি ছিল। এত বেশি ছিল যে চন্দেল্লরাজ কীর্তিবর্মার সভাকবি কৃষ্ণ মিশ্র তাঁর বিখ্যাত 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নাটকে অন্যতম প্রধান পুরুষের চরিত্র এঁকেছিলেন "ভূরিশ্রেষ্ঠিক-নিবাসী" ব্রাহ্মণকে নিয়ে এবং সেই নাট্যচরিত্রের নাম দিয়েছিলেন 'অহঙ্কার'। ভূরিশ্রেষ্ঠীবাসী ব্রাহ্মণের নাম 'অহঙ্কার' এবং কাশীবাসী ব্রাহ্মণদের-নাম 'দম্ভ'। কাশীবাসী ব্রাহ্মণ 'দম্ভ' দূর থেকে 'অহঙ্কারকে' আসতে দেখে অনুমান করছেন যে, তিনি নিশ্চয় দক্ষিণরাঢ়ের লোক। 'দম্ভের' আশ্রমে ঢুকে যথোচিত অভ্যর্থনার অভাব দেখে 'অহঙ্কার' রুষ্ট হয়ে শিষ্যকে বললেন— "ম্লেচ্ছদেশে এলাম নাকি?" তারপর অভ্যর্থনান্তে 'অহঙ্কার' আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে বলছেন:

গৌড়ং রাষ্ট্রমনুত্তমং নিরুপমা তত্রাপি রাঢ়াপুরী।
ভূরিশ্রেষ্ঠিকনাম-ধাম পরমং তত্রোত্তমো নঃ পিতা॥
তৎপুত্রাশ্চ মহাকুলা ন বিদিতাঃ কস্যাত্র তেষামপি।
প্রজ্ঞাশীলবিবেকধৈর্যবিনয়াচারৈরহং চোত্তমঃ॥

অর্থাৎ অহঙ্কার বলছেন: শ্রেষ্ঠ রাজ্য গৌড়দেশ, তার মধ্যে নিরুপম প্রদেশ রাঢ়াপুরী। সেখানে পরমসুন্দর ভূরিশ্রেষ্ঠ নগরে আমার বাস। আমার পিতা সেখানকার একজন মুখ্যব্যক্তি। তাঁর মহাকুলোদ্ভব পুত্রদের এখানে কে না জানে, তাঁদের মধ্যে আবার প্রজ্ঞা, শীল, বিবেক, ধৈর্য, বিনয় ও আচারে আমিই হলাম শ্রেষ্ঠ।

ডিহি ভুরশুট গ্রামে যাবার আগে, 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নাটকোল্লিখিত ভূরিশ্রেষ্ঠের এই ব্রাহ্মণের অহঙ্কারমূর্তিটি মনের কোণে বিরাজ করছিল। কিন্তু ভুরশুটের অমায়িক ও সরল ব্রাহ্মণদের দেখে নাটকীয় আতঙ্ক কেটে গেল। প্রাচীন বিদ্যা-গৌরবের ধারা আজকের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণেই ম্লান হয়ে গেছে। তবু প্রচুর জীর্ণ পুঁথির বাণ্ডিল এই ব্রাহ্মণদের ঘরে ঘরে আজও সেই লুপ্ত বিদ্যা-গৌরবের মূক সাক্ষীরূপে রয়েছে ডিহি ভুরশুট গ্রামে।

গড় ভবানীপুর

হাওড়া-হুগলী জেলার প্রাচীন ভুরশুট রাজ্যের অন্তর্গত গড়ভবানীপুর, পেঁড়ো-বসন্তপুর, দোগাছিয়া, রাজবলহাট প্রভৃতি গ্রামে ভুরশুটের ব্রাহ্মণ রাজাদের সম্বন্ধে অনেক রোমাঞ্চকর কাহিনী ও কিংবদন্তী লোকের মুখে মুখে আজও প্রচারিত হয়। তার মধ্যে 'রায়বাঘিনীর' কাহিনী এবং রাজবংশের প্রথম রাজা কৃষ্ণ রায়ের ভ্রাতা 'কালাপাহাড়ের' কাহিনী প্রধান। এই জেলার ইতিহাস-লেখকরা সকলেই প্রায় এই সব কাহিনী ও কিংবদন্তীর চোরাবালির উপর ভুরশুটের ব্রাহ্মণরাজাদের এক বিচিত্র 'ইতিহাসের' সৌধ রচনা করেছেন। রাজবংশের বিভিন্ন শাখার নির্ভরযোগ্য বংশলতা, ভূমিদানপত্র বা তায়দাদাদির কষ্টিপাথরে এই সব কাহিনী তাঁরা যাচাই করে দেখেননি যে তার মধ্যে আসল ঐতিহাসিক সত্য কতখানি আছে। তার ফলে মনোরম রূপকথাই রচিত হয়েছে বেশি, ইতিহাস লেখা হয়নি।

প্রাচীন ভুরশুট রাজ্যের অংশবিশেষ চতুর্দশ-পঞ্চদশ খৃস্টাব্দে কোন ধীবর-রাজার অধীন ছিল। হাওড়া ও হুগলী জেলার এই সব অঞ্চলে এই ধীবর রাজার অনেক কাহিনী আমরা শুনেছি। কোন জীর্ণ ইঁটের স্তম্ভ বা স্তূপের দিকে চেয়ে আজও স্থানীয় লোকেরা বলেন, এগুলি ধীবররাজার স্মৃতিচিহ্ন। এছাড়া আর কোন চিহ্ন অবশ্য ইতিহাসের পৃষ্ঠায় নেই। দামোদরের লুপ্ত পৌরুষের কথা এবং তারই তীরে তীরে স্বাভাবিক ধীবরপ্রধান বসতির কথা মনে করলেই, কোন ধীবর দলপতির আঞ্চলিক আধিপত্য বিস্তারের কথা কল্পনা বলে মনে হয় না। আমতা থানায় আজও তাদের প্রাধান্য বজায় আছে এবং স্থানীয় গ্রাম্য উৎসবপার্বণ ও লোকধর্মের নানা অনুষ্ঠানের মধ্যে তার প্রভাব ও প্রমাণও রয়েছে যথেষ্ট। তার মধ্যে প্রধান হল ধর্মরাজ-ঠাকুরের পূজা।

শেষ ধীবর-রাজা শনিভাঙ্গড়কে পরাজিত করে গড়ভবানীপুর-বাসী চতুরানন নিয়োগী (মহানেউকী) ভুরশুট রাজ্য দখল করেন। চতুরাননের দৌহিত্র ফুলিয়ার মুখটিবংশীয় কৃষ্ণ রায় হলেন ভুরশুট রাজ্যের প্রথম ব্রাহ্মণরাজা। এই ঘটনা কোন্ সময় ঘটে দেখা যাক। সম্প্রতি ভুরশুট পরগণার অনেক তায়দাদ

পরীক্ষা করা হয়েছে।[১] তার মধ্যে রাজা প্রতাপনারায়ণের পূর্বকালীন ভূমিদানের বিষয়ও উল্লিখিত আছে। তায়দাদে দেখা যায়—"১২০৯ সালের ২০শে ফাল্গুন (১৮০৩ খৃঃ) সাদক মহামুদ দীগর 'সাং বোডহন', তাদের নিষ্কর সম্পত্তির বিবরণ দান করেন (হুগলী কালেক্টরীর ৮৩৫৪ নং তায়দাদ)। তার মধ্যে 'খেত্ররাত ভাঙ্গা বাস্তবাটী' মৌজে বোডহন ৬/০ বিঘা তাঁদের পূর্বপুরুষ সেখ দৌলতকে দান করেছিলেন 'রাজা রায় কৃষ্ট'।" দানপত্রের তারিখ পরিষ্কার লেখা আছে ৯৯০ সাল, অর্থাৎ ১৫৮৩-৮৪ খৃস্টাব্দ। সুতরাং ভুরশুট ব্রাহ্মণ-বংশের প্রথম রাজা কৃষ্ণ রায় ১৫৮৩-৮৪ খৃস্টাব্দে ভুরশুটে যে রাজত্ব করছিলেন তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। ইতিহাসের দিক থেকে সময়টা হল আকবর বাদশাহের রাজত্বকাল। সুতরাং রাজা প্রতাপনারায়ণের মাতা 'রায়বাঘিনী' পাঠান আমলে যুদ্ধবিগ্রহ করেছিলেন, অথবা কৃষ্ণ রায়ের ভ্রাতার পৌত্র রাজীবই ছিলেন কালাপাহাড়—এসব বাস্তব ইতিহাস নয়। তবে রায়বাঘিনীর কাহিনীর যে ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই তা নয়। নিছক মিথ্যা কোন কল্পনাকে আশ্রয় করে কোন কিংবদন্তী এরকম লোকপ্রিয়তা অর্জন করতে পারে না। মনে হয়, আকবর বাদশাহের রাজত্বের শেষভাগে মোগল-পাঠান সংঘর্ষের কালে ভুরশুটের ব্রাহ্মণ রাজা রায়বংশীয় কোন বীরাঙ্গনা অপূর্ব রণকৌশল দেখান রাজ্যরক্ষার্থে। কে সেই বীরাঙ্গনা তা সঠিকভাবে বলা যায় না। তিনি রাজা কৃষ্ণ রায়ের পুত্রবধূ (দর্পনারায়ণের পত্নী), অথবা তাঁর পৌত্র উদয়নারায়ণের পত্নী (প্রতাপনারায়ণের মাতা) হতে পারেন। ব্রাহ্মণ-বংশের রাজবধূর এই অপূর্ব বীরত্বের কথা যখন স্থানীয় লোকচিত্তের কল্পনার মাধুর্যে লোকগাথায় পরিণত হয়েছে, তখন স্বভাবতঃই ঐতিহাসিক কালের নোঙরটি গেছে ছিঁড়ে। নোঙরহীন লোককল্পনার তরী ইতিহাসের বন্দর ছেড়ে অনেক দূরে ভেসে গেছে।

ভুরশুট রাজবংশের যতগুলি বংশলতার পুঁথি পাওয়া গেছে (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের, সাহিত্য পরিষদের, যশোহর জয়ন্তীপুরের, বসন্তপুরের ইত্যাদি) তার মধ্যে একমাত্র ঢাকার পুঁথি ছাড়া সর্বত্র এই রাজবংশ ফুলিয়ার মুখবংশীয় সৌরিপ্রকরণের অন্তর্গত বলে বর্ণনা করা হয়েছে। মদনের

১ শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য: প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৪৯, সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১৩৪৮, ৪র্থ সংখ্যা।

বৃদ্ধ প্রপৌত্র রাজা কৃষ্ণ রায় হলেন মহাকবি কৃত্তিবাসের অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ। কৃত্তিবাসের জন্ম যদি ১৩৫২ খৃস্টাব্দে হয় এবং মোটামুটি তিনপুরুষে এক শতাব্দী ধরা যায়, তাহলে কৃষ্ণ রায়ের জন্ম হয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম বা দ্বিতীয় পাদে। এই সময় কৃষ্ণ রায়ের মাতামহ চতুরানন নিউগী ভুরশুট রাজ্য দখল করে আধিপত্য বিস্তার করেন। মনে হয় শের শাহের রাজত্ব-কালে চতুরাননের অভ্যুদয় হয়।

ভুরশুট রাজবংশের সবচেয়ে কীর্তিমান পুরুষ ছিলেন রাজা প্রতাপনারায়ণ। অধুনা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে, প্রতাপনারায়ণ রাজা কৃষ্ণ রায়ের প্রপৌত্র ছিলেন। তিনি বহু ভূমি দান করেছিলেন এবং সেই সব দানপত্র থেকে ১০৫৯ সন (১৬৫২ খৃঃ), ১০৭৫ সন, ১০৭৭ সন, ১০৯১ সন ইত্যাদি তারিখ পাওয়া যায়। তাতে মনে হয়, প্রতাপনারায়ণের রাজত্বকাল কমপক্ষে ১৬৫২ খৃস্টাব্দ থেকে ১৬৮৪ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত। অর্থাৎ সম্রাট সাজাহান ও ঔরঙ্গজীবের অধীন 'রাজা' উপাধিধারী ভুরশুটের জমিদার ছিলেন প্রতাপনারায়ণ। বিদ্যোৎসাহী রাজা বলে তাঁর যথেষ্ট খ্যাতিও ছিল। তাঁর অন্যতম সভাসদ্ সুবিখ্যাত বৈদ্যগ্রন্থকার ভরত মল্লিক তাঁকে চিরস্মরণীয় করে রেখে গেছেন। 'চন্দ্রপ্রভা' (১৫৯৭ শক) ও 'রত্নপ্রভা' (আঃ ১৬৮০ খৃঃ) গ্রন্থে ভরত মল্লিক আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে বলেছেন—

ভূরিশ্রেষ্ঠ-মহীপাল-সভাপণ্ডিত-বিশ্রুতঃ।

অন্যত্র তিনি প্রতাপনারায়ণের কথাও লিখেছেন—

ইতি প্রজাধীশ্বর-ধীরবীর-প্রতাপনারায়ণ-সংসদস্থঃ।

প্রতাপনারায়ণের একমাত্র পুত্রের নাম শিবনারায়ণ। শিবনারায়ণের একমাত্র পুত্র নরনারায়ণ। নরনারায়ণের রাজত্বকাল ১০৯২-১১১৮ সনের মধ্যে পড়ে। হয় তাঁর জীবদ্দশায়, না হয় তাঁর মৃত্যুর ঠিক পরেই, ১১১৯ সনে বর্ধমানরাজ কীর্তিচন্দ্র বলপূর্বক ভুরশুট পরগণা দখল করেন। তারিখটি গড় ভবানীপুরের দেবোত্তর সম্পত্তির বিবরণের মধ্যে পাওয়া গেছে। ৪৮০৭৫নং তায়দাদে উল্লেখ আছে :

"বর্ধমানের জমিদারের সহিত সাবেক ব্রাহ্মণ জমিদারের সহিত লড়াই হয় ইহাতে গড়বাটি লুট হয় সনন্দপত্র খোয়া গেছে সন ১১১৯ সাল।"

আরও একস্থানে লেখা আছে :

"...লড়াই হইয়া সাবেক জমিদারের জমিদারি বর্ধমান চাকলা সামীল হয় তাহাতে শ্রীশ্রী৺দেগে বর্ধমান লইয়া জাইয়া কথক দীন সেইখানে সেবা করিয়া পুনরায় সন (১১২৫) পঁচিষ শালে ঐ জমি এবং গড়বাড়ি শ্রীশ্রীজিউদীগে দীয়া স্থাপিত করিলেন।"

রাজ্যচ্যুত রাজবংশের পরবর্তী বিবরণ শোচনীয় হওয়াই স্বাভাবিক। নরনারায়ণের দুই পুত্র রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ ও হীরারাম রায়। কীর্তিচন্দ্রের পুত্র চিত্রসেন (গড় ভবানীপুরের পাশে চিত্রসেনপুর এঁরই নামে হয়েছে) বহু দেবোত্তর ও ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি লক্ষ্মীনারায়ণকে দান করেন এবং বাঁশবেড়িয়ার রাজারা হীরারামকে বোরো পরগণায় ব্রহ্মোত্তর দেন। লক্ষ্মীনারায়ণের পুত্ররা গড় ভবানীপুর ছেড়ে পেঁড়ো-বসন্তপুর গ্রামে বাস স্থাপন করেন। তাঁদের প্রদত্ত সম্পত্তির বিবরণে (৩৬৬১৩নং তায়দাদ) ভুরশুট রাজবংশের প্রতিপত্তির আভাস পাওয়া যায়। তায়দাদে দেখা যায়, দেবোত্তর ও ব্রহ্মোত্তর মোট ভূমির পরিমাণ ১১৪৬৷৪ কাঠা—তার মধ্যে—

"ভবানীপুর ভদ্রাসন গড়বাটি আন্দাজী ২৫ তোষাখানার বাটি ৫ হাওনাপুর আন্দাজী ৫১ রাজিবাজার ভদ্রাসন বাটি আন্দাজী ১২...রাজবলহাট গড়বাটি ৭। নানাস্থানে দীর্ঘ পুষ্করিণীর সংখ্যা ২৬। দেবোত্তর শ্রীশ্রী৺সিদ্দেশ্বরী ঠাকুরাণী, মৌজে রাজিবাজার আন্দাজী জমি ২০০ ৺রাজবল্লবী ঠাকুরাণী মৌজাহায়ে রাজবলহাট ৫০০ ৺গোপীনাথ জীউ ভবানীপুর দীগর আন্দাজী ১০০—৮০০।"

ভুরশুটে তিনটি প্রধান গড় ছিল, তার মধ্যে গড় ভবানীপুর সবচেয়ে প্রাচীন এবং রাজবংশের প্রধান শাখার অধিকারে ছিল। ভদ্রাসন বাড়ি বা তোষাখানা ইত্যাদির কোন চিহ্ন নেই। এমন কি, সিংহগড়ের 'সিংহ' গিয়েছে, পড়ে আছে শুধু গড় যে, সেই গড় পর্যন্ত নেই, বুজে গেছে। প্রাচীন রাজৈশ্বর্যের একমাত্র সাক্ষীরূপে গড় ভবানীপুরে বিশাল দোতালা ইটের মন্দিরটি আছে। তাও একেবারে জীর্ণ ইটের স্তূপে পরিণত হয়েছে এবং আগাছায় ঢেকে গেছে সব। এত বড় ইটের মন্দির এবং এরকম দোতালা গড়ন, বিরল।

গড় ভবানীপুরের দেবোত্তর সম্পত্তির পূর্বোক্ত বিবরণের মধ্যে (৪৮০৭৫নং তায়দাদ) এই দেবালয়ের একটি কৌতুকজনক নক্শা আছে। তার মধ্যে

কোন্ দেবতা কোন্ কোঠায় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তাও এঁকে দেখানো আছে। দেবতাদের তালিকা এই :

> একতলায় চতুর্ভুজ গণেশ, দ্বিভুজা ইন্দ্রাণী, দ্বিভুজা অভয়া, চতুর্ভুজা সিংহবাহিনী, দশভুজা, দ্বিভুজা ভৈরবী, চতুর্ভুজা ভুবনেশ্বরী, চতুর্ভুজা গজলক্ষ্মী। দোতলায় গঙ্গাধর শিব, গোপাল, গোপীনাথ, দামোদর (চক্র), রাধিকা ও কাশীনাথ শিব। সবই "মহারাজা প্রতাপনারায়ণ ও মহারাজা নরনারায়ণ রায় প্রকাশ করিয়া দেন।"

এই বিগ্রহগুলি কোথায় গেল এবং কিভাবে গেল, এখন তার কোন খোঁজ পাওয়া যায় না। মনে হয়, বর্ধমানরাজ কীর্তিচন্দ্র যখন ভুরশুট দখল করে-ছিলেন, গড়বাড়ি যখন লুট হয়েছিল, সনদ তায়দাদ যখন খোয়া গিয়েছিল, তখন বিগ্রহগুলিও স্থানান্তরিত হয়েছিল। এখন গড় ভবানীপুরের এই জীর্ণ মন্দিরটির দিকে চেয়ে শুধু তার পরিকল্পনার মহত্ত্বের কথা মনে হয়। দেবতাদের তালিকা ও বিভিন্ন কোঠায় প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা থেকে মনে হয়, শৈব শাক্ত গাণপত্য বৈষ্ণব প্রভৃতি সর্বধর্মের সমন্বয়ের প্রতীকরূপে ভুরশুটের ব্রাহ্মণরাজা এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এরকম অভিনব ও উদার আদর্শের এত সুন্দর স্থাপত্য-রূপায়ণ আর কোথাও চোখে পড়েনি।

ভুরশুট রাজ্যের দ্বিতীয় গড় পাণ্ডুয়া বা পেঁড়ো গ্রামে। পেঁড়ো-বসন্তপুর বলে পরিচিত। রাজা কৃষ্ণ রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র বসন্ত রায়ের নামেই বসন্তপুর। রাজবংশের একটি কনিষ্ঠ শাখা এইখানে বাস স্থাপন করেন এবং সেই শাখাতেই কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের জন্ম। ভুরশুটের তৃতীয় গড় 'দোগাছিয়া' অন্য এক কনিষ্ঠ শাখার অধিকারে ছিল। কৃষ্ণ রায়ের তৃতীয় পুত্র মুকুট রায় এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা।

তারকেশ্বরের ইতিহাস-প্রসঙ্গে গড় ভবানীপুরের শৈব মঠ প্রতিষ্ঠার কথা বলেছি। গড় ভবানীপুরের মণিনাথ শিবমন্দির ও মঠ তারকেশ্বর মঠের সম-সাময়িককালে প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরের গায়ে যে ১৩০৬ শকাব্দ (১৩৮৪ খৃস্টাব্দ) খোদিত আছে, তা নিঃসন্দেহে ভুল। মন্দির সংস্কারের সময় মিস্ত্রীদের ভুলও হতে পারে। পাঁচ-ছশ বছরের পুরাতন ইঁটের মন্দিরের এরকম অস্তিত্ব বাংলাদেশে নেই। তা ছাড়া তারকেশ্বর মঠের সঙ্গে যখন গড় ভবানীপুরের শৈব মঠের সম্পর্ক প্রত্যক্ষ এবং তারকেশ্বর মঠের প্রতিষ্ঠা অষ্টাদশ শতাব্দীর

আগে হয়নি, তখন মণিনাথ শিবমন্দির বা মঠও তার আগে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। এই মণিনাথজী-ই হলেন এখন গড় ভবানীপুরের প্রধান দেবতা। শ্রাবণ মাসের শেষ রবিবারে মণিনাথের বিশেষ উৎসব হয়।

গ্রাম্য দেবদেবীর মধ্যে মনসা শীতলা ইত্যাদি ছাড়া ধর্মঠাকুরের প্রতিপত্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গড় ভবানীপুরে ধর্মঠাকুরের উৎসবে পাশাপাশি একাধিক গ্রামের লোক যোগদান করেন। সেবায়েত মাহিষ্য এবং পূজারীও মাহিষ্য ব্রাহ্মণ। গড় ভবানীপুর মাহিষ্যপ্রধান গ্রাম। দামোদরের তীরে পাশের সোনাতলা গ্রামে দুটি ধর্মঠাকুর আছেন। একটির পূজারী ডোম পণ্ডিত, অন্যটির পূজারী 'ভাণ্ডারী' উপাধিধারী মাহিষ্য। ধর্মঠাকুরের এই প্রাধান্য হাওড়া জেলার এই অঞ্চলে, বিশেষ করে আমতা থানায় যথেষ্ট আছে দেখা যায়। ধর্মঠাকুরের সঙ্গে হাওড়া-হুগলী জেলার এই অঞ্চলে চণ্ডীদেবীর বিশেষ প্রাধান্যও লক্ষণীয়।

প্রসঙ্গত আর-একটি বিষয়ও উল্লেখযোগ্য বলে মনে হয়। রায়বংশের বীরাঙ্গনা তাঁর বীরত্বের জন্য লোকপ্রবাদে 'রায়বাঘিনী' বলে যথার্থই পরিচিত হয়েছেন। বাঘিনীর মতন বীরত্ব যাঁর এবং রায়কুলোদ্ভব যিনি, তিনি রায়বাঘিনী। কিন্তু একটি তায়দাদে দেখা যায় (৬১৪০৯নং তায়দাদ) বরদা পরগণা শ্যামসুন্দরপুর গ্রামে 'শ্রীশ্রীরায়-বাগিনী' নামে ধর্মঠাকুর প্রতিষ্ঠিত ছিল। ভুরশুট রাজবংশে 'দক্ষিণ রায়' নামেও একজন রাজা ছিলেন। জয়ন্তীপুরের পুঁথিমতে রাজা কৃষ্ণ রায়ের পুত্র রাজা দক্ষিণ রায়। দক্ষিণ-চব্বিশপরগণার বিখ্যাত ব্যাঘ্রদেবতার নাম 'দক্ষিণ রায়।' এই দক্ষিণ রায়ের সঙ্গে গাজীর যুদ্ধের কাহিনীটিও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। ভুরশুট রায়বংশে 'বসন্ত রায়' নামেও রাজা ছিলেন এবং বসন্ত রায় নামে দেবতা আছেন। রাজার প্রতিপত্তির সঙ্গে দেবতার প্রতিপত্তি কি ভাবে লোককল্পনায় মিলিত হয়ে দেবতারা প্রতাপশালী রাজাদের নামে পরিচিত হয়েছেন, রায়বাঘিনী, দক্ষিণ রায়, বসন্ত রায় ইত্যাদি নাম তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বলে মনে হয়।

রাজবলহাট

ভুরশুট রাজ্যের প্রধান গড় 'গড় ভবানীপুর' প্রসঙ্গে রাজবলহাটের উল্লেখ করেছি। রাজবলহাট বর্তমানে হুগলী জেলার অন্তর্গত। হাওড়া ও হুগলী জেলার অনেকটা অঞ্চল জুড়ে প্রাচীন ভুরশুট রাজ্য ও পরগণা বিস্তৃত ছিল। 'আইন-ই-আকবরী'তে পাওয়া যায়, সরকার সোলেমানাবাদের অন্তর্গত ৩১টি মহালের মধ্যে সবচেয়ে বেশি রাজস্ব ছিল 'বসন্ধরী' পরগণার। তারপরেই ছিল ভুরশুটের, প্রায় বিশ লক্ষ 'দাম'। সরকার সাতগাঁও বা সরকার মাদারনে কোন পরগণার এত বেশি রাজস্ব ছিল না। ভুরশুট রাজ্য ও পরগণার আয়তন যে কত বড় ছিল তা এই রাজস্বের পরিমাণ থেকে অনুমান করা যায়। রাজবলহাট ছিল ভুরশুটের মধ্যে। ভুরশুট রাজবংশের বসন্তপুর শাখার সম্পত্তির বিবরণে দেখা যায় যে রাজবলহাটেও প্রায় সাত বিঘা ভূমির উপর তাঁদের গড়বাটি ছিল এবং রাজবল্লভী ঠাকুরানীর নামে দেবোত্তর সম্পত্তি ছিল পাঁচশ বিঘা। রাজার গড়বাড়ির এখন কোন চিহ্ন নেই রাজবলহাটে।

রাজবল্লভী দেবী সম্বন্ধে প্রচলিত কিংবদন্তী যা আছে তার মধ্যে বণিকের সপ্তডিঙার কিংবদন্তীটি উল্লেখযোগ্য। দেবীর বৃদ্ধ পুরোহিত অসুস্থ অবস্থায় বিছানায় শুয়ে শুয়ে কিংবদন্তীটি আমাদের বলেছিলেন। গরীব ব্রাহ্মণকন্যার বেশে রাজবল্লভী দেবী কোন পরিবারের দাসীর কাজ করতেন। পাশের নদীপথে তখন সদাগরদের বাণিজ্যের ডিঙা যাতায়াত করত। রূপবতী ব্রাহ্মণকন্যাকে ঘাটে দেখে বণিক সেই ঘাটে ডিঙা বাঁধেন এবং অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে সেই ব্রাহ্মণকন্যাকে নিজের বজরায় নিয়ে আসার সঙ্কল্প করেন। ব্রাহ্মণকন্যা যখন একটির পর একটি ডিঙায় পা দিয়ে বণিকের বজরার দিকে যাচ্ছিলেন তখন ডিঙাগুলি একে-একে নদীগর্ভে পণ্যের পসরাসহ ডুবে যাচ্ছিল। ছয়টি ডিঙা এইভাবে ডুবে যাবার পর সপ্তম ডিঙার (অর্থাৎ বণিকের নিজস্ব ডিঙা) দিকে যখন ব্রাহ্মণকন্যা পা বাড়িয়ে দেন, তখন অনুতপ্ত বণিক তাঁর পা জড়িয়ে ধরে ক্ষমাপ্রার্থনা করেন এবং দেবী বলে চিনতে পারেন। তারপর দেবীর প্রতিষ্ঠা ও পূজার প্রবর্তন করেন তিনি রাজবলহাট গ্রামে।

কিংবদন্তীর মধ্যে সেকালের সদাগরদের সামাজিক প্রতিপত্তি ও দৌরাত্ম্যের ইঙ্গিতটি উল্লেখযোগ্য। বাণিজ্যের যাত্রাপথে যেসব ঘাটে তাঁরা ডিঙা বাঁধতেন, সেখানকার গ্রামবাসীদের তার দাপট বেশ খানিকটা সহ্য করতে হত। কিংবদন্তীর মধ্যে দেবীর স্বীকৃতিটিও গুরুত্বপূর্ণ। বোঝা যায়, আর্যসংস্কৃতির প্রভাবপুষ্ট ধনিক সদাগরশ্রেণী গ্রাম্য দেবদেবীকে বিশেষ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখতেন না। চণ্ডীর কাহিনীর মধ্যে তারই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এই কাহিনীর মধ্যেও ঐ একই ইঙ্গিত রয়েছে। দেবী রাজবল্লভী চণ্ডীরই রূপান্তর। 'পীঠনির্ণয়' গ্রন্থে রাজবলহাটকে শাক্তপীঠ বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং পীঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম বলা হয়েছে 'চণ্ডী'। সদাগর যে দেবীর প্রতিষ্ঠা ও পূজা মেনে নিয়েছিলেন, তিনি বোধ হয় 'চণ্ডী'। কিংবদন্তীতে সেই কাহিনীই এই রূপ পেয়েছে। পরে দেবী চণ্ডী যখন রাজার পূজ্য ও প্রিয় দেবী হন, অর্থাৎ ভুরশুটের রাজবংশের পোষকতা লাভ করেন, তখন 'রাজবল্লভী' হয় তাঁর নাম। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল, কিংবদন্তীটি আজও দেবীর পূজানুষ্ঠানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে রয়েছে। আজও অষ্টমী পূজার আগে সাতটি ছোট ছোট ডিঙা তৈরি করা হয় এবং তার মধ্যে ছয়টি ডিঙা দেবীর মন্দির-সংলগ্ন পুকুরে ডুবিয়ে দেওয়া হয়। পূজা আরম্ভ হয় তারপরে। এই অনুষ্ঠানটি দীর্ঘকাল ধরে চলে আসছে। প্রসঙ্গত হাওড়া-হুগলী জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে, প্রধানত দামোদর ও অন্যান্য নদীর তীরবর্তী বহু সমৃদ্ধ গ্রামে (যেমন মাকড়দহ, আমতা, জয়পুর-ঝিকরা, রসপুর) চণ্ডীর প্রতিপত্তির কথা মনে পড়ে। সেই সঙ্গে কিংবদন্তীগুলিও দেখা যায়, সদাগরশ্রেণীর সঙ্গে জড়িত। চণ্ডী হয়ত অনার্য দেবী ছিলেন। পরে সাধারণ লোকসমাজে তিনি পূজ্য হয়েছেন, সুদীর্ঘ সংস্কৃতিসংঘাতের ভিতর দিয়ে। মঙ্গলকাব্যের কাহিনীতে তারই আভাস আছে। পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে গ্রামে তারই পরিচয় পাওয়া যায় এই জাতীয় কিংবদন্তীর মধ্যে।

রাজবলহাটের সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়, গ্রামের সুবিন্যস্ত পথঘাট, ঘরবাড়ি ও দেবালয়ের মধ্যে। গ্রামের সঙ্গতিপন্ন যাঁরা, তাঁরা অনেকেই সুন্দর সুন্দর দেবালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং তার মধ্যে কয়েকটি বেশ প্রাচীন দেবালয়ও আছে। রাধাকান্ত জীউর মন্দির ১৬৬৬ শকাব্দে তৈরি। সুদৃশ্য

বাংলা মন্দির, চমৎকার কারুকর্মযুক্ত। দুঃখের বিষয়, কয়েকটি মন্দির সংস্কার করবার সময় প্লাষ্টার করে এমনভাবে চূণকাম করে দেওয়া হয়েছে যে, মন্দিরের পোড়ামাটির সমস্ত সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে গেছে। এ রকম 'ভয়াবহ' দৃশ্য (ভয়াবহই বলা উচিত) আরও অনেক গ্রামে দেখেছি। রাধাকান্ত দেবের মন্দির-প্রাঙ্গণে আরও কয়েকটি চমৎকার দেবালয় ছিল, এখন ভগ্নস্তূপে পরিণত হয়েছে। সবই প্রায় অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে তৈরি। গ্রামের মধ্যে শ্রীধর ও দামোদর মন্দিরটিও তাই। একই সময়ে দশ পনের বছর আগে ও পরে সব তৈরি। বোঝা যায়, রাজবলহাটের বাণিজ্য ও শিল্প-সমৃদ্ধির ইতিহাসও প্রাচীন। অন্তত দু-শ আড়াই-শ বছর আগেও যে রাজবলহাট শিল্পবাণিজ্যের দিক থেকে যথেষ্ট সমৃদ্ধ গ্রাম ছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। সেইজন্যই কোম্পানীর আমলে বিদেশী বণিকরা রাজবলহাটে একটি বাণিজ্যের কুঠি তৈরি করেছিলেন। পরে হরিপালে কুঠি স্থানান্তরিত হয়েছিল।

রাজবলহাটের মধ্যে ও তার আশে-পাশে ধর্মঠাকুরের যে রীতিমত প্রতিপত্তি ছিল এক সময়, তা আজও বোঝা যায়। স্থানীয় প্রবাদ, এ-অঞ্চলে একজন 'বাগ্দী' রাজা ছিলেন। গড় ভবানীপুর প্রসঙ্গে এই রাজার রাজ্যচ্যুতির কথা বলেছি। সেই 'বাগ্দী' রাজা নাকি বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন। কিন্তু তার প্রমাণ কিছু নেই কোথাও। থাকবেই বা কিসে? তবে উল্লেখযোগ্য হল, রাজবল্লভী দেবীর সামনে দেবীর নিজের ঘট ছাড়া আরও চারটি ঘট আছে। একটি বাসুদেবের, একটি ভগবতীর, একটি লক্ষ্মীর, আর একটি নীলসরস্বতীর (তারা)। নীলসরস্বতীর ঘট কোথা থেকে এল এবং কেন এল? বৌদ্ধ দেবী ঘটে পূজিত হচ্ছেন। 'বাগ্দী' রাজার রাজ্যে ধর্মঠাকুরের প্রতিপত্তির যৌক্তিকতাও বোঝা যায়। রাজবলহাট গ্রামের মধ্যে ধর্মঠাকুরের যে আস্তানা আছে তাতে একাধিক ধর্মরাজ এখন বিরাজ করছেন। নানা স্থানে নিয়মিত পূজা ও পূজারীর অভাবে সকলে একত্রে জড়ো হয়েছেন। চাঁদ রায়, দলু রায়, শ্যাম রায়, কাল রায় ইত্যাদি। নাথযোগীরাও এখানে ধর্মঠাকুরের পূজা করতেন। প্রাচীন ভুরশুট রাজ্যের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে এককালে ধর্মঠাকুরের বেশ প্রাধান্য ছিল মনে হয়। আজও তার প্রচুর নিদর্শন সর্বত্র ছড়িয়ে আছে।

রাজবলহাটের 'অমূল্য প্রত্নশালাটি' একটি ভাল প্রতিষ্ঠান। সাধারণত গ্রামাঞ্চলে মিউজিয়ম প্রতিষ্ঠার এরকম উদ্‌যোগ দেখা যায় না। প্রাচীন ইতিহাস-অনুরাগী সুপণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের স্মৃতিরক্ষার্থে এই প্রত্নশালা ১৯৪১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। সম্পাদক শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রথম থেকেই এর দায়িত্ব নিয়ে আছেন, কিন্তু মিউজিয়ম কখনও একলার চেষ্টায় হয় না। চেষ্টা করলে এই প্রত্নশালাটি দক্ষিণরাঢ়ের ঐতিহাসিক নিদর্শনাদির একটি ভাল সংগ্রহশালা হতে পারে।

রাজবলহাটের সংলগ্ন ছোট গ্রাম গুলিটা। গুলিটা-রাজবলহাট কথায় বলে। এই গুলিটা গ্রামই কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মস্থান। ১৮৩৮ সালের ১৭ই এপ্রিল তারিখে গুলিটা গ্রামে মাতামহের গৃহে হেমচন্দ্রের জন্ম হয়। হেমচন্দ্রের শৈশব রাজবলহাটেই কাটে। রাজবলহাটেরই গ্রাম্য পাঠশালায় তাঁর বিদ্যারম্ভ হয় এবং নবছর বয়সে তিনি কলকাতার খিদিরপুর অঞ্চলে চলে আসেন। খিদিরপুর থেকে তিনি ইংরেজী শিক্ষা আরম্ভ করে, পরে হিন্দু কলেজের সিনিয়র স্কুল বিভাগে ভর্তি হন। কর্মজীবনে হেমচন্দ্র মুন্সেফী ও হাইকোর্টে ওকালতি করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। ১৮৯০ সালে হেমচন্দ্র হাইকোর্টের প্রধান সরকারী উকিল নিযুক্ত হন। ছাত্রজীবন থেকেই হেমচন্দ্রের কাব্যপ্রীতি ছিল এবং ১৮৬১ সালে তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'চিন্তাতরঙ্গিনী' প্রকাশিত হয়। তখন তিনি সবে হাইকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করেছেন। এই সময় মাইকেল মধুসূদনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। রাজনারায়ণ বসুকে একটি পত্রে মধুসূদন লিখেছিলেন :

> Meghnad is going through a second edition with notes, and a real B.A. has written a long critical preface.

এই "রিয়েল বি-এ" 'ক্রিটিক' হলেন হেমচন্দ্র। তিনি 'মেঘনাদবধ কাব্যের' দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন। পরে হেমচন্দ্র বহু কবিতা, নাটক, নিবন্ধ ও হাস্যব্যঙ্গরসাত্মক কাব্যাদি রচনা করে যশস্বী হন। হাস্যরসের কবিতা লিখতেও হেমচন্দ্র সিদ্ধহস্ত ছিলেন। 'অমৃতবাজার পত্রিকার' প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম সম্পাদক শিশিরকুমারের সঙ্গে হেমচন্দ্রের পরিচয় হয় এবং মনে হয় শিশিরকুমারের অনুরোধেই তিনি উক্ত পত্রিকায় 'খিদিরপুর দাঁতভাঙা কাব্য' নামে একটি কবিতা লেখেন।

ভোটবাগান

তিব্বতী ভুটিয়া প্রভৃতিদের কথ্যভাষায় বলা হয় 'ভোট'। কলকাতা শহরের অপর তীরে হাওড়ায় ভোটদের বাগান হল কেমন করে? হিমালয়ের দেশ থেকে ঘুসুড়ীর গঙ্গার তীরে ভোটদের এই মঠ-মন্দির স্থাপন করার কারণ কি? ভোটবাগান একটি মঠ এবং দশনামী শৈব সম্প্রদায়ের মঠ। তারকেশ্বরমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত যে ভোটবাগান, একথা তারকেশ্বর প্রসঙ্গে বলেছি। দশনামী শৈব সন্ন্যাসীদের সঙ্গে ভোটদের যোগাযোগ হল কেমন করে এবং কোন্ সময়? ভোটবাগান মঠে একজন দশনামী মোহান্ত কর্তৃত্ব পেলেন কেন? ভোটবাগান প্রসঙ্গে যে কোন কৌতূহলী পাঠকের মনে এই সব প্রশ্ন জাগবে। বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি রোমাঞ্চকর অধ্যায়ের সঙ্গে এই সব প্রশ্নের উত্তর জড়িত। এই রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চের প্রধান দু'জন নায়কের একজন ওয়ারেন হেস্টিংস, আর-একজন পুরাণ গিরি।

কলকাতা থেকে গঙ্গার বুকের উপর দিয়ে নৌকা বা স্টীমারে করে যেতে যেতে পশ্চিম তীরে ঘুসুড়ীর ঘাটে দূর থেকে অনেক মন্দির ও একটি অট্টালিকা দেখা যায়। এই বাড়ি ও মন্দিরগুলি নিয়েই ভোটবাগান মঠ। ঘুসুড়ীর ঘাটে নেমে ভোটবাগান যাওয়ার সুবিধা, তা না হলে হাওড়া থেকে বাসেও যাওয়া যায়। মঠের আসল বাড়িটি একটি উদ্যানের মধ্যে সন্নিবিষ্ট ছিল, এখনও বোঝা যায়। ভোটবাগান মঠ যখন স্থাপিত হয়েছিল, প্রায় পৌণে দু-শ বছর আগে, তখন স্থাপয়িতারা হাওড়ার এই কুৎসিত শিল্পনাগরিক রূপের কথা কল্পনা করেননি। নির্জন স্থানে গঙ্গার তীরে তাঁরা মঠ স্থাপন করেছিলেন ধর্মসাধনার জন্য এবং কলকাতা শহরের কাছে করেছিলেন, যাতে ধর্মের সঙ্গে অর্থকরী বাণিজ্যের যোগাযোগ রক্ষা করা যায়। বৃটিশ শাসক ও বণিক প্রতিনিধি ওয়ারেন হেস্টিংস ও উত্তরভারতীয় দূরদর্শী দশনামী সন্ন্যাসী পুরাণ গিরির সম্মিলিত দৃষ্টি এই স্থানটির উপর একসময় পড়েছিল বলে, এর ঐতিহাসিক মাহাত্ম্য আজও উল্লেখযোগ্য। কেন পড়েছিল, সেই কাহিনীই বলছি।

মঠের বাড়িটি চতুষ্কোণাকার, মধ্যে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে ফুলবাগান। সিংদরজা দিয়ে ঢুকতেই সামনে মন্দির বা দেবগৃহ দেখা যায়। বামদিকের দ্বিতল গৃহে

মোহান্ত মহারাজ অবস্থান করেন। স্থপতিবিদ্‌রা বলেন, গৃহনির্মাণের রীতির মধ্যে ভোট বা তিব্বতী প্রভাবের চিহ্ন একসময় স্পষ্ট ছিল, ক্রমে সংস্কারের জন্য আজ তা প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে। আমরা তা দেখতে পাইনি। মঠে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত মন্দিরাকৃতি একাধিক সমাধি আছে, মৃত মোহান্তদের সমাধি। তার মধ্যে একটি সমাধিস্তম্ভের গায়ে অশুদ্ধ বাংলায় একটি লিপি খোদাই করা আছে। লিপির মর্ম এই : প্রধান মুক্তিয়ারকার ও চেলা দলজিৎ গিরি মোহান্ত মহাদেব প্রতিষ্ঠা করেছেন পুরাণ গিরি মোহান্তের সমাধির উপর। হিন্দু মুসলমান ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের এই বলে অনুশাসন জারী করা হয়েছে যে, তাঁরা যদি এই সমাধি-মন্দির ও শিবলিঙ্গের উপাসনা না করেন, তাহলে নরকে যাবেন। লিপির তারিখ হল সম্বৎ ১৮৫২, শকাব্দ ১৭১৭, বঙ্গাব্দ ১২০২, ২৩শে বৈশাখ। গণনায় ইংরেজী ১৭৯৫ সালের মে মাস হয়।

কে এই পুরাণ গিরি গোঁসাই বা মোহান্ত, যাঁর চেলা তাঁকে সর্বধর্মসম্প্রদায়ের উপাস্য বলে অনুশাসন জারী করেছেন? ৺অক্ষয়কুমার দত্ত তাঁর 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে, দশনামীদের প্রসঙ্গে যে 'পুরাণপুরির' কথা বলেছেন (বইয়ের মধ্যে পুরাণপুরির একটি ছবিও আছে), তিনিই এই পুরাণগিরি। কিন্তু 'পুরি' শৃঙ্গগিরি মঠভুক্ত এবং 'গিরি' জ্যোসী মঠভুক্ত দশনামী। ভোটবাগানের দলিলপত্রে পুরাণ গির বা গিরি বলেই উল্লেখ আছে, 'পুরী' নয়। দত্ত মহাশয়, মনে হয়, গিরি ও পুরীর মধ্যে গণ্ডগোল করেছেন। 'পুরাণপুরির' যে জীবনবৃত্তান্ত তিনি দিয়েছেন তা 'এশিয়াটিক রিসার্চেস' পঞ্চম খণ্ড থেকে সংগৃহীত। তাতে দেখা যায়, পুরাণ গিরি কান্যকুব্জনিবাসী। ১৭৫২-৫৩ খৃস্টাব্দে, নয় বছর বয়সে তিনি গৃহত্যাগী হয়ে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করেন এবং তারপর বহু দেশ পর্যটন করেন। শোনা যায়, তিনি নাকি রুশিয়ার মস্কৌ নগর পর্যন্ত গিয়েছিলেন। অক্ষয়কুমার লিখেছেন, "আমাদের এই ঊর্ধ্ব-বাহু ঠাকুরটি অনুগ্রহ করিয়া দুই একবার রাজকার্যও করিয়া দিয়াছেন। তিনি যে সময় ভোট দেশের রাজধানীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সে সময় তথাকার রাজপুরুষেরা তাঁহার দ্বারা গভর্ণর-জেনেরল হেষ্টিংসের সমীপে রাজকার্য-সংক্রান্ত কতকগুলি কাগজপত্র প্রেরণ করেন…" (পৃঃ ৩৭)। এই উক্তি থেকেই বোঝা যায়, অক্ষয়কুমারের 'পুরাণপুরি' হলেন ভোটবাগান মঠের স্থাপয়িতা বিশ্রুত পুরাণ গিরি।

ভোটবাগান মঠ-স্থাপনের ইতিহাস সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য উদ্ধার করেন ৺গৌরদাস বসাক, প্রায় ৬০।৭০ বছর আগে এবং তাঁর বিবরণ প্রকাশিত হয় বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে, ১৮৯০ সালে (প্রথম খণ্ড)। তখন ওমরাও গিরি গোঁসাই ভোটবাগান মঠের মোহান্ত ছিলেন। তিনি বসাক মহাশয়কে এশিয়াটিক সোসাইটিতে সংরক্ষণের জন্য দুখানি দুষ্প্রাপ্য তিব্বতী পাণ্ডুলিপি উপহার দেন এবং মঠসংক্রান্ত চারখানি ফার্সী সনদ দেখান। পুরাণ গিরির নামে একখানি তিব্বতী ছাড়পত্র ছিল, সেটিও বসাক মহাশয় দেখেন।

চারখানি সনদের মধ্যে একখানি সনদে গঙ্গাতীরে ১০০ বিঘা ও ৮ কাঠা জমি দানের কথা আছে। গ্রহীতা হলেন পুরাণ গিরি গোঁসাই। জমি হল মৌজা বারবকপুর পরগণা বোরোতে এবং মৌজা ঘুসুড়ী, পরগণা পাইকানে. মঠ মন্দির ও উদ্যান রচনার জন্য জমি দান করা হয়। আর একটি সনদে ৫০ বিঘা জমি দানের কথা আছে। এই পঞ্চাশ বিঘা মহারাজা নবকৃষ্ণ, রাজচন্দ্র রায় ও রাজা রামলোচনের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। নবকৃষ্ণ শোভাবাজারের রাজা এবং রায়েরা আন্দুল রাজবংশের। মুৎসদ্দী, চৌধুরী, কানুনগো, তালুকদার প্রভৃতিদের উদ্দেশে সনদের নির্দেশ জারী করা হয়েছে। ১ নং সনদের তারিখ বাংলা ১১৮৫ সন, ১লা আষাঢ়; ইংরেজী ১২ই জুন ১৭৭৮ সাল। ২ নং সনদের তারিখ বাংলা ১১৮৯ সন, ২রা ফাল্গুন; ইংরেজী ১৭৮২ সাল, ১১ই ফেব্রুয়ারী। ৩ নং ও ৪ নং সনদের তারিখ এক এবং জমির পরিমাণও এক দেখা যায়, মনে হয় প্রথম দুটি সনদের নকল। কিন্তু উল্লেখযোগ্য হল ৩ ও ৪ নং সনদে গ্রহীতার নাম আছে—লামা পাঞ্চন অরদানি বাকৃদেও পাঞ্চন। শীলমোহরের ছাপও ভিন্ন। ৩ নং ও ৪ নং সনদে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শীল আছে, দেওয়ান হিসাবে। দুটি সনদেই ওয়ারেন হেস্টিংসের স্বাক্ষর আছে।

সনদগুলি থেকে ভোটবাগান মঠের রহস্যাবৃত ইতিহাস অনেকটা পরিষ্কার হয়ে যায়। এইটুকু বোঝা যায় যে, ১৭৭৮ ও ১৭৮২ সালে, পুরাণ গিরি গোঁসাই ও পাঞ্চন লামা উভয়েই গঙ্গাতীরে প্রায় ১৫০ বিঘা আন্দাজ জমি পান, বর্তমান ভোটবাগান অঞ্চলে, মঠ ও মন্দির উদ্যানসহ প্রতিষ্ঠার জন্য। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ানীর আমলে ওয়ারেন হেস্টিংস এই সনদে স্বাক্ষর করেন। এখন প্রশ্ন হল, তিব্বতী লামা, দশনামী পুরাণ গিরি ও

গবর্নর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস, এই ত্রয়ীর এরকম ঐতিহাসিক যোগাযোগ হল কেমন করে? ধর্মের প্রেরণায়, না বাণিজ্য ও রাজনীতির স্বার্থে?

এককথায় এর উত্তর হল—ভোটবাগান মঠের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল প্রধানত বৃটিশ-তিব্বতী বাণিজ্য ও রাজনৈতিক সম্পর্কের স্বার্থে, ধর্মের আবরণে। তার ঐতিহাসিক কাহিনী এই: তিব্বত ও ভুটানের উপর হেস্টিংসের লুব্ধ দৃষ্টি সজাগ ছিল। ভুটান ও কোচবিহারের মধ্যে যখন সংঘর্ষ হয় তখন হেস্টিংস তাতে হস্তক্ষেপ করেন সৈন্য পাঠিয়ে। ভোটরাজ পরাজিত হয়ে সন্ধি ভিক্ষা করেন তিব্বতী পাঞ্চন লামার মধ্যবর্তিতায়। দালাই লামা নাবালক ছিলেন বলে পাঞ্চন লামা তখন রাজকার্য পরিচালনা করতেন। ১৭৭২-৭৩ সালের ঘটনা। তাশী লামা সন্ধিপত্রসহ হেস্টিংসের কাছে প্রতিনিধি পাঠান। প্রতিনিধিদের মধ্যে একজন হলেন তিব্বত দেশীয়, নাম পাইমা; আর একজন হিন্দুস্থানের সন্ন্যাসী, পুরাণ গিরি গোঁসাই। ১৭৭৪ সালের ২৯শে মার্চ হেস্টিংস সন্ধিপত্র পান। দূরদর্শী হেস্টিংস সুযোগ বুঝে ভুটানের সঙ্গে সন্ধি করেন, ১৭৭৪ সালের ২৫শে এপ্রিল। হেস্টিংসের মাথায় তখন তিব্বত-ভুটানের সঙ্গে বাণিজ্যের মতলব খেলছে। তিনিও লামার কাছে এই উদ্দেশ্যে প্রতিনিধিদল পাঠান। এই দলে জর্জ বোগ্‌লে ও ডাঃ হ্যামিল্টনের সঙ্গে পুরাণ গিরিও ছিলেন। গৌরদাস বসাক লিখেছেন:[১]

> In this mission as well as in the second attempted embassy to Tibet under Mr. Bogle in 1779, in the third under Captain Turner in 1783, and in the last, under Puran Giri Gosain himself, just at the closing period of the same statesman's career in 1785, are to be sought all the important services that the great Gosain has rendered to the British Government......

১৭৮৫ সালের গোড়াতে ওয়ারেন হেস্টিংস মনস্থ করেন যে, বৃটিশ গবর্নমেণ্টের কূটনৈতিক প্রতিনিধিরূপে তিনি পুরাণ গিরি গোঁসাইকে তিব্বত

১ J. A. S. B., No 1, 1890.

পাঠাবেন। এমনই বিশ্বস্ত বৃটিশবন্ধু এই দশনামী শৈব সন্ন্যাসীটি। কিন্তু ১৮৭৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে হেষ্টিংস পদত্যাগ করে বিলাত যাত্রা করেন। পরবর্তী বড়লাট ম্যাকফার্সন পুরাণ গিরিকে তিব্বত পাঠানো অনুমোদন করেন এবং তিনি তিব্বতে যান।

ভোটবাগান প্রতিষ্ঠিত হয় প্রথম মিশনের পর। বোগ্‌লের কাছে তাশী লামা গঙ্গাতীরে একটি মঠ প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন যে, তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য হল, বাংলা দেশে এমন একটি আস্তানা করা, যেখানে তিব্বতী লামারা ভারততীর্থ পর্যটনের জন্য গিয়ে আশ্রয় পেতে পারে, ধর্মসাধনা করতে পারে এবং যেখান থেকে বাংলার সঙ্গে তিব্বতের রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর হতে পারে। স্থানটি বাংলাদেশে তিনি চান, কারণ বাংলাদেশেই বৃটিশের প্রধান ঘাঁটি স্থাপিত এবং বাংলার সঙ্গে তিব্বতের সাংস্কৃতিক লেনদেনের সম্পর্কও দীর্ঘকালের। বাংলাদেশের মধ্যে স্থানটি আবার কলকাতার কাছে হওয়া চাই কারণ বৃটিশের শাসনকেন্দ্র থেকে বেশি দূরে তাঁরা কিছু করতে চান না। বোগ্‌লের মারফত এই অনুরোধ তিনি হেষ্টিংসকে জানান এবং এও বলেন যে, তিনি যে মঠ প্রতিষ্ঠা করবেন, সেখানকার সর্বময় কর্তা হবেন তাঁদের উভয় পক্ষেরই বিশ্বস্ত দূত পুরাণ গিরি। হেষ্টিংস আবেদন মঞ্জুর করেন নিজেদের স্বার্থে এবং ভোটবাগানের মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়। মঠের মধ্যে আর্য তারা, মহাকাল ভৈরব, বজ্র ভ্রূকুটি, পদ্মপাণি প্রভৃতি যে-সব বৌদ্ধ তান্ত্রিক দেবদেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তা পুরাণ গিরিই চীন ও তিব্বত থেকে এনেছিলেন। এই হল ভোটবাগান মঠের ইতিহাস। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশের আভ্যন্তরিক বিশৃঙ্খলার সময় উত্তরভারতের দশনামী শৈব সন্ন্যাসীরা হাওড়া-হুগলী জেলার নানাস্থানে মঠ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তার মধ্যে তারকেশ্বরের মঠ প্রধান। একথা পূর্বে তারকেশ্বর প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি। তাঁরা প্রধানত কিসের প্রেরণায় এসেছিলেন, তা নিয়ে বিতর্কের প্রয়োজন নেই। ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যেই তার প্রমাণ রয়েছে। তবে ‘সন্ন্যাসী বিদ্রোহ’ প্রসঙ্গে তাঁদের বৃটিশ রাজদ্রোহিতার যে কাহিনী অনেকে প্রচার করেছেন, তা অনেকটাই ভিত্তিহীন।

রসপুর ও জয়পুর

পশ্চিমবাংলার প্রচুর চমকপ্রদ সাংস্কৃতিক উপকরণ হাওড়া জেলার আমতা থানার মধ্যে আজও চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। অনুসন্ধানীরা তার মধ্যে চিন্তার খোরাক পেতে পারেন যথেষ্ট। বিশেষ করে নৃবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীরা। এই উপকরণের বৈচিত্র্য যেমন, বাহুল্যও তেমনি। তার পরিচয় দেবার জন্য প্রতিটি গ্রামের স্বতন্ত্র বিবরণ দেবার প্রয়োজন নেই। সেই ধরনের বিবরণ পুনরাবৃত্তি-দোষে দুষ্ট হতে বাধ্য। রসপুর থেকে জয়পুরের বিবরণের মধ্যে তার সমস্ত বৈশিষ্ট্য আমি প্রকাশ করার চেষ্টা করব। প্রকাশের সুযোগও আছে। আমতা থানায় একসময় ধীবরশ্রেণীর প্রাধান্য ছিল, আজও তার পরিচয় আছে। দামোদরতীরে এই অঞ্চলে বর্ধিষ্ণু গঞ্জেরও বিকাশ হয়েছিল, যেমন আমতায়। জাতি হিসাবে মাহিষ্যরাই আজ আমতায় প্রভাবপ্রতিপত্তিশালী এবং এ-অঞ্চলের গ্রামীণ সংস্কৃতির যা কিছু উল্লেখযোগ্য ঐতিহ্য, তার প্রধান ধারক ও বাহক তাঁরাই।

আমতা থেকে দামোদরের তীর ধরে বাঁধের উপর দিয়ে রসপুর গ্রামে যেতে হয়। প্রায় চার মাইল পথ। গ্রামটির প্রাচীন ও প্রধান বাসিন্দাদের মধ্যে অন্যতম হলেন মাহিষ্য ও কায়স্থরা। কায়স্থরা প্রধানত 'রায়পাড়াতে' থাকেন। রায়পাড়ার রায়দের ইতিহাস প্রায় তিনশ বছরের প্রাচীন। রসপুরের এই রায়বংশে বাংলার 'শিবায়ন' কাব্যের একজন অন্যতম প্রাচীন কবি (কবি রামেশ্বরের পূর্বে) জন্মগ্রহণ করেছিলেন, নাম রামকৃষ্ণ রায়। রামকৃষ্ণের শিবায়ন কাব্যের খণ্ডিত পুঁথি আগে পাওয়া গিয়েছিল এবং তাই অবলম্বন করে দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর 'বঙ্গসাহিত্য পরিচয়' (১ম খণ্ড) গ্রন্থে এ-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করেছিলেন। কিছুদিন আগে এই বংশের শ্রীপাঁচুগোপাল রায় রামকৃষ্ণের 'শিবায়ন' কাব্যের সম্পূর্ণ পুঁথি উদ্ধার করে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে' প্রকাশের জন্য উপহার দিয়েছেন। সাহিত্য পরিষৎ থেকে এই শিবায়ন কাব্য সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। কাব্যের মধ্যে কবি রামকৃষ্ণ রচনাকালের কোন নির্দেশ দেননি। কিংবদন্তী এই যে, তিনি বর্ধমানরাজের অধীনে কোন উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। রামকৃষ্ণের জন্মের

৩৯

৪০
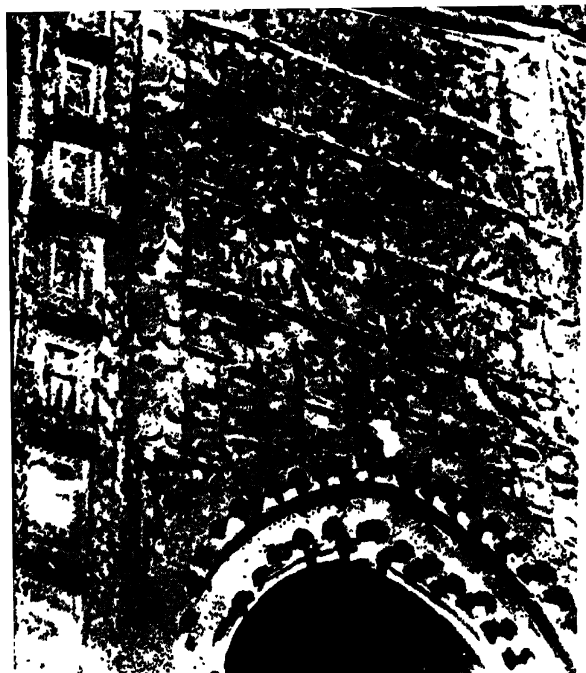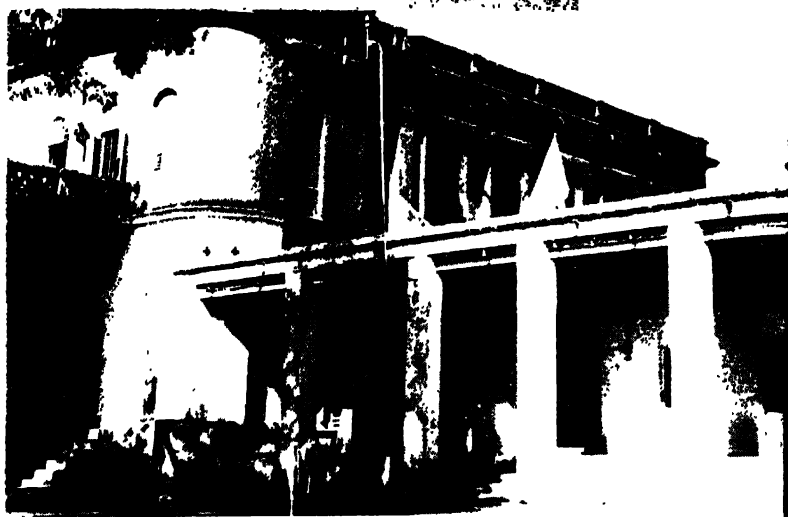
ও কাব্য রচনাকালের যে পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়, তা সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য। রামকৃষ্ণের মৃত্যুর পর দেখা যায় তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র জগন্নাথ রায় বর্ধমানরাজের কাছ থেকে কিছু ভূসম্পত্তি পান। ভূমিদানের তারিখ ১০৯১ বঙ্গাব্দ বা ইং ১৬৮৪ সাল। জগন্নাথের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র মুকুন্দপ্রসাদও ভূসম্পত্তি পান ১১০০ বঙ্গাব্দে, ইং ১৬৯৩ সালে। আনুমানিক পঞ্চাশ বছর জগন্নাথের পরমায়ু ধরলে, তাঁর জন্মকাল হয় ১৬৪৩ সাল। গড়ে তিনপুরুষে একশ বছর ধরলে রামকৃষ্ণের জন্মকাল ১৬১০ সালের পরে হয় না। সুতরাং কবি রামকৃষ্ণ রায়, মনে হয়, সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম বা দ্বিতীয় দশকে জন্মেছিলেন, কাব্যের শেষে তিনি প্রথম দুই পুত্রের কল্যাণ কামনা করেছেন। তাই মনে হয় পঁচিশ-ত্রিশ বছর বয়সের মধ্যে, অর্থাৎ ১৬৩৫-৪০ সালের মধ্যে, তিনি 'শিবায়ন' কাব্য রচনা করেন রসপুর গ্রামে। আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে কবি লিখেছেন:

> কায়স্থ দক্ষিণরাঢ়ি বংশেতে উৎপত্তি।
> গোত্র কাশ্যপ আমার দেবতা প্রকৃতি॥
> নিবাস বন্দিনু আমি রসপুর দেশ।
> এতদূরে ভাইরে বন্দনা হইল শেষ॥

কবি নিজেকে প্রায়ই 'কবিচন্দ্র' বা 'কবিচন্দ্র দাস' বলে উল্লেখ করেছেন ভণিতায়। যেমন—

> কবিচন্দ্র রচিলা সঙ্গীত শিবায়ন।
> ভক্ত নায়কে দয়া কর পঞ্চানন॥

অথবা—

> কল্পমুখে কমলে ব্রহ্মার উৎপত্তি।
> শিবায়ন গীত কবিচন্দ্রের ভারতী॥

আর একজন রাঢ়ের কবি বিষ্ণুপুরের মল্লরাজা বীরসিংহের রাজ্যকালে (১৬৫৬-৮২) 'শিবায়ন' কাব্য রচনা করেছিলেন। তাঁরও উপাধি বা নাম কবিচন্দ্র। তিনিও রামেশ্বরের পূর্বের সপ্তদশ শতাব্দীর কবি। কিন্তু তিনি রসপুরের কবিচন্দ্র রামকৃষ্ণ রায় নন। সপ্তদশ শতাব্দীতে যখন শিবচরিত্র-চণ্ডীমঙ্গল-ধর্মপুরাণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বতন্ত্র শিবমঙ্গল কাব্যরূপে 'শিবায়ন' রচিত হতে থাকে, তখন রসপুরের কবি রামকৃষ্ণ রায় সেই কাব্যরচনায় অগ্রণী হয়েছিলেন। রসপুর গ্রামে রায়পাড়ার 'রাধাকান্তজী'র যে বিগ্রহ ও

মন্দির আছে তা কবিচন্দ্র রামকৃষ্ণের প্রতিষ্ঠিত (বিগ্রহ) বলে রায়বংশীয়রা দাবী করেন।

গড়চণ্ডী দেবীই হলেন রসপুরের প্রধান গ্রামদেবতা। হাওড়া জেলার নানাস্থানে চণ্ডীই বিভিন্ন নামে গ্রামদেবতারূপে বিরাজ করেন দেখা যায়। এ-অঞ্চলে চণ্ডীর প্রাধান্য খুব বেশি। গড়চণ্ডীর মূর্তি দ্বিভুজা দুর্গামূর্তি। চণ্ডীর সামনে ষষ্ঠী, দক্ষিণ রায়, কালী, পঞ্চানন, মনসা, শীতলা, ও জয়চণ্ডী আছেন। উপযুক্ত 'দক্ষিণ রায়' সুন্দরবন বা দক্ষিণ-চব্বিশ পরগণা অঞ্চলের 'বাঘের দেবতা' নন। দাক্ষিণরাঢ়ের 'দক্ষিণ রায়' কি সুন্দরবনের জঙ্গলে গিয়ে বাঘের দেবতা হয়েছেন? পঞ্চাননও হাওড়া জেলার অন্যতম গ্রামদেবতা। গঙ্গার পশ্চিমতীরের দক্ষিণরাঢ় থেকে পূর্বতীরে দক্ষিণ-চব্বিশ পরগণা পর্যন্ত পঞ্চাননের বিস্তার ও প্রতিপত্তিও উল্লেখযোগ্য। গড়চণ্ডীর মন্দিরের মধ্যে দেয়ালের একটি নির্জন কুলুঙ্গিতে ধর্মঠাকুর কতকটা বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করছেন দেখা যায়। কুলুঙ্গিতে স্থানান্তরিত হবার কারণ, মনে হয়, অবস্থার আংশিক পরিবর্তন। এছাড়া মনসার একটি ছোট পাথরের মূর্তি আছে, প্রাচান মূর্তি মনে হয়, বাইরে থেকে নিয়ে আসা। গড়চণ্ডী ছাড়া রসপুরের বারোয়ারীতলায় যে বিন্ধ্যবাসিনীর স্থান আছে, সেখানে পূজার সময় মহিষবলি ও মুণ্ডনৃত্য হয়। রসপুর অঞ্চলে যে শৈব ও শাক্তধর্মের প্রাবল্য ছিল, এইসব নিদর্শন থেকে তা বোঝা যায়।

রসপুর থেকে প্রায় পাঁচ-ছয় মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে জয়পুর গ্রাম। হাওড়া জেলার পশ্চিম সীমান্ত বলা চলে, হুগলী জেলার দক্ষিণ আরামবাগের (মহকুমার) সংলগ্ন। সংলগ্নতার তাৎপর্য আছে। পরে 'দক্ষিণরাঢ়ের গ্রামীণ সংস্কৃতি' প্রসঙ্গে এই তাৎপর্যের বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। রসপুর থেকে জয়পুর যেতে এবং আমতা থানার অন্তর্গত আরো অনেক গ্রামের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে একটি বিচিত্র দৃশ্য নজরে পড়ে। দৃশ্যটি সমাধিস্তম্ভের দৃশ্য। গ্রামের পর গ্রাম, গ্রাম্যপথের ধারে ধারে প্রচুর সমাধিস্তম্ভের এই বিচিত্র সমাবেশ হঠাৎ অনভ্যস্ত দৃষ্টিপথে বিস্ময়ের উদ্রেক করে। খৃস্টান ও মুসলমানদের গোরস্থানে সমাধিস্তম্ভ আছে। হিন্দুদের শ্মশানেও যে সমাধিমন্দির নেই তা নয়, যথেষ্ট

আছে। কিন্তু আমতা থানার এই সব গ্রাম গোরস্থান বা শ্মশান নয়। বর্ধিষ্ণু বসতিবহুল গ্রাম। অধিকাংশই মাহিষ্যপ্রধান গ্রাম এবং স্তম্ভগুলি মাহিষ্যদেরই বেশি। তবে অন্যান্য জাতিও এই আচারটি যে গ্রহণ করেছে, তারও নিদর্শন আছে। মৃতের আত্মীয়স্বজন গৃহ বা গ্রামসংলগ্ন নিজভূমিতে শব সৎকার করেন এবং সমাধিমন্দির গঠন করে দেন। হঠাৎ দূর থেকে এই দৃশ্য দেখে নৃবিজ্ঞানীদের মনে হবে যেন কোন মেগালিথিক আদিম জাতির সমাধিক্ষেত্রে এসে পড়েছি। অল্পবিস্তর আমরা সকলেই যে সেই মেগালিথিক সংস্কারের স্তর উত্তীর্ণ হয়ে এসেছি, অথবা তার সংস্পর্শে এসে সংক্রামিত হয়েছি, তার প্রমাণ পাওয়া যায় আজও আমাদের স্মৃতি-মন্দির নির্মাণের আগ্রহ দেখে। কিন্তু হাওড়া জেলার আমতা থানার গ্রামগুলিতে প্রধানত এই বৈশিষ্ট্য এমন প্রকট হয়ে উঠল কেন, সে-প্রশ্নের জবাব প্রত্যেক অনুসন্ধানীর দেওয়া কর্তব্য। মাহিষ্যপ্রধান মেদিনীপুর জেলার কোথাও এই আচারের এমন প্রবল প্রকাশ দেখিনি। অথচ এই অঞ্চলের মাহিষ্যদের মধ্যে প্রধানত এই সংস্কার এমন প্রবল ও ব্যাপক হয়ে উঠল কেন, সংস্কৃতিবিজ্ঞানীদের তার কারণ অনুসন্ধান করা উচিত। মেগালিথিক সংস্কারের এমন বিচিত্র আধুনিক প্রকাশ ও বিস্তার, পশ্চিমবঙ্গের আর কোন অঞ্চলে দেখা যায় না। শ্মশান বা গোরস্থানে দেখা গেলেও, গ্রামের মধ্যে বা গ্রাম্যপথের ধারে ধারে দেখা যায় না।

পথের আশেপাশে এই সমাধিস্তম্ভের দৃশ্য দেখতে দেখতে আমরা রসপুর থেকে জয়পুর পৌঁছলাম। জয়পুর গ্রামের মধ্যেও এই দৃশ্য রীতিমত দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থ যাঁরা তাঁরা সমাধির উপর পূর্ণাঙ্গ মন্দির (বাংলা মন্দিরের মতন) তৈরি করে দেন এবং এরকম মন্দির জয়পুর গ্রামে অনেক দেখা যায়। জয়পুরও মাহিষ্যপ্রধান গ্রাম এবং এ অঞ্চলের বর্ধিষ্ণু গ্রামের মধ্যে অগ্রগণ্য বলা চলে।

জয়পুর গ্রামে দেবদেবী ও দেবালয় আছে অনেক। তার মধ্যে শ্রীধর, জলেশ্বর, জয়চণ্ডী, লক্ষ্মীজনার্দন, পঞ্চানন, ধর্মরাজ প্রভৃতি অন্যতম। শ্রীধরের মন্দিরটি ১৭৩৯ শকাব্দে (অথবা ১৭০৯) তৈরি। লক্ষ্মীজনার্দনের মন্দিরটি দোতলা, বাংলা ১১১২ সনে প্রতিষ্ঠিত, বর্তমানে পুনর্নির্মিত। প্রায় ২৫০ বছর আগে জয়পুর গ্রামে কালীরাম রায় এই বিগ্রহ ও মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। জয়পুরের প্রাচীন ধর্মঠাকুরের নাম 'মতিলাল'। বাংলা মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত।

মন্দিরটির এখন অতিজীর্ণ অবস্থা। মন্দিরগাত্রে অপূর্ব পোড়ামাটির কারুকার্য ছিল। এখন ইটগুলি গা থেকে সব ধসে পড়ে গেছে। এও প্রায় ২৫০ বছরের প্রাচীন মন্দির, ১৬০৬ শকাব্দে তৈরি। আজ থেকে আড়াই-শ বছর আগে ধর্মরাজ ঠাকুর যখন এমন সুন্দর কারুকার্যশোভিত ইটের মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন, তখন গ্রামের মধ্যে গ্রামদেবতারূপে তাঁর কিরকম প্রতিপত্তি ছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়। ধর্মঠাকুরের সেবাইত মাহিষ্য।

জয়পুরের প্রধান গ্রামদেবতা জয়চণ্ডী ও জলেশ্বর। জয়চণ্ডী এ-অঞ্চলের প্রসিদ্ধ চণ্ডীদেবী। বিরাট গাছতলায় শান-বাঁধানো স্থানে তিনি প্রতিষ্ঠিত। জলেশ্বরের মন্দির গ্রামের একপাশে। মন্দির-প্রাঙ্গণে কয়েকটি পাথরের ভাঙা দরজার টুক্‌রো আছে, কোন প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ। মন্দিরের মধ্যে আছে পাথরের একটি সুন্দর বিষ্ণুমূর্তি, নিঃসন্দেহে বলা যায়, সেন আমলের। জয়পুরে পঞ্চানন্দও আছেন। বেশ প্রাচীন পঞ্চানন্দ, কারণ প্রতিষ্ঠাতা ও সেবাইতদের তায়দাদে দেখা যায় (তায়দাদ নং ২০৩৯৫), বর্তমান সেবাইতের বৃদ্ধপ্রপিতামহ পঞ্চাননের পূজার জন্য দেবোত্তর ভূমি পেয়েছিলেন। অর্থাৎ প্রায় ১৫০ বছর আগে যে পঞ্চানন জয়পুর গ্রামে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। পঞ্চানন্দের মূর্তির বৈশিষ্ট্য আছে। ঘোড়ার পিঠে পঞ্চানন্দ উগ্রমূর্তি ধারণ করে বসে আছেন। পঞ্চানন্দের সামনে তিনটি ঘট আছে, একটি জরাসুরের, একটি পঞ্চানন্দের নিজের, আর একটি পাঁচুঠাকুরের। পঞ্চানন্দ ও পাঁচুঠাকুরে তফাত কি, বোঝা যায় না। হাওড়া-হুগলী জেলায় গ্রামদেবতারূপে অনেক বিখ্যাত পঞ্চানন্দ বিরাজ করছেন এবং ভাগীরথীর পূর্বতীরে দক্ষিণ-চব্বিশপরগণার গ্রামে গ্রামে। তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করেও (হাওড়া, হুগলী বা চব্বিশ পরগণায়) পঞ্চানন্দের কোন পাঁচালি বা পঞ্চাননমঙ্গল জাতীয় কাব্যের কোন পুঁথি কোথাও পাইনি। সকলেই প্রচলিত ধ্যানে পঞ্চানন্দের পূজা করেন। কিন্তু কেন হাওড়া-হুগলী ও দক্ষিণ-চব্বিশপরগণার গ্রামে গ্রামে, প্রধানত গাছতলায়, পঞ্চানন্দ এমনভাবে প্রতিপত্তিশালী গ্রামদেবতারূপে আবির্ভূত হয়ে, অন্যত্র প্রায় অন্তর্ধান করে গেলেন, তা কৌতূহলীদের বিশেষ অনুসন্ধানের যোগ্য। বাংলার গ্রামদেবতার এইরকম অনেক কুয়াশাবৃত ইতিহাসের মধ্যে বাঙালী সংস্কৃতির অনেক মূল্যবান ঐশ্বর্য ও উপকরণ আত্মগোপন করে আছে।

ছোট কলিকাতা

কলিকাতা মহানগরের অনতিদূরে একটি অখ্যাত গ্রাম আছে হাওড়া জেলায়, তার নামও 'কলিকাতা'। স্থানীয় লোকের কাছে সংলগ্ন গ্রাম রসপুরের নামের সঙ্গে 'রসপুর-কলিকাতা' বলে পরিচিত। কেউ কেউ বড় কলিকাতা শহরের কথা স্মরণ করে এই গ্রামটিকে 'ছোট কলিকাতা'ও বলেন। বাংলা দেশে একই নামের একাধিক গ্রাম আছে। দ্বিতীয় নাস্তি, এমন কোন গ্রামের নাম কোথাও নেই। একই জেলা, একই মহকুমা, এমনকি একই থানার মধ্যে এক নামের একাধিক গ্রাম আছে দেখা যায়। একমাত্র 'কলিকাতা' নামটির আশ্চর্য বিশেষত্ব আছে তার বিরলতার মধ্যে। সেইজন্য কলিকাতা নামের ব্যুৎপত্তির সন্ধানে অনেকে গলদ্‌ঘর্ম হয়েছেন এবং যেন-তেন-প্রকারেণ একটা 'থিয়োরী' দাঁড় করিয়ে কলিকাতা শহরের ইতিহাস রচনার দায়মুক্ত হয়েছেন। প্রধানত পাদ্‌রী ও ফিরিঙ্গীসাহেব ইতিহাস-লেখকরা (কলিকাতা শহরের) এই সব তত্ত্বকথার উদ্ভাবক এবং এদেশী লেখকরা তাঁদের কথার পুনরাবৃত্তি করেছেন মাত্র। কিন্তু আজও দামোদর-তীরবর্তী হাওড়া জেলার নগণ্য গ্রাম এই 'ছোট কলিকাতা' আমাদের কলিকাতা মহানগরের নামের ব্যুৎপত্তি এবং তার প্রাচীন ইতিহাসের অনেক অন্ধকার কোণে নানাদিক থেকে আলোকপাত করতে পারে। কেন পারে এবং কোন্ দিক থেকে পারে, সেই কথাই আলোচনা করব এখানে।

একদা বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে লণ্ডন শহরের পরেই কলিকাতা শহরের প্রাধান্য স্বীকৃত হত এবং তার খ্যাতিও ছিল পৃথিবীব্যাপী। অনেক নামে অনেক জাতির লোক কলিকাতাকে ডাকেন, যেমন—কলকাতা, কলকেতা, কলকত্তা, ক্যালকাটা, কলিকোট্টা, কালকুতা, কইলকাত্তা ইত্যাদি। সবই 'কলিকাতা' নামের দেশগত ও জাতিগত বিকৃতরূপ। কিন্তু কলিকাতা নামের ব্যুৎপত্তি নিয়ে অনেক জল্পনা-কল্পনা করা হয়েছে এবং রোমাঞ্চকর কাহিনী-লেখকরা তার মধ্যে কলকাতার প্রাচীন ইতিহাসের উপাদান সন্ধান করেছেন। এই রকম কয়েকটি জল্পনার কথা উল্লেখ করছি—

১। 'কলিকাতা' নামের উৎপত্তি হয়েছে, অনেকের মতে, 'কালীঘাট'

শব্দের বিকারে। ভাষাতত্ত্বে বিকারেরও একটা বৈজ্ঞানিক নীতি আছে, তাতে 'কালীঘাট' থেকে 'কলিকাতা' হয় না। এই তত্ত্বেরই উপতত্ত্ব হল, কালীকোট্টা বা কালীকোঠা (কালীর কোঠা বা ঘর, অর্থাৎ কালীমন্দির) থেকে ফিরিঙ্গী বিকৃতি 'কলিকাতার' উৎপত্তি। নিছক আজগুবী কল্পনা। কারণ কালীর নামে কালীঘাট এবং তার পাশে কলিকাতা স্বতন্ত্র গ্রামরূপে দীর্ঘকাল ধরে বিরাজ করছে। একই দেবীর নামে দুইটি গ্রামের নামের মধ্যে একটি ঠিক রইল, অন্যটি বিকৃত হল, তা হয় না। তা ছাড়া ফিরিঙ্গীদের মুখে বিকৃত হবার অনেক আগে থেকেই 'কলিকাতা' নাম অবিকৃতরূপে প্রচলিত ছিল।

২। 'কালীক্ষেত্র' থেকে 'কলিকাতা'। এ অনুমানও ঠিক নয়। কলিকাতা কালীর ক্ষেত্র বা তীর্থ হলেও, তার জন্য 'কালীক্ষেত্র' 'কলিকাতা' হয়নি। এও ঐ প্রথম জল্পনার বেশান্তর মাত্র।

৩। 'কিল্‌কিল' থেকে 'কলিকাতা'র উৎপত্তির কথা কেউ কেউ বলেন। কিন্তু কিল্‌কিলার সঙ্গে কলিকাতার ব্যুৎপত্তিগত যোগসূত্র নেই বললেই হয়।

৪। একদা এক ইংরেজ সাহেবের এই অঞ্চলের নাম জানবার বাসনা হয়। তখন কলিকাতায় লোকের তেমন বসতি ছিল না। সাহেব দেখেন, একজন হিন্দুস্থানী ঘাস্থড়ে ঘাস কাটছে। তাকে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, জায়গার নাম কি? হিন্দুস্থানী ভড়কে গিয়ে ভাবল, সাহেব বোধ হয় কবে ঘাস কাটা হয়েছে তাই জিজ্ঞাসা করছে। সে বলে, "হুজুর, কল্‌ কাটা" অর্থাৎ কাল কেটেছি। সাহেব মনে করলেন, জায়গার নাম 'কল্‌কাটা' এবং এবং তাই থেকে 'ক্যালকাটা' এবং তার বঙ্গানুবাদ কলিকাতা বা কলকাতা হল। এও এক থিয়োরী আছে। রূপকথা হিসাবে মন্দ নয়, বিশেষ করে প্রথম সাহেবী যুগে। ইতিহাস নয়।

এরকম আরও অনেক উদ্ভট জল্পনা আছে। তার বিস্তৃত বিবরণ এখানে দেবার প্রয়োজন নেই। এই ধরনের জল্পনার প্রাবল্যের জন্যই অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় দুঃখ করে বলেছিলেন:[১] "দেড়শত বৎসরের অধিককাল ধরিয়া ভারতে বৃটিশরাজ্যের রাজধানী হইবার গৌরব ছিল

১ 'কলিকাতা' নামের ব্যুৎপত্তি: সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৪৫ বর্ষ, ১ম সংখ্যা।

যে নগরীর, সেই কলিকাতা নগরীর নামের ব্যুৎপত্তি এখনও নির্ধারিত হইল না, ইহা বড় আশ্চর্যের বিষয়"। উক্ত প্রবন্ধে সুনীতিবাবু 'কলিকাতা' নামের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে যে ইঙ্গিত করেন, তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন :

> "কলিকাতা' একটি খাঁটি বাংলা শব্দ। ইহার অর্থ, 'কলি' বা কলিচুনের জন্য 'কাতা' বা শামুকপোড়া। সুতার সুটী বা গোলার হাট বা আড়ত হইতে যেমন 'সুতানুটী' নাম, তেমনি কলির বা চুনের ও কলিচুনের জন্য শামুকের আড়ত, এবং চুনের কারখানা হইতে 'কলি-কাতা' নাম।"

সুনীতিবাবুর এক ছাত্র তখন বাংলা দেশের গ্রামের নাম নিয়ে গবেষণা করছিলেন। তাঁর কাছ থেকে তিনি আরও দুটি 'কলিকাতা' নামের সন্ধান পান বাংলাদেশে। একটি ঢাকা জেলার লৌহজঙ্গ থানার অধীনে এবং দ্বিতীয়টি আমতা থানার (হাওড়া) অধীনে। উক্ত দুই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীদের কাছে চিঠি লিখে তিনি গ্রাম দুটির বিবরণ সংগ্রহ করেন এবং জানতে পারেন যে, ঢাকা জেলার লোহাজঙ্গ থানায় 'কলিকাতা-ভোগদিয়া' নামে যে গ্রাম আছে সেখানে চুনারী নেই বা চুন তৈরি হয় না, কিন্তু হাওড়ার রসপুর-কলিকাতা গ্রামে চুনারী আছে এবং কলিচুন তৈরিও হয়। সুনীতিবাবুর এই গ্রাম-পরিচয় থেকে আমি রসপুর-কলিকাতা সম্বন্ধে বিশেষ কৌতূহলী হই এবং হাওড়া জেলার আমতা থানার অধীন বিভিন্ন গ্রাম পরিদর্শনের সময় রসপুর-কলিকাতা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অনুসন্ধান করি। অনুসন্ধানের পর তাঁর প্রস্তাবের সত্যতা সম্বন্ধে আমার বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়। দুঃখের বিষয়, প্রায় পনের বছর আগে সুনীতিবাবুর এই ইঙ্গিত করা সত্ত্বেও কারও হাওড়ার 'কলিকাতা' গ্রামে গিয়ে প্রত্যক্ষ অনুসন্ধানের কৌতূহল জাগেনি। কলিকাতা মহানগরের প্রাচীন ইতিহাসের ধারা সম্বন্ধে বিশেষ অনুরাগ থাকার জন্য এই কাজটি আমি যথাসাধ্য তৎপরতার সঙ্গে করি। পরে কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল মিউজিয়ামের একটি সভায় এ সম্বন্ধে আমি আলোচনা করি এবং গত ১২ই ফেব্রুয়ারী (১৯৫৫) 'ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেটে' এ বিষয়ে 'Notes on the History of Old Calcutta' নামে আমি একটি সংক্ষিপ্ত 'নোট' লিখি (৬১ খণ্ড, ১৫ সংখ্যা)। এই প্রসঙ্গে শুধু 'কলিকাতা' নামের নয় 'ধর্মতলা ও চৌরঙ্গী' নামের

উৎপত্তি ও তাৎপর্যের কথাও আলোচনা করি। 'কলিকাতার' মতন পাদ্রী ও ফিরিঙ্গী (উইলসন, লঙ প্রমুখ) সাহেবদের জল্পনার জোরে 'ধর্মতলা ও চৌরঙ্গী' নাম দুটির তাৎপর্যও এতদিন নিছক ভিত্তিহীন অনুমান ও গালগল্পের বালুস্তূপের উপর দাঁড়িয়েছিল। প্রসঙ্গত সে কথাও আলোচনা করব।

প্রথমে কলিচুন, চুনারী ও কলিকাতা নামের সম্পর্কের কথা বলি। ১৮৫০ সালে, সিম্‌স সাহেব কলিকাতা শহর সার্ভে করে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেন (F. W. Simms : Report on the Survey of Calcutta, 1851)। এই রিপোর্টে দেখা যায়, 'ডিহি কলিকাতা'র প্রাচীন ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে কম করেও তিনটি রাস্তা ছিল চুন ও চুনারীদের নামে। যথা—

চুনাপুকুর লেন : ৭২২ ফুট-বাই-১৬'৯ ফুট ; উত্তরবিভাগ, ব্লক নং দুই।

চুনাগলি : ৭৭০ ফুট-বাই-২৩'৪ ফুট ; উত্তরবিভাগ, ব্লক নং তিন।

চুনারপাড়া লেন : ৯২০ ফুট-বাই-১৪ ফুট ; উত্তরবিভাগ, ব্লক নং চার।

উল্লেখযোগ্য হল, কলিকাতার উত্তরবিভাগের এই ব্লকগুলি পরস্পরসংলগ্ন এবং তিনটি ব্লকই উত্তরে কলুটোলা স্ট্রীট, দক্ষিণে বহুবাজার স্ট্রীট, পূর্বে সার্কুলার রোড ও পশ্চিমে লালবাজার, দ্বারা পরিবেষ্টিত। টিরেটাবাজার, ছাতাওয়ালা গলি, ব্ল্যাকবার্ন লেন প্রভৃতির সঙ্গে ছিল সবচেয়ে বেশি। মাত্র একশ বছর আগেও কলকাতার এই অঞ্চলে বিশাল একটি চুনারীদের পাড়া ছিল। মনে রাখা দরকার যে, চুনারপাড়ার এই অঞ্চলই ছিল প্রাচীন ডিহি কলিকাতার প্রাণকেন্দ্র। বর্তমান স্ট্র্যাণ্ড রোডের উপর দিয়ে তখন গঙ্গার ধারা বইত এবং চুনারপাড়া থেকে গঙ্গাতীর খুবই কাছে ছিল। চুনের বাণিজ্যের দিক থেকে চুনারপাড়ার এই অবস্থান অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত। ডিহি কলিকাতার অনেকটা অংশ এবং প্রধান অংশ জুড়ে ছিল চুনারপাড়া, চুনাগলি ও চুনাপুকুর। আজও এই অঞ্চলে এ নামের অস্তিত্ব রয়েছে, যদিও চুনারীদের কোন পাড়া আর নেই। বড় বড় সারবন্দী মাটির পণে শামুক পুড়িয়ে কলিচুন তৈরি করত চুনারীরা এবং তখন বাংলাদেশের এ-অঞ্চলে পাথুরে চুনের প্রচলন ছিল না বলে কলিচুনের চাহিদাও ছিল যথেষ্ট। ঘরবাড়ি চুনকামের জন্যে যে চুন ব্যবহার করা হত তা কলিচুন এবং তার জন্ত চুনকাম করাকে 'কলি দেওয়া' বা 'কলি ফেরানো' বলা হয়। কলিচুন তৈরির প্রধান উপাদান শামুকও তখন প্রচুর পাওয়া যেত কলকাতায় এবং তার

আশপাশে।[৭] কলকাতার প্রাকৃতিক রূপ তখন অন্যরকম ছিল। সিম্‌স সাহেবের রিপোর্টেই দেখা যায়, যে তিনটি ব্লকে শুধু চুনারীরা থাকত এবং তার মধ্যেই ৩৪টি প্রাইভেট ট্যাঙ্ক বা পুকুর এবং একটি পাবলিক ট্যাঙ্ক (মেডিক্যাল কলেজ ট্যাঙ্ক) ছিল, ১৮৫০ সালেও। কলকাতার উত্তরবিভাগে মোট পুষ্করিণীর সংখ্যা ছিল ৮৩২টি, দক্ষিণবিভাগে (সার্কুলার রোড তখন দক্ষিণের সীমানা ছিল) ১৯১টি এবং ময়দানে ২০টি। আরও দক্ষিণে বা আশেপাশে তো কথাই নেই, ডোবা জলা ও পুকুরে ভর্তি ছিল চৌরঙ্গী, ভবানীপুর, কালীঘাট, বালীগঞ্জ, টালিগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চল। পুকুর ও শামুকের এত প্রাচুর্যের মধ্যে কলিচুনের বিরাট শিল্প ও বাণিজ্য ডিহি কলিকাতার প্রাণকেন্দ্রে গড়ে ওঠা খুবই স্বাভাবিক। চুনারীদের সংখ্যা তখন অনেক বেশি ছিল দক্ষিণবঙ্গে, বিশেষ করে বর্তমান হাওড়া জেলায় ও কলিকাতা-সহ দক্ষিণ-চব্বিশপরগণায়। আজও এসব অঞ্চলের বিচ্ছিন্ন চুনারীদের বংশধরদের কাছ থেকে তার বিবরণ পাওয়া যায়। সুতরাং কলিচুনের কাতা বা আড়ত থেকে (চুন তৈরির সারিবদ্ধ পণকেও কলিচুনের কাতা বলে) 'ডিহি কলিকাতার' নামকরণ হয়েছিল বলে মনে হয়। পরবর্তীকালে সস্তা পাথুরে চুনের প্রতিযোগিতায় কলিচুনের কুটিরশিল্প অন্যান্য আরও অনেক শিল্পের মতন ধ্বংস হয়ে যেতে থাকে এবং ক্রমবর্ধমান কলিকাতা মহানগরীতে চুনারীরা ক্রমে জীবিকার্জনের সংগ্রামে কোণঠাসা হয়ে দূরে সরে যায়।

হাওড়ায় ও চব্বিশপরগণায় খুব কাছাকাছি এলাকার মধ্যেই কলিচুনের কাতার নামে যে 'কলিকাতা' নামে অন্তত দুটি গ্রামের নামকরণ হয়েছিল, হাওড়ার কলিকাতা গ্রামটি আজও তার নীরব সাক্ষীরূপে টিঁকে রয়েছে। আরও বেশি নাম ছিল কিনা, আজ আর তা বলবার উপায় নেই, কারণ রসপুর-কলিকাতার মতন ক্রমে নামের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে কোন বর্ধিষ্ণু গ্রাম, ধীরে ধীরে সেই সব নাম আত্মসাৎ করে নিয়েছে কিনা তা একমাত্র একশতাব্দী পূর্বের কানুনগো বা আমিনরাই বলতে পারতেন। আজ তাঁরা জীবিত নেই যখন তখন হাওড়ার ছোট কলিকাতাই আমাদের একমাত্র ভরসা। দামোদরের বাঁধের উপর দিয়ে রসপুর যেতে যেতে যদি বাঁধের ধারে কলিকাতা গ্রামের গ্রাম্য সঙ্ঘ, ক্লাব, দোকান ইত্যাদির গায়ে সাইনবোর্ডে 'কলিকাতা' নামটি লেখা না থাকত, নামের আসল পরিচয় যদি তার লুপ্ত হয়ে যেত, তাহলে

কলিকাতার ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে কিংবদন্তীর পাহাড় ঠেলে উঠত ভবিষ্যতে। এমন কি চুনারীরাও তখন আর সাক্ষী দেবার জন্য বেঁচে থাকত না কোথাও।

প্রথমেই চোখে পড়ে ছোট কলিকাতার ছোট ছোট সাইনবোর্ডগুলি—'কলিকাতা' লেখা। শহর-কলিকাতাবাসী আজ হাওড়ার এই উপেক্ষিত গ্রামের এরকম আত্মপরিচয়কে নিশ্চয় ঔদ্ধত্য বলে মনে করবেন। গ্রামের সম্বল বলতে কিছুই নেই। জীর্ণশীর্ণ গ্রাম, কঠোর জীবনসংগ্রামের সুস্পষ্ট ছাপ তার সর্বাঙ্গে। একদা খুবই সমৃদ্ধ ছিল এই কলিকাতা গ্রাম। দামোদরের তীরে এ-অঞ্চলের অন্যতম প্রধান কলিচুন তৈরির ও বাণিজ্যের কেন্দ্র ছিল। বড় বড় চুনারী মহাজনরা কিছুদিন আগেও গ্রামে দু-চার জন ছিল। চুনারীদের বাসও ছিল অনেক। এখন সেখানে মাত্র ছয় ঘর চুনারীর বাস আছে। পরিত্যক্ত পণ ও বিক্ষিপ্ত শামুকের খোলের স্তূপ দেখে বোঝা যায়, কলিচুন তৈরির রেওয়াজ এখনও কলিকাতা গ্রামের চুনারীদের মধ্যে আছে। চুন তৈরির পদ্ধতি এই :

শামুক ধুয়ে নিয়ে পণের মধ্যে সাজিয়ে দিতে হয়। শামুক পোড়াবার জন্য বড় বড় মাটির পণ তৈরি করা হয়। তলায় হাঁড়ি উপুড় করে সাজানো। তার উপর ঘুঁটে পাতা ইত্যাদি ছড়িয়ে দিয়ে তার উপর শামুক সাজানো হয়। এইভাবে পণের ভিতরে থাকে-থাকে শামুক সাজিয়ে আগুন ধরিয়ে পোড়ানো হয়। পোড়ানোর পরে শামুক পরিষ্কার করে, তলামাথা বাদ দিয়ে (কলিচুনের জন্য), কেবল মাঝখানটা নিয়ে একটা জলের ডাবায় সামান্য চিটেগুড় দিয়ে ভিজিয়ে দেওয়া হয়। তারপর ফুটিয়ে গুঁড়ো করে নেওয়া হয়।

ছোট কলিকাতার চুনারীপাড়ায় আজও কয়েকটি বড় বড় শামুক পোড়ানোর পণ রয়েছে। সামনে শামুকের খোলও রয়েছে অনেক দেখা যায়। প্রধান পেশা বা জীবিকা হিসাবে আজ তারা কলিচুনের উপর ভরসা করতে পারে না, কারণ কলিচুন তৈরির মেহনত অনেক, খরচ অনেক, ক্রেতারা কিনতে চান না। তবু দু-চারজন ক্রেতা যখন অর্ডার দেন তখন তারা কলিচুন তৈরি করে দেয়। রাণা, দাস, বোস ইত্যাদি উপাধি চুনারীদের। হাওড়া জেলার আরও কোন কোন জায়গায় চুনারীদের বাস আছে। যেমন বসন্তপুরে (৬—৭ ঘর), মাজুতে (মুন্সীরহাট ৫—৬ ঘর), খলিয়ায় (২—১ ঘর), উলুবেড়িয়ার কাছে গঙ্গারামপুরে (৬—৭ ঘর), বাগনানের কাছে পিপুলান-ঘোড়াঘাটে (৫—৬

ঘর), ডোমজুড়ের কাছে বলুটিতে (২—৩ ঘর), সিংটি-শিবপুরে (২—৩ ঘর), গড় ভবানীপুরে (২—১ ঘর)। এছাড়া হুগলী জেলার কয়েক স্থানে এবং চব্বিশপরগণার দক্ষিণেও চুনারীদের কিছু কিছু অস্তিত্ব আছে। মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণেও আছে।

এক সময় কলিচুনের কাতা বা আড়ত থেকেই ভাগীরথীর পূর্বে ও পশ্চিমে দুটি গ্রামের নাম কলিকাতা হয়েছিল। পূর্বতীরের গ্রামটি বৃটিশ শাসকদের প্রয়োজনে গ্রাম থেকে নগর ও মহানগরে পরিণত হয় প্রায় দু-শ বছরে—আর পশ্চিমতীরের দামোদরসংলগ্ন গ্রামটি যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই থাকে, দু-শ বছরে তার অবনতি ছাড়া কোন উন্নতি হয়নি।

কলিকাতা প্রসঙ্গে 'ধর্মতলা' ও 'চৌরঙ্গী' সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা দরকার। ধর্মতলা ও চৌরঙ্গীর নামকরণ সম্বন্ধেও পাদ্রী ও ফিরিঙ্গী সাহেবদের অনেক জল্পনা-কল্পনা আছে। যেমন মুসলমানদের মসজিদ ছিল বলে 'ধর্মতলা' নাম হয়েছে। স্থানীয় লোকসংস্কৃতি ও গ্রামীণ সংস্কৃতির সঙ্গে কোন অঞ্চলের ইতিহাসের যোগসূত্র সন্ধান না করে, বাইরে থেকে কিছু আরোপ করতে গেলে যা হয়, সাহেবদের অনেকেরই তাই হয়েছে। ধর্মঠাকুরের প্রাধান্যের জন্যই ধর্মতলার নাম হয়েছে ধর্মতলা, মসজিদের জন্য নয়। মসজিদ বা পীঠস্থানের জন্য বাংলাদেশের কোন স্থানের নাম ধর্মতলা হয়েছে বলে আমার জানা নেই এবং পশ্চিমবঙ্গে অন্তত কোথাও চোখে পড়েনি। পশ্চিমবঙ্গের উত্তররাঢ় ও দক্ষিণরাঢ় থেকে ধর্মঠাকুরের পূজা ভাগীরথীর পূর্বতীরে দক্ষিণ-চব্বিশপরগণার কলিকাতা পর্যন্ত যে প্রচলিত হয়েছিল, তা আজও বোঝা যায়। দক্ষিণে প্রাচীন আদিগঙ্গার তীর ধরে আজও ধর্মের 'ঘাত' হয়। কূর্মমূর্তি ধর্মঠাকুর সোনারপুরের বাজারে ডোমপণ্ডিত পূজা করে এখনও। বর্তমান হাজরা রোড ও শরৎ বসু রোডের (ভূতপূর্ব ল্যান্সডাউন রোড) মোড়ে একটি প্রাচীন ধর্মঠাকুরের মন্দির আছে, এখন শিবই সেখানে প্রাধান্য পেয়েছেন। কস্‌বা, বেহালা প্রভৃতি অঞ্চলেও ধর্মঠাকুর আছেন। পূর্বোক্ত সিম্‌স সাহেবের রিপোর্টে দেখা যায় যে, একশ বছর আগে লালবাজার-রাধাবাজার অঞ্চলে ৩১,৬৮০ বর্গফুট জুড়ে বেশ একটি 'ডোমতালা' ছিল। ধর্মতলার পিছনে ছিল 'হাড়িপাড়া' লেন। পশ্চিমবঙ্গের (রাঢ়ের) ধর্মঠাকুরের বিখ্যাত সেবক বা পণ্ডিত ডোম ও হাড়িজাতির বেশ

প্রাধান্য ছিল ধর্মতলা অঞ্চলে একশ বছর আগেও। যেখানে হাড়ি ও ডোমের এরকম প্রাধান্য ছিল, সেখানে কোন ধর্মঠাকুর ছিল না, একথা মনে হয় না। সারা কলকাতায় এক সময় ধর্মঠাকুরের বেশ প্রতিপত্তি ছিল এবং তার গাজনও হত। পরে ধর্মের গাজন শিবের গাজনে রূপান্তরিত ও লুপ্ত হয়েছে।

কলকাতায় নাথযোগী ও নাথ-পণ্ডিতদেরও যথেষ্ট প্রাধান্য ছিল। দক্ষিণ কলকাতায় ত্রিশ বছর আগেও নাথযোগীদের বড় বড় পাড়া আমরা দেখেছি। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নাথযোগীরাই গাজনে প্রধান অংশ গ্রহণ করতেন। উত্তর কলকাতার 'নাথের বাগান', 'যোগীপাড়া' প্রভৃতি নাম আজও আছে। হাওড়া জেলায় ও দক্ষিণ-চব্বিশপরগণায় নাথ-পণ্ডিত ও যোগীদের প্রাধান্য এখনও কিছু কিছু আছে। কলকাতাতেও যে তাদের প্রাধান্য ছিল তার বহু প্রমাণ আছে। এ-অঞ্চলে শীতলা, পঞ্চানন্দ, ধর্মঠাকুর, শিব প্রভৃতির পূজারী ও সেবাইত এখনও অনেক নাথপণ্ডিত আছেন। চৌরঙ্গীনাথ নাথযোগীদের প্রধান উপাস্যদের মধ্যে অন্যতম, গোরক্ষনাথ, মীননাথের মতন। দমদমে গোরক্ষনাথের মঠ আছে। চৌরঙ্গী অঞ্চলে এইরকম কোন মঠ বা মন্দির ছিল চৌরঙ্গীনাথের, নাথ পণ্ডিতরাই তার পূজারী ছিলেন। তার পাশেই ছিল ধর্মঠাকুর, হয়ত নাথরাই সেবাইত ছিলেন। অথবা হাড়ি বা ডোম পণ্ডিত। পাশাপাশি তাই ধর্মতলা ও চৌরঙ্গীর অবস্থান। পশ্চিমবঙ্গে ধর্মঠাকুরের স্থানের নাম ধর্মতলা। কলকাতার ধর্মতলা তার ব্যতিক্রম হতে পারে না।

চব্বিশ পরগনা

চব্বিশপরগণার ইতিহাস

চব্বিশপরগণার ইতিহাসের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে পূর্বে অনেকেই সন্দেহ পোষণ করতেন। বিশেষ করে দক্ষিণ-চব্বিশপরগণা ও তার অন্তর্গত পশ্চিম-সুন্দরবন সম্বন্ধে তাঁদের ধারণা ছিল যে, লোকালয় ও মানুষের সভ্যতা খুব বেশিদিন সেখানে গড়ে ওঠেনি। ভূতত্ত্ববিদ্ ও প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌রা এই সন্দেহ ভঞ্জন করে সুন্দরবন ও চব্বিশপরগণার প্রাচীনত্বের প্রচুর নিদর্শন আবিষ্কার করেছেন। পূর্বে এই অঞ্চলকে 'ভাটি' প্রদেশ বলত। নদীমাতৃক বাংলার ভাটা দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয় বলে সমুদ্রকূলবর্তী দক্ষিণদেশের নাম ছিল 'ভাটিদেশ'। চব্বিশপরগণা থেকে বাখরগঞ্জ পর্যন্ত সমগ্র নিম্নবঙ্গের 'বারভাটি,' 'আঠারভাটি' ইত্যাদি নাম ছিল। শতমুখী গঙ্গা ভূমিগঠন করতে করতে উপদ্বীপসীমা যতই দক্ষিণ দিকে সরিয়ে নিয়েছে, সুন্দরবনও তত দক্ষিণে সরে গেছে। ভাটি অঞ্চলের জমি ক্রমে দক্ষিণদিকে নিচু হতে হতে সমুদ্রের সঙ্গে সমতল হয়ে গেছে। সমুদ্রের তুফানে, ঝড়ে ও বন্যায় অনেক সময় ভাটি অঞ্চল ডুবে গেছে, আবার মাথা তুলেছে। সুন্দরবনের জমিও বসে গেছে একাধিকবার। দক্ষিণ

২৪ পরগনা জেলা
রানাঘাট
বনগ্রাম
হাবড়া
অাটপাড়া
ব্যারাকপুর
বারাসত
পানিহাটি
দমদম
বসিরহাট
হাসনাবাদ
হাওড়া
কলিকাতা
বড়িশা
বেহালা
সরশুনা
সোনারপুর
বারুইপুর
ফলতা
মগরাহাট
ময়দা
জয়নগর
মজিলপুর
কুলপি
খাড়ি
কাঁটাবেনিয়া
সন্দেশখালি
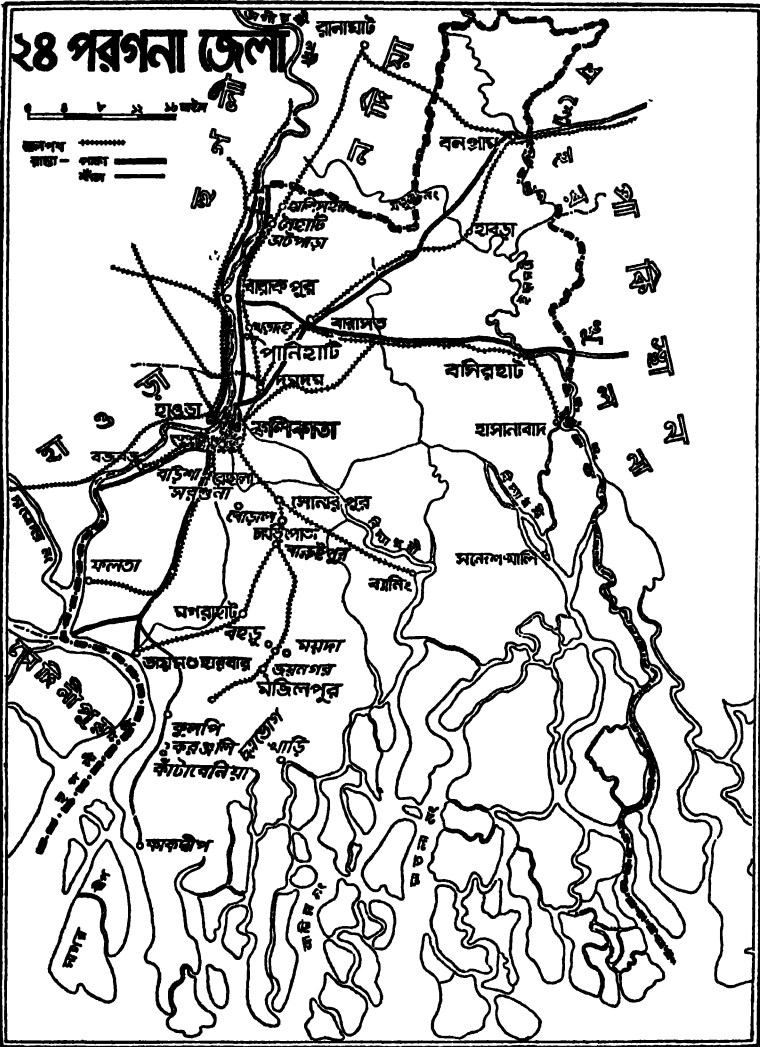
দেশের নানাস্থানে মাটি খুঁড়ে দেখা গেছে যে, প্রায় ত্রিশ ফুট নিচে পর্যন্ত সুন্দরবনের চিহ্ন আছে। কলকাতার শিয়ালদহের কাছে পর্যন্ত পুকুর খুঁড়ে প্রায় ত্রিশ ফুট নিচে অসংখ্য গাছের গুঁড়ি পাওয়া গেছে। মাতলার কাছে আটদশ ফুট মাটির নিচে খুঁড়ে দেখা গেছে প্রায় চল্লিশটি সুঁদরি গাছ সোজা দাঁড়িয়ে আছে। পরিষ্কার বোঝা যায়, নিমজ্জন ছাড়া এরকম হতে পরে না। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কারণে যে দক্ষিণ-চব্বিশপরগণার জমি বসে গেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। সভ্যতার কোন কীর্তিচিহ্ন তাই এখানে স্থায়ী হয়নি। সবই মাটির তলায় সমাধিস্থ। ঘর-বাড়ি, মন্দির, মূর্তি ইত্যাদি মাটির উপরে পাওয়া কঠিন। চব্বিশপরগণার ইতিহাস তাই আজও অনেকটা প্রত্নতাত্ত্বিকদের খনন-মুখাপেক্ষী।

সামান্য যা নিদর্শন মাটি খুঁড়ে, পুকুর খুঁড়ে, জঙ্গল হাসিল করে পাওয়া গেছে তারও ঐতিহাসিক গুরুত্ব কম নয়। ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার অন্তর্গত মথুরাপুর থানার অধীন ২৬নং লাট কঙ্কণদীঘির পশ্চিমে রায়দীঘির পশ্চিমতীরে ভাঁটার সময় প্রায় আঠার ফুট মাটির নিচে প্রাচীন গৃহাদির ভিত দেখা গেছে। খুব বড় বড় ইটের তৈরি ভিত, অনেকটা মৌর্যযুগের ইটের মতন। এই সব অঞ্চলে অন্যান্য প্রাগৈতিহাসিক যুগের নিদর্শন যা পাওয়া গেছে তাও উল্লেখযোগ্য। ষোল ফুট, আঠার ফুট মাটির নিচে পাওয়া গেছে বলে এগুলির গুরুত্ব আছে মনে হয়। আঠার ফুট মাটির নিচে একটি পোড়ামাটির ছোট দেবীমূর্তি (mother-goddess) পাওয়া গেছে। কঙ্কণদীঘিতে ষোল ফুট মাটির নিচে চার কোণা একটি বেলেপাথরের স্ট্যাণ্ড পাওয়া গেছে (১৫ ইঞ্চি × ১২ ইঞ্চি × ৯ ইঞ্চি)।[১] বোড়াল অঞ্চলেও এরকম কিছু কিছু নিদর্শন মাটির তলা থেকে খুঁড়ে পাওয়া গেছে। এগুলির বয়স নির্ধারণ করা কঠিন, তবে প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শন হওয়াও আশ্চর্য নয়। পোড়ামাটি ও পাথরের নিদর্শনের চেয়েও দক্ষিণের ধীবরশ্রেণীর ডিঙি-নৌকা ইত্যাদি, মাছধরার বিভিন্ন জাল, কুম্ভকারদের হাঁড়িকলসীর গড়ন (বোড়াল গ্রামে মাটির তলায় সুবৃহৎ মাটির জালার ভগ্নাবশেষ পাওয়া গেছে), এবং অরণ্যবাসী কাঠুরিয়া প্রভৃতি জাতির বৃত্তি, বনদেবতার পূজা, জন্তুজানোয়ারের পূজা ইত্যাদির গুরুত্ব

১ Bimal Kumar Datta : Some Early Antiquities from Lower Bengal, Modern Review, September 1948.

অনেক বেশি মনে হয়। এগুলি যে সুদূর প্রাগৈতিহাসিক আদিম বঙ্গসভ্যতার স্মৃতি বহন করে চলেছে তাতে সন্দেহের অবকাশ কম। এই সব লোকাচার, আদিম টেক্‌নোলজিকাল নিদর্শন (মৎস্যশিকারের, কাঠ কাটার, জলপথে চলার), বৃক্ষপূজা, জন্তুপূজা ইত্যাদি থেকে মনে হয় দক্ষিণদেশের ভাটি অঞ্চলের সভ্যতার প্রাচীনত্ব সুদূরপ্রসারী, হয়ত প্রস্তরযুগ পর্যন্ত বিস্তৃত এবং তার নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা ভূতাত্ত্বিক ও ভৌগোলিক বিপর্যয়ে ক্ষুণ্ণ হয়েছে মধ্যে মধ্যে।

মৌর্যযুগ বা বৌদ্ধযুগের নিশ্চিত কোন নিদর্শন চব্বিশপরগণায় আজও পাওয়া যায়নি। তবে তমলুকের ইতিহাসের একটি গৌরবময় অধ্যায় যখন বৌদ্ধযুগ জুড়ে ছিল, তখন আদিগঙ্গার পশ্চিমতীরের বর্ধমানভুক্তির (দক্ষিণ চব্বিশপরগণার পশ্চিমাংশ) সঙ্গে তার যে কোন যোগাযোগ ছিল না তা মনে হয় না। না থাকাই আশ্চর্য। তমলুককেন্দ্রিক তথা রাঢ়কেন্দ্রিক বৌদ্ধ ও জৈন সভ্যতার প্রত্যক্ষ গণ্ডীর মধ্যেই এককালে দক্ষিণ-চব্বিশপরগণা অবস্থিত ছিল বলে মনে হয়। সেই বৌদ্ধ ও জৈন প্রভাব পরবর্তীকালে গুপ্ত, পাল ও সেনযুগ পর্যন্ত চলে এসেছে। পরবর্তীকালে এই প্রভাবের নিদর্শনস্বরূপ জৈনমূর্তি পাওয়া গেছে দক্ষিণে। গুপ্তযুগ, কি তারও আগেকার নিদর্শনস্বরূপ মুদ্রা ও মূর্তিও পাওয়া গেছে। কিন্তু আগেই বলেছি, চব্বিশপরগণার প্রাচীন ইতিহাস পুনরুদ্ধার আজও বিস্তীর্ণ খননসাপেক্ষ ব্যাপার। কিন্তু এই খনন সম্পর্কে প্রত্নতত্ত্ববিভাগ অত্যন্ত উদাসীন। একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। ১৯০৬ সালে চব্বিশ-পরগণা জেলার বেড়াচাঁপা অঞ্চলের (বারাসাত-বসিরহাট রেলপথের মধ্যে) তারকনাথ ঘোষ ও অন্যান্য অধিবাসীদের আবেদনে লঙহার্স্ট (Longhurst) সাহেব প্রত্নতত্ত্ববিভাগ থেকে স্থানটি পরিদর্শন করিতে গিয়েছিলেন। তিনি তাঁর রিপোর্টে স্থানটির গুরুত্বের কথা উল্লেখ করেছিলেন : [১]

> ...he mentions that he found fairly large size bricks 15 inch. long by 11 inch. broad and moulded bricks and pottery assignable to an early period. The find of six rectangular copper cast coins in the neighbourhood... further shows that this was one of the earliest settlements in lower Bengal...

১ Archaeological Survey, Annual Report, 1922-23, P. 109.

৪১

৪২

৪৩

৪৪
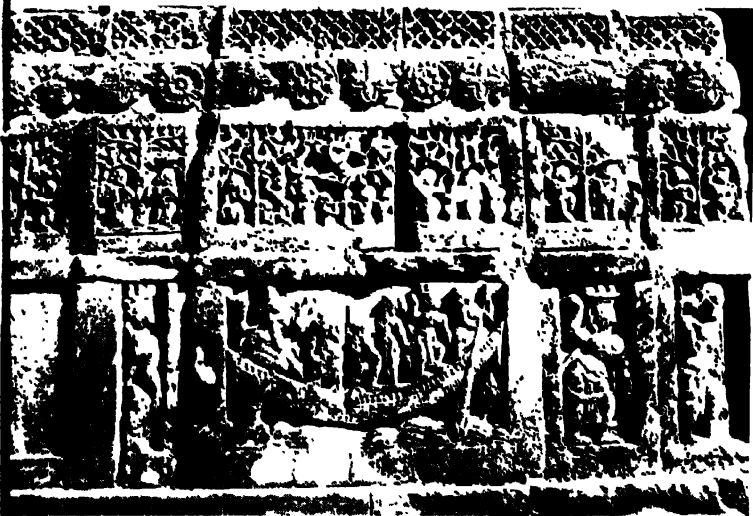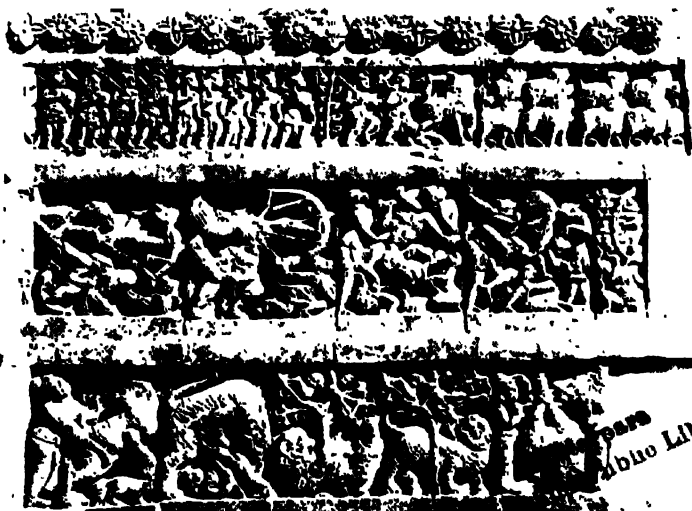
Another site more promising for excavation than the fort is a mound known as Varahamihir's house, just to the north-east of the Berachampa Railway Station.

সম্প্রতি বেড়াচাঁপা অঞ্চল থেকে যে-সব প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গেছে, তা থেকেও অনেকে অনুমান করেছেন যে মৌর্যযুগের সভ্যতার বিস্তার বহুদূর পর্যন্ত হয়েছিল।

এইরকম চব্বিশপরগণার আরও অনেক অঞ্চল খুঁড়লে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা লাভবান হতে পারেন বলে মনে হয়। গড়িয়া, বোড়াল থেকে আরম্ভ করে সুন্দরবনের বিভিন্ন লাট অঞ্চল খুঁড়লে প্রাচীন ইতিহাসের লুপ্তধারার যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যেতে পারে। পুকুর খুঁড়ে ও মাটি খুঁড়ে স্থানীয় লোকেরা যা পেয়েছেন, প্রত্নতাত্ত্বিকদের খননকার্যে উৎসাহ দেবার পক্ষে তা যথেষ্ট।

পালযুগ, বিশেষ করে সেনযুগের নিদর্শন চব্বিশপরগণায় প্রচুর পাওয়া গেছে। বিভিন্ন দেবদেবীর প্রস্তরমূর্তি যা পাওয়া গেছে তা অধিকাংশই সেনযুগের। পশ্চিম-সুন্দরবনের একটি লিপি থেকে জানা যায় যে, ১১৯৬ খৃস্টাব্দে, লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালে শ্রীমদম্মনপাল বা শ্রীমদ্‌ডোম্মনপাল নামে একজন স্বাধীন সামন্তরাজা ছিলেন পূর্বখাড়ী অঞ্চলে। সম্ভবত তিনি লক্ষ্মণসেনের অধীন একজন দক্ষিণ-চব্বিশপরগণার সামন্তরাজা ছিলেন, পরে লক্ষ্মণসেনের দুর্বলতার সুযোগে বিদ্রোহ করে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন হন।[১] ঠিক মুসলমান অভিযানের আগে পর্যন্ত চব্বিশপরগণার রাজনৈতিক ইতিহাসের আভাস পাওয়া যায় এই লিপি থেকে। স্থানীয় সামন্তরাজারা সেনরাজাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন এবং এই বিদ্রোহ ও বিপর্যয়ের মধ্যে মুসলমান অভিযান আরম্ভ হয়েছিল।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে মুসলমান অভিযান আরম্ভ হলেও, পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝির আগে সমগ্র দক্ষিণবঙ্গ মুসলমানদের অধিকারে আসেনি বলে মনে হয়। মুসলমান রাজত্বকালে চব্বিশপরগণা সরকার-সাতগাঁর (সপ্তগ্রামের) অধীন ছিল। চব্বিশপরগণায় মুসলমান আমলের কীর্তির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বসিরহাটের সাহী মসজিদ, পীর গোরাচাঁদ, হালিশহরের

১ History of Bengal, Dacca University. Vol. 1 P. 222-223 ও পাদটীকা।

বাগের মসজিদ ইত্যাদি। মোগলযুগের সূচনার সময় প্রতাপাদিত্যের প্রতিরোধ কাহিনীর সঙ্গেও চব্বিশ পরগণার অনেক স্মৃতি জড়িত আছে। তখন দক্ষিণ-বঙ্গের সর্বশ্রেষ্ঠ ভুঁঞা ছিলেন মহারাজা প্রতাপাদিত্য। তাঁর গড়, পোতনির্মাণ ঘাট, রাজধানী ইত্যাদির ধ্বংসাবশেষ সমগ্র দক্ষিণবঙ্গে ছড়িয়ে আছে, চব্বিশ পরগণাতেও কম নেই। জগদ্দল থেকে সরশুনা-বেহালা ও সাগরদ্বীপ পর্যন্ত তার চিহ্ন আজও পাওয়া যায়।

চৈতন্যভাগবতাদি গ্রন্থ থেকে জানা যায়, পাঠানরাজত্বের শেষদিকে হুসেন শাহের শাসনকালে ছত্রভোগ অঞ্চলে রামচন্দ্র খাঁ নামে একজন সামন্ত ছিলেন। দক্ষিণবঙ্গে তাঁর রীতিমত প্রতাপপ্রতিপত্তি ছিল। তারপর মোগল আমলে দক্ষিণবঙ্গ তথা চব্বিশপরগণার অধিকাংশ হিন্দু জমিদারবংশের প্রতিষ্ঠা হয়েছে দেখা যায়, তার মধ্যে বড়িশার সাবর্ণচৌধুরীরা, বারুইপুরের রায়চৌধুরীরা এবং নদীয়ার রাজারা উল্লেখযোগ্য। এঁদেরই অধীন হিন্দু কর্মচারী ও ভূস্বামীরা আজ চব্বিশপরগণার প্রাচীন বনেদী ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি বংশভুক্ত। এঁদের পর ইংরেজ আমলে নিমকমহলে, জমিদারী দফ্‌তরে, নীলকুঠিতে ও অন্যান্য বিভাগে দেওয়ানী মুৎসুদ্দীগিরি করে নতুন এক অভিজাতশ্রেণীর সৃষ্টি হয় চব্বিশ-পরগণায়। আজ তাঁদের মধ্যে অনেকেই অর্থনৈতিক পাকচক্রে পড়ে সাধারণ মধ্যবিত্তের স্তরে নেমে এসেছেন। জয়নগরের মিত্র, মজিলপুরের দত্ত, খড়দহের বিশ্বাস ও ঘোষ, বহড়ুর বসু প্রভৃতি পরিবার তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাঁদের বৃহৎ অট্টালিকা, পূজামণ্ডপ, দরদালান, দোলমঞ্চ, মন্দির ইত্যাদি আজ জীর্ণ কঙ্কালের মতন অতীত আভিজাত্যের সাক্ষী দিচ্ছে। এইসব ইটপাথরের অট্টালিকা ও দেবালয়ের কঙ্কালের দিকে চেয়ে ইতিহাসের চলার ছন্দ ও গতি-ধারা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করা যায়। বিশেষ করে চব্বিশপরগণার স্যাঁতসেঁতে জোলো আবহাওয়ায় জঙ্গলের দুর্ধর্ষ অভিযান থেকে মনে হয়, মানুষের কীর্তি কত পরিবর্তনশীল এবং স্মৃতিচিহ্ন কত ভঙ্গুর ও ক্ষণস্থায়ী!

বোড়াল

কলকাতার দক্ষিণে মাত্র দশবারো মাইল দূরে বোড়াল গ্রাম। কিন্তু বোড়ালের দিকে চেয়ে মনে হয়, কলকাতা শহর যেন মহারাজাধিরাজ এবং বোড়াল যেন কঙ্কালসার গ্রাম্য চাষী। বোড়াল গ্রামের মধ্যে চতুর্দিকে ঘরবাড়ি দেবালয়, বাঁধ দীঘি পুষ্করিণী ইত্যাদির ধ্বংসস্তূপের মর্মস্পর্শী দৃশ্য। রীতিমত সমৃদ্ধিশালী বর্ধিষ্ণু গ্রাম যে এককালে বোড়াল ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। তখন আদিগঙ্গার তীরে ছিল বোড়াল গ্রাম। খিদিরপুর থেকে গড়িয়া পর্যন্ত যে খালটিকে এখন 'টালির নালা' বলা হয়, সেই পথেই আদিগঙ্গার অধুনালুপ্ত ধারা প্রবাহিত হত। গড়িয়া থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বাঁক ফিরে কাকদ্বীপ পর্যন্ত গিয়ে, সেখান থেকে বর্তমান মুড়িগঙ্গার ধারা ধরে এগিয়ে ধবলাট ও মনসার দ্বীপের মধ্য দিয়ে প্রথমে পশ্চিম, পরে দক্ষিণীমুখী হয়ে সাগরদ্বীপের কাছে বঙ্গোপসাগরে মিলিত হত আদিগঙ্গা। গঙ্গার তীরবর্তী রাজপুর, বারুইপুর, বহড়ু, ময়দা, জয়নগর ইত্যাদি গ্রামের মতনই বর্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল বোড়াল। আদিগঙ্গাই ছিল দক্ষিণ-চব্বিশপরগণার প্রাণ। অধিকাংশ গ্রামই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে এবং গঙ্গার পরিবর্তিত ধারা অনুসরণ করে সভ্যতার কেন্দ্রও স্থানান্তরিত হয়েছে।

গঙ্গার লুপ্ত খাতের ধারে বোড়ালের পথে প্রাচীন দেবালয় ও গঙ্গার ঘাট আজও বনাকীর্ণ অবস্থায় দেখা যায়। দীঘি ও পুষ্করিণী পুনরুদ্ধারকালে বোড়ালে কয়েকটি পাথরের মূর্তিও পাওয়া গেছে। মনে হয় বিষ্ণুমূর্তি। মূর্তির স্থূলত্ব দেখে মনে হয় একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর (সেন আমলের) মূর্তির চেয়ে প্রাচীন, পালযুগেরও হতে পারে। বোড়ালের সুবৃহৎ সেনদীঘি (প্রায় ৪২ বিঘা জুড়ে), বোড়াল থেকে মাত্র কয়েকমাইল দক্ষিণে গোবিন্দপুর গ্রামে প্রাপ্ত লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসনলিপি এবং মৃত্তিকাগর্ভোত্থিত অন্যান্য নিদর্শন থেকে মনে হয়, সেন আমলে বোড়াল গ্রামে একটি বর্ধিষ্ণু সভ্যতাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

বোড়ালের গ্রাম্য দেবদেবীদের মধ্যে ত্রিপুরাসুন্দরী সর্বপ্রধান। ধাতুময়ী মূর্তির পাদপীঠে পঞ্চদেবতা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ঈশ্বর ও রুদ্রের মূর্তি উৎকীর্ণ।

তার উপর শিব শবরূপে শয়ান এবং শিবের নাভিপদ্মস্থিত পদ্মের উপর চতুর্ভুজা ত্রিনয়না ত্রিপুরাসুন্দরীর মূর্তি অধিষ্ঠিত। বোড়ালে 'বাবাঠাকুর' নামে দুটি দেবতা আছেন। সেনদীঘির পশ্চিমকোণে যিনি আছেন, তিনি ত্রিপুরাসুন্দরীর ভৈরব বলে পূজিত হন। সরল দীঘির কোণে যিনি আছেন তিনি কোন্ দেবীর ভৈরব বলা যায় না। এই দেবীর অপর প্রান্তে 'ককাই চণ্ডী' আছেন। এ ছাড়া 'ডর মাকাল' (ডর মহাকাল) নামে এক দেবতার পূজার বহুল প্রচলন ছিল পূর্বে। বাবাঠাকুরের (নামান্তরে ধর্মঠাকুর) মূর্তি গড়ে পূজা হত। এখন এই পূজা সাধারণশ্রেণীর লোকের মধ্যে প্রচলিত।

বোড়াল গ্রামের সমস্ত কীর্তি পরবর্তীকালে নানাকারণে (প্রাকৃতিক ও রাষ্ট্রিক বিপর্যয়ে) ধ্বংস হয়ে যায়। দক্ষিণের অন্যান্য অনেক গ্রামের মতন বোড়ালও সুন্দরবনের উত্তরপ্রান্তের জঙ্গলের মধ্যে সমাধিস্থ হয়। জনশূন্য লোকালয়হীন বোড়ালে তারপর প্রথম যাঁরা বসতি স্থাপন করেন তাঁদের মধ্যে জগদীশ ঘোষ অন্যতম। তখন বা তার আগে দুচার ঘর মৎস্যজীবী ও ডোম ছাড়া অন্য কোন জাতির লোকের বসবাস ছিল বলে মনে হয় না। বোড়ালের প্রাচীনতম ঘোষবংশের বর্তমানে একাদশ পুরুষ চলছে। সুতরাং ঘোষেদের আদিপুরুষ জগদীশ ঘোষ প্রায় তিনশ বছর আগে বোড়ালে জঙ্গল হাসিল করে নতুন বসতি স্থাপন করেছিলেন মনে হয়। বোড়ালের মিত্রবংশের বর্তমানে নবম পুরুষ চলছে, অর্থাৎ তাঁরা ঘোষদের পরে এসেছিলেন। বসুবংশের, অর্থাৎ রাজনারায়ণ বসুর পূর্বপুরুষদের আদিবাস ছিল গড়-গোবিন্দপুরে। ইংরেজরা যখন সেখানে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ নির্মাণ করেন তখন কলকাতার বাইরে সিমলা পল্লীতে তাঁরা বিনিময়স্বরূপ জমিদারী পান। সিমলা থেকে কোন কারণে রাজনারায়ণ বসুর প্রপিতামহ শুকদেব বসু বোড়ালে এসে বসতি করতে বাধ্য হন। অর্থাৎ বোড়ালে রাজনারায়ণ বসুর পূর্বপুরুষরা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রায় মাঝামাঝি আসেন এবং একশতাব্দী আন্দাজ বসবাস করার পর গ্রাম ছেড়ে চলে যান। ঘোষ, বসু ও মিত্রদের সঙ্গে ব্রাহ্মণরাও আসেন। বোড়ালের ভট্টাচার্য, চট্টোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায় ইত্যাদি পরিবার তাঁদেরই বংশধর।

বহড়ু ও ময়দা

'রায়মঙ্গল' কাব্যের কবি বলেছেন, "সঘনে দামামা ধ্বনি, শুনি রায়গুণমণি, বড়ুক্ষেত্র বাহিল আনন্দে। বারাসাতে উপনীত, হইয়া সাধু হরষিত, পূজিল ঠাকুর সদানন্দে।" বহড়ু গ্রাম হল এই প্রাচীন বড়ুক্ষেত্র। সারিবদ্ধ বৃক্ষ-শ্রেণীর ভিতর দিয়ে গ্রাম্য পথ। সেই পথ দিয়ে খানিকটা গেলেই বহড়ুর বসুদের বাড়ি। দোলমঞ্চ ও তার সামনে বিরাট এলাকা জুড়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ান নন্দকুমার বসুর মহলবহুল অট্টালিকার ধ্বংসস্তূপ। নন্দকুমার বসু কিছুদিন জয়পুর রাজ্যেরও দেওয়ান ছিলেন। সেই সময় চুণার থেকে পাথর আনিয়ে এবং জয়পুর থেকে চিত্রশিল্পীদের এনে বহড়ুর বাড়িতে শ্যামসুন্দরজীর মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। বসুদের বাড়ির ভিতরে শ্যামসুন্দর-মন্দিরের গায়ে যে দেয়ালচিত্র আছে, তা বৈষ্ণব ভাবপ্রধান এবং লক্ষ করলে পরিষ্কার বোঝা যায়, খুব ওস্তাদ শিল্পীর আঁকা। প্রায় একশ বছর আগেকার এই রঙিন দেয়ালচিত্রগুলি এখন অনেকটা অস্পষ্ট ও ম্লান হয়ে গেছে। রেখার ভাবলীলায়িত ভঙ্গি, তুলির টান ও সূক্ষ্মতা দেখে জয়পুরের সুদক্ষ শিল্পীর ঘরওয়ানার কথা মনে পড়ে।

বহড়ুবাজারে বসুদের প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দির আছে। খোঁজ করে জানা গেল যে বড়ুগ্রামে ধর্মরাজ আছেন এবং রীতিমত জাগ্রত ধর্মরাজ। বহড়ুবাজার থেকে দক্ষিণদিকে প্রায় আধ মাইল ভিতরে ধর্মরাজের মন্দির। ইটের তৈরি সাধারণ বাংলা-মন্দির নয়। অতি-সাধারণ একখানি টালির ছাওয়া মাটির ঘরে ধর্মরাজ প্রতিষ্ঠিত। একসময় খড়ের চালাঘরেই ছিলেন। বাংলা-দেশে, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে, ধর্মঠাকুরের মূর্তি সাধারণত কূর্মমূর্তি দেখা যায়। চব্বিশপরগণার মধ্যেও দু-একটি গ্রামে এখনও ধর্মঠাকুর কূর্মমূর্তিতে পূজিত হন। বহড়ু ও তার আশপাশের গ্রামে 'ধর্মরাজের' যে মূর্তি দেখলাম, তা আমার কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছে।

বহড়ুর ধর্মরাজের মূর্তি বিশাল পুরুষমূর্তি। উপবিষ্ট অবস্থায় মূর্তির উচ্চতা প্রায় পাঁচ-ছ ফুট। চোখ বড় বড় গোলাকার, গোঁফ পাকানো লম্বা। মাথায় সাপের ফণা একটি। ডান পা মুড়ে বাম পায়ের উপর রেখে,

ডানহাত অভয়মুদ্রার ভঙ্গিতে তুলে উপবিষ্ট। গায়ের রঙ ঘন সবুজ, কানে ধুতরার ফুল। মন্দির বা ঘরের তুলনায় মূর্তিটি এত বড় যে হঠাৎ দেখলে ভয়ে যে কেউ চমকে উঠবেন। ধর্মরাজের মূর্তির পাশে একটি ক্ষুদ্র শিবলিঙ্গ আছে। ধর্মরাজের পূজারী যোগীসম্প্রদায়ের লোক এবং যোগী পূজারীর গৃহের সংলগ্নই ধর্মরাজ-মন্দির। বৈশাখী বুদ্ধ পূর্ণিমায় পূজা ও উৎসব হয় জাঁক করে। বহু লোকের সমাগম হয়।

একজন যোগী প্রৌঢ়া রমণীর সঙ্গে অনেকক্ষণ কথাবার্তা বললাম ধর্মরাজ সম্বন্ধে। বহুকালের প্রাচীন ধর্মরাজ, কতকালের তা তিনি জানেন না। বংশপরম্পরায় তাঁরা পূজা করে আসছেন। খোঁজ করে জানা গেল, বহড়ুতে এখনও প্রায় দশ-পনের ঘর যোগীসম্প্রদায়ের লোকের বাস আছে। অধিকাংশই ছোট ব্যবসায়ী ও দোকানদার। ধর্মরাজ তাঁদেরই প্রধান পূজ্য দেবতা।

ধর্মরাজের এই ধরনের মূর্তি আশপাশের দক্ষিণ-বারাসত, ময়দা প্রভৃতি গ্রামে দেখলাম। সর্বত্র নাম ধর্মরাজ। এদিকে সোনারপুরে রাজপুর গ্রামে কূর্মমূর্তির এক ধর্মঠাকুর আছেন। কিন্তু সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল বহড়ুর পুরুষমূর্তি ধর্মরাজের মতন আর এক দেবতা আছেন মজিলপুরে, নাম বাবাঠাকুর। 'বাবাঠাকুর' ও 'পঞ্চানন' নামে অনেক লোকদেবতা চব্বিশ-পরগণায় ও হুগলী হাওড়া জেলায় আছেন। তাঁদের মূর্তি সাধারণত রক্তবর্ণ, তাছাড়া বহড়ুর ধর্মরাজের সঙ্গে অন্যান্য দিক থেকে সাদৃশ্য আছে। এর ভিতর থেকে উত্তরকালে ধর্মঠাকুরের ক্রমপরিণতি সম্বন্ধে যেন একটা আভাস পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় অঞ্চলের সাধারণ লোকদেবতা 'ধর্মঠাকুর' ক্রমে বর্ধমান, হাওড়া হুগলীর ভিতর দিয়ে ভাগীরথীর তীরে এসে নিম্নবঙ্গে বাবাঠাকুর ও পঞ্চাননের কলেবর ধারণ করে, অবশেষে আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ গণদেবতা শিব-মহাদেবে রূপান্তরিত হয়েছেন। কূর্মমূর্তি পরিত্যাগ করে তিনি শিবলিঙ্গ ও মহাদেবের মূর্তি ধারণ করেছেন। বহড়ুর ধর্মরাজমূর্তি তারই সাক্ষী দিচ্ছে না কি? বোঝা যায়, ধর্মসম্প্রদায়কে এককালে শৈব-সম্প্রদায় আত্মসাৎ করে ফেলেছিলেন এবং নিম্নবঙ্গ সেই আত্মীকরণের অন্যতম কেন্দ্র ছিল। সন্ধিক্ষণের এই সংস্কৃতিদ্বন্দ্বের প্রমাণস্বরূপ বহড়ুর ধর্মরাজ বিরাজ করছেন এবং তাঁর পাশেই রয়েছেন শিব। আত্মসাতের পূর্বাবস্থা। তারপর

ভিন্ন নামগ্রহণ—বাবাঠাকুর ও পঞ্চানন—কিন্তু শিবের বেশ ধারণ করে তারপর গণদেবতার জয়, বা শিবের জয়-জয়কার।

চব্বিশপরগণার মথুরাপুর-লক্ষ্মীকান্তপুর রেলপথে বহড়ু স্টেশনের পশ্চিমে বড়ু, পুবে ময়দা গ্রাম। গ্রামের ভিতর দিয়ে প্রায় একক্রোশ পথ হেঁটে ময়দা পৌঁছতে হয়। পাশে আদিগঙ্গার অবলুপ্ত খাত। সেই খাতের একটা সীমান্তে ময়দা গ্রাম। কালীঘাটের কালীমন্দিরের মতন ময়দার বিখ্যাত কালীমন্দিরও আদিগঙ্গার তীরে প্রতিষ্ঠিত।

শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'আত্মচরিতে' মজিলপুরের কথা বলতে গিয়ে 'ময়দা' গ্রামের উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন: "...প্রাচীন বাঙ্গলা কাব্যে ও পোর্তুগিজদের যাত্রাবিবরণে 'ময়দা' নামক একটি গ্রামের উল্লেখ দেখা যায়। এই মজিলপুরের কয়েক ক্রোশ উত্তর-পূর্বে 'ময়দা' নামে এক গ্রাম এখনও বিদ্যমান আছে।...গ্রামের পার্শ্বে মাঠে মাটি খুঁড়িতে খুঁড়িতে ভগ্ন জাহাজ ও বোটের নিদর্শনস্বরূপ অনেক দ্রব্য পাওয়া গিয়াছে। তাহাতেও অনুমান হয়, এক সময় এই পথে জাহাজাদি চলিত।" জাহাজ চলত খুব বেশিদিন আগে নয়। মহারাজা প্রতাপাদিত্যের আমলেই এই পথে রীতিমত জাহাজ চলাচল করত। গঙ্গার মজাগর্ভে পুকুর খোঁড়ার সময় তাই জাহাজের ভগ্নাবশেষ পাওয়া আশ্চর্য নয়। ময়দার কালীমন্দিরের দরজা এই ভাঙা জাহাজের কাঠ দিয়েই নাকি তৈরি।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, মোগল আমলে, ষোড়শ সপ্তদশ শতাব্দী থেকে বাংলাদেশের 'ভূঞা' ও জমিদারদের কর্মচারী ও আচার্য পুরোহিতরা নিম্নবঙ্গের এইসব অরণ্যাকীর্ণ অঞ্চলে এসে বসবাস করতে আরম্ভ করেন। তার মধ্যে যশোহররাজের কর্মচারীরাও আছেন এবং বড়িশার সাবর্ণচৌধুরীদের মতন মোগল আমলের নতুন জমিদারদের কর্মচারীরাও আছেন। কর্মচারীদের অধিকাংশই কায়স্থ এবং যজ্ঞপুরোহিত, গুরু ও কুলাচার্যরা ব্রাহ্মণ। যেমন জয়নগরের মিত্ররা সাবর্ণচৌধুরীদের কর্মচারী, মজিলপুরের দত্তরা যশোহররাজের এবং তাঁদেরই কুলগুরু উদ্গাতা-ব্রাহ্মণদের বংশধর শিবনাথ শাস্ত্রী। তারপর কোম্পানীর আমলেও কায়স্থ দেওয়ান ও কর্মচারীরা কলকাতার কাছে এই সব

অঞ্চলে এসে বাস করতে আরম্ভ করেন। বহড়ুর বসুরা তাঁদের অন্যতম। এইভাবে মোগলযুগ থেকে নিম্নবঙ্গের গ্রাম্যসমাজের পরিবর্তন হতে থাকে। তার আগে সমগ্র নিম্নবঙ্গে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দেরই একাধিপত্য ছিল। আজও তাঁদের 'মণ্ডল' (গ্রাম্য অধিপতি) উপাধি অতীতের সেই গৌরবময় স্মৃতি বহন করছে এবং আধিপত্য আজও তাঁদের ক্ষুণ্ণ হয়নি।

ময়দা গ্রামের বসু-চৌধুরী, ঘোষ ও বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার খুব বেশি হলে দু-শ আড়াই-শ বছরের বেশি প্রাচীন বাসিন্দা নন। ময়দা গ্রামে আজ কয়েক ঘর ধীবর, রজক ও অন্যান্য শ্রেণীর লোক ছাড়া কায়স্থ-ব্রাহ্মণেরই বাস বেশি। কিন্তু ময়দার আশপাশের গ্রাম সম্বন্ধে (বাঁশতলা, বটতলা, কালীনগর, শ্রীপুর, গঙ্গাপুর) খোঁজ করে জেনেছি প্রত্যেকটি পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়প্রধান গ্রাম, কেবল শ্রীপুর মাহিষ্যপ্রধান। ময়দা ও তার পাশাপাশি গ্রামের এই সামাজিক সংস্থান থেকে নিম্নবঙ্গের ঐতিহাসিক রূপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ময়দার 'কালী' কতদিনের প্রাচীন বলা যায় না, তবে ময়দার কালীমন্দির খুব বেশিদিনের প্রাচীন নয়। স্থানীয় লোক অনেকে বলেন যে, মন্দিরটি নাকি বড়িশার সাবর্ণচৌধুরীরা তৈরি করে দিয়েছিলেন। ময়দা গ্রামে শীতলা, মনসা প্রভৃতি লোকদেবতারাও আছেন। 'বিবিমা' আছেন, হিন্দু-মুসলমানের লৌকিক সংস্কৃতিসমন্বয়ের প্রতীকরূপে। এই ধরনের 'বিবিমা' পীর ও গাজীর দরগাহ ইত্যাদি সমগ্র নিম্নবঙ্গে ছড়িয়ে আছে, হিন্দুমুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বিচিত্র সংস্কৃতিসমন্বয়ের নিদর্শনস্বরূপ। ময়দা গ্রামের উল্লেখযোগ্য লোকদেবতা হলেন 'ধর্মঠাকুর'। উল্লেখযোগ্য কারণ, ময়দার ধর্মঠাকুরও বহড়ুর মতন কূর্মাকৃতি নন। আকারে ছোট, স্বল্প ভয়াবহ এবং পাশাপাশি দুটি মূর্তি খড়ের চালাঘরে প্রতিষ্ঠিত, কালীমন্দিরের উত্তর-পূর্ব কোণে। গ্রামের রজকরাই পূজারী, বৈশাখী বুদ্ধ পূর্ণিমায় সমারোহে পূজা হয়। 'বাবাঠাকুর' অথবা 'পঞ্চানন' নামে পরিচিত দেবতার মতন মূর্তি, অথচ ধর্মরাজ। পূজারীও অব্রাহ্মণ। বহড়ুর মতন ময়দা গ্রামেও গণদেবতা মহাদেব মূর্তিতে রূপান্তরিত হবার পূর্বাবস্থায় বাবাঠাকুর তথা পঞ্চাননের বেশে 'ধর্মরাজ' নামে বিরাজ করছেন।

আটিসারা ও বারুইপুর

শ্রীচৈতন্য নীলাচল যাত্রাপথে আদিগঙ্গার তীরে আটিসারা গ্রামে অবতরণ করেছিলেন। সেই গ্রামে শ্রীঅনন্ত নামে এক পরম সাধু বাস করতেন। এক-রাত্রির জন্য তাঁর গৃহেই শ্রীচৈতন্য আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন এবং সারারাত্রি কৃষ্ণকথা কীর্তন করেছিলেন। পরদিন প্রভাতে অনন্ত পণ্ডিতের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আদিগঙ্গার পথে আবার তিনি নীলাচল যাত্রা আরম্ভ করেন। বৃন্দাবন দাসের 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' গ্রন্থে আটিসারা গ্রামের এই কাহিনী উল্লেখ করা হয়েছে :

হেনমতে প্রভু তত্ত্ব কহিতে কহিতে।
উত্তরিলা আসি আটিসারা নগরেতে ॥
সেই আটিসারা-গ্রামে মহাভাগ্যবান।
আছেন পরম সাধু—শ্রীঅনন্ত নাম ॥
রহিলেন আসি প্রভু তাঁহার আলয়।
কি কহিব আর তাঁর ভাগ্য সমুচ্চয় ॥
অনন্ত পণ্ডিত অতি পরম উদার।
পাইয়া পরমানন্দ বাহ্য নাহি আর ॥

(শ্রীচৈতন্যভাগবত—অন্ত্য, ২য় অঃ)

আটিসারা গ্রামের অস্তিত্ব এখন বারুইপুরের মধ্যে বিলুপ্ত। তার স্বতন্ত্র কোন সত্তা নেই, কিন্তু এই আটিসারার জন্যই বারুইপুর আজ বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের অন্যতম শ্রীপাট ও তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছে। কট্কিপুকুর, সদাব্রতঘাট, কীর্তনখোলাঘাট নামে আজও যে কয়েকটি পুষ্করিণী বারুইপুরে দেখা যায়, তা প্রাচীন ভাগীরথীর খাতের উপর স্থাপিত বলে স্থানীয় লোকের কাছে গঙ্গার মতনই পবিত্র। 'কট্কিপুকুর' নামকরণের কারণ হল, এই ঘাট থেকে শ্রীচৈতন্য কটকের পথে নৌকা করে যাত্রা করেছিলেন, অনন্ত পণ্ডিতের গৃহে একরাত্রি বিশ্রাম নিয়ে। 'সদাব্রত ঘাট' এখনও গঙ্গার খালের সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছে দেখা যায়, মাত্র কয়েকবছর আগেও খালপথে নৌকা এসে ঘাটে ভিড়ত। এখন পুকুরের মাছ রক্ষার জন্য খালের সংযোগপথ বন্ধ করে দেওয়া

হয়েছে। 'কীর্তনখোলা ঘাট' কুলপী রোডের ঠিক পাশে, গঙ্গার খালের ধারে। সারারাত্রি এই স্থানে শ্রীচৈতন্য কীর্তন করেছিলেন, তাই এর নাম কীর্তনখোলা ঘাট। গঙ্গার খালটি এখনও লক্ষ করলে দেখা যায়, বারুইপুর থেকে রাজপুর গড়িয়া-টালিগঞ্জ ঘুরে এসে কালীঘাটের আদিগঙ্গার সঙ্গে মিশেছে এবং বারুইপুর থেকে আরও দক্ষিণে মথুরাপুর-খাড়ি-ছত্রভোগ পর্যন্ত গেছে। প্রাচীন ভাগীরথীর লুপ্তধারা চিনতে একটুও কষ্ট হয় না। মথুরাপুর-খাড়ি-ছত্রভোগ থেকে ভাগীরথী শতমুখী ধারায় গিয়ে সাগরসঙ্গমে মিলিত হত। কাকদ্বীপের গঙ্গাতীরে দাঁড়িয়ে সাগরদ্বীপ পরিষ্কার দেখা যায়।

শ্রীচৈতন্যের নীলাচল যাত্রাকালে বারুইপুর ও আটিসারা গ্রামের কি অবস্থা ছিল তার কোন পরিচয় কোথাও পাওয়া যায় না। তবে গঙ্গাতীরবর্তী দক্ষিণের এই সব গ্রামের অধিকাংশই জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। বারুইপুরে পান-ব্যবসায়ী বারুইরাই ছিলেন প্রধান বাসিন্দা এবং তাঁদের জন্যই গ্রামের নাম বারুইপুর হয়েছে। আজও বারুইপুরে বোধ হয় বারুইদের সংখ্যাই বেশি, তবে পানের বরোজ বারুইপুরে আর দেখা যায় না। এখন বারুইপুরে পেয়ারা, লকেট, সফেদা, গোলাপজাম, আম, কাঁঠাল প্রভৃতি নানারকমের দেশী ফলের চাষ হয়। বারুইরা এখন অধিকাংশই চাকুরিজীবী। বারুইরা ছাড়া প্রাচীন বারুইপুরে ধীবর, যোগী ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দেরও বাস ছিল। মণ্ডলপাড়া, যোগীপাড়া ইত্যাদি নামের মধ্যে তার পরিচয় রয়েছে।

বারুইপুরের বিখ্যাত কায়স্থ জমিদার রায়চৌধুরীদের পূর্বপুরুষ বলভদ্রের পুত্র মদনমোহনের জমিদারীপ্রাপ্তি সম্বন্ধে একটি কিংবদন্তী আছে। মুর্শীদকুলী খাঁর আমলে বাকি খাজনার দায়ে মদনমোহন বন্দী হয়েছিলেন। বন্দী থাকার সময় গাজীসাহেব মুর্শীদকুলী খাঁকে স্বপ্নে আদেশ দেন মদনমোহনকে মুক্তি দিতে এবং নতুন জমিদারী দান করতে। গাজীসাহেবের স্বপ্নাদেশে নবাব মদনমোহনকে দক্ষিণের বিস্তৃত অঞ্চলের জমিদারী দেন। রায়চৌধুরীদের এই জমিদারীর অনেকটাই দেবোত্তর ও পীরোত্তর সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত। এই কিংবদন্তীর সঙ্গে ঐতিহাসিক সত্য অনেকখানি জড়িয়ে আছে। 'রায়চৌধুরী' উপাধী নবাবী আমলের বোঝা যায়, রাজস্ব-আদায়কারী থেকে তাঁরা 'জমিদার' হয়েছিলেন। দক্ষিণবঙ্গে গাজীসাহেবের যে কি অখণ্ড প্রতিপত্তি ছিল তা রায়চৌধুরী পরিবারের জমিদারীপ্রাপ্তির সঙ্গে জড়িত গাজীসাহেবের এই

কিংবদন্তী থেকেই পরিষ্কার বোঝা যায়। সাধারণত হিন্দু দেবদেবীরাই আমাদের স্বপ্নাদেশ দেন, কিন্তু এখানে গাজীসাহেব স্বপ্নাদেশ করলেন হিন্দু জমিদারকে জমিদারী অর্পণ করার জন্য। বিচিত্র নয় কি? চব্বিশপরগণা জেলায় যত ঘুরছি ততই মনে হচ্ছে, দক্ষিণবঙ্গের মতন হিন্দু-মুসলমানের মিলন ও আদর্শসমন্বয়ের এত বড় ক্ষেত্র বোধহয় বাংলাদেশের আর কোথাও নেই। এত সাম্প্রদায়িক হানাহানি ও বিদ্বেষের মধ্যেও দক্ষিণবঙ্গের এই বিচিত্র ঐতিহাসিক বিশেষত্ব আজও অক্ষুণ্ণ রয়েছে, কোথাও আঁচড় লাগেনি।

ধপ্‌ধপির ব্যাঘ্রদেবতা দক্ষিণরায়, ঘুটিয়ারী শরীফের বিখ্যাত গাজীসাহেবের দরগাহ ইত্যাদি বারুইপুরের রায়চৌধুরীদের দেবোত্তর ও পীরোত্তরের অন্তর্ভুক্ত। সবটাই মেদিনীমল্ল পরগণার অধীন এবং এই পরগণার জমিদার রায়চৌধুরীরা। ঘুটিয়ারী শরীফ (কলকাতা থেকে কুড়ি মাইল দূরে, সোনারপুর থেকে ক্যানিং শাখাপথের স্টেশন) মুসলমানদের একটি বিখ্যাত তীর্থস্থান। পীর গাজী মোবারক আলির দরগাহ ও মসজিদ এইখানে প্রতিষ্ঠিত। গাজী-সাহেব এইখানেই দেহত্যাগ করেন এবং রায়চৌধুরীরাই এই দরগাহ তৈরি করে দেন। প্রতিবছর অম্বুবাচীর সময় এখানে বৃহৎ মেলা ও উৎসব হয় এবং উৎসবে হাজার হাজার হিন্দু-মুসলমান যাত্রীর সমাগম হয়। হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই গাজীসাহেবের দরগাহে শিরণি দিয়ে থাকেন। এখনও উৎসবের সময় রায়চৌধুরীদের বাড়ি থেকে প্রথমে শিরণি দেওয়া হয়। কালীমন্দিরে ও শিবমন্দিরে যেমন স্থানীয় জমিদাররা প্রথম পূজা দেন, ঘুটিয়ারী শরীফের গাজীসাহেবের দরগাহে তেমনি বারুইপুরের রায়চৌধুরীরা প্রথমে শিরণি দেন। কালীঘাট ও অন্যান্য পীঠস্থানের মতন ঘুটিয়ারী শরীফও দক্ষিণবঙ্গের অন্যতম তীর্থস্থান। পার্থক্য শুধু এই যে, মুসলমানদের এই তীর্থস্থানের প্রধান হোতা হিন্দু জমিদার এবং হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের হাজার হাজার লোকের সমাগমে তীর্থস্থানটি সরগরম। এখানে কোন জাতিভেদ ও সম্প্রদায়ভেদ নেই।

বারুইপুরের দেবদেবীর বিচিত্র সমাবেশের মধ্যেও সর্বধর্মসমন্বয়ের চমৎকার পরিচয় পাওয়া যায় এবং অধিকাংশ দেবদেবীই রায়চৌধুরীদের দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর ও পীরোত্তর আজও ভোগ করছেন দেখা যায়। প্রথমে পঞ্চানন্দ ওরফে পাঁচুঠাকুরের কথা বলতে হয়। গ্রামের মধ্যে বৈদ্যপাড়ায় প্রাচীন দুটি বাঁধানো অশ্বত্থগাছের তলায় পঞ্চানন ঠাকুর বিরাজ করেন, কোন মন্দির

নেই। হাটতলায় আরও একজন পঞ্চানন আছেন এবং পঞ্চাননের কাছে গাজীসাহেবও আছেন। এ ছাড়া বিশালাক্ষী দেবী আছেন এবং রায়চৌধুরীদের গৃহদেবতা কালীমূর্তি আনন্দময়ী দেবী আছেন। আনন্দগিরি প্রতিষ্ঠিত বলে আনন্দময়ী। সামনে পঞ্চমুণ্ডী আসনে উপবেশন করে আনন্দময়ীর পূজা করা হয়। রায়চৌধুরীদের রাসলীলার উৎসব ও মেলাও বিখ্যাত। রায়চৌধুরীদের পাড়ার মধ্যেই 'বিবিমা' বা ওলাবিবি আছেন, রায়চৌধুরীরা পৃষ্ঠপোষক, মুসলমান ফকির পূজারী এবং কলেরা বসন্তের সময় হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলেই পূজা দেন। পাশেই আটিসারায় গৌরনিতাইয়ের বিগ্রহের নিত্যপূজা হয়। এ ছাড়া চড়কের গাজনও হয় বারুইপুরে এবং এখনও ভৃগুরামের কেশ নিয়ে এসে গাজনের উৎসব আরম্ভ করা হয়। 'ভৃগুরামের কেশের' কাহিনীটি উল্লেখযোগ্য। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও ব্যগ্রক্ষত্রিয়দের মধ্যে পূর্বে অনেক বিখ্যাত লাঠিয়াল ও বীর যোদ্ধা ছিলেন। স্থানীয় জমিদাররা অনেকক্ষেত্রে তাঁদের শরণাপন্ন হতেন। বড়িশার সাবর্ণচৌধুরীদের সঙ্গে বারুইপুরের রায়চৌধুরীদের জমিদারীর সীমানা নিয়ে একবার বিরোধ হয় এবং সেই বিরোধের সমাপ্তি হয় উভয়পক্ষের লাঠিয়ালের সম্মুখযুদ্ধে। সাবর্ণচৌধুরীদের লাঠিয়ালদের সর্দারের নাম ছিল ভৃগুরাম। রায়চৌধুরীদের পক্ষের লাঠিয়ালরা তলোয়ার দিয়ে ভৃগুরামের শিরশ্ছেদন করেন এবং অবশেষে তাঁদেরই জয় হয়। ঘটনাটি চৈত্র মাসের গাজনের দিন ঘটে। ভৃগুরামের সেই কাটামুণ্ডের কেশ আজও বংশপরম্পরায় রক্ষিত আছে এবং আজও বারুইপুরের গাজনোৎসবের সময় ভৃগুরামের সেই কেশ উৎসব-অঙ্গনে না আনলে গাজন শুরু হয় না। বীরত্বের নিদর্শনস্বরূপ ভৃগুরামের কেশ আজও বারুইপুরের গাজনের উৎসবের অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে রয়েছে।

মজিলপুর

আদিগঙ্গার মজাগর্ভের উপর দিয়ে বারুইপুর-লক্ষ্মীকান্তপুর রেললাইন ও বারুইপুর-বিষ্ণুপুর রাস্তা গিয়েছে। সেই রাস্তার পশ্চিমে জয়নগর, পুবে মজিলপুর গ্রাম। জয়নগর প্রাচীন গ্রাম, মজিলপুর অপেক্ষাকৃত নবীন। মধ্যযুগের প্রান্তসীমায় পৌঁছে আমরা মজিলপুর গ্রামের প্রথম পরিচয় পাই। এমনও হতে পারে যে, মজিলপুর গ্রামটাই হয়ত আগে আদিগঙ্গার প্রবাহপথ ছিল। আদিগঙ্গা তখন প্রশস্ত নদী ছিল। সেই আদিগঙ্গা দিয়ে পর্তুগীজদের জাহাজ চলত গঙ্গার উপর দিয়ে, শিবপুরের পাশ দিয়ে, এবং আঁতুল গ্রামের কাছে বর্তমান সাঁকরাইলের খাল দিয়ে গিয়ে বরাবর হুগলী জেলার সপ্তগ্রামে পৌঁছত। উলুবেড়িয়ার পাশ দিয়ে সরস্বতী নদীর মুখ পর্যন্ত যেতে পারত না, কারণ খিদিরপুর থেকে রাজগঞ্জ পর্যন্ত তখন ভূখণ্ড ছিল। খিদিরপুর থেকে জয়নগর-মজিলপুর পর্যন্ত আদিগঙ্গার দুই পাশে গ্রামের নাম প্রাচীন পর্তুগীজ মানচিত্রে দেখা যায়। রেনেলের গাঙ্গেয় বদ্বীপের মানচিত্রে দেখা যায়, বর্তমান মজিলপুরের পশ্চিমাংশের যে বিস্তৃত নিম্নভূমি ধান্যক্ষেত্রে পরিণত হয়ে 'গঙ্গার বাদা' নামে পরিচিত, ঠিক তার উপর দিয়েই আদিগঙ্গার প্রবাহ বইত। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকের কথা। এই আদিগঙ্গার মজাগর্ভে নতুন বসতি ও গ্রামের উৎপত্তি হয়েছে বলেই হয়ত তার নামকরণ হয়েছে 'মজিলপুর'। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর মঙ্গলকাব্যে প্রাচীন ভাগীরথীর বা আদিগঙ্গার তীরবর্তী অনেক জনপদের উল্লেখ আছে দেখা যায়, কিন্তু মজিলপুরের কোন উল্লেখ নেই। অথচ জয়নগরের উল্লেখ আছে। তাতে মনে হয়, সপ্তদশ শতাব্দীর পরে কোন সময় বর্তমান মজিলপুর গ্রামের (উৎপত্তি না হলেও) খ্যাতি হয়েছে।

মজিলপুর-নিবাসী স্বনামধন্য শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'আত্মচরিত' গ্রন্থে লিখছেন: "এইরূপ জনশ্রুতি প্রচলিত আছে যে, জাহাঙ্গীর বাদসার সময় যখন রাজা মানসিং যশোর নগর আক্রমণ করেন, তখন চন্দ্রকেতু দত্ত নামক একজন সম্ভ্রান্ত কায়স্থ ভদ্রলোক, সপরিবারে 'যশোর' বিভাগ হইতে পলায়ন করিয়া ঐ চড়ার উপরিস্থিত গ্রামে (মজিলপুরে) সুন্দরবনের ভিতরে

আসিয়া সপরিবারে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত তাঁহার যজ্ঞপুরোহিত ও কুলগুরু শ্রীকৃষ্ণ উদ্‌গাতা নামক এক ব্রাহ্মণ আসিয়া তাঁহারই প্রদত্ত এক সামান্য ভূমিখণ্ডে আপনার বাসস্থান নির্দেশ করেন। তিনিই আমাদের পূর্ব-পুরুষ (অর্থাৎ শিবনাথ শাস্ত্রীর)।" মজিলপুরের দত্তদের পুরাতন কুলজীতে লেখা আছে যে, ১৬০৬ সালে তাঁদের পূর্বপুরুষ চন্দ্রকেতু দত্ত এবং ভট্টাচার্য ও পোণ্ডাবংশের পূর্বপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ উদ্‌গাতা ও রঘুনন্দন পোতা প্রাচীন যশোহর রাজ্য থেকে সপরিবারে মজিলপুরে এসে বসবাস করেন। চন্দ্রকেতু দত্ত মহারাজা প্রতাপাদিত্যের মুন্সীর কাজ করতেন। মনে হয়, ইসলাম খাঁর সেনাবাহিনীর কাছে প্রতাপাদিত্য যখন যুদ্ধে পরাজিত হন তখন তাঁর সুবিস্তৃত যশোহর-রাজ্যের মধ্যে সাময়িক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। রঙ্গমঞ্চের পটপরিবর্তনের মতন আমাদের দেশে অনবরত রাজা ও রাজবংশের পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু গ্রাম্যসমাজের ক্ষতি বা পরিবর্তন হয়নি বিশেষ। পরিবর্তনের কারণ ঘটেনি। কিন্তু রাজা ও রাজদরবার কেন্দ্র করে যাঁরা কতকটা পরগাছার মতন জীবনধারণ করতেন—সভাপণ্ডিত, গুরু-পুরোহিত, আমলা-অমাত্যবর্গ—রাষ্ট্রীয় বিপর্যয়ের মধ্যে তাঁদেরও ভাগ্যবিপর্যয় ঘটত। এইরকম এক ভাগ্যবিপর্যয়ের মধ্যে পড়েই প্রতাপাদিত্যের আমলা-অমাত্য, পণ্ডিত-পুরোহিতরা সপ্তদশ শতাব্দীতে যশোহর ছেড়ে সুন্দরবনের অনেক জঙ্গলাকীর্ণ জনবিরল গ্রামে এসে বাস করতে আরম্ভ করেন। তাঁরা অধিকাংশই ব্রাহ্মণ কায়স্থ বর্ণের লোক। মজিলপুরের দত্ত ও ভট্টাচার্যদের ইতিহাসও তাই।

এই দত্তপরিবার ও বাৎসগোত্রীয় ব্রাহ্মণেরা ক্রমে মজিলপুর গ্রামের মধ্যভাগ ছেয়ে ফেলেছেন। প্রাচীন গ্রাম-সংস্থান ভেঙে ছত্রভঙ্গ করে দিয়ে তাঁরা যেন নতুন একটি গ্রাম গড়ে তুলেছেন মনে হয়। শুধু নতুন গ্রাম নয়, নিম্নবঙ্গে উন্নতিশীল ও প্রগতিশীল কয়েকটি গ্রামের মধ্যে মজিলপুর আজ যে অন্যতম স্থান অধিকার করেছে, তা প্রধানত তাঁদেরই প্রচেষ্টায়। মধ্যযুগের গ্রাম্যসমাজের ভিত ভেঙে গেছে মজিলপুরে। সপ্তদশ শতাব্দীতে যে ব্রাহ্মণ-কায়স্থরা এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে কায়স্থরা ছিলেন চাকুরিজীবী এবং ব্রাহ্মণদের পেশা ছিল যজন-যাজন, অধ্যয়ন-অধ্যাপন। তার উপর, কলকাতা শহর থেকে মজিলপুর বেশি দূর নয়। কলকাতা শহরের প্রতিষ্ঠা ও প্রগতি প্রায় মজিলপুরের সমসাময়িক। রাজপুর থেকে কলকাতা শহর পর্যন্ত তখন

নিয়মিত দোলদার ছক্কড় গাড়ি করে কোম্পানীর আমলের কর্মচারীবাবুরা যাতায়াত করতেন। রাজপুর থেকে মজিলপুর পাল্‌কিতে বা গোযানে যাওয়া চলত। সপ্তাহান্তে যাতায়াতের অসুবিধা ছিল না। কলকাতা শহরের সঙ্গে এই সহজ যোগাযোগের জন্য নিম্নবঙ্গের গ্রাম্যসমাজের দ্রুত পরিবর্তন হয়েছে, বিশেষ করে কায়স্থ-ব্রাহ্মণপ্রধান গ্রামের। কলকাতা শহরের বাজারের টানে সাধারণ গ্রামের অর্থনৈতিক ভিত্তিতেও আঘাত লেগেছে। গ্রাম্য আত্মনির্ভরতা অনেকটা ভেঙে গেছে। চাকুরিজীবী ও ব্যবসায়ীদের নিয়ে একটা উচ্চ ও মধ্যশ্রেণী গড়ে উঠেছে, যাঁরা গ্রামনির্ভর নন, শহরনির্ভর।

পাশাপাশি শিক্ষা ও সংস্কৃতিরও বিস্তার হয়েছে এই সব গ্রামে। মজিলপুর তার অন্যতম দৃষ্টান্ত। দত্ত, ভট্টাচার্য ও পোণ্ডাবংশের পূর্বপুরুষরা আসবার পর ক্রমে মজিলপুরের চক্রবর্তী, দে, কান্বায়ণ ও অন্যান্য ব্রাহ্মণ কায়স্থ বংশের পূর্বপুরুষরাও গ্রামে এসে বসবাস করেন। চন্দ্রকেতু দত্তের প্রপৌত্র রামচন্দ্র দত্ত ক্রমে সুন্দরবন অঞ্চলে বিস্তৃত জমিদারী লাভ করেন। উদ্‌গাতা, কান্বায়ণ, চক্রবর্তী ও অন্যান্য ব্রাহ্মণবংশে প্রসিদ্ধ পণ্ডিতদেরও আবির্ভাব হয় এবং মজিলপুর গ্রাম টোল-চতুষ্পাঠী ও সংস্কৃতচর্চার অন্যতম কেন্দ্র হয়ে ওঠে। ভট্টাচার্যপাড়ার শিবমন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ লিপি থেকে জানা যায় যে ছাত্র ও দেবালয়বহুল প্রাচীন মজিলপুরে শিক্ষার জন্য অনেক চতুষ্পাঠী ছিল এবং সেগুলি জমিদার ও অন্যান্য ধনী ব্যক্তিদের বৃত্তি বা নিষ্কর ভূমিস্বত্ব থেকে পরিচালিত হত। তারপর উনবিংশ শতাব্দীতে ব্রাহ্মধর্মের আন্দোলনের সময় তার ঢেউ মজিলপুরেও পৌছায়। ইংরেজীশিক্ষা ও স্ত্রীশিক্ষার প্রসার হতে থাকে। শিবনাথ শাস্ত্রীর 'আত্মচরিতে' তার বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।

শক্তিপীঠরূপে মজিলপুরের 'ধন্বন্তরী' কালীবাড়ি বিখ্যাত। কথিত আছে, মজিলপুরের চক্রবর্তীবংশের আদিপুরুষ জনৈক রাজেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী পরিব্রাজকরূপে ভ্রমণকালে ভৈরবানন্দ স্বামী নামে কোন তান্ত্রিক সাধকের সাহচর্যলাভ করেন এবং ডায়মণ্ডহারবারের কাছে নাজরা গ্রামে উপস্থিত হন। পরে ভৈরবানন্দ স্বামী মজিলপুরে আদিগঙ্গাতীরে কালীপীঠ স্থাপন করেন। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মজিলপুরে এই কালীপীঠ স্থাপিত হয়। তারপর ভৈরবানন্দের উপদেশেই তাঁর প্রতিষ্ঠিত দেবীর পূজার জন্য রাজেন্দ্র চক্রবর্তী

নাজরা গ্রাম থেকে এসে মজিলপুরে বিবাহ করে বসবাস করতে আরম্ভ করেন। এই কালীপীঠই মজিলপুরের 'ধন্বন্তরী কালী' নামে প্রসিদ্ধ। এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। নিম্নবঙ্গের জঙ্গলের মধ্যে, বিশেষ করে প্রাচীন ভাগীরথী বা আদিগঙ্গার তীরবর্তী নানাস্থানে তান্ত্রিক সাধকরা ষোড়শ সপ্তদশ শতাব্দী থেকে শক্তি-সাধনার কেন্দ্র গড়ে তুলেছিলেন দেখা যায়। ছত্রভোগ থেকে আরম্ভ করে মজিলপুর, ময়দা, রাজপুর, বোড়াল, কালীঘাট, চিৎপুর প্রভৃতি আদিগঙ্গার তীরবর্তী স্থানগুলি শাক্ত সাধনার কেন্দ্র ছিল।

মজিলপুরের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য লোকদেবতা হলেন পণ্ডিতপাড়া ও কয়েলপাড়ার পঞ্চানন ঠাকুর। কিন্তু পঞ্চানন ঠাকুর কেবল একা নন, একাধিক সঙ্গীসহ বিরাজমান। কয়েলপাড়ার পঞ্চাননের গভীর পাঁশুটে রঙের ভয়ঙ্কর মূর্তি, পাশে শীতলা ঠাকুর (গর্দভবাহন) ও দক্ষিণরায় (বারাঠাকুর) আছেন। পণ্ডিতপাড়ার পঞ্চানন ও শীতলা পাশাপাশি বিরাজমান, রাস্তার তেমাথার মোড়ে একটি সাধারণ ইঁটের ঘরে। আগে চালাঘর ছিল এবং ঘটে পূজা হত, কোন মূর্তি ছিল না। পঞ্চানন ও শীতলার সামনে ছোট ছোট একাধিক দেবতা আছেন—বারাঠাকুর, জরাসুর ও বসন্ত রায়। পাশেই জয়নগরে রক্তাখাঁ পাড়ায় যে পঞ্চানন ঠাকুর আছেন, তিনি কিন্তু বৃষভবাহন। তাঁর পাশাপাশি আরও কয়েকটি পুরাতন পঞ্চানন আছেন, তাঁদের কোন বাহন নেই। লোকদেবতা ধর্মঠাকুর ক্রমে পঞ্চানন্দ রূপের ভিতর দিয়ে যে পরিপূর্ণ শিবমূর্তিতে রূপান্তরিত হয়েছেন, রক্তাখাঁপাড়ার পঞ্চাননরা তার সাক্ষী রয়েছেন। মজিলপুরের কয়েলপাড়া, পণ্ডিতপাড়া এবং পাশেই জয়নগরের রক্তাখাঁপাড়ার পঞ্চানন, শীতলা ও ব্যাঘ্রদেবতার সমাবেশ ও মূর্তিভেদের ভিতর দিয়ে দক্ষিণবঙ্গের লোকসংস্কৃতির সমন্বয় ও পরিবর্তনের ধারাটি খুব চমৎকারভাবে চোখের সামনে ফুটে ওঠে।

৪৭

৪৮
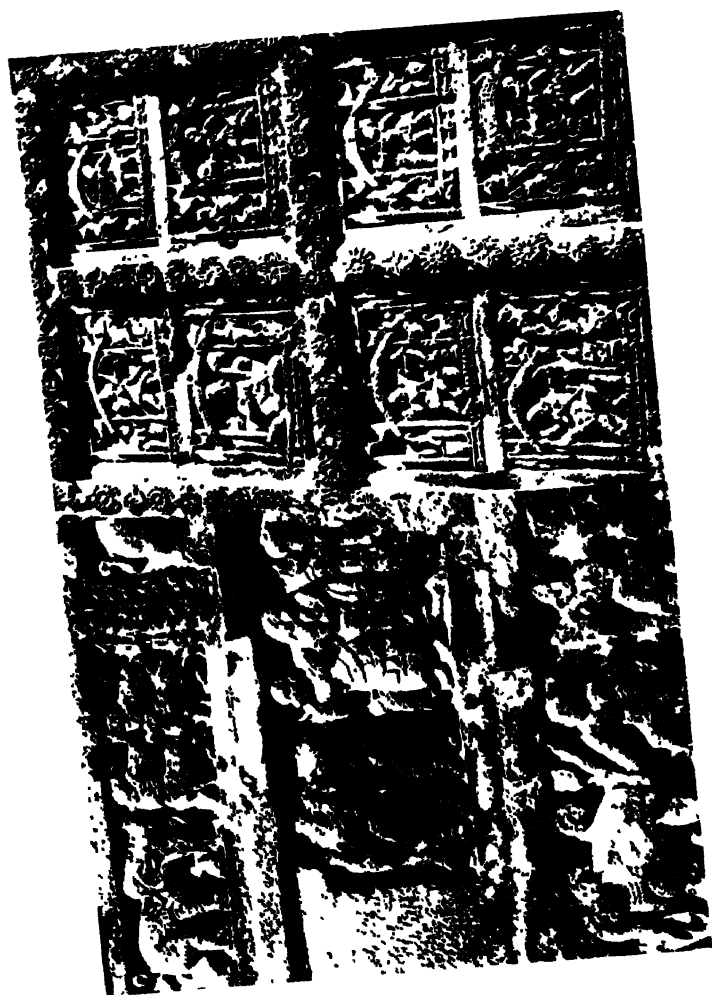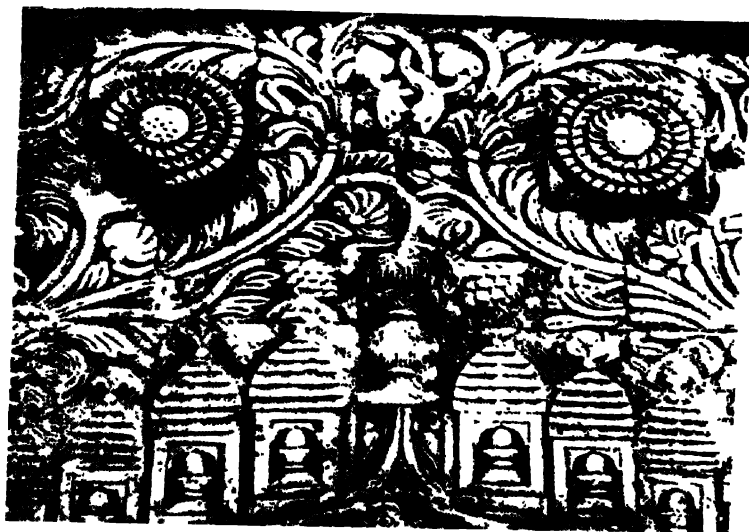
ছত্রভোগ ও চক্রতীর্থ

হিন্দুযুগে আদিগঙ্গার তীরে ছত্রভোগ একটি সমৃদ্ধ গণ্ডগ্রাম ও বন্দররূপে প্রতিষ্ঠিত ছিল বলে মনে হয়। এখনও কাশীনগরের তিন-চার ক্রোশ দক্ষিণে ছুতারভোগ নামে একটি নদী আছে। মনসার ভাসান, চণ্ডীর গান, চৈতন্য-চরিতামৃত, চৈতন্যভাগবত, রায়মঙ্গল প্রভৃতি পুঁথি ও গ্রন্থাদি থেকে জানা যায় যে, আজ থেকে চার-পাঁচশ বছর আগেও আদি-গঙ্গার এই পথে নিম্নবঙ্গের অন্যতম শক্তিপীঠ ছত্রভোগে বাঙালী সদাগর ও তীর্থযাত্রীরা অবতরণ করে, ত্রিপুরাসুন্দরী দেবী ও ভৈরব অম্বুলিঙ্গ-শিব দর্শন করে, চক্রতীর্থে স্নান করে, সমুদ্রের বুকে নৌকা ভাসিয়ে দিতেন।

কৃষ্ণচন্দ্রপুর, বড়াশী, মাধবপুর, কাশীপুর, খাড়ি প্রভৃতি গ্রামের ভিতর দিয়ে চলার সময় চারিদিকে চেয়ে দেখলে বাইরে থেকে আজ আর কিছু মনে হয় না। ভিতরের দিকে বিস্তীর্ণ খাল ও বাদাভূমির কঙ্কালের দিকে চেয়ে কেবল অতীতের সমৃদ্ধ রূপ চোখের সামনে ভেসে ওঠে। ছত্রভোগ কতকালের প্রাচীন তা আজও প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌রা সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে পারেননি। গ্রাম্য লোকেরা পুকুর খুঁড়েছেন, খাল কেটেছেন এবং সেই সময় একাধিক কালো পাথরের হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি, দ্বারফলক ও স্তম্ভাদি পাওয়া গেছে। সেগুলি পাল ও সেন রাজত্বকালের ভাস্কর্যের নিদর্শন বলে মূর্তিবিদ্‌রা অনুমান করেন। এরকম বিক্ষিপ্ত নিদর্শন নিম্নবঙ্গে প্রচুর পাওয়া গেছে, কিন্তু তার ধারাবাহিকতা নির্ধারণের চেষ্টা আজও করা হয়নি। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে এইসব অঞ্চলের ঘন ঘন উল্লেখ করা হয়েছে এবং অকারণে করা হয়নি। লোকালয়শূন্য জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চল হলে এইভাবে সাহিত্যে কখনো তার উল্লেখ থাকত না।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম তাঁর চণ্ডীকাব্যে ছত্রভোগ ত্রিপুরাসুন্দরী ও অম্বুলিঙ্গের কথা উল্লেখ করেছেন:

ডাহিনে অনেক গ্রাম রাখে সাধুবেলা।
ছত্রভোগে উত্তরিলা অবসান বেলা॥

ত্রিপুরা পূজিয়া সাধু চলিল সত্বর।
অম্বুলিঙ্গে গিয়া উত্তরিলা সদাগর॥

ধনপতি ও শ্রীমন্ত সদাগরের বাণিজ্যযাত্রা প্রসঙ্গে এই স্থানের উল্লেখ করা হয়েছে। বিপ্রদাসের মনসার ভাসানেও অনুরূপ উল্লেখ দেখা যায়:

হুলিয়ার গাঙ্গ বাহি চলিল ত্বরিত।
ছত্রভোগে গিয়া রাজা চাপায় ব্যহিত॥
তীর্থকার্য চাঁদ রাজা করিল তথায়।
বদরিকা কুণ্ডজল লইল নৌকায়॥

বদরিকানাথ বা অম্বুলিঙ্গ শিবমন্দিরের পাশে একটি পুষ্করিণী আজও আছে—তারই নাম 'বদরিকা কুণ্ড'। চাঁদ সদাগর, ধনপতি ও শ্রীমন্ত সদাগর সকলেই ছত্রভোগে অবতরণ করে তীর্থকার্য শেষ করে সমুদ্র যাত্রা করতেন দেখা যাচ্ছে। শ্রীচৈতন্যও যে নীলাচল যাত্রাপথে এই ছত্রভোগে অবতরণ করেছিলেন এবং ছত্রভোগ থেকে সমুদ্রপথে পুরীযাত্রা করেছিলেন, তার বিস্তৃত বিবরণ চৈতন্যভাগবতে আছে। তখন রামচন্দ্র খাঁ নামে জনৈক ব্যক্তি এই অঞ্চলের ভূস্বামী বা সামন্ত ছিলেন:

সেই গ্রামে অধিকারী রামচন্দ্র খান।
যদ্যপি বিষয়ী তবু মহাভাগ্যবান॥
অন্যথা প্রভুর সঙ্গে তান দেখা কেনে।
দৈবগতি আসিয়া মিলিলা সেই স্থানে॥

এখানে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে রামচন্দ্র খাঁ দক্ষিণ রাজ্যের অধিকারী ছিলেন। কে এই রামচন্দ্র খাঁ? তখন সুলতান হুসেন শাহের রাজত্বকাল। হুসেন শাহের রাজত্বকালে হিন্দুদের মধ্যে অনেকে উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী নিযুক্ত ছিলেন এবং অনেকের খাঁ উপাধি ছিল। রামচন্দ্র খাঁ সেইরকম একজন নিম্নবঙ্গের প্রতাপশালী হিন্দু সামন্ত ছিলেন। ছত্রভোগে তাঁর সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের হঠাৎ দেখা হয়েছিল এবং তিনি তাঁর নীলাচল যাত্রার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। তিনি কে, এই প্রশ্ন করতে যখন স্থানীয় লোকেরা সকলে বলল—"এই অধিকারী প্রভু, দক্ষিণ রাজ্যেতে"—তখন শ্রীচৈতন্য তাঁকে সমুদ্রপথে নীলাচল যাবার ব্যবস্থা করে দিতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু সেই সময় ষোড়শ শতাব্দীর গোড়াতে, গৌড়ের সুলতানের সঙ্গে উৎকলরাজের যুদ্ধ হচ্ছিল

এবং মেদিনীপুরের অনেকাংশ তখন উৎকলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সুতরাং পথ নিরাপদ নয়। রামচন্দ্র খাঁ সেই কথা শ্রীচৈতন্যকে বললেন :

সবে প্রভু হইয়াছে বিষম সময়।
সে-দেশে এ-দেশে কেহ পথ নাহি বয়॥
কোন্ দিগ দিয়া বা পাঠাঙ লুকাইয়া।
তাহাতে ডরাঙ প্রভু! শুন মন দিয়া॥

এসব বলা সত্ত্বেও শ্রীচৈতন্য যখন তাঁর সঙ্কল্প ব্যক্ত করলেন, তখন রামচন্দ্র খাঁ বাধ্য হয়ে নৌকা ঠিক করে তাঁর যাবার ব্যবস্থা করে দিলেন : "হেনই সময়ে কহে রামচন্দ্র খান। নৌকা আসি ঘাটে প্রভু হইল বিদ্যমান॥"

শ্রীচৈতন্য নৌকায় উঠলেন, ছত্রভোগের ঘাট থেকে। অদূরে সমুদ্র—অপর তীরে মেদিনীপুর। বিস্তীর্ণ জলপথ পাড়ি দিয়ে ওপারে পৌঁছতে হবে। আজও অসংখ্য মাঝি, ব্যবসায়ী ও ধীবররা এই জলপথে মেদিনীপুর থেকে দক্ষিণবঙ্গে যাতায়াত করে। ডায়মণ্ডহারবার থেকে কাকদ্বীপ পর্যন্ত ভাগীরথীর তীরে দাঁড়িয়ে এই জলপথের রেখা পরিষ্কার দেখা যায়। চার-পাঁচশ বছর আগে সমুদ্র আরও কাছে ছিল, ভাগীরথীর আদিপ্রবাহও অনবরুদ্ধ ছিল। সুন্দরবনের জঙ্গল খাড়ি-ছত্রভোগের কাছ থেকেই সমুদ্রকূল পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ছিল। নৌকায় উঠে শ্রীচৈতন্য মুকুন্দকে কীর্তন করতে আদেশ করলেন : "প্রভুর আজ্ঞায় শ্রীমুকুন্দ মহাশয়। কীর্তন করেন প্রভু নৌকায় বিজয়॥"

নৌকার উপর যাত্রীদের এই কীর্তন শুনে মাঝিরা যে ভয় পেয়েছিল, সেকথাও চৈতন্যভাগবতকার উল্লেখ করেছেন। ডাঙায় বাঘ, জলে কুমীর, সামনে বিস্তীর্ণ জলপথ এবং সেখানেও জলদস্যুদের উপদ্রব। মাঝিরা তাই যাত্রীদের ধীর স্থির শান্ত হয়ে বসে থাকতে অনুরোধ করছিল :

অবুধ নাইয়া বোলে, "হইল সংশয়।
বুঝিলাঙ আজি আর প্রাণ নাহি রয়॥
কূলে উঠিলে সে বাঘে লইয়া পলায়।
জলে পড়িলে সে বোল কুম্ভীরেই খায়॥
নিরন্তর এ পানিতে ডাকাইত ফিরে।
পাইলেই ধন-প্রাণ দুই নাশ করে॥

এতেক যাবত উড়িয়ার দেশ পাই।
তাবত নীরব হও সকল গোসাঞি॥"

গোঁসাইরা অবশ্য নীরব হলেন না, উড়িয়ার দেশ পর্যন্ত কীর্তনগান করতে করতে চললেন, এই ছত্রভোগ থেকে। সেই ছত্রভোগ—হিন্দুযুগ ও মুসলমান যুগেও যা সুসমৃদ্ধ গ্রাম, বন্দর ও তীর্থস্থান বলে দক্ষিণবঙ্গে পরিচিত ছিল, আজ তা নগণ্য গ্রামে পরিণত হয়েছে। অবনতির একাধিক কারণ আছে। প্রথম ও প্রধান কারণ, গঙ্গার প্রবাহধারার পরিবর্তন। দ্বিতীয় কারণ, প্রচণ্ড ঝড়বন্যার প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং তৃতীয় কারণ, মগ ও পর্তুগীজ জলদস্যুদের নিম্নবঙ্গে অমানুষিক অত্যাচার ও লুঠতরাজ।

ত্রিপুরাসুন্দরী ও বদরিকানাথ দর্শন করে কাশীনগরের দিকে চললাম। মধ্যে প্রসিদ্ধ চক্রতীর্থ। গঙ্গা, বিষ্ণু, শিব ও শক্তি—এই চার মহাশক্তির অধিষ্ঠানের জন্য একে চক্রতীর্থ বলা হয়। পুরী, কাশী, বৃন্দাবনেও একটি করে চক্রতীর্থ আছে, দক্ষিণবঙ্গেও আছে। নন্দার পুকুর নামে এখানে একটি বৃহৎ পুষ্করিণী আছে, চৈত্রমাসে নন্দার স্নান উপলক্ষ্যে এখানে হাজার হাজার যাত্রীর সমাগম হয় এবং বিরাট মেলা বসে। নন্দার পুকুরের পাশেই শ্মশান, মহাশ্মশান নামে পরিচিত। মহাশ্মশানের বুকেই চক্রতীর্থ প্রতিষ্ঠিত। সামনে খালের উপর দিয়ে পুল পার হয়েই কাশীনগরের হাট, 'মাইবিবির হাট' নামেই সকলের কাছে পরিচিত। নিম্নবঙ্গে পশ্চিম-সুন্দরবন অঞ্চলের বৃহত্তম বাণিজ্য-কেন্দ্রের মধ্যে অন্যতম এই মাইবিবির হাট। হাটের মধ্যে একাধিক লোক-দেবতারা অধিষ্ঠিত আছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল পঞ্চানন ঠাকুর ও শীতলা ঠাকুর। পঞ্চানন ঠাকুর হাটের মধ্যে পর্ণকুটিরেই প্রতিষ্ঠিত, শীতলা ঠাকুরের মন্দিরটি চমৎকার পাকা শান বাঁধানো। মহাসমারোহে পঞ্চানন ও শীতলা ঠাকুরের উৎসব হয়।

মাইবিবির হাট থেকে প্রায় এক ক্রোশ উত্তরে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ খাড়ি গ্রাম। হাট ছেড়ে খাড়ি গ্রামের পথ ধরে হাঁটা শুরু করলাম।

খাড়ি গ্রাম

দক্ষিণ-চব্বিশপরগণার অন্যতম প্রাচীন ঐতিহাসিক স্থান খাড়ি গ্রাম। হিন্দু-যুগের 'খাড়ি-মণ্ডল' বা 'খাড়ি-বিষয়ের' ভৌগোলিক স্মৃতি 'খাড়ি' গ্রামটি আজও বহন করে চলেছে। 'খাড়ি' নামটির উৎপত্তি হয়েছে খাড়ি গ্রামের বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থান থেকে, কোন উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক ঘটনা থেকে নয়। ইংরেজী 'এস্টুয়ারী' (Estuary) কথার অর্থ 'খাড়ি'। নদীর প্রবাহ সাগর-সঙ্গমের কাছে যেখানে ছোট ছোট সঙ্কীর্ণ ধারায় (খালে) বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে সাগরের দিকে ছুটে চলে, তাকেই 'এস্টুয়ারী' বা 'খাড়ি' বলে। সেই বিশেষত্বের জন্যই দক্ষিণ-চব্বিশপরগণার এই গ্রামটির নাম 'খাড়ি'। যে নদীটি এরই কাছাকাছি কোন জায়গা থেকে অজস্র সঙ্কীর্ণ ধারায় অদূরে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে মিলিত হত, তার নাম 'আদিগঙ্গা' বা প্রাচীন ভাগীরথী। খাড়ি গ্রাম আদিগঙ্গারই খাড়ি। আজ তার খাড়িত্ব প্রায় নষ্ট হয়ে গেছে, তবু যেটুকু অবশিষ্ট আছে, তাই তার প্রাচীন মহিমা উপলব্ধি করবার পক্ষে যথেষ্ট।

উত্তর-পশ্চিম সুন্দরবন (খাড়ি যার অন্তর্ভুক্ত) থেকে যে সব ঐতিহাসিক নিদর্শন আজ পর্যন্ত পাওয়া গেছে তার অধিকাংশই মুসলমানপূর্ব হিন্দুযুগের। বিজয়সেন ও লক্ষ্মণসেনের দুখানি তাম্রপট্টলিপি চব্বিশপরগণা থেকে পাওয়া গেছে। বিজয়সেনের বারাকপুরলিপিতে খাড়ি একটি 'বিষয়' বলা হয়েছে এবং লক্ষ্মণসেনের সুন্দরবনলিপিতে 'খাড়িমণ্ডল' কথাটি আছে। হিন্দুযুগে বাংলাদেশের বৃহত্তম ভৌগোলিক বিভাগকে 'ভুক্তি' বলা হত, যেমন দণ্ডভুক্তি, বর্ধমানভুক্তি, পৌণ্ড্রবর্ধনভুক্তি ইত্যাদি। 'ভুক্তি'র পরবর্তী ক্ষুদ্র বিভাগকে 'বিষয়' ও 'মণ্ডল' বলা হত। মণ্ডলের অধীন বিভাগ ছিল 'খণ্ডল', 'আবৃত্তি' ও 'ভাগ'। 'আবৃত্তি' ছিল 'চতুরক' ও 'পাটকে' বিভক্ত। 'পাটক'ই ছিল ক্ষুদ্রতম ভাগ, প্রায় একটি গ্রামের অর্ধেক। প্রাচীন 'বিষয়' বা 'মণ্ডল' কতকটা আধুনিক 'মহকুমার' মতন ছিল বলা চলে। খাড়ি-খাড্ডি-খাটিকা প্রাচীন দুটি ভুক্তির অধীন একটি বিরাট 'মণ্ডল' ছিল। প্রাচীন ভাগীরথীর পশ্চিমতীর ছিল 'পশ্চিমখাড়ি' বা 'পশ্চিম-খাটিকা' এবং পূর্বতীর 'পূর্বখাড়ি' (বর্তমান খাড়ি)। পশ্চিমখাড়ির অন্তর্গত ছিল 'বেতড্ড' বা 'বেতড়চতুরক'

(আধুনিক হাওড়া জেলার 'বেতড়')। দক্ষিণরাঢ় থেকে পরবর্তীকালে কোন সময় হয়ত এই চতুরকটি বিচ্ছিন্ন করে নেওয়া হয়েছিল কোন কারণে। পশ্চিমখাড়ি ছিল বর্ধমানভুক্তির অধীন, পূর্বখাড়ি পৌণ্ড্রবর্ধনভুক্তির অধীন। আলোচ্য খাড়ি এই পূর্বখাড়ি।

লক্ষ্মণসেনের উল্লিখিত সুন্দরবনলিপিতে দেখা যায় যে, দ্বাদশ শতাব্দীর শেষে (১১৯৬ খৃঃ অব্দে) শ্রীমদ্ ডোম্মনপাল (পাঠান্তরে শ্রীমদম্মনপাল; লিপিবিদ্ ডক্টর দীনেশচন্দ্র সরকার ও ঐতিহাসিক ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার ডোম্মনপাল পাঠই গ্রহণ করেছেন) নামে কোন সামন্ত পূর্বখাড়িতে একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালে ডোম্মনপাল তাঁরই অধীন একজন সামন্ত ছিলেন। কিন্তু লিপি পাঠে মনে হয়, তিনি স্বাধীন সামন্ত রাজাই ছিলেন। তা না হলে 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি তিনি নিজে ব্যবহার করার সাহস পেতেন না। লিপিতে বলা হয়েছে যে, অযোধ্যা থেকে এই পালবংশ এসে পূর্বখাড়ি দখল করেন। কি ভাবে দখল করেন তা জানা যায় না। দু'জন রাজার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তার মধ্যে একজনের নামের সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। তবে তাঁর উপাধি ছিল পরমমাহেশ্বর, মহামাণ্ডলিক এবং নামের গোড়ায় 'শ্রী' ও শেষে 'পালদেব' ছিল। তাঁর পরবর্তী রাজা হলেন 'মহাসামন্তাধিপতি, মহারাজাধিরাজ ডোম্মনপাল।' ইনিই দ্বাদশ শতাব্দীতে খাড়ির স্বাধীন সামন্ত রাজা ছিলেন। এই ডোম্মনপাল বাংলার পাল রাজবংশের কেউ কি না, তাও সঠিক বলা যায় না। হওয়াও বিচিত্র নয়। পালরাজত্বের পতনের পর হয়ত রাজবংশের কেউ সুন্দরবনের এই অঞ্চলে পালিয়ে এসে গোপনে শক্তি সঞ্চয় করেছিলেন এবং লক্ষ্মণসেনের রাজত্বের শেষদিকে তাঁর দুর্বলতা ও অবনতির সুযোগ নিয়ে, বিদ্রোহ করে আত্মপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সে যাই হোক এবং ডোম্মনপাল যেই হন তিনি যে দক্ষিণ-চব্বিশপরগণার বিদ্রোহী সামন্ত ছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। সুন্দরবনলিপি থেকে হিন্দুযুগ ও মুসলমানযুগের সন্ধিক্ষণের সামাজিক অবস্থার অনেকটা আভাস পাওয়া যায়। লক্ষ্মণসেনের রাজ্যের আভ্যন্তরিক শৃঙ্খলা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তাঁর অধীন সামন্তরা নানাস্থানে বিদ্রোহ করে স্বাধীনতা ঘোষণা করছিলেন। কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা ক্রমেই শিথিল হয়ে আসছিল। একাধিক কারণে তার মধ্যে সেনরাজত্বকালের তীব্র বর্ণবৈষম্য

ও জাতিভেদনীতিও অন্যতম কারণ হওয়া আশ্চর্য নয়। বাংলার বৃহত্তম লোক-সাধারণ সেনরাজাদের সামাজিক বিভেদনীতির সমর্থক ছিলেন বলে মনে হয় না এবং তাঁরা যে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেননি, এমন কথাও বলা যায় না। তার কোন প্রমাণ তামার পাতে বা পাথরের গায়ে লেখা নেই। অন্তত এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। পূর্বখাড়ির স্বাধীন শাসক শ্রীমদ্ ডোম্মনপাল এই ধরনের কোন সামাজিক বিদ্রোহের নেতা ছিলেন কিনা, তাও বলা যায় না। দক্ষিণ-চব্বিশপরগণার পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও মাহিষ্যপ্রধান গ্রাম্যসমাজের দিকে চেয়ে দেখলে এবং তাঁদের শৌর্যবীর্যের ঐতিহ্যের কথা মনে হলে কর্ণাটবংশীয় সেন-রাজাদের আমলে তাঁদের বিদ্রোহের সম্ভাবনা একেবারেই অস্বাভাবিক বলে মনে হয় না। পশ্চিম-সুন্দরবনে খাড়ি হয়ত সেই বিদ্রোহের অন্যতম কেন্দ্র ছিল।

মুসলমানযুগেও দেখা যায়, দক্ষিণবঙ্গে একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা সহজে সম্ভব হয় নি। পাঠান আমলেও তাই দেখা যায়, হিন্দু সামন্তরা দক্ষিণ-চব্বিশপরগণায় প্রায় স্বাধীনভাবেই রাজত্ব করেছেন। চৈতন্যভাগবতকার-উল্লিখিত রামচন্দ্র খাঁ সেই রকম একজন সামন্ত ছিলেন। ছত্রভোগে (খাড়ি থেকে একক্রোশের মধ্যে) তাঁর সঙ্গে যখন নীলাচলযাত্রী শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎ হয়, তখন স্থানীয় লোকরা তাঁকে দক্ষিণ অঞ্চলের অধিপতি বলে যেভাবে এক বাক্যে পরিচয় দিয়েছিলেন, তাতে তাঁর প্রতিপত্তি সম্বন্ধে আন্দাজ করা কঠিন নয়। মোগলযুগে রাজা প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে মোগল সৈন্যের যে সংঘর্ষ হয়, তাতেও দক্ষিণবঙ্গের একটা বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। তা ছাড়া, হিন্দুসমাজের বর্ণভেদ ও জাতিভেদ প্রথার প্রতি দক্ষিণ-চব্বিশপরগণার সাধারণ লোকের যে কোন সহানুভূতি ছিল না (থাকতে পারেও না), তাও মুসলমানযুগে এই অঞ্চলের ধর্মান্তরের কাহিনী থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায়। কৌলিন্যপ্রথা ও মেল-থাক্-প্রথা-জর্জরিত হিন্দুসমাজে যাঁরা অবজ্ঞাত ছিলেন, তাঁরাই ইস্‌লাম-ধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন আত্মধিকারে। শুধু মুসলমানযুগের নয়, ইংরেজযুগের কাহিনীও তাই। মুসলমান গাজীসাহেবরা যা করেছিলেন, পরবর্তীকালে ইংরেজ পাদ্রী সাহেবরাও সহজেই তাই করতে পেরেছিলেন। হিন্দুসমাজের জাতিভেদপ্রথার প্রতি দক্ষিণ-চব্বিশপরগণার যেন একটা জাতক্রোধ ছিল বলে মনে হয়। গাজীসাহেবদের মতন পাদ্রীসাহেবদেরও তাই ধর্মপ্রচারের

অন্যতম লীলাক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল দক্ষিণবাংলা। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তাই খাড়ি অঞ্চলের এই গুরুত্বপূর্ণ বিবরণটুকু পাওয়া যায় ঃ[১]

The principal village is Khari, which contained a Church and an English School in 1857, and a large portion of the population of which were Christian converts.

১৮৫৭ সালেই খাড়িতে একটি গির্জা, একটি ইংরেজী স্কুল এবং বহু বাঙালী খৃস্টান (ধর্মান্তরিত) ছিলেন দেখা যায়। প্রায় একশ বছর পরে যা দেখলাম, তা নতুন কিছু নয়। কেবল নতুন দৃষ্টিতে আর একবার খাড়ি গ্রামটিকে দেখলাম। খাড়ির নারায়ণীতলা দেখলাম। সাধারণ ইটের ঘরে নারায়ণী প্রতিষ্ঠিত, জমকালো কোন মন্দিরে নয়। সামনে মণ্ডপ। নারায়ণী চতুর্ভুজা, ত্রিনয়না ও সিংহবাহিনী। শক্তির প্রতিমূর্তি, পরিষ্কার বোঝা যায়। 'ডাকার্ণবে' খাড়ির কথা চৌষট্টি পীঠের মধ্যে অন্যতম শক্তিপীঠ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[২] হিন্দুযুগে খাড়ির প্রাধান্যের কথা আগেই বলেছি। তন্ত্রপীঠ তার অনেক পরের পর্ব। মনে হয় ষোড়শ সপ্তদশ শতাব্দীতেই এই সব পীঠস্থানের উৎপত্তি হয়, বিশেষ করে বাংলাদেশের তান্ত্রিক পীঠস্থান[৩] খাড়ির নারায়ণী ছত্রভোগের ত্রিপুরাসুন্দরী তখন থেকেই প্রাধান্য পেয়েছেন মনে হয়। নারায়ণীর পাশেই দেখলাম খাড়ির গাজীসাহেব। অশ্বপৃষ্ঠে আসীন ধর্মযোদ্ধা গাজীসাহেবের এরকম মূর্তি চব্বিশপরগণায় আর কোথাও দেখিনি। অন্যত্রও দেখিনি। বৃদ্ধ এক মুসলমান ফকিরের কাছে বসে বসে গাজীসাহেবের মাহাত্ম্যের কাহিনী এবং হিন্দু-মুসলমাননির্বিশেষে গাজীর পূজারী ভক্তদের কথা শুনলাম। খাড়ির সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক জীবনের একটি পর্বের প্রতিমূর্তি গাজীসাহেব। তার পরবর্তী পর্বের ইতিহাস গির্জা ও বাঙালী খৃস্টানদের মধ্যে প্রতিফলিত হয়ে রয়েছে। সমাজ ও সংস্কৃতির স্তরগুলি আজও এইভাবে খাড়িগ্রামে সুবিন্যস্ত।

১. Hunter: Statistical Account of Bengal, Vol. 1, P. 235.

২ Inscriptions of Bengal, Vol. III, N. G. Majumder, ৬০-৬১ পৃষ্ঠা।

৩ The Sakta Pithas: Dr. D C. Sircar: J.A.S.B. Letters. Vol. 14, No. 1. 1948.

করঞ্জলি ও কাঁটাবেনিয়া

ডায়মণ্ডহারবার থেকে কাকদ্বীপের মধ্যপথে করঞ্জলি গ্রাম এবং পাশেই কাঁটাবেনিয়া। চলাচলের অসুবিধা নেই, একটানা প্রায় ছাব্বিশ মাইল নতুন মোটর-পথ তৈরি হয়েছে। ডায়মণ্ডহারবার থেকে প্রায় তের চৌদ্দ মাইল পথ। করঞ্জলি থেকে কাকদ্বীপ আরও প্রায় দশ বারো মাইল। দক্ষিণ-চব্বিশ-পরগণার প্রায় সমস্ত ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে করঞ্জলির মতন একটি গ্রাম যে এখানে আশে-পাশে কোথাও থাকতে পারে, একথা কাকদ্বীপের পথে চলতে চলতে যেন ভাবাই যায় না। এককালে করঞ্জলি যে বেশ বর্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল তা গ্রামের মধ্যে পা দিলেই বোঝা যায়। ঘোষপাড়া, দত্তপাড়া, ব্রাহ্মণপাড়া, সর্দারপাড়া (মাহিষ্য), উত্তরপাড়া, চর্মকারপাড়া, ব্যগ্রক্ষত্রিয়পাড়া ইত্যাদি কতকগুলি 'পাড়া' নিয়ে করঞ্জলি গ্রাম। সব পাড়ার চেহারা এক-রকম নয়। পাড়ায় পাড়ায় আর্থিক বৈষম্য প্রতিফলিত। কোথাও পুরনো বাড়ির চুনবালির পলেস্তারা নতুন করে লাগানো, কোথাও পলেস্তারা খসে পাঁজর বেরিয়ে পড়েছে। কোথাও ইটের ভগ্নস্তূপের পাশে নতুন টিনের বা খড়ের ঘর উঠেছে। কোথাও চালাঘরগুলি বেশ সুবিন্যস্ত, কোথাও অবিন্যস্ত ও জরাজীর্ণ। বিভিন্ন পাড়ার নাম ও সন্নিবেশ দেখে বোঝা যায়, প্রাচীন করঞ্জলির গ্রাম্যসমাজ রীতিমত দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। গ্রাম্যসমাজের আত্মনির্ভরতাও অক্ষুণ্ণ ছিল। তারপর কলকাতা শহরের কয়েকঘণ্টার পথ, অফিস ও বাজার, তার ভিত ভেঙে দিয়েছে। পথের যত উন্নতি হয়েছে—পায়ে হাঁটা পথ, গরুর গাড়ির পথ, মোটর পথ—শহরের টানে গ্রামের স্বাতন্ত্র্য তত ভেঙে গেছে।

করঞ্জলি-কাঁটাবেনিয়া অঞ্চলের চারিদিক থেকে যে সব পাথরের দেবদেবীর মূর্তি, দ্বারফলক ও স্তম্ভাদি পাওয়া গেছে তা থেকে এইটুকু বোঝা যায় যে, করঞ্জলি ও কাঁটাবেনিয়া অঞ্চলের ইতিহাস বেশ প্রাচীন। সাত-আট শত বৎসর পর্যন্ত, অর্থাৎ সেন ও পালরাজাদের রাজত্বকাল পর্যন্ত সেই ইতিহাসের জের টানা যায়। দেবদেবীর মূর্তির অধিকাংশই বিষ্ণুমূর্তি, বাসুদেবমূর্তি, গণেশ-মূর্তি। করঞ্জলির ঘোষেদের বাড়িতে কয়েকটি মূর্তি এখনও আছে দেখলাম।

করঞ্জলির পাশে দামোদরপুরে এই রকম কয়েকটি মূর্তি গ্রামের লোকেরা পূজা করেন। কাঁটাবেনিয়া গ্রামে একটি বৃহৎ জৈন পার্শ্বনাথের মূর্তিকে বিশালাক্ষী দেবীর পাশের ঘরে প্রতিষ্ঠা করে পূজা করা হয়। এত সুন্দর নিখুঁত পার্শ্ব-নাথের মূর্তি অল্পই দেখা যায়। জৈন পার্শ্বনাথ ক্রমেই চব্বিশপরগণার প্রধান গ্রামদেবতা পঞ্চানন ঠাকুরের শক্তি ও গুণের আধার হয়ে উঠছেন। পুত্র-কামনায় তাঁর ঘরের দরজায় ও জানলার গরাদে ইট বাঁধা শুরু হয়ে গেছে। করঞ্জলি গ্রামের মুখোই ইতস্তত বড় বড় কয়েকটি প্রস্তরস্তম্ভ পড়ে আছে দেখলাম। পাথরের গায়ে ছোট মূর্তিও খোদাই করা আছে। মনে হয়, প্রাচীন কোন মন্দিরের দ্বারফলক। এইসব প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন দেখে বোঝা যায়, মুসলমান-পূর্ব হিন্দুযুগেও করঞ্জলি ও কাঁটাবেনিয়া গ্রামাঞ্চল সভ্যতার একটি বিশিষ্ট কেন্দ্র ছিল। হয়ত প্রাচীন খাড়িমণ্ডল বা পূর্বখাড়ির অন্তর্ভুক্ত ছিল করঞ্জলি-কাঁটাবেনিয়া-দামোদরপুর।

করঞ্জলির লৌকিক দেবদেবীর মধ্যে বাবাঠাকুর ও শীতলার প্রাধান্য বেশি। ব্রাহ্মণপাড়ায়, সর্দারপাড়ায়, চর্মকারপাড়ায়, উত্তরপাড়ায়—প্রায় প্রত্যেক পাড়ায় বাবাঠাকুর বা পঞ্চানন ও শীতলা আছেন। বাবাঠাকুরের পাশেই প্রায় শীতলা অধিষ্ঠিত। কেবল ব্রাহ্মণপাড়ায় দেখলাম, বাবাঠাকুরের পাশে সরস্বতী দেবী স্থান করে নিয়েছেন। এটা ব্রাহ্মণত্বের গুণ। সর্দারপাড়ার (মাহিষ্য) বাবাঠাকুরের মূর্তিটি বিরাট এবং কোন ইটপাথরের কিছু না থাকলেও বাবাঠাকুরের টিনের ঘরটি ও তার সামনের মণ্ডপটি বেশ জমকালো মনে হয়। একটি গ্রামের মধ্যে বাবাঠাকুরের এরকম একত্র সমাবেশ আর কোথাও দেখিনি। দত্তপাড়ায় প্রতিবৎসর পয়লা বৈশাখ যখন গোষ্ঠযাত্রা হয় ও মেলা বসে, এবং যখন বিভিন্ন পাড়ার কৃষ্ণরাধা বিগ্রহের সমাবেশ হয় মেলা-প্রাঙ্গণে, তখনও মেলার একপাশে খোলা জায়গায় এককোণে পঞ্চাননের মূর্তি গড়ে পুজো করা হয়। রাধাকৃষ্ণের লীলায় আমাদের গ্রাম্য লোকদেবতা বাবাঠাকুরের যে কোন স্থান নেই বা সমাদর নেই, তা বেশ বোঝা যায়। কিন্তু একঘরে ও কোণঠাসা হয়েও বাবাঠাকুর যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী লোকদেবতা তা গোষ্ঠযাত্রার সময়ও জানিয়ে যান এবং এককোণে তাঁর পূজার ব্যবস্থা করে রাধাকৃষ্ণের ভক্তরাও তা স্বীকার করতে বাধ্য হন।

এখানে আরও একজন প্রতিপত্তিশালী লোকদেবতা আছেন—হিন্দু-

মুসলমান উভয় সম্প্রদায় পূজিত। তিনি আসলে ওলাইচণ্ডী, মুসলমান আমলে ওলাবিবি হয়েছেন। গ্রাম্য নাম বিবিমা। করঞ্জলির ব্যগ্রক্ষত্রিয়-পাড়ায় ওলাবিবির স্থান আছে। খড়ের চালাঘরের মধ্যে সাতটি ছোট ছোট মাটির ঢিবির (সমাধিচিহ্ন) সামনে তিনটি মাতৃমূর্তি, রঙিন মাটির পুতুল। কাঁটাবেনিয়ার বিক্রমপাড়ায় (মাহিষ্য) খোলা মাঠের মধ্যে গাছতলায় বিবিমা-তলা। ঝড়বৃষ্টিতে মাটির বিবিমা ও সমাধি-ঢিবির কি অবস্থা হয় জানি না, কিন্তু হঠাৎ উন্মুক্ত আকাশের তলায় বিবিমার মূর্তি দেখে থমকে দাঁড়াতে হয়। বাবাঠাকুর ও শীতলা, গাজীসাহেব ও বিবিমার প্রতিপত্তি দক্ষিণ-চব্বিশ-পরগণায় প্রায় সমান দেখলাম সর্বত্র। কাঁটাবেনিয়ায় প্রসিদ্ধ গ্রামদেবতা হলেন বিশালাক্ষী দেবী। পূজারী ব্রাহ্মণ, কিন্তু প্রধান ভক্ত মৎস্যশিকারীরা। সুন্দরবনের মৎস্যশিকারী ও মধু-আহরণকারীদের অন্যতম আরাধ্যা দেবী এই বিশালাক্ষী।

পাণিহাটি-খড়দহ

দক্ষিণ-চব্বিশপরগণার অধুনালুপ্ত আদিগঙ্গার তীরবর্তী গ্রামগুলি প্রদক্ষিণ করে উত্তর-চব্বিশপরগণার গঙ্গাতীরের গ্রামগুলিতে এলে মনে হয় যেন বিভিন্ন এক ভৌগোলিক পরিবেশের মধ্যে এলাম। শুধু ভৌগোলিক নয়, ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশেরও পার্থক্য উপলব্ধি করা যায়। বেশ বোঝা যায়, আমরা নবদ্বীপের বৈষ্ণব-সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ বাহুবেষ্টনীর মধ্যে এসে পড়েছি। বৃটিশ আমলের কল-কারখানার চিম্‌নির ধোঁয়ায় আজ সেই নবদ্বীপ কালচারের আকাশ অনেকটা মেঘাচ্ছন্ন হয়ে গেলেও, সারা চব্বিশপরগণায় এবং কলকাতা মহানগরীর নিকটতম অঞ্চলের মধ্যে, বৈষ্ণব-সংস্কৃতির সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থস্থানরূপে পাণিহাটি-খড়দহ আজও বিরাজমান।

জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' কাব্যে পাণিহাটি গ্রাম সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

পাণিহাটি সম গ্রাম নাহি গঙ্গাতীরে।
বড় বড় সমাজ সব পতাকা মন্দিরে॥

চৈতন্যমঙ্গলের রচনাকাল ষোড়শ শতাব্দীর সপ্তম দশক বলে মনে হয়। গদাধর পণ্ডিত, নিত্যানন্দের অনুচর অভিরাম গোঁসাই ও নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্রের (নামান্তরে বীরচন্দ্র) আদেশে জয়ানন্দ চৈতন্যমঙ্গল রচনা করেছিলেন। নিত্যানন্দবংশ তখন খড়দহে স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করেছেন এবং জয়ানন্দের কাব্যরচনাকালে বীরভদ্রের একাধিক সন্তান হয়েছিল দেখা যায়—

শ্রীনিত্যানন্দ নিবাস করিল খড়দহে।
মহাকুল যোগেশ্বর বংশ যাহে রহে॥

সুতরাং জয়ানন্দ যখন চৈতন্যমঙ্গল রচনা করেছিলেন, অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দীর সপ্তম দশকে, তখন পাণিহাটি বৈষ্ণব-সংস্কৃতির অন্যতম বর্ধিষ্ণু কেন্দ্র-রূপে বেশ প্রাধান্যলাভ করেছিল মনে হয়। তখন পাণিহাটিতে "বড় বড় সমাজ সব পতাকা মন্দিরে" দেখা আশ্চর্য নয়। তার অনেক আগে রচিত কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে' এবং বাংলাভাষায় লেখা প্রাচীনতম চৈতন্য-চরিত-কাব্য বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবতে' পাণিহাটি গ্রামের উল্লেখ আছে।

বৃন্দাবনদাস ও কৃষ্ণদাস শ্রীচৈতন্ত ও নিত্যানন্দের উৎসব-লীলা প্রসঙ্গে পাণিহাটির পরিচয় দিয়েছেন। শ্রীচৈতন্ত, নিত্যানন্দ ও তাঁদের পার্ষদবৃন্দ কয়েকদিন ধরে পাণিহাটি গ্রামের প্রাচীন বটবৃক্ষতলে ও রাঘব পণ্ডিতের গৃহে যে মহোৎসব করেছিলেন, তার জন্তই বাঙালী বৈষ্ণবদের কাছে পাণিহাটি চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। শ্রীচৈতন্তের অন্যতম অন্তরঙ্গ পার্ষদ রাঘব পণ্ডিতের শ্রীপাটের জন্তও পাণিহাটি বিখ্যাত। কিন্তু এ ইতিহাস শ্রীচৈতন্তযুগের ইতিহাস, প্রায় পাঁচ-শ বছরের প্রাচীন ইতিহাস। তার আগের ইতিহাস কি?

শ্রীচৈতন্তের আগে নয় শুধু, তাঁর সমসাময়িক ও পরবর্তীকালেও অনেকদিন পর্যন্ত বাংলাদেশে তান্ত্রিক ও শৈবধর্মের রীতিমত প্রতিপত্তি ছিল। নবদ্বীপও যে শ্রীচৈতন্তের আবির্ভাবের আগে তান্ত্রিক, নাথপন্থী যোগী ও শৈবদের লীলাক্ষেত্র ছিল তা চৈতন্তচরিতকারদের রচনা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়। শ্রীচৈতন্তের সমসাময়িক বলে কথিত কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ 'তন্ত্রসার' রচয়িতা, একথাও মনে রাখা উচিত। তন্ত্রের প্রচণ্ড প্রভাবে বাংলার বৈষ্ণবধর্ম পর্যন্ত বিশিষ্ট রূপ ধারণ করে। স্বয়ং শ্রীরাধাই ক্রমে বাংলার মাটিতে হ্লাদিনী শক্তির প্রতিমূর্তি হয়ে ওঠেন, বৈষ্ণব 'পঞ্চরাত্রের' বিকাশ হয় এবং কামগায়ত্রীও গৃহীত হয়। নবদ্বীপে যে নানারকমের তান্ত্রিক সাধন, কাপালিক ও শৈব যোগীদের প্রতিপত্তি ছিল, ষোড়শ শতাব্দীর চৈতন্তযুগের সাহিত্য থেকেই তার আভাস পাওয়া যায়। রাঢ় অঞ্চলের শক্তিপূজা, তন্ত্রমন্ত্র, মনসা, বাঁশুলি ও ধর্মপূজা বীরভূম-বর্ধমান থেকে গঙ্গার পূর্বতীরে চব্বিশপরগণার উত্তরে এক সময় বেশ বিস্তারলাভ করেছিল বলে মনে হয়। উত্তরকালে একাধিক শক্তি-সাধক উত্তর-চব্বিশপরগণায় খ্যাতিলাভ করেছিলেন দেখা যায়। তাঁদের মধ্যে হালিশহরের রামপ্রসাদ, খড়দহের বিশ্বাসবংশের প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস (যিনি 'প্রাণতোষিণীতন্ত্র' গ্রন্থের সঙ্কলক), কামদেব পণ্ডিত প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হালিশহর, খড়দহ, পাণিহাটি, দক্ষিণেশ্বর, চিৎপুর থেকে আরম্ভ করে কালীঘাট, বোড়াল, বারুইপুর, বহড়ু-ময়দা, জয়নগর, বড়াশী-মাধবপুর ছত্রভোগ পর্যন্ত ভাগীরথী ও আদিগঙ্গার তীরবর্তী জঙ্গলের মধ্যে ও শ্মশানে বামাচারী তান্ত্রিক উপাসক, কাপালিক ও নাথপন্থী শৈব যোগীদের শক্তি-সাধনার কেন্দ্র ও আস্তানা ছিল। উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত চব্বিশপরগণার গঙ্গাতীরবর্তী গ্রামগুলি দেখলে তাই মনে হয়।

চৈতন্যযুগ থেকে, বিশেষ করে নিত্যানন্দ ও তাঁর পুত্র বীরভদ্র গোস্বামীর খড়দহে স্থায়ী বসবাস করার সময় থেকে, পাণিহাটি-খড়দহের প্রাধান্য বাড়তে থাকে এবং নানাস্থান থেকে লোকজন এসে বসবাস করতে থাকে বলে মনে হয়। শ্রীচৈতন্যের অনুরোধে নিত্যানন্দ দারপরিগ্রহ করে গৃহী হন এবং স্থায়ীভাবে খড়দহে এসে বসবাস করতে আরম্ভ করেন। তখন থেকে খড়দহের ইতিহাসের এক নতুন যুগের সূচনা হয়। শ্রীচৈতন্যের আদর্শ ও ধর্মের বোধ হয় সবচেয়ে সক্রিয় প্রচারক ছিলেন নিত্যানন্দ। প্রথমেই নিত্যানন্দ অবশ্য খড়দহে আসেননি। শ্রীচৈতন্যের আদেশে রামদাস, গদাধর দাস, রঘুনাথ, কৃষ্ণদাস পণ্ডিত, পরমেশ্বর দাস, পুরন্দর পণ্ডিত প্রভৃতি পার্ষদগণসহ নিত্যানন্দ গৌড়দেশে যাত্রা করেন। যাত্রাপথে পাণিহাটি আসেন রাঘব পণ্ডিতের গৃহে। সেখানে কিছুদিন অবস্থান করে তিনি গঙ্গাতীরের গ্রামে গ্রামে ধর্ম প্রচার করতে থাকেন।

তবে প্রভু সকল পার্ষদগণ মেলি।
ভক্ত গৃহে গৃহে করে পর্যটন কেলি॥
জাহ্নবীর দুই কূলে যত আছে গ্রাম।
সর্বত্র ফিরেন নিত্যানন্দ জ্যোতিধাম॥

এইভাবে গঙ্গার উভয় তীরে, পূর্বে ও পশ্চিমে, নিত্যানন্দ গ্রামে গ্রামে ধর্ম প্রচার করে বেড়িয়েছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ার দিকের কথা। পাণিহাটি থেকে গদাধর দাসের মন্দিরে যান নিত্যানন্দ, সেখান থেকে নবদ্বীপে। নবদ্বীপ থেকে নিত্যানন্দ খড়দহে আসেন, পুরন্দর পণ্ডিতের দেবালয় স্থানে—

তবে আইলেন প্রভু খড়দহ গ্রামে।
পুরন্দর পণ্ডিতের দেবালয় স্থানে॥
খড়দহ গ্রামে প্রভু নিত্যানন্দ রায়।
যত নৃত্য করিলেন—কথন না যায়॥ (চৈতন্যভাগবত)

খড়দহে পুরন্দর পণ্ডিতের এই দেবালয় স্থানটি কোথায় ছিল, আজ আর জানবার উপায় নেই। গঙ্গার গর্ভে, মনে হয়, দেবালয় ও সেই স্থান দুই-ই অন্তর্ধান করেছে। তা না হলে খড়দহ গ্রামে নিত্যানন্দের প্রথমাবির্ভাবের স্থানটি এবং পুরন্দর পণ্ডিতের দেবালয়টি নিশ্চয় খড়দহবাসী সযত্নে রক্ষা করতেন।

নিত্যানন্দের খড়দহে বসবাস সম্বন্ধে একাধিক কিংবদন্তী আছে। সেগুলি বাদ দিয়েও বলা যায়, নিত্যানন্দ সংসারধর্ম গ্রহণ করে খড়দহে এসেই স্থায়ী বসবাস করেছিলেন। প্রায় সাড়ে চার-শ বছর আগেকার কথা। তখন খড়দহের অবস্থা কি রকম ছিল, তা বৃন্দাবন দাস আভাসে-ইঙ্গিতে বর্ণনা করে গেছেন। নিত্যানন্দের সঙ্গে পুরন্দর পণ্ডিতের যখন খড়দহ গ্রামে মিলন হল তখন—

> পুরন্দর পণ্ডিতের পরম উন্মাদ।
> বৃক্ষের উপরে চড়ি করে সিংহনাদ॥
> বাহ্য নাহি শ্রীচৈতন্যদাসের শরীরে।
> ব্যাঘ্র তাড়াইয়া যায় বনের ভিতরে॥
> তখন চড়েন সেই ব্যাঘ্রের উপরে।
> কৃষ্ণের প্রসাদে ব্যাঘ্র লঙ্ঘিতে না পারে॥
> মহা অজগর সর্প লই নিজ কোলে॥
> নির্ভয়ে চৈতন্যদাস থাকে কুতূহলে॥
> ব্যাঘ্রের সহিত খেলা খেলেন নির্ভয়।
> হেন কৃপা করে অবধূত মহাশয়॥ (চৈতন্যভাগবত)

ব্যাঘ্র ও সর্প-অধ্যুষিত জঙ্গলাকীর্ণ স্থান ছিল খড়দহ, পরিষ্কার বোঝা যায়। নিত্যানন্দ যখন খড়দহে এসে বসবাস করতে আরম্ভ করেন, ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে, তখন খড়দহ জঙ্গলাকীর্ণ দ্বীপের মতন ছিল বলা চলে। তাই নিত্যানন্দ প্রতিষ্ঠিত গোস্বামীবংশকেই খড়দহের অন্যতম প্রাচীন বংশ বলতে হয়। গোস্বামীবংশ ছাড়া খড়দহের প্রাচীনতম বাসিন্দা হিসাবে কুলীনপাড়ার শিরোমণিবংশ (কামদেব পণ্ডিতের বংশধর বলে কথিত—'মুখোপাধ্যায়') উল্লেখযোগ্য। দেবীবর ঘটক এখানে মেলবন্ধন করেন, তাই 'খড়দহমেল'। খড়দহের অন্যান্য ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ পরিবার (ভট্টাচার্য, বিশ্বাস, বসু ও ঘোষ পরিবার) মুসলমানযুগের শেষে ও বৃটিশ আমলের গোড়ার দিকে এসেছিলেন।

দাসপাড়া থেকে কুলীনপাড়া, গোস্বামীপাড়া, বিশ্বাসপাড়া ও ঘোষ-বোসপাড়া ঘুরে দেখলে খড়দহের প্রাচীন গ্রাম্যসমাজের ছবিটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। খড়দহের শিকদার, বিশ্বাস, ঘোষ, বোস, ভট্টাচার্যরা পরবর্তীকালে

এসেছেন। বিশ্বাসদের পূর্বপুরুষ আব্দুলের কাছে সাঁকরেলে থাকতেন এবং মুর্শিদাবাদের নবাবের অধীনে সহকারী মুন্সীর কাজ করতেন। কথিত আছে, বর্গীর হাঙ্গামার সময় তিনি প্রাণ দিয়ে নবাবের তহবিল রক্ষা করার চেষ্টা করে 'বিশ্বাস' উপাধি ও জায়গীর লাভ করেন। এই বংশের দয়ারাম বিশ্বাস অত্যাচারী ছিলেন বলে প্রজারা তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং তাঁর স্ত্রী কোলের সন্তান রামহরিকে নিয়ে পরগণা আমুওয়ারপুরের অধীন মহেশ্বরপুরে পালিয়ে যান। এই রামহরি বিশ্বাস পরে চট্টগ্রামের নিমক-মহালে কাজ করে দেওয়ান হন এবং প্রায় কোটি টাকা সঞ্চয় করে খড়দহে বসবাস করার জন্য ফিরে আসেন। মায়ের নিত্য গঙ্গাস্নানের সুবিধার জন্যই তিনি খড়দহের গঙ্গাতীরে বসবাস করা স্থির করেছিলেন। চট্টগ্রাম, নোয়াখালি থেকে আরম্ভ করে বারাণসী, গয়া, প্রয়াগ, মথুরা, বৃন্দাবন, পুরী প্রভৃতি নানাস্থানে বিশ্বাসরা দেবমন্দির তৈরি করে দিয়েছিলেন। খড়দহের বিশ্বাস-ঘাটে তিনি দ্বাদশটি শিবমন্দিরও প্রতিষ্ঠা করেন। দেবোত্তর ও ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি তিনি বহু পুরোহিত ও ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের দান করেছেন। তাঁর মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠপুত্র প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস কোচবিহার ও শ্রীহট্টে দেওয়ানের কাজ করেন। প্রাণকৃষ্ণ একজন সাধক পুরুষ ছিলেন, তান্ত্রিক সাধক। 'প্রাণতোষিণীতন্ত্র', 'বৈষ্ণবামৃত', 'বিষ্ণুকৌমুদী', 'শব্দকৌমুদী', ক্রিয়াম্বুধি' প্রভৃতি একাধিক গ্রন্থ সঙ্কলন করে তিনি বিনা পয়সায় বিতরণ করেছেন। পিতার দ্বাদশ মন্দিরের সঙ্গে তিনি আরও চৌদ্দটি মন্দির নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। এখনও গঙ্গাতীরে খড়দহের বিশ্বাসঘাটে এই ছাব্বিশটি শিব-মন্দির আছে। আমুওয়ারপুরে তিনি একটি চমৎকার কালীমন্দির তৈরি করে দেন। তাছাড়া আশি হাজার শালগ্রাম ও বিশ হাজার বাণলিঙ্গ সংগ্রহ করে তিনি খড়দহে দ্বিতীয় 'রত্নবেদী' (শ্রীক্ষেত্রের পর) প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। হঠাৎ মৃত্যুর জন্য তাঁর সেই স্বপ্ন সার্থক হয়নি, কিন্তু এখনও তাঁর সংগৃহীত হাজার হাজার শালগ্রাম ও বাণলিঙ্গ তাঁর বিরাট জরাজীর্ণ অট্টালিকার একটি অন্ধকার কক্ষে সযত্নে পূজিত হচ্ছে। দেখলাম, তারই মধ্যে অন্যান্য দেব-দেবীর সঙ্গে একটি কুড়িয়ে-পাওয়া চমৎকার ছোট জৈন মূর্তিও রয়েছে।

বৃটিশ আমলে এককালে বাঙালী মধ্যবিত্ত কায়স্থরা কমিশারিয়েটে চাকরি করে দেশ-বিদেশে ঘুরেছেন এবং প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছেন। খড়দহের

PTO.
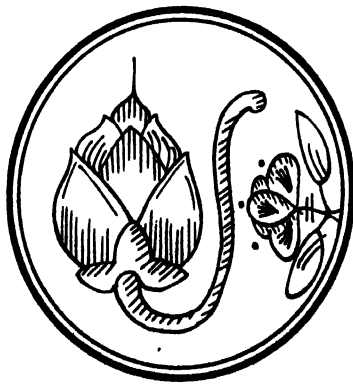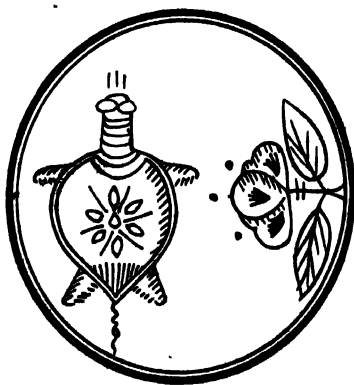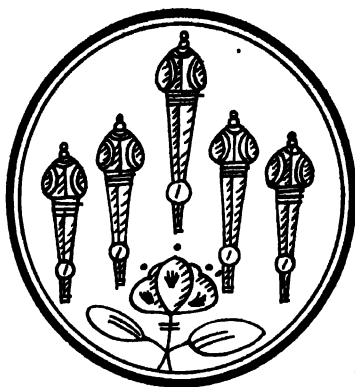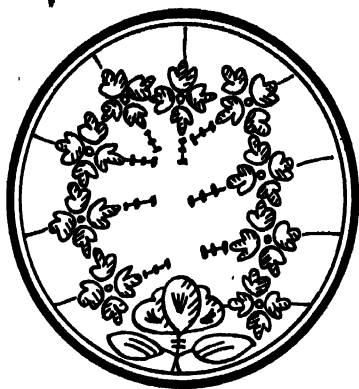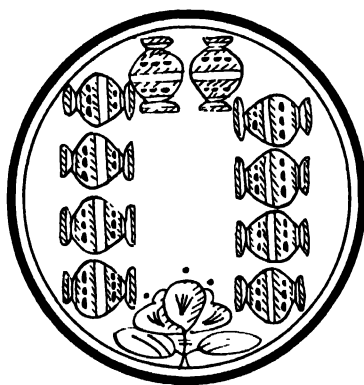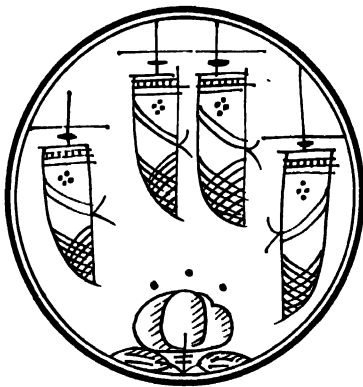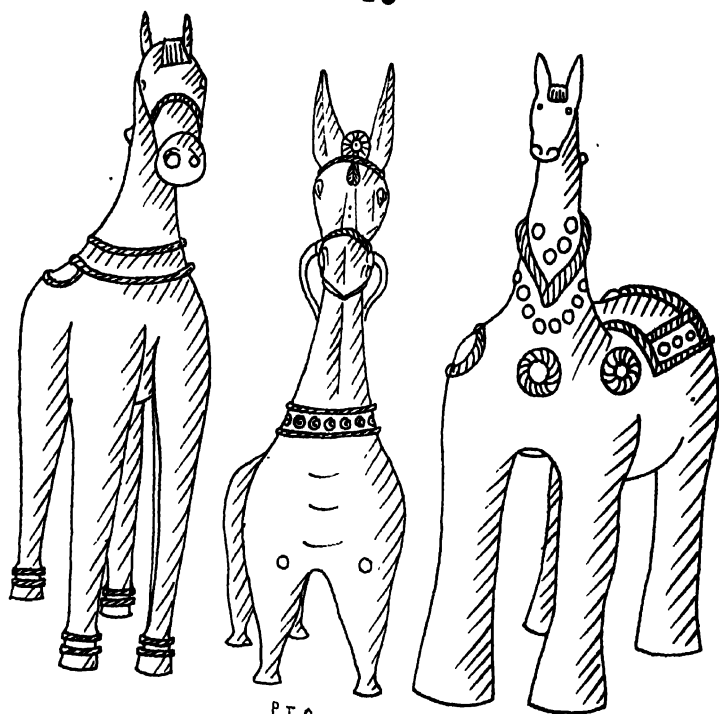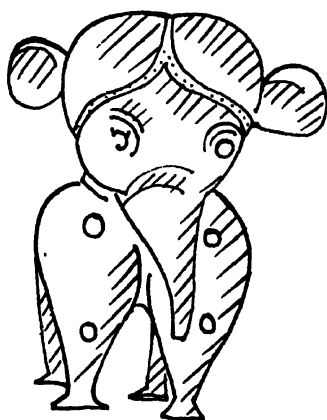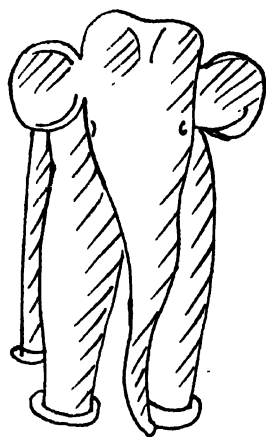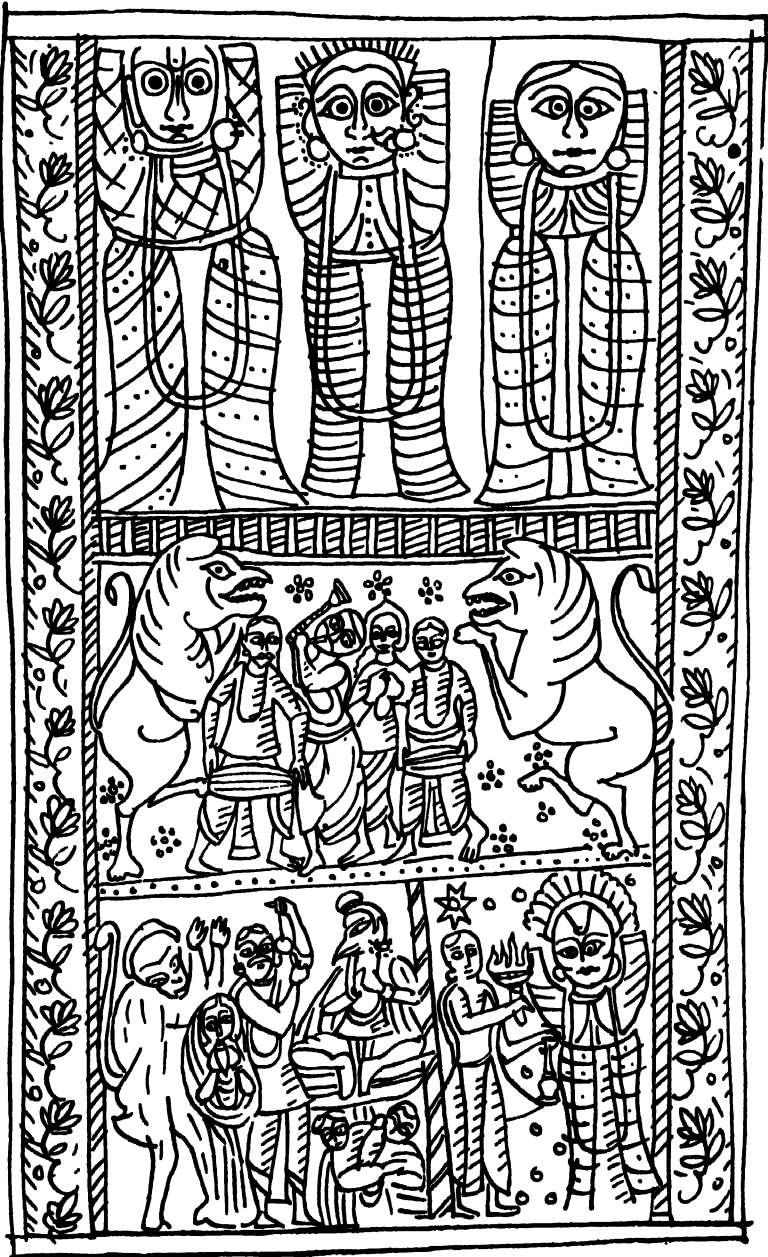
ঘোষপরিবারের পূর্বপুরুষরাও তাই করে প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করেছিলেন। খড়দহের প্রতিপত্তিশালী কায়স্থপরিবারের মধ্যে এই ঘোষরা অন্যতম। প্রাচীন পরিবারের মধ্যে শিকদার ও বসুরাও আছেন। খড়দহের কুম্ভকার, চর্মকার, কর্মকার ও ব্যগ্রক্ষত্রিয়রাও প্রাচীন অধিবাসী এবং কেউ কেউ হয়ত প্রাচীনতমও হতে পারেন। চাকুরীজীবী কায়স্থরা (ঘোষ, বোস ইত্যাদি) প্রধানত বৃটিশ আমলে ইংরেজী শিক্ষার বাহক হয়ে খড়দহে আসেন। তাঁরাই খড়দহে নবযুগের প্রবর্তক। অবশ্য খড়দহ কলকাতা শহরের কাছাকাছি গ্রাম বলেও সেখানে বৃটিশযুগের কলকাতা কালচারের তরঙ্গ সহজেই পৌঁছেছিল। কিন্তু খড়দহে গোস্বামী ও শিরোমণিবংশের ঐতিহ্য দৃঢ়মূল ছিল বলে তাকে উপড়ে ফেলে বৃটিশযুগের ইংরেজী কালচার খড়দহকে কোনদিন বেসামাল করতে পারেনি।

বাংলার সংস্কৃতি-সমন্বয়ের অন্যতম তীর্থস্থান খড়দহ, আগে বলেছি। শুধু তান্ত্রিক-বৈষ্ণব ধর্মের নয় বা ইসলাম ও হিন্দুধর্মের নয়, সমস্ত ধর্মের যাবতীয় মত ও পথের মহামিলন হয়েছিল খড়দহে এক সময়। বিচিত্র ধর্মমত ও সাধনপথের প্রতীকরূপে নানা দেব-দেবী আজও তার সাক্ষী দিচ্ছেন। শ্যামসুন্দর, মদনমোহন তো আছেনই, ত্রিপুরাসুন্দরী আছেন, শিব আছেন, ক্ষেত্রপাল আছেন, শীতলা আছেন, ব্যগ্রক্ষত্রিয়পাড়ায় রাস্তার মোড়ে পঞ্চানন আছেন এবং পীরও আছেন। দেবদেবীদের পাশাপাশি সকল জাতের, ধর্মের ও মতের মানুষও আছে পাশাপাশি। এমন কি, গ্রামবিন্যাসের মধ্যে এখনও পুরাতন ধারার চিহ্ন রয়েছে।

ভাটপাড়া

যাশিষ্ঠাদ্যৈ র্দ্বিজবুধবরৈঃ শোভিতো ভট্টপল্লী
নামগ্রামঃ স্থরসবিদভিন্নন্দম প্রত্যগঙ্গঃ।

—পঞ্চানন তর্করত্ন

বাংলাদেশে বিদ্যাচর্চা, শাস্ত্রচর্চা ও অধ্যাপনার জন্য নবদ্বীপ ও ভাটপাড়ার পণ্ডিতরা ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের জন্য ("নবদ্বীপ হেন গ্রাম ত্রিভুবনে নাই, যাহে অবতীর্ণ হৈলা চৈতন্য গোঁসাই"—চৈঃ ভাঃ) নবদ্বীপের বর্ণনা যেমন আমরা বাংলাসাহিত্যে পাই, ভট্টপল্লী-ভাটপাড়ার বর্ণনা তেমন পাই না। নবদ্বীপ ও ভাটপাড়া বাংলার দুই ঐতিহাসিক পণ্ডিতসমাজের শ্রেষ্ঠ কেন্দ্ররূপে পরিচিত। নবদ্বীপ সম্বন্ধে চৈতন্য-ভাগবতকার যা বলেছেন—

যদ্যপিও নবদ্বীপ পণ্ডিতসমাজ,
কোটার্বুদ অধ্যাপক নানা শাস্ত্র সাজ।
ভট্টাচার্য, চক্রবর্তী, মিশ্র বা আচার্য,
অধ্যাপনা বিনা কার আর নাহি কার্য।
যদ্যপিও সবেই স্বতন্ত্র সবে জয়ী,
শাস্ত্রচর্চা হইলে ব্রহ্মারও নাহি সহি।

—সেকথা ভাটপাড়া সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। ভট্টপল্লী-ভাটপাড়ার এই জাতীয় কোন বর্ণনা বৈষ্ণবকাব্যের মধ্যে কোথাও আছে বলে জানি না। ঐতিহাসিক কারণে না থাকাই সম্ভব, কারণ চৈতন্যসাহিত্যের বিকাশের সময় ভাটপাড়ার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। পরবর্তীকালের কোন সাহিত্যে ভাটপাড়ার বিস্তৃত বর্ণনা আছে কিনা আমার জানা নেই। তবে ভাটপাড়ার বিদ্যাচর্চা সম্বন্ধে কয়েকটি চমৎকার ছড়া ও শ্লোক সংগ্রহ করেছি। তার মধ্যে একটি বাংলা ছড়া, ভাটপাড়ার কোন 'আজীবন ছাত্র'কে লক্ষ্য করে রচিত:

অজ্ঞাত গ্রাম নামা সুচরিত বটুটি
হাত সরু পেট মোটাটি।
সূক্ষ্ম গ্রীবা চরণ সরু তার
মস্তকেতে টিকিটি।
টোলাভ্যন্তর্ভাই দেখিবে যাহার
এই রকম ঠিক গঠনটি।
নিঃসন্দেহে জানিবে মৃত্বাক্
উপেন্দ্রঃ স পোড়োটি।

রসিক পণ্ডিতের ছড়া হলেও এর মধ্যে ভাটপাড়ার বিদ্যাচর্চার কঠোর পরিবেশটি চমৎকার ফুটে উঠেছে।

'ভাটপাড়া' নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে একাধিক কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। কেউ কেউ বলেন, 'ভাটপাড়া'ই মৌলিক নাম, পরে পণ্ডিতসমাজের বাসস্থান হওয়ায় এই নামের সংস্কৃতীকরণ হয়েছে 'ভট্টপল্লী'। আবার কেউ কেউ বলেন, 'ভট্টপল্লী' থেকেই 'ভাটপাড়া' হয়েছে। কিন্তু এসম্বন্ধে সঠিক কিছু বলা যায় না। প্রাচীন বাংলাসাহিত্যের মধ্যে বিপ্রদাস পিপলাইয়ের 'মনসা-বিজয়' কাব্যে ভাটপাড়ার নাম পাওয়া যায়। বিপ্রদাসের 'মনসাবিজয়ের' রচনাকাল—

সিন্ধু ইন্দু বেদ মহী শক পরিমাণ।
নৃপতি হুসেন শাহা গৌড়ের প্রধান।

অর্থাৎ ১৪১৭ শকাব্দ, ১৪৯৫-৯৬ খৃস্টাব্দ। সিদ্ধপুরুষ নারায়ণ ঠাকুর সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে ভাটপাড়া গ্রামে এসে পাশ্চাত্য বৈদিকসমাজের প্রকৃত প্রতিষ্ঠা করেন। ভাটপাড়ার হালদারগোষ্ঠীর পূর্বপুরুষ নারায়ণ ঠাকুরকে এই গ্রামে বাস করান। কেউ কেউ বলেন, মহারাজা প্রতাপাদিত্যের ভক্তিভাজন সিদ্ধপুরুষ অল্লাল ভট্ট (গণপতি ভট্টের পুত্র এবং নারায়ণ ঠাকুরের শ্বশুর) প্রাচীন যশোহরের কাছে ধুলিয়াপুর থেকে এসে অন্তিমকালে কাঁকিনাড়ায় গঙ্গাতীরে বাস করেছিলেন বলে প্রতাপাদিত্য তার পার্শ্বস্থ অরণ্যভূমিতে 'ভট্টপল্লী' গ্রামের প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু তাহলেও 'মনসাবিজয়' রচনাকালের সঙ্গে প্রতাপাদিত্যের ভট্টপল্লী স্থাপনের কোন সামঞ্জস্য স্থাপন করা যায় না। তবে মনসাবিজয়ে ভাটপাড়ায় উল্লেখ সম্বন্ধে অন্য ব্যাখ্যা করা যায়।

বলেন বিপ্রদাসের চাঁদোর বাণিজ্যযাত্রার বর্ণনায় কুমারহাট থেকে বারুইপুর অংশ প্রক্ষিপ্ত, অন্তত স্থানে স্থানে। তার অন্যতম দৃষ্টান্ত হল, মনসাবিজয়ে 'শ্রীপাট খড়দহের' উল্লেখ আছে, যদিও বিপ্রদাসের রচনাকালে খড়দহ 'শ্রীপাট' হতে পারে না, কারণ নিত্যানন্দের বসবাসের আগে খড়দহ শ্রীপাট হয়নি। কাজেই, মনসাবিজয়ে পরবর্তীকালের প্রক্ষেপ আছে এবং প্রক্ষেপকালে হয়ত ভাটপাড়া, খড়দহ ইত্যাদির নাম যোগ করা হয়েছে। তখন হয়ত ভট্টপল্লীর প্রতিষ্ঠা হয়েছে। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ বা অষ্টাদশ শতাব্দীর আগে ভট্টপল্লীর প্রতিষ্ঠা হলেও, খ্যাতি হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং শেষ পর্যন্ত প্রশ্ন একটা থেকেই যায়—'ভাটপাড়া' ও 'ভট্টপল্লী' নামের মধ্যে কোন্‌টি প্রাচীনতর? যদি ভাটপাড়া নাম প্রাচীনতর হয়, তাহলে 'ভাট' নামক শ্রেণীবিশেষের বা ভাঁট গাছের বাহুল্যের জন্য 'ভাটপাড়া' নাম হওয়া বিচিত্র নয়।

বাংলাদেশে পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণদের অন্যতম বাসস্থানরূপে ভাটপাড়া বিখ্যাত। কিন্তু ভাটপাড়ার আদিবাসিন্দা তাঁরা নন। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণরা তাঁদের আগে ভাটপাড়ায় এসেছিলেন। কথিত আছে, বাদশাহের কাছ থেকে দুর্লভরাম হালদারের পিতা এই গ্রাম ও 'হালদার' উপাধি পুরস্কারস্বরূপ পান এবং এই হালদারদেরই পূর্বপুরুষ নারায়ণ ঠাকুরকে এই গ্রামে গুরুরূপে নিয়ে এসে বাস করান। ভাটপাড়া গ্রামে নারায়ণ ঠাকুরই পাশ্চাত্য বৈদিকসমাজের প্রকৃত প্রতিষ্ঠা করেন। পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণরা সর্বপ্রথম বাংলাদেশে আসেন শ্যামলবর্মার রাজত্বকালে, একাদশ শতাব্দীতে। কুলজীগ্রন্থে শ্যামলবর্মা ও হরিবর্মার নামোল্লেখ এবং তাঁদের মোটামুটি ঠিক রাজত্বকালের পরিচয় থেকে বোঝা যায় যে, দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে উত্তরভারত থেকে কয়েকজন বৈদিক ব্রাহ্মণ বাংলাদেশে এসে বসবাস করেন।[১] কেউ কেউ বলেন যে, তাঁরা প্রথমে এসে সরস্বতী নদীর তীরে বসবাস করেন এবং সেখানে থেকে পাঠান অভিযান-কালে অন্যত্র চলে যান। কেউ কেউ বলেন, তাঁরা এসে কোটালিপাড়ায় (ফরিদপুরে) বাস করেন হরিবর্মার আশ্রয়ে এবং সেখান থেকে অন্যত্র যান। বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডে এঁরাই বাংলাদেশে অনেক ব্রাহ্মণের পুরোহিতের কাজ করেন এবং যাঁরা বেদজ্ঞ পণ্ডিত তাঁরা অন্য শ্রেণীর ব্রাহ্মণের গুরুগিরিও করেন।

১ History of Bengal, Vol. 1, ১৫ অ, ৫৮২-৮৩ পৃঃ।

এইভাবে সিদ্ধপুরুষ নারায়ণ ঠাকুর ভাটপাড়ায় আসেন হালদারদের গুরু হয়ে। তাঁরই প্রভাবে ভট্টপল্লীর খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়াতে। ভাটপাড়ায় দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণদেরও বাস আছে। দক্ষিণভারত থেকে অন্ধ্র বা উৎকল-ব্রাহ্মণ যাঁরা আসেন, তাঁদের দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ বলা হয়। পাশ্চাত্য ও দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণদের চেয়ে প্রাচীন বাসিন্দা হলেন রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণরা। ভাটপাড়ার সদ্‌গোপ ও মাহিষ্যরা মনে হয় তার চেয়েও প্রাচীন বাসিন্দা। সংখ্যার দিক দিয়ে পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণরাই প্রধান। ভাটপাড়ায় কয়েকঘর মাত্র কায়স্থের বাস আছে। আধুনিকযুগের কলকারখানা ও শিল্পাঞ্চলের প্রচণ্ড প্রভাব সত্ত্বেও, ভাটপাড়ার প্রাচীন সমৃদ্ধি, সাংস্কৃতিক বিশেষত্ব ও পাণ্ডিত্যের ঐতিহ্যের স্মৃতির স্পর্শ আজও পাওয়া যায়। ভাটপাড়ার পণ্ডিতদের গোঁড়ামির অনেক গল্প শোনা যায়। ভাটপাড়ায় গিয়ে সেদিনও পণ্ডিতদের নিজেদের মুখেই সে-সব গল্প শুনলাম। কিন্তু তার মধ্যেও এমন সব গল্প শুনলাম যা থেকে পণ্ডিতদের রসবোধ ও উদারতাবোধ যে কতটা প্রখর তাও বোঝা যায়।

ভাটপাড়ার 'আজীবন ছাত্র' সম্বন্ধে পূর্বোক্ত ছড়াটি থেকে শুধু "মৃদুবাক্ উপেন্দ্রঃ স পোড়োটি"র কথা যে জানা যায় তা নয়। এরকম পোড়ো ভাটপাড়ায় একসময় অনেক ছিলেন এবং টোলের সংখ্যাও ছিল যথেষ্ট। ১৯০০ সালে পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় তাঁর নিজের জমিতে টোলগুলি একত্রিত করে একটি 'সংস্কৃত কলেজ' প্রতিষ্ঠা করেন, চুঁচুড়ার বরদাপ্রসন্ন সোমের অর্থসাহায্যে। স্মৃতি জ্যোতিষ প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য নানাস্থান থেকে তখন অনেক পড়ুয়া ভাটপাড়ায় আসতেন, আজও আসেন। সংস্কৃত শিক্ষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র বলে ভাটপাড়ার পণ্ডিতরা আধুনিক শিক্ষাকে অন্ধ গোঁড়ামির জন্য বর্জন করেননি। পণ্ডিতদের মধ্যে বহু পরিবারে আধুনিক শিক্ষার আশ্চর্য প্রসার দেখা যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র ভাটপাড়ার পণ্ডিতদের মধ্যে অনেকেই আছেন। ন্যায়রত্ন, স্মৃতিতীর্থ, কাব্যতীর্থ প্রভৃতি উপাধির সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ, বি-এল, পি, এইচ-ডি প্রভৃতি অনেকের নামের পাশে দেখা যায়। বোঝা যায়, সংস্কৃতচর্চা করেও ভাটপাড়ার পণ্ডিতরা আধুনিক শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষা সযত্নে গ্রহণ করেছেন। ভাটপাড়ার পণ্ডিতদের মধ্যে যাঁরা যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে হলধর

তর্কচূড়ামণি, বীরেশ্বর স্মৃতিতীর্থ, হৃষীকেশ শাস্ত্রী, রাখালদাস ন্যায়রত্ন, শিবচন্দ্র সার্বভৌম, পঞ্চানন তর্করত্ন, প্রমথনাথ তর্কভূষণ, কমলকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত পাঁচজন 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। বর্তমান পণ্ডিতদের মধ্যে হরিচরণ স্মৃতিতীর্থ (জ্যোতিষশাস্ত্রবিদ্), নিরঞ্জন স্মৃতিতীর্থ, জগদ্দুর্লভ স্মৃতিতীর্থ, নারায়ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ, পঞ্চানন তর্কবাগীশ, মন্মথনাথ তর্কতীর্থ, রামরঞ্জন স্মৃতিতীর্থ, রামরক্ষ তর্কতীর্থ, শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ, ডক্টর জানকীবল্লভ ভট্টাচার্য, ভবতোষ ভট্টাচার্য প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

ভাটপাড়ার এই বিদ্যানুশীলনের ধারার পাশাপাশি সংস্কৃতিধারার বিশ্লেষণ করলেও, তার উপর পণ্ডিতসমাজের সুস্পষ্ট প্রভাব নজরে পড়ে। ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে ভাগীরথীর উভয়তীরে লোকবিরল গ্রামগুলিতে যে একদা শৈব যোগী ও তান্ত্রিকদের প্রাধান্য ছিল, তা একাধিকবার বলেছি। তারপর বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব বাড়তে থাকে। লোকধর্ম ও লোকোৎসবের মধ্যে বিষহরি বা মনসা, বাঁশুলি ধর্মপূজা ইত্যাদিরও যে প্রচলন ছিল তা চৈতন্যচরিতকারদের বিবরণ থেকে জানা যায়। ধর্মের গাজন পরে অনেক জায়গায় শিবের গাজনে পরিণত হয়েছে এবং ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগেও ভাটপাড়ায় চড়কের বিরাট উৎসব ও মেলা হত। মনসাপূজার সময় এককালে ভাটপাড়ায় ঝাঁপান উৎসব ছিল প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং সাপুড়ে ও ওঝাদের মধ্যে রীতিমত বাণ-মারামারিও হত। মাত্র বছর ত্রিশ-চল্লিশ আগে ঝাঁপান বন্ধ হয়ে গেছে। মনসাপূজা এখনও প্রায় ঘরে ঘরে হয়। ভাটপাড়া থেকে প্রায় দুই মাইল দূরে জয়চণ্ডী দেবী প্রতিষ্ঠিত আছেন এবং মনে হয় তিনি তন্ত্রপ্রধান যুগের সাক্ষী দিচ্ছেন। কেউ কেউ বলেন, জয়চণ্ডী দেবী একসময়ে ডাকাতে-কালী ছিলেন এবং এই অঞ্চলের বিখ্যাত ডাকাতরা (গৌরী বেদে, মধু ডাকাত প্রভৃতি) তাঁর পূজা দিতেন, পূজায় নরবলিও হত। লৌকিক ধর্মের এই সব নিদর্শন ভাটপাড়ায় আজও দেখা যায়, রূপান্তরিত অবস্থায়। ভাটপাড়ার পঞ্চমদোল, জয়চণ্ডীর নবমীর দোল, রামনবমীর উৎসব ও মেলা, শ্রীপঞ্চমীর উৎসবও উল্লেখযোগ্য। শ্রীপঞ্চমীর সময় ভাটপাড়ায় এককালে বিশেষ ঘটা হত, সংস্কৃত নাটক অভিনয় করা হত এবং কলকাতা ও অন্যান্য স্থান থেকে অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তিরাও তা দেখতে আসতেন। ভাটপাড়ায় প্রায় তিন-শ বছরের প্রাচীন বলে কথিত বৃক্ষতলে পঞ্চাননঠাকুরও আছেন, চক্রবর্তীরা তাঁর সেবা ও পূজা করেন।

এ ছাড়া ভাটপাড়ায় মহারাজ নন্দকুমারের আরাধিত শ্রীরাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ এখনও তাঁর দৌহিত্র-বংশ রায়দের কাছে পূজিত হচ্ছেন। কাঁকিনাড়ার মধ্যে মাণিকপীরও আছেন, বেশ প্রাচীন এবং হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকদেবতা। ভাটপাড়ার পণ্ডিতরা পঞ্চদেবতার উপাসক বলে কোন বিশেষ লোকদেবতা বা লোকোৎসবের বিরোধিতা করেননি কখনও। এ ব্যাপারে তাঁরা সত্যই উদার।

ভাটপাড়ার মধ্যে একাধিক প্রাচীন দেবালয় (২০০ থেকে ২২৫ বছরের) আছে, অধিকাংশই শিবমন্দির এবং পণ্ডিতদের প্রতিষ্ঠিত। বাংলার প্রায় সবরকমের মন্দিরই ভাটপাড়ায় এক জায়গায় দেখা যায়, একমাত্র 'জোড়-বাংলা' ও 'দেউল' ছাড়া। সাধারণ চারচালা বাংলা মন্দির, পঞ্চরত্ন ও নবরত্ন মন্দিরই ভাটপাড়ায় বেশি। তার মধ্যে প্রাচীনত্বের দিক দিয়ে ক্রমান্বয়ে কয়েকটি মন্দিরের উল্লেখ করছি: বীরেশ্বর ন্যায়ালঙ্কার কর্তৃক নিজ বাস্তুতে প্রতিষ্ঠিত দুটি 'বাংলা' শিবমন্দির সবচেয়ে প্রাচীন—বাংলা ১১৩৪ সাল, ইংরেজী ১৭২৭-২৮ সালে প্রতিষ্ঠিত। এর পর বাণেশ্বর পঞ্চানন কর্তৃক সস্ত্রীক ভাঙা-বাঁধাঘাটের উপর প্রতিষ্ঠিত দুটি 'বাংলা' শিবমন্দির (১৭৩৭-৩৮ খৃঃ), রামকান্ত সার্বভৌম কর্তৃক সস্ত্রীক প্রতিষ্ঠিত একটি পঞ্চরত্ন (১৭৬৯-৭০ খৃঃ) ও একটি নবরত্ন শিবমন্দির (১৭৭৩-৭৪ খৃঃ), রামশঙ্কর তর্কবাগীশ প্রতিষ্ঠিত দুটি শিবমন্দির (১৮০২-৩ সাল), ভোলানাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত নবরত্ন শিবমন্দির (১৮১৯-২০ খৃঃ)। এ ছাড়াও গত এক-শ বছরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত আরও অনেক মন্দির আছে। ভাটপাড়ার গঙ্গাতীরের বাঁধানো ঘাটটি ভাগীরথীর পূর্বতীরের এই অঞ্চলের ঘাটগুলির মধ্যে অন্যতম প্রাচীন ঘাট, বলরাম সরকার কর্তৃক প্রায় ১১০ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত।

ভাটপাড়া পণ্ডিতদের রসবোধের কথা আগে উল্লেখ করেছি। নানারকমের খাদ্য, সামাজিক ও লৌকিক আচার-ব্যবহার ইত্যাদি নিয়ে পণ্ডিতরা সংস্কৃত শ্লোক, ছড়া ও পাঁচালি রচনা করেছেন। কয়েকটি চমৎকার শ্লোক ও ছড়া আমি সংগ্রহ করেছি, কিন্তু দু-একটি ছাড়া এখানে সব উল্লেখ করা সম্ভব নয়। ভাটপাড়ার আনন্দ শিরোমণির 'মুক্তসখা' পাঁচালির দুই ছত্র এই:

কুঁজোর ইচ্ছে চিৎ হয়ে শোয়
খোঁড়ার ইচ্ছে ছোটে,

বোবার ইচ্ছে কথা কয়
সভত মুখ ফোটে।

দুই ছত্রের নমুনাই যথেষ্ট। খাদ্যের মধ্যে ইলিশমাছের একটি শ্লোক এখানে উদ্ধৃত করছি, বর্ষার সমাগমে সুখপাঠ্য হবে মনে করে:

বিশ্বাধারোহি বায়ুস্তদুপরি
কমঠস্তত্র শেষ স্ততোভূ
স্তস্যাং কৈলাসশৃঙ্গং তদুপরি
গিরিশো মস্তকে যস্য গঙ্গা।
তস্যামিল্লীশ মৎস্যঃ সকল ঋষবরঃ
স্বাদু পীযূষতুল্যঃ
কিং ব্রূমস্তস্য তত্ত্বং বদতি
কমলভূর্ভোজনে যস্য মুক্তিঃ॥

ব্যাখ্যা বা টীকা নিষ্প্রয়োজন। বিশ্বাধার বায়ুস্তর ইত্যাদির অনেক উপরে কৈলাস শৃঙ্গ, তার উপরে গিরিশের মাথা থেকে গঙ্গা প্রবাহিত। সেই গঙ্গার মৎস্য ইলিশ পীযূষতুল্য এবং প্রাণভরে ভোজন করলেই মুক্তিলাভ নিশ্চিত।

কুমারহট্ট-হালিশহর

হালিশহর পরগণা হিন্দুরাজত্বে সম্ভবত 'সুহ্মদেশের' অন্তর্গত ছিল। লক্ষ্মণসেনের সভাকবি ধোয়ী তাঁর 'পবনদূত' কাব্যে মলয়পবনকে "গঙ্গাবীচিতপ্লুত পরিসর" সুহ্মদেশে যেতে বলেন। সেখানে এক বিষ্ণুমন্দির ছিল। তার উত্তরে অধুনালুপ্ত এক শিবের ক্ষেত্র, তার মধ্যে গঙ্গাতীরে রামমন্দির, অর্ধনারীশ্বরমূর্তি, বল্লালসেন-নির্মিত সেতু এবং পবিত্র যমুনা-সঙ্গম অতিক্রম করে লক্ষ্মণসেনের রাজধানী 'বিজয়পুরে' আসতে হয়। এই বিজয়পুর কোথায়, তা নিয়ে দীর্ঘকাল ধরে তর্ক চলছে।[১] আমাদের মনে হয়, হালিশহর-কুমারহট্টের প্রাচীন নাম ছিল 'বিজয়পুর'। আজও হালিশহরের সংলগ্ন 'বীজপুর' নাম তার সাক্ষী দিচ্ছে। লক্ষণীয় হল, 'পবনদূত' কাব্যে গঙ্গা থেকে নির্গত যমুনা নদীর বর্ণনা আছে, কিন্তু সরস্বতী নদীর কোন উল্লেখ নেই। তার পরেই আছে রাজধানী 'বিজয়পুরের' নাম। তাই মনে হয়, গঙ্গার অদূরবর্তী এই রাজধানী পূর্বতীরেই অবস্থিত ছিল, সরস্বতী-সংলগ্ন পশ্চিমতীরে নয়। শ্রীচৈতন্যের সময়েও বিজয়পুর নাম প্রচলিত ছিল মনে হয়, কারণ তাঁর সমকালীন 'মুখ'-বংশীয় একটি বিখ্যাত বিদ্বদ্‌গোষ্ঠীতে ভগবান ন্যায়াচার্য, গোপাল সার্বভৌম প্রভৃতি সাত ভাই ছিলেন এবং সার্বভৌমের নিবাসসূচক 'বিজয়পুরিয়া' পদ কুলগ্রন্থে পাওয়া যায়। সুতরাং কুমারহট্ট-হালিশহরের সভ্যতার ইতিহাস প্রাচীন হিন্দুযুগ পর্যন্ত বিস্তৃত বললে অত্যুক্তি হয় না। 'হালিশহর' নাম মনে হয় মুসলমানযুগের। 'হাবেলীশহর' কথার অপভ্রংশ হালিশহর। 'হাবেলী' কথার অর্থ অট্টালিকা বা প্রাসাদ। অট্টালিকাবহুল নগরী ছিলে বলে 'হালিশহর' নাম।

'কুমারহট্ট' নাম হাবেলীশহরের চেয়ে প্রাচীনতর মনে করবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। আঞ্চলিক বিভাগ হিসাবে 'কুমারহট্ট' ও

---

১ এবিষয়ে 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'য় (১৩৩০ সন) নিখিলনাথ রায়, বিমানবিহারী মজুমদার, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ও মন্মথনাথ বসুর আলোচনা দ্রষ্টব্য। ১৩৪৩ সনের পরিষৎ পত্রিকায় শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের আলোচনাও উল্লেখযোগ্য। 'হালিশহরের গুডউইল ফ্রেটারনিটির' শতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থে (১২৬১-১৩৬১ সন) শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের 'কুমারহট্ট বিদ্যাসমাজ' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

'হাবেলীশহর' সমসাময়িক নাম বলে মনে হয়। বরং হাবেলীশহরই প্রাচীনতম নাম হতে পারে। চৈতন্যসাহিত্যে 'কুমারহট্টের' নাম পাওয়া যায় এবং খুব প্রাচীন হলে সেটা ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ার দিকের কথা। তার আগেই মনে হয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ থেকে সাতগাঁ সরকারের অধীনে হাবেলীশহর গড়ে উঠেছে। কুমারহট্ট নাম বৃহত্তর হাবেলীশহরের স্থানীয় নাম হতে পারে। হালিশহর এক সময় কুম্ভকারদের জন্য বিখ্যাত ছিল। আজও দেখা যায় হালিশহরের হাঁড়িকলসীর একটা নাম-স্বাতন্ত্র্য বজায় রয়েছে। এই কুম্ভকারদের (কুমার) বিরাট হাট বসত হালিশহরে, গঙ্গারঘাট থেকে হাঁড়ি-কলসী নৌকায় করে চালান যেত। তাই 'কুমারহাট' থেকে 'কুমারহট্ট' নাম হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, রাজকুমার এখানে গঙ্গার ঘাটে স্নান করতে আসতেন, তার জন্য হাট বসত, তাই 'কুমারহট্ট'।

ভূগর্ভলব্ধ দুটি প্রস্তর মূর্তি হালিশহরে দেখেছি, যা হিন্দুযুগের, অন্তত সেন আমলের মূর্তি হওয়াই সম্ভব বলে মনে হয়। একটি চমৎকার পাথরের গণেশমূর্তি বারুইপাড়ার শুভচণ্ডীতলায় (শাচণ্ডী বলে কথিত) বটবৃক্ষতলে শাচণ্ডীর প্রস্তরখণ্ডের পাশে দীর্ঘদিন ধরে পূজিত হয়ে আসছে শুনলাম। পাশের শাচণ্ডীর শাপুকুর থেকে খননকালে মূর্তিটি পাওয়া গেছে, শতাধিক বছর আগে। প্রায় দুই ফুট দীর্ঘ মূর্তি, পদ্মাসনে উপবিষ্ট। চার হাতের মধ্যে ডান হাত দুটি ভেঙে গেছে, বাকি অংশ আজও নিখুঁত রয়েছে। পাথরের পালিশ যেন আজও ঝকঝকে রয়েছে মনে হয়।

মাধবেন্দ্র পুরীর যে দ্বাদশজন শিষ্যের কথা কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন, তাঁদের মধ্যে ঈশ্বর পুরী, কেশব ভারতী প্রভৃতি অন্যতম। এঁরাই বাংলা-দেশে বৈষ্ণবধর্মের দীক্ষাগুরু। শ্রীচৈতন্য গয়াতে ঈশ্বর পুরীর কাছে মন্ত্রদীক্ষা নিয়েছিলেন, কাটোয়াতে কেশব ভারতীর কাছে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। ঈশ্বর পুরী যে বাঙালী ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাঁর আসল নাম কি ছিল জানা যায় না। কুমারহট্ট-হালিশহরে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণপরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন, পিতার নাম শ্যামসুন্দর আচার্য (প্রেমবিলাস, ২৩ অধ্যায়)। 'ভক্তিরত্নাকরের' মতে তিনি বাসুদেব সার্বভৌমের আত্মীয় গোপীনাথ

আচার্যের গৃহে সংস্কৃতে 'শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত' রচনা করেন। ঈশ্বর পুরী হালিশহর থেকে নবদ্বীপে প্রায় আসতেন এবং শ্রীচৈতন্যকে তাঁর ধর্মমতে দীক্ষিত করার চেষ্টা করতেন। তরুণ শ্রীচৈতন্য তখন পাণ্ডিত্য-গৌরবে গর্বিত।

সংস্কৃতে রচিত ঈশ্বর পুরীর 'শ্রীকৃষ্ণলীলামৃতের' ব্যাকরণের ভুল ধরতেন তখন শ্রীচৈতন্য। অনেক সাধ্য-সাধনা করে ঈশ্বর পুরী শেষে শ্রীচৈতন্যকে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা দিতে পেরেছিলেন। তিনি দশাক্ষরের কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছিলেন শ্রীচৈতন্যকে। হালিশহরে ঈশ্বর পুরীর বাস্তভিটা এখন 'চৈতন্য ডোবা' নামে কথিত। 'চৈতন্য ডোবা'র সামনে একটি সুন্দর মঠে গৌর-নিতাই মূর্তি প্রতিষ্ঠিত।

ঈশ্বর পুরীর বাসস্থান হালিশহরে শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ বন্ধু ও ভক্ত শ্রীবাস পণ্ডিতও বসবাসের জন্য একটি বাড়ি তৈরি করেছিলেন। শ্রীবাস নবদ্বীপেই থাকতেন এবং তাঁর গৃহেই কীর্তন মহোৎসব হত। মধ্যে মধ্যে তিনি হালিশহরেও থাকতেন। পদাবলী-রচয়িতা বাসুদেব ঘোষ, কীর্তনিয়া মাধব ও গোবিন্দানন্দও হালিশহরে বাস করতেন। চৈতন্যযুগ থেকেই হালিশহরে বৈষ্ণবধর্ম বেশ বিস্তারলাভ করেছিল দেখা যায়। বৈষ্ণব দেব-দেবীর মধ্যে আজও তাঁর পরিচয় রয়েছে। ঈশ্বর পুরীর স্মৃতিমন্দির, চৈতন্য ডোবা, শ্রীবাসের গৃহ ইত্যাদি ছাড়াও, চৌধুরীপাড়ায় বিখ্যাত শ্যাম রায় আছেন, শিকদারপাড়ায় (বর্তমানে ঠাকুরপাড়া) রাধাগোবিন্দ আছেন, বারেন্দ্র গলিতে মল্লিকবাড়ি মদনমোহন আছেন। যাঁরা শাক্তধর্মী ছিলেন, তাঁদের মধ্যেও অনেকে বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেছিলেন।

শৈব-শাক্তদের প্রাধান্যের যথেষ্ট পরিচয় আজও হালিশহরে পাওয়া যায়। হালিশহরের অধিকাংশই মন্দিরই শিব-মন্দির, বিশেষ করে সবচেয়ে জীর্ণ প্রাচীন মন্দিরগুলিতে এখনও শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত রয়েছে দেখা যায়। পূজার্চনা আর হয় না, মন্দির পরিত্যক্ত। প্রাচীন পরিত্যক্ত মন্দিরের মধ্যে 'পঞ্চরত্ন' ও চারচালা বাংলা মন্দিরই বেশি। গঙ্গাতীরে কয়েকটি পঞ্চরত্ন মন্দির (মনে হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে তৈরি) আছে, অল্পদিনের মধ্যে সেগুলি ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। হালিশহরের বারেন্দ্রগলিতে একত্রে কয়েকটি শিব-মন্দির পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। তার মধ্যে একটি গায়ে উৎকীর্ণ লিপি থেকে জানা যায়, ১৬৬৫ শকাব্দে নির্মিত। সব ক'টি চারচালা বাংলা মন্দিরের অপূর্ব

নিদর্শন এবং মন্দিরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরের গায়ে ইটের উপর পৌরাণিক চিত্রাবলীর যে অপূর্ব রূপায়ণ দেখেছি, তা চব্বিশপরগণা জেলায় আর কোথাও আছে বলে আমার জানা নেই।

শিব ছাড়াও একাধিক শক্তিদেবীর পূজা হয় হালিশহরে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল, বলিদাঘাটার সিদ্ধেশ্বরী দেবী, খাসবাটির শ্যামাসুন্দরী, শ্মশানঘাটের শ্মশানকালী বা পাষাণময়ী, রক্ষাকালী, রুদ্রভৈরবী ইত্যাদি। হালিশহরের কার্তিকপূজাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কালিকাতলায় (বাজারপাড়ায়) জ্যাংড়া কাঁর্তিকপুজো হয়, প্রায় ছাব্বিশ হাত উঁচু কার্তিকের সেনাপতি মূর্তি তৈরি করে। মৎস্যজীবীদের পাড়ায় ধুমো কার্তিকের পূজা হয় এবং তার জন্যও একুশ-বাইশ হাত মূর্তি তৈরি হয়। কার্তিকের পূজা এবং পুকুর থেকে খুঁড়ে পাওয়া গণেশমূর্তি দেখে মনে হয়, শিবের দুই পুত্র গণেশ ও কার্তিক উভয়েরই পূজার প্রচলন ছিল আগে হালিশহরে।

লৌকিক ধর্মানুষ্ঠানের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল ব্যগ্রক্ষত্রিয়দের মনসাপূজা। ব্যগ্রক্ষত্রিয়পাড়ায় এবং চৌধুরীপাড়ায় হয়। আগে যথেষ্ট জাঁকজমক করে উৎসব হত, বলি হত, ঝাঁপান হত। চড়কপূজা হয় একাধিক পাড়ায়,—যেমন, গোলবাড়িতে, ডাঙাপাড়ায়, বুড়োশিবতলায় ও খাসবাড়িতে। শীতলাপূজা হয় মৎস্যজীবীদের পাড়ায় শিবের গলিতে এবং অন্যান্য পাড়ায়। বারুইপাড়ায় পবনদেব পূজিত হন। পানের বরোজ রক্ষার জন্য এও অত্যন্ত প্রাচীন পূজার নিদর্শন। শুভচণ্ডীতলা, ষষ্ঠীতলা, রক্ষা-কালীতলা, ওলাবিবিতলা, পঞ্চাননতলায় বৃক্ষপূজার নিদর্শন আজও অত্যন্ত স্পষ্ট রয়েছে।

এই সব লৌকিক ধর্মানুষ্ঠান হালিশহরের প্রাচীন সংস্কৃতিধারার প্রাচীন মুসলমানযুগের পশ্চাতে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত মনে হয়। তখন হয়ত হালি-শহরের আদি বাসিন্দা মৎস্যজীবীরা ছিলেন, দাড়ি-মাঝিরা ছিলেন, ব্যগ্র-ক্ষত্রিয় ও মাহিষ্যরা ছিলেন। মনসা, শীতলা, চড়কপূজা ও বৃক্ষপূজার প্রচলন তখন থেকেই হতে পারে। তারপর শৈব-শাক্তধর্মের জোয়ার এসেছে এবং তন্ত্রোক্ত নানা দেবদেবীর পূজার প্রচলন হয়েছে। তার অনেক পরে বৈষ্ণবধর্মের ঢেউ এসেছে। বৈষ্ণব ও শাক্ত-ধর্মের মধ্যে সমন্বয় কিছুটা হয়েছে বটে, কিন্তু শৈব-শাক্ত দেবদেবী বা মনসা-শীতলার প্রাধান্য তাতে

লোপ পায়নি। অষ্টাদশ শতাব্দীতেও সাধক রামপ্রসাদ জন্মেছিলেন হালিশহরে এবং শুধু সাধনায় নয়, কাব্যে ও সঙ্গীতে একটা বিচিত্র ধারার প্রবর্তন করেছিলেন বাংলাদেশে।

পঞ্চদশ খৃস্টাব্দের মধ্যভাগে (১৪৫০ সালের পূর্বে) গাঙ্গুলীবংশীয় সাবর্ণ চৌধুরীদের আদিপুরুষ 'পাঁচুশক্তিখান' হাবেলীশহর পরগণার কর্তৃত্ব লাভ করে, 'হালিশহরসমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁরই কালে বিক্রমপুর থেকে বৈদ্য পরিবার, কোন্নগর থেকে কায়স্থপরিবার প্রভৃতির সমাগমে সমাজ পূর্ণাঙ্গতা লাভ করেছিল। পাঁচুশক্তি খাঁর (পাঠান আমলের রাজপুরুষ বলে খাঁ উপাধি ছিল) সাত পুত্র ছিল এবং তাঁরা সকলেই হালিশহরনিবাসী ছিলেন—"এতে পাঁচু শক্তি খাঁন্ সন্তানা হালিসহর নিবাসিনঃ।" হালিশহর থেকে সাবর্ণগোষ্ঠীর বিভিন্ন শাখা নানাস্থানে ছড়িয়ে পড়েছিল (বড়িশা-বেহালা পর্যন্ত)। শক্তিখানের সর্বজ্যেষ্ঠ প্রপৌত্র স্বনামধন্য লক্ষ্মীকান্ত মজুমদার আনুমানিক ১৪৭০ সালে জন্মগ্রহণ করেন; সুলতান হুসেন শাহ, নসরৎ শাহ বা শেরশাহের সময়ে বিপুল জমিদারী অর্জন করেন। কথিত আছে, লক্ষ্মীকান্তই হালিশহরে, কালীঘাটে ও সাবর্ণগোষ্ঠীর আদিস্থান গোঘাটে ও আমাটিয়া গ্রামে দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।[১] বড়িশা থেকে হালিশহর পর্যন্ত (কলিকাতা শহরের চিৎপুর থেকে কালীঘাটের ভিতর দিয়ে) যে প্রাচীন রাজপথ ছিল, শোনা যায় তা লক্ষ্মীকান্ত তৈরি করেছিলেন।

'আইন-ই-আকবরী'তে সরকার-সাতগাঁর অন্তর্গত পরগণার মধ্যে হাবেলী-শহরের নাম পাওয়া যায়। লক্ষ্মীকান্ত তখন জীবিত ছিলেন না। তাঁর আট পুত্রের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ রাম রায় সম্ভবত আকবরের সময় জীবিত ছিলেন। রাম রায়ের পৌত্র বিদ্যাধর রায়ের সময়ে হাবেলীশহর পরগণা সাবর্ণচৌধুরী-বংশের হস্তচ্যুত হয় এবং কালক্রমে দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়। প্রধান খণ্ড নবদ্বীপাধিপতি রাজা রাঘব রায়ের হস্তগত হয়। তা সত্ত্বেও দীর্ঘকাল ধরে হাবেলীশহরে তালুকদাররূপেও সাবর্ণচৌধুরীদের প্রভাব অক্ষুণ্ণ থাকে। পরগণার অপরখণ্ড বাঁশবেড়িয়ার রাজবংশ দখল করেন। বাঁশবেড়িয়ার রামেশ্বর রায়ের মৃত্যুর পরে, ১০৯৯ সনে, উক্ত অংশ দুইভাগে ভাগ হয়ে যায়।

১ A. K. Ray : Lakshmi Kanta, 1928, P. 15 & P. 44.

সাবর্ণচৌধুরীদের সমাজ-প্রতিষ্ঠার পর থেকে অনেক বিখ্যাত পণ্ডিতবংশ কুমারহট্ট-হালিশহরে এসে বাস করেন। তাঁদের বিদ্যাচর্চার ফলে কুমারহট্ট-বিদ্যাসমাজ একসময় পশ্চিমবঙ্গে নবদ্বীপের সমতুল্য প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিল। কামালপুরের ভট্টাচার্যবংশ ন্যায়শাস্ত্রের একনিষ্ঠ চর্চার জন্য চিরপ্রসিদ্ধ।[১] এই বংশের দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কামদেব বিদ্যাবাচস্পতি কুমারহট্টে অধ্যাপনা করতেন। তাঁর মৃত্যুর পর ১২০২ সনে কুমারহট্টে চতুষ্পাঠীতে তাঁর পুত্র শিবরাম ন্যায়বাগীশ অধ্যাপনা করতেন। কামদেব শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণের নবরত্নসভার রত্ন ছিলেন। কামদেবের পুত্র-পৌত্রদের মধ্যে আরও অনেকে তখন বিখ্যাত নৈয়ায়িক ছিলেন। এছাড়াও, বহু পণ্ডিতবংশ কুমারহট্ট-বিদ্যাসমাজের গৌরব বৃদ্ধি করেছিলেন।

কুমারহট্ট-হালিশহরের প্রাচীন সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার ও বিদ্যাগৌরব আজ একাধিক সামাজিক কারণে ম্লান হয়ে গেছে। বাংলাদেশের অন্যান্য আরও অনেক জায়গার মতন। কিন্তু তা সত্ত্বেও, সেই ঐতিহ্য-চেতনা স্থানীয় লোকসমাজে আজও লুপ্ত হয়ে যায়নি।

১. দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য: 'বাঙালীর সারস্বত অবদান', ১ম ভাগ, পৃ ২৮৮-৯০। দীনেশ বাবুর পূর্বোক্ত প্রবন্ধ 'কুমারহট্ট বিদ্যাসমাজ' দ্রষ্টব্য।

সাংস্কৃতিক প্রসঙ্গ

বীরস্তম্ভ

বনদেবতা

রঙ্কিনী
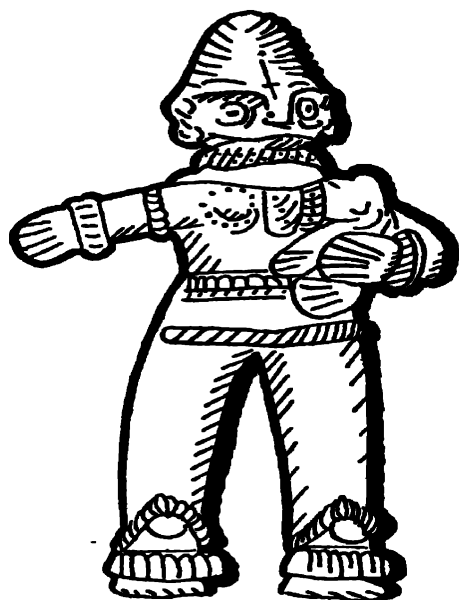
লোকধর্ম ও শিল্পকলা

পশ্চিমবঙ্গের নাথধর্ম

পীর ও গাজীসাহেব

দক্ষিণ রায়

দশাবতার তাস

পশ্চিমবঙ্গের চিত্রকর

কুড়মুনের গাজন

ইন্দ্রধ্বজের উৎসব

ভাদু ও সয়লা উৎসব

প্রান্তিক

বিষয়গুলির সাংস্কৃতিক তাৎপর্যের জন্য স্বতন্ত্রভাবে সন্নিবেশিত করা হল। 'গ্রামপ্রদক্ষিণ' অংশের মধ্যেও প্রচুর সাংস্কৃতিক উপকরণ আছে। পার্থক্য হল, এই অংশে আলোচনা প্রধানত বিষয়কেন্দ্রিক।
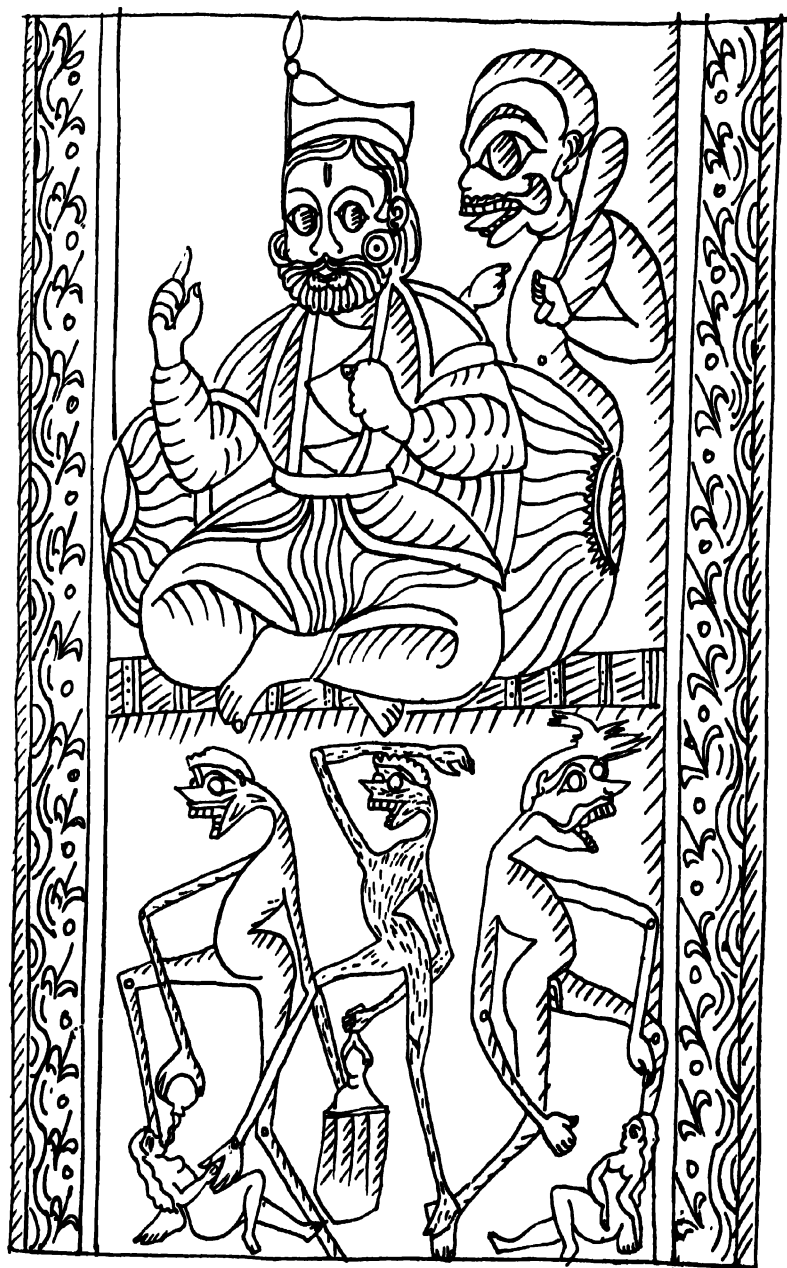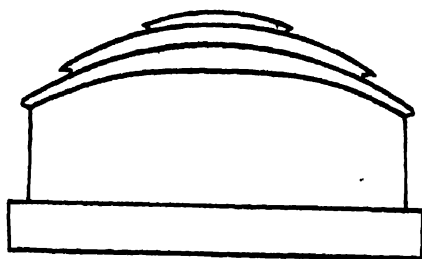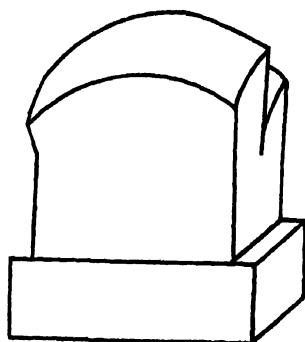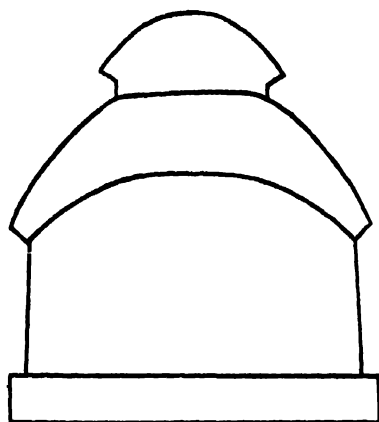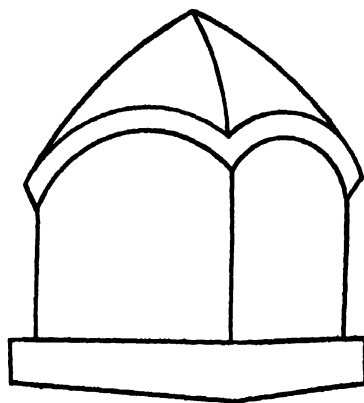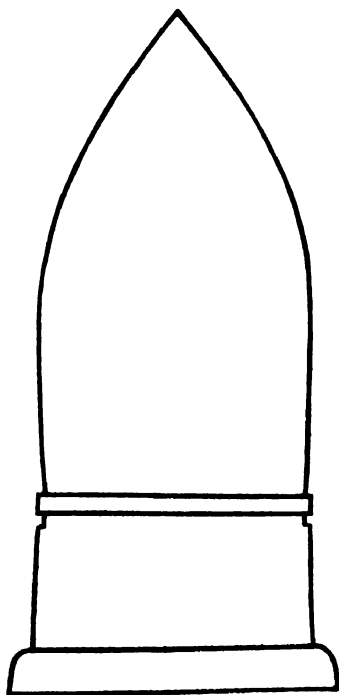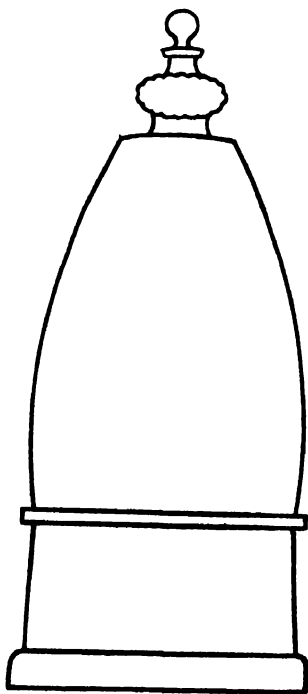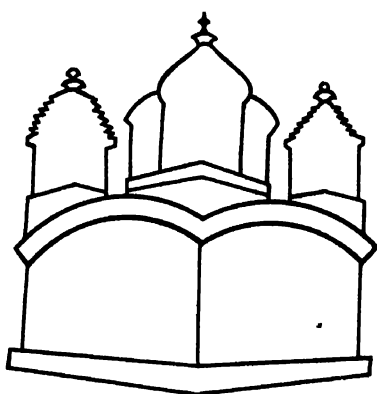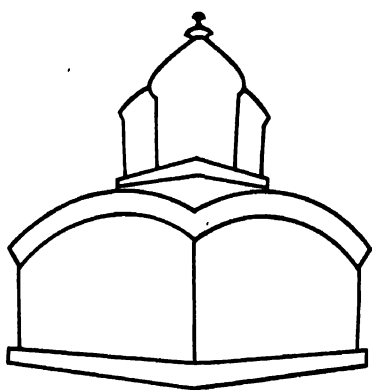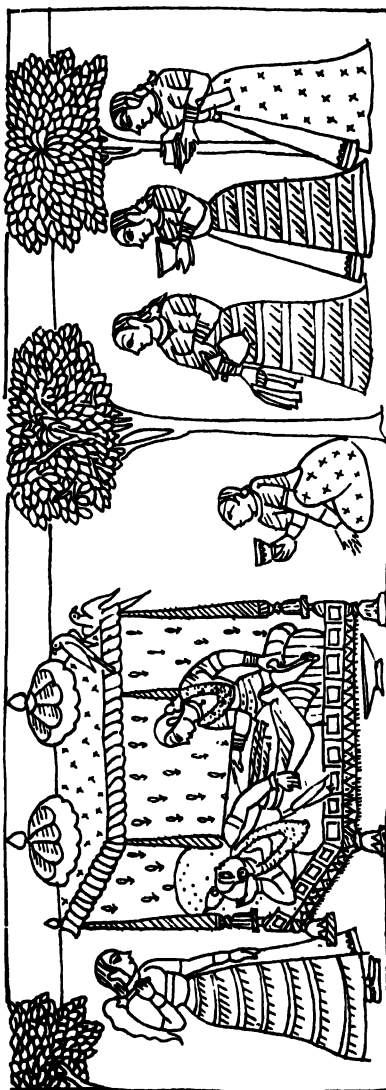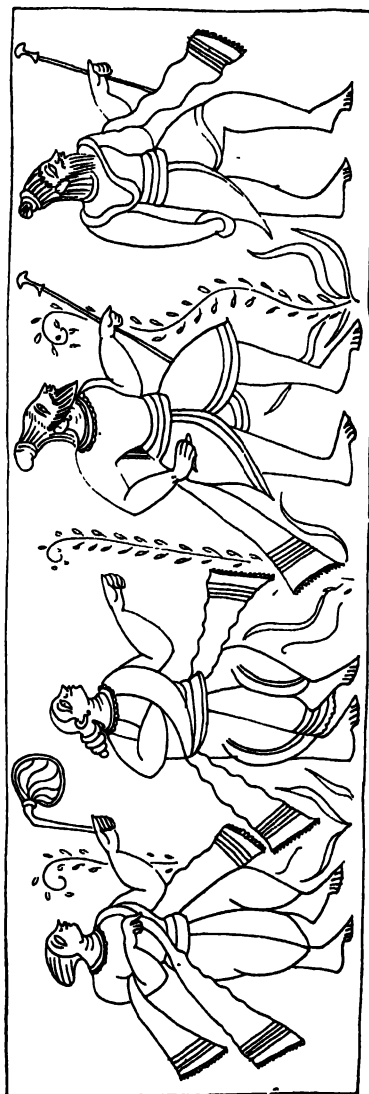
ছাতনা সামন্তভূমের প্রাচীন রাজধানী, বাঁকুড়া জেলায়। মানভূমের সন্নিকট সামন্তভূম। বাঁকুড়া শহর থেকে আট-দশ মাইল পশ্চিমে ছাতনা। অনতিদূরে শুশুনিয়া পাহাড় দেখা যায়। পাহাড়ের মধ্যে পুষ্করণা-পোকর্ণাধিপতি সিংহবর্মার পুত্র চন্দ্রবর্মার বিখ্যাত শিলালিপি ও চক্র। সাধারণের কাছে 'চাঁদসুর' বলে পরিচিত। সামনের চাঁদড়া গ্রামের ভিতর দিয়ে পাহাড়ে যেতে হয়। চক্রস্বামী বিষ্ণুর পাশে ছাতনায় শাক্ত দেবী বাঁসুলী বিরাজ করছেন। পশ্চিমবঙ্গ ও মানভূমের সাংস্কৃতিক সাদৃশ্যও এখানে সুস্পষ্ট।

ছাতনায় ভ্রমণকালে গ্রাম্য বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক বললেন—"এখানে এক পুকুর-পাড়ে কতকগুলি বিচিত্র পাথরের স্তম্ভ আছে, তার গায়ে নানা-রকমের মূর্তি খোদাই করা আছে—দেখবেন?" কথা শুনেই শিলাস্তম্ভগুলি সম্বন্ধে আমার যে ধারণা হয়েছিল, পরে চোখের সামনে সেই ধারণাই যেন সত্য হয়ে ভেসে উঠল। শিলাস্তম্ভগুলি মনে হয় প্রাগৈতিহাসিক প্রস্তরযুগের সংস্কৃতির স্মৃতি-নিদর্শন, অর্থাৎ 'মেগালিথিক কালচারের' নিদর্শন। প্রস্তরযুগের নিদর্শন নয়, সেই সংস্কৃতির উত্তরসাধকদের পরবর্তীকালের নিদর্শন।

ছাতনার একটি পুকুর-পাড়ে অনেককাল ধরে শিলাস্তম্ভগুলি রয়েছে। কিংবদন্তী হল, একদা রাত্রিকালে বাইরের কোন শত্রু সামন্তভূমের রাজধানী ছাতনা আক্রমণ করে। রাজার কুলদেবী বাঁসুলি স্বয়ং মায়াসেনা সৃষ্টি করে তাদের পরাজিত করেন। এর মধ্যে ভোর হয়ে যায় এবং ভোরের সূর্যালোকে দেবীর মায়াসেনারা পাষাণে পরিণত হয়। স্তম্ভগুলির গায়ে তাই যোদ্ধামূর্তি ইত্যাদি খোদাই করা আছে। কেউ বলেন, এখানে কোন ঐতিহাসিক যুদ্ধ হয়েছিল, এবং যুদ্ধে যে বীর সেনারা নিহত হয়েছিল, এগুলি তাদেরই সমাধিস্তম্ভ। কেউ বলেন, এগুলি 'কামুফ্লাজ' বা 'ছদ্মরূপ'। প্রচুর শিলাস্তম্ভ এইভাবে নাকি উন্মুক্ত স্থানে প্রোথিত করে, সেকালের রাজারা শত্রুর মনে বিশাল সৈন্যসমাবেশের ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করতে চাইতেন। এইরকম অনেক কাহিনী ও কিংবদন্তী শিলাস্তম্ভগুলিকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে। তথ্যানির্ভরতার অভাবে কল্পনা পক্ষবিস্তার করেছে।

ছাতনার শিলাস্তম্ভগুলি বীর যোদ্ধাদের স্মৃতিস্তম্ভ হওয়া আশ্চর্য নয়, কিন্তু তার আসল ঐতিহাসিক পরিচয় তা নয়। যে শিলাস্তম্ভগুলির কথা বলছি, তার উচ্চতা গড়ে চার-পাঁচ-ছয় ফুট হবে, হয়ত আরও বেশি হতে পারে, কারণ মাটির মধ্যে বসে গেছে, কেউ খুঁড়ে বার করেনি। সুতরাং সম্পূর্ণ স্তম্ভের উচ্চতা সম্বন্ধে (খুঁড়ে বার না করলে) আন্দাজে কিছু বলা যায় না। স্থানটি বিশেষভাবে লক্ষ করে দেখেছি, আশেপাশে অনেক শিলাশীর্ষ ভূগর্ভ থেকে সামান্য পাঁচ-ছয় ইঞ্চি করে উপরে উঠে রয়েছে। মনে হয়, সবগুলিই ঐ শিলাস্তম্ভ, মাটির তলায় বসে গেছে, খুঁড়ে বার করা যায়। এই কারণেই মনে হয়, শিলাস্তম্ভগুলি বেশ প্রাচীন। তা না হলে ছাতনার মতন পাথুরে জায়গায় গড়পড়তায় পাঁচ-ছয় ফুট মাটির তলায় বসে যাওয়া সহজ ব্যাপার নয়। শিলা-স্তম্ভগুলি হো-মুণ্ডা প্রভৃতি ছোটনাগপুরের আদিম নিষাদ-জাতির 'মেগালিথিক' আচারের নিদর্শন বলেই মনে হয়। ছাতনার আশেপাশে আরও কয়েক স্থানে এই ধরনের অনেক শিলাস্তম্ভ প্রোথিত আছে। ছাতনার ক্রোশ দুই দক্ষিণে 'মৌলবনা' গ্রামে মৌলেশ্বর থানের কাছে এইরকম শিলাস্তম্ভ আছে। মৌলেশ্বর প্রাচীন শিব—লিঙ্গমূর্তি। পাশে 'নীলাম্বর' মহাদেব ও চণ্ডীর স্থান। দেড়হাত উঁচু এক শিলাদণ্ড চণ্ডীরূপে পূজিত হয়। তারই পাশে ভাঙা জৈন বৌদ্ধ ও গণপতি মূর্তি ছড়ানো। শুশুনিয়া পাহাড়ের ঝরণার কাছে একটি শিলাস্তম্ভ আছে। স্তম্ভশীর্ষে সিংহ ও অশ্বারূঢ় নরমূর্তি খোদিত। স্থানীয় লোক 'নরসিংহ' বলে পূজা করেন।

মেদিনীপুর জেলায় কেশিয়াড়ী থেকে মাইল পাঁচছয় দূরে কিয়ারচাঁদ বলে একটি গ্রাম আছে। এই গ্রামে, বিশাল মাঠের মধ্যে প্রচুর পাথরের স্তম্ভ মাটিতে প্রোথিত রয়েছে দেখা যায়। দেখে মনে হয়, স্থানটিতে একাধিক দেবালয় ছিল। দেবালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর, বেদী ইত্যাদি এখনও আছে, ভাঙা-চোরা বহু দেহাংশও আছে। প্রোথিত স্তম্ভগুলি ভাঙা মন্দিরেরই টুকরো। কিন্তু স্তম্ভগুলির বিচিত্র বিন্যাস দেখলে শুধু মন্দিরের ছড়ানো টুকরো বলে মনে হয় না। নানারকম প্রশ্ন জাগে মনে। প্রথম প্রশ্ন হল, দেবালয়ের বড় বড় টুকরোগুলি এইভাবে ছড়িয়ে দিল কে এবং কেন? দ্বিতীয় প্রশ্ন হল, স্তম্ভগুলি মৃত্তিকাগর্ভে প্রোথিত হলই বা কি করে? আমরা খুঁড়ে দেখেছি, মাটির তলায় প্রায় দু'ফুট আড়াই-ফুট পর্যন্ত প্রোথিত স্তম্ভ আছে। কেন প্রোথিত?

আমাদের ধারণা, এগুলি স্মৃতিস্তম্ভ ও বীরস্তম্ভ। এমন অনেক স্থানে এরকম প্রোথিত স্তম্ভ আছে যেখানে কোন ভগ্ন দেবালয়ের চিহ্ন নেই, কাছাকাছিও নেই। যেমন বাঁকুড়ায় বা হুগলীতে। পাথরখণ্ড বহন করে এনে মাটিতে পোঁতা হয়েছে, পরিষ্কার বোঝা যায়। তা ছাড়া, পাথরের গায়ে মূর্তি খোদাই করা হবে কেন? ধনুর্বাণধারীর মূর্তি, অশ্বারোহীর মূর্তি, এরকম স্থূলভাবে খোদিত, এসব অঞ্চলে কোন মন্দিরের গায়ে চোখে পড়েনি। যেখানে ভাঙা মন্দিরের পাথরখণ্ড পাওয়া গিয়েছে, যেমন কিয়ারচাঁদে, সেখানে সেগুলিকে স্মৃতিস্তম্ভরূপে ব্যবহার করার জন্য নতুন করে চাঁছাছোলা ও খোদাই করা হয়েছে। কিয়ারচাঁদের স্তম্ভগুলিকে ভাল করে পরীক্ষা করলেই তা বোঝা যায়। কিয়ারচাঁদের এই পাথরের দৃশ্যের পাশে হাওড়া জেলার আমতা থানার স্মৃতিমন্দিরের দৃশ্যটি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। আমতা থানার মাহিষ্যপ্রধান গ্রামে সারবন্দী স্মৃতি-মন্দিরের বিচিত্র দৃশ্য দেখা যায়, শ্মশানে নয়, লোকবসতির সংলগ্ন স্থানে। একথা উল্লেখ করার কারণ এই যে, স্মৃতি-মন্দির নির্মাণ বা স্মৃতিস্তম্ভ প্রোথিত করার সুপ্রাচীন প্রথা আজও আমাদের মধ্যে আছে এবং কেবল শ্মশানে নয়, জনবসতির সঙ্গে। আমাদের শ্মশানে ও গোরস্থানে তার প্রমাণ আজও রয়েছে। আমতা থানায় স্বতন্ত্র কোন শ্মশানে এ-দৃশ্য দেখা যায় না। পথের ধারে ধারে, লোকালয়ের মধ্যে মধ্যে এই দৃশ্য দেখা যায়। স্তম্ভ থেকে মন্দির পর্যন্ত আমরা এগিয়ে গেছি, কিন্তু প্রথাটা একই। ছাতনা বা কিয়ারচাঁদ থেকে আমতার গ্রাম একটু দূরে হলেও, তার সাংস্কৃতিক দূরত্ব খুব বেশি নয়।

দক্ষিণভারত ও পূর্বভারতের অনেক জাতি-উপজাতির মধ্যে এইভাবে মৃত ব্যক্তির স্মৃতিরক্ষার প্রথা আজও প্রচলিত আছে। নীলগিরি পাহাড়ের আদিবাসীদের মধ্যে এই প্রথার বিচিত্র সব নিদর্শন দেখা যায়। ফার্গুসন ও ব্রীক্স্ এ-সম্বন্ধে তাঁদের বিখ্যাত গ্রন্থে সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। ব্রীক্স লিখেছেন যে, নীলগিরি পাহাড়ের ইরুল ও কুরুম্বরা এই ধরনের স্মৃতিস্তম্ভকে 'বীরকল্লু' বলে। 'কল্লু' কথার অর্থ পাথর, 'বীরকল্লু' মানে বীরের পাথর, অর্থাৎ বীরস্তম্ভ।[১] হুগলী জেলায় আরামবাগ অঞ্চলে যে পাথরস্তম্ভ আমরা

[১] J. W. Breeks: An Account of the Primitive Tribes and Monuments of the Nilgiris: London 1873: P. 53, 72

দেখেছি, তাকে 'বীরকাঁড়' বলা হয়। কুরুখরা যেমন বীরকল্লুর পূজা করে, পশ্চিমবঙ্গেও তেমনি ভূমিজরা বীরকাঁড়ের পূজা করে।

পূর্বভারতের মধ্যে খাসিয়াদের কথা সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য। কারণ খাসিয়া অঞ্চলে এই ধরনের পাথরের স্মৃতিস্তম্ভ যেমন দেখা যায়, সেরকম পর্যাপ্ত পরিমাণে বোধ হয় আর কোথাও দেখা যায় না। ফার্গুসন বলেছেন :[১]

> Throughout the whole of the Western portion of the hilly region, inhabited by tribes bearing the generic name of Khassias, rude stone monuments exist in greater numbers than perhaps in any other portion of the globe of the same extent.

মেজর গার্ডন খাসিয়াদের মেনহির বা একক প্রস্তরস্তম্ভগুলি সম্বন্ধে বলেছেন যে, সেগুলি দু-তিন ফুট থেকে বারোচোদ্দ ফুট পর্যন্ত দীর্ঘ হয়। জয়ন্তীয়া পাহাড়ের কোথাও কোথাও বিরাটাকারের স্তম্ভও দেখা যায়, তার মধ্যে একটি সাতাশ ফুট লম্বা ও আড়াই ফুট মোটা স্তম্ভও আছে। পাথরের স্তম্ভগুলি সাধারণত দেখা যায় অত্যন্ত স্থূলভাবে চাঁছাছোলা এবং মাথার দিকটা ক্রমে সরু করে উপরটা সুন্দরভাবে গোল করা, ঠিক মুণ্ডের মতন। মনে হয়, খানিকটা মানবসদৃশ করার চেষ্টা 'মেনহিরের' গড়নের মধ্যে গোড়াতে ছিল, পরে তার অবনতি হয়েছে। তবু মাথার দিকটা বেশ সযত্নেই গোল করা।[২]

> Mostly stones are roughly hewn and generally taper gradually to their tops which are sometimes nearly rounded off—

বিস্ময়কর হল, কিয়ারচাঁদের পাথরস্তম্ভগুলির মধ্যে অনেক স্তম্ভ এইভাবে মাথার দিকে গোলাকার করা হয়েছে দেখা যায়। ঠিক মানুষের মুণ্ডের মতন করে চেঁছে-ছুলে গোল করা। ছোট দেউলের মডেলের মাথার আমলকগুলিকে স্বেচ্ছায় ভেঙেচুরে গোলাকার করা হয়েছে, স্পষ্ট বোঝা যায়। ক্ষয়ে গিয়ে পাথরের আমলক এরকম গোল হতে পারে না। হতে যা সময় লাগে,

১ Fergusson : Rude Stone Monuments : Ch. 13, Pp. 461-62.
২ Major P. R. T. Gurdon : The Khasis : London, 1907. Pp. 144-54.

কিয়ারচাঁদের ইতিহাসের কালের হিসেবে তার নাগাল পাওয়া যায় না। তা ছাড়া, মাথাগুলি যে স্থূলভাবে পরে ছোলা হয়েছে তা দেখলেই বোঝা যায়।

দক্ষিণভারত ও পূর্বভারত থেকে মেদিনীপুর-বাঁকুড়ার সীমান্তের কাছে ছোটনাগপুর অঞ্চলে এলেও দেখা যায়, হো ও মুণ্ডারা এই ধরনের স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করে। ড্যাল্টন সাহেব এই অঞ্চলের হো ও মুণ্ডাদের গ্রামের দৃশ্য, প্রায় একশতাব্দী পূর্বে, লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। প্রত্যক্ষদর্শী অনুসন্ধানীর বিবরণ হিসেবে তার মূল্য খুব বেশি। ছোটনাগপুরের গ্রামে গ্রামে ঘুরে ড্যাল্টন দেখেছিলেন প্রায় প্রত্যেক হো ও মুণ্ডা গ্রামে মৃতের স্মৃতি উদ্দেশে প্রোথিত পাথরের স্তম্ভের সমাবেশ আছে। সাধারণত একটি সুনির্বাচিত স্থানে স্তম্ভগুলি প্রোথিত। চার-পাঁচ ফুট থেকে চোদ্দ-পনের ফুট পর্যন্ত বড় বড় স্তম্ভ আছে। স্তম্ভগুলি সারবন্দীভাবে একলাইনে প্রোথিত, বৃত্তাকারে প্রোথিত নয়। ড্যাল্টনের বিবরণটি উদ্ধৃত করছি: [১]

'A collection of the massive grave stones indelibly mark the site of every Ho or Mundari village...a megalithic monument is set up to the memory of the deceased in some conspicuous spot outside the village. The groups of such stones that have come under my observation in the Munda and Ho country are always in line. The circular arrangment so common elsewhere, I have not seen.

ড্যাল্টন যখন ছোটনাগপুরের কমিশনার ছিলেন তখন হো ও মুণ্ডাদের গ্রামে গ্রামে ঘুরে তিনি এই সব নিদর্শন দেখেছিলেন। এ সম্বন্ধে পরে তিনি লিখেছেন, অনেকস্থানে দেখা যায়, সাধারণ স্মৃতিস্তম্ভ ছাড়াও, গ্রামবৃদ্ধ, মণ্ডল, নায়ক ও বিশেষ শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের স্মৃতি উদ্দেশেও স্তম্ভ প্রোথিত করা হয়। এই সব স্তম্ভের পূজাও করে তারা। যেমন খড়িয়ারা করে: [২]

১ E. T. Dalton: Descriptive Ethnology of Bengal: Calcutta 1872: P. 203.

Dalton; Rude Stone Monuments in Chutia Nagpur (Abstract): Proceedings, Asiatic Society 1873, P. 130

২ Dalton: The Kols of Chota Nagpore: Transactions of the Ethnological Society of London: 1867: P. 38.

Besides the grave stones, monumental stones are set up outside the village to the memory of men of note... The Kherias have collections of these monuments in the little enclosure round their houses and libations are constantly made to them.

আমতা থানার গ্রামের যে দৃশ্যের কথা বলেছি, তার সঙ্গে হো মুণ্ডা খড়িয়া গ্রামের এই দৃশ্যের বিস্ময়কর সাদৃশ্য আছে। কেবল পাথরের স্তম্ভের বদলে প্রচুর পরিমাণে ছোটবড় স্মৃতিমন্দির তৈরি করা হয়েছে। এই মন্দির উপরতলার দান, কিন্তু স্মৃতিরক্ষার এই প্রথাটি মানবসংস্কৃতির অনেক নিচেরতলার দান। বহুকালের প্রথা।

মেদিনীপুরের পশ্চিমদিক থেকে বাঁকুড়া পর্যন্ত যে সব অঞ্চলে আমরা প্রস্তরস্তম্ভের এই সব নিদর্শন দেখেছি, তার সবটাই ছোটনাগপুর-সংলগ্ন অঞ্চল বললেও ভুল হয় না। বিভিন্ন জাতি-উপজাতির আদিবাসীদের বাস মেদিনীপুর ও বাঁকুড়ায় যথেষ্ট আছে। এমন কি, প্রাকৃতিক পরিবেশের সাদৃশ্যের দিক থেকে বিচার করলে, এই অঞ্চলকে আরও একটি ক্ষুদ্রতর ছোটনাগপুর বলা যায়। কেবল পাহাড় ঠেলে ওঠেনি এই যা। উঠতে উঠতে অনেক জায়গায় যে মুখ থুবড়ে পড়েছে, তা মাটির রূপ দেখলেই বোঝা যায়। ছোটনাগপুরের সংস্কৃতিধারার সঙ্গে প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই পশ্চিমবঙ্গের এই অঞ্চলের বেশ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তার প্রমাণ অনেক পাওয়া গেছে। প্রস্তরযুগের আয়ুধ পর্যন্ত। মেগালিথিক সংস্কৃতির ধারাও এককালে ছোটনাগপুর থেকে পশ্চিমবঙ্গের এই অঞ্চল পর্যন্ত স্বচ্ছন্দে প্রবাহিত হয়ে এসেছিল মনে হয়। পরে ঐতিহাসিক কারণে মৌলিক জাতির শাখা-প্রশাখার মধ্যে ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতার ফলে এবং অন্যান্য উন্নত জাতির সংস্পর্শে আসার ফলে, অনেক ক্ষেত্রে এত পরিবর্তন হয়েছে যে আসল রূপ চেনাই যায় না। পরিবর্তন সকলের সমানভাবে হয়নি, তা হয়ও না। একই জাতির বিভিন্ন স্তরের মধ্যেও সংস্কৃতি-সংঘাতের ফলে পরিবর্তনের তারতম্য হয়। মেদিনীপুর-বাঁকুড়া অঞ্চলেও তাই হয়েছে। বীরস্তম্ভগুলি কেবল অতীতের সাক্ষীস্বরূপ আজও রয়েছে। কোথাও বীরস্তম্ভ বীরকাঁড় হয়েছে, কোথাও অন্য দেবতার নামে পূজিত হচ্ছে। এ ছাড়া আর কোন পার্থক্য নেই।

বনদেবতা

পশ্চিমবঙ্গে বড়ম্ (বড়াম্) দেবতার পূজা খুব প্রচলিত। প্রধানত বাউরীদের মধ্যে বড়াম পূজার প্রাধান্য দেখা যায়। বাঁকুড়ায় বাউরীদের মধ্যে বেশি, মেদিনীপুর গড়বেতা অঞ্চলে বাউরী ও লায়েকদের মধ্যে এবং হুগলী জেলার শ্যামবাজার কয়াপাট প্রভৃতি অঞ্চলে ভূমিজদের মধ্যে বড়াম পূজা প্রচলিত। বাউরী, লায়েক ও ভূমিজরা আজ একই সমাজভুক্ত না হলেও, বড়াম দেবতা তাদের ঐতিহাসিক যোগসূত্রটি আজও অবিচ্ছিন্ন রেখেছে বলে মনে হয়। বাউরী, ভূমিজ ও লায়েক ছাড়া, হাড়ি ও ডোমরাও কোন-কোন জায়গায় বড়ামপূজা করে। হুগলী জেলার দেবখণ্ডে বড়ামপূজা হাড়িদের মধ্যে প্রচলিত, পুরোহিত ডোমপণ্ডিত। প্রতি বছর পৌষ সংক্রান্তির দিন বড়ামপূজার বিশেষ উৎসব-অনুষ্ঠান হয়। উল্লেখযোগ্য হল, অন্যান্য অনেক উপেক্ষিত দেবতাকে ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা দখল করে, পূজার্চনার প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করে, নিজেদের জীবিকার্জনের উপায় করে নিয়েছেন। তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হল, পশ্চিমবঙ্গের ধর্মঠাকুরের শিবঠাকুরে রূপান্তর। কিন্তু বড়াম দেবতার পৌরোহিত্য আজও কোন ব্রাহ্মণ কোথাও গ্রহণ করেননি। নিজ সম্প্রদায়ের পুরোহিত দিয়েই বাউরী লায়েক ভূমিজ প্রভৃতি বড়ামের পূজা করে। মেদিনীপুরের গড়বেতা অঞ্চলে পৌরোহিত্য অনেক জায়গায় পুরুষানুক্রমিক অধিকারে পরিণত হয়েছে দেখা যায়। কিন্তু শ্যামবাজারে (হুগলী) বা কাদড়ায় (মেদিনীপুরে) আজও পূজার দিনে নিজেদের ভিতর থেকে পুরোহিত নির্বাচনের প্রথা আছে।

সাধারণত বড়ামপূজা গাছতলাতেই হয়ে থাকে এবং বড়ামকে বনদেবতাই বলা হয়। কিন্তু এ-অঞ্চলের অন্যান্য বনদেবতাদের সঙ্গে বড়ামের বেশ একটু পার্থক্য আছে। বনদেবতাদের পূজায় আরও অনেক জাতির লোক যোগদান করে, যারা বড়ামপূজায় যোগ দেয় না। বোঝা যায়, বড়াম আজও আদিম বন্য স্তর থেকে খুব বেশি উচ্চস্তরে উঠতে পারেননি। সেইজন্যই, বিশেষ করে যারা বড়াম পূজা করে, তাদের মধ্যে একটা অধুনালুপ্ত স্বাজাত্যসূত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। বড়ামের কোন নির্দিষ্ট মূর্তি নেই কোথাও। গাছতলায়

দেখা যায়, বিষ্ণুপুরের পাঁচমুড়া গ্রামের কুম্ভকারদের তৈরি পোড়ামাটির হাতি-ঘোড়া। কোথাও কোথাও একখণ্ড ঝামা-পাথর। বড়ামের কোন দেবালয় নেই, পর্ণকুটিরও নেই। গাছতলাই তাঁর আশ্রয়। বনদেবতার ঐতিহ্য এইদিক দিয়েও তিনি বহন করছেন। বড়াম পূজায় শূয়োর বলি দেওয়া হয়। ছাগল মুর্গীও বলি দেওয়া হয়। ধাদ্‌কায় (গড়বেতা) বলির পরে শূয়োরের কাটা মাথা থেকে একখণ্ড মাংস কেটে নিয়ে, আগুনে দগ্ধ করে, মন্ত্র সহযোগে, ঠাকুরকে দেওয়া হয়। কোথাও কাটা মাথার উপর তেলের প্রদীপ ও ধূপ জেলে দেওয়া হয়। মাংস বিতরণ করা হয় স্বজাতির মধ্যে। কোথাও রান্না করে খাওয়ার রীতিও আছে।

আশপাশের অন্যান্য জাতির পূজানুষ্ঠানের রীতিনীতিও বড়াম পূজারীদের উপর কিছু কিছু প্রভাব বিস্তার করেছে দেখা যায়। যেমন, বলি কোথাও কোথাও বন্ধ হয়ে গেছে। কোথাও বা ছাগবলির সঙ্গে কুমড়োবলি হয়। বোঝা যায়, ছাগবলি লুপ্ত হয়ে কেবল কুমড়োবলি হতে আর বেশি দেরী নেই। কোথাও পুরোহিত উপবাস করে। পুজোয় আতপচাল, ফলমূলও দেওয়া হয়। এগুলি বন্য বড়ামের উপর ব্রাহ্মণ্য প্রভাবের নিদর্শন। বড়ামপূজায় ঠাকুরের মাথায় ফুল চাপাবার রীতিও আছে। ফুল মাটিতে পড়লে বলিদান আরম্ভ হয়। ধর্মপূজা ও শিবপূজার গাজন-উৎসবের প্রভাব এখানে স্পষ্ট। অন্যান্য পূজা-উৎসবের অনেক অনুষ্ঠান এইভাবে বড়ামপূজাতেও প্রক্ষিপ্ত হয়েছে দেখা যায়। প্রক্ষেপের ফলে যেসব স্থানে বড়ামপূজায় পরিবর্তন হয়েছে ও হচ্ছে, সেই সব স্থানে আর কিছুদিনের মধ্যে পৌরোহিত্যের অধিকার নিয়ে ব্রাহ্মণরা হয়ত উপস্থিত হবেন।

বড়াম ছাড়া এঅঞ্চলের 'সিনি' নামে বনদেবতাদের পূজা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গ্রামের নামের সঙ্গে 'সিনি' শব্দ যোগ করে, অথবা অন্যান্য নামের সঙ্গে দেবতাদের নামকরণ করা হয়। যেমন—জাম্দাসিনি, শালবাঁইসিনি, জোখাসিনি, পাশরাসিনি, মদমাসিনি, মালবাঁধিসিনি, মাতাসিনি, ভোদোসিনি, ঝাড়বনিসিনি, কুমারসিনি, করাসিনি ইত্যাদি। বাঁকুড়া জেলার খাতড়া, ওন্দা, পাঁচাল, ছাতনা প্রভৃতি অঞ্চলে এই সিনিদেবতার খুব আধিপত্য দেখা যায়। সিনিদেবতা আদিম বনদেবতা, কিন্তু গ্রামের নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সিনি দেবতার নামকরণ থেকেই বোঝা যায়, বড়াম বা কুদ্রা প্রভৃতি

বনদেবতাদের তুলনায় সিনিদেবতা গ্রাম্যসমাজের মধ্যে অনেক বেশি আধিপত্য বিস্তার করতে পেরেছেন।[১] তাই সিনিদেবতার পূজায় আজকাল ব্রাহ্মণরা পর্যন্ত পৌরোহিত্য করেন, এবং সকল জাতির লোক উৎসব-অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। গড়বেতা অঞ্চলে কুমারডুবি মৌজায় কুমারসিনি বনদেবতার পুরোহিত ব্রাহ্মণ। চম্‌কিনী দেবীও বনদেবী, কিন্তু তাঁর পুরোহিত এখন ব্রাহ্মণ। কয়াপাটে (হুগলী) কয়াসিনি দেবীর পুরোহিত ব্রাহ্মণ। বনদেবতার পূজায় এই সব ব্রাহ্মণের পৌরোহিত্য পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সাধারণত লায়েকরাই এ-অঞ্চলে বনদেবতার পুরোহিতের কাজ করেন দেখা যায়। সিনিদেবতা যে বনদেবতা, তার আরও উজ্জ্বল প্রমাণ এখনও রয়েছে। কোথাও কোন সিনি দেবতা গৃহদেবতারূপে পূজিত হন না। এটা খুবই উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ সিনিদেবতা যে গৃহের দেবতা হতে পারেন না, এ-সংস্কার এখনও সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে বদ্ধমূল রয়েছে। অরণ্য ছেড়ে লোকালয়ে সিনি দেবতারা এসেছেন বটে, কিন্তু গৃহের কোণে আশ্রয় নেননি। সিনি দেবতাদের কোন মন্দিরও বিশেষ কোথাও দেখা যায় না। চম্‌কিনী দেবী বা রঙ্কিণী দেবী প্রভৃতি বনদেবীর মন্দির দু'একটি দেখা যায়, পরে প্রতিষ্ঠিত। দেবতার খ্যাতি ও প্রতিপত্তির জন্য ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা তাঁদের দেবালয়ে প্রতিষ্ঠিত করে আভিজাত্য বাড়াবার চেষ্টা করেছেন। যেমন চমকাইডাঙ্গার (মেদিনীপুর) চম্‌কিনী দেবীর পাথরের রেখমন্দির, শোনা যায় লায়েক হাঙ্গামার সময় প্রতিষ্ঠিত। সিনি দেবতাদের মধ্যে এখনও এমন অনেকে আছেন যাঁরা লোকালয়েও আসেননি, জঙ্গলেই আছেন। আজও জঙ্গলেই তাঁদের পূজা করতে হয়। মাধাইসিনি, পায়রাসিনি প্রভৃতি বনদেবতার পূজা জঙ্গলেই হয়ে থাকে আজও।

সিনিদেবতাদের এই পরিচয় থেকে এই অঞ্চলের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের যে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তা প্রণিধানযোগ্য। ছোটনাগপুরের প্রাকৃতিক সীমারেখার মধ্যবর্তী পশ্চিমবঙ্গের এই অঞ্চল একসময় গভীর অরণ্যে আচ্ছন্ন ছিল। আদিম বনবাসীরা নানারকমের বনদেবতার পূজা করতেন, নানারকমের কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার জন্য। তারপর ক্রমে

১ 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা' ৬০বর্ষ, ৩য় সংখ্যায় শ্রীমাণিকলাল সিংহের 'ষষ্ঠী ও সিনি ঠাকুর' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

জঙ্গল হাসিল করে লোকবসতি স্থাপিত হয়েছে। অরণ্যের মধ্যে স্থানে স্থানে লোকালয় গড়ে উঠেছে। বনদেবতারা লোকালয়ের দেবতা হয়েছেন। অর্থাৎ যেখানকার বন কেটে বসতি গড়ে উঠেছে, সেখানকার বনদেবতাই সেই বসতির দেবতা হয়েছেন। বসতির বা গ্রামের সঙ্গে 'সিনি' নাম যুক্ত হবার কারণ তাই বলে মনে হয়। বনদেবতা যখন বসতির দেবতা হয়েছেন, তখন বিভিন্ন জাতির বাসিন্দারাও তাঁকে ক্রমে পূজ্য দেবতা বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। তাঁদের আচারঅনুষ্ঠানের প্রভাবও পড়েছে বনদেবতার অনুষ্ঠানে। তাই কয়াপাটের কয়াসিনী দেবী যখন ব্রাহ্মণের পৌরোহিত্য পেলেন, তখন পূজার আয়োজন হল দুর্গার মতন, মাটির ঘোড়া মানসিক দেওয়া বন্ধ হল, মদ্যদান নিষিদ্ধ হল। চম্‌কিনী দেবীর ক্ষেত্রে সব বন্ধ করা সম্ভব হল না। হাতি-ঘোড়া মানসিক দেওয়ার রীতি রইল, বলিদান বন্ধ হল না। কিন্তু মন্দির তৈরি হল, দুর্গাপূজার নবমীর দিন ষোড়শোপচারে পূজার ব্যবস্থা হল। তার সঙ্গে পৌষ-সংক্রান্তির প্রচলিত পূজাও অব্যাহত রইল। এইরকম সব সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানের বিচিত্র ইতিহাস এই অঞ্চলের লোকদেবতাদের কাছ থেকে জানা যায়, যা আর অন্য কারও কাছ থেকে জানবার কোন উপায় নেই। পশ্চিমবঙ্গের লোক-সংস্কৃতির ধারা নির্ণয়ের দিক থেকে, বাঁকুড়া হুগলী ও মেদিনীপুরের ত্রি-সীমানার এই সঙ্গমস্থলের ঐতিহাসিক গুরুত্ব খুব বেশি বলে মনে হয়।

রঙ্কিণী

পশ্চিমবঙ্গে এক দেবী আছেন, তাঁর নাম রঙ্কিণী দেবী। অধিকাংশ স্থানেই আজ তাঁর কোন মূর্তি নেই। দু'এক স্থানে যেখানে তাঁর মূর্তি আছে, সেখানে কালীর পাষাণ-মূর্তিতেই তিনি কল্পিত দেখা যায়। যেখানে নেই, এরকম অনেক স্থানে গাছতলায় বা কোন ঝোপের তলায় তিনি অবস্থান করেন। একখণ্ড মূর্তিহীন পাথরেই তাঁকে ধ্যান করেন পূজারী। কোথাও তিনি বনদেবী, কোথাও বা তিনি ভৈরবী। বড়াম, রুদ্রা ও চণ্ডী-দেবীর স্থানের মতন কোথাও পোড়ামাটির হাতিঘোড়া ছাড়া তাঁর আস্তানায় আর কিছু দেখা যায় না। এমন অনেক স্থান আছে যেখানে রঙ্কিণী দেবী বিরাজ করেন বলে অন্য কোন গ্রাম্য দেব-দেবী বসবাস করতে সাহস পান না। সেই গ্রামে আর অন্য কোন দেব-দেবীর পূজা হয় না। ভয়ঙ্কর দেবী বলে সকলে তাঁকে ভয় করেন, বিপদে-আপদে তাঁকে ভক্তিভরে স্মরণ করেন। ভয়ঙ্কর হলেও তখন রঙ্কিণী দেবী তাঁদের বরাভয় দেন, রোগব্যাধি থেকে মুক্ত করেন, বিপদ ভঞ্জন করেন, মঙ্গল করেন। ক্ষিপ্ত হলে তাঁকে জীবন্ত পশু বলিদান দিয়েও সহজে তৃপ্ত করা যায় না। আগে নরবলি দিয়ে তাঁকে তোষণ করতে হত। কে এই রঙ্কিণী দেবী? পশ্চিমবঙ্গে রঙ্কিণী দেবীকে একেবারে অজ্ঞাতকুলশীল বলা যায় না। গঙ্গার পূর্বতীরে কোথাও তাঁর নাম শোনা যায় না বিশেষ। পশ্চিমে বর্ধমান, মেদিনীপুর থেকে আরম্ভ করে আরও যত এগিয়ে যাওয়া যায়, মানভূম, সিংভূম, উড়িষ্যার দিকে, ততই রঙ্কিণী দেবীর নাম শোনা যায় বেশি। পাহাড়-বনময় দেশ ছেড়ে, বর্ধমান-মেদিনীপুর জেলার ভিতর দিয়ে যত গঙ্গার দিকে আসা যায়, রঙ্কিণী দেবীর নাম আর তেমন শোনা যায় না।

প্রাচীন ধর্মমঙ্গল কাব্যের নানাস্থানে দেব-দেবীর বর্ণনা আছে। ঢেকুরপালার ইছাই ঘোষ দেবীর সেবক ছিলেন। কানড়া যখন বিপদে পড়লেন, দেবী তখন তাঁর পক্ষে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। 'রঙ্ক' কথার সঙ্গে 'রণ' কথার অর্থ মিশে গিয়ে রণকিনী কোথাও রঙ্গিনীও হয়েছেন—"রঙ্গিনী উড়িলা রণে রুধিরলোচনা"। কানড়া যখন চৌতিশা পাঠ করছেন দেবী চণ্ডীর উদ্দেশে,

তখন দেখা যায়—"রক্ষ রক্ষ রঙ্কিণী রঙ্কিণী রণমাঝে, রণ রণ রেব উরি রাখ দশভুজে ॥" রক্ত দিয়ে রঙ্কিণী ভদ্রকালীর পূজার কথাও আছে—"তার রক্তে পূজিব রঙ্কিণী ভদ্রকালী।" কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে কাল-কেতুর চৌতিশায় রঙ্কিণীর উল্লেখ করেছেন—"রাজার সনে হৈল রণ রক্ষা নাহি আর। রঙ্কিণী করহ রক্ষা তবে সে উদ্ধার ॥"

রঙ্কিণী দেবী যে একেবারে অপরিচিতা নন, মঙ্গলকাব্যের কবিদের এইসব উল্লেখ থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। কবিরাও সব পশ্চিমবঙ্গের কবি। রঙ্কিণী আর রঙ্কিণীর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

পশ্চিমবঙ্গের যে-সব অঞ্চলে রঙ্কিণী দেবীর পূজার খবর পেয়েছি, তার অধিকাংশই বর্ধমান ও মেদিনীপুর জেলায়। তার সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য হল, রঙ্কিণী দেবীর পূজা এখনও যে-সব গ্রামে অনুষ্ঠিত হয়, সেই সব গ্রামের নামেরও কোন পার্থক্য নেই। সব গ্রামেরই প্রায় একই নাম। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। বর্ধমান জেলার সদর মহকুমায় একটি গ্রামে রঙ্কিণী দেবীর পূজা হয়। সেই গ্রামের নাম 'মৌলা'। মেদিনীপুর জেলায় চন্দ্রকোণা থানায় এক রঙ্কিণী দেবী আছেন। যে-গ্রামে তিনি আছেন, তার নামও 'মৌলা'। বিনপুর থানায় এক রঙ্কিণী দেবী আছেন, গ্রামের নাম 'মৌলা'। নন্দীগ্রাম থানায় একটি 'মৌলা' গ্রাম আছে, সেখানেও রঙ্কিণী দেবী আছেন। এক নামের একাধিক গ্রাম বাংলাদেশে অনেক আছে। একাধিক মৌলা নামে গ্রাম থাকাও আশ্চর্য নয়। কিন্তু আশ্চর্য হল, মৌলা নামের গ্রামের সঙ্গে রঙ্কিণী দেবীর অবস্থানের সম্পর্ক। সুতরাং মৌলা নামের সঙ্গে রঙ্কিণী দেবীর কোন ঐতিহাসিক বা সাংস্কৃতিক সম্বন্ধ নেই, এমন কথা বলতে সাহস হয় না। এরকম 'কোরিলেশন' (correlation) কখনও আকস্মিক হয় না, হতে পারে না। তাহলে, 'মৌলা' নামের সঙ্গে রঙ্কিণীর যে যোগাযোগ দেখা যায়, তার ঐতিহাসিক মূল কোথায়?

পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান রাষ্ট্রিক সীমান্তের বাইরে সিংভুম জেলায় রঙ্কিণী দেবীর পূজার আধিক্য ও ঘটা দুই-ই খুব বেশি। তার মধ্যে ঘাটশীলায় ধলভূমগড়ের রঙ্কিণী দেবী সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। সেখানে রঙ্কিণী দেবী ধলভূম-রাজের পৌরকতা পেয়ে মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। দেবী শুধু দেবালয়বাসিনী হয়েছেন যে তা নয়, তাঁর ধ্যান রচিত হয়েছে, পাষাণের মূর্তিও কল্পিত হয়েছে।

ধলভূমগড়ে রঙ্কিণী দেবী অষ্টভূজা, পাদপীঠে শবমূর্তি। উপরের দুই বাহুতে করী উত্তোলিত। ওড়িয়া ব্রাহ্মণ দেবীর পূজা করেন। পূজার ধ্যানের একটি চরণ হল—"রক্তাঙ্গীং শববাহনাং সদম্বুজাং ধ্যায়েৎ সদা রঙ্কিণীম্"। কৃষ্ণপক্ষের সকল অষ্টমীতে দেবীর বিশেষ পূজা হয়। ধলভূমরাজের কুলদেবী বলে রাজ-বাড়ির পত্রাদিতে লেখা থাকে—'শ্রীশ্রীরামচন্দ্র রঙ্কিণীচরণে শরণম্'

ধলভূমগড়ের রঙ্কিণী দেবী সম্পর্কে অনেক কিংবদন্তী শোনা যায়, তার মধ্যে দু'টি উল্লেখযোগ্য। একটি হল—দেবী আগে রাক্ষসীর মতন দেখতে ছিলেন। পঞ্চকোটের কোন দৈত্য একবার তাঁকে শক্তিপরীক্ষার জন্য তাড়া করে। তাড়িত হয়ে পালিয়ে এসে তিনি এক রজকের কাছে আশ্রয় নেন। সুবর্ণরেখা নদীতীরে রজক তখন কাপড় কাচছিল, সে তার কাপড়ের গাদির মধ্যে দেবীকে লুকিয়ে রাখে। দৈত্য খোঁজ-খবর করে না পেয়ে ফিরে যায়। রজকের আশ্রয় পেয়ে দেবী তাকে রাজা করেন। রজকের সঙ্গে সঙ্গে 'ধবল' কথার সম্পর্ক টেনে, রাজ্যের নাম ধবলভূম—ধলভূম হয়। সেই রাজবংশ অবশ্য পরে লোপ পায়। বর্তমান রাজারা রাজপুতবংশীয় বলে দাবী করেন। দ্বিতীয় কিংবদন্তী হল—দেবী কোন রাজপুতবংশের কুলদেবী ছিলেন। কুলপতি যখন ভাগ্যান্বেষণে বেরিয়ে পড়েন, তখন দেবীও তাঁর অনুগমন করেন। অবশেষে সুবর্ণরেখাতীরে এসে আর অগ্রসর হন না।

কিংবদন্তীর যদি কোন তাৎপর্য থাকে, তাহলে দেবীর পূর্বেকার রাক্ষসী মূর্তি ও পঞ্চকোটের দৈত্যের সঙ্গে লড়াইয়ের কাহিনীর মধ্যেই আছে। রজক বা রাজপুত, কারও মধ্যে নেই। সিংভূম হল হো, মুণ্ডা প্রভৃতি আদিবাসীদের প্রাচীন বাসস্থান। সেখানে ঐতিহাসিক ঘটনাচক্রে কোন রাজপুতবংশীয় কেউ ভাগ্যান্বেষণে বিদেশ থেকে এসে আধিপত্য বিস্তার করতে পারেন না যে তা নয়। কিন্তু রাজার কুলদেবী আদিবাসীদের কুলদেবী হয়ে উঠবে, এমন কোন কথা নেই। রাজ্য জয় করা সেকালে যত সহজ ছিল, সংস্কৃতিগত আচার-অনুষ্ঠানাদি জয় করা কোনকালেই তত সহজ ছিল না। বরং ইতিহাসে দেখা যায়, রাজধর্ম প্রজার উপর যতটা না ব্যাপকভাবে আরোপিত হয়েছে, তার চেয়ে অনেক বেশি ব্যাপকভাবে প্রজার আচরিত ধর্ম রাজারা গ্রহণ করে, আত্মসাৎ করে, নতুন রূপ দিয়েছেন। তাঁদের স্বার্থেই তাঁরা দিয়েছেন। ধর্মের চেয়ে রাজ্যের স্বার্থ রাজাদের বেশি। রাজ্যস্বার্থে লোকধর্মকে স্বীকার করেই

রাজারা কূটবুদ্ধির পরিচয় দিয়ে থাকেন। বৈদিক যুগের আর্যদের থেকে আরম্ভ করে, ইংরেজযুগের বৃটিশ শাসকরা, সকলেই স্থানীয় লোকধর্মের সঙ্গে আপস-রফা করে রাজত্ব বিস্তার করেছেন দেখা যায়। ধলভূমের রাজারা তার ব্যতিক্রম হবেন, এমন কোন বিশেষ ঐতিহাসিক কারণ কিছু থাকতে পারে না। বরং এই কথাই মনে হয় যে, রঙ্কিণী দেবী স্থানীয় আদিবাসীদের কাছে দৈত্য-দানব বা রাক্ষসীর কল্পনায় পূজিত হতেন। তাঁর প্রভাবও ছিল খুব এই পার্বত্য বন্য অঞ্চলে। হো-মুণ্ডা প্রভৃতি স্থানীয় আদিবাসীদের সায়েস্তা করতে, আয়ত্তে আনতে, এই অঞ্চলের রাজারাজড়াদের যথেষ্ট হয়রানও হতে হয়েছে। তারই একটি কৌশল হিসেবে, তাদের প্রভাবপ্রতিপত্তিশালী কোন দেবীকে যদি রাজারা কুলদেবীর মর্যাদা দিয়ে পূজার্চনারও ব্যবস্থা করে থাকেন, তাহলে তাঁরা রাজবুদ্ধিরই পরিচয় দিয়েছেন।

রঙ্কিণী দেবীকে নিয়ে যে এইরকম কোন ঘটনা কিছু ঘটেছে, তার বিক্ষিপ্ত প্রমাণও পাওয়া যায় অনেক। চিল্‌কিগড়ের রাজারা ধলভূমগড়ের রাজবংশের শাখা। চিল্‌কিগড়ে দেখেছি রঙ্কিণী দেবী আছেন এবং একপাশে কয়েকটি গাছের ঝোপের তলায় পোড়ামাটির হাতি-ঘোড়াসহ, ঠিক এ-অঞ্চলের অন্যান্য বনদেবতাদের মতন, তিনি বিরাজ করছেন। রাজার অনুগামী কুলদেবী যদি ধলভূমে এসে স্থানীয় বাসিন্দাদের উপর আরোপিত হয়ে পূজিত হতেন, তাহলে বনদেবীর বেশে সেই রাজবংশের দ্বারা তিনি এইভাবে পূজা পেতেন না। চিল্‌কিগড় ঝাড়গ্রামের মধ্যে। সিংভূমে আরও অনেক স্থানে রঙ্কিণী দেবীর পূজা হয়—নরসিংগড়ে, বহড়াগড়ে, নতুনগড়ে, কোকপাড়ায়, হলদিপুকুরে, হরিণ-ধুকড়িতে। গাছের তলায় বা ঝোপের তলায় সাধারণত রঙ্কিণী দেবী বিরাজ করেন এবং একখণ্ড পাথর ছাড়া তাঁর আর অন্য কোন মূর্তি দেখা যায় না। উড়িষ্যার কেওঞ্ঝড় প্রভৃতি অঞ্চলে অনেক স্থানে কলেরার মতন মহামারীর প্রাদুর্ভাব হলে 'রাণ্‌কিনী' দেবীর পূজা দেওয়া হয়। এইসব তথ্য থেকে বোঝা যায়, ছোটনাগপুরের পার্বত্য ও বন্য অঞ্চলের স্থানীয় আদিবাসীদেরই দেবী ছিলেন রঙ্কিণী দেবী। এখনও তাই আছেন। অরণ্য ও পর্বত ছেড়ে ক্রমে বত সভ্য সমতল ভূমির দিকে তিনি পশ্চিমবঙ্গে এগিয়ে এসেছেন, তত তাঁর বন্য রূপটাও খানিকটা সভ্য ও শাস্ত্রীয় হয়েছে। তা হলেও অনেক সময় লেগেছে, কারণ বর্ধমান পর্যন্ত নরবলিপ্রথা বর্জিত হয়নি দীর্ঘকাল।

কিন্তু সেই "মৌলা" গ্রামের রহস্যের উৎস কোথায়? শোনা যায়, সিংভূমে মহুলিয়ার কাছে এক পাহাড়ে রঙ্কিণী দেবী আগে নাকি বিরাজ করতেন। তখন দেবীর সামনে নরবলি দেওয়া হত। দেবী নিজেই নরহত্যা করতেন। হিন্দোলজেড়ী মৌজায় মহুলিয়া নামে গ্রাম আছে। সেখানে বহু উপকায়স্থ পরিবারের বাস আছে। জনশ্রুতি হল, তাঁরাই আগে নরবলির উপাদান, অর্থাৎ মানুষ যোগান দিতেন। 'মহুলিয়া' থেকেই 'মৌলা' নাম হয়েছে মনে হয়। রঙ্কিণী দেবীর পূজার প্রসার হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে এই অঞ্চল থেকে। বিস্ময়কর হল, রঙ্কিণী দেবীর পূজার কেন্দ্রগুলিরও নাম হয়েছে মহুলিয়ার অনুকরণে মৌলা। পশ্চিমবঙ্গে মৌলা নামের সঙ্গে রঙ্কিণী দেবীর পূজার 'কো-রিলেশনের' এ-ছাড়া অন্য কোন তাৎপর্য আছে বলে মনে হয় না। 'ডিফিউ-জনের' এ এক বিচিত্র দৃষ্টান্ত। প্রতিপত্তিকেন্দ্রের ভৌগোলিক নামের পর্যন্ত বিকীরণ (diffusion) হয়েছে।

বর্ধমানে একটি এবং মেদিনীপুরে তিনটি মৌলা গ্রামের অস্তিত্বের খোঁজ পেয়েছি। প্রত্যেকটিতে রঙ্কিণী দেবীর পূজা হয়। 'কালিকামঙ্গলেও' এই মৌলা গ্রামের নাম পাওয়া যায় রঙ্কিণী দেবীর সঙ্গে—

মৌলায় রঙ্কিণী বন্দো জোড় করি পাণি।
ভাণ্ডারহাটে বন্দিলাঙ সাবিত্রী গোসানি॥

রঙ্কিণীর পূজায় নরবলি হওয়াও আদৌ আশ্চর্য নয়। দেবীর আসল পূজারী যারা, সেই আদিবাসীরা আগে নরবলি দিয়েই ফলন-শক্তির (fertility) কামনা প্রকাশ করত। মাত্র একশ-সওয়াশ বছর আগেও বর্ধমান জেলাতেই রঙ্কিণী দেবীর সামনে নরবলির কথা শোনা গেছে। তখনকার কলকাতার সংবাদপত্রে তাই নিয়ে অনেক আলোচনাও হয়েছে। দু-একটি সংবাদ উদ্ধৃত করছি :

"...সম্বাদ প্রভাকর পত্র হইতে সমুদায়িক পত্রে প্রকাশ পাইতেছে যে, বর্ধমানে শ্রীশ্রী৺রঙ্কিণীশ্বরী দেবী অর্থাৎ মৃত্তিকা কিম্বা পাষাণ-খুদিতা মূর্তির নিকটে একটা নরবলি হইয়াছে, কিন্তু তাহা কে করিয়াছে তাহার নির্ণয় এ-পর্য্যন্ত হয় নাই।"—সমাচার দর্পণ, ৪ ফেব্রুয়ারী, ১৮৩৭।

"...সাধারণ লোকেরদের মধ্যে এমত জনরব উপস্থিত হইয়াছে যে, তথাকার কোন প্রধান লোক এই নরবলিতে লিপ্ত আছেন এবং আমরা

আরো জানি, এই রঙ্কিণী দেবীর নিকট পূর্বেও বিস্তর নরবলি হইয়াছে।" ('জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকা থেকে 'সমাচার দর্পণ' পত্রে উদ্ধৃত, ৪ ফেব্রুয়ারী, ১৮৩৭)।

১৮৩৭ সাল পর্যন্ত যদি কলকাতার কাছে বর্ধমানে রঙ্কিণী দেবীর সামনে নরবলি হয়ে থাকে, তাহলে তার আগে, সিংভূমের পাহাড়ে বনে, কি মহুলিয়ায় যে নরবলি হত তাতে সন্দেহ নেই।[১] গড়বেতা, আরামবাগ অঞ্চলের যে-সব লোকদেবতা ও বনদেবতা আছেন, তার মধ্যেও রঙ্কিণী দেবী আছেন। চম্‌কিনী, সনকিনী, রণকিনী ইত্যাদি এখানকার বনদেবীদের নাম। এই বনদেবীদের সাতবোন-রূপেও কল্পনা করা হয়, এমনকি 'সাতবউনি' নামেও এক বনদেবী আছেন। এই বনদেবীরাই দক্ষিণবঙ্গে এসে মুসলমান আমলে বনবিবি হয়েছেন এবং বনদেবীদের সাতবোন 'সাতবিবি' বলে পূজিত হন। দক্ষিণ চব্বিশপরগণার অনেক গ্রামে এই সাতবিবির পূজা দেখেছি। সর্বত্রই এই বনদেবীদের বিশেষ পূজা-উৎসব হয়, পৌষমাসের মকর-সংক্রান্তিতে। এটাও বিশেষভাবে লক্ষ করার মতন। বড়াম, কুদ্রা, ভৈরব ভৈরবী প্রভৃতি ভূমিজ লায়েক সাঁওতাল বাউরীদের দেব-দেবীর উৎসবও মহাসমারোহে এই সময় হয়ে থাকে। উল্লেখযোগ্য হল, মৌলা গ্রামে রঙ্কিণী দেবীর শারদীয় ও কালীপূজার বিশেষ পূজার ব্যবস্থা থাকলেও, সবচেয়ে বিরাটাকারে পূজা ও উৎসব হয় মকর সংক্রান্তিতে। এসব জায়গায় অনেকে রঙ্কিণীকে ভৈরবী বলেও ধারণা করেন। বোঝা যায়, ব্রাহ্মণ পুরোহিত বনদেবী ও আদিবাসীদের ফলনশক্তির অন্যতম আদিদেবী রঙ্কিণীকে গোত্রান্তরিত করবার চেষ্টা করেও সম্পূর্ণ সার্থক হননি।

১ শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন : রঙ্কিনী দেবী (সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৪১ বর্ষ)

লোকধর্ম ও শিল্পকলা

লোকশিল্পের সঙ্গে লোকধর্মের সম্পর্ক গভীর। কত প্রত্যক্ষভাবে যে গভীর তা বাংলার লোকালয়ে ঘুরলেই বোঝা যায়। মানুষের আচরিত ধর্ম ও কল্পিত ধ্যানধারণাকে কেন্দ্র করেই প্রধানত আমাদের দেশের শিল্পকলা গড়ে উঠেছে। শুধু আমাদের দেশের নয়, প্রায় সব দেশেরই। বাংলাদেশের শিল্পকলাতেও তার বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য আছে। এখানে কেবল একটি শিল্পের দৃষ্টান্ত দেব, মৃৎশিল্পের, বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরের মৃৎশিল্প। লোকধর্মের সঙ্গে লোকশিল্পের সম্পর্ক প্রসঙ্গে খুব বেশি করে মনে পড়ে বৌদ্ধতন্ত্রের কথা। মহাযান, বজ্রযান ইত্যাদি নানাধর্মের প্রভাবে যে কত নতুন নতুন বুদ্ধের, নতুন নতুন দেবতার, নতুন নতুন বোধিসত্ত্বপূজার প্রচলন হয়েছিল বাংলাদেশে—ভাবলেও বিস্মিত হতে হয়। বৌদ্ধ 'সাধনমালা', মহাপণ্ডিত অভয়াকর গুপ্তের 'নিষ্পন্নযোগাবলী' প্রভৃতি গ্রন্থে তার পর্যাপ্ত প্রমাণ রয়েছে।[১] এক-এক দেবতার নানা মূর্তি পরিকল্পিত হয়েছে। সেই সব মূর্তির, মুদ্রার ও দেবতার নাম অসংখ্য। কখনও প্রসন্ন কখনও অপ্রসন্ন মূর্তি, কখনও শান্ত কখনও করুণা মূর্তি, মূর্তিবৈচিত্র্যের ও ভাববৈচিত্র্যের শেষ নেই। এ রকম শত শত মূর্তির ধ্যান ও রূপের বর্ণনা করা হয়েছে বৌদ্ধ সাধনমালায়। বাংলাদেশে, নেপালে, তিব্বতে চিত্রকররা এই সব ধ্যানমূর্তিকেই রূপান্বিত করেছেন পটে ও পাথরে। বাঙালী ভাস্কররা এরকম কত বিচিত্র মূর্তিই যে গড়েছেন তার ইয়ত্তা নেই। মিউজিয়মে তার আভাস পাওয়া যায়, আর পাওয়া যায় বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে। পথের প্রান্তে, গাছতলায়, পুকুরপাড়ে, জীর্ণমন্দিরে এরকম অজস্র দেবমূর্তি আজও বাংলার গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে রয়েছে। কোন্ কালের, কোন্ দেবতার মূর্তি কিছুই জানে না কেউ, যে-কোন দেবতার দৈবশক্তি আরোপ করে সেগুলি কোথাও পূজিত হচ্ছে, কোথাও হচ্ছে না। সুন্দর প্রস্তরমূর্তি উল্টিয়ে পুঁতে দিয়ে তার উপর পুকুরঘাটে কাপড় কাচতেও দেখেছি।

শুধু ভাস্কর্য নয়, চিত্রশিল্প ও মৃৎশিল্পও বাংলার লোকধর্মকে আশ্রয় করে

---

১ Benoytosh Bhattacharyya : Sadhanmala, Vols. 1, 2. Nispannayogabali, ভূমিকা।

প্রধানত গড়ে উঠেছে দেখা যায়। বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরে লোকধর্মের সঙ্গে লোকশিল্পের গভীর, ও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের কথা বিশেষভাবে মনে পড়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরলে। উৎসব-পার্বণে, গ্রামদেবতার স্থানে স্থানে তার প্রচুর নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে। মৃৎশিল্পটি প্রধানত বিষ্ণুপুর মহকুমার একটি গ্রামে কেন্দ্রীভূত। গ্রামের নাম পাঁচমুড়ো, বিষ্ণুপুর থেকে প্রায় ষোল মাইল দূরে। পাঁচমুড়ো বা বিষ্ণুপুর কেন্দ্র করে, পঞ্চাশ-ষাট মাইল ব্যাসার্ধ নিয়ে একটি বৃত্ত-রেখা টানলে, বর্ধমান হুগলী ও মেদিনীপুর জেলার যে সব অঞ্চল এই রেখাভুক্ত হয়, মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, ততদূর পর্যন্ত পাঁচমুড়োর কুম্ভকারদের মৃৎশিল্পের প্রভাব বিস্তৃত। তার সঙ্গে লক্ষণীয় ব্যাপার হল, এই অঞ্চলের সাংস্কৃতিক সাদৃশ্য, অর্থাৎ লৌকিক ধর্ম ও আচার-অনুষ্ঠানের একাত্মতা। মনে হয় যেন এই সাংস্কৃতিক অঞ্চলের উৎসব-অনুষ্ঠানকে আশ্রয় করে একসময় এই মৃৎশিল্পের বিকাশ হয়েছিল বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরের পাঁচমুড়ো গ্রামে এবং আরও অন্যান্য স্থানে। হয়ত আরও বিস্তৃত ছিল একসময় এই অঞ্চলের সীমানা। তারপর সামাজিক পরিবর্তনের ফলে উৎসব-পার্বণের ও লোকধর্মাচরণের যেমন পরিবর্তন হয়েছে, তেমনি এই শিল্পেরও অবনতি হয়েছে এবং তার প্রভাব-সীমানাও সঙ্কুচিত হয়েছে।

এই অঞ্চলের ধর্মাচরণের কথা বলি। প্রথমেই বলতে হয় মনসাদেবীর কথা, মনসাপূজার কথা। বাংলাদেশে মনসার প্রতিপত্তির কথা বাঙালী মাত্রেই জানেন। পূব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ-বাংলার সর্বত্রই মনসা অন্যতম প্রধান লোকদেবতা। পূবে যেমন, পশ্চিমে তেমনি, উত্তরে যেমন দক্ষিণে তেমনি তাঁর প্রতিপত্তি ও জনপ্রিয়তা। তারতম্য বোঝা মুশকিল। তার বিচারও করছি না এখানে। তবু বলছি, পশ্চিমবঙ্গে মনসার প্রভাব-প্রতিপত্তি অসাধারণ। শুধু অসাধারণ নয়, প্রভাবের বিশেষত্বও আছে। পশ্চিমবঙ্গে বর্ধমান বীরভূম বাঁকুড়া মেদিনীপুর, হুগলী জেলায় আদিবাসীদের বসবাসও খুব বেশি। সীমান্ত অঞ্চল তো আদিবাসীপ্রধান অঞ্চল। এই সব জেলার আদিবাসীদের মধ্যে মনসাপূজার প্রচলন সবচেয়ে বেশি এবং প্রতিপত্তিও বোধ হয় সবচেয়ে প্রচণ্ড। একেবারে আদিম কৌমদেবতা যেখানে আছেন, সেখানেও মনসা আছেন। পশ্চিমবাংলার অন্যতম লোকদেবতা ধর্মঠাকুরকে মনসাশূন্য অবস্থায় কদাচিৎ দেখা যায়। যেখানে কেউ নেই, সেখানেও মনসা আছেন। বাউরী, হাড়ী,

ধীবর, ডোম, সকলের অন্যতম উপাস্য দেবতা মনসা। গ্রামে গ্রামে অসংখ্য দেবালয় আছে মনসার, সবই প্রায় পর্ণকুটির। যেখানে কোন আলয় নেই, সেখানে গাছতলা আছে এবং গাছতলায় চণ্ডী, ধর্মঠাকুর যেই থাকুন, মনসা থাকবেনই। যেখানে গাছ নেই, সেখানে উন্মুক্ত মাঠ আছে আকাশের তলায় এবং সেখানেই রোদ-ঝড়-বৃষ্টি মাথায় নিয়ে মনসা বিরাজ করছেন। বাঘ-ভল্লুকাদি বন্য জন্তু এই অঞ্চলের গভীর জঙ্গলে একসময় কম ছিল না। পথ চলতে সবচেয়ে ভয় বেশি সাপের। বর্ধমান, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম অঞ্চলে পথ চলতে পদে পদে গ্রামবাসীর সাবধানবাণী শুনতে হয় সাপের জন্য। বিষাক্ত সাপ ও সাপের দেবতা মনসার কথা প্রতি পদক্ষেপে মনে হয়। ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক দু-ই পটভূমিকাতেই মনে হয়, আদি-অকৃত্রিম বিষাক্ত সাপের ভীতি থেকে আদিম সর্পপূজার উৎপত্তি হয়েছে এবং সেই আদিম সর্পপূজা বৌদ্ধ 'জাঙ্গুলীর' রূপ ধরে পরে সর্বত্র বিরাজিত মনসা হয়েছেন। মূলে সেই ভয়াবহ জন্তুপূজা ছাড়া আর কিছু নেই। নেই বলেই পশ্চিমবাংলার আদিবাসীদের মধ্যে 'মনসা' অপরিচিত নাম হওয়া সত্ত্বেও, সহজেই এত লোকপ্রিয় হয়েছে মনসাপূজা।

এখানেই শেষ নয়। বাঁকুড়া বিষ্ণুপুর অঞ্চলের লোকোৎসবের মধ্যে অন্যতম হল, বড়ামপূজা, ভৈরবপূজা, চণ্ডীপূজা, ধর্মপূজা ও মনসাপূজা। যেখানে দেবতারা আলয়ে, অর্থাৎ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত, সেখানেই দেখা যায়, ভক্তের সামাজিক মর্যাদার সঙ্গে ভগবানের মর্যাদা উন্নত হয়েছে। অর্থাৎ সাধারণত মধ্যবিত্ত ভক্তদের আরাধ্য দেবতারই দেবালয় আছে, তার নিচের স্তরে নেই। অবশ্য আলয়ে চণ্ডী, মনসা ও ধর্মরাজ থাকেন। বড়াম ও ভৈরব থাকেন না, কারণ থাকতে নেই। আরও একজন আছেন—রুদ্র বা রুদ্রা। এই রুদ্র, বড়াম্ ও ভৈরব বনেজঙ্গলে, গাছতলায়, মাঠে মাঠে থাকেন। ভৈরব হলেন, 'ঝোপঝাড়ের' ভৈরব। রুদ্র ও বড়ামও প্রায় তাই। এঁদের জন্য গাছতলায় বড় জোর মাটির বেদী থাকতে পারে, কিন্তু কোনরকম আলয় থাকতে পারবে না। সকলেই বনদেবতা। বন হাসিল করে ক্রমে গ্রাম ও নগর গড়ে উঠেছে, তাই আজ আর তাঁরা বনে থাকতে পারেন না, অতীত অরণ্যের নির্জন প্রতীক বৃক্ষের তলায় থাকেন।

এঁদের মূর্তি কি রকম? কোন ধ্যানলব্ধ কল্পিত মূর্তি কিছু নেই, এইটাই

হল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। মনসার মূর্তি হল, মাটির ঘটের উপর সারিবদ্ধ সাপের ফণা, থাকে-থাকে সাজানো। বাকি সব দেবতার মূর্তিই হল হাতি আর ঘোড়া। নানারকমের ঘোড়া আর হাতি, নানা আকারের, কিন্তু নানারঙের নয়, হয় কালো, না হয় পোড়া মাটির মতন রং। ভৈরবও তাই, চণ্ডীও তাই, বড়ামও তাই—এমনকি কোথাও কোথাও ধর্মরাজ ও মনসা পর্যন্ত তাই। বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরে পথ চলতে, গ্রামে গ্রামে, অসংখ্য গাছতলায় দেখা যায়, সিঁদুরল্যাপা মাটির হাতি-ঘোড়া সাজানো। বেশ যে সাজানো-গোছানো তা নয়, নতুনও নয়। বছরে বছরে বদলানো হয়। পাশে স্তূপীকৃত হয়ে থাকে ভাঙাচোরা মাটির সব হাতি-ঘোড়া। এ কোন্ দেবতা? জিজ্ঞাসা করলে কেউ বলে বড়াম, কেউ বলে ভৈরব, কেউ বলে রুদ্র, কেউ বলে মহাজাগ্রত চণ্ডী ও মনসা, কেউ বা তার সঙ্গে ধর্মঠাকুরের নাম করে। অধিকাংশই ব্যগ্রক্ষত্রিয় পাড়ায়, বা বাউরী পাড়ায়, বা হাড়ী ডোম পাড়ায়। বিষ্ণুপুর শহরের মধ্যে ও আশে-পাশে একাধিক গাছতলায় এই হাতিঘোড়ারূপী ভৈরব, বড়াম, রুদ্র, চণ্ডী দেখেছি। বিষ্ণুপুর থেকে হুগলী-মেদিনীপুরের সীমান্তে যেতে যেতে গ্রামে গ্রামে অসংখ্য গাছতলায় দেখেছি। বাঁকুড়া ছাতনা অঞ্চলে দেখেছি। বর্ধমান জেলায় দেখেছি, এমন কি বর্ধমান শহরের মধ্যে পর্যন্ত, বাউরীপাড়ায় ঐ হাতি-ঘোড়া দেখেছি। হুগলী জেলায় আরামবাগ অঞ্চলেও ঐ হাতি-ঘোড়ারূপী বড়াম ও ভৈরবপূজার বেশ প্রচলন আছে।

ঘোড়া আছে অনেক, মাটির ঘোড়া, ছোট ছোট হাতেগড়া শিশুদের খেলনার মতন ঘোড়া। বীরভূমে ধর্মঠাকুরের সঙ্গে প্রচুর সংখ্যায় থাকে। বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরেও আছে। বর্ধমান ও হুগলীতেও যথেষ্ট আছে। কিন্তু গাছ-তলার বড়াম, ভৈরব, চণ্ডীর যে ঘোড়া সে-ঘোড়া নয়। এ ঘোড়ার চেহারাই আলাদা, আকারেও বড়। তাছাড়া হাতি আছে। অসংখ্য হাতি, বড় বড় হাতি। মনসার ঘট সাপের ফণাসহ সর্বত্রই আছে। চিত্রিত রঙিন সুন্দর পূর্ববঙ্গের মনসার ঘট অনেকেই দেখেছেন। পশ্চিমবঙ্গের "মনসার বারির" বৈচিত্র্য বিস্ময়কর। রঙিন্ বৈচিত্র্য নয়, ফণার বিস্তারের বৈচিত্র্য। অথচ রঙচঙের ছিটেফোঁটাও নেই কোথাও কেবল সাপের ফণা আর ফণা, যেন ফণার ঢেউ উঠেছে।

এত সব হাতি-ঘোড়া আর সাপের ফণার ছড়াছড়ি ও মানতপূজার প্রতিপত্তি দেখলে মনে হয় না কি যে, বাংলাদেশের পশ্চিমাঞ্চলে অন্তত এক-সময় নানারকমের বনদেবতার পূজা ও বন্যজন্তুর পূজার ব্যাপক প্রচলন ছিল? ধর্মঠাকুরের ও পীরের ঘোড়াগুলোকে কেউ ভেবেছেন আর্যদের ঘোড়া, কেউ ভেবেছেন গ্রীকদের, কেউ বা আরবী তুর্কীদের। সূর্যদেবের রথের ঘোড়াও হয়ত মনে হয়েছে অনেকের। কিন্তু আরবী, তুর্কী, গ্রীক বা আর্যদের আগেও হয়ত এদেশী একরকম ঘোড়া ছিল, আজ অন্তত অনুসন্ধানের ফলে একথা বলা যেতে পারে। হয়ত তা তুর্কী ঘোড়ার মতন তেজী না হতে পারে, তবু ঘোড়া। আর হাতি তো ছিলই। ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস তো প্রায় হাতিরই ইতিহাস বলা যেতে পারে। হাতির পিঠে চড়ে যুদ্ধ, শিকার, ভ্রমণ, পথচলা, বাণিজ্য, সব কিছু। আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে ভারতীয়দের যুদ্ধ মানে তো ঘোড়া-বনাম-হাতির যুদ্ধ এবং হাতির পরাজয়। কুষাণযুগে ঘোড়ার জয়জয়কার, দেয়ালচিত্রে পর্যন্ত দেখা যায়, অশ্বারোহীর অনুগামী গজারোহী। মন্থর গজ-সভ্যতার পরাজয় হয়েছে তখন দ্রুতগামী অশ্বসভ্যতার কাছে।

ছোটনাগপুর অঞ্চলে অসংখ্য বন্য হাতির উপদ্রব সেদিনও ছিল। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পর পশ্চিমবাংলার শত শত গ্রাম যখন জনশূন্য হয়ে গিয়েছিল, তখন দলে-দলে ছোটনাগপুরের বুনো হাতি বীরভূম-মল্লভূমের মধ্যে উন্মত্তের মতন চলে বেড়াত। বাঘের তো কথাই নেই। অরণ্যময় দেশ বলে নাম 'বীর'-ভূম। মল্লভূম থেকে ঝাড়গ্রাম পর্যন্ত একাংশের সেদিনও বৃটিশরা 'জঙ্গলমহল' নাম রেখেছিলেন। বিস্তীর্ণ জঙ্গলে বন্যজন্তুর উপদ্রবও কম ছিল না। হাতি-ঘোড়া, বাঘ, ভাল্লুক, সাপ অসংখ্য ছিল। আদিবাসীরা তাদের পূজাও করত বলে মনে হয়, কারণ বৃক্ষপূজা ও জন্তুপূজা আদিমতম পূজার মধ্যে অন্যতম পূজা। মাটির ঘোড়া পূজা আরও অনেক আদিম জাতির মধ্যে দেখা যায়। ১৮৭৫ সালে মেজর হেন্‌ডলে ভীলদের সম্বন্ধে লিখে গেছেন যে, তাদের দেবতার স্থানে পাথর আর মাটির ঘোড়া দেখা যায় খুব বেশি। কোথাও কোথাও ভীলেরা ঘোড়ার সামনে সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখে।[১]

হাতি যে অন্তত 'টোটেম'-রূপে পূজিত হত তাতে কোন সন্দেহ নেই।

---

১ J. A. S. B., Vol. 44,—1875; also Russell and Hiralal's—'The Tribes and Castes of the Central Provinces of India,' Vol. 2, P. 289.

ঘোড়াও বোধ হয় তাই হত। বাঘেরও পূজা হত। কচ্ছপেরও হত। 'বাঘ', 'হাতি' ইত্যাদি পশ্চিমবঙ্গের জাতিগত উপাধির মধ্যে আজও সেই "টোটেমপূজার" স্মৃতি বেঁচে রয়েছে। ছোটনাগপুর-সাঁওতাল পরগণা থেকে পশ্চিমবঙ্গ পর্যন্ত জন্তপূজা ও টোটেম-পূজার প্রাধান্য ছিল এককালে। আজকের লোকধর্ম, লোকাচার ও লোকোৎসবের মধ্যে তারই অবশেষ দেখা যায়।

বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরের যে মৃৎশিল্পের কথা বলেছি, তার বিকাশ হয়েছে মূলত এই লোকধর্মকেই আশ্রয় করে। বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরের গ্রামে-গ্রামে গাছতলায় এই যে সব মাটির হাতি-ঘোড়া ইত্যাদি দেখা যায়, পাঁচমুড়োর কুম্ভকাররা প্রধানত সেগুলি তৈরি করেন। মৃৎশিল্পের এরকম নিদর্শন বাংলাদেশের আর কোথাও আছে কিনা জানি না। লোকধর্ম আজও এই অঞ্চলে জীবন্ত আছে বলে এই লোকশিল্পটিও বেঁচে রয়েছে। পৌষমাসের বড়ামপূজা ও ভৈরব-পূজার সময় হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ হাতি-ঘোড়া তৈরি করেন পাঁচমুড়োর কুম্ভকাররা। দু-তিন ইঞ্চি উঁচু হাতি-ঘোড়া থেকে আরম্ভ করে আসল হাতি-ঘোড়ার বাচ্চার মতন বড় বড় মাটির হাতি-ঘোড়া। মাটির তৈরি এত বিশাল হাতি-ঘোড়া আর কোথাও দেখা যায় না। দূর থেকে দেখলে মনে হয় যেন সত্যিই হাতি-ঘোড়ার বাচ্চা সব। আকারের তুলনায় অসম্ভব হাল্‌কা, ফাঁপা। ফাঁপানো এবং ঝামার মতন পুড়িয়ে শক্ত করা। খড়ের মূর্তির ছাঁচের উপর গড়ে, মধ্যে মধ্যে ছিদ্র রেখে, যদি আগুন ধরিয়ে দেওয়া যায় মাটির হাতি-ঘোড়ার গায়ে, তাহলে কি হয়? ধোঁয়া ও আগুনের জন্ত মূর্তির গায়ে ছিদ্র আছে। আগুনে খড়গুলি পুড়তে থাকে। তাতে মাটির মূর্তি আগুনে পুড়ে পোড়ামাটি হয়ে যায় এবং খড়শূন্য হয়ে মূর্তিটি ফাঁপা অবস্থায় বেরিয়ে আসে। অভিনব প্রথা। মানব-সভ্যতার আদিশিল্পী যে কুম্ভকার তা পাঁচমুড়োর কুম্ভকারদের এই অপূর্ব কীর্তি দেখলে উপলব্ধি করতে কষ্ট হয় না।

বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুর, বর্ধমান-হুগলী সর্বত্র এই কুম্ভকারদের তৈরি হাতি-ঘোড়া হাজার হাজার চালান যায় পৌষমাসের বড়াম ও ভৈরব পূজার সময়। ছোট বড় নানারকমের হাতি-ঘোড়া নিয়ে চলে লোক দলে দলে, মানতের হাতি-ঘোড়া, পৌষের উৎসবের সময়। তারপর শ্রাবণ সংক্রান্তির মনসা পূজার সময় 'মনসার বাড়ি' তৈরি হয়। একতলা, দোতলা, চারতলা, সাততলা 'মনসার

বারি', মাটির তৈরি। সারিবদ্ধ সাপের ফণা ঘটের উপর মুকুটাকারে থাকে-থাকে সাজানো, আধফুট, একফুট থেকে আট দশ ষোল ফুট, কি আরও বেশি উঁচু। দূর থেকে দেখলে মনে হয় যেন শত শত সাপ ফণা তুলে ছুটে আসছে। শুধু একটি মাত্র মাটির ফণাও আছে, ঘট নেই। ফণাটি বিরাট। এরকম কত যে বৈচিত্র্য তার ঠিক নেই।

মনে হয় যেন সেই সুদূর অতীতের জন্তপূজা ও টোটেমপূজার সময় থেকে আদিশিল্পী এই কুম্ভকাররা এই সব মাটির হাতি-ঘোড়া-সাপ ইত্যাদি তৈরি করছেন। বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরের, পাঁচমুড়োর কুম্ভকাররা আজও সেই ঐতিহ্য বহন করে চলেছেন এবং ক্রমে ক্রমে আদিম হাতি-ঘোড়ার সরল-মূর্তি থেকে তাঁরা একটা ভঙ্গীগত স্বাতন্ত্র্য ফুটিয়ে তুলেছেন (stylised) তার মধ্যে, যা আর বাংলাদেশের অন্য কোন অঞ্চলে দেখা যায় না। দেখা গেলেও, এই কেন্দ্র থেকেই তার বিকীরণ হয়েছে বলে মনে হয়।

পশ্চিমবঙ্গের নাথধর্ম

'মহানাদ' প্রসঙ্গে নাথধর্মের আলোচনা করা হয়েছে। দক্ষিণরাঢ়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য হল নাথযোগীদের সাংস্কৃতিক প্রাধান্য। উত্তরবঙ্গের সঙ্গে দক্ষিণবঙ্গের, বিশেষ করে দক্ষিণরাঢ়ের এই দিক দিয়ে এক বিচিত্র সাদৃশ্য দেখা যায়। উভয় অঞ্চলের মধ্যে সাংস্কৃতিক সংযোগ এবং লেনদেনের ইঙ্গিত করে। নাথধর্ম ও নাথযোগীদের প্রভাব দক্ষিণ বর্ধমান, হুগলী হাওড়া থেকে দক্ষিণ-চব্বিশপরগণা (কলিকাতা-সহ) পর্যন্ত বিস্তৃত। মনে হয় যেন ভাগীরথীর পূর্বতীর থেকে ক্রমে পশ্চিমতীরে রাঢ়দেশের দক্ষিণ সীমানা পর্যন্ত নাথধর্মীদের প্রভাব প্রসারিত হয়েছে এবং রাঢ়দেশের সীমানার মধ্যে নিরঞ্জন ধর্মঠাকুরের সম্প্রদায়ের সঙ্গে নাথযোগীদের মিলন ও মিশ্রণ ঘটেছে। দক্ষিণরাঢ়ে নিরঞ্জন ধর্মসম্প্রদায়ের সঙ্গে নাথযোগীদের এই সংমিশ্রণ একটি উল্লেখযোগ্য সাংস্কৃতিক বিশেষত্ব।

হুগলী জেলার মহানাদ নাথযোগীদের মহাতীর্থ ছিল একসময়। নাথ-সাহিত্যের মহানাদ শ্রবণ থেকে স্থানের নামও মহানাদ হয়েছে। তারকেশ্বরের তারকনাথ, লোকনাথ, গড়ভবানীপুরের মণিনাথ, কলকাতার উত্তরে গোরখ-বাসলি, কলকাতার মধ্যে চৌরঙ্গীনাথ ইত্যাদি এককালীন নাথযোগীদের প্রাধান্য সূচনা করে। 'ত্রিবেণী' নাম ও বাঁশবেড়িয়ার হংসেশ্বরী মন্দিরের গড়নের কথাও স্মরণীয়। সামাজিক জীবনের বহু বিপর্যয়ের মধ্যে এই সব অঞ্চলের অনেক শৈব-তান্ত্রিক মঠ, তীর্থ ও দেবস্থান নাথধর্মীদের হাতছাড়া হয়ে যায় এবং তাঁরা ভিন্নধর্মী সেবায়েত ও পূজারীদের হাতে দেবালয় মঠ ইত্যাদি ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। মুসলমান অভিযানের পর তাঁদের মধ্যে একটা অংশ প্রধানত দারিদ্র্য ও হিন্দু উচ্চসমাজের সামাজিক নির্যাতনের ফলে, অন্যান্য আরও অনেক সম্প্রদায়ের মতন ইসলামধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। জটেশ্বরনাথ মঠের প্রাচীন দলিলপত্রে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এত সব বিপর্যয়ের মধ্যেও আজও নাথযোগীরা পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষ করে দক্ষিণরাঢ়ে, তাঁদের প্রাচীন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের যেটুকু বহন করে চলেছেন, তা দেখলে সত্যই আশ্চর্য হতে হয়। দক্ষিণরাঢ়ে অনেক বিখ্যাত ধর্মঠাকুর, পঞ্চানন্দ, শীতলা, শিব ও

কালীর পূজারী ও সেবায়েত নাথযোগীরা। হুগলী জেলার যেসব স্থানে একসময় তাঁদের প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল, সেসব স্থান থেকে ক্রমেই তাঁরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছেন। জীবনসংগ্রামেও অনেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছেন। তাঁদের মঠ দেবালয়াদিও ঘটনাচক্রে অন্যের করতলগত হয়েছে। হাওড়া ও চব্বিশ-পরগণাতেই এখন নাথযোগী ও নাথপণ্ডিতদের প্রভাব অনেকটা সীমাবদ্ধ বলা চলে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

হুগলী জেলার মণিরামপুরে ধর্মঠাকুরের পূজারী উপেন্দ্রনাথ পণ্ডিত। বৈশাখ মাসে বড় উৎসব হয়। খড়সরাই গ্রামে গোবর্ধন নাথ ভট্টাচার্য শিবের পূজারী। হাওড়া জেলার রামচন্দ্রপুর গ্রামে ধর্মঠাকুরের পূজারী নিরঞ্জন নাথ পণ্ডিত। বেতোড়ের কালীমন্দিরের সেবাইত শরৎচন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য। লক্ষণীয় হল বৈশাখী বুদ্ধ পূর্ণিমায় বাৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শিবপুরের শ্রীবলরাম নাথ বারোয়ারী শীতলাদেবীর সেবাইত। শিবপুরের রবিরাম দেবনাথ গোস্বামী শিবঠাকুরের সেবাইত। হাওড়ায় কালীবাবুর বাজারের কাছে সিদ্ধেশ্বরীর মন্দির রসিকনাথ প্রতিষ্ঠা করেন, এখন অন্য ব্রাহ্মণ পূজা করেন। রাঘবপুরের বলাইচন্দ্র নাথ পণ্ডিত ধর্মরাজ ঠাকুরের সেবাইত, আষাঢ়ী পূর্ণিমায় উৎসব হয়। গঙ্গাধরপুর গ্রামের ধর্মঠাকুরের সেবাইত বসন্তকুমার দেবনাথ। আন্দুল-জোড়-হাটের কমলকৃষ্ণ নাথ শিবের সেবাইত। হাওড়ার পঞ্চানন ঠাকুরের সেবাইত উপেন্দ্র নাথ পণ্ডিত। হুগলীর শ্রীরামপুর স্টেশনের কাছে বাবা বচননাথের শিবমন্দির আছে। বেতোড়ে শ্রীমুক্তারাম দেবনাথ ভট্টাচার্য শিব পঞ্চানন্দ শীতলা কালী ইত্যাদির সেবাইত। এঁর নামে একটি রাস্তাও আছে 'মুক্তারাম দেবনাথ ভট্টাচার্য লেন'। সাতঘরার নবনারীতলায় ধর্মঠাকুরের পূজার ব্যবস্থা নাথরাই করেন, বৈশাখী বুদ্ধ পূর্ণিমায় গাজন হয়। হাওড়া খুরুটে নাথপণ্ডিতদের একটি পাড়া আছে, কয়েকঘর নাথপণ্ডিত থাকেন। হারাধন নাথ পণ্ডিত শীতলা ও ধর্মঠাকুরের সেবাইত। দক্ষিণ চব্বিশপরগণার বড়াশী-মাধবপুরে বদরিকানাথ শিব বা অনুলিঙ্গ, বহড়ুর ধর্মরাজ নামে অভিহিত পঞ্চানন্দ ইত্যাদি নাথযোগীদের অতীত ও বর্তমান প্রভাবের সাক্ষী। প্রাচীন চৌরঙ্গী অঞ্চলের (কলিকাতার) চৌরঙ্গীনাথ এবং ধর্মতলার ধর্মঠাকুরের সেবাইত নাথযোগীরা ছিলেন বলে প্রবীণ নাথপণ্ডিতদের কাছ থেকে শোনা যায়। কলকাতার মধ্যে অনেক ধর্মরাজের সেবাইতও নাথভট্টাচার্যরা ছিলেন।

তার একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন এখনও আছে—হাজরা-রোড ও ল্যান্সডাউন রোডের মোড়ে ধর্মরাজ-শিবের মন্দিরটি ও তার পূজারীরা। মাণিকতলা ও সার্কুলার রোডের মোড়ের শীতলামন্দিরের সেবাইত নাথ ভট্টাচার্য। এখানেই "যোগীপাড়া" ছিল, রাস্তার নাম "যোগীপাড়া লেন" এখনও আছে। শ্যামবাজারের বাজারের কাছে কালীমন্দিরের সেবাইত নগেন্দ্রনাথ, এঁর নামে রাস্তাও আছে। এরকম আরও দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়।

দক্ষিণরাঢ়ে নাথযোগীদের এককালীন সাংস্কৃতিক প্রতিপত্তির বিক্ষিপ্ত অবশেষ এগুলি। পশ্চিমবঙ্গে নিরঞ্জন ধর্মঠাকুরের সঙ্গে যে নাথযোগীদের মিশ্রণ ঘটেছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। ধর্মঠাকুরের সেবাইত নাথপণ্ডিতরা আছেন। এছাড়া আরও একটি বিষয় স্মরণীয় এই প্রসঙ্গে। ধর্মপূজা-বিধানের প্রামাণ্য পুঁথিগুলি পশ্চিমবঙ্গের নাথযোগীদের বাড়ি থেকেই বেশি পাওয়া গেছে। প্রশ্ন হল পঞ্চানন্দকে নিয়ে। পঞ্চানন্দের উৎপত্তি হল কোথা থেকে এবং কেন? যিনি শিব, তিনি পঞ্চানন্দ হলেও, পঞ্চাননের স্বাতন্ত্র্য আছে যথেষ্ট। বিখ্যাত শিবের আশেপাশে সুবিখ্যাত পঞ্চানন্দও আছেন হুগলী-হাওড়া জেলায়। যেমন দশঘরার পঞ্চানন্দ, নার্নার পঞ্চানন্দ। আরামবাগ অঞ্চলে পঞ্চানন্দের নানারকম ধ্যানে তাঁকে শিব, ক্ষেত্রপাল, ধর্মরাজ প্রভৃতি নানারূপে বন্দনা করতে দেখা যায়। ধ্যানগুলিও বিচিত্র, অর্থহীন আদিমভাষার ধ্বনির মধ্যে যেন সংস্কৃতের বীজ ছড়ানো। কয়েকটির টুকরো নমুনা দিচ্ছি:

টং টং বিটং টংকপানি বিটং
রং রং রক্তবর্ণ রক্তজিহ্বা
রক্তজিহ্বা করালং।
ধুং ধুং ধূম্রবর্ণ শকট বিকট নয়নং
পঞ্চাননং ক্ষেত্রপালাং নমঃ।

এছাড়া "আদিত্য নিরঞ্জন নৈরাকার মগ্রন্ত পঞ্চানন্দ ধর্মরে নমঃ" বলেও পঞ্চানন্দের পূজা করা হয়। প্রচলিত পঞ্চাননের ধ্যানও আছে। পঞ্চানন্দকে দৈত্যরূপে কল্পনা করা হয় এবং তিনি শিশুদের মঙ্গল-অমঙ্গলের কর্তা। পঞ্চানন্দের পূজারীরা শুধু পূজা করেন না, গ্রাম্য ওঝা ও কবিরাজের কাজ করেন, অর্থাৎ ঝাড়ফুঁক করেন, বিষ নামান, ব্যাধির চিকিৎসা করেন। নাথদের মধ্যেই অনেকে কবিরাজী করে থাকেন। ভূতপ্রেত দৈত্যদানব পূজা,

ম্যাজিক বা জাদুবিদ্যা (শবরীবিদ্যা), তান্ত্রিক আলকিমি ইত্যাদি পঞ্চানন্দের পূজানুষ্ঠানের মধ্যে মিশে রয়েছে মনে হয়। কিন্তু কেন পঞ্চানন্দ দক্ষিণরাঢ়ে ও দক্ষিণবঙ্গে গ্রামদেবতারূপে অন্যতম প্রধান হয়ে উঠলেন? নিরঞ্জন ধর্মঠাকুরের সম্প্রদায় ও নাথযোগীদের মিশ্রণের সময়েই কি দক্ষিণরাঢ়ে ও দক্ষিণবঙ্গে পঞ্চানন্দের উদ্ভব হয়েছিল?

হাওড়া জেলার বাউড়িয়াতে নাথধর্মীদের একটি মঠ আছে। বিশেষ প্রখ্যাত মঠ নয় বলে অনেকে হয়ত তার নামও জানেন না। বাউড়িয়া স্টেশন (নাগপুর লাইনে) থেকে প্রায় মাইল তিনেক দূরে এই মঠটি। এখন একটি পাটকলের সীমানার মধ্যে অবস্থিত। পাটকলের সাহেব মালিকরা একসময় মঠটিকে উচ্ছেদ করার জন্য অনেক চেষ্টা করেছিলেন এবং দরিদ্র নাথ পূজারী-দের নানারকম প্রলোভন ও হুমকি দিয়ে কার্যোদ্ধার করতে চেয়েছিলেন। ব্যর্থ হয়ে অবশেষে তাঁরা কারখানার প্রাচীরবেষ্টিত এলাকার মধ্যে মঠের অবস্থান ও পূজানুষ্ঠান মেনে নিয়েছেন। খুব প্রাচীন একটি নাথপরিবার এই মঠের রক্ষক পূজক ও সেবাইত। এই পরিবারের একজন অতি বৃদ্ধা নাথ মহিলা মঠের পূজানুষ্ঠানাদি পরিচালনা করতেন। তাঁর মুখ থেকে যেসব বিচিত্র ধ্যানমন্ত্র আমরা শুনেছি, তাই কিছু কিছু এখানে উল্লেখ করব। ধ্যানমন্ত্রের মধ্যে প্রচুর আরবী-ফারসী কথার মিশ্রণ হয়েছে দেখা যায়। উদ্ধৃত কথাগুলি হয়ত সব শুদ্ধ বা অবিকৃত নয়, কিন্তু তার শুদ্ধরূপ যে-কোন ভাষাবিদ বুঝতে পারবেন। এখানে তার নমুনা উদ্ধৃত করার কারণ হল, সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণের (দক্ষিণবঙ্গে) একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত দেওয়া। মঠের আরাধ্যা দেবী হলেন কালী। অতিজীর্ণ গৃহের মধ্যে একটি কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত। তার সঙ্গে শিবও আছেন। যোগীদের সমাধিও আছে। বৃদ্ধা নাথ মহিলার কাছ থেকে যেসব মন্ত্র আমরা সংগ্রহ করেছি, তা এখানে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত না করে সামান্য নমুনা হিসেবে দু'একটির কথা বলব। যেমন—মালা-জপের মন্ত্র :

মুশ্‌কিল পড়ি তো ক্যা হয়া
মুশ্‌কিল কোথ্যা তু হায়
রোজ মশোর থক্ যোগোর
মস্তক ফাট্ হায়

নামপড়ানোর বয়ান :

দোহাই বাবা ন'লাখ পীর
আশী হাজার পীর
লক্ষ সাধু ষোলশ মুনি
তেত্রিশ কোটি দেবতা
দোহাই আল্লা, দোহাই খোদা
আউলিয়া আম্বিয়া গায়েশ কুতু
আবেদারে মুনিঋষি যোগীনাগা
মোহন্ত উদ্বাহ
সন্ন্যাসী দণ্ডী ব্রহ্মচারী
জীবরি মেকাই।

উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি :

দোহাই বাবা সোমশ মুনি

নারদ ইন্দ্র বলিরাজা সুরথ রাবণ মান্ধাতা
দোহাই বাবা ঈশ্বর চাটুজ্জে
কমল সরকার
মধু মল্লিক, বিপ্রদাস অধিকারী
বেলমুড়ি বেয়াড়া সন্তোষপুরের
গোকুল মিত্র
নাদার বস্তিনাথ পাল, স্বরূপ পাল
শ্রীনিবাস গোসাই দাস, বাউল
কালাচাঁদ ঠাকুর
মা সত্য, গুরু সত্য, শচী মা সত্য
বাউল সত্য······ ··· ইত্যাদি
সাত সমুদ্দুর সাত পাহাড়
সাত দরিয়া সাত জঙ্গল
সাত তবক আশমান
সাত তবক জমিন্

ফকিরি ফকিরি
জিকিরি জিকিরি
বেড়ী বাঁধ, বেড়ী বাঁধ—ইত্যাদি

নাথপূজারীর এই ধ্যানমন্ত্র-জপ ও ছড়ার মধ্যে আরবী ফারসী ও উর্দু বয়েতের যথেষ্ট মিশ্রণ হয়েছে দেখা যায়।[১] কেন এরকম মিশ্রণ হল ? সে সম্বন্ধে বৃদ্ধা নাথ মহিলাকে অনেক প্রশ্ন করা সত্ত্বেও তিনি বিশেষ কোন হদিশ দিতে পারেননি। গুরুপরম্পরায় এগুলি তাঁরা শুনে আসছেন এবং আবৃত্তিও করছেন। এমনকি, অনেক কথার অর্থও তাঁদের কাছে পরিষ্কার নয়। পারম্পর্যের সূত্রটি লোপ পেয়ে গেছে। আগে বলেছি, বাংলাদেশের অন্যান্য আরও অনেক জাতির মতন, সামাজিক অবিচার ও নির্যাতনের পেষণে নাথ-যোগীদের মধ্যে কেউ কেউ ইসলামধর্মের আশ্রয় নিয়েছিলেন। যোগীগুরু যাঁরা এইভাবে মুসলমান রাজধর্মের আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন, তাঁরা তাঁদের সম্প্রদায়গত নাথধর্মের আচরণ ছাড়তে পারেননি। অথচ কতকটা মুসলমান পীরদের মতন তাঁদের বাহ্য ধর্মাচরণ করতে হত। এককথায় তাঁদের 'যোগীপীর' বলা যেতে পারে। হিন্দু যোগী ও মুসলমান পীরের নিবিড় বন্ধুত্ব ও একাত্মতার অনেক কাহিনীও পশ্চিমবঙ্গে শোনা যায়। বেশ বোঝা যায়, দক্ষিণবঙ্গে অন্তত হিন্দু নাথযোগী ও মুসলমান পীরের ধর্মাচরণের বিচিত্র সংমিশ্রণ হয়েছিল। বাউড়িয়ার নাথমঠের পূজারীদের ধর্মাচরণ, জপ-ধ্যানমন্ত্রের মধ্যে তারই প্রমাণ রয়েছে। এছাড়া এই বিচিত্র মন্ত্রের ব্যাখ্যা করা যায় না।

১ নাথধর্ম সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য আলোচনা : শ্রীকল্যাণী মল্লিক : নাথসম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধনপ্রণালী ; শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল : গোর্খবিজয় (বিশ্বভারতী) ; শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায় : বাংলার নাথসাহিত্য (সাহিত্যপ্রকাশিকা, প্রথম খণ্ড, বিশ্বভারতী)।

পীর ও গাজীসাহেব

পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষ করে দক্ষিণবঙ্গে ও দক্ষিণরাঢ়ে, পীর ও গাজীসাহেবের প্রতিপত্তি খুব বেশি দেখা যায়। পীর সাহেব চব্বিশ-পরগণার গ্রামদেবতাদের মধ্যে অত্যন্ত লোকপ্রিয়। প্রায় প্রত্যেক গ্রামে পঞ্চানন ঠাকুর আছেন, পীর সাহেবও আছেন। অনেক জায়গায় উভয়েই বৃক্ষতলে পাশাপাশি বিরাজ করেন। অলৌকিক শক্তির সাদৃশ্যও উভয়ের মধ্যে আছে। পশ্চিম সুন্দরবন ও দক্ষিণ চব্বিশপরগণায় প্রাধান্য খুব বেশি। হাওড়া হুগলী বর্ধমান ও মেদিনীপুর জেলায় বিখ্যাত পীরস্থান আছে অনেক। সুন্দরবন অঞ্চলে বনবিবি ও পীরের বেশি প্রাধান্য। দক্ষিণ অঞ্চলে পঞ্চানন ও পীর সাহেবের প্রতিপত্তি প্রায় সমান, উত্তরে উভয়েরই প্রাধান্য একটু কম। উত্তরের কলকারখানার দৈত্যদানবরা বোধ হয় কিছুটা তাঁদের স্থানচ্যুত করেছে।

পীর সাহেবের প্রতিপত্তি শুধু চব্বিশপরগণার বিশেষত্ব নয়, বাংলাদেশেরই বিশেষত্ব। মুসলমান অভিযানের সময় থেকে আরম্ভ করে স্বাধীন সুলতানদের আমল পর্যন্ত মুসলমান ফকিররা এদেশের শাসনকার্যে ও ধর্মপ্রচারে প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। পীর ও গাজী সাহেবদের সবচেয়ে মুশকিল হয়েছিল গ্রামদেবতাদের নিয়ে। ইসলামধর্মের প্রচার প্রধানত যাঁদের কাছে তাঁরা করেছিলেন এবং তার আবেদনও ছিল যাঁদের কাছে সবচেয়ে বেশি, তাঁরা সাধারণ গ্রামের লোক, গ্রামদেবতার পূজা করতেন। তার মধ্যে বৌদ্ধধর্মীদের সংখ্যা কম ছিল না। বৃক্ষ, জীবজন্তু, ভূতপ্রেতের পূজারীদের সংখ্যাও কম ছিল না। গাজী সাহেবরা এই গ্রামদেবতাদের নিয়ে সমস্যায় পড়েছিলেন। কারণ বড় বড় অভিজাত দেবতাদের যত সহজে দেবালয় থেকে উৎখাত করা যায়, ইটপাথরের দেবালয় পর্যন্ত ধূলিসাৎ করে ফেলা যায়, গ্রামদেবতাদের সেইভাবে উচ্ছেদ করা যায় না। সাধারণ গ্রামের লোকের মতনই তাঁরা দীনদরিদ্র, তাদের মতন জীর্ণ পর্ণকুটিরেই তাঁরা বাস করেন। সহজেই সন্তুষ্ট হন। গাজী সাহেবরা তা বিলক্ষণ বুঝেছিলেন। বুঝে-সুঝেই তাঁরা বাংলার গ্রাম-দেবতাদের সঙ্গে একটা আপস-রফা করে বাংলার জনসাধারণকে বশীভূত করতে পেরেছিলেন। গ্রামদেবতাদের গুণগুলি পীর ও গাজী সাহেবরা নিজেরাই

আত্মসাৎ করে ফেলেন। মধ্যে মধ্যে তাই নিয়ে বিরোধ যে হয়নি তা নয়। চব্বিশপরগণার ব্যাঘ্রদেবতা (অর্থাৎ বাঘের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা যে দেবতা) দক্ষিণ রায়ের সঙ্গে গাজী সাহেবের বিরোধ হয়েছিল। চব্বিশপরগণারই কবি তাই নিয়ে 'রায়মঙ্গল' কাব্য রচনা করেছিলেন। গাজী ও দক্ষিণ রায় দু'জনেরই সেনাদল বাঘ। দু'জনে যখন বিরোধ বাদল তখন বনের বাঘ দুইভাগে ভাগ হয়ে গেল। গাজীর বাহন ও প্রিয় বাঘের নাম দাউদা, রায়ের বাহন ও প্রিয় বাঘের নাম হীরা। যুদ্ধে অবশ্য প্রথম দিকে ফকির মরতে লাগল বেশি। তারপর গাজী সাহেব পয়গম্বর-প্রদত্ত খরশান খাঁড়া নিয়ে সাত হাজার বাঘ মেরে রায়ের গলায় কোপ বসিয়ে দিলেন। দক্ষিণ রায়ের মুণ্ড ধড়চ্যুত হল বটে, কিন্তু আবার জোড়া লাগল। এই যখন অবস্থা তখন পরমেশ্বর এলেন শান্তিশর্ত নিয়ে। যুগসঙ্কটকালে আসতে তিনি বাধ্য। কিন্তু কি রূপ ধারণ করে এলেন? "অর্ধ-শ্রীকৃষ্ণ-পয়গম্বরের" রূপ। সেটা কি? তার বর্ণনা এই:

অর্ধেক মাথায় কালা একভাগ চূড়া টালা
বনমালা ছিলম্বিনী তাতে
ধবল অর্ধেক কায় অর্ধ নীলমেঘ প্রায়
কোরাণ পুরাণ দুই হাতে।

মোটামুটি এই শর্তে তিনি একটা সন্ধিচুক্তি করে দিলেন—

এখানে দক্ষিণ রা'র সব ভাটী অধিকার
হিজলীতে কালু রায় থানা
সর্বত্র সাহেব পীর সব নোয়াইবে শির
কেহ তাহে না করিবে মানা।

'জোন' বা 'টেরিটোরিয়াল সীমানা' পর্যন্ত নির্দিষ্ট করে দেওয়া হল। দক্ষিণ রায় ও গাজী সাহেব উভয়েই শান্তিতে বিরাজ করতে লাগলেন। হুকুম হল যে অন্যান্য দেবতাদের মতন পীর-সাহেবের কাছেও 'সব নোয়াইবে শির'। আধা-কৃষ্ণ-পয়গম্বরের সেই হুকুম আজও পশ্চিমবাংলার অধিকাংশ গ্রামের লোক সরল বিশ্বাসে মেনে চলেন।

যুগসন্ধির সময় মুসলমান পীর ও ফকিররা বাংলার গ্রামদেবতাদের সঙ্গে এইভাবে সন্ধি করতে বাধ্য হয়েছিলেন। ইতিহাসে দেখা যায়, দু'টি বিভিন্ন সংস্কৃতি যখন ঘটনাচক্রে মুখোমুখি দাঁড়ায়, তখন দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের মধ্য দিয়ে

একটা 'সমন্বয়' হয় উভয়ের মধ্যে। বিশেষ করে দৃঢ়মূল উন্নত সংস্কৃতির কাছে বিজয়ী সংস্কৃতি এইভাবে আপস করতে বাধ্য হয়। বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির মধ্যে খুব বেশিভাবে তাই হয়েছে। পীরমাহাত্ম্য কাহিনীর উৎপত্তি হয়েছে প্রধানত পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গে। পশ্চিমবঙ্গের ধর্মঠাকুরের মধ্যেও মুসলমান-প্রভাব বেশ স্পষ্ট। ধর্মমঙ্গল-কবিরা ধর্মঠাকুরকে পীরের বেশেও দেখেছিলেন। রূপরাম চক্রবর্তী তো নিজেকে 'রূপরাম ফকির' বলেছেন। ফকিরবেশী ধর্মঠাকুরই মনে হয় ক্রমে 'সত্যপীর' ও 'সত্যনারায়ণে' বিবর্তিত হয়েছেন। এছাড়া নাথগুরু মৎস্যেন্দ্রনাথ ও পীর মসনদ-আলি মিলিত হয়ে "মছন্দলী" বা মোছরা পীর হয়েছেন। চব্বিশ পরগণাতেও মছন্দলী বা মোছরা পীর আছেন। বড় খাঁ গাজী তো আছেনই, দক্ষিণ রায়ের সঙ্গে আপস করে। এই বড় খাঁ গাজীর মাহাত্ম্য-কাহিনী অনেক আছে। একটি বিশিষ্ট কাহিনীর কথা উল্লেখ করছি। কাহিনীটি 'মেদনমল্ল' পরগণার জমিদার মদন রায় ও বড় খাঁ গাজী নিয়ে, নাম "মদনের গান" বা 'মদনপালা'। মদন রায় হলেন বারুইপুরের রায়চৌধুরীদের পূর্বপুরুষ। মদন রায় একবার খাজনার দায়ে পড়ে নবাবের কাছে নাস্তানাবুদ হন, বড় খাঁ গাজী তাঁকে উদ্ধার করেন। ক্যানিং রেলপথে ঘুটিয়ারী শরীফে গাজী সাহেবের যে বিখ্যাত দরগাহ আছে, সেখানে আষাঢ় মাসে অম্বুবাচীর সময় বিখ্যাত উৎসব হয়। তাতে বারুইপুরের রায়চৌধুরীদের বাড়ি থেকে সর্বপ্রথম শিরণি দেওয়া হয়। মেদনমল্ল পরগণা রায়চৌধুরীদের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত এবং ঘুটিয়ারী শরীফ প্রাচীন মেদনমল্ল পরগণার অন্তর্গত। বারাসাত-বসিরহাট রেলপথে হাড়োয়ায় বিখ্যাত পীর গোরাচাঁদ আছেন, তাঁর নামেও অনেক কাহিনী আছে। দক্ষিণে খাড়ি গ্রামে একজন গাজী সাহেব আছেন। এছাড়া গ্রামে গ্রামে পীরের আস্তানা ও বিবিমায়ের স্থান আছে। সর্বত্র ছোট ছোট সমাধিস্তূপ আছে এবং এই স্তূপগুলি দেখে বৌদ্ধস্তূপের কথা সহজেই মনে হয়। বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্যের যুগে গ্রামে গ্রামে চৈত্য ও স্তূপ-পূজা হত। বৌদ্ধরা বাংলাদেশের যে-স্তরের জনসাধারণকে ধর্মান্তরিত করেছিলেন, পরবর্তীকালে মুসলমানরা প্রধানত তাঁদেরই ধর্মান্তরিত করেছেন। গ্রামদেবতার মৃত্যু নেই। ধর্মান্তরের সময় গ্রামাঞ্চলে ছোট ছোট বৌদ্ধ মৃত্তিকাস্তূপ ও প্রস্তর-স্তূপগুলি পীরস্থান ও বিবিমা-তলায় পরিণত হওয়া আদৌ বিচিত্র নয়।

দক্ষিণ রায়

দক্ষিণবঙ্গের 'দক্ষিণ রায়' মানুষ নন, দেবতা এবং শুধু দেবতা নন, বাঘের দেবতা।[১] সুদূর অতীতে সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলের ভিতর থেকে আদিম অরণ্যবাসীর মানসচক্ষে হয়ত একদিন তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল। তখন তাঁর দেহহীন মুখমণ্ডলে চাপদাড়ি বা গোঁফ কিছুই ছিল না। দাড়িগোঁফ দুই-ই এই আদিম বনদেবতার বয়ঃসন্ধিকালে পরে গজিয়েছে। কয়েকবার হয়ত তিনি নামও বদলেছেন, যুগের প্রয়োজনে এবং শেষে দক্ষিণবঙ্গের শ্রেষ্ঠ দেবতা-রূপে 'দক্ষিণ রায়' হয়েছেন। 'রায়বাঘিনী', 'রায়-রায়াঁনের' মতন 'রায়' তাঁর উপাধি। বিচিত্র এই বনদেবতার চরিতকথা দক্ষিণবঙ্গের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের একটি অধ্যায় জুড়ে রয়েছে। দক্ষিণের কথা দক্ষিণ রায়কে বাদ দিয়ে বলা যায় না। বলা সঙ্গত নয়।

দক্ষিণ বাংলার গ্রাম থেকে গ্রামে ঘুরতে ঘুরতে দেখা যায় (পৌষ মাসে) কুম্ভকাররা হাড়িকলসীর সঙ্গে প্রচুর 'দক্ষিণ রায়ের' মূর্তি তৈরি করে। পৌষ-সংক্রান্তির কয়েকদিন আগে। ধপধপির বিখ্যাত দক্ষিণ রায়ের মূর্তিটির বীর যোদ্ধার বেশ, মাথায় উষ্ণীষ, কর্ণে কুণ্ডল, পিঠে ধনুর্বাণ। হঠাৎ দেখে মনে হয় কালকেতু না কি?

চন্দ্রকেতু পিতামহ বাপ ধর্মকেতু।
তায় পুত্র কালকেতু কুল যশ হেতু॥
দৌড়িয়া ধরয়ে বাঘ রণে মত্ত হাতি।
অর্জুন সমান যার ধনুকে সুখ্যাতি॥

সেই কালকেতুর কথা মনে পড়ে দক্ষিণ রায়কে দেখে। যে-কেউ দক্ষিণ রায়ের মূর্তির দিকে চেয়ে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর কালকেতুর এই রূপ-বর্ণনা মিলিয়ে দেখলে অবাক হয়ে যাবেন:

বিচিত্র কপাল তটী গলায় জালের কাঁঠি
করযুগে লোহার শিকলি।

---

১ 'বাঘের দেবতা' কথার অর্থ ব্যাঘ্ররূপী দেবতা নয়। বাঘের উপর আধিপত্য যাঁর বেশি, তিনিই বাঘের দেবতারূপে কল্পিত দক্ষিণ রায়।

বুক শোভে ব্যাঘ্রনখে অঙ্গে রাঙ্গা ধূলি মাখে
কটিতটে শোভয়ে ত্রিবলী ॥
কপাট বিশাল বুক নিন্দি ইন্দিবর মুখ
আকর্ণ-আয়ত বিলোচন।

'রায়মঙ্গল' কাব্যে দক্ষিণ রায়ের মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে।[১] দক্ষিণ-বঙ্গের কাণ্ডহীন মুণ্ডমূর্তি 'বারাঠাকুরই' যে দক্ষিণ রায়, সেই কথা বলে কবি তাঁর দেহহীনতার কারণ বর্ণনা করেছেন :

বাঘের উপরে নাহি দক্ষিণের রায়।
একখানি মুণ্ড মাত্র বারা বলে তায় ॥
এমন প্রকার পূজা কেন হয় হেথা।
জান যদি কহ শুনি দুই এক কথা ॥…
শুন্যা বড়খাঁ গাজী পরতেক পীর।
ঠাকুর দক্ষিণ রায় আঠার ভাঁটির ॥
দুইজনে দোস্তানী হইয়াছিল আগে।
তারপর হুড়োহুড়ী মহাযুদ্ধ লাগে ॥
দক্ষিণ রায়ের বুকে মারে বড় গাজী।
পড়িয়া উঠিয়া রায় বলে মায়া বাজী ॥
বড়খাঁ হানিল খাঁড়া গলায় তাহার।
মায়ামুণ্ড ক্ষিতি পড়ে এমনি প্রকার ॥
বিরোধ ভাঙ্গিয়া দিল আসিয়া ঈশ্বর।
তার পরে দোস্তানী পাইল দোঁহে বর ॥
কাটামুণ্ড বারা পূজা সেই হতে করে।
কোনখানে দিব্যমূর্তি ব্যাঘ্রের উপরে ॥

এর মধ্যে হিন্দু ও মুসলমানধর্মের সংঘাতের চিত্র এত পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে যে তা ব্যাখ্যা করে বলার দরকার হয় না। এই সংঘাতের জন্যই,

১ সম্প্রতি 'রায়মঙ্গল' কাব্য মুদ্রিত হয়েছে। কৃষ্ণরাম দাসের 'রায়মঙ্গল' : শ্রীসত্যনারায়ণ রায় সম্পাদিত (সাহিত্য সভা, বর্ধমান)। এই গ্রন্থে শ্রীসুকুমার সেনের ভূমিকা দ্রষ্টব্য। অন্যান্য কবিরও 'রায়মঙ্গল' কাব্য পাওয়া গেছে (বিশ্বভারতী থেকে প্রকাশিত শ্রীপঞ্চানন মণ্ডলের 'পুথিপরিচয়' প্রথম খণ্ড দ্রষ্টব্য)।

কবি বলছেন, ব্যাঘ্রদেবতা দক্ষিণ রায়ের মুণ্ডটি কাটা পড়েছে। কিন্তু তা পড়লেও, এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কথা হল—'বিরোধ ভাঙ্গিয়া দিল আসিয়া ঈশ্বর'। দেবতা এসে মানুষের বিরোধ মিটিয়ে দিলেন। এইভাবে সংস্কৃতির লেনদেন ও সমন্বয়ের ভিতর দিয়ে আমরা অপরকে আপন করে নিয়েছি। এই ব্যাঘ্রদেবতার সঙ্গে মুসলমান আমলে বড়খাঁদের যেমন ভয়ানক যুদ্ধ হয়েছে, তেমনি 'দোস্তানিও' হয়েছে। দক্ষিণ রায় হয়েছেন গাজি সাহেবের দোস্ত।

শুধু যে দোস্তিই হয়েছে, তা নয়। গাজীর সঙ্গে এই দোস্তির জন্য দক্ষিণ রায়ের দেবত্ব দক্ষিণাঞ্চলে বজায় রয়েছে। সুন্দরবনের অধিশ্বরী বনদেবী চণ্ডী 'বনবিবি' হয়েছেন, গাজীর বন্ধুত্বে দক্ষিণ রায়েরও প্রতাপ বেড়েছে, কিন্তু বন-বিবির সর্বময় কর্তৃত্বকে অগ্রাহ্য করে কারও অধিকার প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। মুন্‌শী বয়নদ্দিন তাঁর "বনবিবির জহুরনামা" পুঁথিতে সেই কাহিনী বর্ণনা করেছেন। দক্ষিণ রায় নরবলির জন্য কাতর হলে, বলির বালক 'দুখে' যখন অসহায়ের মতন কাঁদতে লাগল, তখন সুন্দরবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বনবিবি নিজের অনুচর পাঠিয়ে দক্ষিণ রায়কে জব্দ করে তাকে উদ্ধার করলেন। বনবিবির আক্রোশে দিশাহারা হয়ে দক্ষিণ রায় শেষে বড়খাঁ গাজীর শরণাপন্ন হলেন। বড়খাঁ তখন দক্ষিণ রায়কে সঙ্গে করে নিয়ে বনবিবির দরবারে উপস্থিত হলেন। বনবিবি অনাথ দুখেকে কোলে করে বসে আছেন—

> হেনকালে উপনীত গাজী দক্ষিণ রায়।
> ছালাম করিল রায় বনবিবির পায়॥
> তাতল খাঁ খোশাল খাঁ আর অলিগণ।
> কর জুড়ি করিয়া আইল সর্বজন॥
> হরি রায় বিষম রায় আর কাল রায়।
> আসিয়া ছালাম করে বনবিবির পায়॥
> কহেন বড়খাঁ গাজী শুন নেক মাই।
> তোমার হুজুরে মাগো এই ভিক্ষা চাই॥
> দক্ষিণ রায়ের পর কোপ কর দূর।
> এখাতের আইলাম তোমার হুজুর॥
> এতেক শুনিয়া মায়ের দয়া উপজিল।
> সদয় হইয়া মাতা বলিতে লাগিল॥

আঠার ভাঁটির মধ্যে আমি সবার মা।
মা ব'লে যে ডাকে তার দুঃখ থাকে না॥
সঙ্কটে পড়িয়া যেবা মা বলে ডাকিবে।
কদাচিৎ হিংসা তায় কভু না করিবে॥
রায় বলে শুন মাতা আরজ আমার।
সত্য সত্য তিন সত্য সত্য অঙ্গীকার॥
বঁনেতে আসিয়া যেবা মা বলে ডাকিবে।
আমা হতে হিংসা তার কদাচ না হবে॥

বয়নদ্দিনের পুঁথির কাহিনী আরও পরিষ্কার। মুসলমান আমলে হয়ত একাধিক 'রায়' উপাধিধারী দেবতার আবির্ভাব হয়েছিল। শুধু দক্ষিণ রায় নয়, হরি রায়, বিষম রায়, কালু রায় ইত্যাদি। এই রকম 'রায়' উপাধিধারী অনেক দেবতা আছেন রাঢ় অঞ্চলে—হুগলি বর্ধমান বাঁকুড়া ও বীরভূমে। এঁরা অনেকেই হয়ত আঞ্চলিক সামন্তরাজা, জমিদার ও যোদ্ধা ছিলেন এবং পরে গ্রাম্য লোকদেবতার মহিমা আত্মসাৎ করে দেবত্বের বেদীতে উন্নীত হয়েছেন। কেউ ধর্মঠাকুর থেকে হয়েছেন বাঁকুড়া রায়, কালাচাঁদ রায় ইত্যাদি, কেউ বনদেবতা ও বাঘের দেবতা থেকে হয়েছেন দক্ষিণ রায়। ব্যাঘ্রপৃষ্ঠে আসীন দক্ষিণ রায়ের মূর্তি গড়ে বহু গ্রামে পূজা করা হয়। আরও উল্লেখযোগ্য হল, দক্ষিণ রায়ের পূজা হয় রাত্রে, আলো জালিয়ে, ঢোল মাদল কাঁসি বাজিয়ে। বাঘ বিতাড়নের অনুষ্ঠান বলে মনে হয়।* কিন্তু তাহলেও গাজীর দোস্ত, বীর যোদ্ধাবেশধারী দক্ষিণ রায়কে দেখলে বোঝা যায় যে, তিনি সুন্দরবনের বাঘের দেবতা ছিলেন এবং সুন্দরবনের আরও অনেক জীবজন্তুর দেবতার মতন 'চণ্ডীর' বা "বনদেবীর" সর্বময় কর্তৃত্ব মেনে চলতেন। তারপর একসময় (বোধ হয় মুসলমান আমলে) তিনি বাংলাদেশের ভূঞাদের মতন নিজের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। অবশেষে "আঠার ভাঁটির মধ্যে" যিনি সকলের মা, সেই চণ্ডী বনদেবী বা বনবিবির অধীনতা স্বীকার করে তিনি দেবত্ব বজায় রাখেন।

* Dakshindar, a godling of the Sunderbuns: By Bimala Charan Batabyal (Journal and Proceedings, Asiatic Society of Bengal, 1915)

দশাবতার তাস

বাংলা লোকশিল্পের রত্নভাণ্ডার বিষ্ণুপুর। তার অধিকাংশই আজ লুপ্ত ও দ্রুত বিলীয়মান। একদা তার বৈচিত্র্য ও সমৃদ্ধি বিস্ময়কর স্তরে পৌঁছেছিল। তার মধ্যে বিষ্ণুপুরের দশাবতার তাস একটি বিচিত্র নিদর্শন। দশাবতার তাসের বিশেষত্ব শুধু তাস খেলাতে নয়, তাসচিত্রণেও।

দশাবতার কল্পনা অনেক প্রাচীন, কিন্তু বিচিত্র রঙে ও রূপে রূপায়িত করে তাকে খেলার তাসে পরিণত করার পরিকল্পনা যে কতকালের প্রাচীন, তা আজও কোন ঐতিহাসিক বলতে পারেন না। তার উৎপত্তি ও উদ্ভাবন আজও রহস্যাবৃত। দশজন অবতারের সঙ্গে সকলেরই পরিচয় আছে, কিন্তু দশাবতার তাসের সঙ্গে বাংলাদেশে ক'জনের পরিচয় আছে? তাসখেলা বাঙালীর লোকপ্রিয় খেলা, কিন্তু রাজা-রাণী আর সাহেব-বিবি-গোলামের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠতা বেশি। এই সাহেব-বিবি-গোলামের তাসখেলার প্রবর্তন নিশ্চয় বৃটিশযুগে হয়েছে। রাজা-রাণীর প্রতাপ বেশি, সাহেব-বিবির আধিপত্য গোলামের উপর প্রতিষ্ঠিত। বেশ বোঝা যায়, বৃটিশের কাছে আমাদের গোলামির ইতিহাসের কলঙ্ককথা এই সাহেব-বিবি-গোলামের তাসখেলার মধ্যে খেলার ছদ্মবেশে আত্মগোপন করে রয়েছে। কিন্তু তাসখেলা বৃটিশযুগের চেয়ে অনেক বেশি প্রাচীন। বৃটিশযুগে তার রূপ-প্রতীক বদলেছে। বৃটিশযুগের সাহেব-বিবি-গোলাম বৃটিশপূর্ব যুগে অন্য নামে পরিচিত ছিল। সেই সব নাম বা তখনকার তাসখেলার সঙ্গে আমরা পরিচিত নই। আগেকার সেই তাস ও তাসখেলা লুপ্ত হয়ে গেছে। 'দশাবতার' তাসখেলার নাম দেখে বোঝা যায়, হিন্দুযুগের পরিকল্পনা। হিন্দুযুগের কোন্ সময়ের পরিকল্পনা, তা সঠিকভাবে বলা যায় না।

মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, রাম (রঘুনাথ), ভৃগুরাম (পরশুরাম), বলরাম, জগন্নাথ (বুদ্ধ) ও কল্কী—এই দশজন হলেন আমাদের পৌরাণিক অবতার। বিষ্ণুপুরের দশাবতার তাসখেলা এই দশজন অবতারকে নিয়েই পরিকল্পিত। দশজন অবতারের মূর্তি অঙ্কিত দশখানি তাস, প্রত্যেক অবতারের একজন করে। 'উজীরের' চিত্রসহ আরও দশখানি তাস। এই অবতার

ও উজীরদের অধীনে দশখানি করে তাস, সমাজের আরও দশজন বিভিন্ন লোকের মতন বিভিন্ন শ্রেণীর ও স্তরের এবং সেই অনুপাতে তাদের প্রভাবের তারতম্য—যেমন দশ, নয়, আট, সাত, ছক্কা, পঞ্জা, চৌকা, তিরি, দুরি, টেক্কা। হঠাৎ মনে হয় পৌরাণিক যুগের সমাজের একটা চমৎকার প্রতিচ্ছবি যেন এই সচিত্র দশাবতার তাসের মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে। পৌরাণিক অবতারদের ক্ষমতা অসীম, তাঁদের প্রতিভূ হলেন 'উজীররা'। সুতরাং তাদের প্রতাপও যথেষ্ট। তারপর সমাজের বাকি দশজন এবং সেখানেও শ্রেণীবিন্যাস সুপরিস্ফুট, দশ থেকে তিরি, দুরি, টেক্কা পর্যন্ত। অর্থাৎ আমীর-ওমরাহ, জমিদার-জায়গীরদার থেকে একেবারে পাইক-বরকন্দাজ পর্যন্ত। মনে হয়, সমাজে শ্রেণীবিন্যাস রীতিমত কায়েম হবার পরে কোন একসময়ে সমাজের প্রতিচ্ছবি-রূপে এই সচিত্র তাসখেলার প্রবর্তন হয়েছিল। যেমন দাবাখেলার মধ্যে রাজা-রাজড়াদের চতুরঙ্গ সেনাবাহিনীসহ যুদ্ধযাত্রার ছবি সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, তাসখেলার মধ্যেও তেমনি সমাজবিন্যাসের ছবি ফুটে উঠেছে। খেলার অন্তরালে লুকিয়ে আছে অতীত সমাজের ইতিহাস।

বিভিন্ন অবতারের প্রতীক স্বতন্ত্র এবং প্রতীকগুলি তাসের উপর আঁকা। অবতার, উজীর ও দশখানি তাস নিয়ে বারোখানা তাস প্রত্যেক অবতারের। দশজন অবতারের একশ কুড়িখানা তাস। অবতারদের প্রতীকগুলি এই :

রঘুনাথ (রাম)=তীর	জগন্নাথ (বুদ্ধ)=পদ্ম
বলরাম=গদা	বরাহ=শঙ্খ
ভৃগুরাম=টাঙ্গি বা কুঠার	মৎস=মৎস
নৃসিংহ=চক্র	কূর্ম=কূর্ম
বামন=কমণ্ডলু	কল্কী=খড়গ

এই সব প্রতীক অঙ্কিত একশ-কুড়িখানি তাস নিয়ে দশাবতার তাসখেলা আরম্ভ হয়। অবতারদের মধ্যে পাঁচজন অবতারের আভিজাত্য-বোধ হয় বেশি, সেইজন্য তাঁদের অধীন বাকি দশজনের মর্যাদারও স্বাতন্ত্র্য আছে। এই পাঁচজন অবতার হলেন—রঘুনাথ (রাম), বলরাম, ভৃগুরাম, জগন্নাথ (বুদ্ধ) ও কল্কী। এই পঞ্চ অবতার ও তাঁদের পঞ্চ উজীরের পরেই টেক্কার সর্বোচ্চ স্থান, তারপর যথাক্রমে দুরি, তিরি, চৌকা ইত্যাদির স্থান, দশের স্থান সকলের নিচে।

বাকি পাঁচজন অবতার—মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন। এঁদের উজীরের পরেই 'দশ'ই হল সম্মানিত কার্ড এবং যথাক্রমে টেক্কার মর্যাদা সবচেয়ে কম। শুধু তাই নয়। দিনের বেলা খেলা হলে রাম (রঘুনাথ) অবতার 'স্টার্টার' হন এবং রাতে খেলা হলে 'স্টার্টার' হন মৎস্য অবতার। এখানেও হঠাৎ মনে হয় যেন রাতের অন্ধকার থেকে জীবজগতের বিকাশের সূচনা এবং দিনের আলোয় ধনুর্বাণধারী মানুষের বিকাশ। জীবজগৎ ও মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশের একটা মাইক্রোফিল্ম।

পাঁচজন খেলোয়াড় নিয়ে খেলা চলে। খেলোয়াড়রা কেউ কারও 'পার্টনার' নয়। খেলার কোন বাঁধাধরা নিয়মও নেই। ডান থেকে বামে অথবা বাম থেকে ডানে, যেভাবে ইচ্ছা খেলা চলতে পারে। তাস বণ্টনের পর প্রত্যেকের ভাগে চব্বিশখানা করে তাস পড়ে। রাম অবতার যাঁর হাতে থাকবেন, তিনি দিনের বেলা খেলা হলে 'স্টার্ট' দেবেন। তাঁর হাতের অবতার উজীর ও অন্যান্য 'অনার্স' কার্ডের পিঠ নিয়ে তিনি হাত ফেরাবার জন্য অন্যকে 'সেরোয়া' বা পাস দেবেন। তারপর অন্য খেলোয়াড়ও ঠিক ঐভাবে খেলবেন। খেলার সময় যখন একজন খেলোয়াড় অন্যজনকে 'সেরোয়া' বা পাস দেন, তখন যদি তাঁর বামদিকের খেলোয়াড় খেলা পান, তাহলে তাঁর প্রথম পিঠ "টিপসহি" বলে অভিহিত হয়। তার মূল্য দুই পিঠের সমান। এইভাবে খেলা চলতে থাকে। খেলায় মোট চব্বিশটি পিঠ থাকে। খেলা শেষ হবার পর পিঠ গুণে হারজিত নির্ধারিত হয়। কমপক্ষে পাঁচটি পিঠ 'এক পয়েণ্ট' বলে গণ্য হয়। তার পরের প্রত্যেকটি বাড়্তি পিঠের মূল্য পাঁচ পয়েণ্ট করে। যেমন, কেউ যদি আট পিঠ পান, তাঁর পয়েণ্ট হবে "প্লাস-ষোল"। প্রত্যেক কম্‌তি পিঠে পাঁচ পয়েণ্ট করে কমবে। কেউ যদি তিন পিঠ পান, তাঁর পয়েণ্ট হবে "মাইনাস্ নয়"। পয়েণ্টের উপর বাজী রেখেও খেলা হয়।

বিষ্ণুপুরের কিংবদন্তী হল, মল্লরাজাদের সমৃদ্ধিকালে এই দশাবতার তাস খেলার প্রবর্তন হয়েছিল মল্লভূমে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৮৯৫ সালে 'এসিয়াতিক সোসাইটির জার্নালে' বিষ্ণুপুরের দশাবতার তাস খেলা সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত 'নোট' লিখেছিলেন। অনেকের দৃষ্টির অন্তরালে থাকলেও, দশাবতার তাস তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। শাস্ত্রী মহাশয়ের বিবরণ সম্পূর্ণ নয় এবং তাঁর বিবরণের সঙ্গে আমাদের বিবরণের পার্থক্য আছে। বিষ্ণুপুর সাহিত্য পরিষদের স্থানীয়

কর্মীদের সহযোগিতায়, প্রবীণ ও ওস্তাদ খেলোয়াড়দের কাছ থেকে এই বিবরণ আমরা সংগ্রহ করেছি। শাস্ত্রী মহাশয় তাসচিত্রণের পদ্ধতির কথা অথবা শিল্পী ফৌজদার ও সূত্রধরদের কথা কিছু বলেন নি। যাই হোক্, দশাবতার তাসের ঐতিহাসিক প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে শাস্ত্রী মহাশয় যা বলেছেন তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন : ১

I full believe that the game was invented about eleven or twe}ve hundred years before the present date.

প্রায় এগারোশ-বারোশ বছর আগে এই তাস খেলার উৎপত্তি হয়েছিল বলে শাস্ত্রী মহাশয় উল্লেখ করেছেন। এই হিসেবে দশাবতার তাসের উৎপত্তিকাল সপ্তম-অষ্টম শতাব্দী হয়। এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে তিনি এই যুক্তি দিয়েছেন। প্রথম কারণ হল, প্রচলিত তাসের তালিকায় দেখা যায় যে, জগন্নাথ বা বুদ্ধের স্থান 'নবম', কল্কীর পূর্বে। কিন্তু তাসের অবতারবিন্যাসে জগন্নাথ বা বুদ্ধের স্থান হল 'পঞ্চম'। তাসের প্রচলিত ধারার প্রবর্তন হয়েছে দ্বাদশ শতাব্দীতে জয়দেবের কালে বা একাদশ শতাব্দীতে ক্ষেমেন্দ্রের কালে। আসল দশাবতার তাস তার চেয়েও প্রাচীন। মনে হয়, এমন একসময়ে দশাবতার তাসের প্রবর্তন হয়েছিল যখন অবতারদের মধ্যে বুদ্ধ পঞ্চম অবতার বলে গণ্য হতেন। বুদ্ধের পঞ্চম অবতার বলে গণ্য হবার কারণও সঙ্গত। বুদ্ধের মূর্তি তাসে জগন্নাথের মূর্তি, কেবল মাথা ও হাতসহ দেহকাণ্ডের মূর্তি। সুতরাং নৃসিংহ (অর্ধনর ও পশু) এবং বামনের (পূর্ণ নর) মধ্যবর্তী স্থান তিনি অধিকার করতে পারেন স্বচ্ছন্দে। সেইজন্য নিম্নতম জীব মৎস্য থেকে পূর্ণ মানব পর্যন্ত ক্রমবিকাশের স্তরে জগন্নাথমূর্তি বুদ্ধের স্থান পঞ্চম। খুব যুক্তিসঙ্গত স্থান। দ্বিতীয় কারণ, দশাবতার তাসে বুদ্ধের প্রতীকচিহ্ন পদ্মফুল। সুতরাং এমন একসময় দশাবতার তাসের বিকাশ হয়েছিল যখন বুদ্ধ "পদ্মপাণি" নামে পরিচিত হয়েছিলেন। পদ্মই তাঁর প্রতীক হয়ে উঠেছিল। সেটা হয়েছিল বাংলাদেশে মহাযান বৌদ্ধধর্মের আধিপত্যের যুগে, ৮০০ থেকে ১০০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে, পাল রাজাদের রাজত্বকালে অথবা তার কিছুকাল আগে।

১ Note on Vishnupur Circular Cards: By Haraprasad Sastri: 'Journal Asiatic Society of Bengal. 1895

এই হল শাস্ত্রীমশায়ের যুক্তি। অনেকে বলবেন, এ হল শাস্ত্রীমশায়ের বৌদ্ধবায়। কিন্তু এই ধরনের মন্তব্য করার আগে মনে রাখা দরকার, বাংলার ও বাঙালীর সংস্কৃতির মধ্যে বৌদ্ধ প্রভাব কম নয়। অনার্য কৌম-সংস্কৃতির সঙ্গে এই বৌদ্ধ প্রভাব সর্বত্র মিলেমিশে রয়েছে—বাঙালীর উৎসব-পার্বণে, লৌকিক খেলা-ধুলায়, দেবদেবীর পূজাপদ্ধতিতে ও মূর্তিতে। দশাবতার তাস পালযুগে উদ্ভাবিত হওয়া আদৌ আশ্চর্য নয়। মল্লরাজারা তখন মল্লভূমের অধীশ্বর হয়েছেন। বিশেষ করে, দশাবতার তাসের চিত্র এবং সেই চিত্রাঙ্কনের পদ্ধতি দেখলে মনে হয়, পালযুগের সমৃদ্ধিকালেই এই খেলা, এই শিল্প ও শিল্পী-দের বিকাশ হয়েছিল। তারই ঐতিহ্য বহন করছেন বিষ্ণুপুরের ফৌজদার ও সূত্রধররা। আজ তাঁদের বংশ প্রায় লুপ্ত বলা চলে।

'সূত্রধররাই' ছিলেন বাংলার শিল্পী। 'কাষ্ঠ, পাষাণ, মৃত্তিকা ও চিত্র'—এই চারশ্রেণীর সূত্রধর বা শিল্পী ছিলেন। কাষ্ঠ-শিল্পীরা কাঠের কাজ করতেন, পাষাণ-শিল্পীরা ছিলেন ভাস্কর, মৃত্তিকা-শিল্পীরা মাটির মূর্তি, পুতুল ও পাত্র গড়তেন, আর চিত্রশিল্পীরা আঁকতেন চিত্র। সকলেই 'সূত্রধর' বলে পরিচিত ছিলেন তখন, কিন্তু এখন 'সূত্রধর' বলতে আমরা শুধু 'কাষ্ঠশিল্পী' বুঝি। বুঝলেও, এখন কাষ্ঠশিল্পের শুকনো কাঠটুকুই আছে, শিল্প নেই।

বিষ্ণুপুর-মল্লভূমেও যাঁরা শিল্পী ছিলেন তাঁরা 'সূত্রধর' বলেই পরিচিত, 'ফৌজদাররা' পরিচিত কেবল রাজোপাধিতে। মল্লভূমের মৃত্তিকাশিল্পী, পাষাণ-শিল্পী, কাষ্ঠশিল্পী ও চিত্রশিল্পী অধিকাংশই 'সূত্রধর' ও 'ফৌজদার' বলে পরিচিত ('পাল'-ও আছেন)। মৃত্তিকাশিল্পীদের মধ্যে গদাধর ফৌজদার, সতীশ ফৌজদার, কেদার সূত্রধর প্রভৃতির যথেষ্ট সুনাম ছিল এবং দশাবতার তাসচিত্রণেও তাঁরা প্রচুর সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। বর্তমানে যতীন ফৌজদার, শুধীর ফৌজদার, পটল ফৌজদার, ভানুপদ পাল, অনিল সূত্রধর প্রভৃতি শিল্পীরা বিষ্ণুপুরে সুপরিচিত। চিত্রবিদ্যার পারদর্শিতা ক্রমেই এঁদের কমে যাচ্ছে, কারণ বর্তমান সমাজে এঁদের চিত্র বা মূর্তির সমাদর নেই। জীবনসংগ্রামে এঁরা সকলেই প্রায় বিপর্যস্ত এবং বংশগত বিদ্যার চর্চাতেও উদাসীন। কিছুদিন পরে চিত্রবিদ্যার এই চর্চাই হয়ত লোপ পেয়ে যাবে।

ফৌজদারবংশের বংশধরদের কাছ থেকে দশাবতার তাসচিত্রণের প্রণালী সম্বন্ধে যে বিবরণটুকু সংগ্রহ করেছি, তা এখানে সংক্ষেপে বলছি। দশাবতার

তাস স্বচক্ষে না দেখলে তা তৈরি করার প্রণালীর মধ্যে বাস্তবিকই যে কতখানি চিন্তা ও উদ্ভাবনশক্তির পরিচয় আছে, তা বোঝা যায় না। তাসগুলি বৃত্তাকার এবং বৃত্তব্যাস প্রায় চার ইঞ্চি হবে। রীতিমত মজবুত শক্ত তাস, কারণ খেলার জন্য তাস তৈরি হয়, সাজিয়ে রাখার জন্য নয়। তাস তৈরি করার প্রণালী এই: কাপড় তিনভাঁজ করে পর-পর সাজিয়ে আঠা দিয়ে সাঁটা হয়। আঠা হল তেঁতুলবীচির আঠা বা 'মাড়ি'। তেঁতুলবীচির মাড়ি দিয়ে বেশ ভাল করে সেঁটে খড়িমাটির প্রলেপ দিয়ে শুকিয়ে নেওয়া হয়। শুকাবার জন্য খড়িমাটির প্রলেপ একাধিকবার দেওয়া হয়। পরে 'ঝামাপাথর' দিয়ে ঘষে উপরটা যতদূর সম্ভব মসৃণ করে নেওয়া হয়। একে বলে তাসের 'জমিন' প্রস্তুত করা। জমিন প্রস্তুত করতে বেশ সময় লাগে। জমিন তৈরি হবার পর চক্রাকারে সেগুলি কেটে ফেলা হয়। তাসের আকার অনুযায়ী কাটা হয়। তারপর আরম্ভ হয় চিত্রাঙ্কন। বিভিন্ন অবতার, তাদের উজীর ও প্রতীকচিহ্নসহ দশ থেকে টেক্কা পর্যন্ত সমস্ত ছবি আঁকা হয়। নানারঙ দিয়ে ছবি আঁকা হয় এবং তার কোনটাই বিদেশী রঙ নয়। আঁকা শেষ হবার পরে মেটে সিঁদুর ও গালা টেনে তাসের পিঠ তৈরি করা হয়। এই পিঠ তৈরি করার পদ্ধতিটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাসের একদিকে ছবি, আর একদিকে এই মেটে সিঁদুর ও গালার প্রলেপ থাকে। তাসগুলিকে রঙের ব্যাকরণ বললেও অত্যুক্তি হয় না। বিভিন্ন রঙের পটভূমিকায় বিচিত্র সব রঙের অদ্ভুত সামঞ্জস্য রক্ষা করে তাসগুলি আঁকা হয়। দশাবতার তাসের এই রঙের সামঞ্জস্য ও নক্‌শা থেকে বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত তাঁতশিল্পীরা কাপড়ের পাড় তৈরি করতেন। দশাবতার তাস সামনে রেখেই তাঁরা কাপড়ের আঁচলা ও পাড় বুনতেন। "পাটরাঙ্গা" নামে স্থানীয় তন্তুবায় সম্প্রদায় দেশীয় পদ্ধতিতে নানারকমের রঙও তৈরি করতেন।

এখন বিষ্ণুপুরের সকল শ্রেণীর শিল্পীরাই প্রায় লোপ পেয়ে যাচ্ছেন। তাঁদের শিল্পকলার প্রাচীন ঐতিহ্যটুকুই কেবল আছে, ঐতিহাসিক স্মৃতির মতন, শিল্পের নিদর্শন বিশেষ নেই। দশাবতার তাসও আর কিছুদিনের মধ্যে একেবারে লোপ পেয়ে যাবে মনে হয়। কারণ তাস না আঁকতে পারলে খেলা বন্ধ হয়ে যাবে, এবং তাস যাঁরা আঁকবেন তাঁরা যদি অন্নের জন্য বংশগত পেশা ছেড়ে ভিন্ন পেশা গ্রহণ করতে বাধ্য হন, তাহলে তাস আঁকা ও তাসখেলা দুই-ই লুপ্ত হয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় কি?

পশ্চিমবঙ্গের চিত্রকর

সমাজ-জীবন ও আর্থিক-ব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার নানাশ্রেণীর লোকশিল্পীরা কিভাবে ক্রমে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছেন, পশ্চিমবঙ্গের চিত্রকরদের দেখলে তা বোঝা যায়। বীরভূমের চিত্রকরদের অস্তিত্ব আজ প্রায় বিলুপ্ত বলা চলে। বিশ-পঁচিশ বছর আগেও কায়ক্লেশে যে কয়েকঘর চিত্রকর বীরভূম জেলায় জীবনধারণ করছিলেন, আজ তাঁরা জীবিত থাকলেও, পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে তাঁদের বংশানুক্রমিক পেশার পরিবর্তন ঘটছে। বীরভূম, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলায় যেখানে চিত্রকরদের বিচ্ছিন্ন বিরল বসতি আজও আছে, সর্বত্রই প্রায় একই লক্ষণ দেখা যায়।

প্রথমে বীরভূমের কথা বলি। সিউড়ী থেকে মাইল পাঁচ-ছয় দূরে পানুড়ে গ্রাম। এই পানুড়ে গ্রামেই গুরুসদয় দত্ত মহাশয় ছবিলাল চিত্রকরের সন্ধান পেয়েছিলেন।[১] তখন ছবিলালরা চিত্রাঙ্কন ও চিত্র-প্রদর্শনবিদ্যার অভ্যাস ছাড়েননি। ছবিলালই তাঁকে বলেছিলেন যে তাঁরা বিশ্বকর্মার বংশধর। কুপিত ব্রাহ্মণের অভিশাপে সমাজে তাঁরা পতিত হয়েছিলেন, কিন্তু চিত্রবিদ্যার চর্চা ছাড়েননি। একালে চিত্রবিদ্যার চর্চাও তাঁরা ছেড়ে দিয়েছেন, দিতে বাধ্য হয়েছেন। কার অভিশাপে? ব্রাহ্মণের অভিশাপ একালে ফলে না। দারিদ্র্যের চাপে পানুড়ে গ্রামের চিত্রকররা আজ চাষ করছেন, মজুর খাটছেন, মিস্ত্রীগিরি করছেন। পূর্বপুরুষদের পেশা তাঁরা ভুলে গেছেন।

পানুড়ের চিত্রকররা আরও কয়েকটি গ্রামের সন্ধান দিলেন। অণ্ডাল-সাঁইথিয়া রেলপথে কুনরী স্টেশনে নেমে প্রায় দুই মাইল দূরে ইটাগড়িয়া গ্রাম। সিউড়ী থেকে মাইল সাত-আট পথ হবে। ইটাগড়িয়ায় কয়েকঘর চিত্রকরের অস্তিত্ব আজও আছে, চিত্রবিদ্যার চর্চা বিশেষ নেই। এই গ্রামে প্রায় ষাট বছরের বৃদ্ধ সুদর্শন চিত্রকরের সঙ্গে দেখা হল। চিত্রপ্রদর্শনবিদ্যা গ্রাম থেকে প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে, পট আঁকতে বা পুতুল গড়তেও বিশেষ কেউ জানেন

১ শ্রীগুরুসদয় দত্ত: পটুয়া সঙ্গীত (পরিচায়িকা)

Journal of Indian Society of Oriental Arts, Vol I, no 1, June 1933: "The Indigenous Painters of Bengal" by G. S. Dutt.

না। গ্রামের দু'একজন দরিদ্র বালককে সুদর্শনই অবসর মতন দু'একখানা পট এঁকে দিয়েছেন, তাই দেখিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে তারা ভিক্ষা করে বেড়ায়। সুদর্শন নিজে এখন দেবমূর্তি গড়েন, দেয়ালচিত্র আঁকেন এবং সেজন্য মধ্যে মধ্যে তাঁকে কলকাতা শহরেও আসতে হয়। জীর্ণ কুটিরের পরিত্যক্ত বাস্তুভিটা-গুলির দিকে দেখিয়ে সুদর্শন বললেন: "কয়েকবছর আগেও প্রায় বিশ-পঁচিশ ঘর চিত্রকর ছিল এই গ্রামে, এখন তারা অভাব-অনটনের চাপে সকলেই প্রায় নির্বংশ হয়ে গেছে। এইরকম গ্রাম বীরভূম জেলায় আমি অন্তত পঞ্চাশ-ষাটটি দেখেছি, প্রত্যেক গ্রামে প্রায় বিশঘর করে পটুয়ার বাস ছিল। এখন গ্রামও অনেক লুপ্ত হয়ে গেছে, পটুয়ারা তো গেছেই। আগে আমরা পট আঁকতাম, গ্রামের লোক সেই পট কিনে পুজো করত। ঘটেপটে পূজার প্রচলন ছিল তখন বেশি। এখন হাতে-আঁকা ছবির বদলে ছাপানো ছবিতে কাজ চলে যায়। আগে মালাকাররা ছিলেন সাজসজ্জার রূপকার, এখন তাঁরাও পুজোর পট এঁকে দেন, মূর্তিও গড়েন। তাই আজ আমরা ক্রমে পট আঁকা ছেড়ে চাষবাস, মিস্ত্রী-মজুরের কাজ করছি। আগে বারোমাসে তের পার্বণের সঙ্গে ছোট বড় অসংখ্য গ্রাম্য মেলা হত সব জায়গায়। এইসব গ্রাম্য মেলাতে আমরা নানারকমের দেবদেবীর পট এঁকে, কাঠের পুতুল গড়ে বিক্রী করতাম। মেলাতে মেলাতে ঘুরে পট দেখিয়ে, গান গেয়ে যা রোজগার হত তাতেও স্বচ্ছন্দে আমাদের চলে যেত। এখন অধিকাংশ মেলা উঠে গেছে, যা দু'চারটে আছে তাতে রবার-প্লাস্টিকের পুতুল আর সস্তা ছাপা ছবির এত আমদানি হয় যে, আমাদের কাঠের পুতুল বা আঁকা পটের দিকে কেউ ফিরেও চায় না। নানারকমের ভেলকিবাজী, সার্কাস ও সিনেমা ছেড়ে কে মেলার মধ্যে আমাদের পটের গান শোনার জন্য সময় নষ্ট করবে?"

বৃদ্ধ সুদর্শনের এই সুন্দর বিবৃতির পর কোন সমাজবিজ্ঞানীর আর বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয় না পরিষ্কার বোঝা যায়, কেন চিত্রকররা বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছেন। চিত্রকর জাতিপ্রসঙ্গে "পতিতো ব্রহ্মশাপেন ব্রাহ্মণাঞ্চ কোপতঃ" কথার উল্লেখ করতে দেখলাম বৃদ্ধ সুদর্শনের হাসিখুশি মুখখানি গম্ভীর হয়ে গেল। সুদর্শন বললেন: "হ্যাঁ, ব্রাহ্মণের অভিশাপে সমাজে আমরা পতিত হয়েছি। হিন্দুর মতন পূজার্চনা করি, অথচ মুসলমানদের মতন নমাজ করি কেন, এ প্রশ্ন ছেলেবেলায় আমার মনে হয়েছিল। আমার পরলোকগত

পিতাকে জিজ্ঞাসাও করেছিলাম। আমার মনে আছে, তিনি আমাকে বলেছিলেন যে, আগে আমরা নমাজ করতাম না, নিজেদের হিন্দু বলেই মনে করতাম। কিন্তু হিন্দুরা আমাদের ঘৃণা করতেন এবং সমাজে কোন স্থান দিতেন না। তখন মুসলমানরা আমাদের ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা করেন। দুঃখে ও অভিমানে আমরা মোল্লাদের ধর্মই গ্রহণ করি। কিন্তু করলে কি হবে, তার আগে হিন্দুসমাজের আচার-অনুষ্ঠানে আমরা অভ্যস্ত হয়েছি, তাই অভ্যাস ছাড়তে পারিনি। আজ তাই আমাদের ঐ নমাজটুকু ছাড়া বাকি সব আচারই হিন্দুর মতন। আমাদের মেয়েরা শাখা-সিঁদুর পরে, আমরা হিন্দু দেবদেবীর ছবি আঁকি, পুজো করি অথচ নমাজও পড়ি। আমাদের নমাজটাই হল ব্রাহ্মণের অভিশাপের প্রত্যক্ষ ফল।"

কথায় কথায় বৃদ্ধ সুদর্শন পট আঁকার পদ্ধতিও বললেন। হাতে তৈরি কাগজের উপর প্রথমে লালরঙ (আলতা ইত্যাদি) দিয়ে রেখাচিত্র এঁকে নিতে হয়, তারপর নীলবর্ণে চিত্রাঙ্কন চলে। কেরোসিনের ল্যাম্প জেলে তার উপর মাটির সরা ধরলে যে ভুষো জমে, তাতে ভাল কালো রঙ হয়। নারকেলের মালা পুড়িয়েও কালো রঙ তৈরি করা যায়। বীরভূমের নলহাটি অঞ্চলে একরকমের হলুদ মাটি পাওয়া যেত, তাই দিয়ে হলদে রঙ করা চলত। নীলের জন্য 'নীল' তো আছেই। হরিতাল থেকেও রঙ করা হত। নীল আর হলুদ মেশালেই সবুজ রঙ তৈরি হত। পট আঁকার জন্য রঙের অভাব হত না। প্রসঙ্গত তিনি বললেন যে তাঁদের ঘরের মেয়েরাও ছবি আঁকতেন। এখন আর আঁকেন না।

আরও একটি কথা সুদর্শন বলেছিলেন। জাতিপ্রসঙ্গে কথাটা উঠলো। সুদর্শন চিত্রকর বললেন: "একসময় আমরা সুরাপান করতাম খুব বেশি। দৈনিক শুড়ির দোকানে না গেলে আমাদের চলত না। এ অঞ্চলে ধর্মরাজ ঠাকুরের উৎসবের কথা তো জানেন। ধর্মঠাকুরের উৎসবে সুরা অন্যতম উপকরণ। উৎসবের সময় প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে বড় মাটির জালা বা ভাঁড় বসান হত এবং সেটি সুরায় পূর্ণ থাকত। উৎসবে ধীবর বাউরী হাড়ি ডোম প্রভৃতি জাতের লোকই যোগ দিত বেশি, কিন্তু আমরা চিত্রকররাই সেই সুরাভাণ্ডে সর্বপ্রথম মাল্যদান করতাম।"

সুদর্শন চিত্রকরের কথা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। ধর্মঠাকুর, সুরাভাণ্ডে

মাল্যদান, সুরাপান, যমরাজার পট ও গান ইত্যাদির সঙ্গে বীরভূমের চিত্রকরদের এই সম্পর্ক থেকে তাদের ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক উৎপত্তি-পরিণতি সম্বন্ধে ধারণা অনেকটা পরিষ্কার হয়। ধর্মঠাকুরের সঙ্গে চিত্রকরের সম্পর্ক এবং তার সঙ্গে যমপটের, বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চিত্রকররা আদিতে পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী নিষাদজাতির কোন শাখা ছিলেন বলে মনে হয়। পরে হিন্দু-সমাজের অন্তর্ভুক্ত হন এবং অন্যান্য অনার্য জাতির মতন হিন্দুসমাজের নিম্নস্তরেই তাঁরা স্থান পান। স্বভাবতঃই যথেষ্ট সামাজিক নির্যাতন ও অবজ্ঞা যুগে যুগে তাঁদের সহ্য করতে হয়। তবু তাঁরা নিজেদের অস্তিত্ব ও বংশগত পেশা বজায় রাখতে পেরেছিলেন, প্রধানত প্রাচীন ও মধ্যযুগের সমাজ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার জন্য। স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম্যসমাজে অন্যান্য সকল জাতির মতন তাঁদেরও একটা ভূমিকা ছিল। তাঁরা পট আঁকতেন, ঘটে ও পটে গ্রামের পূজা হত। গ্রামের মেলাগুলি ছিল সেকালের পণ্য বেচাকেনার অন্যতম কেন্দ্র। মেলায় মেলায় ঘুরে জীবিকা অর্জন করাও তখন সহজ ছিল। মহাভারত, রামায়ণ, পুরাণকথা গেয়ে গেয়ে তাঁরা হিন্দুধর্ম প্রচারে সাহায্য করতেন। সামাজিক সমস্যা নিয়ে ব্যঙ্গবিদ্রূপও তাঁদের আঁকা চিত্রপটে ও রচিত গানে ফুটে উঠত। মুসলমান আমলে তাঁরা হিন্দুসমাজের উপেক্ষার জন্য ধর্মান্তরিত হন এবং ইসলামধর্মের প্রচারক গাজী সাহেবরাও তখন তাঁদের পটচিত্রের বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে (গাজীর পট)। মনে হয়, চিত্রকররা তার অনেক আগে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। বৃটিশযুগে আত্মনির্ভর গ্রাম্যসমাজের দ্রুত ভাঙনের সময় তাঁদেরও দ্রুত অবনতি হতে থাকে। ক্রমে বিলুপ্তির পথে তাঁরা এগিয়ে যান, আর্থিক সঙ্কটের চাপে।

উত্তর-পশ্চিমবঙ্গ ও দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গ, মোটামুটি এই দুইভাগে বাংলার চিত্রকরদের সমাজকে ভাগ করা যায়। মেদিনীপুরের চিত্রকররা দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের সমাজভুক্ত। মেদিনীপুর থেকে দক্ষিণে চব্বিশপরগণা জেলার ডায়মণ্ডহারবার ও আলিপুর মহকুমা পর্যন্ত এই চিত্রকর-সমাজের প্রভাব প্রত্যক্ষভাবে বিস্তৃত। সুন্দরবনের গ্রামে গ্রামে পর্যন্ত মেদিনীপুরের চিত্রকররা পট দেখিয়ে ঘুরে বেড়ান। কলকাতার কালীঘাটের পটুয়ারাও প্রধানত দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের সমাজভুক্ত।

তমলুক ও ঘাটাল মহকুমার বাইরে এখন আর মেদিনীপুরের চিত্রকরদের

বিশেষ দেখা যায় না। এই দুই মহকুমার অন্তর্গত দু'টি স্থানের চিত্রকরদের কথাই বলব এখানে। তমলুক মহকুমায় কুমীরমারা গ্রামে চিত্রকরদের বাস আছে। গ্রামটি নন্দীগ্রাম থানার অন্তর্গত। চিত্রকরদের স্থানীয় লোকেরা সাধারণত পটীদার বলেন। কুমারীমারা গ্রামে এখনও সাত-আট ঘর পটীদার বাস করেন। এখন আর পট খেলানো তাঁদের প্রধান বা একমাত্র পেশা নয়। এখন তাঁরা ঠাকুর গড়নে, নানারকমের মাটির পুতুল ও চিত্রিত হাড়ি গড়ে হাটে ও মেলায় বিক্রী করেন। বছরের কয়েকমাস যখন প্রতিমা গড়ার কোন কাজ থাকে না হাতে তখন পট খেলিয়ে বেড়ান। এক-একটি পৌরাণিক কাহিনী পালার মতন ছড়া বাঁধা এবং ছবি আঁকা থাকে। যেমন মশানে শ্রীমন্ত, রামচন্দ্রের বনবাস, লক্ষণের শক্তিশেল, মহীরাবণ বধ, মনসার গান, জগন্নাথ ও শ্রীকৃষ্ণের পালাগান ইত্যাদি। পট দেখিয়ে পয়সা, চাল-ডাল, বাসন পর্যন্ত ভিক্ষা গ্রহণ করেন। এখন যাঁরা বেঁচে আছেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই পট আঁকতে জানেন না। দু'চারজন যাঁরা জানেন, তাঁরাও যে পূর্বপুরুষদের মতন সুদক্ষ শিল্পী নন, একথা তাঁরা স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হন না। প্রধানত পুতুল ও প্রতিমা গড়াই এখন তাঁদের কাজ। তাও নিজেদের তৈরি রঙ-তূলি দিয়ে নয়। বাজার থেকে তাঁরা বিলেতি রং ও তুলি কিনে আনেন। ঘরে তৈরি ছাগলের লোমের তুলি বা ভুষো কালি ব্যবহার করা হয় না যে তা নয়। কিন্তু ক্রমেই অঙ্কনের উপকরণের জন্য এঁরা বাইরের বাজারের মুখাপেক্ষী হয়ে উঠছেন।

চেতুয়া-দাসপুর, চেতুয়া-বাসুদেবপুর অঞ্চলেও পটীকার বা চিত্রকরদের বাস আছে। বাসুদেবপুরের সংলগ্ন নির্ভয়পুর গ্রামে পটীকারদের যে পল্লীটি আছে, তার দীনহীন রূপ দেখলেই বোঝা যায়, চিত্রকরদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা কিরকম শোচনীয়। জরাজীর্ণ কয়েকটি পাতার মাটির ঘর, একস্থানে জড়ো করা। পটীকারদের বসতি। মধ্যে মুক্ত অঙ্গন। তার উপর খাটিয়া, চাটাই ও মাদুর পাতা, পুতুল সাজানো। নানারকমের পুতুল, কাঁচা ও শুকনো মাটির পুতুল, দু'এক পোঁচ রঙ দেওয়া। কোন মেলা বা উৎসব উপলক্ষে তৈরি হচ্ছে। পট দু'চারখানা করে অনেকেরই ঘরে আছে, কারও কারও আবার তাও নেই। অধিকাংশই পিতা পিতামহের আঁকা পট, এখন ভক্তির ও আসক্তির জিনিস।

বীরভূম অঞ্চলের মতন মেদিনীপুরের পটাকাররাও না-হিন্দু, না-মুসলমান। আচার সংস্কার যা কিছু তার সবই প্রায় হিন্দুসমাজের, কেবল মুসলমান-সমাজের বাইরের কতকগুলি সামাজিক কর্তব্য তার উপর আরোপ করা হয়েছে। কুমীরমারা গ্রামের পটাকাররা বলেন যে, তাঁরা মুসলমানধর্ম মানতেন, কিন্তু মসজিদে যেতেন না, বাড়িতে নমাজ পড়তেন। মুসলমানদের সঙ্গে তাঁদের বিবাহাদিও হত না, নিজেদের চিত্রকর-সমাজের মধ্যেই বিবাহ হত। মৌলানা এসে অবশ্য কল্‌মা পড়িয়ে যেতেন। পূর্বে 'সুন্নৎ' করারও রীতি ছিল, এখন নেই। চেতুয়া-বাসুদেবপুরের সংলগ্ন নির্ভয়পুরের পটাকার-পল্লীতে একটি ছোট ভাঙা মস্‌জিদ আছে। অন্য কোথাও চিত্রকর বসতিতে এরকম মস্‌জিদ চোখে পড়েনি। বিশ্বকর্মার পুত্র চিত্রকররা কিন্তু এখনও বিশ্বকর্মার পূজা করেন ভাদ্র সংক্রান্তিতে এবং মেয়েরা ঘরে লক্ষ্মীপূজাও করেন। যাঁরা প্রায় সম্পূর্ণ মুসলমানসমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন তাঁরা পূর্ববঙ্গে গাজীর পট দেখিয়ে বেড়ান। জনসমাজে ধর্মকথা প্রচারের এরকম জনপ্রিয় কৌশল মুসলমান পীরগাজীরাও নিজেদের কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছিলেন। তার থেকেই গাজীর পটের উৎপত্তি, পূর্ববঙ্গে তার প্রসার বেশি। পশ্চিমবঙ্গের চিত্রকররা মধ্যপথে থেমে রইলেন, এখনও তাই আছেন। আধা-মুসলমান হয়েও তাঁরা চিরদিন হিন্দু দেবদেবীর মাহাত্ম্যকথা গেয়ে বেড়ান, তাঁদের চিত্র ও মূর্তি আঁকেন। অথচ হিন্দুসমাজে তাঁরা পতিত, নির্বাসিত ও অবজ্ঞাত।

মেদিনীপুরের পটাকারদের সমাজ অনেকদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। ভাগীরথীর পশ্চিমে ঘাটাল ও আরামবাগ মহকুমায়, পূর্বদিকে দক্ষিণ চব্বিশপরগণায় সরিষা, কালীঘাট, আখড়া, সোনারপুর, কলকাতা ইত্যাদি স্থানে পটাকারদের সমাজ ছিল। কলকাতা শহরে একাধিক স্থানে পটুয়াপাড়া ছিল, শুধু কালীঘাটে নয়। তীর্থস্থান হিসেবে কালীঘাট তো ছিলই, চিৎপুরে চিত্রেশ্বরীদেবীর কাছে, পটুয়াটোলা ইত্যাদি অঞ্চলেও ছিল। কলকাতার পটুয়ারা শহরের নতুন ইঙ্গবঙ্গ সমাজ ও বাবুসমাজের সংস্পর্শে এসে, কবিয়ালদের মতন বাবুদের মনোরঞ্জনের জন্যই প্রধানত নানারকম সামাজিক ব্যঙ্গচিত্রাদি আঁকতে আরম্ভ করেন। বিদেশ থেকে আমদানি ছবির প্রিন্টের প্রভাবও তাঁদের উপর পড়ে। তার ফলে কলকাতায় একটি বিশিষ্ট চিত্রকরগোষ্ঠী গড়ে ওঠে। তাদের মধ্যে কালীঘাটের পটুয়ারা বিখ্যাত।

কুড়মুনের গাজন

বর্ধমান শহর থেকে প্রায় মাইল দশ উত্তর-পূর্বে কুড়মুন গ্রাম। পাশের পলাশী গ্রাম রেভারেণ্ড লালবিহারী দে'র জন্মস্থান। একাধিক পলাশী নামের জন্য কুড়মুনসহ কুড়মুন-পলাশী বলে বিখ্যাত। এই গ্রাম্য-পরিবেশই 'বেঙ্গল পেজাণ্ট লাইফ' গ্রন্থের উপজীব্য। রামমোহন রায় দ্বিতীয় বিবাহ করেন কুড়মুন গ্রামের শ্রীমতী দেবী নামে এক ব্রাহ্মণকন্যাকে। গ্রামের ঈশানেশ্বর পাড়ায় তাঁর শ্বশুরালয়। কুড়মুন ও পলাশী দুটি গ্রামই বেশ প্রাচীন গণ্ডগ্রাম। গ্রামের মধ্যে পা দিলেই তার আভাস পাওয়া যায়। কুড়মুনের কোল ঘেঁষে খড়েগশ্বরী নদী বয়ে গেছে। পরবর্তীকালে নদীর প্রবাহ যেমন বদলেছে, গ্রামের বসতিও তেমনি সরে এসেছে। পুরাতন সেই সব বসতির চিহ্ন বর্তমানে গ্রামের সীমানা ছাড়িয়ে নদীর দিকে যেতে দেখা যায়। গ্রাম সম্বন্ধে প্রচলিত একটি ছড়ায় আজও কুড়মুনের এককালীন সমৃদ্ধির স্মৃতি ভেসে আসে—
"বারো আহার, তেরো দীঘি, নবুড়ি গড়ে ছ'বুড়ি ডোবা, তিনশ ঘাট পুষ্করণী, এই নিয়ে কুড়মুন জানি।"

দলিলপত্রে কুড়মুন গ্রামের প্রাচীনত্বের যে প্রমাণ পাওয়া যায়, তা প্রায় তিনশ বছরের। ঈশানেশ্বর শিবের গাজনতলার মন্দিরের শিলালিপির তারিখ ১৬৬৭ শকাব্দ, ইংরেজী ১৭৪৫ সাল। গ্রামের প্রাচীন মুসলমান মুন্শী পরিবারের তায়দাদের তারিখ বাংলা ১০৯৪ সন, ইংরেজী ১৬৮৭ সাল। কুড়মুনবাসী মোল্লা জাহেদ আলির মাতৃকুলের উর্ধতন পূর্বপুরুষকে বর্ধমান রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা সঙ্গমরায়ের অধস্তন ষষ্ঠপুরুষ কৃষ্ণরাম রায় নিষ্কর সম্পত্তি দিয়েছিলেন, মখদুম সাহেবের আস্তানার 'চেরাগি ফকিরান খরচ সুরস্তে', ১০৯৩ সনে (তায়দাদ নং ২৫৪১৩, বর্ধমান সদর)। তায়দাদ ও লিপি ছাড়াও আরও অন্যান্য যে সব পরোক্ষ ইঙ্গিত আছে তাতে মনে হয় কুড়মুন গ্রাম আরও বেশি প্রাচীন। গ্রামের মধ্যে 'ফকিরডাঙ্গা' নামে একটি স্থানে বেশ উঁচু একটি ঢিবি আছে। কোন ইটপাথরের গৃহের ধ্বংসাবশেষ মনে হয়, কারণ এখনও পাথরের স্তম্ভের বড় বড় খণ্ড ও অজস্র ইটের টুকরো তার চারিদিকে ছড়িয়ে আছে দেখা যায়। গ্রামের লোকের বিশ্বাস, এখানে

সাজাহানের আমলের একটি মসজিদ ছিল। ভগ্নাবশেষ ও তার অবস্থান দেখে মনে হয়, এটি বেশ বড় মসজিদই ছিল এবং ফকিরডাঙ্গায় একসময় মুসলমান পীর ফকিরদেরও বসতি ছিল। এখনও কুড়মুনের মুসলমানপাড়া এই ফকির-ডাঙ্গার কাছে। এখানকার গ্রাম্যপথের উপর মাটি খুঁড়ে অনেক কবরও পাওয়া গেছে। কবর ছাড়া পথের মধ্যে মধ্যে পুরনো পাতকুয়োর ভাঙা পাটা, এমন কি সম্পূর্ণ পাতকুয়ো পর্যন্ত বেরিয়েছে। দেখে মনে হয়, বেশ প্ল্যান অনুযায়ী গ্রামের মধ্যে এই পাতকুয়োগুলি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল একসময়। ঠিক এইরকম সব নিদর্শন বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট গ্রামেও দেখেছি। গ্রামগুলি মোগল আমলেই বেশ প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিল মনে হয়। মঙ্গলকোটের মতন কুড়মুনও মুসলমানপ্রধান সমৃদ্ধ গ্রাম ছিল। মোগলযুগে কয়েকটি সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবার ও রাজকর্মচারী এই গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। অন্তত সপ্তদশ শতাব্দী থেকে মুসলমানরা কুড়মুন গ্রামের অন্যতম বাসিন্দা হয়েছিলেন মনে হয়। এখন মুসলমান-পরিবারের সংখ্যা অনেক কম এবং প্রাচীন পরিবারের মধ্যে মুন্সী ও মোল্লাবংশই অন্যতম। মোল্লারা গ্রামস্থ পীর মখদুম সাহেবের খাদেম বা সেবায়েত।

গ্রামের উগ্রক্ষত্রিয় ও রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণরা প্রাচীনদের মধ্যে অন্যতম। "মণ্ডল" উপাধিধারী উগ্রক্ষত্রিয়রাই ঈশানেশ্বর শিবের বিখ্যাত গাজনের পরিচালক এবং ঘোষাল ব্রাহ্মণরা পূজারী। মণ্ডলদের পূর্বপুরুষ সন্তোষ মণ্ডল (যিনি ঈশানেশ্বরের শিবের উৎপত্তির কিংবদন্তীর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট) বাংলা ১১৬১ সনে যে জীবিত ছিলেন, মুন্সী পরিবারের একটি প্রাচীন তায়দাদ থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ১১৬১ সনের একটি তায়দাদে দেখা যায় যে বর্ধমানরাজ মদদ্মাস দিচ্ছেন সেখ আজীমুদ্দিন ও তস্য পুত্র কলিমুদ্দিনকে এবং সন্তোষ মণ্ডল তার অন্যতম সাক্ষী। সন্তোষ মণ্ডল যদি তখন বৃদ্ধও হন, তাহলে তাঁর কাল ১১০০ সনের পূর্বে বলে মনে হয় না। কিংবদন্তী হল, এই সন্তোষ মণ্ডলই স্বপ্ন দেখে খড়িনদীর কলমিসায়রের দহ থেকে ঈশানেশ্বর শিবকে নিয়ে এসে গ্রামে প্রতিষ্ঠা করেন। সন্তোষ মণ্ডলের বংশধররাই বংশপরম্পরায় ঈশানেশ্বরের গাজন পরিচালনা করেন। সুতরাং কুড়মুন গ্রামের ঈশানেশ্বর শিবের বিখ্যাত গাজনোৎসব প্রায় আড়াইশ বছরের প্রাচীন উৎসব বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

হাড়ি, বাগ্দী ও ডোম প্রভৃতি জাতির বাস এককালে গ্রামে খুব বেশি ছিল। এখনও কুসম্যেটে, তেঁতুলে ও দুলেদের বাস যথেষ্ট আছে গ্রামে। গ্রামের উত্তরে হাড়িদেরও বাস আছে এবং হাড়িদের মেয়েরা আজও গ্রাম্য ধাত্রীর কাজ করে। গ্রামের পশ্চিমে একসময় বিশাল ডোমপাড়াও ছিল, এখন প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। হাড়ী, বাগ্দীও ডোমরা ছিল প্রধানত ধর্মঠাকুরের পূজারী। দুলেপাড়ায় এখনও এক ধর্মরাজ আছেন, তবে ঈশানেশ্বরের প্রভাবে ম্লান হয়ে গেছেন। পূজা দুলেরাই করে। এ ছাড়া, কুড়মুনের পূর্বপাড়ায় বুড়িগাছতলায় 'কাঁলাচাদ' নামে আর এক ধর্মঠাকুর আছেন, সেবায়েত তন্তুবায়, "দেয়াসী" বলা হয়। এখন ব্রাহ্মণে পূজা করেন। বৈশাখী বুদ্ধ পূর্ণিমায় উৎসব হয়। ঈশানেশ্বরের গাজনের সময় এখনও সন্ন্যাসীরা বুড়িগাছতলায় কালাচাঁদের মন্দিরের সামনে জমায়েত হন। বর্ধমান-তথা রাঢ়দেশের আরও অন্যান্য অনেক গাজনের মতন, কুড়মুনের ঈশানেশ্বর শিবের গাজনও পূর্বের ধর্মের গাজনের রূপান্তর বলে মনে করার সঙ্গত কারণ আছে। শিবের অধিকাংশ ভক্ত্যা বা সন্ন্যাসীরা প্রধানত গোপ, বাগদী, দুলে, ডোম প্রভৃতি সম্প্রদায়ের, বিশেষ করে শ্মশান-সন্ন্যাসীরা। এছাড়া কালাচাঁদ ধর্মের মন্দিরে যে একাধিক কূর্মমূর্তি ধর্মঠাকুর দেখা যায়, তার কারণ পূর্বে গ্রামের মধ্যে একাধিক স্থানে ধর্মঠাকুর প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং ক্রমে তার পূজা বন্ধ হওয়ার জন্য অথবা পূজারীবংশ লোপ পাবার জন্য মূর্তিগুলি একটি মন্দিরে এসে জমেছে। সকল ধর্মরাজের এক বিরাট সমবেত গাজনোৎসব হত মহা-সমারোহে। তারপর গ্রামের প্রধানরা বোধ হয় একে শিবের গাজনে পরিণত করেন, সকল জাতির হিন্দুর সমাবেশের জন্য। গ্রামের মণ্ডলদের কথা সকলেই মেনে নিয়েছেন। তারপর থেকে চৈত্র সংক্রান্তির ঈশানেশ্বরের গাজন হয়েছে প্রধান গাজন এবং কালাচাঁদ ধর্মের বৈশাখী উৎসব হয়েছে গৌণ। আর দুলেরা তাই চৈত্র ও বৈশাখের উৎসবের আরও পরে ধর্মপূজার বিধান করেছে জ্যৈষ্ঠে। ব্রাহ্মণরা ক্রমে গ্রামের মণ্ডল উগ্রক্ষত্রিয়দেরও দেয়াসী তন্তুবায়দের কাছ থেকে ঈশানেশ্বর ও কালাচাঁদের পূজার কর্তৃত্ব অনেকাংশে অধিকার করেছেন। তার ফলে, কোন একসময়ের আপসরফার জন্য মনে হয়, ঈশানেশ্বর শিব এখন দুই স্থানে থাকেন। ১৩ই চৈত্রের রাত্রি থেকে উৎসবান্ত পর্যন্ত মণ্ডলদের তত্ত্বাবধানে শিব গাজনতলার মন্দিরে থাকেন এবং বাকি সময়

থাকেন ব্রাহ্মণপাড়ার মন্দিরে। ব্রাহ্মণদের চাপে আরও একটি ঘটনা ঘটেছে। ঈশানেশ্বর শিব রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের মতন উচ্চবর্ণের কুলীন অভিজাত দেবতায় পর্যবসিত হয়েছেন। কিন্তু শিব তো তা হতে পারেন না। তাঁর উপর অধিকার সকলের সমান থাকা উচিত, বিশেষ করে গাজনের সন্ন্যাসীদের। কিন্তু সন্ন্যাসীরা তো কুলীন ব্রাহ্মণ নন। অথচ তাঁরা শিবকে কাঁধে করে গ্রাম প্রদক্ষিণ করবেন, শিবকে স্পর্শ করবেন, মাথায় ফুল চাপাবেন। অতএব, স্বয়ং ঈশানেশ্বর শিব এক পুত্রের জন্ম দিলেন, তিনিও শিব, নাম 'গাজনেশ্বর'। এই গাজনেশ্বরই জাতিধর্ম-নির্বিশেষে সন্ন্যাসীদের স্কন্ধে চেপে গ্রাম-গ্রামান্তর প্রদক্ষিণ করেন, এবং সকলের দ্বারা পূজিত ও স্পর্শিত হন।

কুড়মুনের গাজন এ-অঞ্চলের খুব বিখ্যাত গাজন। আগেই বলেছি, ১৩ই চৈত্র রাত্রি থেকে ঈশানেশ্বর ও গাজনেশ্বর মণ্ডলদের তত্ত্বাবধানে শিবতলার মন্দিরে অবস্থান করেন। শিবতলা বা গাজনতলা গ্রামের ঠিক মাঝখানে; ২৫শে থেকে ২৮শে চৈত্র (মাস বাড়লে ২৬শে থেকে ২৯শে) চারদিন শিব গ্রাম প্রদক্ষিণ করেন। গাজনেশ্বরই পালকি করে পাশাপাশি গ্রামে যান, সন্ন্যাসীরা পালকি বহন করেন। ২৮শে বা ২৯শে কুড়মুন পলাশী পাঁড়ুই গ্রামের সন্ন্যাসীরা গাজনতলায় জমা হন। নানারঙে মুখ চিত্রিত করে, সেজেগুজে নাচতে নাচতে তাঁরা আসেন। আগে যে মুখোস পরে নৃত্যের প্রচলন ছিল তা বেশ বোঝা যায়। এখন মুখোস করাও শক্ত, খরচও বেশি, তাই মুখ পেইণ্ট করা হয়। ঐদিন কুড়মুনের পূব, পশ্চিম ও উত্তরপাড়া থেকে মাটির পুতুল-প্রতিমা নিয়ে এসে, গাজনতলায় তিনদিকের তিনটি বাঁশের গ্যালারীতে সাজানো হয়। কুম্ভকার ও পটুয়ারা এই সব পুতুল তৈরি করে এবং এগুলিকে 'ছবি' বলা হয়। সাধারণত পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বন করে পুতুল তৈরি হয় এবং পাড়ায় পাড়ায় তার প্রতিযোগিতা হয়। গাজনতলায় পুতুল সাজানো হলে, সকলে একমত হয়ে যে পাড়ার কলানৈপুণ্যের শ্রেষ্ঠতা ঘোষণা করেন, সেই পাড়ার মৃৎশিল্পীদের কাঁধে করে নৃত্য করা হয়। এই তাঁদের পুরস্কার। তার আগে পাড়ায় পাড়ায় "খেস্তা" গান বলে একরকম গান হত। ঠিক কবিগান নয়, অথচ গানের টেকনিক অনেকটা কবিগানের মতন। একপাড়ার গায়করা অন্য পাড়ার একটা পূর্বনির্দিষ্ট স্থানে গান গেয়ে আসতেন, তারপর আর একদিন সেই পাড়ার লোক এসে এই পাড়ায় উত্তর দিয়ে যেতেন। এখনও খেস্তা গান

হয়, কিন্তু তার পূর্বেকার গৌরব আর নেই বিশেষ। পরদিন অর্থাৎ ২৯শে বা ৩০শে চৈত্র প্রত্যূষে শ্মশান-সন্ন্যাসীরা নরমুণ্ড নিয়ে উৎসব-নৃত্য করেন।

আসল নরমুণ্ড, নকল বা মাটির নয়। রাঢ়দেশের গাজনে আসল নরমুণ্ড নিয়ে উৎসব এখনও হয়। কুড়মুন গ্রামে হয়, পাশের পলাশী গ্রামেও হয়। শুনেছি, পূর্বস্থলী থানায় মেড়তলার গাজনেও নরমুণ্ডের নৃত্যোৎসব হয়। মুণ্ড-নৃত্য করার অধিকার সব সন্ন্যাসীর নেই, কেবল শ্মশান-সন্ন্যাসীদের আছে। মণ্ডলদের যৎকিঞ্চিৎ দক্ষিণা দিয়ে গ্রামের শ্মশান কিনতে হয়। মণ্ডলরা অনুমতি দিলে শ্মশান-সন্ন্যাসীদের প্রধান যিনি (বর্তমানে পরামাণিক) তিনি অধিকার মেনে নেন। সাধারণত এই অধিকার দেখা যায়, বংশানুক্রমিক। শ্মশান-সন্ন্যাসীরা নরমুণ্ড গ্রাম্য শ্মশান থেকে সংগ্রহ করে পুতে রাখেন মাটির তলায়। মধ্যে মধ্যে গিয়ে দেখে আসেন বা পাহারা দেন। একে 'শ্মশান-জাগানো' বলে। হাতে তলোয়ার নিয়ে নৃত্য করে, নরমুণ্ডে তেলসিঁদুর লেপন করে রাখতে হয়, এবং উৎসবের দিন শেষরাত্রে নিয়ে এসে গাজনতলায় নৃত্য করা হয়। গ্রামে মড়ক মহামারী হলে সদ্যোমৃতের টাটকা মুণ্ড তলোয়ার দিয়ে কেটে এনে আগে সন্ন্যাসীরা নৃত্য করতেন শুনেছি। এখনও ঐ রকম অবস্থার সৃষ্টি হলে সেই সুযোগ গ্রহণ করতে তাঁরা কুণ্ঠিত হন না। ভোর রাত্রে শ্মশান-সন্ন্যাসীদের এই দৃশ্যটি সত্যিই বীভৎস ও ভয়াবহ দেখায়। মনে হয়, একদল উন্মত্ত কাপালিক যেন নরমুণ্ডের নৃত্যোৎসবে মেতে উঠেছে। শিব শ্মশানে-মশানে থাকেন, ভূতপ্রেত তাঁর সহচর। শ্মশান-সন্ন্যাসীরা তাই শিবের সব চেয়ে নিকট-আত্মীয় এবং অন্যান্য শ্মশান-সন্ন্যাসীদের চেয়ে তাঁদের সম্মানও তাই বেশি। কুড়মুনের উগ্রক্ষত্রিয়, গোপ প্রভৃতিরা শৈবতান্ত্রিক ছিলেন। হাড়ি, বাগদী, দুলে, ডোম প্রভৃতি নিরঞ্জন ধর্মপন্থীদের উৎসবের সঙ্গে শৈবতান্ত্রিক উৎসবের মিলনমিশ্রণে ঈশানেশ্বর শিবের গাজন গড়ে উঠেছে। আগাগোড়া গাজনের সব অনুষ্ঠান দেখলে এই কথাই মনে হয়।

কুড়মুনে নদীতীরে একসময় গন্ধবণিক, সুবর্ণবণিক প্রভৃতিদেরও যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। শীলদের একটি ভগ্ন ইটের মন্দির আজও তার সাক্ষী দিচ্ছে। এই শীলদের ভদ্রাসনের সীমানার ভিতর পুকুর থেকে দ্বারস্তম্ভ পাওয়া গেছে। এছাড়া ঈশানপাড়ায় ঈশানেশ্বর শিবের যে মন্দির আছে, তার মধ্যে একটি চমৎকার পাথরের দেবীমূর্তি আছে। খুব প্রাচীন মূর্তি এবং মূর্তিটি ইন্দ্রাণীর।

ইন্দ্রাণী সপ্তমাতৃকার এক মাতৃকা। সপ্তমাতৃকার মূর্তি বাংলাদেশে যা পাওয়া গেছে তার মধ্যে চামুণ্ডার বিভিন্ন রকমের মূর্তিই (দন্তুরা চর্চিকা ইত্যাদি) বেশি। বর্ধমানেও চামুণ্ডামূর্তি অনেক পাওয়া গেছে। বারাহী মূর্তিও অনেক পাওয়া গেছে বাংলাদেশে। হুগলী জেলার দ্বারবাসিনীতে একটি বারাহী মূর্তি আছে। ব্রহ্মাণীর মূর্তি খুব বেশি পাওয়া যায়নি। যা পাওয়া গেছে তার মধ্যে একটি মূর্তি (দেবগ্রাম-নদীয়ার) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মিউজিয়মে আছে। কিন্তু ইন্দ্রাণীর মূর্তি খুবই দুষ্প্রাপ্য। রাজশাহীর মিউজিয়মে একটি মাত্র ইন্দ্রাণীর মূর্তি আছে।[১] কুড়মুনের ইন্দ্রাণী মূর্তিটি দুষ্প্রাপ্য তো বটেই, অনেক বেশি (রাজশাহীর মূর্তির চেয়ে) সুন্দর ও নিখুঁত। বর্ধমানে 'ইন্দ্রাণী' নামে প্রাচীন পরগণাও ছিল, কাটোয়া অঞ্চলে। চামুণ্ডার পূজারও খুব প্রচলন ছিল। ইন্দ্রাণীর মূর্তিও পাওয়া গেল কুড়মুনে। এই সব থেকে বোঝা যায় যে একসময়ে সপ্তমাতৃকার পূজার বেশ প্রচলন হয়েছিল রাঢ়দেশে।

---

১ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বাংলার ইতিহাস'—১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৫৫, প্লেট নং ৬৭, ছবি নং ১৬৩ দ্রষ্টব্য।

ইন্দ্রধ্বজের উৎসব

বাংলাদেশের অধুনালুপ্তপ্রায় এক বিচিত্র উৎসব এই ইন্দ্রধ্বজের উৎসব। রাঢ়দেশে, মেদিনীপুর বিষ্ণুপুর অঞ্চলে আজও ইন্দ্রধ্বজ উৎসবের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। ইঁদপূজা, ইঁদ পরবও বলা হয়। ভাদ্র মাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে ইন্দ্রধ্বজের উৎসব হয়। বিষ্ণুপুরের রাজারা যেভাবে উৎসবটি পালন করেন, তার বিবরণ দিচ্ছি প্রথমে। ভাদ্র মাসের প্রথম দিনে ফৌজদারবংশের কেউ তলোয়ার নিয়ে শোভাযাত্রা করে ঢাকঢোল বাজিয়ে শালবনে যান। বনে গিয়ে দু'টি শালগাছ কেটে নিয়ে আসেন। এখন আর ফৌজদারবংশের কেউ নিজে শালগাছ কাটেন না, শুধু তলোয়ার দিয়ে গাছ দু'টি স্পর্শ করে দেন, কাঠুরেরা কাটে। বিষ্ণুপুরে কৃষ্ণবাঁধের কাছে নির্দিষ্ট স্থানে শালগাছ দু'টি মাটিতে পাশাপাশি পোঁতা হয়। তারপর গাছ দু'টির সর্বাঙ্গে কাপড় জড়িয়ে, মাথায় একটি ছাতা দেওয়া হয়। বাঁশের বড় ছাতা, এখন ছোট ছত্রাকার ঝুড়িতে পরিণত হয়েছে। দ্বাদশীর দিন সকালে রাজবাড়িতে ঢাকঢোল বাজিয়ে ইন্দ্রধ্বজের উৎসব ঘোষণা করা হয়। রাজবাড়িতে অনন্তদেব শালগ্রামশিলার পূজা হয় এবং অনন্তদেবের সঙ্গে ফৌজদারদেরই গড়া একটি মাটির ইঁদও পূজা করা হয়। পুজো শেষ হলে রাজপুরোহিত অনন্তদেবসহ রাধাশ্যামের মন্দিরে যান। অপরাহ্নে বাদ্যভাণ্ডসহ রাজপুরোহিত ইঁদতলায় যাত্রা করেন (কৃষ্ণবাঁধের কাছে)। পুরোহিতের অনুগমন করেন রাজা। এখন আর প্রতি বৎসর রাজা নিজে যান না, মহাপাত্র গিয়ে ইঁদকাঠ দু'টি পূজা করেন। দণ্ডায়মান অবস্থায় শালগাছ দু'টি সাতদিন থাকে, তারপর ফেলে দেওয়া হয়। এইভাবে আজ ইন্দ্রধ্বজের উৎসব পালন করা হয় বিষ্ণুপুরে। ছোটখাট সামান্য একটা মেলাও বসে ইঁদতলায়।

পরিষ্কার বোঝা যায়, উৎসবটি এখনও যা রয়েছে তা আসল উৎসবের ধ্বংসাবশেষ মাত্র। আসল উৎসবের অনেকটা খাঁটি রূপ যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা অনেকে এখনও বেঁচে আছেন বিষ্ণুপুরে। তাঁদের মুখে যা শুনেছি তা আজ ইতিকথা মনে হলেও, ইতিকথা নয়, অতিকথাও নয়। শ্রাবণ-সংক্রান্তির দিনে রান্না পান্তা ভাত পয়লা ভাদ্র ভোজন করা হত। স্বয়ং বিষ্ণুপুরের রাজা

নতুন পোষাক-পরিচ্ছদ পরে, হাতে তলোয়ার নিয়ে গীতবাদ্য সহকারে শোভাযাত্রা করে অরণ্যে যেতেন। বিষ্ণুপুরের নাম ছিল বন-বিষ্ণুপুর। বন-বিষ্ণুপুরের বন হল শালবন। মেদিনীপুর থেকে বিষ্ণুপুর পর্যন্ত পথের ধারে ধারে সুবিস্তৃত শালবনের দিকে চেয়ে প্রাচীন মল্লভূমের বনময় রূপের কথা কল্পনা করতে একটুও কষ্ট হয় না। রাজা যেতেন শালবনে। শালবনে গিয়ে তিনি সবচেয়ে বড় বড় দু'টি শালগাছে তলোয়ার ছোঁয়াতেন। তারপর সূত্রধর ফৌজদাররা সেই গাছ দু'টি কেটে নিয়ে এসে 'ইঁদ' তৈরি করতেন। উৎসবের দিন ইঁদতলায় রাজা হাতির পিঠে চড়ে ঘুরতেন। হাজার হাজার সাঁওতাল নর-নারীর সমাবেশ হত ইঁদতলায়। সাঁওতাল নরনারীর নৃত্যগীতে মুখরিত হয়ে উঠত বন-বিষ্ণুপুর।

এ সব বেশিদিন আগেকার কথা নয়, সেদিনকার কথা। খুব বেশি হলে পঞ্চাশ বছর আগেকার। এখন আর সে উৎসব নেই, ম্লান হয়ে গেছে উৎসব। উৎসবের যে তাৎপর্য ও অর্থ ছিল তখন, এখন তাও নেই। এককালের গভীর অর্থপূর্ণ উৎসব আজ অর্থহীন হয়ে প্রাণহীন আচারে পরিণত হয়েছে। আজ আর তাই রাজা নিজে শালবনে বড় একটা যান না, এমন কি ইঁদতলাতেও সব সময় যাওয়া প্রয়োজন মনে করেন না। সাঁওতালরাও আজ আর দলে দলে এসে উৎসবে যোগদান করে না, নৃত্যগীতও হয় না। এখন আর সবচেয়ে বড় শালগাছ কাটা হয় না, সবচেয়ে ছোট শালগাছই কেটে এনে পোঁতা হয়। মানুষের ও সমাজের প্রয়োজন মিটে গেলে, উৎসব যত বড় ঐতিহাসিক উৎসবই হোক না কেন, তার পরমায়ু এইভাবে শেষ হয়ে যায়।

বিষ্ণুপুরের মতন মেদিনীপুরের কয়েকস্থানেও ইন্দ্রধ্বজের উৎসব হয়। মেদিনীপুর শহরের তিন মাইল পশ্চিমে কংসাবতী বা কাঁসাই নদীর অপরপারে ধারেন্দা পরগণা। শুক্লা দ্বাদশীতে ভাদ্র মাসে সেখানে ইঁদপূজা হয়। মাঠের মধ্যে শালগাছ পোঁতা হয়। শালগাছের মাথার উপর 'ইন্দ্রচ্ছত্র' নামে একটি বাঁশের তৈরি নতুন ছত্র কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। উৎসবের সময় সেই ছত্র লক্ষ করে খই-দই বর্ষণ করা হয়। রাতে নাচ-গান বাজনার অনুষ্ঠান হয়। আটদিন পরে ইঁদের বিসর্জন হয়।[১] ধারেন্দা বা কলাইকুণ্ডার পালবংশীয়

১ ত্রৈলোক্যনাথ পাল : মেদিনীপুরের ইতিহাস, ৪র্থ খণ্ড, ৭৭।

রাজারা সুখসমৃদ্ধির দিনে মহাসমারোহে ইন্দ্রধ্বজের পূজা করতেন।[১] যে মাঠে উৎসবটি হত তার নাম ছিল 'ইঁদকুড়ির ময়দান'। মেদিনীপুরের নাড়াজোলের রাজারাও প্রতি বছর মহাসমারোহে ইন্দ্রধ্বজের উৎসব করেন। মেদিনীপুর জেলার "জঙ্গল মহলেও" নানাস্থানে এই উৎসব হয়। মেদিনীপুর ছাড়া মানভূমের পঞ্চকোট রাজ্যে, বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরে জামকুড়ীতে, ছাতনায়, কুচিয়াকোলে এবং বর্ধমান ও বীরভূমের স্থানে স্থানে ইন্দ্রধ্বজের উৎসব হয়। সাধারণত রাজা ও রাজবংশের মধ্যেই উৎসবটি সীমাবদ্ধ দেখা যায়।

ইন্দ্রধ্বজ পূজা যেদিন হয়ে থাকে, পঞ্জিকায় সেই দিনটিকে "শক্রোত্থান" বলে উল্লেখ করা হয়। পৌরাণিক কাহিনী হল, দেবরাজ ইন্দ্র অসুর-যুদ্ধে পরাজিত হবার পর বিষ্ণু তাঁকে ঘণ্টা মাল্য ও ছত্রযুক্ত যে দীপ্তিমান ধ্বজ দান করেছিলেন, তারই সাহায্যে ইন্দ্র যুদ্ধে জয়লাভ করেছিলেন। তারপর থেকে তিনি বিধান দেন, যে-রাজা এই ধ্বজপূজা করবেন তাঁর ধন, বল ইত্যাদি বৃদ্ধি হবে এবং তিনি সকল কাজে সিদ্ধিলাভ করবেন। অর্থাৎ পৌরাণিক কাহিনীর অর্থ হল এই যে, ইন্দ্রধ্বজপূজা বিজয়ধ্বজ পূজা এবং রাজার পূজা।

মহাভারতে ইন্দ্রধ্বজপূজার একটি কাহিনী আছে। রাজা উপরিচরবসু প্রথমে ইন্দ্রধ্বজপূজার প্রচলন করেন। মাটিতে একটি বেণুযষ্টি প্রোথিত করে তাতেই ইন্দ্রের পূজার ব্যবস্থা করা হত। বছরের মধ্যে মাত্র একদিন এইরকম পূজার বিধান ছিল। ইন্দ্রধ্বজপূজার পরের দিন বস্ত্র গন্ধ মাল্য প্রভৃতি উপচারে হংসরূপী ইন্দ্রের পূজার নিয়ম ছিল। টীকাকার নীলকণ্ঠ লিখেছেন যে, মহারাষ্ট্রাদি দেশে ইন্দ্রধ্বজ প্রোথিত করা হয়।[২]

ততঃ প্রভৃতি চাদ্যাপি যষ্টেঃ ক্ষিতিপসত্তমৈঃ।
প্রবেশঃ ক্রিয়তে রাজন্ যথা তেন প্রবর্তিতঃ॥

ইন্দ্র কে? দেবতাদের মধ্যে যিনি রাজা তিনিই ইন্দ্র, তিনিই বাসব, তিনিই শতক্রতু, তিনিই পুরন্দর। দেবতাদের শাসনকর্তা তিনি। মহাভারতে একথাও বলা হয়েছে যে "ইন্দ্র" একটি উপাধি মাত্র। যিনি দেবতাদের রাজা তাঁকেই 'ইন্দ্র' নামে অভিহিত করা হয়—"বহূনীন্দ্রসহস্রাণি সমতীতানি বাসব।"

১ শ্রীযোগেশচন্দ্র বসু: মেদিনীপুরের ইতিহাস, ২য় সং, ৬১০-৬১১।
২ সুখময় শাস্ত্রী: মহাভারতের সমাজ, ২৪২-২৪৩।

ইন্দ্র যদি উপাধি হয় এবং দেবতাদের রাজা যিনি তাঁর উপাধি হয়, তাহলে মানুষের রাজার পক্ষেও তাঁর ধ্বজপূজা করা আশ্চর্য নয়। দেবতাদের রাজা যুদ্ধে জয়লাভ করে ধ্বজোৎসব করেছিলেন, অর্থাৎ বিজয়কেতন উৎসব করেছিলেন। মর্ত্যলোকের মানুষের রাজাও যুদ্ধে জয়লাভ করে উৎসব করতে পারেন। বিশেষ করে বাংলাদেশের রাজারা তো নিশ্চয় পারেন, কারণ দেবতা-মানুষের এমন পরমাত্মীয়ের সম্পর্ক বাংলাদেশের মতন আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। দেবতারা বাংলাদেশে সহজেই মানুষের মতন আচরণ করতে পারেন, আবার মানুষেরাও অনায়াসে দেবতা হয়ে যান।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, ইন্দ্রধ্বজোৎসব রাজাদের বিজয়োৎসব। রাজা উপরিচরবসু প্রথমে এই উৎসবের প্রচলন করেছিলেন। সেও তো অনেক দিনের কথা হওয়া উচিত। অর্থাৎ দীর্ঘকাল ধরে এই উৎসব চলে আসছে। মানুষের সমাজে অর্থাৎ আমাদের দেশের সমাজে রাজারাজড়াদের আবির্ভাব হয়েছে যখন থেকে এবং রাজায় রাজায় যুদ্ধ চলেছে যতদিন, ততদিন থেকে এই বিজয়োৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কিন্তু এটা কি কেবল রাজাদেরই বিজয়োৎসব? তা মনে হয় না। কারণ গোবর্ধন আচার্যের একটি উক্তি থেকে মনে হয় যে, সেকালে সাধারণ ধনিক বণিকরাও প্রধানত শক্রধ্বজ প্রতিষ্ঠা করতেন এবং পূজা করতেন। কবি দুঃখ করে বলছেন—[১]

তে শ্রেষ্ঠিনঃ ক্ব সম্প্রতি শক্রধ্বজ যৈঃ কৃতস্তবোচ্ছ্রায়ঃ।
ঈষাং বা মেঢ়িং বাধুনাতনাস্বাং বিধিৎসন্তি।

"হে শক্রধ্বজ, সম্প্রতি কোথায় সেই শ্রেষ্ঠীরা যারা তোমাকে উন্নত করে গিয়েছিল। এখনকার লোক তোমাকে লাঙ্গলের ইষ অথবা গরু বাঁধবার গোঁজ করতে চায়।"

একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর কথা। গুরুত্বপূর্ণ উক্তি গোবর্ধন আচার্যের। তাঁর কথা থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, শুধু রাজারা ধ্বজোৎসব করতেন না, ধনিক বণিকরাও এই উৎসব করতেন। আরও লক্ষণীয় হল, কবি দুঃখ করে বলছেন—হে শক্রধ্বজ, কোথায় সেই শ্রেষ্ঠীরা যারা তোমাকে উন্নত করে গিয়েছিল। অর্থাৎ দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যেই ইন্দ্রধ্বজ উৎসবের সমারোহ

১ সুকুমার সেন: প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী, ৩৬ পৃষ্ঠা।

রীতিমত ম্লান হয়ে এসেছিল। উৎসবে এতদূর ভাঁটা পড়েছিল যে, ইন্দকাঠ নিয়ে লোকে লাঙ্গলের 'ইষ' অথবা গরু বাঁধবার গোঁজ তৈরি করত। গোবর্ধন আচার্যের এই খেদোক্তি থেকে বাংলাদেশের তাৎকালিক অর্থনৈতিক অবস্থার একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায় এবং বোঝা যায়, সামাজিক উৎসব-পার্বণের সঙ্গে অর্থনৈতিক অবস্থার সম্পর্ক কতটা ঘনিষ্ঠ। ইন্দ্রধ্বজের পূজা কেবল রাজারাই যে করতেন তা নয়। ধনৈশ্বর্য কামনা করে দেশের শ্রেষ্ঠীরা বা বণিকরাও করতেন। দ্বাদশ শতাব্দীতে এই বাণিজ্যের অবনতি ও বণিকদের দুর্গতির জন্যই যে প্রধানত ইন্দ্রধ্বজের উৎসবে ভাঁটা পড়েছিল, তাও বোঝা যায়।

তাহলে ইন্দ্রধ্বজ উৎসব কি রাজার বিজয়োৎসব ও ধনিক বণিকের ধনৈশ্বর্য ও সমৃদ্ধির উৎসব? তা যদি হয়, তাহলে শালবনের শালগাছটি কি, এবং শালগাছের মাথায় ছত্রটিই বা কি? শালবনে যাওয়া এবং শালগাছ কাটা কিসের স্মৃতি বহন করছে? ছত্রই বা কিসের স্মৃতি? উৎসবে সাঁওতালদের ও অন্যান্য আদিম অনগ্রসর জাতির সমাবেশের ও যোগদানেরই বা কারণ কি?

সাঁওতালদের উৎসব-পার্বণের তথ্য অনুসন্ধান করতে করতে প্রায় একশ বছর আগে লেখা কোন প্রত্যক্ষদর্শীর একটি বিবরণ দেখতে পেলাম। ইন্দ্রধ্বজ উৎসব প্রসঙ্গে বিবরণটি অত্যন্ত মূল্যবান বলে এখানে উল্লেখ না করে পারছি না। ১৮৬৭ সালে প্রকাশিত ই. জি. ম্যান সাহেবের লেখা সাঁওতালদের একটি বিবরণ আছে। তার মধ্যে "ছত্তা বোঙ্গা" ও "ছাতোম্ পরব" বলে একটি সাঁওতালী উৎসবের বিবরণ তিনি দিয়েছেন। বোডিং (Bodding), ক্যাম্বেল প্রভৃতি পাদ্রি সাহেবদের লেখা আরও অনেক মূল্যবান গ্রন্থ আছে সাঁওতালদের সম্বন্ধে, কিন্তু আর কোথাও এই উৎসবটির কথা কেউ উল্লেখ করেননি। মনে হয় উৎসবটির প্রচলন পরে ক্রমেই কমে যায় এবং আরও পরে একেবারে লুপ্ত হয়ে যায়। ম্যান্ সাহেবের বিবরণটি এই:[১]

The Chatta Banga festival takes place during the rains ...At a given signal a pole, some twelve cubits long, is erected...On the top of the revolving pole is tied a small ornamented umbrella...Upon the erection of the pole, which is hailed with shouts and other noisy demonstra-

১ E. C. Man : Sonthalia and the Sonthals, P. P. 54-56.

tions of delight, the people gather handfuls of dust and dirt and forthwith begin to pelt the umbrella. This novel mode of veneration is at the same time accompanied with war dances by the men, the women also performing the usual marriage dance.

এই বিবরণ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, ইন্দ্রধ্বজ উৎসব মূলত বিজয়োৎসব, কিন্তু আদিম জাতির বিজয়োৎসব। বিভিন্ন আদিম জাতির মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ প্রায় হত এবং সেই যুদ্ধে জয়-পরাজয়ও হত। বিজয়ী জাতি দলবদ্ধভাবে উৎসব করত। কৌমপতি বা গোষ্ঠীপতি (পরবর্তীকালের রাজা) যে নতুন অধিকার পেতেন, তারই প্রতীক ঐ 'ছত্র', আমাদের দেশের (আরও অনেক দেশের) দীর্ঘকালের রাজ-প্রতীক। সামরিক নৃত্যগীতোৎসবের কারণও তাই। তারই সঙ্গে আদি-অকৃত্রিম বৃক্ষপূজা এবং ফলনশক্তিবৃদ্ধির কামনা উৎসবও (fertility cult) অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত আছে। বর্ষাকালে তাই উৎসবটি অনুষ্ঠিত হয় এবং পশ্চিমবাংলায় শালবন ও শালগাছও তাই অনুষ্ঠানের অপরিহার্য উপকরণ। এই আদিম কৌম-উৎসবই পরবর্তীকালে বৈদিক ও পৌরাণিক যুগে দেবরাজ ইন্দ্রের ধ্বজোৎসবে পরিণত হয়েছে এবং ধীরে ধীরে সমাজে ধনবল ও সুখসমৃদ্ধির কামনা-উৎসব এবং বিজয়োৎসবের রূপ নিয়েছে। তারপর ধনৈশ্বর্য ও সুখসমৃদ্ধির অবনতির যুগে, দেশের দুর্দিনে এই উৎসবে স্বভাবতঃই ভাঁটা পড়েছে।

ভাদু ও সয়লা উৎসব

ভাদু ও সয়লা পশ্চিমবঙ্গের দুটি বিচিত্র লোকোৎসব। বিশেষ অঞ্চলের মধ্যে উৎসব দুটি আজও সীমাবদ্ধ। মানভূম পুরুলিয়া পঞ্চকোট থেকে বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুর ও বীরভূমের সিউড়ী পর্যন্ত ভাদু উৎসবের প্রধান কেন্দ্র। কেন্দ্রের বাইরেও এই উৎসব অন্যত্র কিছুটা প্রচলিত হয়েছে, কিন্তু উৎসবের লোকপ্রিয়তা মোটামুটি এই অঞ্চলেই সীমিত। সয়লা উৎসব মেদিনীপুরের ঘাটাল ও হুগলী আরামবাগ মহকুমার কয়েকটি স্থানে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের গভীর সাংস্কৃতিক তাৎপর্য আছে।

ভাদু উৎসব একসময় মানভূম ও বাঁকুড়া অঞ্চলের বাউরী ও সমশ্রেণীর অন্যান্য জাতির প্রধান উৎসব ছিল। ভাদ্রমাসের শেষ দুইদিনে মহাসমারোহে উৎসবের সমাপ্তি হত। ভাদ্রের গোড়াতে ঘরে ঘরে ভাদুর কুমারীমূর্তির প্রতিষ্ঠা হত, নৃত্যগীত অনুষ্ঠানের সঙ্গে। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় মেয়েরা ভাদুর চারিদিকে সমবেত হয়ে নাচগান করত। মন্ত্র পড়ে ভাদুর পূজা হত না। নৃত্যগীতই ভাদুর উৎসবের প্রধান অঙ্গ।

ভাদুপূজার বর্তমান রূপ বেশিদিনের প্রাচীন নয়। একশ বছর আগে, পঞ্চকোটে এই উৎসবের উৎপত্তি হয়।[১] শোনা যায়, পঞ্চকোটের রাজার একটি কন্যা ছিল। যেমন সুন্দরী, তেমনি হৃদয়বতী। বাউরী ও অন্যান্য উপেক্ষিত শ্রেণীর লোকের প্রতি গভীর মমতা ছিল তার। অল্পবয়সেই রাজকন্যার মৃত্যু হয়। কাশীপুরের বাউরী ও অন্যান্য গ্রাম্য সাধারণ লোক রাজকন্যার স্মৃতি-উৎসবের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে। ভাদ্রমাসে রাজকন্যার মৃত্যু হয় বলে, উৎসবেরও আয়োজন করা হয় এই সময়। উনিশ শতকের মধ্যভাগে কোন সময় থেকে এই ভাদু উৎসব প্রচলিত হয় এবং ক্রমে পঞ্চকোট কাশীপুর থেকে সংলগ্ন স্থানগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে ?

নৃত্যগীতই ভাদু উৎসবের প্রধান অঙ্গ। ছড়া রচনা করে গান করা হয়।

১ The Bhadu and the Bauris: By Upendra Chandra Mukherjee, Bankura (Proceedings, Asiatic Society of Bengal, 1873, P. P. 202-205)। ছড়াগুলি উপেন্দ্রচন্দ্রের সংগৃহীত।

মেয়েপুরুষে একসঙ্গে গান ও নৃত্য করে। প্রায় একশ বছর পূর্বে রচিত ভাতু উৎসবের একটি ছড়া উদ্ধৃত করছি :

রাজকুমারী ভাতু আমার দুঃখের মর্ম জানে না।
সুকালো দুদেরি গলা আ মরি কাঁচা সোনা॥
হেদে যাব, পোদ্দার আনবো, গড়িয়ে দিব সিংহাসন।
তার মধ্যে খেলা করে রাজকুমারী ভাতু ধন॥

ভাতু আমার গরবিণী, হায় গো সোনার নথখানি।
গায়ে দিব মল মল চাদর, বুকে দিব জামদানী॥

বেলা গেলো, সন্ধ্যা হোলো মাথা বান্ধ মা জননী।
আর কেন্দো না ও গো ভাতু আর পাঠব না আমি॥

কার বাড়ীতে ছিলে ভাতু কে করেছে পূজা গো।
বুকে মায়ের রক্তচন্দন পায়ে লাল জবা গো॥

ভাতু আমার মান করেছে মানে গেল সারারাত।
মানের কপাট ভাঙ্গ ভাতু পায়ে পড়ে প্রাণনাথ॥

এনেছি বনেরি ফুল সুগন্ধ মালতী গো।
ভাতুর গলে হার গাঁথিব বসাইয়া গো॥

অগুরু চন্দন ঘষে দিব ভাতুর বদনে।
বাঁকা করে বেন্ধ বেণী কাজল দিব নয়নে॥

ভাতু আমার গরবিণী, ভাতু আমার প্রাণের ধন।
না দেখতে পেলে ঘনে ঘনে অচেতন॥

পরবর্তীকালে ভাতুপূজা বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুর, বীরভূম অঞ্চলে প্রায় সর্বশ্রেণীর ও সর্বস্তরের লোকের মধ্যে প্রচলিত হয়েছে। ভাতু উৎসবের উৎপত্তি ও প্রচলনের ধারা থেকে এইটুকু বোঝা যায় যে গ্রাম্য উৎসবের উৎসের ও বৈচিত্র্যের অন্ত নেই। উৎস যত সংকীর্ণ, উৎসবের সীমানাও তত সীমাবদ্ধ।

'সয়লা' উৎসব হল বন্ধুত্বের উৎসব। বাংলাদেশের উচ্চসমাজেও সই পাতানো, মিতা পাতানো, কিছুদিন আগেও খুব প্রচলিত ছিল। মেয়ের সঙ্গে

মেয়ের, পুরুষের সঙ্গে পুরুষের বন্ধুত্ব পাতান চলত। বন্ধুত্বের মধ্যে কোন জাতিবিচার ছিল না। ব্রাহ্মণ বা কায়স্থের সঙ্গে মাহিষ্য পৌণ্ড্রক্ষাত্রিয় ও অন্যান্য যে-কোন বর্ণের লোকের স্বচ্ছন্দ বন্ধুত্ব পাতান চলত। বন্ধুত্বের পর রক্তসম্পর্কের মতন আত্মীয়তার সম্বন্ধ স্থাপিত হত। পরিষ্কার বোঝা যায়, বাংলাদেশে 'বন্ধুত্ব' (Friendship) এককালে একটি সামাজিক 'ইনস্টিটিউশন' ছিল। সমাজ-জীবনে তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও ছিল। বর্তমানের বিলীয়মান সয়লা উৎসবের মধ্যে তারই অবশেষ রয়েছে।

সয়লা উৎসব প্রধানত ঘাটাল ও আরামবাগ অঞ্চলেই এখন সীমাবদ্ধ। আগে হয়ত উৎসবের সীমানা আরও বিস্তৃত ছিল। এখন দশবারো বছর অন্তর গ্রাম্যদেবতার স্থানে উৎসবের আয়োজন হয়। গ্রাম্যদেবতার পূজারী বা গ্রামের কর্তাব্যক্তি কেউ ঘোষণা করেন যে 'অমুক' সময় সয়লা উৎসব হবে। ঘোষণার পর গ্রামের যে-কোন জাতির ও শ্রেণীর লোক যার সঙ্গে ইচ্ছা বন্ধুত্ব পাতানোর জন্য 'উপহার' পাঠাতে পারেন। বিত্তগত বা জাতিগত কোন অন্তরায় থাকতে পারে না বন্ধুত্বের পথে। উপহার পাঠালেই তা গ্রহণ করতে হবে, এবং গ্রহণ করার অর্থ হল, বন্ধুত্বের প্রস্তাব গ্রহণ করা। এইভাবে কয়েকটি গ্রাম জুড়ে বন্ধু-নির্বাচন চলতে থাকে। উৎসবের দিনে সকলে পূর্বনির্দিষ্ট স্থানে (সাধারণত গ্রামদেবতার স্থানে) সমবেত হন। পূজা ও আনন্দানুষ্ঠানের মধ্যে বন্ধুত্বের উৎসব শেষ হয়।

মানবসমাজ ও সংস্কৃতির ইতিহাসে 'বন্ধুত্বের' এই 'ইনস্টিটিউশন' ও অনুষ্ঠান যে কতকালের প্রাচীন, তা বলা যায় না। নৃবিজ্ঞানীরা অনুমান করেন, এটি আদিম সমাজের একটি প্রাচীনতম 'ইনস্টিটিউশন'। আফ্রিকার নিগ্রোদের মধ্যে 'বন্ধুত্বের' এই সামাজিক বন্ধন অত্যন্ত প্রবল দেখা যায়।[১] তাই যদি হয় তাহলে সয়লা উৎসব উপেক্ষণীয় নয়। বাংলার সংস্কৃতির ইতিহাসে অনাদৃত ও স্বল্পপরিচিত সয়লা উৎসবের তাৎপর্য গভীর।

১ Melville J. Herskovits: Man and His Works, the Science of Cultural Anthropology (1949)। হার্কোভিট্‌স এবিষয়ে আফ্রিকার নানাস্থানে অনুসন্ধান করেছেন এবং 'বন্ধুত্ব' সম্বন্ধে অনেকগুলি মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেছেন।

প্রান্তিক

পশ্চিমবঙ্গে মানবজাতির এমন কয়েকটি বিচ্ছিন্ন টুকরো আছে যারা আজও সভ্যসমাজ থেকে দূরে দ্বীপান্তরিত হয়ে কোনরকমে জীবনধারণ করছে। তারা দরিদ্র ও অসহায়। ইতিহাসের যুগসন্ধিক্ষণে তারা হয়ত কখন মানুষের মতন বাঁচার আশায় ধর্মান্তরিত হয়েছে, কখন পাইক-লাঠিয়াল-তীরন্দাজ হয়ে পররাজ্য-লোলুপ রাজা-রাজড়াদের সেনাবাহিনীর সঙ্গে দেশ থেকে দেশান্তরে যাত্রা করেছে। এইভাবে জাতি-সম্প্রদায়-সমাজ থেকে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। সংস্কৃতিধারার এমনই বৈশিষ্ট্য যে একবার তার কোন অংশ যদি বাঁধাধরা ছক থেকে ছিন্ন হয়ে যায়, তাহলে সেই ছিন্নাংশকে সহজে আর পুরনো ছকে পুনরায় খাপ খাওয়ানো যায় না। এই সব মানুষের আজ "ঘরেও নহে, পারেও নহে" অবস্থা হয়েছে। সংস্কৃতির ইতিহাসে এদের আমরা "কালচারাল ল্যাগ" ও "কালচারাল স্ল্যাগ", দুইই বলতে পারি। বৃহত্তর দেশীয় সংস্কৃতি এবং ক্ষুদ্রতর গোষ্ঠী-সংস্কৃতি উভয়েরই প্রান্তে এদের অবস্থান। এগুলিকে তাই সংস্কৃতিক্ষেত্রের 'প্রান্তিক' নিদর্শনও বলা যেতে পারে। মেদিনীপুরে এরকম কয়েকটি জাতি আছে, কাকমারা, কলমাদার ইত্যাদি, যারা আজ কৌতূহলের পাত্র হলেও সংস্কৃতির এই প্রান্তিক নিদর্শন ছাড়া কিছু নয়। তাদের কথাই বলব।

খেজুরী থেকে হাঁটাপথে নন্দীগ্রাম থানার অন্তর্গত আমদাবাদ গ্রাম। পটুয়া, কাকমারা, কলমাদার প্রভৃতি নানারকমের জাতি-উপজাতি নন্দীগ্রাম থানায় বাস করে। পথে যেতে মাঠে-মাঠে একদল লোক দেখলাম, যাদের এরকম পরিবেশে হঠাৎ দেখবার কথা নয়। এদিককার গ্রামগুলির দূরত্ব এত বেশি এবং এত বড় মাঠ ভেঙে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যেতে হয় যে, মাঠের মধ্যে হঠাৎ কারও বসতি দেখলে সত্যিই চমকে উঠতে হয়। যাদের কথা বলছি, তাদের বসতি বলে অবশ্য কিছু নেই, ছোটখাট কোন নগণ্য গ্রামও তাদের নিয়ে গড়ে ওঠেনি কোথাও। সাধারণত গ্রামের প্রান্তে বা উপকণ্ঠে তারা এক-এক দল বাস করে, ঠিক উচ্ছিষ্ট ও আবর্জনার মতন। তাদের চাল-চলন, পোষাক-পরিচ্ছদ, ধরন-ধারণ, খাদ্য-পানীয় সবই বেখাপ্পা ধরনের। এদেরই নাম 'কাকমারা'। শুনিনি কখনও এরকম নাম। কাকমারাও একটি নাম এবং

মানুষেরই দেওয়া নাম। কাক যারা মারে তাদের বলে 'কাকমারা'। এতদিন শুনেছি, কাকের মাংস অখাদ্য, কোন জন্তুও স্পর্শ করে না। জন্তুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ জন্তু মানুষও কাক শীকার করে রীতিমত এবং শীকার করে খায়। এমন মানুষ আছে এবং বর্তমানে তারা বাংলাদেশের মেদিনীপুরেই থাকে, যাদের সবচেয়ে প্রিয় খাদ্য হল কাকের মাংস। লোকে তাই তাদের নাম দিয়েছে কাকমারা। নিজেরা এরা তেলিঙ্গা বলে পরিচয় দেয়, বলে যে অনেকদিন আগে এরা নাকি কাঁথি অঞ্চলে ছিল। কাক, শেয়াল, গোসাপ, শূয়োর, বেজী, বাদুড়, বাখরোল মাখরোল ইত্যাদি নানারকমের জন্তুর মাংস খায়, খায় না কেবল গোমাংস। ট্যাবুর মতন ট্যাবু। যারা এতরকমের মাংস খায়, তারা গোমাংস খায় না। ট্যাবুর তাৎপর্য আছে। দক্ষিণভারতীয় তেলেগুভাষী জাতির একটি বিচ্ছিন্ন যাযাবর অংশ এরা, হিন্দু-সংস্কৃতির অনেক বিধিনিষেধ পালন করে। পোষাক এক বিচিত্র ধরনের। পালক মালা, চিত্রিতবিচিত্রিত ছেঁড়া ন্যাকড়াকানি, শামুক, ঝিনুক, সব দিয়ে অদ্ভুতভাবে দেহটিকে এরা আচ্ছাদন করে থাকে। কোন ক্লাউনের বা বাহারে সঙের পোষাকেও এত বৈচিত্র্য নেই এবং এত পরস্পরবিরোধী সাজের সামঞ্জস্য নেই। শীকার ও ভিক্ষাবৃত্তিই এদের একমাত্র অবলম্বন। কোথাও কখন স্থায়ীভাবে এরা বসবাস করে না। মাঠে মাঠে ঘুরে কাক বেজী আর বাদুড় মেরে, যাযাবর জীবনের দিনগুলি এরা নির্বিকারচিত্তে কাটিয়ে দেয়। কোন সভ্য উৎসব-পার্বণেও যোগ দেয় না। শীকারের হাতিয়ার, লাঠি নরাজ ও ফাঁদ নিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। সঙ্গে কুকুর থাকে। শীকারের সন্ধান এনে দেয় কুকুর। নরাজ ফাঁদ দিয়ে বেজী, বাদুড়, কাক শীকার করে, ফিরে আসে মাঠের চলন্ত ডেরায়। মাংস আগুনে পুড়িয়ে খায়। আর সবচেয়ে বিস্ময়কর হল, এহেন যাযাবর কাকমারাদেরও নিজেদের পুরোহিত আছে। অর্থাৎ সমাজ একটা তাদেরও আছে (বা একদা ছিল) এবং তার একটা গড়নও আছে (বা ছিল)। পরিষ্কার বোঝা যায়, তাদের নিজেদের সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তারা ভেলার মতন ভেসে-ভেসে বেড়াচ্ছে, কোন বাঁধা ঘাটেই ভিড়তে পারছে না।

প্রশ্ন হল কারা এরা এবং মেদিনীপুরের এসব অঞ্চলে এরা এলই বা কেমন করে? ইতিহাসের এ প্রশ্ন ছাড়াও, নৃবিজ্ঞানের কৌতূহলী ছাত্রদের মনে কাকমারাদের সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন জাগবে। দক্ষিণভারতীয় কোন যাযাবর

শীকারজীবী আদিম জাতির কেন্দ্রচ্যুত একটা অংশবিশেষ যে কাকমারারা, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তারা কৃষিজীবী নয়, ছিলও না। দক্ষিণভারত থেকে একাধিক ঐতিহাসিক অভিযান হয়েছে বাংলাদেশে এবং যে-পথে হয়েছে, সে হল মেদিনীপুরের এই পথ। এইসব সামরিক অভিযানের সময় দক্ষিণ-ভারতের এই সব আদিবাসী পাইক তীরন্দাজ হয়ে, অথবা বিপুল সাজ-সরঞ্জামের বাহক হয়ে বাংলাদেশে এসেছে। রাজার রাজকীয় অভিযান শেষ হয়ে গেছে, যখন, উচ্ছিষ্ট ও আবর্জনার মতন তাদের ফেলে রেখে তাঁরা স্বদেশে ফিরে গেছেন। সেইদিন থেকে তারা উভয়প্রান্তে বাস করছে, ভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশে।

কাকমারারা ছাড়াও, মেদিনীপুর জেলায় শিয়ালগিরি, কল্‌মাদার প্রভৃতি আরও কয়েকটি বিচ্ছিন্ন জাতি আছে, যারা ইতিহাসের চলার পথে উৎক্ষিপ্ত আবর্জনার মতন। শিয়ালগিরিদের শিয়ালের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই, গিরির সঙ্গে ছিল বলে মনে হয় এককালে। প্রধানত দাঁতন থানাতেই তাদের বাস। জনশ্রুতি হল, মারাঠা হাঙ্গামার সময় তারা নাকি রসদবাহী হয়ে মারাঠী সেনাদের সঙ্গে এদেশে এসেছিল এবং পরে কোন কারণে তাদের সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়ায় আর তারা দেশে ফিরে যায়নি। অনেকে বলেন, তারা ভীল জাতির বংশধর। নির্দিষ্ট পেশা বলে এখন বিশেষ কিছু নেই। কেউ হাটে মাছ তরিতরকারী বিক্রি করে, কেউ চাষবাস করে খায়, কেউ বাঁশের জিনিসপত্র তৈরি করে। হিন্দু বলেই নিজেদের পরিচয় দেয় এরা। কিন্তু ব্রাহ্মণরা এদের পৌরোহিত্য করেন না। তাছাড়া, সামাজিক আচারের দিক থেকেও হিন্দুসমাজের সঙ্গে এদের পার্থক্য আছে। এদের মধ্যে বিধবা-বিবাহের সামাজিক প্রচলন আছে। হিন্দুরা শবদাহ করেন, শিয়ালগিরিদের মধ্যে দাহ করার পরিবর্তে মৃত্তিকাগর্ভে শব প্রোথিত করার প্রথা প্রচলিত। এগুলি সংস্কার ও আচারের দিক থেকে খুব গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য এবং সংস্কার ও আচার নিয়েই সংস্কৃতি। সংস্কৃতির এই গড়নের পার্থক্য দেখে মনে হয়, শিয়ালগিরিরাও বাংলার বাইরে থেকে এদেশে এসে, মূল কোন আদিম জাতির সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাস করছে। কাকমারাদের সঙ্গে তাদের তফাৎ হল এই যে কাকমারারা একদা আরও আদিম স্তরে ছিল, কোনদিক থেকেই তারা বাইরে সমাজের সঙ্গে খাপ খায়নি। শিয়ালগিরিরা উন্নত সমাজের সঙ্গে নিজেদের

অনেকটা খাপ খাইয়ে নিয়েছে। কেবল কয়েকটি আচার-ব্যবহারের মধ্যে আজ তাদের অতীতের পরিচয় পাওয়া যায়।

কল্‌মাদার নামে আর একটি জাতি আছে মেদিনীপুরে, যারা অনেকদিক থেকে আরও বেশি কৌতূহল জাগায়। নন্দীগ্রাম, খেজুরী ও কাঁথি থানাতেই তাদের বাস বেশি। আমদাবাদ থেকে মাইল দুই দূরে কৃষ্ণনগর গ্রামে পাঁচ-ছয় ঘর কল্‌মাদারের বাস আছে। তাদের কাছ থেকে সন্ধান করে যেটুকু জেনেছি তাতে মনে হয় নন্দীগ্রাম থানাতেই তাদের বাস বেশি। নন্দীগ্রাম থানায় কুলোপাড়ায় দশ ঘর, ঘোলদায় সাত ঘর, রাণীচকে চার ঘর, মুরাদিপুরে দশ ঘর, ধান্যখোলায় পাঁচ ঘর, খড়িগেড়িয়ায় দু'ঘর, খেজুরি থানায় বেগনেবাড়িতে পঁচিশ-ত্রিশ ঘর, কুষ্টপুর কসতলায় চার পাঁচ ঘর, কাঁথি থানায় কিছু—এই হল কল্‌মাদারদের বসবাসের মোটামুটি হিসেব। এপারে কাকদ্বীপ প্রভৃতি অঞ্চলেও কিছু কিছু কলমাদারের বাস আছে। কলমাদাররাও একসময় কোন শিকারী জাতি ছিল বলে মনে হয়। শীকার আজও একেবারে এরা পরিত্যাগ করেনি। শীকারের মধ্যে এদের বৈশিষ্ট্য হল, পাখি শীকার। লম্বা লম্বা সরু বাঁশের নলা দিয়ে, বাটুল বা গুলতি দিয়ে কল্‌মাদাররা পাখী শীকার করে। মেয়েরা পাড়ায় পাড়ায়, গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঝুড়িতে নানারকম মনোহারী জিনিসপত্র সাজিয়ে নিয়ে মাথায় করে বিক্রী করে বেড়ায়। সাধারণত মেয়েরাই এদের খরিদ্দার। পুরুষরা যখন বাড়িতে থাকে না, তখন দুপুর বেলা তারা গ্রাম্য মেয়েদের কাছে গিয়ে মনোহারী জিনিস বেচে বেড়ায়—মাথার কাঁটা, চুলের ফিতে, চিরুণী, গন্ধতেল, সাবান, আলতা ইত্যাদি। আজকাল পুরুষরা অনেকে চাষবাস করে, ক্ষেত মজুরের কাজ করে, ছাতা সারায়, থালা ঘটি বাটি সারায়, চাবি সারায়। এরই ফাঁকে মধ্যে মধ্যে নলা দিয়ে শীকার করতে বেরোয়।

পেশা যাই হোক, জাতি হিসেবে এরা আরও বেশি বিচিত্র। না হিন্দু, না মুসলমান, পশ্চিমবঙ্গের পটুয়াদের মতন ঠিক। কৃষ্ণনগরের কলমাদাররা পীরের পুজো করে এবং গ্রামে বড়খান পীরের আস্তানাও আছে। বিয়ে হয় নিজেদের মধ্যে। নমাজ পড়ে। মুসলমানদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি সবই চলে, কেবল বিবাহ বা কন্যাদান চলে না। খুব চমকপ্রদ। আরও উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল, পটুয়াদের সঙ্গে কলমাদারদের হুঁকো চল আছে, বিবাহের চল নেই, কন্যাদান নেই। বিয়ের সময় হিন্দুদের মতন গায়ে

হলুদ হয়, সিঁথিতে সিঁদুর দেয়, কিন্তু বিবাহের অনুষ্ঠানাদি হয় মুসলমানী রীতিতে। মৃতদের হিন্দুপ্রথা অনুযায়ী সৎকার করা হয় না, সমাধি দেওয়া হয়। ছুন্নৎ-প্রথাও আছে কলমাদারদের মধ্যে। চার পাঁচ বছর বয়সে মুসলমানী রীতিতে ছুন্নৎ অনুষ্ঠান হয়। হিন্দুসমাজ ও মুসলমানসমাজের উপকরণ মিলেমিশে পশ্চিমবঙ্গের পটুয়াদের মতন অনুরূপ একটি বিচিত্র গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজ কলমাদারদের মধ্যে গড়ে উঠেছে দেখা যায়।

সমাজবিজ্ঞানীদের কাছে বাংলাদেশের এই পটুয়ারা ও কলমাদাররা নিশ্চয়ই কৌতূহলের বিষয়। বিবাহের বন্ধন আছে যেখানে, সেখানে ভোজনের কোন বন্ধন নেই। মুসলমানদের সঙ্গে ভোজনাদি সব চলে, বিবাহ চলে না। এর অর্থ বোঝা যায়। মুসলমানযুগে ধর্মান্তরিত হবার পরেও হিন্দুত্ব সম্পূর্ণ বর্জন করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু ঠিক কলমাদারদের মতনই যাদের ইতিহাস, সেই পটুয়াদের সঙ্গে বিবাহের সম্বন্ধ নেই। কেন নেই? পটুয়া, কলমাদার ও মুসলমান-সমাজের এই সব বিচিত্র সামাজিক বিধিনিষেধ থেকে এইটুকু বোঝা যায় যে ছোট ছোট জাতি-উপজাতির গঠনের সঙ্গে অর্থনৈতিক পেশার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে এবং সব জাতির সবরকমের 'ট্যাবু' সমান শক্তিশালী নয়। পটুয়াদের ও কলমাদারদের পেশা এক ছিল না হিন্দুসমাজে। কলমাদাররা হয়ত বাজীকর ও শিকারী কোন জাতি ছিল, পটুয়ারা পট আঁকত। পরে ধর্মান্তরিত হয়েও পেশাগত পার্থক্যবোধ তাদের মধ্যে দূর হয়নি। ধর্মের চেয়েও দেখা যাচ্ছে যে পেশার মর্যাদা সমাজে বেশি হতে পারে। বিবাহের আদানপ্রদান তাই তাদের দুই সমাজে (পটুয়া ও কলমাদার) চলেনি। বিবাহের সঙ্গে কুলগত মর্যাদার সম্পর্ক এবং কুলকৌলীন্য মূলত পেশাগত কৌলীন্য। তাই বিবাহ এক্ষেত্রে পটুয়াদের ও কলমাদারদের মধ্যে অচল। কিন্তু খাওয়া-দাওয়া ও হুঁকো অচল নয়। খাদ্যের ট্যাবুর প্রাচীর দুর্লঙ্ঘ্য নয়। ধর্মাচরণ এক হলে তা সহজেই ভেঙে ফেলা যায়। এক্ষেত্রেও তা ভেঙে গেছে। কিন্তু পেশাগত (occupational) কৌলীন্যের প্রাচীর আজও ভাঙেনি।
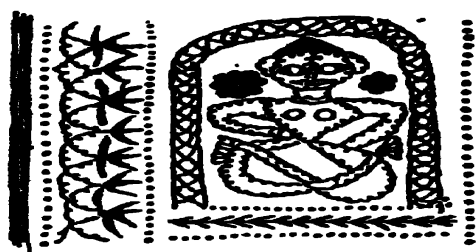
আলোচনা

আলোচনা-বিভাগের রচনাগুলি এ-বইয়ের বিশেষ প্রয়োজনে এবং গ্রন্থকারের অনুরোধে লিখিত। বইয়ের মধ্যে যেসব বিষয় আলোচিত হয়েছে, তারই পরিপূরক হিসেবে এই রচনাগুলি পাঠ করা উচিত। তা না হলে প্রত্যেকটি রচনা খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণ মনে হবে। রচনাগুলি গ্রন্থকারের প্রশ্নাবলীর উত্তরে ও প্রয়োজনে লিখিত বলে, তাদের পূর্ণতা-অপূর্ণতার জন্য লেখকরা দায়ী নন।

পশ্চিমবঙ্গের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন
ও
সাংস্কৃতিক ইতিহাস

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
কারমাইকেল অধ্যাপক, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

পশ্চিমবঙ্গে তথা উত্তরপূর্ব ভারতে দেবদেবীর মূর্তিপূজার প্রাচীনত্বের বিষয় সমগ্র ভারতে এই অনুষ্ঠানের প্রচলনের সহিত জড়িত। ইহা এখন সর্ব্বজনগ্রাহ্য মত যে মূর্তিপূজা প্রাগার্য ভারতবাসীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। বৈদিক আর্যগণ আদিতে মূর্তিপূজক ছিলেন না, পরে সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের ফলে ইহা আর্যসমাজে প্রবেশ লাভ করে। পূর্বভারতে তথা পশ্চিমবঙ্গে কখন যে ইহা প্রচলিত হয় তাহা সঠিক বলা দুরূহ। ভারতের এই অঞ্চলে আর্য উপনিবেশের পূর্ব হইতেই আর্য ও প্রাগার্য ভারতীয়দিগের সংমিশ্রণ বহুলপরিমাণে সংঘটিত হইয়াছিল। কাজেই মনে হয় যে এতদঞ্চলে মূর্তিপূজা জনগণের মধ্যে খৃষ্টপূর্ব যুগ হইতেই বিস্তার লাভ করে। কিন্তু ইহাও স্বীকার্য যে বহু প্রাচীন যুগের মূর্তি অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। ইহার অন্যতম কারণ এই যে ভারতীয়গণ সুপ্রাচীন যুগে প্রস্তর ধাতু ইত্যাদি অধিকতর স্থায়ী উপাদানে তাহাদের উপাস্য দেব-দেবীর মূর্তি নির্মাণ করিত না। মূর্তি সাধারণত মৃন্ময় বা দারুময় ছিল এবং ইহারা অপেক্ষাকৃত ক্ষণস্থায়ী হইত। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য এই, এখনো রাঢ়দেশের বহু গ্রামে এবং উপনগরে নানাবর্ণে চিত্রিত দারুময় মূর্তি মন্দিরমধ্যে নিত্য পূজিত হইতেছে।

দেবদেবীর মূর্তিপূজা কতদিনের প্রাচীন?

ভারতবর্ষে শিবপূজার প্রাচীনত্ব সমধিক। ইহা বা ইহার আদিম প্রতিরূপ যে প্রাগ্বৈদিক যুগ হইতে এদেশে প্রচলিত ছিল এ অনুমান অসঙ্গত নহে। সিন্ধুনদের উপত্যকায় যে সব প্রাচীন নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে উহা এই বিষয়ে একটি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত প্রদান করে। বেদের 'রুদ্র' দেবতার

রূপকল্পনার মধ্যে এই আদিম দেবতার রূপের কিঞ্চিৎ প্রকাশ ঘটে এবং এই বৈদিক ও অবৈদিক দেবতার সংমিশ্রণে যে 'শিব'-দেবতার রূপ বিকশিত হয়, পরে উহাই সাম্প্রদায়িক শৈবধর্মের প্রতীক-দেবতারূপে পরিকল্পিত হয়।

শিবপূজা ও শৈবধর্মের প্রাচীনত্ব

সাম্প্রদায়িক শৈবধর্মও যে বৈদিক যুগের শেষের দিকে বিকাশলাভ করিয়াছিল তাহার সাহিত্যগত নিদর্শন পাওয়া যায়। পানিনি এবং তাঁহার ভাষ্যকার পতঞ্জলি, আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের গ্রীক ইতিহাস রচয়িতাগণ এবং প্রাচীন বৌদ্ধ ও জৈন শাস্ত্রকারগণ এ সম্বন্ধে বহু প্রামাণিক তথ্য সঙ্কলন করিয়া গিয়াছেন। রাঢ়দেশেও যে শিবপূজা সুপ্রাচীনযুগ হইতে প্রচলিত ছিল সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ হইতে পারি; তবে ইহা অস্বীকার করা যায় না যে এই সম্বন্ধে খৃষ্টপূর্ব যুগের নিদর্শন বিরল। সেই যুগের এতদ্দেশীয় ইতিহাস আজও অনেকাংশে অজ্ঞাত রহিয়াছে বলিয়া এ বিষয়ে স্পষ্ট কিছু বলা যায় না।

'লিঙ্গ'-পূজা ভারতবর্ষে-তথা পৃথিবীর অন্যান্য দেশে বহু পুরাতন কাল হইতে প্রচলিত। ইহার মূলগত বৈশিষ্ট্য এই যে ইহা সৃষ্টিক্রিয়ার আদিম প্রতীকরূপে পরিকল্পিত। 'শিব'-দেবতা পৌরাণিক যুগে প্রধানত সংহারকর্তা বলিয়া পূজিত হইলেও তাঁহার উপাসকদিগের নিকট তিনি প্রাক-পৌরাণিক কাল হইতেই জগৎস্রষ্টা এবং সকলের পিতা বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। 'লিঙ্গ' এই কল্পনার-ই আদিম প্রতীক, এবং দেবতার পিতৃত্বের পরিচায়ক। এইজন্যই শিবমূর্তি পূজার সঙ্গে সঙ্গেই শিবলিঙ্গপূজার প্রচলন হয়। এ বিষয়েও সিন্ধুনদ উপত্যকার প্রাগ্বৈদিক নিদর্শনগুলি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত প্রদান করে। ঋগ্বেদে 'শিশ্ন'দেব কথাটির উল্লেখ আছে 'শিশ্ন'দেবগণ বৈদিক ঋষিদের জুগুপ্সার পাত্র ছিল। অনেকে অনুমান করেন যে ইহারাই প্রাগ্বৈদিক লিঙ্গপূজক। ক্রমশ ভারতবাসীদের মধ্যে, বিশেষ করিয়া সাম্প্রদায়িক শৈবদিগের মধ্যে, শিবলিঙ্গপূজার বহুল বিস্তৃতি ঘটে। প্রধান এবং অপ্রধান শিবমন্দিরের গর্ভগৃহে শিবলিঙ্গই পূজার প্রধান প্রতীকরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে। শিবের নানাপ্রকার লীলামূর্তি এই সব মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে খোদিত হইলেও শিবের লিঙ্গমূর্তি পূজার প্রধানতম রূপ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এ প্রথা অদ্যাপিও হিন্দু ভারতে বর্তমান।

শিবলিঙ্গপূজার উৎপত্তির কারণ এবং ইহার প্রাচীনত্ব

শিবলিঙ্গের যে সকল প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে ঐগুলি অত্যন্ত বাস্তবধর্মী (realistic)। ঐজন্যই বোধহয় শিবলিঙ্গপূজা উচ্চস্তরের হিন্দুদিগের মধ্যে প্রথমে সমধিক আদৃত হয় নাই। মহাভারতের অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন অংশ অনুশাসনপর্বে কৃষ্ণ-উপমন্যু-সংবাদ পর্বাধ্যায়ে ইহার স্পষ্ট উল্লেখ দেখিতে পাই। কিন্তু এজন্য অনুমান করা সঙ্গত হইবে না যে হিন্দু জনসাধারণের মধ্যে ইহার প্রসার ছিল না। উচ্চবর্ণের শাস্ত্রকারগণ ইহার প্রসার সম্বন্ধে প্রথমত উদাসীন বা বিরূপমনোভাবাপন্ন হইলেও, ক্রমশ এই অনুষ্ঠানকে স্বীকার না করিয়া পারেন নাই। কিন্তু তখন এই শৈব 'প্রতীকে'র রূপ পরিবর্তিত হইয়াছিল। ইহার বাস্তবধর্মিতা প্রায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল এবং কালক্রমে এতদূর conventionalised হইয়াছিল যে আধুনিক কোন কোন পণ্ডিত ইহাকে বৌদ্ধস্তূপপূজা হইতে উদ্ভূত বলিয়া অনুমান করিয়াছেন।

রাঢ়দেশে কোন কোন শিবমন্দিরের অভ্যন্তরস্থ শিবলিঙ্গের উৎপত্তি সম্বন্ধে কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। এই সকল গল্প গোপজাতি এবং তাহাদের গাভীগুলির সহিত সংশ্লিষ্ট। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য এই যে, অনুরূপ কিংবদন্তী ভারতবর্ষে, বিশেষত দক্ষিণভারতে পূজিত কোন কোন শিবলিঙ্গের সম্বন্ধে প্রচলিত। ইহার বিশেষ কি কারণ তাহা সম্যক বলা যায় না। তবে ইহা বলা যাইতে পারে যে শিবপূজা এবং শিবলিঙ্গপূজা দেশের তথাকথিত অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের জনগণের মধ্যেই যে বিশেষ বর্তমান ছিল, এই সব কাহিনীগুলিতে তাহারই ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

আদিম জাতিদিগের মধ্যে menhir ও monolith পূজার প্রচলন দেখা যায়। উহার সহিত লিঙ্গপূজার কিঞ্চিৎ পরোক্ষ সম্পর্ক বর্তমান আছে বলিয়া মনে হয়। অনেকক্ষেত্রে এই menhirগুলি আদিম জাতিগণের পূর্বপুরুষ পূজার (ancestor-worship) পরিচায়ক। কোন কোন menhir-এ সমুষ্ক শিশ্নের প্রতিকৃতি অঙ্কিত দেখা যায়। উত্তরপ্রদেশের ভিটা নামক স্থানে যে অর্ধভগ্ন 'স্তম্ভশীর্ষ' (?) আবিষ্কৃত হইয়াছে, উহাতে পাঁচটি মনুষ্যের আবক্ষমূর্তি ও একটি সমুষ্ক শিশ্ন খোদিত আছে। স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং গোপীনাথ রাও ইহাকে শিবলিঙ্গের অন্যতম প্রাচীন নিদর্শন বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। কিন্তু এই অনুমান কিঞ্চিৎ সংশোধিত করা যাইতে পারে। ইহা সত্যকারের 'মুখলিঙ্গ' নহে এবং ইহা উপরি-উক্ত menhir-ধর্মী বস্তু।

তবে শিবলিঙ্গ যে পূর্বপুরুষের স্মারক হিসাবে পূজিত হইত তাহা অপেক্ষাকৃত প্রাচীনকাল হইতে অদ্যাপি বর্তমান।

রাঢ়দেশের ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চলে যে একমুখলিঙ্গ ও চতুর্মুখলিঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায় তাহার অন্যতম কারণ এই যে এইসব স্থানে শিবপূজার বহুল প্রচলন ছিল। লকুলীশ-পাশুপত সম্প্রদায়ের উৎপত্তি যে পশ্চিমভারতে হইয়াছিল তাহার বহু সাহিত্যগত ও প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু মধ্যযুগে পূর্বভারতের উড়িষ্যা, রাঢ়দেশ প্রভৃতি স্থানেও এই সম্প্রদায়ের যে বহুল বিস্তৃতি ঘটে তাহার পর্যাপ্ত নিদর্শন আমরা পাই। এই একমুখলিঙ্গ ও চতুর্মুখলিঙ্গগুলি যে পাশুপত সম্প্রদায়ের পূজার প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হইত তাহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে। বেগুনিয়ার (বরাকর) অন্যতম মন্দিরগাত্রে আমরা লকুটপাণি লকুলীশের প্রতিমূর্তি দেখিতে পাই। কলিকাতায় কালীঘাটের কালীমন্দিরের অনতিদূরে অবস্থিত 'নকুলেশ্বর শিবলিঙ্গ' যে এই লকুলীশেরই পূজাপ্রতীক, এবিষয়েও নিঃসন্দেহ হইতে পারি।

সমগ্র ভারতবর্ষে বিষ্ণুপূজা বহু পুরাকাল হইতে প্রচলিত থাকিলেও প্রাচীনত্বের দিক দিয়া ইহা শিবপূজার পরবর্তী। এই পূজার প্রধান প্রতীক বিষ্ণু বৈদিক 'আদিত্য-বিষ্ণু' নহেন। পৌরাণিক বিষ্ণু বাসুদেব, নারায়ণ ও বৈদিক বিষ্ণুর সংমিশ্রণ। এই পূজায় বাসুদেব-কৃষ্ণের অগ্রজ বলরাম এবং পুত্র ও পৌত্র প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—ইহারা সকলে বাসুদেবের সহিত পূজিত হইতে থাকেন। ইহাই 'পাঞ্চরাত্র'-বৈষ্ণবমতে ব্যূহ বা চতুর্মূর্তিপূজা। এই পূজা খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় বা প্রথম শতক হইতে ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হয় এবং গুপ্ত ও পরবর্তী যুগে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশে বিস্তৃতি লাভ করে। এই সময় বাংলা-দেশেও যে ইহার সমধিক প্রচলন ঘটিয়াছিল তাহার কিছু কিছু নিদর্শন আজও পাওয়া যায়। বাংলার পালরাজাদের সময়ের বহু বিষ্ণুমূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এইগুলি এতদঞ্চলে বিষ্ণুপূজার প্রাধান্যের নিশ্চিত সাক্ষ্য প্রদান করে। বলরামের পৃথক পূজাও যে এদেশে প্রচলিত ছিল তাহারও কিছু কিছু নিদর্শন অদ্যাপি বর্তমান। বর্ধমান জেলার অন্তর্গত বোড়ো-বলরামপুর গ্রামে বহুভুজ বিশিষ্ট বলরামের সুবৃহৎ দারুনির্মিত মূর্তি আজও পূজিত হইতেছে। দশাবতারের কোনও কোনও অবতারের, বিশেষ করিয়া নরসিংহের মূর্তি

বৈষ্ণবধর্মের প্রাচীনত্ব
বলরামের পূজা
বাংলার বিষ্ণুমূর্তির বৈচিত্র্য

বাংলাদেশে আবিষ্কৃত হইয়াছে। বিষ্ণুর 'ব্যূহরূপে'র পরে সম্প্রসারণ হয়, এবং ইহা চতুর্ব্যূহ বা চতুর্মূর্তি হইতে চতুর্বিংশতি মূর্তিতে পরিণত হয়। এই চব্বিশটি মূর্তিরও কোন কোন 'ভেদ' মধ্যযুগের বাংলাদেশে পূজিত হইত। উহাদের অধুনাপ্রাপ্ত মূর্তি ইহার প্রমাণ।

বাংলার তথা রাঢ়দেশের বিভিন্ন প্রকারের বিষ্ণুমূর্তিগুলি সাধারণতঃ উত্তরভারতীয় শৈলী অনুসারে নির্মিত। অধিকাংশই চতুর্ভুজ, শঙ্খ-চক্র গদা-পদ্মধারী স্থানকমূর্তি। একপার্শ্বে পদ্মকরা শ্রী এবং অন্যপার্শ্বে বীণাধরা পুষ্টি বা সরস্বতী। পীঠিকায় কৃতাঞ্জলি-হস্ত ক্ষুদ্র গরুড়মূর্তি এবং অন্যান্য মূর্তি। আসন মূর্তি এবং শয়নমূর্তি বিষ্ণু এদেশে অল্পই পাওয়া গিয়াছে। বিষ্ণুর দশাবতার মূর্তিগুলির মধ্যে মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নরসিংহ ও বামন বা ত্রিবিক্রমের পৃথক মূর্তি কিছু কিছু আবিষ্কৃত হইয়াছে। একই প্রস্তরখণ্ডে খোদিত পাশাপাশি দশটি অবতারের মূর্তিও এখানে পাওয়া যায়। মূর্তিশিল্পের দিক দিয়া ইহাদের শৈলী উত্তরভারতীয় শিল্পশৈলীর সহিত উপমিত হইলেও ইহার প্রাদেশিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা উচিত। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব কর্তৃক প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রচলনকাল হইতে যে বিষ্ণুপূজার প্রচলন আরম্ভ হয়, উহার প্রতীক সাধারণতঃ কৃষ্ণের লীলামূর্তি। বালগোপাল (নাড়ুগোপাল), বেণুগোপাল, মদনমোহন, রাধাকৃষ্ণ ইত্যাদি বিভিন্ন কৃষ্ণমূর্তি মধ্য ও বর্তমান যুগে বিভিন্ন বিষ্ণুমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাওয়া যায়। চৈতন্যদেব তাঁহার ভক্তদিগের নিকট ভগবান বিষ্ণুর অবতার বলিয়া পরিগণিত হন এবং সেজন্য তাঁহার এবং তাঁহার সঙ্গী নিত্যানন্দের কীর্তনরত মূর্তিদ্বয় রাঢ়দেশের অপেক্ষাকৃত আধুনিক বহু বিষ্ণুমন্দিরে পূজিত হইতেছে।

তন্ত্রের তাৎপর্য

'তন্ত্র শব্দটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগের একটি বিশেষ সাম্প্রদায়িক ধর্ম-মতের সহিত সংশ্লিষ্ট হইলেও আদিতে ইহার একাধিক তাৎপর্য ছিল। ইহা যে কেবল শক্তিপূজার বিশেষ রূপের সহিত জড়িত ছিল তাহা নহে, অন্যান্য ধর্ম সম্প্রদায়ের দ্বারা আচরিত সুনির্দিষ্ট বিধিগুলিও তান্ত্রিক পর্যায়ভুক্ত ছিল। শক্তিপূজার সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক যথেষ্ট প্রাচীন হইলেও পাঞ্চরাত্র-ভাগবত ধর্মমতের ব্যাখ্যানসম্পন্ন কোন কোন গ্রন্থ 'তন্ত্র' নামে অভিহিত হইয়াছে ('পাদ্মতন্ত্র' এইরূপ একটি অপেক্ষাকৃত প্রামাণিক প্রাচীন গ্রন্থ)। সাধারণত তন্ত্র শব্দের ব্যুৎপত্তিগত

অর্থ সুনিয়ন্ত্রিত প্রণালীবদ্ধ ধর্মানুষ্ঠানিক বিধিনিষেধাদির অভিব্যঞ্জনা। শক্তিপূজার আচারঅনুষ্ঠানের এবং শক্তি-উপাসকের ক্রিয়াকর্মাদির বিশেষ বিশেষ বিধির নির্দেশক প্রচলিত তান্ত্রিক গ্রন্থগুলির অধিকাংশই বেশিদিনের প্রাচীন নহে। কিন্তু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হইতে আমরা সুস্পষ্ট জানিতে পারি যে মাতৃকাপূজার সহিত তান্ত্রিক ক্রিয়াদির সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ ছিল। গুপ্তরাজ প্রথম কুমারগুপ্তের সমকালীন গাঙ্‌ধার শিলালিপি হইতে আমরা জানিতে পারি যে মাতৃকাদেবীগুলির মন্দির ডাকিনী-যোগিনী সম্বলিত বিশেষ বিশেষ তান্ত্রিক ক্রিয়ার সহযোগে ময়ূরাক্ষক নামক একজন শক্তি-উপাসকের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

ভারতবর্ষে শক্তিপূজা অতি প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত ছিল। এ বিষয়েও সিন্ধু উপত্যকার প্রাগ্বৈদিক কোন কোন নিদর্শন বিশেষ সাক্ষ্য প্রদান করে। ঋগ্বেদাদি গ্রন্থে উপাস্য দেবতাদের মধ্যে স্ত্রী-দেবতার নাম অপেক্ষাকৃত স্বল্পসংখ্যক হইলেও ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে 'দেবীসূক্তে' (১০।১২৭) আমরা বিশ্বসৃষ্টির অন্তর্নিহিত শক্তির যে রূপকল্পনা দেখিতে পাই, উহার অনুরূপ পরবর্তীযুগের গ্রন্থাদিতে বিরল। শৈব-বৈষ্ণবাদি ধর্মসম্প্রদায়ের পর্যায়ভুক্ত অন্যতম ধর্মসম্প্রদায় হিসাবে ইহার প্রাচীনত্ব খৃষ্টপূর্ব যুগের বলিয়া নির্দিষ্ট হইতে পারে। কন্যা ও মাতা হিসাবে দেবীর পূজা বহু পূর্ব হইতেই যে এদেশে প্রচালিত ছিল তাহার প্রমাণ সাহিত্য এবং প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হইতে পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় প্রথম শতকে দক্ষিণভারতে আগমনকারী এক গ্রীক বণিকের রচিত গ্রন্থ (Periplus of the Erythrean Sea) হইতে আমরা জানিতে পারি যে কুমারিকা অন্তরীপের দেবী কন্যাকুমারীরূপে পূজিত হইতেন। বিখ্যাত চীন পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ্‌ খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের প্রথমভাগে গন্ধার (উত্তরপশ্চিম ভারতবর্ষ) পরিভ্রমণকালে তথায় প্রসিদ্ধ ভীমাদেবীর পূজাস্থানের উল্লেখ করিয়াছেন। মহাভারতের তীর্থযাত্রা পর্বাধ্যায়ে (বনপর্ব) এই পবিত্র ভীমাস্থানের প্রসিদ্ধির উল্লেখ আছে। এইরূপ পশ্চিম, পূর্ব এবং মধ্যভারতে শক্তিপূজার প্রচলন সম্পর্কে নানাবিধ প্রমাণ সংগ্রহ করা যায়। পূর্বভারতে, বিশেষ করিয়া মিথিলায় ও বাংলাদেশে শক্তিপূজার প্রচলন সমধিক পরিলক্ষিত হয়। এতদ্দেশে শিবপূজা ও বিষ্ণুপূজার সহিত শক্তিপূজা অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। শিবের সহিত দুর্গা

শক্তিপূজার প্রাচীনত্ব

বা কালী এবং বিষ্ণু-কৃষ্ণের লক্ষ্মী বা রাধিকার পূজা কয়েক শতাব্দী ধরিয়া এদেশে প্রচলিত। পাল এবং সেনযুগের বহু প্রস্তরময় হিন্দু এবং বৌদ্ধ দেবীমূর্তি বঙ্গদেশে শক্তিপূজার প্রাধান্যের সাক্ষ্যস্বরূপ। শারদীয়া দুর্গাপূজা মার্কণ্ডেয় মহাপুরাণের দেবীমাহাত্ম্যের (চণ্ডী) সহিত সম্পর্কিত হইলেও বাংলাদেশে ইহা একটি বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। চৈতন্যপূর্বযুগ হইতেই মনে হয় এই বিশিষ্ট রূপকল্পনার সূচনা হইয়াছে। ইহাতে পূর্বেকার দেবী, দেবীর বাহন সিংহ এবং মহিষাসুর এই তিন মূর্তির সহিত আর চারিটি দেবতার মূর্তি সংযোজিত হয়। এই দেবতাগুলি হইলেন লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক এবং গণেশ—পৌরাণিক আখ্যান অনুসারে শিব ও দুর্গার পুত্র-কন্যাগণ। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে সুরথ রাজা কর্তৃক দেবীর মহীময়ী মূর্তিপূজার উল্লেখ পাই। বাংলাদেশে এই বিশিষ্ট মৃন্ময়ী দেবীমূর্তির চারিদিনব্যাপী পূজা এবং চতুর্থদিনে বাদ্যভাণ্ডসহকারে নদী-তড়াগাদিতে উহা বিসর্জনের প্রথা প্রচলিত আছে।

পূর্বভারতে তথা বাংলাদেশে কয়েক শতাব্দী পূর্বে তন্ত্রযান বৌদ্ধধর্মের এবং তান্ত্রিক হিন্দুধর্মের বিশেষ সংমিশ্রণ ঘটে। বৌদ্ধধর্ম ক্রমশ মহাযান হইতে বজ্রযান প্রভৃতি তান্ত্রিক রূপ পরিগ্রহ করে, এবং এই বিবর্তনে বহু ব্রাহ্মণ্য হিন্দু দেবদেবী বজ্রযান বৌদ্ধরূপে পরিবর্তিত হয়।

বৌদ্ধতন্ত্র ও হিন্দুতন্ত্রের দেবদেবী

অপরদিকে কোন কোন বৌদ্ধদেবতা তান্ত্রিক হিন্দু দেবতার রূপ পরিগ্রহ করে। নিদর্শনস্বরূপ দু-একটির উল্লেখ এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর প্রধানত বিষ্ণুর রূপান্তর বলিয়া গৃহীত হইলেও ইহা সত্য যে তাঁহার কোন কোন মূর্তিভেদ, যথা সিংহনাদ লোকেশ্বর, নীলকণ্ঠ, পদ্মনর্তেশ্বর ইত্যাদি শিবের বিভিন্ন রূপকল্পনা হইতে সঞ্জাত। অন্যপক্ষে নৈরাত্মা এবং বজ্রযোগিনী প্রভৃতি বজ্রযান বৌদ্ধ-দেবতার হিন্দুরূপ যে কালী এবং ছিন্নমস্তা এবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ অল্প। এইরূপ আরও বহু নিদর্শন উপস্থাপিত করা যাইতে পারে যাহা উভয় সম্প্রদায়ের ঘনিষ্ঠ সংমিশ্রণের ফলস্বরূপ।

পালযুগ বা তাহার পূর্ববর্তী কাল হইতে যে পশ্চিমবঙ্গে বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের প্রসার ঘটিয়াছিল তাহার প্রত্নতাত্ত্বিক ও সাহিত্যগত নিদর্শন পাওয়া যায়। মহাযান ও বজ্রযান বৌদ্ধধর্মসম্পর্কিত বহু মূর্তি যে রাঢ়দেশে সেকালে

পূজিত হইত, তথায় অধুনা আবিষ্কৃত সেই সব মূর্তি তাহার প্রমাণ। জৈনধর্ম সম্বন্ধেও এই উক্তি প্রযোজ্য। বাংলার পালবংশীয় নৃপতিগণ যে ভগবান সুগতের বিশিষ্ট উপাসক ছিলেন, উহা তাঁহাদের অনুশাসন হইতে জানা যায়। বৌদ্ধ পালরাজগণ এবং তাঁহাদের উত্তরাধিকারী ব্রাহ্মণ্য হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত সেনরাজগণ ধর্মসম্পর্কে উদারদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন এবং তৎকালে তাঁহাদের রাজ্যে অন্যান্য ধর্মেরও বহুল প্রসার ও প্রচলন ছিল।

পশ্চিমবঙ্গ বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রসার

বাংলায় প্রাপ্ত দেবদেবীর মূর্তি হইতে সে-যুগের সামাজিক ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করা যায়। মূর্তিগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণী দৃষ্টি লইয়া পর্যবেক্ষণ করিলেই এই সব উপাদান আমাদের হস্তগত হয়। ইহাদের পোশাক-পরিচ্ছদ, বেশবিন্যাস অলঙ্কার ইত্যাদির তাৎকালিক বাঙালী নরনারীর ব্যবহৃত এই সকল বস্তুর সহিত অনেক পরিমাণে সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। বর্তমানযুগে এই সকলের প্রভূত পরিবর্তন হইলেও পূর্বেকার রীতি আংশিকভাবে এখনও প্রচলিত আছে। তুলনামূলক আলোচনা করিলে সাদৃশ্যগুলি আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। ইহার স্বপক্ষে বাংলায় প্রাপ্ত শিবের 'বৈবাহিক' (কল্যাণসুন্দর) মূর্তির বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা যাইতে পারে। বরবেশে সজ্জিত শিবের সম্মুখে দর্পণহস্তা ব্রীড়াবনতা বধূরূপী উমা দণ্ডায়মানা। শিবের হস্তে ত্রিশূল থাকিলেও দক্ষিণহস্তে একটি ক্ষুদ্র অস্ত্র রহিয়াছে। বিবাহকালীন কুশণ্ডিকা সংস্কারে বর ও বধূর সপ্তপদীগমন একটি বিশেষ আচরণীয় ক্রিয়া। বাংলার এই জাতীয় মূর্তিগুলিতে এই ক্রিয়ারও একটি সুস্পষ্ট ছাপ বর্তমান।

প্রাচীন মূর্তি হইতে সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ সঙ্কলন

লুপ্ত ইতিহাসের পুনরুদ্ধারে প্রাচীন মুদ্রা অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা অবশ্যস্বীকার্য। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে এমন অনেক অন্ধকারময় যুগ আছে যাহাতে আলোকপাত করিতে গেলে সেযুগের অধুনা আবিষ্কৃত মুদ্রারাজির অনুশীলন অত্যাবশ্যক। ভারতবর্ষের যবন, শক পহ্লব, কুষাণ প্রভৃতি বৈদেশিক রাজন্যবর্গের অধিকারকালের ইতিহাস মূলত তাহাদের দ্বারা প্রবর্তিত মুদ্রাসমূহ হইতে কিয়ৎপরিমাণে উদ্ধার করা সম্ভব হইয়াছে। সাহিত্যগত ও অন্যবিধ

প্রাচীন মুদ্রা এবং ইতিহাসচর্চা

প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহ এদেশের ইতিহাসরচনায় সাহায্য করিলেও বিভিন্ন যুগের মুদ্রাসমূহ এবিষয়ে বিশেষ কার্যকরী।

যেসব বিশেষ বিশেষ স্থানে বিভিন্ন প্রকার ও বিভিন্ন যুগের মুদ্রাসমূহ আবিষ্কৃত হয় অনেকক্ষেত্রে সেই সব স্থানের ঐতিহাসিক প্রাচীনত্ব অনস্বীকার্য। বাংলাদেশ সম্বন্ধে এই প্রবচন আরোপ করিতে গেলে আমরা ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারি। এ-দেশের বহুস্থানে অঙ্কচিহ্নযুক্ত মুদ্রা (punch-marked coins), ঢালাই মুদ্রা (cast coins) কুষাণ যুগের তাম্রমুদ্রা, গুপ্ত ও গুপ্তোত্তরযুগের স্বর্ণমুদ্রা প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। অঙ্কচিহ্নযুক্ত এবং ঢালাই মুদ্রা মুর্শিদাবাদের গীতগ্রাম নামক স্থানে, চব্বিশপরগণার বেড়াচাঁপায় (চন্দ্রকেতুর গড়), হুগলী জেলার মহানাদ গ্রামে, মেদিনীপুর জেলার তমলুক (প্রাচীন তাম্রলিপ্তি) ইত্যাদি স্থানে পাওয়া গিয়াছে। ইহার দ্বারা এই সকল স্থানের প্রাচীনত্ব নিশ্চিতভাবে সূচিত হইতেছে। সেকালের ইষ্টকনির্মিত গৃহাদির ভগ্নাবশেষ, মৃৎপাত্রের খণ্ডসমূহ এবং প্রস্তর ও ধাতুনির্মিত দেবমূর্তির পূর্ণরূপ ও ভগ্নাংশ এই সব স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। আবার অন্যদিকে ইহাও বলা যাইতে পারে যে সেকালের মুদ্রা কোন এক স্থানে আকস্মিকভাবে আবিষ্কৃত হইলেই তাহার প্রাচীনত্ব নির্বিবাদে স্বীকার করা যায় না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে কলিকাতার কালীঘাট অঞ্চলে ওয়ারেন হেষ্টিংসের শাসনকালে গুপ্ত সম্রাটদের অনেকগুলি স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গিয়াছিল। ইহা হইতেই কালীঘাটের ঐতিহ্য গুপ্তযুগে লইয়া যাওয়া সম্ভব নয়। কারণ অন্য কোনও রূপ নিদর্শন এখানে পাওয়া যায় নাই। মুদ্রা এবং অন্য জাতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন একই সঙ্গে এক স্থানে পাওয়া গেলে, তথাকার প্রাচীনত্ব বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়।

প্রাচীন ভারতের মুদ্রাগুলিকে প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। একটি এদেশের নিজস্ব রীতিতে প্রস্তুত, অপরটি ইহার বৈদেশিক শাসকগণ কর্তৃক প্রবর্তিত। অঙ্কচিহ্নযুক্ত ও ঢালাই মুদ্রা এ-দেশীয় মুদ্রাশৈলী অনুসারে নির্মিত। বৈদেশিক মুদ্রাগুলি die-struck পদ্ধতিতে তৈয়ারি হইত। আবার এমন অনেক মুদ্রা এখানে পাওয়া গিয়াছে যেগুলি বিভিন্ন মুদ্রাশৈলীর সঙ্কর বলা যাইতে পারে। অঙ্কচিহ্নযুক্ত এবং ঢালাই মুদ্রা এ-দেশের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন মুদ্রা।

প্রাচীন মুদ্রার প্রকৃতি-বিষয়ক কয়েকটি কথা

এগুলির প্রথম প্রচলন খৃষ্টপূর্ব যুগের কোন্ সুদূর শতাব্দী হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা সঠিক বলা যায় না। তবে ইহাদের প্রচলনকাল যে খৃষ্টীয় প্রথম দুই শতক পর্যন্ত বর্তমান ছিল তাহা অনেকে অনুমান করিয়াছেন। উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে প্রথম বৈদেশিক রাজগণ ছিলেন হখামানসীয় দরায়ুস প্রমুখ সম্রাটগণ। তাঁহাদের রৌপ্যমুদ্রা (siglos) এদেশে আবিষ্কৃত হইয়াছে। পরবর্তীকালের বৈদেশিক রাজন্যবর্গ (যবন, শক, পহ্লব প্রভৃতি) স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র প্রভৃতি ধাতুতে বিভিন্ন যুগে বহু মুদ্রা প্রচলিত করিয়াছিলেন। সাতবাহন, গুপ্ত প্রভৃতি দেশীয় রাজন্যবর্গও বিভিন্ন ধাতুতে প্রচুর মুদ্রার প্রবর্তন করেন। এই সব বিভিন্ন প্রকারের মুদ্রাগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিলে আমরা ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক বহু তথ্য অবগত হইতে পারি।

অঙ্কচিহ্নযুক্ত ও ঢালাই মুদ্রা পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি স্থানে পাওয়া গিয়াছে, একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। গুপ্তযুগের কয়েকটি স্বর্ণ মুদ্রা হুগলী জেলার মহানাদে পাওয়া গিয়াছে। এগুলি প্রথম কুমারগুপ্ত এবং স্কন্দগুপ্তের আমলের। হুগলী জেলার অন্য এক স্থানে ইহার পূর্বেকার মুদ্রাও পাওয়া গিয়াছে—ইহাতে সমুদ্রগুপ্তের নাম খোদিত। ইহা হইতে আমরা নিঃসন্দেহে অনুমান করিতে পারি যে এতদঞ্চল গুপ্তসম্রাটগণের অধিকারে ছিল। অবশ্য ইহার অন্য প্রমাণও বর্তমান। অন্যদিকে আশ্চর্যের বিষয় এই যে মধ্যযুগীয় বাংলার পরাক্রান্ত পাল ও সেন নৃপতিবংশের কাহারও মুদ্রা এদেশে অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। অবশ্য বিগ্রহপাল নামে এক নরপতির কয়েকটি রৌপ্য মুদ্রা (দ্রম্ম) কোন কোন স্থানে পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু এই বিগ্রহপাল গুর্জর-প্রতিহারবংশীয় রাজাও হইতে পারেন। ধর্মপাল, দেবপাল, মহীপাল, রামপাল প্রভৃতি বিখ্যাত পাল রাজাদের কোন মুদ্রা এখনো পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। সেনবংশীয় বল্লালসেন ও লক্ষ্মণসেন সম্বন্ধেও এই উক্তি প্রযোজ্য। ইহার সঠিক কারণ নির্দেশ করা একরূপ অসম্ভব।

পশ্চিমবঙ্গে প্রাপ্ত মুদ্রা। —এদেশের ইতিহাস অনুশীলনে উহার প্রয়োজনীয়তা

নানাবিধ মুদ্রার পৃষ্ঠে যেসব চিহ্ন দেখা যায় তাহার সঙ্গত ব্যাখ্যা ন্যূনাধিক অনুমানসাপেক্ষ। অঙ্কচিহ্নযুক্ত ও ঢালাই মুদ্রার গাত্রে যেসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিহ্ন

খোদিত দেখা যায়, উহাদের যথার্থ সংজ্ঞা কি এবিষয়ে মুদ্রাতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে মতভেদ বর্তমান। তবে ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি যে প্রচলিত ধর্মসম্প্রদায়ের সহিত সম্পর্কিত ছিল তাহা অনুমিত হইতে পারে। পরবর্তীকালেও অনেক মুদ্রায় আমরা একদিকে রাজার এবং অন্যদিকে নানাবিধ দেবদেবীর মূর্তি অঙ্কিত দেখিতে পাই। ভারতে যবনাধিকার কালের প্রথমদিকে যেসব মুদ্রা যবন-রাজগণ কর্তৃক প্রচলিত হইয়াছিল, ঐগুলিতে তাহাদের স্ব স্ব প্রতিকৃতি অঙ্কিত থাকিত। কুষাণরাজগণের মুদ্রাতেও কদফিস, কনিষ্ক প্রভৃতি কুষাণ নরপতিগণের মূর্তি অঙ্কিত হইত। গুপ্তবংশীয় সমুদ্রগুপ্ত, চন্দ্রগুপ্ত প্রমুখ নৃপতিগণের মুদ্রাতেও তাঁহাদের স্ব স্ব প্রতিকৃতি অঙ্কিত দেখিতে পাই। অন্যদিকে এই সব বিভিন্নযুগের মুদ্রাগাত্রে যে-সব দেশী ও বিদেশী দেবদেবীর মূর্তি খোদিত দেখি তাহা হইতে সেই সেই দেবতার নানান কালের রূপ সম্বন্ধে আমরা বহুল তথ্য অবগত হইতে পারি।

মুদ্রাপৃষ্ঠস্থ চিহ্ন উহার প্রকৃতি

পশ্চিমবঙ্গের প্রাগিতিহাস

শ্রীধরণী সেন

প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নতত্ত্বের অধ্যাপক
নৃতত্ত্ব বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রাগৈতিহাসিক প্রস্তরযুগ ও তাম্রযুগের নিদর্শন পশ্চিমবঙ্গ (ভৌগোলিক) ও তৎসংলগ্ন অঞ্চল থেকে কিছু-কিছু পাওয়া গেছে। যে ধরনের নিদর্শন আজ পর্যন্ত পাওয়া গেছে এবং তা থেকে এ-অঞ্চলে প্রাগৈতিহাসিক সংস্কৃতি-ধারার আদিপর্বের গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে নৃতত্ত্ববিদ্‌রা যা অনুমান করতে পারেন, সংক্ষেপে তার বিবরণ দিচ্ছি।

পুরোপলীয় যুগ (Paleolithic Age)

পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া (গোপীনাথপুর), বর্ধমান (রাণীগঞ্জ) এবং তার সংলগ্ন সাঁওতাল পরগণা, সিংভূম, মানভূম, ধলভূম, ময়ূরভঞ্জ (বসতিস্থল) তালচের, আঙ্গুল, ঢেনকানল ও ঝরিয়া অঞ্চল থেকে পুরোপলীয় যুগের আয়ুধ ও প্রহরণ পাওয়া গেছে। ময়ূরভঞ্জ ব্যতীত, অন্যান্য স্থানে আয়ুধগুলি সবই পাওয়া গেছে ভূপৃষ্ঠ থেকে। প্রকারের দিক থেকে প্রহরণগুলি সাধারণত একধরনের। ময়ূরভঞ্জে দু-রকমের ভূতাত্ত্বিক স্তর থেকে আয়ুধগুলি পাওয়া গেছে—বুড়াবলঙ্গ (বুড়িবালাম্) নদীর কঙ্করস্তর (gravel beds) থেকে এবং বিশ্লিষ্ট মাকড়া পাথরের (detrital laterites) ভিতর থেকে। এই আয়ুধগুলির প্রকারসাদৃশ্য আছে মাদ্রাজে-পাওয়া আয়ুধের সঙ্গে। মাদ্রাজ অঞ্চলে বেশ বড় বড় প্রহরণ-বহুল পুরোপলীয় যুগের কেন্দ্র আবিষ্কৃত হয়েছে। সম্ভবত, দক্ষিণভারতের মাদ্রাজ অঞ্চলের পুরোপলীয় যুগের সংস্কৃতি (প্রধানত দু-মুখো হাতকুঠার, ছেদক, কর্তরিকা ইত্যাদি সম্বলিত—মুষলায়ুধের বা 'core-tool'-এর সংস্কৃতি), মধ্য-অন্ত্যাধুনিক যুগে (middle pleistocene)[১] উপকূলবর্তী স্থানের ভিতর দিয়ে, উত্তরপূর্বদিকে ময়ূরভঞ্জের দিকে প্রসারিত হয় এবং সেখান থেকে ধীরে ধীরে তার সংলগ্ন অঞ্চল সিংভূম, মানভূম, ধলভূম, বাঁকুড়া,

১ প্রায় পাঁচলক্ষ বছর আগেকার কথা।

বর্ধমান, বীরভূম (পশ্চিমবঙ্গের উচ্চভূমিতে) ও সাঁওতাল পরগণায় ছড়িয়ে পড়ে। এই কারণে মনে হয় যে পশ্চিমবঙ্গের উত্তরভাগে এবং তার পার্শ্ববর্তী মানভূম, সিংভূম, সাঁওতাল পরগণা, ময়ূরভঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলে, দক্ষিণভারত থেকে আগত পুরোপলীয় যুগের মানুষের আনাগোনা ছিল। এই ভৌগোলিক অঞ্চলটিকে (পূর্বভারতের) দক্ষিণভারতের (পূর্ব উপকূল ধরে মাদ্রাজ পর্যন্ত এবং দাক্ষিণাত্যের খানিকটা অংশ জুড়ে) বৃহত্তর পুরোপলীয় সংস্কৃতিকেন্দ্রের একটি প্রান্তিক প্রসারক্ষেত্র বলা যায়।

নবোপলীয় যুগ (Neolithic Age)

নবোপলীয় যুগের নিদর্শনাদির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কুঠারফলক (celts), বাটালি, গদাফলক (ringstone), পেষক ও স্থূল মৃৎপাত্রাদি। এসব নিদর্শন পূর্বোক্ত অঞ্চলে পাওয়া গেছে। তবে নবোপলীয় যুগের কৃষি বা পশুপালনের নিদর্শন এখনও কিছু পাওয়া যায়নি। পশ্চিমবঙ্গে মেদিনীপুর (ঝাড়গ্রাম, তমলুক), বর্ধমান (দুর্গাপুর, রাণীগঞ্জ), দার্জিলিং (ক্যালিম্পং) প্রভৃতি অঞ্চল থেকে নবোপলীয় যুগের নিদর্শন পাওয়া গেছে। পশ্চিমবঙ্গের পার্শ্বস্থ ধলভূম, সিংভূম, মানভূম, রাঁচি ও সাঁওতাল পরগণা অঞ্চলেও পাওয়া গেছে অনেক। উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জে (কুলিয়ানা, বৈদিপুর, খিচিং), কেওঞ্ঝড় ও সম্বলপুরে এবং আসামের তেজপুর ডিব্রুগড়, শিলং অঞ্চলেও এই ধরনের নিদর্শনের সন্ধান পাওয়া গেছে।

নবোপলীয় কুঠারফলকের বিস্তার এবং তার গড়নের তুলনা করে বিচার করলে মনে হয় যে এই কুঠারফলক-তৈরির কৌশল বা রীতি (celt-making technique) প্রাচ্যদেশ (ইন্দোচীন) থেকে ভারতবর্ষে প্রচলিত হয়েছিল। নৃতত্ত্ববিদরা অনুমান করেন যে ইন্দোচীন প্রভৃতি অঞ্চল থেকে ব্রহ্মদেশ ও আসামের পথ দিয়ে, বাংলাদেশের উচ্চভূমির ভিতর দিয়ে, এই নবোপলীয় বিশেষ আয়ুধ-নির্মাণের কৌশলটি ক্রমে বিহার উড়িষ্যা উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশের দিকে বিস্তারলাভ করে এবং সেখান থেকে ধীরে ধীরে দক্ষিণভারতে প্রচলিত হয়।

রাঁচি, সিংভূম, মানভূম ও ময়ূরভঞ্জ অঞ্চলে নবোপলীয় 'সেল্ট' বা কুঠারফলক পর্যাপ্ত পরিমাণেই পাওয়া গেছে। যেসব স্থানে পাওয়া গেছে তার মধ্যে কয়েকটি নির্মাণকেন্দ্র (factory) ও বসতিকেন্দ্র (settlement) বলে মনে হয়। সুতরাং প্রমাণাদি যা পাওয়া গেছে তাতে এই 'সেল্ট-কালচার' বা

কুঠারফলক-সংস্কৃতিধারার উৎস মনে হয় দক্ষিণপূর্ব এশিয়া (ইন্দোচীন) এবং প্রবাহপথ ব্রহ্মদেশ আসাম, বাংলার উচ্চভূখণ্ড থেকে আরও পশ্চিমে বিহার উত্তরপ্রদেশ ও দক্ষিণে উড়িষ্যা, মাদ্রাজ পর্যন্ত বিস্তৃত।

তাম্রপ্রস্তর যুগ (Chalcolithic Age)

তাম্রপ্রস্তর যুগের সংস্কৃতি (সঠিকভাবে বলতে গেলে, তামার কাজ এবং শেষদিকের নবোপলীয় 'সেল্ট' ব্যবহার) বোধ হয় এককালে ধলভূমের তাম্রখনি অঞ্চলে বিকাশলাভ করেছিল। তার কালনির্ণয় করা এখনও সম্ভব হয়নি। পশ্চিমবঙ্গের ভৌগোলিক সীমান্তের মধ্যে, আমি যতদূর জানি, এখনও এমন কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়নি, যাতে জোর দিয়ে বলা যেতে পারে যে বাংলাদেশ তাম্রপ্রস্তর যুগের সংস্কৃতিধারা (লৌহপূর্ব বা 'pre-Iron' এবং নবোপলোত্তর বা 'post-neolithic' যুগের) উত্তীর্ণ হয়ে এসেছে। অর্থাৎ তাম্রধাতুর ব্যবহারের সঙ্গে নবোপলীয় আয়ুধ ও দ্রব্যাদির ব্যবহারের কোন সাক্ষাৎ প্রমাণ কিছু পশ্চিমবঙ্গ থেকে পাওয়া যায়নি। রাঁচি, হাজারিবাগ, পালামৌ, মানভূম ও ময়ূরভঞ্জ থেকে তামার 'সেল্ট' বা কুঠারফলক যা পাওয়া গেছে, সম্ভবত সেগুলি ঐতিহাসিক কালের। আমরা যত দূর জানি এখনও পর্যন্ত তাতে এইসব অঞ্চলে পাথরের কুঠার বা অন্যান্য প্রহরণের সঙ্গে তামার কোন আয়ুধাদি পাওয়া যায়নি। এখনই তাই যেসব তামার আয়ুধ পাওয়া গেছে, সেগুলিকে 'তাম্রযুগের' নিদর্শন বলে চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। এখন এই পর্যন্ত আমরা বলতে পারি যে এইসব অঞ্চলে একসময় আরও পুরাতন কোন তাম্রফলক-সংস্কৃতির অস্তিত্ব ছিল।

রাঁচি হাজারিবাগ পালামৌ ময়ূরভঞ্জ মানভূম ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলার তামাজুড়ি থেকে তাম্রফলক পাওয়া গেছে।[১]

পশ্চিমবঙ্গের স্থাপত্যকলা

শ্রীসরসীকুমার সরস্বতী
অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

আবহমানকাল থেকে নদনদীবহুল বাংলাদেশে পলিমাটি শুধু প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার নানাকাজে যে লেগেছে তা নয়, বাংলার শিল্পকলার অন্যতম উপকরণ হিসাবেও বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। পাথর এ-দেশে দুর্লভ বলে তার ব্যবহারও খুব সীমাবদ্ধ। বাঁশ, কাঠ, নলখাগড়া ইত্যাদি ছিল ঘরবাড়ি তৈরির প্রধান উপাদান। এ-ছাড়া পোড়ামাটির ইটেরও ব্যবহার ছিল এবং মন্দির-বিহার ইত্যাদি নির্মাণে ইটের বহুল ব্যবহার ছিল। কিন্তু যেদেশে বৃষ্টিপাত প্রচুর, বন্যা হামেশাই লেগে থাকে, নদনদীর তট ক্ষয়ে যায় প্রায়শঃই, সেখানে ইটের ঘর-বাড়ির আয়ুই বা কতদিনের হতে পারে? এজন্যে এখানে খুব প্রাচীন স্থাপত্যকীর্তি বলতে গেলে কিছুই নেই। মুসলমানপূর্ব যুগের খুব অল্প স্থাপত্যকীর্তিই বর্তমান এবং এগুলি থেকে প্রাচীনকালের সবরকমের স্থাপত্যকীর্তি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ কোন ধারণা করা যায় না। কোন্ কোন্ অঞ্চলে কোন্ ধরনের ঘরবাড়ি ছিল, তা বলা দুরূহ। মুসলমানপূর্ব যুগের বাংলার স্থাপত্যশিল্পের ইতিহাস তাই অনেকাংশেই অনুমানের উপর নির্ভরশীল।

বাংলার স্থাপত্যশিল্পের ইতিহাস রচনা করার সময় এই উপাদানের অভাব বিশেষভাবে অনুভূত হয়। যে ক'টি প্রাচীন স্থাপত্যকীর্তি বর্তমান, তার মধ্যে অধিকাংশই ভগ্ন অথবা অর্ধভগ্ন। এই উপাদানের উপর নির্ভর করে বাংলাদেশের স্থাপত্যশিল্পের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করা দুরূহ। এমতাবস্থায় তথ্য আহরণ করতে হয় নানাপ্রকারের উপাদান থেকে। ভাস্কর্য আর পাণ্ডুলিপিচিত্রে বাংলাদেশের স্থাপত্যকীর্তির নিদর্শন দেখা যায়। অন্যান্য অঞ্চলের স্থাপত্যকীর্তি ও বাংলাদেশের প্রায়শ অস্পষ্ট স্থাপত্য নিদর্শনের রহস্য উদ্ঘাটনে সহায়তা করে। এইভাবে বিভিন্ন রকমের উপাদান থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে এ-দেশের স্থাপত্যশিল্পের বিভিন্ন প্রকরণ, গঠনরীতি প্রভৃতি সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা করা চলতে পারে, যদিও স্থাপত্যশিল্পের বিভিন্ন প্রকরণের- উৎপত্তি ও বিবর্তনের সম্পূর্ণ এবং সুসংবদ্ধ ইতিহাস রচনার

পক্ষে এ-উপকরণ যথেষ্ট নয়। তা ছাড়া বাংলার স্থাপত্যশিল্প সম্বন্ধে যেটুকু তথ্য আমরা অবগত হয়েছি তার অধিকাংশই ধর্ম-সম্পৃক্ত, ফলে সাধারণ লোক-মানসের প্রতিচ্ছবি এর মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই অনুপস্থিত।

মুসলমানপূর্ব যুগের বাংলার এই সব ধর্মগত বাস্তুকে মোটামুটি তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়: স্তূপ, বিহার ও মন্দির। বৈদিক যুগেও শ্মশানে মাটির স্তূপ তৈরি হত, কিন্তু বৌদ্ধরাই এই স্তূপকে বিশেষভাবে গ্রহণ করেন এবং বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্মের প্রতীকস্বরূপ স্তূপপূজার প্রচলন করেন। পশ্চিমবঙ্গে প্রাপ্ত প্রাচীন স্তূপের নিদর্শন হিসাবে বাহুলাড়া তমলুক রাঙামাটি প্রভৃতি স্থানের স্তূপের উল্লেখ করা যেতে পারে। এ-প্রসঙ্গে রাজশাহীর পাহাড়পুরের স্তূপের কথাও বলা যায়। এই সব স্তূপ আয়তনে ক্ষুদ্র, বৃহদাকৃতি স্তূপ বাংলাদেশে বিরল। স্তূপের পরে আসে বিহার। সুপ্রাচীনকালে পাহাড় কুঁদে বাসযোগ্য যে গুহা তৈরি করে 'বিহার' স্থাপনা হত। স্তূপের মতো এই বিহারও বৌদ্ধরা গ্রহণ করে এবং বিহারে থেকে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা অধ্যয়ন-অধ্যাপনা, ধর্মচর্চা ইত্যাদি করতেন। পাহাড় কুঁদে বিহার তৈরি ছাড়া ইট বা পাথরের ভিত ও কাঠামোর উপর বাঁশ, কাঠ ইত্যাদি দিয়েও বিহার তৈরি হত। একসময় এই বিহার দো-তলা, তেতলা, নয়তলা পর্যন্তও হত। পশ্চিমবঙ্গের বিহারসমূহের মধ্যে মুর্শিদাবাদের রাঙামাটি (বা রক্তমৃত্তিকা) ও মেদিনীপুরের তমলুকের ভারাহা বিহার অন্যতম। রাজশাহীর পাহাড়পুরের বিহারের কথাও এ-প্রসঙ্গে মনে আসে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙের গ্রন্থে রক্তমৃত্তিকা বিহারের; ওই-চিংএর গ্রন্থে ভারাহা বিহারের বর্ণনা পাওয়া যায়।

বিহারের পর মন্দির-স্থাপত্যের প্রসঙ্গ উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন প্রাচীন লিপি ও সাহিত্যগ্রন্থ থেকে জানা যায়, বাংলাদেশে অনেক মন্দির তৈরি হয়েছিল। কিন্তু একাদশ-দ্বাদশ শতকের কয়েকটি ভগ্ন ও অর্ধভগ্ন মন্দির ছাড়া সেই সব প্রাচীন মন্দিরসমূহের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। সমসাময়িক লিপি ও সাহিত্যগ্রন্থের বর্ণনা এবং পাণ্ডুলিপি ও তক্ষণফলকে চিত্রিত মন্দিরের প্রতিকৃতির আকৃতি-প্রকৃতি থেকে বোঝা যায়, প্রাচীন বাংলায় মোটামুটি চারটি বিভিন্ন রীতির মন্দির নির্মিত হত। এই চারটি নির্মাণরীতি হল: ভদ্র বা পীড়া দেউল, রেখ বা শিখর দেউল, স্তূপশীর্ষ পীড়া বা ভদ্র দেউল,

এবং শিখরশীর্ষ পীঢ়া বা ভদ্র দেউল। পীঢ়া দেউলে গর্ভগৃহের চাল ক্রমহ্রস্বায়মান আকৃতিতে ধাপে-ধাপে উপরের দিকে উঠে যায় এবং সর্বোচ্চ ও ক্ষুদ্রতম স্তরের উপরে থাকে আমলক ও চূড়া। পীঢ়া দেউলের একটি নিদর্শন বাঁকুড়ায় এক্তেশ্বরের মন্দির, তবে সম্ভবত এই মন্দির মুসলমান আমলের। প্রাচীন বাংলার দেউল যে একসময় জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল, স্তূপে এবং তক্ষণফলকে উৎকীর্ণ প্রতিকৃতি-চিত্র, মূর্তি-খোদিত চিত্র ও পাণ্ডুলিপি-চিত্রসমূহ থেকে তা জানা যায়। ঢাকা-আস্রফপুরে প্রাপ্ত সপ্তম-অষ্টম শতকের একটি ব্রোঞ্জ চৈত্যে উৎকীর্ণ মন্দিরের প্রতিকৃতি এখনো পর্যন্ত বাংলার পীঢ়া দেউলের প্রাচীনতম রূপ বলে ধরা হয়। এই প্রতিকৃতি বাঁশ এবং খড়ের চালের কথা মনে করিয়ে দেয়। ঢালু ক্রমহ্রস্বায়মান দুটি চালের উপর সুন্দর চূড়াবিশিষ্ট এই মন্দির-প্রতিকৃতি লোকায়ত বাংলার আটচালা থেকে উদ্ভূত মনে হয়। গর্ভগৃহের উপর চারটি চাল। গর্ভগৃহের চারদিকে চারটি বারান্দা এবং বারান্দাগুলির উপর আবার আর চারটি চাল লাগিয়ে আটচালা গৃহ তৈরি হয়। গর্ভগৃহের চাল বারান্দার চালের চাইতে উঁচু এবং সমস্ত বাড়িটাকে দ্বিতল মনে হয়। এই জাতীয় দ্বিতল বা ত্রিতল খড়ের চালের রূপ থেকে সম্ভবত উদ্ভূত এই রীতি পরবর্তীকালে আরও সমৃদ্ধ ও জটিল রূপ ধারণ করে, এবং ক্রমশ ক্রমহ্রস্বায়মান ঢালু চালের সংখ্যা বেড়ে যায়। ভদ্র বা পীঢ়া নামে পরিচিত এই মন্দিরই উড়িষ্যার রেখ-মন্দিরসমূহের সম্মুখভাগের জগমোহন। কিন্তু বাংলার পীঢ়ার সঙ্গে জগমোহনের তফাত এই যে, জগমোহনের চাল ক্রমহ্রস্বায়মান পোতল-বিভক্ত পিরামিডাকৃতি হয়ে উপরের দিকে উঠে যায় এবং তার আমলকশিলার তলায় ঘণ্টাকৃতি একটি অংশ থাকে, অন্যপক্ষে বাংলার পীঢ়ায় এ-সব বৈশিষ্ট্য অনুপস্থিত। মুসলমানযুগের দ্বিতল পীঢ়া দেউল ক্রমহ্রস্বায়মান দুটি চালের উপর তৈরি, প্রত্যেকটি স্তর বাংলার চারচালার ঘরের মতো দেখতে। বিভিন্ন মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ প্রতিকৃতি থেকে এ-জাতীয় মন্দির-রূপের আভাস পাওয়া যায়। পূর্বোক্ত আস্রফপুর ফলকোৎকীর্ণ প্রতিকৃতি এর একটি প্রাসঙ্গিক দৃষ্টান্ত। তফাত হচ্ছে, শুধু এ সময়ের পীঢ়া দেউলের প্রত্যেকটি স্তরের ঢালু চাল আগেকার মতো সোজা না হয়ে বেঁকে গেছে এবং কার্নিশ-গুলোও সেই সঙ্গে বেঁকে গেছে। চালের এই বক্রাকার রূপ সম্ভবত বক্রাকৃতি বাঁশের ও খড়ের চালের ঘরকে অনুকরণ করারই ফলশ্রুতি।

রেখ বা শিখর-দেউলে গর্ভগৃহের চাল ঈষদ্বক্র রেখায় শিখরাকৃতি হয়ে সোজা উপরের দিকে উঠে যায়। শিখরের উপরে থাকে আমলক ও চূড়া। পশ্চিমবঙ্গ তো বটেই, অবিভক্ত বাংলারও প্রাচীনতম নিদর্শন সম্ভবত বরাকরের ৪নং মন্দিরটি। অন্যান্য প্রাচীন রেখ-দেউলের মধ্যে বর্ধমানের দেউলিয়া-গ্রামের মন্দির, বাঁকুড়ার বাহুলাড়া-গ্রামের সিদ্ধেশ্বর মন্দির ও দেহার গ্রামের ষাঁড়েশ্বর ও মল্লেশ্বর মন্দির এবং সুন্দরবনের জটার দেউল। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া বাংলার অন্যান্য স্থানে এই রীতির কয়েকটি ক্ষুদ্রায়তন মন্দির রয়েছে। এদের মধ্যে দিনাজপুরের বানগড়, রাজশাহীর নিমদীঘি এবং চট্টগ্রামের ঝেওয়ারীতে প্রাপ্ত নিবেদন-মন্দিরগুলি উল্লেখযোগ্য। সংখ্যায় অপেক্ষাকৃত অধিক হওয়াতে মনে হয় রেখদেউল অবিভক্ত বাংলার প্রায় সর্বত্রই অল্পবিস্তর তৈরি হয়েছিল। মানভূম জেলার বোরম, তেলকুপী, পকবীরা প্রভৃতি বাংলা-ভাষী অঞ্চলসমূহেও এ-জাতীয় মন্দির দেখতে পাওয়া যায়।

উত্তরভারতের সর্বত্র এবং দাক্ষিণাত্যের কৃষ্ণা-তুঙ্গভদ্রা অববাহিকা পর্যন্ত অঞ্চলসমূহে 'নাগর' নামে পরিচিত বহুপ্রচলিত মন্দির-নির্মাণরীতির আঞ্চলিক রূপ হল এই সমস্ত রেখ-দেউল। কোন কোন অংশে উড়িষ্যার রেখ-দেউলের সঙ্গেও বাংলার এ-সব মন্দিরের আত্মীয়তা বর্তমান, আবার পশ্চিমভারতের নাগর-দেউলের কতকগুলি বৈশিষ্ট্যও এদের মধ্যে সহজেই চোখে পড়ে। উদাহরণত বরাকরের চার নম্বর মন্দিরের 'কনকেভ' আমলকের সূক্ষ্মাগ্র ধারসমূহ, মন্দিরের ঊর্ধ্বাংশের রাহাপগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আমলকসমূহ, রাহাপগ-বিভাজক নিরবচ্ছিন্ন রেখা ইত্যাদির উল্লেখ করা যায়। এই বৈশিষ্ট্যগুলি সুরাষ্ট্রের পস্থার-এর সুপ্রাচীন মন্দিরে বর্তমান। বর্ধমানের দেউলিয়া বা সাত দেউলিয়ার মন্দিরেরও বাড়ের উপর বিপরীতমুখী পিরামিডাকৃতি অফ-সেট, ভূমি-আমলকের অনুপস্থিতি অভিনবত্বসমূহ লক্ষণীয়। এই সমস্ত অলঙ্করণ প্রভৃতি অভিনবত্বের প্রকৃতি নির্ধারণ করা দুরূহ। নাগররীতিতে নির্মিত আঞ্চলিক সংস্করণের মন্দিরসমূহের মূল শিখরের চারপাশে ছোট ছোট কতগুলি শিখর থাকে ; এই শিখরগুলিকে 'অঙ্গশিখর' বলে। অঞ্চল বিশেষে অঙ্গশিখরের গঠনরূপেরও পার্থক্য হয়। বাংলাদেশের এ-জাতীয় মন্দিরেও আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য বর্তমান। বাহুলাড়ার সিদ্ধেশ্বর মন্দিরের ও সুন্দরবনের জটার দেউলের অঙ্গ-শিখরের স্বকীয়তা লক্ষণীয়। বরাকরের মন্দির এবং দেহারের দুটি মন্দির পাথরের তৈরি,

অন্যান্য রেখ-দেউলগুলি ইটের তৈরি। এই সব স্থাপত্যকীর্তির গাত্রালঙ্কারসমূহ পরিচ্ছন্নতা এবং নিখুঁত নৈপুণ্যের স্বাক্ষর বহন করছে, অঙ্গ-অলঙ্করণ হিসাবে এদের সৌন্দর্য অতুলনীয়।

অন্য দু-ধরনের মন্দির, স্তূপশীর্ষ এবং শিখরশীর্ষ পীঢ়া-দেউলের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। অস্বাভাবিক আকৃতির এ-ধরনের মন্দির বাংলাদেশেই নির্মিত হয়েছিল এবং এখান থেকে বহির্ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এ-দুই রীতির প্রভাব বিস্তৃত হয় এবং সে-সব স্থানে এ-রীতিতে মন্দির তৈরি হয়। ভাস্কর্য ও ফলকে উৎকীর্ণ এবং পাণ্ডুলিপি-চিত্র থেকে এ-দুই ধরনের মন্দিরের কথা আমরা জানতে পারি। স্তূপশীর্ষ পীঢ়া-দেউল যে বাংলায় তৈরি হত, বিভিন্ন প্রাচীন পাণ্ডুলিপি-চিত্রে তার প্রমাণ। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে রক্ষিত 'অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা'র একাদশ-শতকের একটি পাণ্ডুলিপি-চিত্রে নালেন্দ্র নামক স্থানের লোকনাথ-মন্দির এবং উড্ডীয়ান ও তীরভুক্তির অপর দুইটি মন্দিরের প্রতিকৃতি এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এই নির্মাণশৈলী অনুযায়ী চতুষ্কোণ গর্ভগৃহের উপর ক্রমহ্রস্বায়মান ঢালু চালের স্তরের উপর একটি বড় স্তূপ থাকত এবং প্রত্যেকটি স্তরের চারটি কোণে কোণে একটি করে ক্ষুদ্রাকৃতি স্তূপ অলঙ্করণ হিসাবে যোজিত হত। ব্রহ্মদেশ-পাগানের অভয়দান এবং পটোথাম্যা মন্দির দুটিও এই আদর্শে রচিত বলে মনে হয়। স্তূপশীর্ষ পীঢ়া-দেউলের মতো শিখরশীর্ষ পীঢ়া দেউলেরও কোন বাস্তব নিদর্শন পাওয়া যায় না; আভাস যা পাওয়া যায় তা ভাস্কর্য ও পাণ্ডুলিপি-চিত্রের প্রতিকৃতি থেকে। এমনি একটি পাণ্ডুলিপি-চিত্রে আঁকা বুদ্ধ-মন্দিরের প্রতিকৃতি থেকে অনুমিত হয় এ-জাতীয় মন্দিরও বাংলাদেশে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। শিখরশীর্ষ পীঢ়া-দেউলে ক্রমহ্রস্বায়মান চালের সর্বোচ্চটির উপর একটি শিখর এবং শিখরের উপর আমলকশিলা থাকত; বৌদ্ধ-মন্দির হলে আমলকশিলার উপর একটি প্রতীক-স্তূপ স্থাপিত হত। রাজশাহী জেলার পাহাড়পুর গ্রামে আবিষ্কৃত বিশাল মন্দিরটিও সম্ভবত শিখরশীর্ষ পীঢ়া দেউল ছিল। ব্রহ্মদেশ-পাগানের আনন্দ, সর্বজ্ঞ প্রভৃতি মন্দিরও পাহাড়পুর মন্দিরের স্থাপত্যরীতি-প্রভাবিত বলে মনে হয়। যবদ্বীপের প্রাচীন লোরো-জোংরাং এবং চণ্ডীসেবু মন্দিরও সম্ভবত উক্ত রীতি-প্রভাবে নির্মিত হয়েছিল।

এ তো গেল মুসলমানপূর্ব যুগের স্থাপত্যের বিবৃতি। হিন্দুযুগের মতো

মুসলমানযুগেও বিভিন্ন প্রকরণের মন্দির তৈরি হয়েছিল। স্থাপত্যরীতির দিক থেকে এই সমস্ত মন্দির পাঁচ-ভাগে ভাগ করা যায়, রেখ-দেউল, চালা-দেউল, বাংলামন্দির, রত্ন অথবা বহু শিখরযুক্ত মন্দির, শিখরযুক্ত অষ্টকোণাকৃতি মন্দির। এ ছাড়াও বিষ্ণুপুরের রাসমঞ্চে এক অভিনবরীতির সন্ধান পাওয়া যায়। এ-সময়কার রেখ-দেউলে নতুন কোন বৈশিষ্ট্য আসেনি; পূর্বের রেখ-দেউলেরই অনুরূপ। বরাকরের এক, দুই ও তিন নম্বর মন্দির, মেদিনীপুরের কর্ণগড়ের মন্দির, বর্ধমান-গৌরাঙ্গপুরের ইছাই ঘোষের দেউল প্রভৃতি মধ্যযুগীয় রেখ-দেউল গঠনরীতির দিক দিয়ে বরাকরের চার নম্বর মন্দির বা বাহুলাড়ার সিদ্ধেশ্বর মন্দিরের উত্তরসূরী এবং শিল্পবিচারে এদের চেয়ে নিকৃষ্ট। বরাকরের চার নম্বরের মন্দির বা সিদ্ধেশ্বর মন্দিরের সুষমা ও সৌন্দর্য এই সব মন্দিরে নেই বললেই হয়।

চালা-মন্দির সাধারণত দুই শ্রেণীর, চৌচালা ও আটচালা। বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলে বাঁশ বা কাঠের খুঁটির উপর মাটির দেয়াল বা বাঁশের চাঁচারীর বেড়ায় ঘেরা দোচালা, চৌচালা, আটচালা প্রভৃতি চালা-ঘরের অনুকরণে নির্মিত মন্দিরকে চালা-মন্দির বলে এবং চালার সংখ্যা অনুযায়ী চৌচালা, আটচালা প্রভৃতি মন্দিরের নাম হয়। চৌচালা বা চারচালা মন্দিরের নিদর্শন বর্ধমানের গরুইতে পাওয়া গেছে। আটচালা মন্দিরের নিদর্শন বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই পাওয়া গেছে।

'বাংলা' মন্দিরও দু-রকমের, এক-বাংলা ও জোড়-বাংলা। এক-বাংলা মন্দিরের কোন নিদর্শন নেই। জোড়-বাংলা মন্দিরের কিছু কিছু নিদর্শন আছে। হুগলী-গুপ্তিপাড়ার চৈতন্যমন্দির বা বিষ্ণুপুরের মন্দির বাংলা-মন্দিরের প্রাসঙ্গিক দৃষ্টান্ত। বিষ্ণুপুরের মন্দির দুখানি বাংলা দোচালা ঘরের সমন্বয়ে গঠিত, তাই নামও 'জোড়বাংলা'। উড়িষ্যায় এ-ধরনের মন্দির-নির্মাণ-পদ্ধতিকে গৌড়ীয় বা বাংলা রীতি বলে। বাংলার নিজস্ব এই মন্দির-স্থাপত্য-রীতি রাজপুত এবং মোগল স্থাপত্যরীতিকেও যথেষ্ট প্রভাবান্বিত করেছিল। ভারতীয় স্থাপত্যের ইতিহাসে বাংলার এই দান উপেক্ষণীয় নয়।

রত্নমন্দির বা বহু শিখরযুক্ত মন্দির প্রধানত পঞ্চরত্ন বা পঞ্চশিখরান্বিত এবং নবরত্ন বা নয়টি শিখরান্বিত, এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। বর্গাকার নকশার ভিত্তিতে নির্মিত এই ধরনের মন্দিরের কার্নিশ বক্রাকৃতি হয় এবং মূল শিখরকে

ঘিরে চারকোণে চারটি ছোট ছোট শিখর থাকে, এই শিখরগুলির আকৃতিও বক্রাকার। পঞ্চরত্ন মন্দির বাংলাদেশে বহু দেখা যায়। নবরত্ন অথবা ন'টি শিখরযুক্ত মন্দির দ্বিতল হয়, একতলার চালের চারকোণে চারটি ছোট শিখর এবং দোতলায় মূল শিখরকে ঘিরে আর চারটি ছোট শিখর থাকে। নবরত্ন মন্দিরও পশ্চিমবঙ্গে প্রচুর দেখা যায়। মন্দিরের তলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছোট ছোট শিখরের সংখ্যাও বাড়তে থাকে এবং তিন-তলা, চার-তলা, পাঁচ-তলা, ছ-তলা মন্দিরে সেই অনুযায়ী যথাক্রমে তের, সতের, একুশ এবং পঁচিশটি রত্ন যোজিত হয়।

শিখরযুক্ত অষ্টকোণাকৃতি মন্দিরও গঠনরীতির দিক থেকে নূতন। মুর্শিদাবাদের বড়নগরের রানী ভবানীর মন্দির, রাজশাহীর নাটোরের মন্দির প্রভৃতি এ-জাতীয় মন্দিরের নিদর্শন। এ ধরনের মন্দির বোধ হয় রানী ভবানীই সর্বপ্রথম তৈরি করেন।

অভিনবাকৃতি মন্দিরের একটিমাত্র নিদর্শন বিষ্ণুপুরের সুবিখ্যাত রাসমঞ্চ। পিরামিডাকৃতি এই মন্দিরের চারপাশে খিলান-শ্রেণীর সমাবেশে এই কীর্তির অভিনবত্ব লক্ষ করা যায়।

একমাত্র রেখ-দেউল বাদে, বাকি অন্য সমস্ত মন্দিরের প্রধান বৈশিষ্ট্য বক্রাকৃতি কার্নিশ। এই সমস্ত মন্দিরে সুন্দর সুন্দর অলঙ্কারবহুল পোড়ামাটির প্রতিকৃতি, চিত্রফলক প্রভৃতি বিদ্যমান। মন্দিরের সম্মুখভাগে সাধারণত বহুপত্রাকৃতি তিনটি খিলান থাকে; এই খিলানগুলিও সুন্দরভাবে চিত্রোৎকীর্ণ। মনে হয়, পোড়ামাটির তক্ষণশিল্পে যেন বাঙালী শিল্পীদের প্রতিভা অবাধ স্ফূর্তিলাভ করতে পারে।

নদীশ্যামল বাংলায় আবহমানকাল থেকে বাঙালী শিল্পীরা পোড়ামাটির মাধ্যমে তাঁদের রূপ-কল্পনা ধ্যান-ধারণা প্রকাশ করে এসেছেন। ইটের ঘর-বাড়ি তুলতে বাঙালী স্থপতি প্রকাশ করেছেন তাঁদের স্বভাবদক্ষতা। উপাদানের অপ্রতুলতার জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইটের স্থাপত্যকীর্তিসমূহ স্বভাবতই ছোট। কিন্তু আয়তনে ছোট হলেও এই সব ইটের স্থাপত্যকীর্তির গায়ে, বিশেষত সম্মুখভাগে, অকৃপণভাবে তাঁরা তাঁদের শিল্পনৈপুণ্যের স্বাক্ষর বিকীর্ণ করে দিয়েছেন। প্রথমদিকে ততটা না হলেও, পরবর্তীকালের মন্দির ও অন্যান্য স্থাপত্যকীর্তিতে এর যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। মন্দিরাদির প্রবেশপথ

ও সম্মুখভাগের কারুকার্যসমূহে ফুটে উঠেছে তুলনাহীন সৌন্দর্য-সুষমা, মার্জিত ও সংযত রুচির অলঙ্করণে অপরূপ ও বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে সম্মুখভাগের খিলান-শ্রেণী। বক্রাকৃতি কার্নিশের উপস্থিতিতে বহুপত্রাকৃতি বিচিত্র খিলানত্রয় ও সমগ্র মন্দিরের মধ্যে একটা সুন্দর শৈল্পিক ভারসাম্য রক্ষিত হয়েছে। মন্দিরের মণ্ডপে সর্বত্র শিল্পের সুষমাজ্ঞান পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে; তাই বহু অলঙ্করণে সুশোভিত হলেও সমগ্রভাবে মন্দিরটিকে অলঙ্কারবহুল বা অলঙ্কার-কণ্টকিত মনে হয় না। ফলে মন্দিরের এককোণ থেকে আরেককোণ অবধি দ্রষ্টার মুগ্ধ দৃষ্টি স্বচ্ছন্দে বিচরণ করতে পারে, একটি চিত্রসারি (প্যানেল) থেকে আরেকটি চিত্রসারি (প্যানেল) অনায়াসে তার দৃষ্টি চলে যায়। বহু চিত্রের উপর বিচরণ করলেও ক্লান্তিকর একঘেঁয়েমি ও গতানুগতিকতায় কখনো তার প্রেক্ষণ বিমলিন হয় না। মন্দিরের সামগ্রিক সৌন্দর্যের ঔজ্জ্বল্যে তার মানসলোক সুন্দর স্নাতশুভ্র হয়ে ওঠে।

ধর্মঠাকুর ও মনসা

শ্রীসুকুমার সেন

অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

১

ধর্মদেবতার রীতিমত পূজা এখন পশ্চিমবঙ্গে, একান্তভাবে বর্ধমান বিভাগে সীমাবদ্ধ। তবে চব্বিশ পরগনায়, কলিকাতার কাছাকাছি অঞ্চলে, ধর্মদেবতার বিগ্রহ ও নিত্যপূজা একেবারে লুপ্ত হয়নি। পূর্ববঙ্গের স্থানে স্থানেও ধর্মদেবতার পূজার ইঙ্গিত অনবলুপ্ত। সেখানে ধর্মের গাজন সাধারণত দেল পূজা অর্থাৎ দেউল পূজা নামে প্রসিদ্ধ। কোথাও কোথাও পাটপূজাও বলে।

ধর্মদেবতার উৎপত্তি বহুমুখ। অর্থাৎ বিভিন্ন সূত্রে আগত বিভিন্ন দেবভাবনা ও দৈবচিন্তা মিশে গিয়ে এক হয়ে ধর্মঠাকুরে রূপ নিয়েছে। এই সব সূত্র কিছু কিছু খুঁজলে মেলে।

প্রথমত ধর্ম সূর্যদেবতা। ধর্মমঙ্গলের কাহিনীতে এর প্রচুর প্রমাণ আছে। ধর্মপূজায় তো আছেই।

দ্বিতীয়ত ধর্ম যমদেবতা। বেদে আর আবেস্তায় যম বিবস্বানের পুত্র, বৈবস্বত। সুতরাং এখানেও সূর্যের সঙ্গে যোগ। বেদে আর আবেস্তায় উভয়ত্রই যম রাজা। যমরাজ কথাটির প্রয়োগ ঋগ্‌বেদেও আছে, পৌরাণিক সাহিত্যে তো কথাই নেই। বেদে না পেলেও অন্যত্র যমরাজ সাধারণত ধর্মরাজ বলেই উল্লিখিত। এর থেকেই ধর্মঠাকুরের নাম। ধর্মশিলার বিশিষ্ট নামের শেষাংশ—যেমন বাঁকুড়ারায়, কালুরায়, মেঘরায়, চাঁদরায়, খুদিরায়, সুন্দররায়, বুড়ারায়, জগৎরায়, দলুরায় ইত্যাদি—ধর্মরাজের 'রাজ' থেকেই এসেছে। ধর্মঠাকুর রাজা-দেবতা, তাঁর গাজনের অনুষ্ঠানে রাজসভার অনুকৃতি সুস্পষ্ট।

তৃতীয়ত ধর্ম বরুণদেবতা। ঋগ্‌বেদে যম আর বরুণ এই দু দেবতাই বেশি করে রাজসম্মান পেয়েছেন এবং দুজনে একত্রও বন্দিত হয়েছেন। ধর্মমঙ্গলের হরিশ্চন্দ্র পালার ধর্মদেবতা ঐতরেয় ব্রাহ্মণে কথিত শুনঃশেফ কাহিনীর বরুণদেবতার সঙ্গে অভিন্ন। ধর্মঠাকুরের সাংজাত অনুষ্ঠান বৈদিক বরুণ-

যজ্ঞের অনুরূপ। গাজনের দাহুড়ঘাটা পর্ব খানিকটা জলদেবতার পূজা-উৎসব।

চতুর্থত ধর্ম কূর্মদেবতা। এখানে একটা কথা বলবার আছে। ধর্মঠাকুরের শাস্ত্রে ও কাহিনীতে কোথাও ধর্মকে কূর্মাকৃতি দেবতা বলা হয় নি। বলা হয়েছে এই মাত্র যে কূর্ম তাঁর পাদপীঠ, অধিষ্ঠান। সেইজন্ত পরবর্তী কালের অর্থাৎ সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে নির্মিত কূর্মাকৃতি ধর্মবিগ্রহে কূর্মের উপরে ধর্মের পদদ্বয় আঁকা থাকে। ব্রাহ্মণ্য পুরাণে কূর্ম বাসুকিকে ধারণ করে আছেন আর তার উপর বসুমতী। ইনিই পুরাণে কূর্ম অবতার। ধর্মের কাহিনীর সঙ্গে এ কাহিনী মেলাতে গেলে নাগ হন ধর্মঠাকুর, আর বসুমতী তাঁর কামিনী-কেতকা। ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রে কূর্ম অবতারের পূজার কোন বিধান আছে বলে জানি না। কিন্তু লোক-ব্যবহারে যে ছিল তার প্রমাণ পেয়েছি। প্রসঙ্গত বলি, পূজনীয় শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যা বলেছেন, অর্থাৎ ধর্ম ঠাকুরের নামটি এসেছে ধর্মের সমধ্বন্যাত্মক কোনো অন্-আর্য শব্দ থেকে, তার কোন সমর্থন মেলে না। যমের সঙ্গে ধর্মের যোগ দৃঢ় এবং নিগূঢ়। যমের ধর্মরাজ নাম প্রায় আড়াই হাজার বছর আগেই প্রসিদ্ধ হয়েছিল। সুতরাং ধর্মের নামের উৎপত্তি আর্যভাষার বাইরে খোঁজবার আবশ্যক নেই। অবশ্য অন্য দিক দিয়ে ধর্মপূজার সঙ্গে অন্-আর্য আচার অনুষ্ঠানের কিছু না কিছু যোগ কালে কালে অবশ্যই হয়েছে।

পঞ্চমত ধর্ম শূন্যমূর্তি দেবতা, যিনি ব্রহ্ম-অণ্ড ভেদ করে উদ্ভূত হয়েছিলেন এবং যিনি ব্রহ্মাণ্ডের অসীম জলরাশির মধ্যে ত্রিকোণ পৃথিবী এবং ত্রিদেব—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর—সৃষ্টি করে শূন্যে বিলীন হয়েছিলেন, অর্থাৎ মারা গিয়েছিলেন। ব্রাহ্মণ্য পুরাণের ব্রহ্মাণ্ড ধারণা—অর্থাৎ বৃহৎ অণ্ড ভেঙে বিশ্বের উৎপত্তি—ধর্মঠাকুরের কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত। ঋগ্বেদের সূক্তে (১০, ১২৯) 'তুচ্ছ' অর্থাৎ কিছু-না থেকে ডিমের আবির্ভাব এবং সে ডিমের দুদিক থেকে—স্বধা ও প্রযতি—তা দেওয়ার উল্লেখ আছে। ডিম ভেঙে বেরুল কী তার কোন স্পষ্ট বর্ণনা কোথাও নেই, না বৈদিক সাহিত্যে, না ব্রাহ্মণ্য পুরাণে, না ধর্মের কাহিনীতে। তবে এদিক ওদিক থেকে সংগ্রহ করে নির্ভরযোগ্য অনুমান খাড়া করা যায়। ধর্মকাহিনীর সৃষ্টি বর্ণনা থেকে মনে হয় তিনি ছিলেন সাপ। জলে ভাসতে ভাসতে তিনি ছাড়লেন হাই। তার থেকে জন্মাল

পাখী উলুক। সে হল তাঁর বাহন। বাহনে চড়ে উড়ে উড়ে ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত হয়ে শেষে তিনি পৃথিবীর সৃষ্টি করলেন। এখানে ব্রাহ্মণ্যে পুরাণের সঙ্গে কতকটা মিলে যায়—কূর্মের উপর বাসুকি বা শেষ তার মাথায় পৃথিবী। ধর্মঠাকুরকে যে একদা—সম্ভবত অতিপ্রাচীন অন্-আর্য বা অ-বৈদিক ঐতিহ্যে—সাপ কল্পনা করা হত তার প্রমাণ কি, এ প্রশ্ন উঠতে পারে। প্রমাণ আছে। মনসামঙ্গলের কাহিনী গোড়ার দিকে ধর্মকাহিনীর সঙ্গে অভিন্ন। (মনসাই ধর্মের কামিনী।) বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল সবচেয়ে পুরানো। তাতে পাই যে শিব মনসাকে সিজুয়া পর্বতে ফেলে রেখে আসবার সময় ধামাইকে সৃষ্টি করেছিলেন, তার রক্ষক ও বাহন রূপে। ধামাই ধর্ম, এবং সে সাপ। পরে হয়েছে ঢেমনা বা ঢোঁড়া সাপ। এখানে মিলে যাচ্ছে, বাসুকির উপর বসুমতী=ধামাইয়ের উপর মনসা। পুরাণে বর্ণিত কৃষ্ণলীলায় পাই যে অক্রুর যখন কৃষ্ণবলরামকে বৃন্দাবন থেকে মথুরা নিয়ে যাচ্ছিলেন তখন যমুনার তীরে রথ রেখে তিনি যমুনার হ্রদে ডুব দিয়েছিলেন নাগরাজ শেষকে দর্শন ও বন্দনা করতে। হরিবংশে নাগরাজাকে বলা হয়েছে ধর্মদেব, তিনি শুভ্র এবং তিনি ধর্মাসনগত। নাগরূপী ধর্মদেবতার এক পরিণতি বাস্তুদেবতায়।

ষষ্ঠত ধর্ম অশ্বারোহী যোদ্ধা দেবতা। এ দেবতার আবির্ভাব ধর্মমঙ্গল-কাহিনীর উদ্ভবের আগেই হয়েছে। ধর্মপূজাপদ্ধতি বর্তমান রূপ নেবার বেশ কিছু কাল আগে কোন কোন ধর্মমঙ্গল রচয়িতা এঁকে সিপাহী বেশে কল্পনা করেছেন। এ কল্পনার মধ্যে তিনটি উপাদান আছে। এক, ইরানীয় বুটপরা সূর্যদেবতা—যাঁর বিশেষ উপাসক শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ এবং যিনি দুঃসাধ্য রোগের অপহর্তা রূপে উপাসিত হতেন। দুই, বিজয়ী মুসলমান শক্তির সিপাহী-রূপ কল্পনা। ইনিই ব্রাহ্মণ্য পুরাণে প্রোক্ত ভবিষ্যৎ কল্কি অবতার। ধর্মের থানে—এবং তার থেকে পীরের থানে—মাটির ঘোড়া দেওয়া এই যোদ্ধা দেবতারই বিশিষ্ট অর্ঘ্য।

সপ্তমত ধর্ম গোরূপ দেবতা। আসামের বোড়োদের মধ্যে প্রচলিত কাহিনী অনুসারে ধর্মঠাকুর মরা গোরুর রূপ নিয়ে তাঁর পুত্রদের ছলনা করেছিলেন। তাঁরা সে দেহ ভক্ষণ করেছিলেন। পৌরাণিক কাহিনীতে ধর্মকে বৃষ কল্পনা করা হয়েছে। সত্যযুগে তার চার পা ছিল। তার পরে তিন যুগে একটি একটি করে কমে কলিকালে কল্পিত হয়েছেন একপাদ রূপে।

বৈদিক ঋষি দেবশক্তির প্রচণ্ডতা বোঝাতে বৃষের উপমা দিতেন—একথাও এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। এখন মনে হচ্ছে, ধর্মপূজা বিধানে কলিমাজালাল প্রসঙ্গে যে গোহত্যার কথা আছে তা প্রাচীনতর গোরূপ-ধর্ম-ঐতিহ্যের এক নব গোমেধ সংস্করণ। মুসলমান রাজশক্তি যখন স্বাভাবিক উপায়ে ধর্ম-ঠাকুরের সঙ্গে মিলে গেল তখন মৃত গোদেহ ভক্ষণের কাহিনীকে মুসলমানদের কোরবানির সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া সহজ হয়েছিল।

অষ্টমত শ্বেত পক্ষী। ইনিই আবার ধর্মঠাকুরের বাহন ও মন্ত্রী উলুক, বেদে যমের দূত শ্বেত কপোত-রূপে কল্পিত। কোন কোন ধর্মমঙ্গল-রচয়িতার কাছে ধর্মঠাকুর শঙ্খচিলরূপে দেখা দিয়েছিলেন।

আরও অনেক সূত্রাগত দেবভাবনা এসে মিলেছে ধর্মঠাকুরে। সে সব পরবর্তী কালের জোটনা এবং বর্তমান আলোচনার পক্ষে তত প্রয়োজনীয় নয়।

২

যে যে সূত্র ধরে ধর্মঠাকুরের মূলে পৌঁছই সেই সব সূত্রের কয়েকটি ধরে ধর্মঠাকুরের সঙ্গিনী কেতকা মনসার কাছেও পৌঁছই।

প্রথমত কেতকা-মনসা ধর্মের অঙ্গজা, বেদের যমী যিনি ভগিনী হয়ে ভ্রাতাকে কামনা করেছিলেন পতিরূপে। কেতকাও ধর্মের কামিনী (কামিন্যা)। বেদের কাহিনীতে (এবং আবেস্তায়) যম মারা গিয়েছিলেন, ধর্মের কাহিনীতেও তাই।

দ্বিতীয়ত কেতকা বারুণী। তাঁর প্রতীক জলভরা (আদিতে মদভরা?) ঘট, বেদের শ্বেত সোমকলস। তার থেকে নানা পথ-বাঁক ঘুরে তিনি একদিকে হয়েছেন আরোগ্যের দেবতা—বিষহরি, অপর দিকে শস্যদেবতা ইলা, শ্রী।

তৃতীয়ত যম-ভগিনী যমুনারূপে কেতকাও কূর্মদেবতা, তাঁর বাহন কূর্ম। যমুনা কালো, গঙ্গা গৌরী। গঙ্গার বাহন মকর=গৌরী দুর্গার বাহন (?) গোধা।

চতুর্থত তিনি গোরূপিণী বসুন্ধরা। পুরাণে পৃথুর গোদোহন-কাহিনী স্মর্তব্য। এর ইঙ্গিত আবেস্তার প্রাচীনতম অংশে জরথুশ্‌ত্রের গাথায় আছে। সেখানে হত্যার সম্মুখীন হয়ে আদিসৃষ্ট গোরু আদিদেবের কাছে অনুনয় করছেন যাতে তাকে মারা না হয়। কেতকা যেমন একদিকে চণ্ডী হয়ে শিবগৃহিণী

হলেন, অপর দিকে ষাঁড় হয়ে শিববাহন হলেন। ঋগ্‌বেদে পাই যে রুদ্রের পত্নী হচ্ছেন পৃশ্নি অর্থাৎ বাঘাফটকা রঙের গাই। এখানে কেতকা-শিব বিবাহের আর একটা ছবি পাচ্ছি। বাংলা লৌকিক ধর্মে গোভাগাড়-বাসিনী গোমুণ্ড-প্রতীকা ভগবতী দেবীর উৎপত্তিও এই সূত্রে কল্পনা করতে পারি। মনসা পঞ্চমী দেবী, তাঁর পূজাতিথি হচ্ছে পঞ্চমী। ভগবতী ষষ্ঠী দেবী, তাঁর পূজাতিথি ষষ্ঠী। দেবী দুজন মূলত এক। তার প্রমাণ শীতল ষষ্ঠী। এ দিনে বাস্তুদেবতার পূজা। বাস্তুশিল্পে ছেলে-কোলে মনসা এবং ষষ্ঠী দুইই পাওয়া যায়।

পঞ্চমত চণ্ডীরূপিণী কেতকা পক্ষিদেবতাও বটেন। দেবকীগর্ভসম্ভূতা কাত্যায়নী শিলাপাটে আছাড় খেয়ে শঙ্খচিল হয়ে যান। এ কাহিনী সুবিদিত।

ধর্ম-মনসা (কামিনী) একদা যমজ দেবতারূপে একসঙ্গে একত্র পূজিত হতেন। এখন যেমন ধর্মের গাজনে হয়। কিন্তু প্রায় শুরু থেকেই মনসার পদ্ধতি অন্যপথ নিয়েছে। সেই জন্যে এখন ধর্মঠাকুরের সঙ্গে মনসার যোগা-যোগ খুব স্পষ্ট নয়। কেবল একটি ব্যাপারে মিল আছে। সে হচ্ছে বাস্তু পূজায়। কিন্তু এখানে ধর্মঠাকুর প্রায় বিলুপ্ত। ধর্ম যিনি ধারণ করেন, তিনিই বাস্তুদেব। নাগ পৃথিবী ধারণ করে আছেন। সুতরাং নাগ হলেন বাস্তুদেব। নাগের থেকে এলেন মনসা। তার থেকে এখন সিজের (মনসা গাছের) ডালে পৌঁছেছে। উনোনে মনসা গাছের ডাল রেখে এখন বাস্তুপূজা করা হয়। উনোন সেদিন বাস্তুর প্রতিনিধি, তাই অরন্ধন। নাগের অর্ঘ্য শীতলতা, আগুনের উত্তাপ নয়।

মনসার ইতিহাস অতীব বিচিত্র। তা আমি অন্যত্র বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছি। কৌতূহলীকে বিপ্রদাসের মনসাবিজয়ের ভূমিকা (ইংরেজিতে) দেখতে বলি (বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটি প্রকাশিত)।

৩

ধর্মের বার্ষিক (গাজন) ও নৈমিত্তিক (ঘরভরা) পূজা-অনুষ্ঠানে সেকালের নাগর ও জানপদ-সংস্কৃতির প্রায় সব আয়োজন সম্ভৃত হয়েছিল। সব জাতি, সব বৃত্তি, মায় রাজসভার যাবৎ পদিক সকলেরই স্থান ও মর্যাদা স্বীকৃত হয়েছে। ধর্মঠাকুর রাজদেবতা। রাজার দর্শন পেতে হলে রাজদ্বারে এসে গোহারি

করতে হত। তারপর রাজদ্বার উন্মুক্ত হত। এইই বারমতি (দ্বার-মৌক্তিক)। রাজদ্বার খোলা হলে দিগ্‌দেশাগত দর্শনপ্রার্থীদের ডাক দেওয়া হত রাজদর্শনের জন্যে সমবেত হতে। এরই নাম ধর্মডাক। (আধুনিক 'ধর্মের ডাকে' অর্থ পরিবর্তন লক্ষণীয়)। রাজসভা মণ্ডপ চৌহুয়ারি। চার দরজায় চার কোটাল প্রহরী। ধর্মের সিংহাসন "পাট"। তাই প্রধান ভক্তিয়ার নাম পাটভক্ত্যা। আর সব ভক্তিয়া রাজসভায় উচ্চপদাধিকৃত। ধামাৎকন্নি—ধর্মাধিকরণিক, আম্নিনী—আম্নায়িক, পড়িহার—প্রতীহার, কোঙারশাঞি—কুমারস্বামী অর্থাৎ কুমারামাত্য, শান্তিবিগ্রহী—সান্ধিবিগ্রহিক, ইত্যাদি।

ধর্মের তপস্যা সুকঠিন। তাই শালেভর, অর্থাৎ শল্যশয্যা। শালেভর সাধনায় ধর্মের সিংহাসন "পাট" কণ্টকশয্যায় পরিণত তপস্বী উপাসকের জন্যে।

ধানচাষ থেকে আখমাড়াই, এমন কি পাটনি বৃত্তি পর্যন্ত, সব কিছুর স্থান আছে ধর্মের গাজন অনুষ্ঠানে। এগুলি সবই মৌলিক রীতি-আগত নয়, স্থানীয় সংস্কৃতিকে কালে কালে আত্মসাৎকরণ। আরামবাগ-ঘাটাল অঞ্চলে মুসলমান-সংস্কৃতির একটা বড় ঘাঁটি হয়েছিল মান্দারন। এখানকার কোন কোন স্থানীয় ধর্মঠাকুরের গাজনে তাই মহরমের হাসনহোসেনের শোভাযাত্রাও স্থান পেয়েছে।

৪

ধর্মঠাকুরের শাস্ত্রে উক্ত সৃষ্টিকাহিনীতে কোথাও কোথাও ধর্মের উৎপত্তির আগে নীল আর অনিলের উদ্ভবের উল্লেখ পাই। যেমন দ্বিজ লক্ষ্মণের অনিল-পুরাণে। সেখানে যে কথা আছে তাতে নীল-অনিল যথাক্রমে নাথযোগীদের মন-পবন। অনাদিদেবের সৃষ্টি বাঞ্ছা হল—

কে হইব নীল কে হইব অনিল
কার গর্ভে নিরঞ্জন সৃজিল শরীর।
মন হব অনল পবন হব নীল[১]
শূন্য ভবে করতার সৃজিল শরীর।

---

১ এখানে পাঠ স্পষ্টতই ভ্রান্ত মনে করি। 'মন হইব নীল পবন অনিল' এই পাঠ হওয়া উচিত।

তারপর ইসলামি কাহিনীর হারুত-মারুতের মত বা ঋগ্‌বেদীয় সূক্তের শ্রধা-প্রষতির মত

স্থখ সঙ্গেতে তারা হৈয়া গেল রঙ্গ
নীল অনিল রতি হৈয়া গেল যঙ্গ।
আন মাসে আন স্থান মহানিল জানে
অনিলের[১] গর্ভে তথা বাড়ে দিনে দিনে।

এই গর্ভবিম্ব ভেঙে আদিদেব ধর্মের জন্ম।

অনিল যে উলূক তাতে সন্দেহ নেই। ধর্মের হাই থেকে তার জন্ম। এখন সমস্যা হচ্ছে নীল নিয়ে। ধর্মঠাকুরের পুরাণ-কাহিনীতে বা পূজাবিধানে নীলের নামগন্ধ নেই। নীল এখন পূজিত হন মেয়েদের দ্বারা, চড়ক-পূজার আগের দিনে শিবেরই প্রকাশান্তর (?) বলে। পশ্চিমবঙ্গে সন্তানবতী নারীরা নীলের উপোস করে। এখন নীল নারীরূপেও কল্পিত হন—নীলাবতী। মনে হচ্ছে, হয়ত নীলাবতী কথাটি ভেঙেই 'নীলের (ঘরে) বাতি' সৃষ্টি হয়েছে। তবে এটা আপাতত অনুমান মাত্র। উল্‌টোটাও সমান সম্ভব —অর্থাৎ নীলের বাতি থেকে নীলাবতী (লীলাবতীর সাদৃশ্যে?)। কিন্তু নীলাবতী কল্পনাকে খুব অর্বাচীন বলতে পারি না। মনে হয়, উলূক যেমন অনিল, কেতকা-কামিন্যা-বসুমতী তেমনি নীল। এ অনুমানের পোষণে বলতে পারি, ধর্মপূজাপদ্ধতিতে কামিন্যার ধ্যানমন্ত্রে তাঁকে বলা হয়েছে, "নীলজীমূত-সংকাশং...সদা মদনবিহ্বলাং...দেবীং কামিনাং প্রণমাম্যহম্"। বসুমতীকে শ্যামপুষ্প দিয়ে পূজা করবার বিধি আছে। আর তাঁর ধ্যানে বলা হয়েছে "শ্যামাং...বসুধাং ভজামহে"।

ধর্মঠাকুরের বর্তমান রূপ গড়ে ওঠবার অনেক আগেই নীলের সঙ্গে শিবের যোগ সাধিত হয়েছিল। বেদের নীললোহিতের মধ্যে আমি এরই ইঙ্গিত দেখছি। লোহিত যদি রুদ্র (রুধ্র থেকে, তুলনীয় রুধির) হন তাহলে নীল কি আমাদেরই নীল? নীললোহিত কি নীলসহিত রুদ্র? নীল যদি কামিন্যা হন তবে এর অর্থ করা যেতে পারে। কামিন্যার প্রতীক জলভরা হাঁড়ি। ধর্মপূজাতে তাঁকে "নমস্তে কামিনাকুণ্ডে" বলে বন্দনা করা হয়েছে।

১ পাঠ 'নীলের' হওয়া উচিত।

কামিন্যা কুণ্ডস্থিত ধর্মশিলা নীলবেষ্টিত রুদ্র, এ অনুমান করতে পারি। পুরানো বাংলা সাহিত্যে আমি শুধু এক জায়গায় নীলদেবতার (?) এবং শিবের নীল-বেষ্টনের উল্লেখ পেয়েছি। সে হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বাণখণ্ডে। রাধা নিজের লাসবেশ বর্ণনা করছেন,

থোঁপা পরতেথ মোর ত্রিদশ-ঈশ্বর হর
কেশপাশ নীল বিদ্যমানে।
সিন্দের সিন্দুর স্থর ললাটে তিলক চাঁদ
নয়নত বসএ মদনে॥

সুতরাং নীলকে শিবের আবরণ-দেবতা এবং ধর্মের কামিন্যা মনে করা সঙ্গত।

পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যাসমাজ

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

অতি প্রাচীন কাল হইতে বঙ্গদেশের সর্বত্র শাস্ত্রব্যবসায়ী পণ্ডিত দ্বারা অধ্যুষিত বিদ্যাসমাজ বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিশ্ববিদ্যালয়জাতীয় প্রতিষ্ঠান বিরাজমান ছিল—তাহাদের সম্যক্ বিবরণ দেওয়া সমুদ্রের তরঙ্গ-সংখ্যাগণনার ন্যায় অধুনা একান্তভাবে অসম্ভব। আমরা কেবল দিগ্‌দর্শনস্বরূপ পশ্চিমবঙ্গের কতিপয় প্রধান সমাজের বিবরণ অতিসংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিতেছি। ইংরাজ-শাসনে বঙ্গদেশ জেলায় বিভক্ত হইয়া সুনির্দিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু তৎপূর্বে ছিল বহুশত পরগণা বা ক্ষুদ্র-বৃহৎ রাজ্যসমূহ। প্রত্যেক পরগণায় বা রাজ্যে একটি করিয়া "রাজপণ্ডিত"-গোষ্ঠী থাকিত এবং তাঁহাদের নির্দেশক্রমে রাজ্যের যাবতীয় বিবাদের মীমাংসা হইত—ব্যবহারিক, সামাজিক অথবা ধর্মঘটিত। বলা বাহুল্য, এই রাজপণ্ডিতগণ সকলেই শাস্ত্রব্যবসায়ী বিদ্বদ্‌গোষ্ঠীর নেতৃত্ব করিতেন এবং ব্যবহারকাণ্ডে তাঁহাদের মর্যাদা বর্তমান জিলা-জজ্‌দের তুল্য ছিল। পাঠান ও মোগল আমলে পরগণাসমূহ ক্রমশঃ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে রাজপণ্ডিতদের পরিচয়াদি বিলুপ্ত হইয়া যায়। ঐ সময়েই নবদ্বীপ বিদ্যাসমাজের উৎপত্তি—ইহার মর্যাদা ব্যবহারকাণ্ডে ও ধর্মশাস্ত্রে হাইকোর্টের তুল্য ছিল। অথচ ইহার উৎপত্তি ও কালক্রমে "ভারতীয় রাজধানী" রূপে পরিণতি কেবল একটি রাজগোষ্ঠী বা তৎপ্রতিষ্ঠিত বিদ্বৎসমাজের দ্বারা হয় নাই—অনেকটা স্বাধীনভাবে আপামর জনসাধারণের মর্যাদাদানে ইহা গড়িয়া উঠিয়াছিল। নবদ্বীপের পণ্ডিত ও ছাত্রদের অসামান্য মর্যাদা প্রত্যক্ষ করিয়া ইংরাজ শাসক-গোষ্ঠী প্রমাদ গণিলেন। তাঁহারা শাস্ত্রব্যবসায়ী পণ্ডিতদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করার যাবতীয় উপায় অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের 'মানস'-পুত্রদের সাহায্যে সফলকাম হইয়াছিলেন। বর্তমানে শাস্ত্র, শাস্ত্রী ও শাস্ত্রীয়াচারের প্রতি মর্যাদাবোধ সর্বত্র এবং বিশেষ করিয়া বঙ্গদেশে বিলুপ্তপ্রায়। এই গ্রন্থে পণ্ডিত-সমাজের যথাসম্ভব বিবরণ সঙ্কলনে আগ্রহ দেখাইয়া সুযোগ্য গ্রন্থকার যে পুনরুজ্জীবিত মর্যাদার আভাস সৃষ্টি করিতেছেন তাহা অভিনন্দনযোগ্য।

নবদ্বীপে পরে কেবল ন্যায়শাস্ত্র ও স্মৃতিশাস্ত্রের চর্চা চরমপর্যায়ে প্রচলিত

ছিল—ব্যাকরণাদি লঘুশাস্ত্র সেখানে পড়ান হইত না। নৈয়ায়িকদের বিবরণ গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। এখানে কেবল স্মার্ত গ্রন্থকারদের একটি তালিকা-মাত্র সঙ্কলিত হইল। মহাপ্রভুর সমকালীন শ্রীনাথ আচার্যচূড়ামণি এবং তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হরিদাস তর্কাচার্য উভয়েই নবদ্বীপে বসিয়া বহুতর গ্রন্থ রচনা করেন। হরিদাস শ্রাদ্ধবিবেকের টীকায় এবং শ্রাদ্ধনির্ণয়-গ্রন্থে ১৪২৪ (অথবা চৈত্রাদি ১৪২৫) শকাব্দে চৈত্র-মলমাসের উল্লেখ করিয়াছেন (১৫০৩ খ্রী.)—তাঁহার গুরুর নাম ছিল ধরণীধর আচার্যসিংহ। শ্রাদ্ধবিবেকের টীকায় (৩৪-৫ পত্রে) অপর একটি মূল্যবান্ তথ্য লিখিত আছে—১৩৯৭ শকাব্দে (১৪৭৫-৬ খ্রী.) একই বৎসরে দুইটি মলমাস হইয়াছিল। (বাসুদেব সার্বভৌমের পিতা) "বিশারদ" একথা লিখিয়া গিয়াছেন এবং তৎকালে গৌড়ের সুলতান ছিলেন "বারবক সাহ"। হরিদাস ও তাঁহার প্রায় একপুরুষ পরবর্তী বগড়ী অঞ্চলের গৌতম-গোত্র "কৌমুদী"কার (১৪৫৭ শকে জীবিত) গোবিন্দানন্দ কবিকঙ্কণাচার্য উভয়েই শ্রীনাথের ব্যাখ্যা খণ্ডন করিয়াছেন। শ্রীনাথের পুত্র রামভদ্র ন্যায়ালঙ্কার (দায়ভাগের টীকাকার) এবং হরিদাসের পুত্র অচ্যুত চক্রবর্তী (দায়ভাগ, হারলতা ও শ্রাদ্ধবিবেকের টীকাকার) উভয়ই নবদ্বীপের বিখ্যাত স্মার্ত ছিলেন। কিন্তু শ্রীনাথের শেষ বয়সের ছাত্র বন্দ্যবংশীয় "স্মার্ত ভট্টাচার্য" রঘুনন্দন ২৮ তত্ত্ব ও কতিপয় প্রকরণ রচনা করিয়া একমাত্র "শূলপাণি মহামহোপাধ্যায়" ব্যতীত পূর্বতন সকল গ্রন্থকারের কীর্তি লোপ করিয়া দিয়া অপূর্ব সাফল্য অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার গ্রন্থরচনার কাল ১৫৫০-৭৫ খ্রী—তিনি মহাপ্রভুর প্রায় একপুরুষ পরবর্তী ছিলেন। তাঁহার শেষ বয়সের ছাত্র বৈদিক বংশীয় জগদীশ পঞ্চানন তাঁহার গ্রন্থ প্রচারের প্রধান সহায়ক হইয়াছিলেন। জগদীশ অগ্নিবেশ্য গোত্র এবং শ্রাদ্ধবিবেক, কাব্যপ্রকাশ প্রভৃতি বহু গ্রন্থের টীকাকার। তাঁহার প্রপৌত্র গোপাল ন্যায়ালঙ্কার (১০০ বৎসর বয়সে ১৭৯১ খ্রী. স্বর্গত) নবদ্বীপের "প্রধান" স্মার্ত এবং ইংরাজ শাসককল্পিত "বিবাদার্ণবসেতু" গ্রন্থের ১১ জন রচয়িতৃগোষ্ঠীর নেতা ছিলেন। Gentoo Code নামে অনূদিত হইয়া ইহা দ্বারা বহুকাল হিন্দুদের মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইয়াছিল। পরে Colebrooke সাহেব ত্রিবেণীর জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন রচিত বিবাদভঙ্গার্ণব Digest নামে বৃহৎ চারিখণ্ডে অনুবাদ করিলে Gentoo Code বিলুপ্ত হইয়া যায়। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে মুখ-বংশীয় নবদ্বীপের রামানন্দ

বাচস্পতি নানা প্রকরণে বিভক্ত "কৃত্যরাজ" গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তৎপূর্বে বারেন্দ্রশ্রেণীয় চন্দ্রশেখর "দুর্গভঞ্জন" ও "তত্ত্বসম্বোধিনী" নামে স্মৃতি ও মীমাংসার অতি পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন। বিগত শতাব্দীতে গোপাল ন্যায়ালঙ্কারের ছাত্র "গেঁয়ে" রামনাথের পুত্র রামলোচন ন্যায়ভূষণ তিথিতত্ত্বাদির উপর "পত্রিকা" রচনা করিয়া খ্যাতিলাভ করেন।

দায়ভাগ ও শ্রাদ্ধবিবেকের শেষ টীকাকার শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার (বৈদিক-শ্রেণী) নবদ্বীপনিবাসী ছিলেন। তিনি ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দের কিঞ্চিৎ পূর্ববর্তী। নব্যন্যায়ে গদাধরের ন্যায় নব্যস্মৃতিতে শ্রীকৃষ্ণই চরম পরিণতি আনিয়া দিয়াছিলেন। বিধর্মী শাসকগোষ্ঠীর আমলে স্মার্ত পণ্ডিতদের প্রধান আলোচ্য ব্যবহারকাণ্ড ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইয়া গেলে তাঁহাদের প্রতিভা শ্রীকৃষ্ণ-প্রবর্তিত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারপদ্ধতিতে অভিনিবিষ্ট হয়। শ্রীকৃষ্ণের কিঞ্চিৎ পূর্ববর্তী মহেশ্বর ন্যায়ালঙ্কারও নবদ্বীপনিবাসী এবং দায়ভাগ ও শ্রাদ্ধবিবেকের টীকাকার। কিন্তু কাব্যপ্রকাশ ও সাহিত্যদর্পণের টীকাকাররূপেই তাঁহার খ্যাতি অধুনা সুপ্রতিষ্ঠিত। শেষোক্ত টীকা অবাঙ্গালী কর্তৃক মুদ্রিত হইয়াছে।

এতদ্ভিন্ন নবদ্বীপে আরও অনেক স্মার্ত নিবন্ধ ও টীকা রচিত হইয়াছিল যাহা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। আমরা গোবিন্দ ন্যায়বাগীশ রচিত জ্যোতির্নির্ণয় ও শুদ্ধিরত্ন দেখিয়াছি। শেষোক্ত গ্রন্থে অনেক অজ্ঞাত নিবন্ধের বচন উদ্ধৃত হইয়াছে।

রঘুনন্দনের অল্প পরবর্তী গোপাল সিদ্ধান্তবাগীশ বহু স্মৃতির নিবন্ধ রচনা করেন। তদ্রচিত ব্যবহারকৌমুদী (১৫৩৫ শক), শুদ্ধিকৌমুদী (১৫৩৪ শক) ও প্রায়শ্চিত্তকৌমুদী বাঙ্গলার বাহিরে প্রচারিত হয়। কিন্তু, আশ্চর্যের বিষয়, বঙ্গদেশে তাঁহার নাম ও গ্রন্থ বিদিত নহে। সম্ভবতঃ তিনি নবদ্বীপনিবাসী ছিলেন না।

ঐ সময়ে রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ২৪ প্রকরণে বিভক্ত "কৃত্যকৌমুদী" নামে এক বিরাট্ নিবন্ধ রচনা করেন। তাহার কিয়দংশ আমরা দেখিয়াছি, বেশ পাণ্ডিত্যপূর্ণ। তাঁহার পরিচয়াদি গবেষণীয়। রঘুনন্দনের কিঞ্চিৎ পরে গোপাল ন্যায়-পঞ্চানন "নির্ণয়" নামে বহুতর স্মৃতি-নিবন্ধ রচনা করেন—অশৌচনির্ণয়ের রচনাকাল ১৫৩৫ শক (১৬১৩ খ্রী)। এই "বৃদ্ধ" পঞ্চাননের নিবন্ধ বাঙ্গলায়

সর্বত্র এবং মিথিলায়ও প্রচারিত হইয়াছিল। তাঁহার পরিচয়াদি অজ্ঞাত—তিনি নবদ্বীপনিবাসী নাও হইতে পারেন।

নবদ্বীপের পর গুপ্তিপাড়া, শান্তিপুর, উলা প্রভৃতি সমাজের শত শত পণ্ডিতের নাম পাওয়া যায়। কতিপয় খ্যাতনামা গ্রন্থকারের উল্লেখ মাত্র করা সম্ভবপর। গুপ্তিপাড়ার "দেবাংশ" পণ্ডিত রাঘবেন্দ্র শতাবধান ভট্টাচার্য্য আগ্রার নিকট গৌড়ক্ষত্রিয় রাজা কৃপারামের সভায় "রামপ্রকাশ" নামে সুবৃহৎ স্মৃতিনিবন্ধ রচনা করেন। তাঁহার পুত্র চিরঞ্জীব বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী প্রভৃতি রচনা করিয়া ভারতবিখ্যাত হইয়াছিলেন। ইহারা চট্টবংশীয়। চট্টশোভাকরবংশীয় শিমলানিবাসী কৃষ্ণরাম ন্যায়বাগীশ আসামরাজের গুরু—অদ্যাপি "পর্বতীয়া গোঁসাই" কৃষ্ণরামের বংশ আসামের বহু সম্ভ্রান্ত বংশের গুরু। কৃষ্ণরাম শিবসিংহের জন্য দুর্গোৎসবপদ্ধতি ও শতচণ্ডীবিধি রচনা করেন। গুপ্তিপাড়ার শোভাকরবংশীয় সিদ্ধ পুরুষ "মহাকবি" মথুরেশ বিদ্যালঙ্কার "শ্যামাকল্পলতিকা" ১৫৯৪ শকে (১৬৭২ খ্রী) রচনা করেন। তৎপর সুপ্রসিদ্ধ বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার চিত্রচম্পূ প্রভৃতি বহু কাব্য রচনা করেন। তিনিও বিবাদার্ণবসেতুর অন্যতম রচয়িতা।

শান্তিপুরের রাধামোহন বিদ্যাবাচস্পতি গোস্বামী ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দনের টীকা, ন্যায়ের পত্রিকা, বৈষ্ণবশাস্ত্র প্রভৃতি বহুতর গ্রন্থ রচনা করিয়া সর্বত্র খ্যাতিলাভ করেন।

উলার রঘুনাথ সার্ব্বভৌম (নপাড়ী বন্দ্যবংশীয়) সৎকৃত্যমুক্তাবলী, স্মার্ত-ব্যবস্থার্ণব (রচনাকাল ১৫৮৯ শক) প্রভৃতি রচনা করিয়া সর্বত্র বিখ্যাত হইয়াছিলেন। তাঁহার চপেটাঘাতে এক ঝী পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয় ("অয়ং চপেটকেন দাসীং হত্যাং চকার")। নবদ্বীপরাজ রাঘব বলিলেন—কাজটা দৈত্যের মত হইয়াছে। তদবধি তাঁহাদের খ্যাতি হয় "দৈত্যবংশ" (অধুনা নবদ্বীপবাসী)। তাঁহার পৌত্র বীরেশ্বর পঞ্চানন বিবাদার্ণবসেতুর অন্যতম রচয়িতা।

জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের বহু পূর্বেই ত্রিবেণীসমাজের খ্যাতি বাঙ্গলার সর্বত্র প্রচারিত ছিল। জগন্নাথের সময়ে তাহা পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয়। তাঁহার পিতা রুদ্রদেব তর্কবাগীশ বহু কাব্য-নাটকের টীকা রচনা করেন—শকুন্তলা, নৈষধ ও প্রবোধচন্দ্রোদয়ের টীকা পাওয়া গিয়াছে। রুদ্রদেবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভবদেব ন্যায়ালঙ্কার ১৬."কলায়" বিভক্ত বিরাট্ "স্মৃতিচন্দ্র" গ্রন্থ রচনা করেন

—তাঁহার অন্য গ্রন্থও ছিল। রুদ্রদেবের জ্যেষ্ঠতাত চন্দ্রশেখর বাচস্পতি সমগ্র বঙ্গদেশে একজন শ্রেষ্ঠ স্মার্ত ছিলেন—তাঁহার নিবন্ধের নাম স্মৃতিসারসংগ্রহ, দ্বৈতনির্ণয় ও মীমাংসাশাস্ত্রে ধর্মদীপিকা। তাঁহার পিতামহ গঙ্গাদাস বিদ্যাভূষণ, রঘুনন্দনের কিছু পূর্বে নানা নিবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে কেবল "দুর্গোৎসবপদ্ধতি" পাওয়া যায়।

রঘুনন্দনের কিঞ্চিৎ পরবর্তী যাদব বিদ্যাভূষণ "স্মৃতিসার" রচনা করেন—তাহার বহুল প্রচার হইয়াছিল এবং নানা প্রকরণের বহু প্রতিলিপি অদ্যাপি পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁহার পরিচয়াদি অজ্ঞাত।

গঙ্গার উভয় তীর, মুর্শিদাবাদ হইতে কলিকাতা পর্যন্ত, ইংরাজ শাসনের আরম্ভকালেও অগণিত নানা দেশীয় চতুষ্পাঠীর ছাত্রদ্বারা মুখরিত ছিল—ভারতবর্ষের (এবং সম্ভবতঃ পৃথিবীর) অন্যত্র কোথাও বিদ্যাবিলাস এতদূর প্রসারিত হয় নাই। কুমারহট্ট, বংশবাটী, নৈহাটী, ভাটপাড়া, গোন্দলপাড়া, ভদ্রেশ্বর, মূলাজোড়, ইছাপুর, কোননগর, উত্তরপাড়া, বালী প্রভৃতি বিদ্যা-সমাজের শত শত পণ্ডিতের নাম পাওয়া যায়। তাঁহাদের মধ্যে গ্রন্থকার বিরল হইলেও অনেকের পাণ্ডিত্যখ্যাতি বাঙ্গলার বাহিরেও প্রচারিত হইয়াছিল। ৺জয়কৃষ্ণ মুখার্জির জীবদ্দশায় দুইজন সাহেব উত্তরপাড়ায় আসিয়াছিলেন "বৌদ্ধাধিকার" গ্রন্থের আলোচনার জন্য। তৎকালীন নৈয়ায়িকশ্রেষ্ঠ কোন-নগরের মহামহোপাধ্যায় দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন আসিয়া বলেন, ঐ গ্রন্থের পঠনপাঠন বঙ্গদেশে বিলুপ্তপ্রায়—উত্তরপাড়ার মহানৈয়ায়িক জয়শঙ্কর তর্কালঙ্কারের এক মাদ্রাজী ছাত্রের নিকট প্রেরিত হইয়া সাহেবরা কৃতকার্য হইয়াছিলেন এবং জয়কৃষ্ণবাবুকে কৃতজ্ঞতা জানাইয়াছিলেন।

পবিত্র গঙ্গাতীর ছাড়াও রাঢ় অঞ্চলে এবং নদীয়া ও ২৪-পরগণার মধ্যে প্রতি গণ্ডগ্রামে চতুষ্পাঠী ছিল—আমরা শত শত পণ্ডিতের নাম পাইয়াছি। ন্যায়ের পত্রিকাকার ভারতবিখ্যাত দুলাল তর্কবাগীশ (বাসস্থান সাতগাছিয়া, বর্ধমানের অন্তর্গত), বিবাদার্ণবসেতুর অন্যতম রচয়িতা কৃপারাম তর্কসিদ্ধান্ত (বাকুলীয়া, হুগলী), তদানীন্তন স্মার্তশ্রেষ্ঠ কৃপারাম তর্কভূষণ (পশপুর, হুগলী), মহেশ ন্যায়রত্নের গোষ্ঠী (নারীট, ঝিকরা, শিয়াখালা, হরিপাল প্রভৃতি), জগন্মোহন তর্কসিদ্ধান্ত (শালিখা) প্রভৃতি খ্যাতনামা ছিলেন। ইঁহারা সকলেই রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ। সম্ভ্রান্ত রাঢ়ীয় বৈদ্যবংশীয় ভরত মল্লীক ভুরহুটের

ব্রাহ্মণ রাজা প্রতাপনারায়ণের সভাসদ্ এবং রাজপুত্রের শিক্ষক ছিলেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থের সংখ্যা বিংশাধিক এবং সবগুলিই অতি পাণ্ডিত্যপূর্ণ। প্রচলিত সমস্ত কাব্যের উৎকৃষ্ট টীকা রচনা করিয়া তিনি মল্লিনাথের ন্যায় অসামান্য প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার বাড়ি ছিল হুগলী-বর্ধমানের সংযোগস্থলে "পিণ্ডিরা" গ্রামে। তদ্রচিত শ্রেষ্ঠগ্রন্থ অমরকোষের টীকা ১৫৯৯ শকাব্দে রচিত হয়।

বৈদ্যবাটীর নিকট "দীর্ঘাঙ্ক" অর্থাৎ দীগঙ্গগ্রামে গঙ্গাতীরে "দত্ত"-উপাধি এক সুবিখ্যাত বৈদ্যগোষ্ঠী ছিল—নবাবদত্ত তাঁহাদের বাস্তগ্রাম "বৈদ্যপুর" (গ্র্যাণ্ডট্র্যাঙ্ক রোডের সংলগ্ন) এখন জঙ্গলাকীর্ণ। এই বংশে "কবিচন্দ্র" নামে একজন বিখ্যাত গ্রন্থকার ছিলেন। তাঁহার সুবৃহৎ বৈদ্যক নিবন্ধ "চিকিৎসা-রত্নাবলী" ১৫৮৩ শকাব্দে রচিত হয় (১৬৬১ খ্রী.)। তদ্রচিত ১৬ প্রকাশে বিভক্ত "কাব্যচন্দ্রিকা" নামক অলঙ্কারগ্রন্থ আমরা পাইয়াছি। তিনি সারলহরী ও ধাতুচন্দ্রিকা নামে ব্যাকরণগ্রন্থও রচনা করেন।

হুগলীর অন্তর্গত সুগন্ধ্যার কায়স্থকুলীন "বসু রায়" বংশ মোগল আমলে অতি প্রসিদ্ধ আয়ুর্বেদব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁহাদের রচিত অনেক বৈদ্যক নিবন্ধ ছিল—পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার কোটিপরিমিত অশ্ববলের পেষণে সব ধূলিসাৎ হইয়াছে। কেবল একটি উৎকৃষ্ট নিবন্ধ "বৈদ্যরাজ" রচিত "সুখবোধ" (১৬২৪ শকাব্দে রচিত) ভাগ্যচক্রে লণ্ডনে পৌছিয়া কোনপ্রকারে বাঁচিয়া গিয়াছে।

রাঢ় অঞ্চলে বহু বিখ্যাত বৈদ্যক গ্রন্থকার ছিলেন। তাঁহাদের মুকুটমণি ছিলেন "নিরোল" নিবাসী "প্রযোগামৃতের" রচয়িতা বৈদ্য-চিন্তামণি এবং তদীয় গুরু দিগন্তবিশ্রুতকীর্তি নানা গ্রন্থকার নরসিংহ কবিরাজ। বাসবদত্তার টীকা, রসরত্নমালা, মধুমতী ও তাহার ব্যাখ্যা প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়া নরসিংহ সে-যুগে অসামান্য খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার বাড়ি ছিল বর্ধমানের অন্তর্গত ন'পাড়া গ্রামে।

ইহাদের সকলেরই পূর্ববর্তী প্রায় ১৫০০ খ্রী. বিদ্যমান শিবদাস সেন চরকের টীকা, চক্রদত্তের টীকা (মুদ্রিত), অষ্টাঙ্গহৃদয়ের টীকা (মুদ্রিত) এবং চক্রপাণির দ্রব্যগুণের টীকা রচনা করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। তাঁহার পিতা অনন্ত গৌড়াধিপতি বারবক্ সাহের "অন্তরঙ্গ" এবং সাংখ্যশাস্ত্রে প্রবীণ

ছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙ্গালী বৈদ্য ও কায়স্থদের অবদান একখণ্ড বিরাট গ্রন্থে কীর্তন করিয়া শেষ করা কঠিন।

অলঙ্কারশাস্ত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ সাহিত্যদর্পণের টীকা রামচরণ তর্কবাগীশ ১৬২২ শকাব্দে রচনা করেন—এই বহুমুদ্রিত টীকা ভারতবর্ষের সর্বত্র প্রচার লাভ করিয়াছে। রামচরণের বাড়ি ছিল (হুগলী জেলার অন্তর্গত) "পাশণ্ডা" গ্রামে—তাঁহার বংশধরগণ অদ্যাপি আত্মবিস্মৃত অবস্থায় সেখানে এবং পার্শ্ববর্তী কতিপয় গ্রামে বিদ্যমান আছে। রামচরণের পিতৃব্যপুত্র মুনিরাম বিদ্যাবাগীশ অতি বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন—নবদ্বীপে পর্যন্ত তাঁহার খ্যাতি হইয়াছিল, যদিও তাঁহার রচিত গ্রন্থাদি ইংরাজশাসনে বিলুপ্ত হইয়াছে। সংস্কৃত কলেজের সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক নানা গ্রন্থকার প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ (১২১২-৭৪ বঙ্গাব্দ) মুনিরামের বৃদ্ধপ্রপৌত্র ছিলেন। এই পণ্ডিতবহুল "সভাপণ্ডিত"-গোষ্ঠী "অবসথী" চট্টবংশীয়। বাঙ্গলার সর্বত্র এ জাতীয় সভাপণ্ডিত ও রাজপণ্ডিত-গোষ্ঠী বিদ্যমান ছিল—কিন্তু তাহাদের কীর্তিকথা বিলুপ্ত হইতে না দেওয়ার কোন ব্যবস্থাই অদ্যাপি হইতেছে না।

বঙ্গদেশে যে সকল বিদ্যাসমাজ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, সাধারণ লোকে তাহাদের খ্যাতি-সূচক 'ছোট নদে', 'দ্বিতীয় নবদ্বীপ', 'নিম-নবদ্বীপ' প্রভৃতি সংজ্ঞা সৃষ্টি করিয়াছিল। এইরূপ নদীয়ার প্রতিরূপক বহু গ্রাম পশ্চিমবঙ্গে ছিল। কিন্তু নবদ্বীপের সহিত প্রতিপক্ষতা করিয়া কয়েকটি সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছিল—তন্মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হইল পূর্ববঙ্গে বিক্রমপুর ও বাক্‌লা এবং পশ্চিমবঙ্গে খানাকুল-কৃষ্ণনগর। শেষোক্ত সমাজের বিবরণ অতিসংক্ষেপে লিখিত হইল। রঘুনাথ শিরোমণির সহাধ্যায়ী তত্ত্বচিন্তামণির টীকাকার ও ভাষারত্ন-নামক নিবন্ধকার কণাদ তর্কবাগীশ খানাকুলনিবাসী ছিলেন। তাঁহার বংশ (উন্দুরার বন্দ্যঘটী) অদ্যাপি তথায় বিদ্যমান আছে। কণাদ হইতেই খানাকুল-সমাজের উৎপত্তি। তাঁহার পৃষ্ঠপোষক কে ছিলেন জানা যায় না। তাঁহার প্রায় ১৫০ বৎসর পরে বিখ্যাত নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঠাকুর কায়স্থ জমিদার বংশী রায়ের সভায় বহুতর স্মৃতিনিবন্ধ রচনা করিয়া কোন কোন বিষয়ে নবদ্বীপের মতের সহিত পার্থক্য সৃষ্টি করেন। অদ্যাপি ঐ সমাজের অন্তর্গত নাতিক্ষুদ্র অঞ্চলে (হুগলী, হাওড়া ও মেদিনীপুরের কোন কোন অংশে) "বাড়ুর্য্যে ঠাকুরের" ব্যবস্থা অল্পবিস্তর প্রচলিত আছে। তাঁহার রচিত গ্রন্থের মধ্যে ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে রচিত

ধাতুরত্নাকর, স্মৃতিসারসঞ্চয়, স্মৃতিসর্বস্ব, শান্তিকতত্ত্বামৃত সুপ্রচারিত। তাঁহার সর্বশেষ গ্রন্থ 'স্মৃতিসার' তিনি সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। এই গ্রন্থে ১৬০১ শকের একটি জ্যোতিষগণনার উল্লেখ আছে এবং ১৬০৩ শকাব্দের ক্ষয়মাস "ভাবী" (অর্থাৎ হইবে) বলিয়া উল্লিখিত আছে। ঐ সময়েই তাঁহার মৃত্যু হইয়া থাকিবে। তিনি "সপ্তশতী" কুলড্যাল বংশে বিবাহ করিয়া খানাকুল-কৃষ্ণনগরের অধিবাসী হন। তাঁহার অতি বিস্তীর্ণ বংশধারা পশ্চিম-বঙ্গের নানাস্থানে ছড়াইয়া আছে এবং তন্মধ্যে প্রায় ১০০ জন শাস্ত্রব্যবসায়ী পণ্ডিতের নাম পাওয়া যায়। প্রসিদ্ধ বিপ্লবী ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় তাঁহার বংশধর ছিলেন।

নারায়ণের বংশে পরেও অনেক গ্রন্থকার ছিলেন—তন্মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন নারায়ণের পুত্র কৃষ্ণদেব স্মার্তবাগীশ। তদ্রচিত কতিপয় স্মৃতিনিবন্ধ একসময়ে পশ্চিমবঙ্গে প্রচারিত ছিল—প্রায়শ্চিত্তসংগ্রহ ও প্রযোগসার তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য। ভগবদ্গীতার ব্যাখ্যা বাঙ্গালী-পণ্ডিতরচিত অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য। নারায়ণের বংশধর রামশঙ্কর চূড়ামণি ১৮শ শতাব্দীর শেষভাগে একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। তিনি "সারাবলী" নামে গীতার টীকা রচনা করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন তদ্রচিত হংসদূতের টীকা এবং আনন্দলহরীর রামপক্ষে ব্যাখ্যা পাওয়া গিয়াছিল। নারায়ণবংশীয় সর্বশেষ বিখ্যাত নৈয়ায়িক কালিদাস তর্কসিদ্ধান্ত (১২৮৯ সনে স্বর্গত) "শ্রীরামস্তোত্রশতকং" রচনা করিয়া মুদ্রিত করিয়াছিলেন। এই সুপ্রসিদ্ধ বিদ্বৎসমাজের কীর্তি পৃথক্ গ্রন্থে মুদ্রিত হওয়া উচিত।

পশ্চিমবঙ্গের আর একটি পণ্ডিতসমাজ বহু শতাব্দী ধরিয়া পৃথক্ অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ মল্লরাজবংশের রাজ্যলোপের সঙ্গে সঙ্গে এই "বিষ্ণুপুর" বিদ্যাসমাজও বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে। প্রাচীন কাল হইতে বিষ্ণুপুরের বহু পণ্ডিত নানা শাস্ত্রে বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। আমরা কেবল দিগন্তবিশ্রুতকীর্তি কাশীনাথ বাচস্পতির নামোল্লেখ করিতেছি। তিনি রঘুনন্দনের প্রধান তত্ত্বগ্রন্থের উপর যে উৎকৃষ্ট টীকা রচনা করিয়াছিলেন তৎসমূহ বাঙ্গলার সর্বত্র এবং নবদ্বীপে পর্যন্ত সুপ্রচারিত হইয়া একাধিকবার মুদ্রিত হইয়াছে। নব্যস্মৃতির অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থকাররূপে তাঁহার এই কীর্তি অতুলনীয়। তিনি মল্লাধিপতি গোপালসিংহের (১৭২৩-৪৮ খ্রীঃ) সভায়

ছিলেন এবং রঘুনন্দনের টীকা ব্যতীত অন্যান্য গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার বংশ (ঋগ্বেদী মৌদ্‌গল্য গোত্র) অদ্যাপি নানাস্থানে বিদ্যমান আছে।

মেদিনীপুর ব্রাহ্মণভূম-নিবাসী চণ্ডীর বিখ্যাত টীকাকার গোপাল চক্রবর্তী বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থরাজির বিবরণ অন্যত্র লিখিয়াছি (প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৬৩, পৃঃ ৩০২-৪)।

উপসংহারে বঙ্গদেশের বেদান্তচর্চার কথা সংক্ষেপে বলিয়া এই আলোচনা শেষ করিলাম। বঙ্গদেশের বেদান্তের চর্চা অন্ততঃ শ্রীধরভট্টের পূর্ব হইতেই (প্রায় ১০০০ খ্রী.) ধারাবাহিক প্রচলিত ছিল এবং নব্যন্যায়ের চাপেও তাহা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই। বাসুদেব সার্বভৌম স্বয়ং প্রধানতঃ শঙ্কর মতের বৈদান্তিক ছিলেন এবং তাঁহার পিতা বিশারদও ছিলেন "বেদান্তবিদ্যাময়"। সার্বভৌম-রচিত "অদ্বৈতমকরন্দে"র টীকা পুরীতে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। উলা-নিবাসী স্মার্ত রঘুনাথ সার্বভৌম "অদ্বৈতার্ণব" নামে বেদান্তগ্রন্থ রচনা করেন। কৃপারামের নব্যধর্মপ্রদীপ, শিবরামের মুক্তিবাদটীকা প্রভৃতি গ্রন্থে ১৮শ শতাব্দীতেও বেদান্তচর্চার নিদর্শন পাওয়া যায়।

পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীন ভূগোল

শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক

এই গ্রন্থখানির প্রাজ্ঞ লেখক শ্রীযুক্ত বিনয় ঘোষ মহাশয়ের একান্ত অনুরোধে এই বৃদ্ধ বয়সে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের খানিকটা প্রাচীন ভৌগোলিক বিবরণ লিখিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছি। এই ক্ষুদ্র বিবরণী লিখিতে সম্পূর্ণভাবে মনোযোগ প্রদান করিতে পারি নাই বলিয়া একটু দুঃখিত আছি। সে যাহা হউক, এই ভৌগোলিক বৃত্তান্তগুলি সুধীজনের নিকট একেবারে উপেক্ষিত হইবে না বলিয়া আশা করি।

বর্তমানে নবগঠিত পশ্চিম বাঙ্গালা প্রদেশে দুইটি বিভাগ আছে—বর্ধমান বিভাগ ও প্রেসিডেন্সি বিভাগ এবং এই দুই বিভাগে যতগুলি জেলা আছে, তন্মধ্যে বর্ধমান বিভাগের জেলাগুলির নাম হইল—বীরভূম, বর্ধমান, বাঁকুড়া, হুগলী, হাওড়া ও মেদিনীপুর এবং প্রেসিডেন্সি বিভাগের জেলাগুলির নাম হইল—দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কুচবিহার, পশ্চিম দিনাজপুর, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া ও চব্বিশ-পরগণা। কলিকাতা স্বতন্ত্র জেলা বিশেষ। পশ্চিম বাঙ্গালার এই সব জেলার প্রাচীন ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক বিবরণ আমাদের এই প্রবন্ধে বিবেচ্য। কিন্তু ইহার বিবেচনায় সংযুক্ত বাঙ্গালাদেশ অর্থাৎ পশ্চিম ও পূর্ববঙ্গ (বা পূর্বপাকিস্থান) লইয়া গঠিত সারা বাঙ্গালাদেশের ভৌগোলিক সংস্থানের কিছু পরিচয় না থাকিলে প্রতিপাদ্য পরিচয় বুঝা একটু কষ্টকর প্রতিভাত হইবে। সকলেই জানেন যে, বর্তমান পূর্ববাঙ্গালায় তিনটি বিভাগ আছে—ঢাকা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিভাগ ও রাজসাহী বিভাগ এবং এই তিনবিভাগে অনেকগুলি করিয়া জেলাও আছে।

প্রাচীন সমগ্র বাঙ্গালার ও অন্যান্য ভারতীয় প্রাচীন প্রদেশসমূহের ভূমিভাগ-কল্পনায় ভুক্তি, মণ্ডল, খণ্ডল, বিষয়, বীথী, চতুরক, গ্রাম প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভূমির আয়তন-সম্বন্ধে 'ভুক্তি' বর্তমান কালের বিভাগের সঙ্গে অনেকটা তুলিত হইতে পারে এবং 'মণ্ডল' ও 'খণ্ডল' পরগণার সঙ্গে, 'বিষয়' জেলার সঙ্গে, 'বীথী' মহকুমার সঙ্গে এবং 'চতুরক' থানার সঙ্গে তুলিত হইতে পারে। কোন কোন স্থলে এমনও দেখা যায় যে

অনেক বিষয় বৃহৎ মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত থাকিত। আবার কোন কোন বড় বিষয়ও ছোট মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত থাকিত। ভারতবর্ষে চিরকালই 'গ্রাম' সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রতম জনপদাংশ (unit) বা রাষ্ট্রের ক্ষুদ্রতম ভূম্যংশ।

প্রাচীন নগরসমূহও ভূমির আয়তন হিসাবে ছোট বড় হইত এবং সেগুলির যে বিভিন্ন নাম থাকিত সে-কথা আমরা কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রের দ্বিতীয় অধিকরণে জনপদ-নিবেশ নামক অধ্যায়ে দেখিতে পাই। তাহাতে লিখিত আছে যে, সর্বাপেক্ষা বড় নগরেরর নাম ছিল 'স্থানীয়' এবং আটশত গ্রাম থাকিত ইহার এলাকাধীন। 'দ্রোণমুখ'-নামক উপনগর বিশেষের এলাকা থাকিত চারিশত গ্রাম মধ্যে। 'কার্বটিক' বা 'খার্বটিক' নামে পরিচিত ক্ষুদ্রনগর বিশেষের এলাকা বিস্তৃত থাকিত দুইশত গ্রামের উপর এবং দশখানি গ্রামের উপর এলাকা থাকিত 'সংগ্রহণ'-নামক ক্ষুদ্রতম নগরের।

প্রকৃতির সদয় প্রভাবে সারা বাঙ্গালাদেশই একরূপ নদীমাতৃক দেশ। এই দেশের প্রধান নদনদীগুলির নাম আমরা পাই, যথা—ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা, গঙ্গা, পদ্মা, ভাগীরথী, করতোয়া মহানন্দা, (অ) পুনর্ভবা অজয়, দামোদর, রূপনারায়ণ, সুবর্ণরেখা প্রভৃতি। প্রাচীন ভৌগোলিকেরা প্রধানতঃ এইসব নদ-নদীকে সীমারূপে ধার্য করিয়া এই প্রদেশের নানা বড় বিভাগ বা 'ভুক্তি' কল্পনা করিয়াছিলেন।

সাধারণতঃ গঙ্গানদীর মূলপ্রবাহের উত্তরে, মহানন্দা নদীর পূর্বে ও করতোয়া নদীর পশ্চিমে অবস্থিত ছিল প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি এবং এই ভুক্তিরই অন্তর্ভুক্ত ছিল বরেন্দ্রী মণ্ডল। এই ভুক্তির আয়তন প্রথমতঃ অধিকাংশভাবে যুক্ত-বাঙ্গালার উত্তরবঙ্গের রাজসাহী বিভাগ সূচিত করিত। প্রাচীন যুগেই একটু পরবর্তীকালে এই পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তি পূর্বদিকে ঢাকা-বিভাগের ও দক্ষিণ দিকে প্রেসিডেন্সী বিভাগের ভাগীরথীর পূর্বে অনেকখানি অংশ-পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। এমন কি ২৪-পরগণার সুন্দরবন ভূমিও ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

আবার ভাগীরথীর পশ্চিমদিকের ও অজয় নদের উত্তরদিকের ভূমি-বিভাগের প্রাচীন নাম ছিল কঙ্কগ্রামভুক্তি এবং এই ভুক্তিই বক্ষে ধারণ করিত উত্তররাঢ়া মণ্ডলকে।

অজয় নদের দক্ষিণে দামোদর নদের উপত্যকাভূমিতে, দক্ষিণদিকে প্রায়

রূপনারায়ণ নদ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। প্রাচীন বর্ধমানভুক্তি এবং দক্ষিণরাঢ়া মণ্ডল এই ভুক্তিরই অন্তর্ভুক্ত ছিল।

রূপনারায়ণ নদের দক্ষিণে ও সুবর্ণরেখার উত্তরে অবস্থিত বর্তমান মেদিনীপুর জেলার ভূমি-বিভাগের প্রাচীন নাম ছিল দণ্ডভুক্তি। কেহ কেহ মনে করেন যে প্রাচীন সুহ্মদেশের অংশ বিশেষ এই ভূমিরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু, প্রাচীন কোষকারেরা সুহ্মদেশকে রাঢ়া নামেই পরিচিত করিয়াছেন। মনে হয়, প্রচীন সুহ্মদেশ দক্ষিণরাঢ়ারই নামান্তর। তাহা সত্য হইলে উত্তররাঢ়া মণ্ডল ও দক্ষিণরাঢ়া মণ্ডল বর্ধমানভুক্তিরই অন্তর্গত ছিল।

প্রাচীন ভারতের শাসন-পদ্ধতির পর্যালোচনা করিলে লক্ষ করা যাইতে পারে যে, সব ভুক্তিরই একটা প্রধান নগর বা অধিষ্ঠান (headquarter) থাকিত, যথা পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তিরই রাজধানীর নাম ছিল পুণ্ড্রবর্ধনপুর বা পণ্ড্রনগর এবং ইহা বর্তমান বগুড়া জেলাস্থ করতোয়া নদীর তটস্থিত মহাস্থানগড়-নামক স্থান হইতে অভিন্ন বলিয়া ঐতিহাসিকেরা স্থির করিয়াছেন। সেইরূপ প্রাচীন বর্ধমানভুক্তির রাজধানীর নামও ছিল বর্ধমানপুর এবং এই নগরটি ছিল দামোদর নদের উত্তরতীরস্থ বর্তমান বর্ধমান নগর এবং এই স্থানটিই প্রাচীন বর্ধমানপুরের অস্তিত্ব ও খ্যাতি রক্ষা করিতেছে। পশ্চিমবঙ্গের কঙ্কগ্রামভুক্তি ও দণ্ডভুক্তি নামক প্রাচীন ভুক্তিদ্বয়ের রাজধানীর নাম আমাদের আজও জানা হয় নাই।

জৈন 'আচারাঙ্গ সূত্রে' সর্বপ্রথম সুহ্ম ও রাঢ়ার নাম পাওয়া গিয়াছে। সাম্প্রদায়িক আখ্যান আছে যে, জৈনধর্মের প্রতিষ্ঠাপক মহাবীর বর্ধমান সুপ্রাচীন যুগে (খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠশতকে) একসময়ে লাড়াদিগের (অর্থাৎ রাঢ়া জনপদের) পথশূন্য স্থানসমূহে ভ্রমণার্থ যাইয়া অত্যন্ত নির্যাতিত হইয়াছিলেন। তাঁহার নাম অনুসারে যদি বর্ধমান নগর সৃষ্ট হইয়া থাকে, তবে বুঝিতে হইবে যে, পথশূন্য দেশে তিনিই সর্বপ্রথম পথের ব্যবস্থা করাইয়া দিয়াছিলেন। তারপর আমরা খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে পতঞ্জলির মহাভাষ্যে অঙ্গ, বঙ্গ, সুহ্ম ও পুণ্ড্রের নাম একসঙ্গে প্রাপ্ত হই। মহাভারতে ও পালিগ্রন্থেও সুহ্মের উল্লেখ আছে। পালি মহাবংশে (৬।৫) লাড়রট্ট বা রাঢ়ারাষ্ট্র ও লাড়বিষয়ের (রাঢ়াবিষয়ের) উৎকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এই রাঢ়ারাষ্ট্রের অটবীভূমির মধ্য দিয়া এক বঙ্গেশ্বরের স্বৈরচারিণী কন্যা বণিকসার্থের সহিত মগধদেশের

দিকে যাইতেছিলেন, তিনিই সিংহবাহুরাজার মাতা এবং ঐ সিংহবাহুরাজার পুত্র বিজয় রাঢ়া-বিষয় (রাঢ়া জেলা) হইতেই সমুদ্রপথে লঙ্কার দিকে যাইয়া সেখানে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর ভারতীয় প্রধান জ্যোতির্বিদ্ আচার্য বরাহমিহির তদীয় বৃহৎসংহিতা-নামক জ্যোতিষগ্রন্থে কূর্মবিভাগ-নামক চতুর্দশ অধ্যায়ে ভারতবর্ষের পূর্বদিকৃস্থিত দেশসমূহের তালিকায় সুহ্ম, সমতট, ভদ্র-গৌড়ক, পৌণ্ড্র, তাম্রলিপ্তিক ও বর্ধমান দেশের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। বরাহমিহিরের তালিকায় সুহ্ম বা দক্ষিণরাঢ়াকে বর্ধমান প্রদেশ হইতে বিভিন্ন দেখান হইয়াছে। কিন্তু, পরবর্তীকালে বর্ধমান প্রদেশ দক্ষিণরাঢ়ার এবং উত্তররাঢ়ার (অর্থাৎ কঙ্কগ্রামভুক্তির) অংশবিশেষ লইয়াই গঠিত বিবেচিত হইত। পাল-সেনযুগে রাঢ়দেশ যে উত্তররাঢ়া ও দক্ষিণরাঢ়ায় বিভক্ত ছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। শ্রীধরের ন্যায়কন্দলী-নামক গ্রন্থে দক্ষিণরাঢ়ার উল্লেখ আছে। দাক্ষিণাত্যের নরপতি প্রথম রাজেন্দ্রচোলের তিরুমলয় লিপিতে 'উত্তিরলাড়া' (উত্তররাঢ়া) ও 'তক্কনলাড়া' (দক্ষিণরাঢ়ার) উল্লেখ পাওয়া যায়।

বর্তমান বর্ধমান জেলার গলসী থানার এলাকাধীন দামোদর নদের তটস্থিত মল্লসারুল-নামক গ্রামে আবিষ্কৃত, খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমভাগের মহারাজ বিজয়সেনের একখানি তাম্রশাসনে আমরা বাঙ্গালার প্রাচীন ঐতিহাসিক নিদর্শনসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম বর্ধমানভুক্তির নাম স্পষ্টতর পাইতেছি। তখন এই ভুক্তির প্রাদেশিক শাসনকর্তা ছিলেন এই মহারাজ বিজয়সেন এবং তিনি ছিলেন পূর্ববঙ্গের উর্ধ্বতন সার্বভৌম নরপতি মহারাজাধিরাজ গোপচন্দ্রের অধীন শাসক। মল্লসারুলের তম্রশাসনে উল্লিখিত এই বিজয়সেনকে আমরা যেন বহু পরবর্তীকালের (একাদশ শতাব্দীর) সেনবংশীয় মহারাজাধিরাজ বিজয়সেনের সহিত অভিন্ন মনে না করি। পূর্ব্বভারতে গুপ্তসাম্রাজ্যের পতনোন্মুখ অবনতির সময়ে এই বিজয়সেন ছিলেন প্রথমত মহারাজ বৈন্যগুপ্তের একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী এবং তিনিই ছিলেন বৈন্যগুপ্তের ১৮৮ গুপ্তাব্দে (অর্থাৎ ৫০৭-৮ খৃষ্টাব্দে) প্রদত্ত গুণাইঘর-তাম্রশাসনের দূতক। পরে সম্ভবত বিজয়সেন তাঁহার রাজনীতি-প্রবীণতার জন্য পূর্ববঙ্গেরই পরবর্তী নরপতি মহারাজাধিরাজ গোপচন্দ্র-দ্বারা বর্ধমানভুক্তিতে প্রাদেশিক শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বিজয়সেন বক্কত্তকবীথি অধিকরণের অন্তর্গত বেত্রগর্তাগ্রামে আট কুল্যবাপ

(অর্থাৎ ৬৪ দ্রোণ) ভূমি সুবর্ণময় দীনারমুদ্রা দিয়া ক্রয় করিয়া নিয়া তাহা কৌণ্ডিন্য গোত্রের বহ্বৃচ ব্রাহ্মণ বৎসস্বামীকে তাঁহার পঞ্চ-মহাযজ্ঞ-প্রবর্তনের জন্য দান করিয়াছিলেন। তাম্রশাসন পাঠ করিয়া জানা যায় যে, তখনকার বর্ধমানভুক্তির লোকেরা পুণ্যকর্মা ছিলেন এবং তাঁহারা বর্ধমানভুক্তিকে তাঁহাদের সতত আচরিত ধর্মক্রিয়াদ্বারা বর্ধমানা বা সমৃদ্ধিসম্পন্না রাখিতেন।

আনুমানিক খৃষ্টীয় অষ্টম-নবম (মতান্তরে—সপ্তম-অষ্টম) শতাব্দীর হরিকেল-মণ্ডলের বৌদ্ধ রাজা মহারাজাধিরাজ কান্তিদেবের চট্টগ্রাম-তাম্রশাসনে আমরা 'বর্ধমানপুরের' নাম উল্লিখিত পাই। অনেক ঐতিহাসিকের বিচারে এই 'বর্ধমানপুর' আধুনিক পশ্চিম বাঙ্গালায় অবস্থিত বর্ধমান নগরেরই নামান্তর বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে। গৌড়াধিপ দেবপাল-দেবের মৃত্যুর পরে বাঙ্গালা-দেশের অনেক অংশে ছোট ছোট স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সম্ভবত কান্তিদেবের হরিকেল-রাজ্য দক্ষিণ ও পশ্চিম বাঙ্গালার দেশভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল।

একাদশ শতাব্দীর বঙ্গাধিপ মহারাজাধিরাজ শ্রীভোজবর্মার বেলাব-তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, তিনি পূর্ববঙ্গে অবস্থিত বিক্রমপুর-নামক রাজধানী হইতে যে উপ্যলিকা গ্রামটি সাবর্ণ-গোত্রীয় ব্রাহ্মণ রামদেবশর্মাকে দান করিয়াছিলেন, তাহার অবস্থান ছিল পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তিতে, কিন্তু দানপ্রতিগ্রহ-কারী ব্রাহ্মণ রামদেবশর্মা ছিলেন মধ্যদেশ-বিনির্গত উত্তররাঢ়ায় অবস্থিত সিদ্ধল গ্রামের অধিবাসী পীতাম্বর দেবশর্মার প্রপৌত্র। আনুমানিক দশম শতাব্দীর কোন সময়ে মধ্যদেশ হতে বিনির্গত হইয়া সেই পীতাম্বর দেবশর্মা বর্ধমান-ভুক্তির অন্তর্গত উত্তররাঢ়ায় অবস্থিত প্রসিদ্ধ সিদ্ধল গ্রামে আগমন করিয়াছিলেন। আবার সেই বর্মরাজবংশের অপর নরপতি, হরিবর্মদেবের মন্ত্রসচিব রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ ভট্টভবদেবের ভুবনেশ্বর-প্রশস্তিতে রাঢ়ার এই প্রসিদ্ধ সিদ্ধল গ্রামটি এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, সাবর্ণমুণির মহীয়ান্ কুলে যে-সব শ্রোত্রিয় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের হস্তে তাম্রশাসন দ্বারা রাজপ্রদত্ত দানভূমিখণ্ড ও তাঁহাদের জন্মস্থান শতসংখ্যক হইতে পারে, কিন্তু জগতে বিখ্যাত, আর্যাবর্ত-ভূমির বিভূষণ-তুল্য, সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রামের নাম হইল একমাত্র সিদ্ধলগ্রাম—যাহা রাঢ়া রাজধানীর অলঙ্কারবিশেষ। বর্ধমান-বিভাগের বর্তমান যে স্থানে এই প্রাচীন কালের প্রসিদ্ধ সিদ্ধলগ্রাম ছিল, তাহা সম্ভবত বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলার

(কান্দীর) সংযোগস্থলের নিকটে ভাগীরথীর পশ্চিমে অবস্থিত ছিল। সেই সিদ্ধলগ্রাম সাবর্ণগোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের বাসস্থান ছিল।

গৌড়াধিপ রামপাল-কর্তৃক নিজের জন্মভূমি বরেন্দ্রীর উদ্ধার-সময়ে, বাঙ্গালার রাঢ়া-অঞ্চলের কয়েকজন সামন্তরাজ তাঁহার পক্ষে যুদ্ধে যোগ দিয়াছিলেন। তন্মধ্যে অপরমন্দারের (হুগলী জেলার গড়মন্দারণের) রাজা লক্ষ্মীশূর, উচ্ছালের (বীরভূম জেলার স্থানবিশেষের) রাজা ভাস্কর, ঢেক্করীর (বর্ধমান জেলার ঢেকরী-নামক স্থানের) রাজা প্রতাপসিংহ ও নিদ্রাবলের (রাঢ়ার অন্তর্ভুক্ত স্থানবিশেষের) রাজা বিজয়ের নাম উল্লেখযোগ্য।

একাদশ শতাব্দীতে গৌড়াধিপ নয়পাল ও তৃতীয়বিগ্রহপালের রাজত্বকালের প্রচলিত অক্ষরে ক্ষোদিত একখানি তাম্রশাসন (দিনাজপুর জেলার রাণী-সঙ্কাইল থানার এলাকাস্থিত) রামগঞ্জে পাওয়া গিয়াছিল। তাম্র-শাসন-প্রদাতার নাম ছিল মহামাণ্ডলিক শ্রীঈশ্বর ঘোষ। তিনি ঢেক্করী হইতে (ঢেক্করীতঃ) এই শাসন প্রচার করিয়া ভট্ট-নিব্বোকশর্মাকে যে গ্রামটি প্রদান করিয়াছিলেন তাহার নাম দিগ্‌ঘাসোদিকা এবং ইহা পিয়োল্লমণ্ডলের অন্তঃপাতী গাল্লিটিপ্যক-বিষয়ে সম্বদ্ধ ছিল। তাম্রশাসনে উল্লেখ আছে যে দানপ্রদাতা জটোদা-নাম্নী নদীতে স্নান করিয়া দানকার্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। ঢেক্করী নগর জটোদা নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। ৺মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের মতে এই নগর ও নদীটি বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমায় বিদ্যমান ছিল। আমাদের মনে হয়, এই পিয়োল্লমণ্ডলটি প্রাচীন বর্ধমানভুক্তিরই অন্তর্গত একটি মণ্ডল ছিল।

সপ্তম শতাব্দীতে বাঙ্গালাদেশের যে পাঁচটি বিভাগের সমাচার চীনদেশীয় পরিব্রাজক হিউয়েন-সাঙ্‌ লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাদের নাম—কজঙ্গল, সমতট, তাম্রলিপ্ত, পুণ্ড্রবর্ধন ও কর্ণসুবর্ণ। গৌড়াধিপ শশাঙ্ক কর্ণসুবর্ণ ও পুণ্ড্রবর্ধন যুক্ত করিয়া একরাজ্যে পরিণত করিয়া তাহা কর্ণসুবর্ণ নগর হইতে শাসন করিতেন। সম্ভবত শশাঙ্কের পূর্বে মহারাজাধিরাজ জয়নাগ কর্ণসুবর্ণ রাজধানী হইতেই রাজ্য পরিচালন করিতেন। শ্রীহট্ট জেলার নিধানপুর-নামক স্থানে প্রাপ্ত তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, কামরূপাধিপতি ভাস্কর-বর্মাও কর্ণসুবর্ণ হইতেই সেই শাসন প্রকাশিত করিয়াছিলেন। এই কর্ণসুবর্ণ ভাগীরথীর পশ্চিমে মুর্শিদাবাদ জেলার প্রায় ১২ মাইল দক্ষিণে উত্তররাঢ়াতে

বর্তমান রাঙ্গামাটী নামক স্থান বলিয়া ঐতিহাসিকেরা গ্রহণ করিয়া থাকেন। পরিব্রাজক হিউয়েন-সাঙ্ লিখিয়াছেন যে কর্ণসুবর্ণে বহু প্রজা বাস করিত, এবং ধনী লোকের সংখ্যাও সেখানে বেশী ছিল। বিদ্যানুরাগী ও চরিত্রবান্ ছিল সেখানকার লোকেরা। অনেক বৌদ্ধ বিহার ও দেবমন্দিরও সেখানে ছিল। রাজধানী কর্ণসুবর্ণের নিকটে ছিল 'লো-তো-মো-তি' (রক্তমৃত্তিকা বা রাঙ্গামাটী)-নামক বিপুলায়তন বিহার এবং সেই প্রসিদ্ধ বিহার ছিল শ্রমণাদির আশ্রয়স্থান।

দ্বাদশ শতাব্দীর বাঙ্গালার রাজা বল্লালসেনের কাটোয়ার নিকটবর্তী নৈহাটী গ্রামে প্রাপ্ত তাম্রশাসন হইতে জানা যায়, সেনবংশীয় পূর্ববর্তী রাজপুত্রেরা চন্দ্রবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া সদাচার-সম্পাদন-দ্বারা বিখ্যাত রাঢ়দেশকে অননুভূত-পূর্ব প্রভাবে ভূষিত করিয়াছিলেন, এবং তাঁহারা বিশ্বের লোককে অভয়-বিতরণ-পূর্বক বহুপ্রদ হইয়া কীর্তিমান্ হইয়াছিলেন। তাম্রশাসনখানির প্রাপ্তিস্থান নৈহাটী গ্রামটি বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমায় ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে (সীতাহাটীর নিকট) অবস্থিত। ইহাতে বর্ণিত আছে যে, বল্লালসেনের মাতা মহাদেবী বিলাসদেবী এক সূর্যগ্রহণের দিনে ভারদ্বাজ-গোত্রীয় ওবাসুদেব নামক এক সামবেদী ব্রাহ্মণকে যে বাল্লহিট্‌ঠা গ্রাম দান করিয়াছিলেন, তাহা অবস্থিত ছিল শ্রীবর্ধমানভুক্তির অন্তঃপাতী উত্তররাঢ়া-মণ্ডলের স্বল্পদক্ষিণ-নামক বীথীতে।

এই শাসনদ্বারা প্রদত্ত গ্রাম বাল্লহিট্‌ঠার চতুঃসীমার বর্ণনাতে আরও চারিটি শাসন-গ্রামের নাম পাওয়া যায়—(১) খাণ্ডয়িল্লা, (২) অম্বয়িল্লা, (৩) নাড্‌ডিনা (৪) জলসোথী, ও (৫) মোলাড়ন্দী। ইহাতে সিঙ্গটিআ-নামে এক নদীর নামও পাওয়া যায়। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় (১৭ খণ্ড) প্রকাশিত শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র রায় মহাশয়ের প্রবন্ধ পাঠে জানা যায় যে তিনি উক্ত গ্রামগুলির মধ্যে প্রাচীন বাল্লহিট্‌ঠাকে বর্তমান সময়ের বালুটিয়ার সহিত, জলসোথীকে জলসোথীর সহিত, খাণ্ডয়িল্লাকে খারুলিয়ার সহিত, অম্বয়িল্লাকে অম্বলগ্রামের সহিত, এবং মোলাড়ন্দীকে মুরুন্দীর সহিত অভিন্নতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। তাঁহার মতে বালুটীয়া বর্তমান বর্ধমান জেলার উত্তর সীমায় (শাসনপ্রাপ্তিস্থান) নৈহাটীর ছয় মাইল দূরে অবস্থিত। ইহার উত্তরে জলসোথী (এখন ভাগীরথীর পশ্চিমদিকে মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্ভুক্ত), ইহার দক্ষিণে খারুলিয়া এবং ইহার পূর্ব-দক্ষিণে

অম্বলগ্রাম। তারকবাবু আরও বলিয়াছেন যে, সিগ্গটিআ নদীর অবস্থান জানা যায় না—তবে বর্তমান বালুটিয়ার দক্ষিণ ও পূর্বদিকে যে খাল আছে তাহাই হয়ত পূর্বকালে সিগ্গটিআ নদীরূপে তাম্রশাসনে বর্ণিত হইয়া থাকিবে।

বর্তমান ২৪-পরগণার বারুইপুর রেলস্টেসনের নিকটবর্তী গোবিন্দপুর-গ্রামে আবিষ্কৃত লক্ষ্মণসেনের একখানি তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, রাজা তদীয় রাজ্যের দ্বিতীয় সংবতে বাৎসগোত্রীয় সামবেদী ব্রাহ্মণ উপাধ্যায় শ্রীব্যাসদেব শর্মাকে বিড্ডারশাসন-নামক যে গ্রামখানি দান করিয়াছিলেন, তাহাও শ্রীবর্ধমানভুক্তির অন্তঃপাতী পশ্চিম-খাটিকার বেতড্ড-চতুরকে অবস্থিত ছিল। প্রদত্ত গ্রামের পূর্বদিক্‌স্থিত অর্ধসীমা 'স্রবন্তী' (নদী) জাহ্নবী বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। স্বর্গীয় ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই বেতড্ড-চতুরককে বর্ধমান-বিভাগের হাওড়া জেলাস্থিত বর্তমান বেতড়গ্রাম বলিয়া মনে করেন। সেনরাজগণের রাজধানী তখন পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুরে অবস্থিত থাকিলেও পশ্চিমবাঙ্গালার বর্ধমানভুক্তি তাঁহাদের রাজ্যের অন্তর্গত ছিল।

'মধুর-কোমল-কান্ত-পদাবলী'-সমন্বিত গীতগোবিন্দ-নামক সংস্কৃত গীতিকাব্য রচনা করিয়া লক্ষ্মণসেনের যে অন্যতম সভাকবি জয়দেব জগতে অমর কীর্তি লাভ করিয়াছিলেন, তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বর্ধমানভুক্তির উত্তররাঢ়ার (বীরভূম জেলার) অজয় নদের তীরবর্তী কেন্দুবিল্বগ্রামে।

এখন পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি ও ইহার অন্তর্গত কয়েকটি মণ্ডল ও বিষয়ের বিবরণ আলোচিত হইতেছে। এই ভুক্তির কোটিবর্ষ-নামক বিষয়ের যে-সব ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায় তাহা দামোদরপুর হইতে আবিষ্কৃত গুপ্তযুগের তাম্রশাসন-পঞ্চক ও বৈগ্রামে আবিষ্কৃত তাম্রশাসনখণ্ডে নিহিত আছে। দামোদরপুর গ্রামটি পূর্ব-দিনাজপুরের (পাকিস্থানভুক্ত) ফুলবাড়ী পুলিশ স্টেশনের ৮ মাইল দূরে অবস্থিত। এই পুস্তকের লেখকের নির্দেশে এই সব তাম্রশাসন ও তাহাতে উল্লিখিত স্থানগুলির ভৌগোলিক বর্ণনা হইতে আমরা স্থগিত রহিতে বাধ্য হইলাম। তবে বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতায় ও বায়ু-পুরাণে কোটিবর্ষ নগরের নামোল্লেখ আছে। সংস্কৃত কোষকার হেমচন্দ্র তাঁহার অভিধান-চিন্তামণি-নামক গ্রন্থে কোটিবর্ষ ও ইহার নামান্তরগুলির এইরূপ নির্দেশ দিয়াছেন যথা—"দেবীকোট উমাবনং। কোটিবর্ষং বাণপুরং স্যাচ্ছো-ণিতপুরং চ তৎ"। 'বাণপুর' বর্তমান বাণগড়ের নামান্তর বলিয়া মনে হয়।

দেবীকোট ও কোটিবর্ষ নগর যখন অভিন্ন, তখন আমরা পশ্চিম বাঙ্গালার অন্তর্ভুক্ত পশ্চিম-দিনাজপুরের গঙ্গারামপুর থানার নিকটবর্তী দেবীকোট-নামক স্থানটিকেই প্রাচীন কোটিবর্ষ নগরের স্থান বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। পশ্চিম-দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত বাণগড়ের (দেবীকোট বা কোটিবর্ষের) ধ্বংসাবশেষ মধ্যে আবিষ্কৃত একাদশ শতাব্দীর গৌড়াধিপ প্রথম-মহীপালদেবের এক তাম্র-শাসন হইতে জানা যায় যে, রাজা বিলাসপুর-সমাবাসিত স্কন্ধাবার হইতে পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির অন্তঃপাতী কোটিবর্ষ-বিষয়ের গোকলিকা-মণ্ডলের অন্তর্গত কুরট্টপল্লিকা-নামক গ্রাম কৃষ্ণাদিত্যশর্মাকে প্রদান করিয়াছিলেন।

পরবর্তীকালে লক্ষ্মণসেনের তর্পণদীঘি বা তপনদীঘিলিপি হইতে জানা যায় যে, মহারাজাধিরাজ লক্ষ্মণসেন পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির অন্তঃপাতী বরেন্দ্রী-মণ্ডলে অবস্থিত বেলহেষ্টী গ্রামের এক ভূভাগ স্বুবর্ণাশ্ব-মহাদানের আচার্য শ্রীঈশ্বর দেবশর্মাকে দান করিয়াছিলেন। উল্লিখিত-বেলহেষ্টী গ্রামের পরিচয় পাওয়া কঠিন। তবে আধুনিক পশ্চিম-দিনাজপুরের বালুরঘাট জেলার গঙ্গারামপুর থানার ৬ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত তপন-নামক স্থানের তর্পণদীঘিনামক বিশাল এক দীঘির উত্তরে এই তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে।

পশ্চিমবাঙ্গালার পশ্চিম-দিনাজপুর জেলায় মনহলি-নামক যে গ্রাম তপনের খানিকটা উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত, সেই গ্রামে গৌড়াধিপ রামপালের পুত্র মদনপালদেবের একখণ্ড তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছিল। তাহা হইতে জানা যায় যে, রাজা তাঁহার পট্টমহিষী চিত্রমতিকাদেবীর মহাভারত পাঠ করাইয়া দক্ষিণাস্বরূপ যে ভূমিখণ্ড পণ্ডিত শ্রীবটেশ্বর-স্বামি-শর্মাকে প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির কোটিবর্ষ-বিষয়স্থ হলাবর্ত-নামক মণ্ডলে অবস্থিত ছিল। মদনপাল এই শাসন পিতার নবনির্মিত রাজধানী রামাবতী-নগরী হইতে প্রদান করিয়াছিলেন। সন্ধ্যাকরনন্দীর রামচরিতে এই রামাবতীর সবিশেষ বর্ণনা পাওয়া যায়। এই রামাবতীকে কোন কোন ঐতিহাসিক আইন্-ই-আকবরীতে উল্লিখিত রামৌতি নগরের পূর্ব নাম বলিয়া গ্রহণ করেন। ইহা সেনরাজগণের প্রতিষ্ঠিত লক্ষ্মণাবতী-নামক (লখ্নৌতি) বা গৌড়ের নিকটবর্তী স্থান ছিল। এই যুক্তি সত্য হইলে, রামাবতী নগরও যে পশ্চিমবাঙ্গালার পশ্চিম-দিনাজপুরে বা মালদহে অবস্থিত ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ করার কারণ দৃষ্ট হয় না।

সর্বপ্রথম ব্যাঘ্রতটীমণ্ডলের উল্লেখ পাই আমরা অষ্টম-নবম শতাব্দীর প্রথম

প্রচণ্ডপ্রতাপ গৌড়াধিপ ধর্মপালের (মালদহ জেলার) খালিমপুর-গ্রামে আবিষ্কৃত তাম্রশাসনে। ইহাতে উক্ত হইয়াছে যে, তাম্রশাসন প্রতিগ্রহীতাকে যে গ্রামচতুষ্টয় তিনি দান করিয়াছিলেন সেগুলি সবই পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির অন্তঃপাতী ব্যাঘ্রতটীমণ্ডলে অবস্থিত ছিল। এই মণ্ডলে সম্বদ্ধ ছিল মহান্তাপ্রকাশ-নামক বিষয় এবং তাম্রশাসনদ্বারা প্রদত্ত ক্রৌঞ্চশ্বভ্র নামটি ছিল এই বিষয়ের অন্তর্গত। দানপ্রদত্ত মাঢ়াশাল্মলী-নামক দ্বিতীয় গ্রামও উক্ত 'বিষয়েই' সম্বদ্ধ ছিল। আবার নিকটবর্তী স্থালীক্কট-বিষয়ে সম্বদ্ধ আম্রষণ্ডিকামণ্ডলের অন্তঃপাতী ছিল শাসনপ্রদত্ত চতুর্থ গ্রামটি, যাহার নাম ছিল গোপিপ্পলী গ্রাম। প্রদত্ত পালিতক-নামক তৃতীয় গ্রামটি উক্ত দ্বিতীয় মণ্ডলেরই অন্তর্গত ছিল। এই গ্রামগুলির সীমানির্দেশের জন্য তাম্রশাসনে গাঙ্গিনিকা ও খাটিকার (খাড়িকার বা খাড়ীর) যে উল্লেখ পাই তাহাতে গঙ্গার সুন্দরবনস্থিত খাড়ীর কথা সহজেই মনে উঠে। মনে হয় যে, সেনবংশীয় রাজা লক্ষ্মণসেনের ২৪-পরগণার অন্তর্ভুক্ত সুন্দর-বনাংশে আবিষ্কৃত তাম্রপট্টেও যে খাড়ীমণ্ডলের নাম পাই, তাহাও ব্যাঘ্রতটী-মণ্ডলের সন্নিকটস্থ একটি মণ্ডল হইয়া থাকিবে। লক্ষ্মণসেন এই তাম্রশাসনদ্বারা পৌণ্ড্রবর্ধনভুক্তির অন্তঃপাতী খাড়ীমণ্ডলসম্বদ্ধ কান্তল্লপুর-নামক চতুরকের মণ্ডলগ্রামের কতক ভূভাগ শ্রীকৃষ্ণধর-দেবশর্মাকে দিয়াছিলেন। এখনও ২৪-পরগণার ডায়মণ্ড হারবার মহকুমায় খাড়ী-পরগণা ও খাড়ীগ্রাম-নামক স্থান রহিয়াছে।

দ্বিতীয় গৌড়াধিপ দেবপাল (নবমশতাব্দী) মুদ্গগিরি (মুঙ্গের) হইতে যে তাম্রশাসনদ্বারা নালন্দায় বৌদ্ধবিহার নির্মাণ করিয়া সেখানে বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘের পূজার্থে পাঁচটি গ্রাম দূতকমুখে বিজ্ঞাপিত হইয়া সুবর্ণদ্বীপাধিপ (সুমাত্রার অধিপতি) মহারাজ বালপুত্রদেবকে প্রদান করিয়াছিলেন—সে-বিষয়ে গৌড়াধিপের নিকট দৌত্য করিয়াছিলেন, শত্রুবলদলনে তাঁহার দক্ষিণবাহুরূপী সহায়ক ব্যাঘ্রতটীমণ্ডলাধিপতি মহারাজ শ্রীবলবর্মা। সুদূর সমুদ্রমধ্যস্থিত সুবর্ণ-দ্বীপের রাজা দেবপালের নিকট ভারতের মধ্যদেশস্থিত শ্রীনগরভুক্তির রাজগৃহ-বিষয় ও গয়াবিষয়স্থিত যে গ্রামপঞ্চক প্রার্থনা করিয়া পাইয়াছিলেন—সেই শাসন-প্রদানবিষয়ে যিনি (শ্রীবলবর্মা) দূতের কাজ করিয়াছিলেন তাঁহার শাসিত বাঙ্গালার ব্যাঘ্রতটীমণ্ডল প্রদেশভাগ যে সমুদ্রপারপর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, তাহা অনুমান করা কঠিন নহে। আরও পরবর্তীকালে সেনবংশীয় নরপতি

লক্ষ্মণসেনদেবের, নদীয়া জেলার রাণাঘাট মহকুমার নিকটবর্তী আনুলিয়া-নামক গ্রামে প্রাপ্ত তদীয় একখানা তাম্রশাসনেও উল্লেখ আছে যে, পৌণ্ড্রবর্ধনভুক্তির অন্তঃপাতী ব্যাঘ্রতটীতে অবস্থিত মাথরণ্ডিয়া-খণ্ডক্ষেত্র রঘুদেবশর্ম-নামক ব্রাহ্মণকে তিনি দান করিয়াছিলেন। এই তাম্রশাসনে দূতের কার্য করিয়াছিলেন সান্ধিবিগ্রহিক নারায়ণদত্ত। বড়ই আশ্চর্যের বিষয় যে, লক্ষ্মণসেনের দর্পণদীঘি, সুন্দরবন ও গোবিন্দপুরে আবিষ্কৃত তাম্রশাসনগুলিতেও এই নারায়ণদত্তই দূতকের কার্য করিয়াছিলেন।

স্বর্গীয় অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়ের মতে (Asutosh Com. Vols. Orientalia Part 2, p. 424) ব্যাঘ্রতটীকে বর্তমানকালের বাগড়ী বলিয়া জানিতে হইবে। প্রাচীন ব্যাঘ্রতটী নামটি আধুনিক বাগড়ী-নামে পরিণত হওয়া সরল ও সহজ। সংস্কৃত 'ব্যাঘ্র' 'বগ্‌ঘ' হয় (বাঙ্গালা বাঘ), 'তটী'ও 'তড়ী' হওয়া অসম্ভব নহে। 'ব্যাঘ্রতটী' 'বগ্‌ঘঅডী' হইতে পারে, তৎপর 'বগ্‌ঘঅড়ী' 'বাগড়ী' হইতে পারা বিশেষভাবে অনুকূল। এই 'বাগড়ী' অবশ্যই গঙ্গানদী ও ব্রহ্মপুত্র নদের মোহানা লইয়া গঠিত ছিল। সুন্দরবন যে ব্যাঘ্রের নিবাসভূমি সমুদ্রতটবর্তী ভূমিভাগ তাহা সুবিখ্যাত। এই মত খুবই সমীচীন বলিয়া প্রতিভাত হয়। অতএব ব্যাঘ্রতটীমণ্ডলাধিপের পক্ষে সুদূরবর্তী সুবর্ণদ্বীপাধিপতির সহিত মিত্রত্ব-সম্বন্ধ থাকা খুবই স্বাভাবিক মনে হয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, এই মণ্ডলটি বর্তমান ২৪-পরগণার (দক্ষিণে) ডায়মণ্ড হারবার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

লক্ষ্মণসেনের সুন্দরবনে আবিষ্কৃত তাম্রশাসনে দেখা যায় যে, প্রদত্ত মণ্ডল-গ্রামের দক্ষিণসীমা 'চিতাড়েখাত' বলিয়া উল্লিখিত। এখনও ডায়মণ্ড হারবারের নিকটে 'চিতাড়িখাল' বলিয়া একটি স্থান আছে। এই মণ্ডলে অবস্থিত 'কান্তল্লপুর'-নামক চতুরকের অবস্থান এখনও অজ্ঞাত রহিয়াছে।

বিজয়সেনের বারাকপুর তাম্রশাসনখানি আবিষ্কৃত হয় বারাকপুর ক্যাণ্টন-মেণ্টের নিকটবর্তী এক গ্রামে। সেন-রাজবংশের প্রথম মহারাজাধিরাজ বিজয়সেন বিক্রমপুর সমাবাসিত জয়স্কন্ধাবার হইতে এই তাম্রশাসন দ্বারা যে গ্রাম দান করেন উদয়করদেবশর্মাকে, তাহার নাম ছিল 'ঘাসসম্ভোগভাট্টবড়া' এবং ইহা পৌণ্ড্রবর্ধনভুক্তির অন্তঃপাতি খাড়িবিষয়ে অবস্থিত ছিল। লক্ষ্মণ-সেনের সুন্দরবনে প্রাপ্ত তাম্রশাসনে এই ভুক্তিরই অন্তঃপাতী খাড়িমণ্ডলস্থিত

ভূভাগই শ্রীকৃষ্ণধরদেবশর্মাকে দান করিয়াছিলেন। খাড়িনামে মণ্ডল ও বিষয়—উভয়ই ছিল।

পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির অধঃপত্তনমণ্ডল-নামে আর একটা মণ্ডল ছিল। এই সমাচার জানা যায় ভোজবর্মার বেলাবলিপি হইতে। এই শাসনের দানগ্রহীতা রামদেব শর্মা উত্তররাঢ়ার প্রসিদ্ধ সিদ্ধলগ্রাম হইতে বিনির্গত ছিলেন। এই শাসনের সিংহপুর বৌদ্ধগ্রন্থ মহাবংশের সীহপুর বলিয়াই বিবেচিত হয়—যাহা লাড়রট্টে (রাঢ়ারাষ্ট্রে) অবস্থিত ছিল বলিয়া নির্দেশ আছে। বালবলভীভুজঙ্গ ভট্টভবদেব (ভুবনেশ্বর-প্রশস্তিতে) রাঢ়ার জাঙ্গলপথগ্রামের উপকণ্ঠে এক জলাশয় নির্মাণ করাইয়া সেখানকার সমগ্র পান্থ-পরিষদের জলকষ্ট দূর করিয়াছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলায় অবস্থিত শুশুনিয়া পর্বতে এক পাষাণখোদিত লিপিতে উক্ত হইয়াছে যে, পুষ্করণাধিপতি মহারাজ সিংহবর্মার পুত্র মহারাজ চন্দ্রবর্মা সেই পর্বতের একটি গুহা (নির্মাণ করাইয়া) চক্রস্বামীর (বিষ্ণুর) উদ্দেশে অতিসর্গ বা দান করিয়াছিলেন। এই পুষ্করণ-নামক প্রাচীন স্থানটিকে কোন কোন ঐতিহাসিক বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত দামোদরের দক্ষিণপূর্বস্থিত পোখরণা নামক স্থান বলিয়া গ্রহণ করেন। গুপ্তসম্রাট সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ-স্তম্ভলিপিতে উল্লিখিত আর্যাবর্ত-নরপতিগণের অন্যতম চন্দ্রবর্মা একই ব্যক্তি বলিয়া ঐতিহাসিকগণ গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই উক্তি সত্য হইয়া থাকিলে, বাঁকুড়ার পুষ্করণ চতুর্থ শতাব্দীতে এক বৈষ্ণবপ্রধান স্থান ছিল বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। বর্তমান লেখক মনে করেন যে, পুষ্করণাধিপতি চন্দ্রবর্মা রাজপুতানার পুষ্করণের (পোখরণের) রাজা ছিলেন এবং তিনি সমুদ্রগুপ্তেরই সমসাময়িক আর্যাবর্তের অন্যতম রাজা। বাঁকুড়ার এই পর্বতে তিনি চক্রস্বামীর উদ্দেশে একটি বিষ্ণুচক্রের প্রতিকৃতি পর্বতের গুহামধ্যে নির্মাণ করাইয়াছিলেন। এই স্থানটি তৎকালে চক্রস্বামীর প্রসিদ্ধি রক্ষা করিত।

সপ্তম শতাব্দীতে চীনদেশীয় বৌদ্ধপরিব্রাজক হিউয়েন-সাঙ্ প্রাচীন তাম্রলিপ্ত বন্দর দর্শন করিয়াছিলেন। অনেকে মনে করেন যে, স্থানটি বর্তমান কালের মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত তমলুকই হইয়া থাকিবে। অন্যেরা মনে করেন যে, সমুদ্রের নিকটবর্তী কোন খাড়ীতে অবস্থিত প্রাচীন তাম্রলিপ্তের অবস্থান এখন আর নির্ণয় করা কঠিন। দণ্ডীর দশকুমার-চরিতে আমরা দামলিপ্ত বলিয়া যে

নগরের উল্লেখ পাই তাহাই যে প্রাচীন তাম্রলিপ্ত তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই প্রাচীন তাম্রলিপ্ত তৎকালে দণ্ডভুক্তির অন্তর্গত ছিল। পশ্চিম বাঙ্গালার এই বন্দর দিয়াই ভারতের সহিত চীন, ইন্দোনেশিয়া ও এশিয়ার অন্যান্য রাজ্যের বিপুল ব্যবসা-বাণিজ্য চলিত। চীনা-পরিব্রাজক লিখিয়াছেন যে, তাম্রলিপ্তের ভূ-বিভাগে অনেক মূল্যবান দ্রব্য-সামগ্রী পাওয়া যাইত। লোকেরা সেখানে সমৃদ্ধশালী ছিল। চাষদ্বারা উৎপন্ন নানারূপ ফসলও সেখানে পাওয়া যাইত। ফলপুষ্প সেখানে যথেষ্ট উৎপন্ন হইত। এই স্থানের লোকেরা একটু কর্কশ হইলেও সাহসী ছিল।

দশম শতাব্দীর কাম্বোজ-কুলতিলক নরপতি নয়পালের ইর্দায় আবিষ্কৃত তাম্রশাসনে দণ্ডভুক্তিকে বর্ধমানভুক্তির অন্তর্গত বলিয়া নির্দিষ্ট পাওয়া যায়। এই রাজার রাজধানী প্রিয়ঙ্গু-নগরীর অবস্থান আজও জানা যায় নাই।

ইতিহাস রচনার সাম্প্রতিক একটি পদ্ধতি

নীহাররঞ্জন রায়

সাংস্কৃতিক সচেতনতা, একটু অন্যভাবে ঐতিহাসিক সচেতনতা, সাম্প্রতিক কালের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মানব-সমাজের অগ্রযাত্রায় সংস্কৃতিকর্ম অপরিহার্য। সর্বদেশে সর্বকালে সংস্কৃতিকর্মের ভেতর দিয়েই মানুষ জীবনের পথে অগ্রসর হয়। কিন্তু সকলদেশে সকলকালে মানুষ এ-সম্বন্ধে সচেতন থাকে না। আধুনিক মানুষ নিজের ভাগ্য নিজে নিয়ন্ত্রণে বিশ্বাসী ; সে বুদ্ধির আলোয় নিজের অতীত ও বর্তমানের দেশ, কাল ও পাত্রকে জেনে বুঝে বর্তমানের সংস্কার করতে চায়, ভবিষ্যতটিকে গড়তে চায়। এই সংস্কার ও গড়নের কাজটাই হচ্ছে সংস্কৃতিকর্ম। তা ছাড়া, অতীতকে জানবার ইচ্ছা, অর্থাৎ ভূতজিজ্ঞাসা মানুষের একটি সহজাত প্রবৃত্তি; স্মৃতি তার সহায়ক বৃত্তি। যা অতীতে ছিল ('ইতি হ আস') মানুষ তাকে স্মৃতির প্রবাহে বহন করে।

সাধারণত যে-বিদ্যার উপায় ও পদ্ধতি অবলম্বনে আমরা অতীত ও বর্তমানকে জানতে বুঝতে চেষ্টা করি, তার নাম ইতিহাস। ইতিহাস-শাস্ত্রের সঙ্গে পৃথিবীর পরিচয় বহুপ্রাচীন কাল থেকেই। কিন্তু আধুনিক মানুষ আবিষ্কার করেছে, শুধু এই শাস্ত্রের সাহায্যে সে অতীত ও বর্তমানের যে-জ্ঞান লাভ করে তা আংশিক জ্ঞান মাত্র। কারণ, স্মৃতির প্রবাহ ছাড়া অন্য সূত্রেও অতীত বাহিত হয়ে বর্তমানে এসে পৌছয়, এবং তাকে প্রভাবিত করে ভবিষ্যতের রূপান্তর ঘটায়।

এই অন্য সূত্রগুলির মধ্যে প্রধান একটি সূত্র হচ্ছে রক্তপ্রবাহ, যাকে অবলম্বন করে বিভিন্ন মানুষের ধারা পৃথিবীর বুকে সঞ্চারিত হচ্ছে। এই বিচিত্র মানুষের ধারা বা নর-প্রবাহের জ্ঞানলাভের জন্য আধুনিক মানুষ নূতন একটি শাস্ত্রের, নূতন উপায় ও পদ্ধতির উদ্ভব ঘটিয়েছে। এই শাস্ত্রের নাম নরতত্ত্ব বা নৃশাস্ত্র, ইংরাজিতে যাকে বলে 'অ্যান্থ্রপলজি', স্বল্প অর্থান্তরে 'এথনলজি'।

নৃতত্ত্ব ছাড়া আধুনিক মানুষ আর একটি গভীর অর্থবহ শাস্ত্র গড়ে তুলেছে, নিজের অতীত ও বর্তমানকে জানবার বুঝবার জন্যই। এই নূতন শাস্ত্রটির নাম সমাজতত্ত্ব বা সমাজশাস্ত্র, এবং এই শাস্ত্রের উপায় ও পদ্ধতি অবলম্বন করে

মানুষ সামাজিক উদ্ভব ও বিবর্তনের বিচিত্র রীতিনীতি সম্বন্ধে, তার অতীতের জীবনযাত্রা, বর্তমানের আচরণ প্রভৃতি সম্বন্ধে পূর্ণতর জ্ঞান লাভ করে, যে-জ্ঞান নিছক ঐতিহাসিক দলিলপত্রের ভিতর থেকে লাভ সম্ভব নয়। মানুষ সামাজিক জীব; সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করবার প্রেরণায় ও প্রয়োজনে নানা কর্মসূত্রকে আশ্রয় করে এক-একটি সমাজ সে গড়ে তোলে, নিজেরই পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য। ধর্মকর্ম, শিল্পকলা, জ্ঞানবিজ্ঞান, সাহিত্যদর্শন প্রভৃতি যেমন এই কর্মসূত্রের অন্তর্গত, রাষ্ট্রবন্ধন, বর্ণবন্ধন, গোষ্ঠীবন্ধন, ব্যবসাবাণিজ্য, শস্যোৎপাদন, রন্ধন-ক্রিয়া, অশনবসন, প্রজনন, আচার-ব্যবহার, ছোটবড় তুচ্ছ যত কর্ম, সমস্তই বিশেষ দেশ ও কালের সামাজিক কাঠামোর বিভিন্ন সূত্র বা অঙ্গ, যারা আবার একে অন্যে পারস্পরিক সম্বন্ধে যুক্ত হয়ে সমাজদেহকে ধারণ করে রাখে। বলা প্রয়োজন, আমি সেই সব কর্মের কথাই বলছি যা একান্তভাবে ব্যক্তিগত নয়, যে-কর্ম সামাজিক প্যাটার্ন-গত, যে-কর্মের যোগ সমাজের অন্য দশজনের সঙ্গে। যাই হোক, এই সূত্র বা অঙ্গগুলির পরিচয় না পেলে অতীত ও বর্তমানের জ্ঞান সম্পূর্ণ হয় না। যে-শাস্ত্রের সাহায্যে এই জ্ঞান আমরা লাভ করি তারই নাম সমাজশাস্ত্র।

আজও ইতিহাস, নৃতত্ত্ব ও সমাজশাস্ত্র পৃথিবীর জ্ঞানী ও পণ্ডিতসমাজে পৃথক পৃথক শাস্ত্র হিসাবেই স্বীকৃত; বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতেও অধ্যয়ন-অধ্যাপনা সেইভাবেই হয়ে থাকে। কিন্তু, একান্ত সাম্প্রতিক কালে একটি জিনিস ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ছে; তা হচ্ছে এই যে, যত দিন যাচ্ছে তত যেন বিভিন্ন বিষয়ের সুনির্দিষ্ট সীমারেখা ঘুচে যাচ্ছে, একটি শাস্ত্রের সঙ্গে আর একটি শাস্ত্রের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠতর হয়ে ধরা পড়ছে, বিশেষত জ্ঞানের উচ্চতর স্তরে। সুখের বিষয়, ইতিহাস, নৃতত্ত্ব, সমাজশাস্ত্র পরস্পর যত পৃথকই হোক, তার অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ আজ একেবারে অস্বীকৃত নয়, অন্তত কোনো কোনো পণ্ডিতসমাজে। সে-দিন ক্রমশ এগিয়ে আসছে যখন এই তিনটি শাস্ত্রের ব্যবধান প্রায় একেবারে ঘুচে যাবে, এমন অনুমান খুব অযৌক্তিক নয়।

ইতিহাস রচনার একটি পদ্ধতি হচ্ছে, প্রায়-কুয়াসাচ্ছন্ন, অস্পষ্ট অতীত থেকে সময়ের সূত্র বেয়ে বেয়ে ধীরে ধীরে বর্তমানের দিকে এগিয়ে আসা, প্রত্ন-সাক্ষ্যের পদচিহ্ন অনুসরণ করে করে। এই পদ্ধতিই বহুশতাব্দী স্বীকৃত, বহু গুণীমান্য ঐতিহাসিক পদ্ধতি, যে-পদ্ধতি এ-যাবৎ আমরা মেনে চলেছি।

সমাজশাস্ত্র আমাদের একটি নূতন পদ্ধতির ইঙ্গিত দিয়েছে ও দিচ্ছে, একান্ত সাম্প্রতিক কালে। সেটি হচ্ছে, বর্তমান চলমান কালের সামাজিক প্যাটার্ন (সাংস্কৃতিক প্যাটার্ন যার অন্তর্গত) বিশ্লেষণ করে, তারই বিভিন্ন সূত্র অবলম্বন করে, ধীরে ধীরে অতীতের দিকে এগিয়ে যাওয়া এবং অতীতের সূত্রগুলির সঙ্গে যোগাযোগ আবিষ্কার ও প্রতিষ্ঠা করা। এর ফলে অতীত ও বর্তমানের রহস্যমুক্তি ঘটে, দুইই জীবন্ত হয়ে ওঠে এবং দুয়েরই নূতন অর্থসন্ধান লাভ করা যায়। তখনই শুধু অতীত ও বর্তমান একসূত্রে গাঁথা পড়ে। একথা অত্যন্ত বেশি সত্য সেই সব দেশ সম্বন্ধে যে-সব দেশে ইতিহাসের ধারাবাহিকতা অত্যন্ত প্রত্যক্ষ। ভারতবর্ষ সেই সব স্বল্প কয়েকটি ভূখণ্ডের অন্যতম। শেষোক্ত এই পদ্ধতি অবলম্বন করে ইতিহাসের পরিধিকে বিস্তৃত করা, ইতিহাসের পূর্ণতর জ্ঞান লাভ করার সজ্ঞান প্রয়াস পাশ্চাত্ত্য পৃথিবীর বিদ্বজ্জনসমাজে কিছুদিন যাবৎ দেখা দিয়েছে, এবং তার সুফলও পাওয়া যাচ্ছে। আমাদের দেশে এ-প্রয়াস কেউ কেউ কেবল শুরু করেছেন মাত্র।

এইমাত্র যে সামাজিক প্যাটার্ন বিশ্লেষণের কথা বললাম, এ-বিশ্লেষণের উপায় ও পদ্ধতি কি? কি উপায়ে এই প্যাটার্নের সূত্র বা অঙ্গগুলি ধরা পড়বে?

আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বদেশবাসীকে আহ্বান করে বলেছিলেন, বাংলাদেশের প্রত্যেকটি গ্রামে গ্রামে ঘুরে ও বাস করে প্রত্যেকটি গ্রামের গ্রাম্য ছড়া, প্রবাদ, এমন কি গালগল্প ও কিংবদন্তী, খাল-বিলহাওর, পথমাঠঘাটহাটবাজার, মঠমন্দিরমসজিদ, ঘরবাড়ী, আচারব্যবহার, ভয়বিশ্বাস রীতিনীতি, অশনবসন, আমোদপ্রমোদ, খেলাধূলা, ধর্মকর্ম, শিল্পকলা, শাসনব্যবস্থা, প্রভৃতির সম্পূর্ণ বিবরণ সংগ্রহ করবার জন্য। সেদিন তিনি একথাও বলেছিলেন যে, ছোট বড় ও স্থানীয় সমাজ ও সংস্কৃতির এই সব পূর্ণাঙ্গ বিবরণ সংগ্রহ না করলে বাংলা দেশ ও বাঙ্গালীর যথার্থ পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা কিছুতেই সম্ভব হবে না। সেদিন রবীন্দ্রনাথের কথায় আমরা কর্ণপাত করিনি। আজও আমাদের অনেক ঐতিহাসিক বিশ্বাসই করেন না যে, ইতিহাস অর্থাৎ অতীতের তথ্যনিষ্ঠ জ্ঞানলাভ করতে হলে বর্তমান সমাজের এই সব সূত্র সম্বন্ধে সংবাদ আহরণের কোনো প্রয়োজন আছে।

অথচ, সাম্প্রতিক সমাজতাত্ত্বিকেরা বলেন, যে-কোনো স্থানের সমাজ-

বিবর্তনের ধারার ইঙ্গিতগুলো আবিষ্কার করবার উপায় ও পদ্ধতিই হচ্ছে, স্থানীয় সমাজের পুংখানুপুংখ জরিপ বা সার্ভে। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্ববিদদের বক্তব্যও ঠিক একই। তাঁরাও বলেন, দেশকালধৃত কোনো মানব-গোষ্ঠীর ধর্ম-কর্ম, রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, সমাজ-সংস্কৃতি প্রভৃতির উৎস ও ক্রমপরিণতি জানতে হলে স্থানীয় জরিপক্রিয়া ছাড়া তা সম্ভবই হতে পারে না। এই জরিপক্রিয়া যত বিস্তৃত ও যত পূর্ণাঙ্গ হবে ইতিহাসের জ্ঞান তত পূর্ণ, গভীর ও বিস্তৃত হবে। সাধারণত কোন্ কোন্ প্রধান প্রধান বিষয়কে আশ্রয় করে এই জরিপক্রিয়া করতে হয় তার কিছু আভাস ও ইঙ্গিত রবীন্দ্রনাথ বহুপূর্বেই আমাদের জন্য রেখে গেছেন। সাম্প্রতিক নৃতাত্ত্বিক ও সমাজশাস্ত্রীরা এ-সম্বন্ধে আরও সুনির্দিষ্ট, সুপরীক্ষিত নির্দেশ দিয়েছেন এবং দিচ্ছেন।

কয়েক বৎসর আগে "বাঙ্গালীর ইতিহাস: আদিপর্ব" রচনাকালে নৃতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বলব্ধ কিছু কিছু তত্ত্ব ও তথ্য বাঙ্গালীর অতীতব্যাখ্যাকার্যে আমি ব্যবহার করেছিলাম। আমার কাছে তা ছিল একটি কঠিন পরীক্ষামূলক ব্যাপার। অনুমান হয়, সে-পরীক্ষায় কিছুটা সার্থকতা লাভ বোধ হয় আমার ঘটেছিল। না ঘটে থাকলেও ক্ষতি নেই, কারণ তা হয়ে থাকলে সেটা আমারই অক্ষমতার পরিচায়ক, পদ্ধতিটির নয়। কিন্তু ইতিহাস-রচনার নূতন এই পদ্ধতিটি প্রয়োগ করতে গিয়ে সুস্পষ্ট হয়ে আমার কাছে ধরা পড়লো, বাংলাদেশ ও বাঙ্গালী সম্বন্ধে আমার জ্ঞান অত্যন্ত কম, অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। যে-বর্তমান আমাদের চোখের সামনে বিস্তৃত সেই বর্তমান সম্বন্ধেই আমাদের জ্ঞান কত স্বল্প, কত অসম্পূর্ণ! স্থানীয় সমাজ ও সংস্কৃতির উৎস ও বিবর্তনের ক্রমগুলো জানা নেই বলে বৃহত্তর দেশের অতীতের টুকরোটাকরা সংবাদ, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত তথ্যগুলো আমাদের কাছে কোনো অর্থই যেন বহন করে না; অনেক সময় সে-সব তথ্য আমাদের দৃষ্টিই আকর্ষণ করে না। তার চেয়েও বড় কথা, বিভিন্ন তথ্যের মধ্যে পারস্পরিক যোগসূত্রটাই আমরা আবিষ্কার করতে পারি না, যেহেতু চলমান সমাজের গতিপ্রকৃতির সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটেনি। সে পরিচয় সম্পূর্ণ হয়না সমাজশাস্ত্রের সহায়তা ছাড়া।

আমার সতীর্থ বন্ধু বিনয় ঘোষ মশায় আমাদের এই অভাব অন্তত কিছুটা ঘুচাবার দায় নিজের স্কন্ধে তুলে নিয়ে পশ্চিমবাংলার গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে আমাদের স্থানীয় সমাজ ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে নানা তথ্য সংগ্রহ করেছেন, প্রভূত

আয়াসে, অক্লান্ত ধৈর্য, নিষ্ঠা ও ভালোবাসায়। জরিপ ও সংগ্রহক্রিয়া যেমন করেছেন, বিশ্লেষণও সঙ্গে সঙ্গে তেমনই করেছেন, যার ফলে পশ্চিমবাংলার গ্রাম্যসমাজের চলমান সাম্প্রতিক রূপটি আমাদের কাছে অনেকটা প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। স্থানীয় ইতিহাস ও ক্রমে ক্রমে বৃহত্তর দেশের ইতিহাসের উপাদান কি করে আহরণ করা যায় সমাজশাস্ত্রের উপায় ও পদ্ধতির সাহায্যে, বিনয়বাবু তার একটি সুষ্ঠু দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। প্রাচীন ও মধ্যযুগের পশ্চিম বাংলার জীবনযাত্রার ছোটবড় কিছু কিছু অংশ তাঁর এই জরিপক্রিয়ার ফলে স্পষ্টতর ও পূর্ণতর হবে, এ-আশা বোধ হয় অন্যায় নয়। শুধু দুঃখ হয় এই ভেবে যে, পূর্ববাংলা সম্বন্ধে এ-কাজ করবার সুযোগ যখন আমাদের ছিল, তখন আমরা তা কেউ করিনি। এখন সে-সুযোগ কবে হবে কে জানে!

নৃতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের পদ্ধতি অবলম্বন করে ইতিহাস রচনায় প্রবৃত্ত হলে কি ধরনের সমৃদ্ধ ফসল ফলানো যায়, ইতিহাস কত যুক্তি ও তথ্যনিষ্ঠ হয়ে ওঠে তার দু-একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করি, আমাদের দেশের ইতিহাস থেকেই। হিন্দু-সমাজের বর্ণাশ্রমের ইতিহাস উনিশ শতক থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত অনেক ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকেরাই রচনা করেছেন। তাঁদের প্রধান নির্ভর বেদ উপনিষদ থেকে শুরু করে যাবতীয় সংস্কৃত ও পালিশাস্ত্রগ্রন্থ, কোনো কোনো ক্ষেত্রে শিলালিপি, তাম্রপট্ট, পুরাণ, স্মৃতি ও সাহিত্য-গ্রন্থ। কিন্তু তাঁদের রচিত বর্ণাশ্রমের ইতিহাস বর্ণাশ্রমের যুক্তি ও রহস্য ততদিন এতটুকুও ভেদ করতে পারেনি যতদিন না নৃতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের সাহায্য নিয়ে সে-পদ্ধতি অবলম্বন করে হাটন প্রভৃতি পণ্ডিতেরা বর্ণাশ্রমের ভিত্তি, উদ্ভব ও বিবর্তনের সমস্ত সূত্র ও স্তরগুলি একটি একটি করে ধরিয়ে দিলেন। আর্য ও অনার্যভাষা-ভাষী লোকদের সমন্বয়ের সূত্রগুলিও আমাদের চোখে বহুদিন সুস্পষ্ট হয়ে ধরা পড়েনি, পড়লো তখনই যখন জ্ঞাত তথ্যাদির উপর নৃতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের আলো এসে পড়লো রমাপ্রসাদ চন্দ ও অন্যান্য দু'একজন মনীষীর সামাজিক ও নৃতাত্ত্বিক জরিপের ফলে।

বিশুদ্ধ বংশাবলী-ইতিহাস, যাকে বলা হয় 'ক্রনিকল', রাজাবাদশা'র কথা, যুদ্ধবিগ্রহের কথা ইত্যাদি, হয়তো তা তথাকথিত ঐতিহাসিক দলিলপত্র থেকে রচিত হতে পারে, কিন্তু সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনা করতে হলে

নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক তথ্য, উপায় ও পদ্ধতি অবলম্বন না করলে প্রত্নসাক্ষ্যও তার সমস্ত রহস্য উদ্ঘাটিত করতে পারে না। যাঁরা গর্ডন চাইল্ড প্রভৃতি মনীষীর সাম্প্রতিক গবেষণাদি এবং সর্বজনসুখপাঠ্য গ্রন্থাদির সঙ্গে পরিচিত তাঁরাই একথার সত্যতা স্বীকার করবেন। কথাটি শুধু প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধেই প্রযোজ্য নয়, মধ্য ও উত্তরপর্ব সম্বন্ধেও সমান সত্য। বিগত একশ বছর ধরে অসংখ্য গবেষক স্থানীয় কাউন্টি ও পারিশের (county ও parish) যাবতীয় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক তথ্যাদি যদি সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে না রাখতেন, জরিপ কার্যটির ফলাফল যদি তৈরী না থাকতো, এবং তার উপর সমাজশাস্ত্রের উপায় ও পদ্ধতির আলোকপাত না ঘটতো তাহলে কি ট্রেভিলিয়ানের পক্ষে ইংলণ্ডের সামাজিক ইতিহাস রচনা করা সম্ভব হতো?

বাংলাদেশে সম্প্রতি যে দু'চারজন গবেষক ইতিহাসে এই নূতন পদ্ধতির প্রয়োগে অগ্রসর হয়েছেন, বিনয় ঘোষ তাঁদের অন্যতম। আমাদের উনিশ শতকের সংস্কৃতি বিশ্লেষণে তিনি ইতিমধ্যেই এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে এমন সার্থক ফললাভ করেছেন যার সন্ধান আগে আমরা জানতাম না। বর্তমান গ্রন্থে তিনি বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করেছেন, কিন্তু উদ্দেশ্য একই, এবং তা হচ্ছে বাংলাদেশ ও বাঙালীর সংস্কৃতির ইতিহাসের সূত্র আবিষ্কার।

আমার এই যুক্তির অর্থ এ নয় যে, প্রত্নসাক্ষ্য ও সমসাময়িক দলিলপত্রের তথ্যাদি গ্রাহ্য বা নির্ভরযোগ্য নয়। মূর্খসুলভ এই যুক্তি একেবারেই আমার উদ্দেশ্য নয়। প্রত্নসাক্ষ্য ও ঐতিহাসিক দলিলপত্রের তথ্যাদির মূল্য ও মর্যাদা সম্পূর্ণ স্বীকার করে নিয়েও আমার বিনীত বক্তব্য এই যে, সে-সাক্ষ্য ও তথ্যাদির সম্পূর্ণ অর্থ ও প্রকৃতি সুস্পষ্ট ততক্ষণ হতে পারে না যতক্ষণ তার উপর আমরা সমাজশাস্ত্রের রীতিনীতি গতিপ্রকৃতি ও উপায়পদ্ধতির প্রয়োগ না করি। এ-যাবৎ আমরা বহুলাংশে তা করিনি বলে আমাদের ইতিহাস রচনাও বহুলাংশে ক্রনিকল্-স্তর উত্তীর্ণ হয়ে সার্থক ইতিহাসের স্তরে উন্নীত হতে পারেনি। ক্রমশ এইদিকে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হোক, আমার ইতিহাসলুব্ধ চিত্তের এই কামনা।

পরিশিষ্ট ও নির্ঘন্ট

মুর্শিদাবাদ

পশ্চিমবঙ্গে আমার পর্যবেক্ষণ-সীমা ভাগীরথী পশ্চিমতীর পর্যন্ত। কিন্তু সাংস্কৃতিক সীমানা কখন এইভাবে টানা যায় না। পশ্চিমবঙ্গের অর্থাৎ রাঢ়দেশের সাংস্কৃতিক উপকরণের প্রভাব ভাগীরথীর পূর্বতীরে বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত। এই প্রভাবের সঙ্গত কারণও আছে। প্রাচীন রাঢ়ের ভৌগোলিক সীমানার অন্তর্ভুক্ত ছিল পূর্বতীরের খানিকটা অংশ (নদীয়া, মুর্শিদাবাদ ও ২৪-পরগণা জেলায়)। পশ্চিমতীরে নদীয়া গণ্য না হলেও, মুর্শিদাবাদের অনেকটা ভূভাগ আছে (কান্দী ও জঙ্গীপুর মহকুমার)। ভাগীরথীর পূর্বতীরের নদীয়ান্তর্গত বহু স্থানের সঙ্গে পশ্চিমতীরের সাংস্কৃতিক সাদৃশ্যও লক্ষণীয়। কিন্তু মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া জেলার এইসব অঞ্চলের গ্রামকেন্দ্রিক বিস্তারিত বিবরণ দিলে পূর্ব-বর্ণিত 'গ্রাম প্রদক্ষিণের' পুনরাবৃত্তি হবে বলে, তা থেকে বিরত হলাম। সংস্কৃতিধারার প্রবাহ বিচারের জন্য যেটুকু নিতান্ত প্রয়োজন, খুব সংক্ষেপে সেইটুকু এখানে বলছি।

সাঁওতাল পরগণা ও উত্তর-পূর্ব বীরভূমের সংলগ্ন মুর্শিদাবাদের ভূভাগের প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক সাদৃশ্য দুই-ই উল্লেখযোগ্য। উত্তরে রাজমহল ও পশ্চিমে সাঁওতাল পরগণা থেকে আদি-অস্ট্রাল (Proto-Australoid) বা নিষাদ-সংস্কৃতির ধারা মুর্শিদাবাদের এই অংশে অনেকদূর পর্যন্ত প্রবাহিত। জৈন ও বৌদ্ধ-সংস্কৃতির ধারা ভাগীরথীর পশ্চিমতীরবর্তী মুর্শিদাবাদে (জঙ্গীপুর ও কান্দী মহকুমায়) বেশ প্রবলই বলা যেতে পারে। প্রাচীন হিন্দুযুগে উত্তররাঢ় ও কর্ণসুবর্ণ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল এই অঞ্চল। কর্ণসুবর্ণ রাজ্যের কথা ইউয়াং চোয়াং (হুয়েন সাঙ) তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে উল্লেখ করে গেছেন।[১] তন্‌-মো-লি-টি (তাম্রলিপ্ত-তমলুক) থেকে ৭০০ লী (১লী = ১$\frac{১}{২}$ মাইল) উত্তর-পশ্চিমে তিনি কা-লো-ন-সু-ফ-ল-ন (কর্ণসুবর্ণ) রাজ্যে যান। এ-বৃত্তান্ত ভৌগোলিক বিচারে ভুল মনে হয়, কারণ কর্ণসুবর্ণ রাজ্য যদি মুর্শিদাবাদ জেলায় হয়, তাহলে তাম্রলিপ্তের উত্তর-পূর্বে তা

জৈন-বৌদ্ধধর্ম

১ On Yuan Chwang's Travels in India (629-645A.D): By Thomas Watters, Vol 2, P.P. 191-193.

অবস্থিত ছিল, উত্তর-পশ্চিমে নয়। ওয়াটার্স অন্যান্য তথ্যপ্রমাণ বিচার করে সিদ্ধান্ত করেছেন যে উত্তর-পূর্বকে ভুলক্রমে এখানে উত্তর-পশ্চিম বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পণ্ডিতেরাও এই বিচার মেনে নিয়েছেন। কর্ণসুবর্ণ রাজ্যের পরিধি ৪৪৫০ লী (প্রায় সাড়ে-পাঁচহাজার মাইল) এবং তার রাজধানীর পরিধি ২০লী (২৪ মাইল) ছিল। তার মধ্যে পরিব্রাজক হুয়েন সাঙ দশটি বৌদ্ধবিহার ও দুহাজার বৌদ্ধ শ্রমণ দেখেছিলেন। রাজধানীর পাশেই ছিল লো-টো-উই (মো৩)-চি (রক্তমৃত্তি=রাঙ্গামাটি) বিহার। এই বিহারের পাশে সম্রাট অশোকের আদেশে নির্মিত কয়েকটি বৌদ্ধস্তূপ ছিল। বুদ্ধদেব নিজে এই সব স্থানে ধর্মপ্রচার করেছিলেন। লো-টো-মো-চি সত্যই মুর্শিদাবাদ জেলার 'রাঙ্গামাটি' (চিরুটি স্টেশন থেকে কিছু দূরে) কি না, তাই নিয়ে বহু তর্ক হয়েছে। এখন মোটামুটি অনেকে স্বীকার করে নিয়েছেন। তা যদি হয় তাহলে ভাগীরথীর পশ্চিমতীরস্থ মুর্শিদাবাদে একদা বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্য ছিল বোঝা যায়। এই অঞ্চলে অনেক গ্রাম থেকে প্রচুর বৌদ্ধ ও জৈন দেবদেবীর মূর্তি পাওয়া গেছে এবং এখনও বহু গ্রামের পথপ্রান্তে ও গাছতলায় সেগুলি ভিন্ন দেবতার নামে পূজিত হচ্ছে দেখা যায়। বৌদ্ধধর্মী পালরাজাদের সঙ্গে জড়িত কিংবদন্তীর প্রচলনও এখানে বেশি। মহীপাল দীঘি, মহীপাল রাজার প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ ইত্যাদি (মহীপাল হল্ট-স্টেশন) আজও স্থানীয় লোকেরা দেখিয়ে থাকেন। সন্ধ্যাকরনন্দী তাঁর 'রামচরিত' কাব্যে রামপাল রাজার যে মিত্রসামন্তদের নামতালিকা দিয়েছেন, তাতে দেখা যায় 'কযঙ্গল-মণ্ডলের' অধিপতি নরসিংহার্জুনের নাম আছে। এই 'কযঙ্গল'-মণ্ডল রাজ-মহলের দক্ষিণদিকস্থ 'কক্‌জোল' নামে স্থান বলে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন।[১] কানিংহাম ও ফার্গুসন সাহেবের মতও তাই। ফার্গুসন 'Sicligully' (সকরিগলি) কযঙ্গল বলেছেন। কযঙ্গলের নাম প্রাচীন বৌদ্ধ পালিসাহিত্যে উল্লেখ আছে।[২]

কান্দীর কয়েকমাইল দক্ষিণে 'পাঁচথুপি' নামে স্থান আছে। অনেকে মনে করেন, পাঁচটি বৌদ্ধ স্তূপ (পঞ্চস্তূপ—পাঁচথুপি) ছিল বলে, স্থানের নাম

১ রামচরিত: রাধাগোবিন্দ বসাক, ভূমিকা ১৷৷৴

২ Journal of Royal Asiatic Sceiety, 1904, P.P. 86-88.

পাঁচথুপি হয়েছে। স্তূপের কোন আভাস আশপাশের কোন ধ্বংসাবশেষ থেকে পাওয়া যায় না এখন। না গেলেও, বৌদ্ধপ্রাধান্যের যুগে এইস্থানে একাধিক স্তূপ থাকা আশ্চর্য নয়। স্থানটিও প্রাচীন। কান্দীতে রুদ্রদেবের যে মন্দির আছে তাতে রুদ্রের মূর্তি বুদ্ধমূর্তি বলেই (বিরোচন) মনে হয়। পালরাজার রাজধানী বলে কথিত 'মহীপাল' থেকে প্রচুর বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তি পাওয়া গেছে। এই সব প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নিদর্শন থেকে মনে হয়, পালযুগে তো বটেই, পালপূর্ব যুগ থেকেই হয়ত প্রাচীন রাঢ়ান্তর্ভুক্ত ভাগীরথীর পশ্চিমতীরস্থ মুর্শিদাবাদে জৈন-বৌদ্ধধর্মের প্রচার হয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য হল, ধর্মঠাকুরের পূজা বীরভূম-সংলগ্ন কান্দী মহকুমার অনেকটা অঞ্চল পর্যন্ত একদা প্রচলিত ছিল। এখন প্রায়লুপ্ত বলা চলে।

শাক্ত ও শৈবধর্মের প্রাধান্য মুর্শিদাবাদের এই দিকটায় খুব বেশি। বীরভূম-বর্ধমানের সঙ্গে তার কোন অসঙ্গতি নেই। বৈষ্ণবধর্মের প্রভাবও লক্ষণীয়।

শাক্ত ও বৈষ্ণবধর্ম

কিন্তু বৈষ্ণব প্রভাবের সামাজিক স্তর সীমাবদ্ধ বলে মনে হয়। মালিহাটিতে রাধামোহন ঠাকুরের শ্রীপাট (শ্রীনিবাস আচার্যের প্রপৌত্র), সিজগ্রামে দ্বিজ হরিদাসের শ্রীপাট, ভরতপুরে গদাধর পণ্ডিতের শ্রীপাট, দক্ষিণখণ্ডে (সালারের দক্ষিণে) রসিকদাস কীর্তনিয়ার শ্রীপাট, টেঁয়ার বৈষ্ণবদাস গোকুলানন্দ সেনের শ্রীপাট—সবই কান্দীর দক্ষিণাঞ্চলে, বর্ধমানের বৈষ্ণবতীর্থ কাটোয়া মহকুমা-সংলগ্ন। বৈষ্ণবধর্মের প্রসারের ধারা সম্বন্ধে একটা ধারণা হয় এখান থেকে।

মুর্শিদাবাদের এ-অঞ্চলে মুসলমানযুগের সাংস্কৃতিক নিদর্শন পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকা স্বাভাবিক। তার বিস্তারিত তালিকা দেওয়ার প্রয়োজন নেই। জঙ্গীপুর

ইসলাম ও হিন্দুসংস্কৃতি

মহকুমার অন্তর্গত 'একানি চাঁদপাড়া' গ্রাম কেন্দ্র করে হুসেনশাহের জীবনের অনেক কাহিনী ও কিংবদন্তী রচিত হয়েছে। প্রমাণাদি যা পাওয়া গেছে, তা থেকে তার ঐতিহাসিক ভিত্তি খানিকটা আছে মনে হয়। কাছাকাছি বহু গ্রাম থেকে হুসেনশাহের রাজত্ব-কালীন একাধিক শিলালিপি পাওয়া গেছে।[১] হুসেনশাহের স্মৃতিবিজড়িত এই অঞ্চল বাঙালীর সাংস্কৃতিক পীঠস্থান বললেও অত্যুক্তি হয় না। প্রধানত

১ History of Bengal, Vol II : Chapter 7; Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1917 (148-150), 1921 (149)

বৈষ্ণবধর্মের প্রভাবে, ষোড়শ শতাব্দী থেকে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিক্ষেত্রে যে নবজাগরণের সূত্রপাত হয়, তা হুসেনশাহীবংশের উদারধর্মী রাষ্ট্রনীতি ও মানসিক প্রশস্ততার ফলে। একানি চাঁদপাড়া ও তার পার্শ্ববর্তী গ্রামই বাংলাদেশের এই ঐতিহাসিক মুসলমান রাজবংশের উৎপত্তিকেন্দ্র। আরবদেশ থেকে এঁরা এলেও, বাংলার মাটিকে এখানেই এঁরা আপন করে নিয়েছিলেন এবং এমনভাবে করেছিলেন যে বাঙালী সংস্কৃতির পুনর্জাগরণের প্রবর্তক হয়েছিলেন তাঁরা। মুর্শিদাবাদের এই অঞ্চলে হিন্দু ও মুসলমান-সংস্কৃতির বিচিত্র আদান-প্রদানও হয়েছিল। জৈন-বৌদ্ধ সংস্কৃতির উদারতার ঐতিহ্যপুষ্ট অঞ্চলে সহজেই ইসলাম ও হিন্দুধর্ম ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল। স্থানীয় দর্গায়, পীরের আস্তানায়, মেলায় ও উৎসব-পার্বণে আজও তার বিস্ময়কর প্রমাণ রয়েছে। যেমন জঙ্গীপুরের কাছে রঘুনাথগঞ্জের সৈয়দ কাশিমের দর্গা (যাঁর নাম থেকে 'কাশিমবাজার') হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই তীর্থস্থান। আরও উত্তরে ছাপখাটিতে মর্তুজা হিন্দের দর্গা ও ভৈরবী আনন্দময়ীর আশ্রম। ছাপখাটির দর্গায় পুজো দেবার সময় মুসলমানরা বলেন 'জয় মা কালী', আর হিন্দুরা বলেন 'আল্লা হো আকবর'। অনতিদূরে 'সুতী' থেকে ভাগীরথী দুই ধারায় (পদ্মা ও ভাগীরথী) বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতির দুই ধারা এমনভাবে বাংলার মাটিতে কখন বিভক্ত হয়নি। গ্রামে জনপদে তার যুক্তধারা একখাতেই প্রবাহিত হয়েছে। রাজনীতির উত্তাপে আজ সেই ধারা প্রায় শুকিয়ে গেছে, কিন্তু বাংলার জানপদ-সংস্কৃতির ইতিহাসে এই মরুদৃশ্যের কোন চিহ্ন নেই।

মুর্শিদাবাদের ঐতিহাসিক স্থানের বিবরণ পূর্বে অনেক প্রকাশিত হয়েছে। এখানে তার পুনরাবৃত্তি করে লাভ নেই।[১] বড়নগরের (লালবাগ) মন্দিরগুলি (অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের তৈরি) বাংলার বিভিন্ন প্রকারের মন্দির-স্থাপত্যের নিদর্শনরূপে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মন্দিরের গায়ে চমৎকার পোড়ামাটির কারুকার্য আছে।

১ বেভারীজ সাহেব (H. Beveridge) 'Old Places in Murshidabad' নাম দিয়ে 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকায় (১৮৯২ সালে) কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এই প্রবন্ধগুলি ছাড়া কৌতূহলীরা পুরাতন ও নূতন জেলা গেজেটিয়ার (ও-মালি সাহেব সম্পাদিত, এবং শ্রীঅশোক মিত্র সম্পাদিত), প্রত্নতত্ত্ববিভাগের রিপোর্ট ইত্যাদি দেখতে পারেন।

নদীয়া

নদীয়ার স্থানগুলি আমার প্রত্যক্ষ সন্ধান-সীমানার বহির্ভূত, কারণ তার সবগুলিই ভাগীরথীর পূর্বতীরবর্তী। তবু ভৌগোলিক পশ্চিমবঙ্গের (অর্থাৎ রাঢ়দেশের) সংস্কৃতিধারার প্রসার ও সংযোগ পূর্বতীরস্থ নদীয়ার সঙ্গে গভীর বলে, কয়েকটি স্থান আমাকে পরিদর্শন করতে হয়েছে। যেমন চব্বিশপরগণা জেলার গঙ্গাতীরবর্তী স্থানগুলিও করতে হয়েছে। তা ছাড়া, ঐতিহাসিক 'নবদ্বীপ' সংস্কৃতির স্মৃতিজড়িত নবদ্বীপ, মায়াপুর, বল্লালদীঘি, বিল্বপুষ্করিণী প্রভৃতি অঞ্চলে না গেলে, বাংলার সাংস্কৃতিক প্রাণকেন্দ্রে যাওয়া হয় না।

নবদ্বীপ ও মায়াপুর

স্থানীয় গৌড়ীয় মঠ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে একাধিকবার এই স্থানগুলি পরিদর্শন করেছি। গত কয়েক শতাব্দীর মধ্যে এ-অঞ্চলে ভাগীরথীর এত বেশি ধারাবদল হয়েছে যে প্রাচীন নবদ্বীপের ভৌগোলিক অবস্থান আজ নির্ণয়াতীত ব্যাপার বলা চলে। এ-সম্বন্ধে দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায় যা লিখেছেন তা প্রণিধানযোগ্য : [১]

"...বঙ্গেশ্বরের রাজত্বকালে নবদ্বীপের যে স্থানে নগর ছিল, সে স্থান ভাগীরথী স্রোতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। পূর্বে, নবদ্বীপের পশ্চিম ও দক্ষিণে ভাগীরথী, ও পূর্বদিকে খড়িয়া নদী ছিল; এই উভয় স্রোতস্বতী নবদ্বীপের দুই ক্রোশ দক্ষিণ গোয়ালপাড়া গ্রামের নিকট মিলিত হয়। তৎকালে ঐ সন্ধিস্থানকে ত্রিমোহণী বলিত। নবদ্বীপের উত্তরে বিল্বপুষ্করিণী ও যে স্থান বল্লালদীঘি বলিয়া খ্যাত হইয়াছে, সেই স্থান ছিল। পরে, জাহ্নবী নবদ্বীপের উত্তর-পশ্চিমাংশে যে স্থানে দক্ষিণমুখী হইয়াছিলেন, সেই স্থান হইতে পূর্বাস্যা হইয়া, নবদ্বীপের উত্তরাংশ ভগ্ন করতঃ, বল্লালদীঘীর দক্ষিণে খড়িয়া নদীর সহিত মিলিত হইয়া দক্ষিণবাহিনী হন। ইদানীং নগরের উত্তরে যে স্থানে সুরধুনী প্রবাহিতা আছেন, সে স্থান হইতে ঐ প্রবাহ তৎকালে প্রায় দুই ক্রোশ দূরবর্তী ছিল। পরে, ক্রমশঃ নগরের উত্তরভাগ উদরস্থ করিতে করিতে দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হন। যে অংশ নদীগর্ভস্থ হইতে লাগিল, সেই অংশেই পুরবাসীদিগের বসতি ছিল। যাহাদের বাসস্থান জলসাৎ

১ ক্ষিতীশ-বংশাবলি-চরিত (সংবৎ ১৯৩২) : ৫৩-৫৪ পৃষ্ঠা।

হইল, তাহাদের মধ্যে কেহ বা গ্রামান্তরে, কেহ বা গ্রামের দক্ষিণভাগে যে চর ছিল, তথায় বসতি করিল। এইরূপে, যে ভাগে পৌরদিগের নিকেতন ছিল, সে ভাগ ক্রমে ক্রমে তিরোহিত হইল, এবং যে ভাগ বালুকা ও অরণ্যময় ছিল, তাহা মনুষ্যের আবাস স্থলরূপে পরিণত হইতে লাগিল।"

বর্তমান নবদ্বীপের ভৌগোলিক প্রাচীনত্ব তাই তর্কসাপেক্ষ ব্যাপার। মায়াপুর থেকে বল্লালদীঘী, বিল্বপুষ্করিণী পর্যন্ত গেলে এইটুকু অন্তত বোঝা যায় যে স্থানগুলি প্রাচীন। মনে হয়, এ-অঞ্চলের সবটুকুই প্রাচীন নবদ্বীপের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মায়াপুরের অনতিদূরে 'বল্লালঢিবি' নামে যে উন্নত স্থানটি আছে তা প্রত্নতত্ত্ববিদদের খননযোগ্য নিশ্চয়। দীর্ঘকাল আগে কার্তিকেয়চন্দ্র লিখে গেছেন যে, "রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষেরা ঐ ঢিবি হইতে অনেকগুলি প্রস্তরস্তম্ভ ও নানারূপ প্রস্তরখণ্ড লইয়া আইসেন" (ক্ষিতিশ-বংশাবলি-চরিত)। এরকম নানারকমের পাথুরে নিদর্শন এখনও পাওয়া যায়। বল্লালঢিবি খুঁড়লে প্রাচীন নবদ্বীপের ইতিহাস ও ভৌগোলিক অবস্থান সম্বন্ধে আমাদের ধারণা আরও পরিষ্কার হতে পারে। ইত্যবসরে, বর্তমান নবদ্বীপ, না মায়াপুর, কোথায় সেনরাজাদের রাজধানী ছিল, বাংলার প্রধান বিদ্যাসমাজ ছিল, এবং কোন্ স্থানটি শ্রীচৈতন্যের জীবনস্মৃতিজড়িত, তা নিয়ে বাক্‌যুদ্ধ করা অর্থহীন। রাজধানীর কেন্দ্রস্থলটি অনাবিষ্কৃত ও অনির্ণীত থাকলেও, এই অঞ্চলের সবটুকুই যখন 'নবদ্বীপ' বলে কথিত ছিল, তখন বাংলার শাস্ত্রীয় পাণ্ডিত্যের গৌরব এবং শ্রীচৈতন্যের প্রবর্তিত বৈষ্ণব-সংস্কৃতির ঐতিহ্য-গৌরব সকলেই সমানভাবে বোধ করতে পারেন। নবদ্বীপ বিদ্যাসমাজভুক্ত বিল্বপুষ্করিণী, কুশদ্বীপ, চাকদহ, কাঞ্চনপল্লী (কাঁচরাপাড়া) ইত্যাদি স্থানের পণ্ডিতদের ইতিহাস সম্প্রতি সবিস্তারে লেখা হয়েছে।[১] এখানে তার পুনরাবৃত্তি করার প্রয়োজন নেই।

চব্বিশপরগণার হালিশহর ছাড়ালেই কাঞ্চনপল্লী (কাঁচরাপাড়া), ফুলিয়া, শান্তিপুর, নবদ্বীপ প্রভৃতি গঙ্গাতীরবর্তী সব স্থানই প্রায় বৈষ্ণবদের তীর্থস্থান এবং শ্রীচৈতন্য ও তাঁর পার্ষদদের জীবনস্মৃতিমণ্ডিত। কাঞ্চনপল্লী 'সেন শিবানন্দের শ্রীপাট'। শ্রীচৈতন্য শিবানন্দের গৃহে গিয়েছিলেন।[২] সেন শিবানন্দের

১ শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য : বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান, প্রথম ভাগ।

২ শ্রীসতীশচন্দ্র দে : গৌরাঙ্গদেব ও কাঞ্চনপল্লী (১৯৩৪)। আঞ্চলিক ইতিহাসের একখানি ভাল বই।

প্রতিষ্ঠিত শ্রীকৃষ্ণরায় বিগ্রহ নিত্যপূজিত হয়। কৃষ্ণরায়ের মন্দিরটিও বাংলা দেবালয়ের স্থাপত্যের দিক থেকে উল্লেখযোগ্য। মধ্যযুগ ও আধুনিকযুগের সন্ধিক্ষণের কবি ঈশ্বরগুপ্তও কাঞ্চনপল্লীবাসী ছিলেন। কাঁচরাপাড়ার কয়েক মাইল দূরে কর্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রধান কেন্দ্র ঘোষপাড়া। কর্তাভজারা বলেন যে আউলচাঁদ তাঁদের ধর্মের আদিগুরু এবং তিনি চৈতন্যদেবের অবতার। আউলচাঁদ ফকিরবেশে ঘোলাদুবলী, উলা (বীরনগর) প্রভৃতি গ্রাম ঘুরে বেজড়া গ্রামে এসে বাইশজনকে দীক্ষা দেন। এই বাইশজন শিষ্যের মধ্যে সদ্‌গোপজাতীয় ঘোষপাড়ার অধিবাসী রামশরণ পাল এবং কাঁচরাপাড়াবাসী গোপজাতীয় কানাই ঘোষের নাম বিখ্যাত। 'আউলচাঁদ দোয়াগরু, সঙ্গে বাইশ ফকির বাছুর তার'—এই হল প্রচলিত কথা। কর্তাভজাদের জাত-বিচার নেই, মুসলমানরা পর্যন্ত এই ধর্মে দীক্ষিত হতে পারেন। কবি কৃত্তিবাসের জন্মস্থান ফুলিয়া ও হরিদাস ঠাকুরের সাধনপীঠ বলে বিখ্যাত। শান্তিপুর অদ্বৈত আচার্যের কর্মস্থান ও তাঁর বংশধরদের বাসভূমি। চাকদহ-পালপাড়ার চারচালা ইটের বাংলা মন্দিরটি প্রাচীন। এই ধরনের ইটের মন্দির বাংলাদেশে এখন নেই বললেই হয়। গড়নের দিক থেকে মন্দিরটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এককালে পালপাড়া ও শান্তিপুরের বিদ্যাসমাজের খ্যাতি ছিল নবদ্বীপতুল্য। শান্তিপুরের সর্বানন্দী, বল্লভী, নপাড়ী, চৈতল, শোভাকর, কাশ্যপ ভট্টাচার্য প্রভৃতি বংশে বহু বিখ্যাত পণ্ডিত জন্মেছেন, তাঁদের সংখ্যা কয়েকশত হবে।

শ্রীচৈতন্য ও তাঁর সহচরদের প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফলে নদীয়ার এই অঞ্চলে বৈষ্ণবধর্মের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু প্রাধান্য বলতে যদি লোকসমাজে ব্যাপক প্রসার ও প্রভাব বোঝায়, তাহলে বৈষ্ণবধর্মের প্রাধান্য সম্বন্ধে তর্ক করা যেতে পারে। চৈতন্যচরিতকার যে-শ্রেণীর ধর্মাচারীদের 'পাষণ্ড' বলেছেন, নদীয়ার এ-অঞ্চলে তাঁদের ব্যাপক প্রতিপত্তি আজও দেখা যায়। এ-প্রতিপত্তি সাম্প্রতিক কালের নয়, দীর্ঘকাল ধরেই তন্ত্র ও শাক্ত আচারের ধারা এখানে অব্যাহত রয়েছে। উলা-বীরনগরের বিখ্যাত উলাই চণ্ডীর বিশেষ উৎসব হয় বৈশাখী বুদ্ধ পূর্ণিমায়। হাড়ীজাতির লোকে প্রথম পূজা দেয়, পূজায় শূয়োর বলি হয়। বল্লালদীঘি বেলপুকুর অঞ্চলের গোপরা আজও দলে দলে পূর্বস্থলীর অধীন জামালপুরের (পশ্চিমতীরে বর্ধমানে)

নদীয়ার বৈষ্ণব ও শাক্ত ধর্ম

বুড়োরাজের উৎসবে যোগদান করতে যায়। এছাড়া অন্যান্য শাক্তপূজার নিদর্শনও যথেষ্ট আছে, কিন্তু তার মধ্যে এই চণ্ডী ও ধর্মপূজারীদের কথাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নবদ্বীপ তান্ত্রিক পণ্ডিতদের প্রধান কেন্দ্র, শাক্ত উৎসবের সমারোহ সেখানে খুব বেশি। পণ্ডিতেরা শ্রীচৈতন্যের ধর্মপ্রচার খুব সুনজরে দেখতেন না। তার উপর, নবদ্বীপের রাজারাও (কৃষ্ণনগরের) বৈষ্ণবধর্মানু-রাগী ছিলেন না। 'ক্ষিতীশ-বংশাবলি-চরিত'-কার লিখেছেন: [১]

> "তৎকালে এপ্রদেশস্থ প্রায় যাবতীয় লোক শক্তি উপাসক ছিলেন। তন্মধ্যে অনেকে তন্ত্রোক্ত ক্রিয়ার অনুষ্ঠানোপলক্ষে পানাসক্ত ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ হইতেন।"
>
> "নবদ্বীপের রাজা বা পণ্ডিতগণ চৈতন্যকে অবতারের মধ্যে কখন গণ্য করেন নাই; একারণ যদিও চৈতন্যের প্রবর্তিত ধর্ম প্রচারক, অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ গোস্বামী, ও তাঁহাদের পূর্বপুরুষগণ, এই রাজাদিগের অধিকারের চতুঃপার্শ্বে ভূরি ভূরি শিষ্য করিয়াছেন, তথাপি যে প্রদেশে তাঁহাদের বাস, সে প্রদেশে প্রথমে বহুতর শিষ্য করিতে পারেন নাই।"

একথার সত্যতা আজও নদীয়ার গ্রামে গ্রামে ঘুরলে উপলব্ধি করা যায়। শ্রীচৈতন্যপ্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্ম বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতিতে যে নবজাগরণ এনেছিল, তা বাঙালী সমাজের উচ্চস্তরের মধ্যেই প্রধানত সীমিত ছিল। জনজীবনে ও জনমানসে তার ব্যাপক ও গভীর ছায়াপাত সম্ভব হয়নি। কেন হয়নি তা অনুসন্ধান ও আলোচনাসাপেক্ষ।

বোড়োর (বর্ধমান) বলরাম

"বোড়ো গ্রামের বলরামে নত কৈনু শির।" অনেক পুরানো পুথির দিগ্-বন্দনায় বোড়োর বলরামের উল্লেখ পাওয়া যায়। বর্ধমান জেলায় ভ্রমণকালে অনেকের মুখে বোড়োর বলরামের কথা শুনেছি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত গ্রামটিতে যাওয়ার সুযোগ করতে পারিনি। এই গ্রন্থ মুদ্রণকালে উক্ত গ্রামের শ্রীবৈদ্যনাথ বসু ও শ্রীনিত্যানন্দ বসু আমার সঙ্গে দেখা করেন। আমি তাঁদের কাছে 'প্রশ্নমালা' তৈরি করে দিয়ে কয়েকটি বিষয় অনুসন্ধান করতে বলি। তাঁরা পরে জ্ঞাতব্য

১ ক্ষিতীশ-বংশাবলি-চরিত (সংবৎ ১৯৩২): ৫৩ ও ৬৪ পৃষ্ঠা।

বিষয়গুলি আমাকে জানান। তারপর অধ্যাপক শ্রীসুকুমার সেনের কাছে আমি তাঁদের পাঠাই। তাঁদের অনুরোধে সুকুমারবাবু "বোড়োর বলরাম বিগ্রহ" নামে এ-সম্বন্ধে স্বতন্ত্র একটি প্রবন্ধ লেখেন (পরিচয়, ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৬৩)।

বোড়োর বলরামমূর্তি কাঠের, প্রায় সাত-আট হাত উঁচু (৩৫ নং প্লেট, প্রথম চিত্র দ্রষ্টব্য)। দণ্ডায়মান মূর্তি, হাত চোদ্দটি, মাথায় সর্পফণার ছাতি। কয়েকবছর অন্তর বিগ্রহ পুনর্নির্মিত হয়। বিগ্রহের পশ্চাতে চালচিত্রে ছবি আঁকা। কাঠের বিগ্রহের প্রচলন সপ্তদশ শতকের আগে ছিল না। কৃষ্ণহীন বলরামবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা শ্রীচৈতন্যের কালে বা পরে সম্ভব নয়। সুতরাং বোড়োর বলরাম সপ্তদশ-ষোড়শ শতকের আগেকার বলে মনে হয়। মূর্তির একহাতে লাঙ্গল আছে, বলরামের বিশিষ্ট আয়ুধ কৃষিযন্ত্র। এইরকম বলরামের মূর্তি পশ্চিমবঙ্গে গোটা তিনেক পাওয়া গেছে—একটি বর্ধমানে গড়ুই গ্রামে, দুটি মুর্শিদাবাদের কান্দী অঞ্চলে, গয়েসাবাদে ও সাগরদীঘি গ্রামে। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই মূর্তিগুলিকে বিষ্ণুর রূপভেদ বলেছেন এবং এর মধ্যে বৌদ্ধ ও হিন্দু দেবকল্পনার সংমিশ্রণ ঘটেছে বলে এগুলির নাম দিয়েছেন "লোকেশ্বর বিষ্ণু"। মাথায় সর্পফণাযুক্ত এই লোকেশ্বর বিষ্ণুমূর্তি (দশহাতযুক্ত) আমি বর্ধমানের দেঁদুড় গ্রামে পেয়েছি (১নং প্লেট, তৃতীয় মূর্তি দ্রষ্টব্য)। শুনেছি, এরকম মূর্তি মন্তেশ্বর অঞ্চলে আরও পাওয়া গিয়েছিল। তাতে মনে হয়, বর্ধমান অঞ্চলে 'লোকেশ্বর বিষ্ণু'-পূজার বেশ প্রচলন ছিল এবং বোড়োর বলরামমূর্তি এই সব প্রাচীন মূর্তিরই বিশেষ পরিণতি।

বলরাম এখন বোড়োর গ্রামদেবতা। দক্ষিণরাঢ়ের অন্যতম প্রধান গ্রাম-দেবতা ধর্মঠাকুরের মতন তাঁর গাজন হয় বৈশাখ মাসে। তা ছাড়া, বিশেষ পূজা হয় বছরে চারবার—বৈশাখে অক্ষয় তৃতীয়ায়, ভাদ্রে অনন্ত চতুর্দশীতে, পৌষে মকর সংক্রান্তিতে, আর মাঘে মকর সপ্তমীতে। বলরামের গ্রামে মুসলমানের বাস নিষিদ্ধ। কর্মকার কুম্ভকার ও রজকদের বাসও নিষিদ্ধ। 'নিষিদ্ধ' অর্থে 'ট্যাবু' কিনা বলা যায় না। তা যদি হয় তাহলে এর মূল সামাজিক কারণ অনুসন্ধানযোগ্য।

চিঠিপত্র

কুমারহট্ট ও ভাটপাড়া প্রসঙ্গে

বাঙ্গলার ঐতিহ্য শ্রীবিনয় ঘোষের গভীর অন্তর্দৃষ্টিতে এবং সরস লেখনীতে আজ নূতন করিয়া কীর্তিত হইতেছে।[১] আমাদের কুড়াইয়া পাওয়া কয়েকটি কঙ্কাল এখানে তাঁহার নিকট উপস্থিত করিতেছি, তাঁহার অপূর্ব লেখনী তাহা সজীব করিয়া তুলুক। "হাবেলী সহর" বস্তুতঃ একটি পরগণার নাম এবং তাহা মূলাজোড় পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ১১৩৫ সনে এই পরগণা চাকলা হুগলী ও সরকার সাতগাঁর অন্তর্গত এবং নদীয়ার রাজবংশের জমিদারী ছিল। ৭৫ পরগণার মধ্যে একটি ছিল—রাজস্ব সিক্কা ৮০৯৩৲ টাকা (Grant's Analysis p. 431)। আইন্-ই-আকবরীতে ইহার নাম নাই—তৎকালে ইহা অন্য কোন পরগণার অংশ ছিল। খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীতে ইহা পৃথক্ নামে নদীয়ার অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকিবে। রাজা রুদ্ররায় ১০৮২ সনে এই পরগণায় ভূমিদান করিয়াছেন (নদীয়া কালেক্টরীর ২১৩৯২ নং তায়দাদ)—খুব সম্ভব তাঁহার সময় হইতেই ইহা নদীয়ার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। বিনয়বাবুর প্রবন্ধে এই পরগণার কেন্দ্রস্থল কুমারহট্টের বিবরণ সঙ্কলিত হইয়াছে; সমগ্র পরগণার নহে। অনেক স্থলে দেখা যায়, পরগণা ও তাহার কেন্দ্রস্থল একনামে পরিচিত থাকে—যেমন পরগণা কলিকাতা, সৈদপুর প্রভৃতি। এইভাবে কুমারহট্ট গ্রামও হালিসহর নামে পরিচিত হয়। কিন্তু রামপ্রসাদ একটি গানে স্পষ্ট করিয়া পরিচয় দিয়াছেন—"হালিসহর পরগণায় বসত, কুমারহট্ট গ্রামবাসী" (অতুল মুখোপাধ্যায়ের "রামপ্রসাদ", ২৬৫ সংখ্যক পদ)। ভরত মল্লীকের চন্দ্রপ্রভায়ও কুমারহট্টের নামোল্লেখ দৃষ্ট হয় (পৃঃ ৫৫)।

মুর্শিদাবাদ হইতে কলিকাতা পর্যন্ত ভাগীরথীর উভয় তীরবর্তী প্রায় প্রত্যেক গ্রামে বিদ্যাসমাজ প্রতিষ্ঠিত ছিল। ১৮১১ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুরের পাদ্রী ওয়ার্ড সাহেব হিন্দুদের বিবরণ নামক গ্রন্থে পশ্চিমবঙ্গের সাতটি প্রধান

---

১ কুমারহট্ট ও ভাটপাড়ার বিদ্যাসমাজ সম্পর্কে দুখানি চিঠি (সম্পাদিত) এখানে প্রকাশ করা হল। চিঠিগুলি আমার 'বঙ্গদর্শন'. রচনাকালে 'যুগান্তর' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।—বি. ঘো

বিদ্যাস্থানের উল্লেখ করিয়াছেন—ত্রিবেণী, নদীয়া, কুমারহট্ট, মহলা, বালী, গুপ্তিপাড়া ও শান্তিপুর (The Hindoos, 1st, ed, vol. 1. p. 200)। ভারতবিশ্রুত "ভারতীর রাজধানী" নবদ্বীপের সহিত বঙ্গের অন্য কোন বিদ্যাস্থানের কোন প্রকার তুলনার প্রশ্নই হইতে পারে না। উক্ত সাতটি স্থানের মধ্যে ভাটপাড়ার নাম নাই—যাঁহারা নবদ্বীপের সঙ্গে কেবল ভাটপাড়ার নামোল্লেখ করিয়া থাকেন, বাঙ্গলার সারস্বত ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁহাদের কোন কাণ্ডজ্ঞান নাই। গঙ্গার পূর্বতীরে যত পণ্ডিতসমাজ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল তন্মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল কুমারহট্ট—প্রায় ২০০।২৫০ বৎসর ধরিয়া এখানে শত শত চতুষ্পাঠীতে প্রধানতঃ নব্যন্যায়শাস্ত্র অধীত হইত এবং কেবল বঙ্গদেশের নহে, ভারতের নানা প্রদেশ হইতে বহু ছাত্র আসিয়া ইহাকে গৌরবান্বিত করিয়াছিল।

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

উত্তর

শ্রীবিনয় ঘোষের 'কালপেঁচার বঙ্গদর্শনে' কুমারহট্ট বা হালিসহর ও ভাটপাড়ার পণ্ডিতসমাজের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় পশ্চিমবঙ্গের পণ্ডিতসমাজে কুমারহট্ট ও ভাটপাড়ার স্থান-নিরূপণ প্রসঙ্গে কুমারহট্টের গৌরবের অবসান ও ভাটপাড়ার অভ্যুত্থানের কথা বলিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—ইংরেজ শাসনে সংস্কৃতের চর্চা বাঙ্গলার সর্বত্র হ্রাস হইতে লাগিল—নবদ্বীপের গৌরব ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া বিলুপ্তপ্রায় হইল এবং ম্যালেরিয়ায় কুমারহট্ট নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। এই সময়ে ভাটপাড়ার ঠাকুরগোষ্ঠী অগ্রণী হইয়া শাস্ত্রচর্চা যেভাবে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন তাহার তুলনা নাই। মনে হয়, উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই কুমারহট্টের গৌরবের দীপ্তি ম্লান হইয়া যায়, তবে তখনও ভাটপাড়ার খ্যাতি বিস্তার লাভ করে নাই। পাদ্রি ওআর্ড পশ্চিম বাংলার চতুষ্পাঠীর যে বিবরণ দিয়াছেন তাহাতে কলিকাতা ও নদীয়ার টোলগুলির বিস্তৃত পরিচয় দিয়া অন্যান্য স্থান সম্পর্কে লিখিয়াছেন—'বাঁশবেড়িয়ায় ১৭।১৮টি টোল আছে, ত্রিবেণী, কুমারহট্ট ও ভাটপাড়ায় সম্ভবতঃ ৭।৮টি ঐ জাতীয় টোল আছে,

গোন্দলপাড়া ও ভদ্রেশ্বরে আছে দশটি করিয়া, জয়নগর-মজিলপুরে ১৭ বা ১৮টি, আন্দুলে ১০।১২টি এবং বালি ও অন্যান্য সহরে ২।৩টি অবথা ৪টি।' উইলিয়াম অ্যাডাম বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে যে বিস্তৃত বিবরণ সংকলন করিয়াছিলেন তাহাতে নদীয়ার বিবরণ প্রসঙ্গে তিনি ১৮৩৫ সালে লিখিয়াছেন—'এই জেলার নদীয়া সহরের [নবদ্বীপের] বাহিরের টোল সম্বন্ধে বিশেষ কোন সংবাদ আমার আলোচিত আকর-গ্রন্থগুলিতে দেওয়া হয় নাই। তবে শান্তিপুর, কৃষ্ণনগর ও অন্যান্য স্থানে যে এই জাতীয় টোল আছে সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই।' প্রমাণস্বরূপ অ্যাডাম ওআর্ডের পূর্বোদ্ধৃত উক্তির উল্লেখ করিয়াছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে কুমারহট্ট ও ভাটপাড়ার বিশেষ প্রসিদ্ধি থাকিলে ওআর্ড ও অ্যাডামের পক্ষে এরূপ লেখা সম্ভবপর হইত বলিয়া মনে হয় না।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

গ্রন্থপঞ্জীর কথা

মুদ্রিত গ্রন্থাদির সুদীর্ঘ একটি তালিকা প্রকাশ করার রীতি সুপ্রচলিত। এই বইয়ের শেষে সেই রীতি অনুসরণ করা হল না, কারণ এর অধিকাংশ উপাদানই অমুদ্রিত আকর থেকে গৃহীত। ব্যাখ্যান ও বিশ্লেষণকার্যে মুদ্রিত পুস্তকাদির সাহায্য যথেষ্ট পরিমাণে নিয়েছি এবং যখন যেখানে নিয়েছি, যথাস্থানে পাঠ্যবস্তুর মধ্যে বা পাদটীকায় তা উল্লেখও করেছি। এমন অনেক গ্রন্থও আছে, যা থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছি, কিন্তু সরাসরি কোন উদ্ধৃতি নেই বলে উল্লেখ করিনি। সেই সব গ্রন্থের গ্রন্থকারদের কাছে ঋণ স্বীকার করছি। এখানে কেবল রিপোর্ট, নিবন্ধগ্রন্থ (memoirs) ও পত্রিকাদির বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখ করছি, বাহুল্যবোধে তারও তালিকা দিচ্ছি না।

বাংলা পত্রিকাদির মধ্যে খুবই প্রয়োজনীয় 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা,' পুরাতন 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ', ও 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'। এই সব বাংলা পত্রিকায় বাংলাদেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতির নানাদিক সম্বন্ধে বহু গবেষণাপ্রধান রচনা প্রকাশিত হয়েছে, যার সন্ধান অনেকে না জানলেও, সন্ধানীদের জানা উচিত। প্রকাশিত রচনাবলীর একটি শ্রেণীবিভক্ত তালিকা (Index) যদি এই সব পত্রিকার কর্তৃপক্ষ প্রকাশ করতেন, তাহলে অনুসন্ধানীদের কাজের সুবিধা হত। দুঃখের বিষয়, তা অনেকে করেননি। কেবল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে 'পরিষৎ-পরিচয়' নামে ১৩০০ সন থেকে ১৩৫৬ সন পর্যন্ত পরিষৎ পত্রিকায় মুদ্রিত প্রবন্ধাবলীর একটি বিষয়-বিভক্ত তালিকা প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৫৬ সনে।

ইংরেজী পত্রিকার মধ্যে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকা, গবেষণাপত্র (papers) ও নিবন্ধগ্রন্থগুলি। ১৮৮৫ সালে সোসাইটির Centenary Volume-এ 'জার্নাল' ও 'প্রসিডিংসের' নিবন্ধ ও পত্রাবলীর একটি তালিকা প্রকাশিত হয়। সম্প্রতি এসিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারিক শ্রীশিবদাস চৌধুরী ১৭৮৮ থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত এসিয়াটিক সোসাইটি প্রকাশিত যাবতীয় রচনাবলীর (গ্রন্থাকারে ও প্রবন্ধাকারে) একটি সম্পূর্ণ তালিকা প্রস্তুত করেছেন—Index to the Publications of the Asiatic Society, 1788-1953. এখনও পুস্তকাকারে তালিকাটি প্রকাশিত হয়নি, শীঘ্রই

হবে। যে-কোন বিষয়ের অনুসন্ধানীর কাছে এই 'ইনডেক্স' অপরিহার্য বলে গণ্য হবে। আমার এই বইয়ের কাজে শ্রীশিবদাস চৌধুরী তাঁর ইন্‌ডেক্সের মুদ্রণ-কালীন পাণ্ডুলিপি ও প্রুফকপি ব্যবহার করতে দিয়ে যে কতখানি উপকার করেছেন তা বলা যায় না। তা না হলে, গত প্রায় পৌনে দুশ বছর ধরে প্রকাশিত এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকা ও পত্রাবলীর স্তূপ তল্লাস করে আমার প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করা একরকম অসম্ভব হয়ে উঠত।

অন্যান্য পত্রিকার মধ্যে 'ম্যান ইন ইণ্ডিয়া', 'ইণ্ডিয়ান হিস্টোরিকাল কোয়ার্টার্লি', 'ইণ্ডিয়ান অ্যান্টিকুয়ারি', 'ইণ্ডিয়ান কালচার', 'জার্নাল অফ ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েণ্টাল আর্ট', 'রূপম', 'জার্নাল অফ্ ডিপার্টমেণ্ট অফ লেটার্স' (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

প্রত্নতত্ত্ববিভাগের রিপোর্ট (কানিংহামের পুরাতন সিরিজ, পরবর্তী বাৎসরিক রিপোর্ট ও 'এনসিয়েণ্ট ইণ্ডিয়া') ও নিবন্ধমালা (memoirs) থেকে বহু উপকরণ সংগ্রহ করেছি। প্রাচীন শিলালিপি ও মুদ্রা বিষয়ে উল্লেখযোগ্য হল, Epigraphica Indica, Catalogue of Coins in the Indian Museum, গৌড়লেখমালা (অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়), Inscriptions of Bengal, Vol III (ননীগোপাল মজুমদার)।

ড্যাণ্টন, রিস্‌লে, শরৎচন্দ্র রায়, হাটন প্রভৃতির গ্রন্থ ও রচনাবলী থেকে আদিবাসীদের সম্বন্ধে প্রচুর উপকরণ সংগ্রহ করেছি। ১৯০১ থেকে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত 'সেন্সাস রিপোর্ট' থেকেও এবিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছি। এই বিষয়ে শ্রীঅশোক মিত্র (আই. সি. এস.) সম্পাদিত The Tribes and Castes of West Bengal (Census 1951, West Bengal) নামে সংকলনগ্রন্থখানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

হাণ্টারের Statistical Account of Bengal (20 Vols) ও বাংলা দেশের পুরাতন জেলা 'গেজেটিয়ারের' মধ্যেও বহু সাংস্কৃতিক তথ্য ছড়িয়ে আছে। যতদূর সম্ভব এই তথ্যগুলিও আহরণ করেছি।

এসিয়াটিক সোসাইটি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্বভারতী 'বিদ্যাভবন' থেকে প্রকাশিত বাংলা পুথির বিবরণ ও ক্যাটালগ থেকে অনেক তথ্যের সন্ধান পেয়েছি।

নির্ঘণ্ট

[প্রধানত গ্রাম, লৌকিক দেবদেবী ও উৎসব-পার্বণের নামের নির্ঘণ্ট। বিষ্ণুপুর, বর্ধমান, মেদিনীপুর প্রভৃতি প্রধান শহরের নির্ঘণ্ট দেওয়া হল না। সূচীপত্রে সমস্ত বিবরণ পাওয়া যাবে।]

অ

আ

ই

এ

ও

ঔ

খ

গ

য

র

ল

সংশোধন ও সংযোজন

॥ পাদটীকা ॥

পাদটীকার উল্লেখরীতির পূর্বাপর সঙ্গতিরক্ষা সম্ভব হয়নি। বইয়ের নাম কখন বাংলায়, কখন ইংরেজীতে, লেখকের নাম কোথাও আগে, কোথাও পরে উল্লেখ করা হয়েছে। ভুল না হলেও, এই অসঙ্গতির জন্য দুঃখিত।

॥ ১ মাইল = প্রায় ৫ লী ॥

৭৮৭-৮৮ পৃষ্ঠায় ১ লী = ১$\frac{১}{২}$ মাইল বলে যে উল্লেখ আছে তা ভুল। তার পরিবর্তে ১ লী = $\frac{১}{৫}$ মাইল, অর্থাৎ ৫ লী = ১ মাইল হবে। এই হিসেব অনুসারে কর্ণসুবর্ণরাজ্যের পরিধি ৪৪৫০ লী = ৮৯০ মাইল এবং তার রাজধানীর পরিধি ২০ লী = ৪ মাইল হবে।

অশুদ্ধ	পৃষ্ঠা (লাইন)	শুদ্ধ
Protc-Australoid	৪২ (১৯)	Proto-Australoid
নন্দদুলাল দে	৫৮ (২৯)	নন্দলাল দে
Indc-Mongoloid	৫৯ (১৭)	Indc-Mongoloid
শ্রীসুধাংশুকুমার সেন	৪৭৬ (পাদটীকা)	শ্রীসুধাংশুভূষণ সেনগুপ্ত
মুন্‌শী পরিবারের	৭০৫ (১৬)	মোল্লা পরিবারের
তম্রশাসনে	৭৬৯ (২১)	তাম্রশাসনে
Epigraphica Indica	৮০০ (৪১)	Epigraphica Indica